মঙ্গলকাব্যে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপায়ণ

মো. জাহাঙগীর আলম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
এপ্রিল ২০১৫

উৎসর্গ

আমার প্রয়াত পিতামহী ও পিতামহ

উম্মে কুলসুম

মো. জামাত আলী

এ গবেষণাকর্ম চলাকালে মাত্র তিন

মাসের ব্যবধানে যাঁদের হারিয়েছি।

‘নয়ন তোমাদের পায় না দেখিতে

রয়েছ নয়নে নয়নে।’

প্রত্যয়ন-পত্র

এ মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, মো. জাহাঙ্গীর আলম কর্তৃক উপস্থাপিত **‘মঙ্গলকাব্যে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপায়ণ’** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এটি লেখকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এ অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেননি।

(ড. ফাতেমা কাওসার)
গবেষণা-তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

প্রসঙ্গ কথা

ছাত্র জীবনে আমার দুটি বিষয়ে অনুরাগ-আগ্রহ ও আকর্ষণ জন্মায়; তার একটি সাহিত্য এবং অপরটি ইতিহাস। এ অনুরাগ-আগ্রহই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণায় পরিণত হয়। বাংলা বিভাগের ছাত্র হিসেবে মধ্যযুগের সাহিত্য পাঠ কালেই মূলত সমকালীন বাংলা, বাঙালির ইতিহাস ও যাপিত জীবন সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত হয়। আর এ কারণেই মধ্যযুগের সমৃদ্ধতম সাহিত্যের শাখা হিসেবে স্বীকৃত ও কালের দর্পণ স্বরূপ মঙ্গলকাব্যকে বেছে নেয়া। এ ক্ষেত্রে সমকালীন (ত্রয়োদশ-অষ্টাদশ) বাংলা ও বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পরিচয় জানতে হলে মঙ্গলকাব্যের বিকল্প নেই। নিজ দেশ ও জাতির পরিচয়, ইতিহাস এবং জীবন সম্পর্কিত তথ্য অন্বেষাই বর্তমান গবেষণাকর্ম রচনায় মূল অনুপ্রেরণা।

'মঙ্গলকাব্যে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপায়ণ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ রচনার জন্য আমি স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১১-২০১২ শিক্ষাবর্ষে নাম নিবন্ধন করি। এম.ফিল গবেষণায় অনুমতিদানের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. ফাতেমা কাওসার- এর তত্ত্বাবধানে আমি এ অভিসন্দর্ভ রচনা করি। বর্তমান অভিসন্দর্ভের সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ড. ফাতেমা কাওসার- এর নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা ছিল আমার অন্যতম শ্রম-উৎস। এ অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্বাচন করে দিয়েছিলেন বাংলা বিভাগের সর্বজন শ্রদ্ধেয়, জনপ্রিয় শিক্ষাবিদ এবং আমার শিক্ষক প্রফেসর ড. সৈয়দ আকরম হোসেন। এ অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্বাচনে, দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থসমূহ সংগ্রহে এবং রচনার মান উন্নয়নে স্যারের সুচিন্তিত অভিমত আমাকে ও আমার গবেষণাকে একই সঙ্গে করেছে ঋণী ও ঋদ্ধ।

এছাড়া অভিসন্দর্ভ রচনাকালে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের তালিকা, প্রয়োজনীয় পরামর্শ, নির্দেশনা ও মীমাংসার ক্ষেত্রে যাঁরা আমাকে সর্বদা আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন এবং সাহস যুগিয়েছেন এ দুর্বোধ্য কর্মে; তাঁরা হলেন আমার শিক্ষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, ড. সৈয়দ আজিজুল হক এবং ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া। এঁদের সবার কাছে আমি ঋণী ও কৃতজ্ঞ। মধ্যযুগের সাহিত্য বিশারদ হিসেবে শাহজাহান স্যারের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা অনেক জটিল বিষয়ের মীমাংসায় পৌছাতে আমাকে সাহায্য করেছে। এ পর্যায়ে স্মরণ করছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের নবীন প্রভাষক বন্ধুবর জসিম উদ্দিন তানিম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক ও অগ্রজপ্রতিম আসাদুল্লাহ গালিবকে। এঁরা দুজনেই আমাকে নানাভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন।

গবেষণাকালে আমি প্রধানত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা বিভাগের সেমিনার, বাংলা একাডেমির গ্রন্থাগার ও মানিকগঞ্জ সরকারি দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের গ্রন্থাগার ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

গবেষণাকর্ম রচনায় নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সাংসারিক সকল দায়ভার বহন করে আমাকে দুশ্চিন্তামুক্ত ও সার্বক্ষণিক অধ্যয়নে অভিনিবেশ রাখার ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান অসামান্য; তাঁরা হলেন আমার বাবা-মা, বড় ভাই ও আমার স্ত্রী আফরোজা। আফরোজা তাঁর প্রাপ্য ভালোবাসাকে নির্দ্বিধায় বিসর্জন দিয়েছে শুধু আমার এ মূল্যবান গবেষণার সুবিধার্থে। এ ক্ষেত্রে তাঁর এ ত্যাগ ও উদারতার মূল্য অকিঞ্চিৎকর নয়। এ গবেষণাকর্মে কম্পিউটার কম্পোজ বা মুদ্রণে সহযোগিতা করেছেন আনিস ভাই ও আল-মামুন ভাই। আমি তাঁদেরকে ধন্য জানাই স্বল্প সময়ে অনেক কষ্ট সহ্য করে এ জটিল কর্ম সম্পন্ন করায়।

শিক্ষা জীবনে ছাত্র ছিলাম (মাতৃভাষা) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এবং গবেষণাকর্ম হিসেবে বেছে নিয়েছি বাঙালি জাতির সংশ্লিষ্ট বিষয়-আশয়কে। তাই এ গবেষণাকর্ম করতে গিয়ে আমি যে বোধ ও পরম সত্যে উপনীত হয়েছি; তা হলো- 'জন্মভূমি জননী স্বর্গের গরিয়সী'।

(মো. জাহাঙ্গীর আলম)

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা	:		**৬ – ৮**
প্রথম অধ্যায়	:	**বাংলা ও বাঙালির পরিচয়**	**৯ – ৮৪**
দ্বিতীয় অধ্যায়	:	**মঙ্গলকাব্যের প্রাসঙ্গিক পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ**	**৮৫ – ৯৬**
তৃতীয় অধ্যায়	:	**বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট**	**৯৭ – ১১১**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন	১১১ – ১২০
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির সামাজিক জীবন	১২০ – ১৫৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন	১৫৮ – ২০৯
চতুর্থ অধ্যায়	:	**মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট**	**২১০ – ২২৪**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন	২২৪ – ২৩৩
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির সমাজিক জীবন	২৩৪ – ২৬৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন	২৬৬ – ৩২৯
পঞ্চম অধ্যায়	:	**ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট**	**৩৩০ – ৩৪৬**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন	৩৪৭ – ৩৫৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির সমাজিক জীবন	৩৫৫ – ৩৮১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন	৩৮১ – ৪৪৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	:	**ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট**	**৪৪৪ – ৪৬৭**
প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন	৪৬৮ – ৪৭৫
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির সমাজিক জীবন	৪৭৬ – ৫০৩
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন	৫০৪ – ৫৬৪
উপসংহার	:		**৫৬৫ – ৫৬৬**
পরিশিষ্ট	:		**৫৬৭ – ৫৮৪**

প্রস্তাবনা

সমাজ-সমকাল-সাহিত্য ও সাহিত্যিক (সাহিত্য শিল্পী) এ চতুর্মাত্রিক উপাদান বা উপকরণের সমন্বয়েই মহৎ সাহিত্যের বিনির্মাণ ঘটে। আর এসবের মধ্যকার সম্পর্ক পরস্পর বিপ্রতীপ নয়, বরং পরিপূরক। কারণ সাহিত্য হচ্ছে যুগ-জগৎ ও জীবনের দর্পণ বা অনুকৃতি; ভাব-কল্পনা-আবেগ-অনুভূতির নান্দনিক অভিব্যক্তি। তাই একজন সাহিত্যিক যেমন সময় ও সমাজের রূপকার, তেমিন জীবনের অনুকারকও বটে। সমাজদ্রষ্টা ও সংবেদনশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে একজন সাহিত্যশিল্পী জীবনে যা অনুভব করেন এবং সমাজ প্রতিবেশে যা প্রত্যক্ষ করেন, তারই প্রতিচ্ছবি সাহিত্য সম্ভারে বাণীমূর্তি লাভ করে। যুগ-মানস, যুগ-জীবন, যুগ-জিজ্ঞাসা ও যুগ-যন্ত্রণা সন্দর্শণে তাই সাহিত্যের উপাদান-উপকরণের মূল্য ও গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। ইতিহাসের তথ্য যেখানে একদেশদর্শী, নীরব ও নির্বাক, সাহিত্যের বাণী সেখানে সরব ও সোচ্চার। ইতিহাসে শুধু রাজনৈতিক ঘটনা তরঙ্গের উত্থান-পতন, রাজ-রাজড়ার জয়-পরাজয়ের ইতিকথা, তাতে সাধারণ মানুষ ও জনজীবনের সুখ-দুঃখের তথ্য ও চিত্র তেমন প্রতিফলিত হয় না। কিন্তু সাহিত্য যে বিষয় নিয়েই রচিত হোক না কেন; তাতে লেখকের যুগ-জীবন, সমাজ, প্রতিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতার চিত্র ধরা পড়বেই। তাই সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যকার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ, চিরন্তন ও শাশ্বত।

মধ্যযুগে ধর্মই ছিল মুখ্য আর মানুষ ছিল গৌণ। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ শাখারই উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে ধর্মের আশ্রয়-প্রশ্রয়ে। ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় নিয়ে সাহিত্য সাধনা করা সেকালের মানুষের পক্ষে সম্ভবপর ও সহজতর ছিল না। ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার, ধ্যান-ধারণাকে সমাজ মানসের হৃদয়গোচর করতেই তৎকালে সাহিত্য রচিত হতো। সঙ্গত কারণে মঙ্গলকাব্যসমূহের ক্ষেত্রে এ কথাগুলো সমানভাবে প্রযোজ্য। কারণ মঙ্গলকাব্যসমূহে (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল) একেকজন দেবতার পূজা প্রচার-প্রসার ও মাহাত্ম্য প্রকাশের বাণী বিঘোষিত হয়েছে। যদিও দেবতাকে ছাপিয়ে মানুষের কথা ও মানবতাই বড় হয়ে ওঠেছে। তথাপি এর ধর্মীয় প্রভাবকে কোনভাবেই অস্বীকার করার উপায় নেই।

মধ্যযুগের বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ (বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাপ ও বাঘ ভীতি) ও মানবসৃষ্ট রাজনৈতিক বিষবাষ্পে তথা রাজরোষে অসহায় মানুষ তাদের অবস্থান অনুযায়ী দেব-দেবীর কল্পনা করে তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় কামনা করেছে। এ সূত্রেই পৌরাণিক দেব-দেবী লৌকিক দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে পড়ে এবং স্বর্গবাসী দেবতাদের স্বর্গলোক ছেড়ে মর্ত্যলোকে আগমন অনিবার্য হয়ে পড়ে। মর্ত্যের মায়া-মমতা ও মানুষের সংস্পর্শে এসে দেবতাগণও স্বর্গীয় মাহাত্ম্য ও মহিমা বিসর্জন দিয়ে অনেকটা মর্ত্যবাসী মানব হয়ে ওঠেন। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির প্রভাবে তারাও অস্থির-আকুল, হিংসা-বিদ্বেষ ও স্বপ্ন-বাসনার দোলাচলে তাড়িত হয়ে সাধারণ মানুষের মতোই আচরণ করেছেন। বিশাল ক্ষমতাধর, প্রতিপত্তিশালী বিলাসী ও যশ প্রত্যাশী এসব দেবতাগণ নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে তাই কারণে-অকারণে সাধারণ মানুষের ওপর চালিয়েছেন জুলুম-নির্যাতন; দিয়েছেন প্রতিকারহীন সর্বনাশা অভিশাপ। আসলে মঙ্গলকাব্যের এ চিত্র সমকালীন সামন্ত শাসকদেরই শাসন-শোষণের রূপান্তরিত রূপ। কারণ মধ্যযুগের রাজা-বাদশা, জমিদার-জোতদার ও আমলা শ্রেণির সঙ্গে এ দেবতাদের সাদৃশ্য বা সাজুয্য অত্যন্ত নিবিড়। তাই বলা যায়; মঙ্গলকাব্যের কাহিনী শুধু মঙ্গলময় হয়ে ওঠেনি, বরং তা হয়ে ওঠেছে সাধারণ মানুষের দুঃখ-দণ্ড বহনকারী অভিশপ্ত অভিজ্ঞান।

তাই এ মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমেই মূলত মধ্যযুগের (ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) সামন্তবাদী শাসনামলে বাংলা ও বাঙালি সমাজের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় বা রূপকল্প বিধৃত হয়েছে। মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি

জাতির আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় জানতে হলে আমাদের অবশ্যই মঙ্গলকাব্যের দ্বারস্থ হতে হয়। সঙ্গত কারণেই এ মঙ্গলকাব্য হয়ে ওঠেছে মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালি জাতির রূপান্তরিত রূপক এবং পরিণত হয়েছে ইতিহাসের তত্ত্ব-তথ্যের আধার ও আধেয়-তে।

গুরুত্ব

মধ্যযুগ যেহেতু ছিল ধর্মমুখ্য, সেহেতু মঙ্গলকাব্যের ভাবাকাশের প্রধান সুরও ছিল এই ধর্মীয় চেতনা। আবার মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রধানতম শাখা হচ্ছে এ মঙ্গলকাব্য। তাই মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির অর্থনৈতিক ইতিহাস, রাজনৈতিক ইতিহাস, সামাজিক ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস মূল্যায়নে মঙ্গলকাব্যকে সমকালের আধার ও দলিল হিসেবে বেছে নিতে হয়। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের এ বিশিষ্ট শাখা মঙ্গলকাব্য নিয়ে বহু খ্যাতিমান, পরিশ্রমী ও নিবেদিতপ্রাণ গবেষক-পণ্ডিতগণ গবেষণা ও সমালোচনা করে এর ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। তবে এ কথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এ গবেষণা মূলত সাহিত্যের নন্দনতাত্ত্বিক দিককেই প্রতিষ্ঠা করেছে এবং এ গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া এযাবতকাল গবেষকগণ যে বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব ও দৃষ্টি দিয়েছেন তা হলো–

ক. লেখক জীবনী ও রচনাকাল নির্ণয়-নির্ধারণ প্রচেষ্টা।

খ. দেব-দেবী সম্পর্কিত পুরাতাত্ত্বিক-ঐতিহাসিক ও লৌকিকতা বিচার।

গ. কাব্যের চরিত্র বিচার বা নর-নারীর সামাজিক অবস্থা ও ভূমিকার মূল্যায়ন।

ঘ. কাব্যের রচনা-শৈলী ও অলংকার বিশ্লেষণ।

ঙ. ভাষাতাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণ।

সঙ্গত কারণেই মঙ্গলকাব্যের ইতোপূর্বেকার গবেষণা ও সমালোচনাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যায় না। বিশেষ করে মঙ্গলকাব্যের সমকালীন বাংলা ও বাঙালি জাতির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আন্তঃসম্পর্কীয় এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আজো অনুদ্ঘাটিত রয়ে গেছে। এ ধরনের একটি অনুদ্ঘাটিত বিষয়কে উন্মোচিত করার প্রয়োজনীয়তা ও যুগের দাবিকে স্বীকার করেই রচিত আলোচ্য অভিসন্দর্ভ 'মঙ্গলকাব্যে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপায়ণ'।

পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণাকর্মটি ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণের সমন্বয়ে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণাত্বক পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়েছে। তত্ত্ব ও তথ্যের সমন্বয়ে একটি কাঙ্ক্ষিত মূল্যায়ন ও মীমাংসায় উপনীত হবার প্রযত্ন-প্রয়াস চালানো হয়েছে।

পরিধি

'মঙ্গলকাব্যে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের রূপায়ণ' দেখাতে গিয়ে মূলত পাঁচ শতাব্দী ব্যাপী (ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ) মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালির জীবনের চালচিত্র উন্মোচনে চারটি মঙ্গলকাব্যকে (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল) মূল পাঠ হিসেবে নেয়া হয়েছে। বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক এ তিনটি বিষয়কে নির্মোহ-নিরপেক্ষভাবে উপস্থাপন করাই বর্তমান অভিসন্দর্ভের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

এর সুবিধার্থে বর্তমান গবেষণা-প্রকল্পকে প্রস্তাবনা ও উপসংহার ব্যতীত মোট ছয়টি পর্যায়ে বিভক্ত করে অগ্রসর হবার প্রয়াস পেয়েছি।

১. **বাংলা ও বাঙালির পরিচয় :** এ অধ্যায়ে বাংলা ও বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আলোচিত হয়েছে। এর আলোচনায় বাঙালির আদিযুগ থেকে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত এর কালপ্রবাহকে সংক্ষিপ্তভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এতে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিকটিও গুরুত্ব পেয়েছে।

২. **মঙ্গলকাব্যের প্রাসঙ্গিক পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ :** এ অধ্যায়ে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব-ক্রমবিকাশ ও সমকালীন পট-পরিপ্রেক্ষিত বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

৩. **বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট :** এ অধ্যায়ে মনসামঙ্গল কাব্যের সমকালীন প্রেক্ষাপট, দেবী মনসার পরিচয়, কবিদের তালিকা, বিজয়গুপ্তের জীবনী, কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়-আশয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. **মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট :** এ অধ্যায়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সমকালীন প্রেক্ষাপট, দেবী চণ্ডীর পরিচয়, কবিদের তালিকা, মুকুন্দরামের জীবনী, কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়-আশয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৫. **ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট :** এ অধ্যায়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সমকালীন প্রেক্ষাপট, ধর্মঠাকুরের পরিচয়, কবিদের তালিকা, ঘনরামের জীবনী, কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়-আশয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

৬. **ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট :** এ অধ্যায়ে অন্নদামঙ্গল কাব্যের সমকালীন প্রেক্ষাপট, দেবী অন্নদার পরিচয়, কবিদের তালিকা, ভারতচন্দ্রের জীবনী, কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সকল বিষয়-আশয় উপস্থাপন করা হয়েছে।

উপসংহার অংশে পূর্বের অধ্যায়সমূহের আলোচিত বিষয়-আশয়ের, সার-সংক্ষেপ বা সারাৎসার উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়
বাংলা ও বাঙালির পরিচয়

বাংলা ও বাঙালির সর্বশেষ বিবর্তিত জাতি সত্তার ভৌগোলিক রূপ; আজকের যে বাংলাদেশ তা বৃহত্তম ভারতবর্ষের খণ্ডিত অংশবিশেষ। যে ভাষিক, সাংস্কৃতিক ও নৃ-তাত্ত্বিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাঙালি জাতির বিকাশ ঘটেছে, তার সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস-ঐতিহ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেছে। ভৌগোলিক ভাঙা-স্তা, প্রকৃতির খেয়াল-খুশি ও রাজনৈতিক উত্থান-পতনে ভারতবর্ষের মতো বাংলাও হয়েছে বহুধা বিভক্ত। এরপরও এ বাংলা ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিত্ত-বৈভব, রূপ-রস ও বিপ্লব-বিক্ষোভের দ্বারা তার নিজস্ব গতিতেই বহমান থেকেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন-

এ বঙ্গ কত ভঙ্গ
তবু কত রঙ্গে ভরা।

বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস বড় জটিল ও বিচিত্র। আজকের বাংলা ও বাঙালিকে জানতে হলে সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসকে জানতে হয়। কারণ বাঙালির অস্থি-মজ্জা ও শোণিতের ধারা ভারত ভূমিতে বেড়ে ওঠেছে। তাই বাংলা ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক বিপ্রতীপ নয় বরং পরস্পর পরিপূরক। যেমনটা বলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-

‘আমার জীবনী লিখিতে হইলে তাঁহারও লিখিতে হয়,,, সে আমার পরিবারের (স্ত্রীর)।’[১]

তাই বাংলার ইতিহাস লেখার পূর্বে ভারতবর্ষের ইতিহাস জানা জরুরি হয়ে পড়ে। বঙ্গদেশ ও বাংলা ভাষাভাষী বাঙালির ইতিহাসকে মোটা দাগে, সরল সমীকরণে ও সহজ সিদ্ধান্তে ব্যাখ্যা করা কঠিন ও দুরূহ। শুধু ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জির ধারায় ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ জুনের ‘পলাশীর যুদ্ধ’, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর হাতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ১৪ আগস্ট ‘পাকিস্তান’ ও ১৫ আগস্ট ‘ভারত’ রাষ্ট্রের বিভক্তির মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ এবং ‘পশ্চিম পাকিস্তান’ থেকে ‘পূর্ব পাকিস্তানের’ মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের নবজন্মের ইতিকথা বললেই সব কিছু বলা হয় না। কারণ এসব তথ্য বাংলা ও বাঙালি জাতির উদ্ভব-বিকাশ ও বিবর্তনের ইতিহাসে পরিণামী ঘটনাপ্রবাহ। তাই বাঙালি জাতির উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস আরম্ভের পূর্বে ভারতবাসীর ইতিহাস আরম্ভ করতে হয়। কারণ-

‘আরম্ভের পূর্বেও আরম্ভ আছে। সন্ধ্যা বেলার দীপ জ্বালার আগে সকাল বেলায় সলতে পাকানো।’[২]

ভারতবর্ষ এশিয়া মহাদেশের এক উপমহাদেশ। বিশাল ও বিস্তৃত এ ভারতবর্ষের আয়তন রাশিয়াকে বাদ দিলে প্রায় সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের সমান অথবা গ্রেট ব্রিটেনের বিশগুণ। এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণে একটি ত্রিভুজাকৃতি উপদ্বীপের অংশ হিসেবে ভারতবর্ষ বিরাজমান। প্রাচীন কাল থেকেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল স্থান দখল করে আছে এ উপদ্বীপটি। এর পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে– ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে– আরবসাগর ও উত্তরে সুউচ্চ হিমালয় পবর্তমালা ভারতবর্ষকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদ রেখেছে। এর ভৌগোলিক সীমানা পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ২৫০০ মাইল এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ২০০০ মাইল বিস্তৃত। এর মোট আয়তন দাঁড়ায় ১,৮০,০০০ বর্গ মাইল। আয়তনের দিক দিয়ে ভারত পৃথিবীর মধ্যে সপ্তম বৃহত্তম দেশ। পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ লোক এদেশে বসবাস করে। অধিবাসীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানই প্রধান। তবে জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিব, পারসিক ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী লোকও রয়েছে।

প্রাচীন গ্রিকরা ভারতবর্ষকে বলতো ‘ইন্ডিকা’ এবং পারসিকরা বলতো ‘সিন্দ’ বা ‘হিন্দ’। যা পরবর্তীকালে এ শব্দ দুটি ‘সিন্ধু’ ও ‘হিন্দু’ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। আবার ইংরেজরা সিন্ধু নদকে বলতো ‘ইন্ডাস’। এ ‘ইন্ডাস’ থেকেই ‘ইন্ডিয়া’ নামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ ঘটে। তবে নামের আভিজাত্য ও মাহাত্ম্যে ‘ভারতবর্ষ’

বিশিষ্ট স্থান লাভ করে। কারণ হিন্দুদের বিশ্বাস মতে, অযোধ্যার চন্দ্র বংশের রাজা দশরথের ছেলে ও রামচন্দ্রের ভাই 'ভরত' এ দেশ শাসন করেছিলেন। এ 'ভরত' ও 'চন্দ্রবংশ' শব্দ দুটি একীভূত হয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটে 'ভারতবর্ষ' নামক ভূ-খণ্ডের। পরবর্তীকালে ভারতমাতার বিভক্তি বা অঙ্গচ্ছেদ বোঝাতে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে 'ভারতবর্ষ' থেকে 'বর্ষ' শব্দটি বাদ পড়ে। আবার অনেকে এ ভারতবর্ষকে 'জম্বুদ্বীপ' নামেও ডাকতো। সম্রাট অশোকের শিলালেখ এর প্রমাণ বহন করে। জনগোষ্ঠী, ভাষা, ধর্ম ও প্রাকৃতিক দিক থেকে ভারতবর্ষে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তা চোখে পড়ার মতো। স্থানীয় বা আঞ্চলিক এ বহু বৈচিত্র্যের মধ্যেও বিশাল এক ঐক্য গড়ে ওঠেছে। নানা বৈচিত্র্যের কারণে অনেকে ভারতকে 'নৃ-তত্ত্বের জাদুঘর' বলে অভিহিত করে থাকে।

ইন্দো-আর্য সংস্কৃতির ধারায় এ দেশের প্রতি জনগোষ্ঠীর গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিবেদন করেছে। এদেশের সাতটি পবিত্র নদী যথা- গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্মদা, কাবেরী ও সিন্ধু; হিন্দুদের কাছে 'সপ্তসিন্ধু' নামে মাতৃভূমির প্রতি পূজার্চনা ও মিলন মেলার প্রধান কেন্দ্রস্থল। অনুরূপভাবে সাতটি পবিত্র নগর যথা- অযোধ্যা, মথুরা, কাশী, উজ্জয়িনী, কাঞ্চি, হরিদ্বার ও দ্বারকার সমন্বয়ে 'সপ্তনগর' হিন্দুদের কাছে পবিত্র তীর্থস্থান হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আবার আর্যদের কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র ছিল পাঞ্জাব। ঋগ্বেদে উল্লিখিত প্রায় পঁচিশটি নদীর মধ্যে পাঁচটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো হলো- শতদ্রু, বিপাশা, রাভী বা ইরাবতী, চেনাব ও ঝিলাম বা বিতস্তার সংযোগ হেতু এ 'পঞ্চনদের' নামকরণ হয়েছে পাঞ্জাব। সপ্তসিন্ধুর মতো এ পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাবেরও ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান ছিল। উপর্যুক্ত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্যালোচনার সুবিধার্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যমুনা থেকে ব্রহ্মপুত্রের সমভূমি অঞ্চলকে বলা হয় 'মধ্যদেশ'। উত্তর-পশ্চিম ভারতকে বলা হয় 'উত্তরাপথ'। পশ্চিম ভারতকে বলা হয় 'প্রতীচ্য' বা 'অপরান্ত'। পূর্ব ভারতকে 'প্রাচ্য' এবং দক্ষিণ ভারতকে 'দক্ষিণাপথ' নামে অভিহিত করা হয়।

দুই

ভারতবর্ষের মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের ইতিহাস বলা ও জানা যত সহজ কিন্তু প্রাচীন ও আদি মধ্য যুগের আলোচনা তত সহজসাধ্য নয়। কারণ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে তা কোথাও একত্রে এক স্থানে লিপিবদ্ধ হয়নি বা পাওয়া যায়নি। তাই আমাদের কিছু উপাদানের ওপর নির্ভর করতে হয়। এসব উপাদানকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান (Archaeological elements)

খ. সাহিত্যিক উপাদান (Literary elements)

এ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানসমূহকে আবার স্থাপত্য, ভাস্কর্য, লেখমালা (Inscriptions), মুদ্রানাম (Coin), বা অভিজ্ঞান মুদ্রায় (Seals and Sealing) ভাগ করা যায়। আবার সাহিত্যিক উপাদানসমূহকে দেশীয় সাহিত্য (Native Literary) ও বিদেশি সাহিত্যে (Foreign Literary) ভাগ করা যায়। দেশীয় সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে- বৈদিক সাহিত্য, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, স্মৃতিশাস্ত্র, যাজ্ঞবল্ক্য, উপনিষদ, মনুসংহিতা, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, চাণক্যের নীতিশাস্ত্র, জাতক, থেরীগাথা, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, মৃচ্ছকটিকা, শতককাব্য, চৌরপঞ্চাশিকা, জৈন সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাক্-গুপ্ত ও গুপ্ত যুগের সাহিত্য, গুপ্তোত্তর যুগের সাহিত্য, পুথি, স্থানীয় উপাখ্যান, কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ, সঙ্গম সাহিত্য এবং ডাক ও খনার বচন প্রভৃতি। বিদেশি সাহিত্যের উপাদানের মধ্যে রয়েছে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বিদেশিদের রচিত গ্রন্থ এবং ভারতে আসা বিভিন্ন পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্তমূলক রচনাসমূহ।

তিন

দেশ-কাল ও জনপদ

আজ আমরা ভৌগোলিক, ভাষিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে যে জনগোষ্ঠীকে বাঙালী এবং যে ভূখণ্ডকে বাঙলা বা বাঙলাদেশ বলে জানি, তা আধুনিক কালের। প্রাচীনকালে এই দেশে একক নামের ও অভিন্নগোষ্ঠীর মানুষের কোন পরিচয় মেলে না। মোটামুটিভাবে বলা যায়- গৌড়, রাঢ় ও পুণ্ড্র অঞ্চলই প্রাচীন জনপদ। এইসব অঞ্চলে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু বর্বর বুনো মানুষ গোষ্ঠী-জীবনে অভ্যস্ত ছিল। বসতি ছিল বিরল। ,,, মনে হয় খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতকের পূর্বেই গৌড়া, পুণ্ড্রা, বঙ্গা, রাঢ়া প্রভৃতি গোষ্ঠীয় সমাজ দৃঢ়মূল হয়ে ওঠে। তাই আমরা ঐতরেয় আরণ্যকে (খ্রিষ্টপূর্ব পাঁচ শতক) গ্রন্থে 'বঙ্গা' প্রাচীন সংস্কৃত রচনায় পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর পতঞ্জলির ভাষ্যে গৌড়াঃ রাঢ়াঃ পুণ্ড্রাঃ প্রভৃতি গোত্রীয় সমাজের উল্লেখ পাই। উত্তর ভারতের কোশাম্বীর নিকটে পভোসায় প্রাপ্ত গুহালিপিতে (খ্রিষ্টীয় ১ম শতকে) 'বঙ্গপাল' নামে রাজার উল্লেখ পাই। মানসোল্লাসে 'গৌড় বঙ্গাল' নাম মেলে। চর্যাগীতিতে 'বঙ্গালী' ও 'বঙ্গাল' দেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতেই বোঝা যায় খ্রিষ্টপূর্ব প্রায় হাজার বছর আগেই এদেশের অধিকাংশ মানুষ যাযাবর জীবন পরিহার করে কৃষিনির্ভর জীবিকায় অভ্যস্ত হয় এবং স্থানীয় নিবাস গড়ে তোলে। প্রাচীন দেশী দেবতা শিবের কাহিনীর মধ্যেই এ তথ্য মেলে। পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলি- অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্মা, পুণ্ড্র, মগধ, কলিঙ্গ এবং কাত্যয়নও- অঙ্গাঃ বঙ্গাঃ সুহ্মাঃ পুণ্ড্রাঃ-র উল্লেখ করেছেন। বোধায়ণ ধর্মসূত্রেও [১/২/১৪] পুণ্ড্রের ও বঙ্গের অবজ্ঞার্থে উল্লেখ রয়েছে। পুরাণের পূর্বাঞ্চলের দেশ হিসেবে অঙ্গ, বিদেহ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র প্রভৃতির সঙ্গে বঙ্গও উল্লিখিত। ,,, মহাভারতের অসুর রাজা বলির পাঁচপুত্র– অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম রাজারা ছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কুরুপক্ষে। কালিদাসের 'রঘুবংশে' নৌযুদ্ধে নিপুণ ও সাহসী বাঙালীদের রঘু পরাস্ত করেছিলেন বলে উল্লেখ রয়েছে। এতে মনে হয় বাঙালীদের গোত্র-রক্ত পরিচয় যাই হোক, রাজনীতিতে তারা পিছিয়ে ছিল না। রক্ত সঙ্কর বাঙালীর স্বভাব চরিত্র যেমন অনন্য, তাদের কৃতি-কীর্তিও বিচিত্র।[৩]

এবার ভারতবর্ষের প্রাছীন জনপদ ও রাজ্যসমূহের নাম জেনে নেয়া দরকার। বিস্তীর্ণ-বিশাল ভারতবর্ষের জনপদ ও রাজ্যগুলো হলো- বঙ্গ, গৌড়, পুণ্ড্র, পুণ্ড্রবর্ধন, হরিকেল, চন্দ্রদ্বীপ, বরেন্দ্র, সুহ্মভূমি, রাঢ় (উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ়), তাম্রলিপ্ত, দণ্ডভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি, কঙ্কগ্রামভুক্তি, কর্ণসুবর্ণ, কান্যকুব্জ, মিথিলা, উৎকল, উজ্জয়িনী, সারস্বতদেশ, কাশ্মীর, কৌনজ, মালব, গুজরাট, বুন্দেল খণ্ড, অযোধ্যা, কাশী, দিল্লী, সিন্ধু, পাঞ্জাব, নেপাল ও আসাম প্রভৃতি। এবার বঙ্গদেশ ও গৌড় সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

গৌড়

গৌড় নামটি বেশ প্রাচীন। পণ্ডিতমহল মনে করেন যে, এক সময় বাঙালাদেশে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষুর চাষ হত ও তা থেকে গুড় উৎপাদন হত এবং এই থেকেই 'গৌড়' নামের উৎপত্তি। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'- আমরা গৌড়দেশের পণ্যের উল্লেখ পাই। বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' ও গৌড়রাজ্যের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইতিহাসে গৌড়ের প্রথম অভ্যুত্থান ঘটে গুপ্তসাম্রাজ্যের পতনের কিছু পূর্বে। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির তাঁর 'বৃহৎ সংহিতায়' গৌড়কে বাঙলার অংশবিশেষ বলে বর্ণনা করে গেছেন। বাঙলার অপর অংশগুলোর তিনি যে নাম করে গেছেন যেগুলো হচ্ছে- গৌড়ক, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্তক, বঙ্গ, সমতট ও বর্ধমান। এই ষষ্ঠ শতাব্দীতে মৌর্যরাজ ঈশান বর্মার হরাহা শিলালেখে সমুদ্রযাত্রায় পারদর্শী গৌড়গণের সঙ্গে তার বিবাদের কথা আছে। ভবিষ্যপুরাণে গৌড়দেশকে বর্ধমানের উত্তরে ও পদ্মার দক্ষিণে অবস্থিত বলা হয়েছে। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে- 'অনর্ঘ-রাঘব' গ্রন্থের লেখক

মুরারি মিশ্র লিখে গেছেন যে, গৌড়ের রাজধানী ছিল চম্পায়। অনেকের মতে, মদারণ সরকারের অন্তর্ভুক্ত চম্পানগরী ও চম্পা অভিন্ন। এর অবস্থিতি ছিল দামোদর নদের তীরে বর্ধমানের উত্তর পশ্চিমে।[৪]

পাণিনি (৫ম/৭ম খ্রি.) তাঁর ভাষাবিজ্ঞান গ্রন্থ অষ্টাধ্যায়ীতে যে গৌড়ের উল্লেখ করেছেন, তা আমাদের গৌড় নয়। ওই গৌড় গোত্র জাতি বা গোত্রবাচক উত্তর বা মধ্য ভারতীয় কোন গোত্র হবার সম্ভবনা। পরবর্তীকালে 'পঞ্চগৌড়' নামই একাধিক গৌড়ের অস্তিত্ব নির্দেশ করছে। কলহণের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে গৌড়, সারস্বতদেশ, কান্যকুব্জ, মিথিলা ও উৎকলকে 'পঞ্চগৌড়' বলা হয়েছে।[৫] ইতিহাসে যখন গৌড়ের অভ্যুত্থান হয় তখন গৌড়দেশ বলতে পশ্চিম বাংলার মালদহ-মুর্শিদাবাদ অঞ্চলকেই বুঝাত। বস্তুত খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সুযোগে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত (বহরমপুরের নিকট ভাগীরথী তীরস্থ) প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ নগরকে কেন্দ্র করে স্বাধীন গৌড় রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। খ্রিষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্ক গৌড়ের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এছাড়াও শশাঙ্ক মধ্য ও দক্ষিণ বাঙলা, ওড়িশা, মগধ, মালব ও কান্যকুব্জের বহু স্থান অধিকার করে স্বীয় সাম্রাজ্যভুক্ত করে গৌড়ের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং নিজেকে 'গৌড়েশ্বর' ও গৌড়রাজ' উপাধিতে ভূষিত করেন।[৬]

শশাঙ্ক গৌড়কে সাম্রাজ্যকে পূর্ণ পরিণতি দান করেন। এই সময় হতেই গৌড় নামটির ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা যেন অনেকখানি বেড়ে গিয়েছিল এবং পাল-রাজারা বঙ্গপতি হওয়া সত্ত্বেও- 'গৌড়ধিপ', 'গৌড়েন্দ্র' ও 'গৌড়েশ্বর' নামে পরিচিত হয়ে বেশি ভালোবাসিতেন। সেন রাজা লক্ষ্মণ সেন সম্বন্ধেও একই কথা বলা চলে। শশাঙ্কের পর হতে অর্থাৎ অষ্টম শতক হতেই বাঙলাদেশের তিনটি জনপদই (পেণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধন, গৌড় ও বঙ্গ) যেন সমগ্র বাঙলাদেশের সমার্থক হয়ে ওঠে। দেশের বিভিন্ন জনপদ ও তিনটি জনপদের কাছে ম্ণ্ঢান বলে মনে হয়- আর সকলেই যেন ধীরে ধীরে এদের মধ্যে নিজেদের সত্তা বিলোপ করে দেয়। রাঢ়ের মতন প্রাচীন জনপদও যেন ক্রমশ গৌড় নামের মধ্যেই বিলীন হয়ে যায়। শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের অধিকারী হয়েও নিজেদের 'রাঢ়াধিপতি' বা 'রাঢ়েশ্বর' না বলে নিজেদের পরিচয় দিতেন- 'গৌড়ধিপতি' এবং 'গৌড়েশ্বর' নামে। হর্ষচরিত ও রাজতরঙ্গিনী গ্রন্থ তার প্রমাণ বহন করে। ,,, পাল ও সেন রাজাদের লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল 'গৌড়েশ্বর' বলে পরিচিত হওয়া। বঙ্গপতি যে মুহূর্তে গৌড়ের অধিপতি, সে মুহূর্তে তিনি গৌড়েশ্বর। শশাঙ্কের সময় হতেই একটিমাত্র নাম লয়ে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার যে চেষ্টার সজ্ঞান চেষ্টা সূচনা দেখা দিয়েছিল পাল ও সেন রাজাদের আমলে তা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে। যদিও বঙ্গ তখনও পর্যন্ত আপন স্বতন্ত্র জনপদ প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছিল। এক গৌড় নাম লক্ষ্য ও আদর্শ হওয়া সত্ত্বেও বঙ্গনাম তখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিদ্যমান পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্ধনের রাষ্ট্রসত্তা আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র পৃথক জনপদসত্তা তখন আর নেই। পরবর্তীকালেও গৌড় নামে বাঙলাদেশের কিয়দংশের জনপদ সত্তা বুঝবার চেষ্টা হয়েছে, এমন প্রমাণও দুর্লভ নয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে সুবা বাঙলার যে অংশ নবাব শায়েস্তাখাঁর শাসনাধীনে ছিল তাকে বলা হতো গৌড়মণ্ডল। ঊনবিংশ শতকে যখন মাইকেল মধুসূদন দত্ত লেখেন-

'তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন মধু
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।' -(মেঘনাদবধ কাব্য; ১ম সর্গ, অভিষেকো নাম)

তখন গৌড়জন বলতে তিনি শুধু বর্তমান মালদাহ ও লক্ষ্মণাবতীর অধিবাসীদের নয় বরং বাঙলাদেশের অধিবাসীকেই বোঝাতো। সমস্ত জনপদগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার যে চেষ্টা শশাঙ্ক, পাল ও সেন রাজারা করেছিলেন সে চেষ্টা সার্থক হয়নি। গৌড় নামের ললাটে সে সৌভাগ্য ঘটে বঙ্গ নামের মধ্যে দিয়ে, যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা

ও সংস্কৃতির দিক হতে ঘৃণিত ও অবজ্ঞাত, এবং যে বঙ্গ নাম ছিল পাল ও সেন রাজাদের কাছে কম গৌরব ও আদরের। কিন্তু সমগ্র বাঙলাদেশের বঙ্গ নাম লয়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই। তা ঘটে তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পায় আকবরের (১৫৭৬খ্রি.) আমলে। যখন সমস্ত বাঙলাদেশ সুবা বাঙলা নামে পরিচিত হয়। ইংরেজ (১৭৫৭-১৯৪৭ খ্রি.) বাঙলা নামের পূর্ণতা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে, যদিও আজকের বাঙলাদেশ আকবরের সুবা বাঙলা অপেক্ষা খর্বীকৃত।[৭]

একসময় সমগ্র বঙ্গদেশকে যে গৌড়দেশ বলে অভিহিত করা হত, তা সম্রাট আকবরের (১৫৭৬ খ্রি.) মাধ্যমে সে বঙ্গদেশ অধিকৃত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়ের রাজনৈতিক সত্তার বিলুপ্তি ঘটে। তখন থেকে শুরু করে ইংরেজ আমলে 'সুবা বাঙলা' ও 'বঙ্গাল' নামে বাঙলাদেশ পরিচিত লাভ করে। আর এ ভাবেই বিলুপ্তি ঘটে রামমোহন ও মধুসূদনের গৌড়ভূমির।

বঙ্গ ও বাংলা

বাঙলা অতি প্রাচীন দেশ। ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে বাঙলাদেশ গঠিত হয়েছিল প্লাওসিন যুগে (প্রায় ১০ থেকে ২৫ লক্ষ বৎসর পূর্বে)। পৃথিবীতে নরাকার জীবেরও বিবর্তন ঘটে এই প্লাওসিন যুগে। এর পরের যুগকে বলা হয়ে পণ্ঢাইস্টোনিক যুগ। এই যুগেই মানুষের আবির্ভাব ঘটে। যদিও প্লাইস্টোনিক যুগের মানুষের কোন নরকঙ্কাল আমরা ভারতে পাইনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও সেই প্রাচীন যুগ থেকেই মানুষ যে বাঙলাদেশে বাস করে এসেছে, তার প্রমাণ আমরা পাই বাংলাদেশে পাওয়া সে সময়ের ব্যবহৃত আয়ুধসমূহ (হাতিয়ার/অস্ত্র) থেকে। এ আয়ুধসমূহের অন্তর্ভুক্ত হলো প্লাইস্টোনিক যুগের পাথরের তৈরি হাতিয়ার, যা দিয়ে সে যুগের মানুষ আত্মরক্ষা ও পশু শিকার করত। এসব পাওয়া গেছে বাঁকুড়া, বর্ধমান ও মেদিনীপুর জেলার নানা স্থান থেকে। এগুলোকে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের আয়ুধ বলা হয়। প্রত্নোপলীয় যুগের পরিসমাপ্তি ঘটেছিল আনুমানিক ১০ হাজার বছর আগে। তারপর ধারাবাহিকভাবে সূচনা হয় নবপ্রস্তর বা নবোপলীয় ও তাম্রশ্মযুগের। তাম্রাশ্মযুগেই সভ্যতার সূচনা হয়। বাঙলায় তাম্রাশ্মযুগের ব্যাপক বিস্তৃতি ছিল মেদিনীপুর ও বর্ধমান জেলায়। এই যুগের সভ্যতার প্রতীক হলো সিন্ধু সভ্যতা। বাঙলায় এই সভ্যতার নিদর্শন হলো পাণ্ডুরাজার ঢিবি। আমাদের এই দেশের নাম বঙ্গদেশ বা বাঙলাদেশ। মুঘল আমলে এই দেশ সুবা বাঙলা নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে 'বাঙলা বা বাঙ্গালী' নামের ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল্' (সংস্কৃত-আলি, পূর্ববঙ্গীয়-আইল) যুক্ত হয়ে 'বাঙ্গাল বা বাঙ্গালা' শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে, অর্থাৎ বঙ্গ+আল = বঙ্গাল $\triangle$ বাঙ্গালা, এটি আবুল ফজলের ব্যাখ্যা।[৮] আল্ শুধু শস্যক্ষেত্রের আলি নয়, আল ছোট-বড় বাধও বটে। এই নদীমাতৃক বারিবহুল দেশে বৃষ্টি, বন্যা এবং জোয়ারের স্রোত ঠেকাবার জন্য ছোট-বড় বাধ ছিল, কৃষি ও বাস্তুভূমির রক্ষা তথা যথার্থ পরিপালনের অপরিহার্য অঙ্গরূপে। আবার যেসব ভূখণ্ডের বারিপাত কম, ভূমি সাধারণত ঊষর, সেখানেও বর্ষার জল ধরে রাখবার জন্য এ রকম ছোটবড় বাধের প্রয়োজন হয়, যেমন- বীরভূম অঞ্চলে। আবুল ফজলের ব্যাখ্যার অর্থ এই যে, বঙ্গদেশ আল্ বা আলি বগুল। অর্থাৎ যে বঙ্গদেশের উপরিভূমির বৈশিষ্ট্যই হল আল, সে দেশই বাঙ্গালা বা বাঙলাদেশ।

মধ্যযুগের নকশায়, পর্যটকদের বিবরণীতে এদেশের নাম উল্লিখিত হয়েছে Bengala এবং দক্ষিণের সাগরটির নাম Golfo of Bengala বা Gulf of Bengala। Marco polo এদেশের নাম বলেছেন- Bengala। প্রাচীনকালে বাঙলায়- বঙ্গ ও বঙ্গাল বলতে যে দেশ-ভূখণ্ডকে বোঝাতো, তা বর্তমান বঙ্গ ও বাঙলাদেশের সমার্থক নয়। তার একটি অংশমাত্র। প্রাচীন বাঙলাদেশ যে সব জনপদে বিভক্ত ছিল বঙ্গ ও বঙ্গাল তার দুটি বিভাগ মাত্র। এ দুটি বিভাগ হতেই বর্তমান ও মধ্যযুগীয় সমগ্র বাঙলাদেশের উৎপত্তি।[৯] এছাড়া ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, মৎস্যপুরাণ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, শতপথ ব্রাহ্মণ, পতঞ্জলির ভাষ্য, কাত্যায়নের সূত্র, মনুসংহিতায় বঙ্গ নামের উল্লেখ

পাওয়া যায়। মহাভারতের অসুর রাজা বলির পাঁচ পুত্র, যথাক্রমে- অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। আবার পতঞ্জলির ভাষ্যে- অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, পুণ্ড্র, মগধ ও কলিঙ্গর নাম পাওয়া যায়। আবার কাত্যায়ন সূত্রে যথাক্রমে অঙ্গা, বঙ্গা, সুহ্মা ও পুণ্ড্রার নাম উল্লেখ রয়েছে। আবার চর্যাপদে পাওয়া যায়- বঙ্গাল ও বঙ্গালী নামক দুটি শব্দ।[১০]

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে দেশ বিভাগের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালীর আবাসভূমিকে বলা হত বঙ্গদেশ। ইংরেজিতে বলা হত 'বেঙ্গল'। 'বেঙ্গল' নামটা দিয়েছিল ইংরেজরা। তারা এ নামটা নিয়েছিল পর্তুগিজদের দেয়া 'বেঙ্গালা' শব্দ থেকে। 'বেঙ্গালা' শব্দটি মুসলমানদের দেওয়া বঙ্গালহ, শব্দের রূপান্তর মাত্র। ১৫২৮ খ্রি. নাগাদ পাঠান সুলতানরাই 'বঙ্গালহ' শব্দের ব্যবহার শুরু করেন। তবে তার আগেই ত্রয়োদশ শতাব্দীর দুজন বিদেশি পর্যটক মার্কো পোলো ও রশিদুদ্দিন তাদের ভ্রমণ কাহিনীতে 'বঙ্গাল' নামটা ব্যবহার করেছিলেন। ১৫৭৬ খ্রি. সম্রাট আকবর যখন বাঙলা অধিকার করেন তখন থেকে 'বঙ্গাল' শব্দটা আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয়। প্রাক মুসলমান যুগে 'বঙ্গাল' বলতে পূর্ববঙ্গের দক্ষিণাংশের এক অঞ্চল বিশেষকে বোঝাতো মাত্র। এটা 'বঙ্গ' শব্দের ঠিক সমার্থবোধক ছিল না। কেননা, একই সময়ে আমরা 'বঙ্গ' ও 'বঙ্গাল'- এই দুই ভিন্ন অংশের বিদ্যমানতা লক্ষ করি। 'বঙ্গ' শব্দ দ্বারা বাঙলার এক ব্যাপক অংশকে বোঝত, যার অবস্থিতি ছিল ভাগীরথীর পূর্বদিকে। ভাগীরথীর পশ্চিমাংশে ছিল অঙ্গ দেশ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ। 'বঙ্গ' কোন ভাষার শব্দ তা আমরা জানি না। অনেকে মনে করেন যে-অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ প্রাগার্য তিব্বতীয় উৎস থেকে উদ্ভূত। অনেকে আবার 'বঙ্গ' শব্দটি মুণ্ডারী ভাষার শব্দ বলে মনে করেন। এখানে উল্লেখনীয় যে, বঙ্গ, বঙ্গাল ও বঙ্গালী শব্দগুলি চর্যাগীতে আছে। প্রথমে 'বঙ্গ' শব্দটি ছিল এক কৌমগোষ্ঠীর নাম। পরে এটা ভৌগোলিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল। কৌমগোষ্ঠীর নাম হিসেবে 'বঙ্গ' নামটির সঙ্গে বৈদিক যুগের আর্যরাও পরিচিত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা বঙ্গের নাম প্রথমে পাই। সেখানে বঙ্গবাসীদের 'বয়াংসি'বা পক্ষিজাতীয়' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বোধহয় পক্ষিবিশেষ তাদের 'টোটেম' ছিল। আরও যাদের নাম আমরা বৈদিক সাহিত্যে পাই তারা হচ্ছে- 'পুণ্ড্র'। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পুণ্ড্রদের 'দস্যু' বলা হয়েছে। মোট কথা, বৈদিক সাহিত্যে আমরা বাঙলাদেশের অধিবাসীদের প্রতি ঘৃণা-বিদ্বেষ লক্ষ করি। বৌধায়ন ধর্মসূত্র অনুযায়ী পুণ্ড্রদের অবস্থিতি উত্তরবঙ্গে, আর বঙ্গদের মধ্যপূর্ব বঙ্গে। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে তাদের আর্যাবর্তের বাইরের লোক বলা হয়েছে। তার মানে, তাদের ধর্ম ও সংস্কৃতি আর্যদের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে পৃথক ছিল।

কিন্তু রামায়ণ ও মহাভারত রচনার যুগে আমরা বাঙলাদেশের লোকদের প্রতি আর্যদের বিদ্বেষ ভাব আর লক্ষ করি না। মহাভারত রচনার যুগে আমরা বঙ্গ, কর্বট ও সুহ্ম প্রভৃতি জনপদের নাম পাই। জৈনধর্মের প্রাচীনতম ধর্মপুস্তক আচারাঙ্গ সূত্রে আমরা লাঢ় বা রাঢ় দেশের নামের উল্লেখ পাই। যেখানে রাঢ়দেশের দুই বিভাগের কথা বলা হয়েছে- বজ্জভূমি (বজ্রভূমি) ও সুব্বভূমি (সুহ্ম ভূমি)। তাছাড়া প্রাক-বৌদ্ধ যুগের দুই জনপদের নাম পাই- শিবি রাজ্য ও চেত রাজ্য। আলেকজান্ডার যখন (৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে) ভারত আক্রমণ করেন তখন তিনি গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত 'গঙ্গারিড' বা 'গঙ্গারাঢ়' দেশের শৌর্যবীর্যের কথা শুনেই (মূলত মৌর্য সম্রাটের হস্তী বাহিনীর উপস্থিতি দেখে) বিপাশা নদীর তীর থেকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। প্লিনি, টলেমি ও গ্রীক লেখকগণ গঙ্গারাঢ় দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। টলেমি বাঙলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গানদীর পাঁচটি শাখার কথাও উল্লেখ করেছেন। এই গঙ্গানদীর ওপর অবস্থিত 'গঙ্গা' নামে এক বাণিজ্যকেন্দ্রেরও উল্লেখ পাই। এ নামটা 'পেরিপ্লাস অব দি ইরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পরবর্তীকালে যেটা বাঙালীর আবাসভূমি 'বঙ্গদেশ' নামে অভিহিত হত সেটা প্রাচীন কালে বণ্ড জনগোষ্ঠীর আবাসস্থান হয়ে বণ্ড জনপদে বিভক্ত ছিল। অন্তবর্তীকালে এদের অনেক নাম ছিল, যথা- গৌড়, বঙ্গ, সমতট, চন্দ্রদ্বীপ, পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, রাঢ়, তাম্রলিপ্ত, বারক, কঙ্কগ্রাম, কর্বট, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত ও দণ্ডভুক্তি। এর পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত ছিল- পুণ্ড্র, গৌড় ও

বরেন্দ্র। মধ্যভাগে বঙ্গ এবং দক্ষিণে- হরিকেল, সমতট, খাড়ি ও নাব্য। শেষোক্ত অঞ্চলগুলি পূর্ব বাঙলার দক্ষিণাংশের উপকূলবর্তী দেশ ছিল।[১১]

এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমানরাই সর্ব প্রথম বাংলার সমগ্র অঞ্চলকে 'বাঙ্গালাহ' নামে অভিহিত করে। 'বঙ্গ' ও বাঙ্গালাহ' শব্দের উৎপত্তি অবশ্য হিন্দু আমলে এবং সংস্কৃত সাহিত্যে এর ব্যবহার ছিল। কিন্তু হিন্দু আমলের এই 'বঙ্গ' বা বাঙ্গালাহ' আধুনিক বাংলার কতক অংশ এর পর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। ,,, ড. আর.সি মজুমদার মনে করেন, পালা রাজাদের সময়ে বাংলা বলতে সমস্ত বাংলাকে নির্দেশ করা হত। তাঁর এই অভিমতের পেছনে বড় কোন প্রমাণ নেই। পক্ষান্তরে ড. এইচ.সি রায় চৌধুরী এই মত পোষণ করেন যে, পাল ও সেনদের 'বঙ্গ' বলতে বাংলার একটি ক্ষুদ্রাঞ্চলকে বুঝাত। ড. এইচ. দানী ঠিকই উল্লেখ করেছেন যে, সেন রাজারা যদিও বাংলার একটি বৃহদাংশের উপর শাসন ক্ষমতা চালিয়েছেন, তথাপি তারা নিজেদেরকে 'গৌড়েশ্বর' বলতে গর্ববোধ করতেন। এর থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, দ্বাদশ শতকের শেষভাগেও 'বাঙ্গালাহ' নামটি কেবল মাত্র বাংলার পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। মুসলিম শাসনের প্রথম দিকেও বাংলার একমাত্র পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলই 'বঙ্গ' বা 'বাঙ্গালাহ' নামে অভিহিত হত। মিনহাজ উস-সিরাজের বর্ণনাতেও এর প্রমাণ মেলে। গিয়াস উদ্দিন বলবনের সময় থেকে 'বাঙ্গালাহ' নাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত হয় এবং বাংলার পূর্ব দক্ষিণাঞ্চলের জন্য সাধারণত এ নাম ব্যবহৃত হয়। জিয়াউদ্দিন বারানী সর্ব প্রথম মুসলিম লেখক যিনি 'বাঙ্গালাহ' নাম ব্যবহার করেন এবং তিনি সুলতান বলবনের উক্তিটি উল্লেখ করেন- 'আমি লক্ষ্মণাবতী এবং 'বাঙলা' অঞ্চল আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে (বুগরা খান) অর্পণ করেছি, এদেশ কিছুকাল যাবৎ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।' বারানীও সুলতানের অপর উক্তি উল্লেখ করে বলেন- 'ইকলিম-ই-লক্ষ্মণাবতী' ও 'আরসা-ই-বাঙ্গালাহ' বশে আনতে আমাকে কি বিরাট রক্ত পাতই না করতে হয়েছে। মিনহাজের 'বঙ্গ' ও বারানীর- 'বাঙ্গালাহ' এ শব্দ দুটি ভৌগোলিক দিক থেকে সাদৃশ্যমূলক। সমসাময়িক মুসলিম মুদ্রা থেকে এর স্বপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণাদি পাওয়া যায়। বারানীর মতে, বাংলা তখন কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত ছিল এবং মুসলমানগণ এর ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ করেছিলেন। যেমন- 'আরসা-ই-বাঙ্গালাহ্', 'ইকলিম-ই-বাঙ্গালাহ্' ও 'দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহ্'। ড. কে আর কানুনগো এ আরসা-ই-বাঙ্গালাহ্কে সাতগাঁও অঞ্চল, ইকলিম-ই-বাঙ্গলাহ্কে- সোনার গাঁও অঞ্চল এবং দিয়ার-ই-বাঙ্গালাহকে সংযুক্ত সাতগাঁও ও সোনারগাঁও অঞ্চলরূপে চিহ্নিত করেছেন।

ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের আমলে ইবনে বতুতা যখন বাংলা পরিভ্রমণ (১৩৪৫-৪৬খ্রি.) করেন, তখন 'বাঙ্গালাহ' বলতে পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকেই বুঝাত। ইবনে বতুতার মতে, এ সময় হতেই পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গকে 'বাঙ্গালাহ' বলা হতো, এর অধিবাসী 'বাঙ্গালী' নামে পরিচিত ছিল এবং রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। পরবর্তীকালে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের আধিপত্যে লক্ষ্মণাবতীও 'বাঙ্গালা' একীভূত হয়ে যায়। অতঃপর তিনি বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা করেন। তিনি এই যুক্ত অঞ্চলগুলোকে 'বাঙ্গালা' নামে এবং অধিবাসীদেরকে 'বাঙ্গালী' নামে অভিহিত করেন। সুলতান নিজে 'শাহ্-ই-বাঙ্গালাহ্', শাহ্-ই-বাঙ্গালী ও সুলতান-ই-বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করতে পছন্দ করতেন এবং তাঁর প্রধান অমাত্য ও সৈনিকরা যথাক্রমে- 'বায়ান-ই-বাঙ্গালাহ, 'লস্কর-ই-বাঙ্গালাহ্' ও 'পাইক-ই-বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত হতেন।[১২]

যা ছিল হিন্দু রাজাদের 'গৌড়েশ্বর' ও 'গৌড়রাজ' উপাধির সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। কারণ বৌদ্ধ পাল ও হিন্দু সেন রাজাগণ বঙ্গ ও লক্ষ্মণাবতীর শাসক হয়েও 'গৌড়েশ্বর', 'গৌড়রাজ', 'গৌড়েন্দ্র' ও 'গৌড়াধিপতি' উপাধি ধারণ করতে গৌরব বোধ করতেন। কিন্তু এর একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায়- পালরাজা ধর্মপালের ক্ষেত্রে। প্রতীহার রাজ ভোজদেবের গওয়ালিয়র লিপিতে দেখা যায় ধর্মপালকে একাধারে 'বঙ্গপতি'[১৩] ও 'বঙ্গেশ্বর'[১৪] হিসেবে উল্লেখ করা

হয়েছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন আযম শাহ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ও নুসরৎ শাহ- 'বাঙ্গালার সুলতান' হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

অনেকটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে 'বাঙ্গালাহ' নাম দিয়ে এবং 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ' ও 'শাহ্-ই-বাঙ্গালী' উপাধি ধারণ করে নিজেকে এই বাংলার জাতীয় শাসকরূপে ঘোষণা করার গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠাতারূপে পরিগণিত হন। এর ফলে বাংলার সমগ্র এলাকা একীভূত হয় এবং সমস্ত বাঙালি জাতীর রাজনৈতিক, সামাজি ও ভাষাগত ঐক্যের পটভূমি স্থাপিত হয়। কার্যত এ সময় থেকেই বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসের সূত্রপাত ঘটে। বাংলা ও বাঙালির এ ইতিহাস রচনায় মুসলমানদের অবদান তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলার ভৌগোলিক সীমানা

এক সময় তেলিয়াগর্হি থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল জনপদ বাঙ্গালা নামে পরিচিত হয়। এতে করে পূর্ব বঙ্গের অথবা উত্তর বঙ্গের অথবা পশ্চিমবঙ্গের যেখানকার অধিবাসী হোক না কেন, তারা সবাই বাঙালি, এই সাধারণ নামে পরিচিত পায়। এ বাংলার সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে বলেছেন, সুবা বাঙ্গালা দ্বিতীয় ইকলিমে (অঞ্চলে) অবস্থিত এবং চট্টগ্রাম থেকে গর্হি (তেলিয়াগর্হি) পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য ৪০০ ক্রোশ। এর পূর্ব ও উত্তর সীমায় পাহাড়-পর্বত, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিমে বিহার প্রদেশ। এদেশের প্রান্তসীমায় আছে কামরূপ ও আসাম। আবার সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁর- 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী' গ্রন্থে বলেছেন, বাংলা দ্বিতীয় অঞ্চলে অবস্থিত একটি বিশাল দেশ। সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম থেকে গর্হি পর্যন্ত ৪৫০ ক্রোশের দৈর্ঘ্য এবং উত্তরে পর্বতমালা থেকে মান্দারান অঞ্চল পর্যন্ত ২২০ ক্রোশের প্রস্থ। আবুল ফজলের বিবরণের সঙ্গে ১৯৪৭ খ্রি. বিভাগ-পূর্ব বাংলার ভৌগোলিক আকৃতির মিল রয়েছে। বাংলার উত্তর দিকে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা।[১৫]

নদ-নদী

বাঙলার ইতিহাস রচনা করেছে বাঙলার ছোট-বড় অসংখ্য নদ-নদী। এই নদ-নদীগুলিই বাঙলার প্রাণ, এরাই বাঙলাকে গড়েছে, বাঙলার আকৃতি-প্রকৃতি নির্ণয় করে যুগে যুগে এখনও করছে। এ নদ-নদীগুলিই বাঙলার আশীর্বাদ এবং প্রকৃতির তাড়নায়, মানুষের অবহেলায় কখনও বোধহয় বাঙলার অভিশাপও।[১৬] বাংলার বুকের ওপর দিয়ে জালের মতো জড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। এ নদীসমূহ প্রকৃত অর্থে বাংলার জীবনদায়িনী জননী। এ নদীর পলিমাটি ও জলপ্রবাহ বাংলার মাটিকে উর্বর রেখেছে এবং ফুল-ফল-ফসলে বাংলার অঙ্গন ভরে তুলেছে। বাংলার অসংখ্য নদ-নদীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- গঙ্গা (পদ্মা), ভাগীরথী, সরস্বতী, অজয়, দামোদর, রূপনারায়ণ, পদ্মা, গড়াই, মুধমতী, শিলাইদহ, কুমার, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, মেঘনা, যুমনা, সুরমা, করতোয়া, বন্দনা, ভৈরব, আড়িয়াল খাঁ, ব্রক্ষপুত্র, তিস্তা, পুনর্ভবা, মহানন্দা, আত্রাই ও কপোতাক্ষ।

এসব নদীকে আশ্রয় করেই বাংলাদেশ যেমন শস্যে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তেমনটি আবার নৌপথের ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে দ্রুত বিত্ত-বৈভবে-ঐশ্বর্যে কিংবদন্তির স্তরে পৌছায়। প্রাচীন কাল থেকেই সপ্তগ্রাম, হুগলি, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁ ও ঢাকা বন্দর ব্যবসায়ের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এ বাংলা-গৌড়ের রূপ-রস-ঐশ্বর্যে মুগ্ধ হয়েই মুঘল সম্রাট হুমায়ুন এর নাম দিয়েছিলেন- 'জান্নাতাবাদ' বা 'স্বর্গভূমি'। আবার পর্যটক ইবনে বতুতা

বাংলার বিত্ত-বৈভবের প্রাচুর্য দেখে এর নাম দিয়েছেন- ‘দোজখপুর-ই-নিয়ামত’ বা ‘আশীর্বাদপুত নরক’। বাংলার এ ঐশ্বর্য-বিলাস, সমৃদ্ধির পেছনে নদীসমূহের ভূমিকা ছিল বিরাট। আবার এই নদীই পরবর্তীকালে বাংলার দুঃখ-যন্ত্রণা, পরাধীন-পরাভব ও অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ নদীর সর্বগ্রাসী ভাঙন, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস এবং নদীপথে আসা বর্গি-হার্মাদদের হামলা-লুণ্ঠন এমনকি ইংরেজদের সাম্রাজ্যবাদী শোষণ নির্যাতনের ধারা সমগ্র বাংলাকে ক্রমশ দরিদ্র শ্রীহীন শ্মশানে পরিণত করে। অন্যদিকে নদীর কুল ভাঙা-গড়ার সর্বগ্রাসী দুরন্তরূপ, মানববসতি ও কীর্তিকে বিলীন করার মায়া-মমতাহীন ও নির্মমতা বাঙালিকে গড়ে তুলেছিল নির্ভীক, সাহসী, স্বাধীনতাকামী ও শৌর্য-বীর্যে বলীয়ান। তাই যুগ যুগ ধরেই বাংলা ছিলো প্রায় স্বাধীন। বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় শাসকগণ অধিকাংশ সময়ই দিল্লীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে অবিরত যুদ্ধ-সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছে। একারণেই জিয়াউদ্দিন বারানী এ বাংলার নাম দিয়েছিলেন- ‘বালগাক খানা’ বা ‘দ্বন্দ্বগৃহ’। নদীর এ মমতাময়ী মাতৃরূপ ও কীর্তিনাশা সর্বগ্রাসী ভয়ংকর মূর্তির যুগলরূপ বাঙালির মানসগঠনে রেখেছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। বাঙালির ভোগ-বৈরাগ্য, স্বপ্ন-হতাশা, বীর্য-ভিরুতায় এ নদীর প্রভাব পড়েছিল অনিবার্যভাবে। এ নদীকে আশ্রয় করেই জন্ম হয়েছে- মুর্শিদি, ভাটিয়ালী, বাউল, মরমী ও পল্লী গীতির মতো অজস্র সঙ্গীতের। নদীর বৈশিষ্ট্য নিয়ে একটি মুর্শিদি গান এরকম-

এ কূল ভাঙে ও কূল গড়ে-
এইতো নদীর খেলা।
সকাল বেলার আমির যে ভাই-
ফকির সন্ধ্যাবেলা।
এইতো নদীর খেলা।

যে পদ্মা একদিন রাজা রাজবল্লভের রাজপ্রাসাদের অপূর্ব কীর্তিকে নিমিষে ধূলিস্যাৎ করে ‘কীর্তিনাশা’ নাম ধারণ করেছিলো, সেই পদ্মাই আবার হয়েছে বাংলা ও বাঙালির জীবনদাত্রী জননী। পদ্মার মতো বাংলার অন্যান্য নদীর ভূমিকা একইরূপ। এ প্রসঙ্গে তাই বলা যায়- নদীই বাঙলার ইতিহাসের স্রষ্টা। নদীই বাঙালীর চরিত্রকে গঠন করেছে ও তার সমাজ ও ইতিহাসকে বৈচিত্র্যময় করেছে। নদীই বাঙলার ভাগ্যবিধাতা। ,,, নদীই বাঙলাকে শস্য-শ্যামল করে তুলেছে। নদীই বাঙালীকে প্রাচীন জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকে পরিণত করেছিলো ও বাঙালী বণিককে সাতসমুদ্র তেরনদী পার হয়ে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে সক্ষম করেছিল। আবার এই নদীই বাঙলার বুকে ডেকে এনেছিল বিদেশী বণিককে, যে বণিক তার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে তাকে নিঃস্ব করেছিল। নদী যেমন একদিকে বাঙলাকে ঐশ্বর্যশালী করেছিল, আবার অপরদিকে দীনহীন করেও ছেড়ে দিয়েছিল।[১৭]

চার

বাংলার রাজনীতি

বাংলাদেশ প্রায় চিরকালই ছিল বিজাতি বিজিত দেশ। কাজেই বাংলাদেশের সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের ইতিকথা আরো বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ও মধ্যযুগে জন-জীবন শাস্ত্র ও শাসকের প্রভাব ছিল গভীর ও ব্যাপক। শাস্ত্র ও সরকার বলতে গেলে জন-জীবন ও জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করতো, বিশেষ করে এদেশের বর্ণে বিভক্ত তথা জীবিকায় বিভক্ত জনসমাজ শাস্ত্র ও সামন্তের দাপট ছিল প্রবল। তাছাড়া যখন শাসকগোষ্ঠী হত বিদেশি-বিজাতি-বিধর্মী ও বিভাষী, তখন দেশি ও বিদেশি সামাজিক রীতি-নীতি ও সাংস্কৃতিক আচার-আচরণের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত দেখা দিত, তার পরিণামে গ্রহণে-বর্জনে যে মিলনমুখী মিশ্র-সংস্কৃতির ও

সামাজিক রীতি-নীতির উদ্ভব হত তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ত সাহিত্য-সঙ্গীত-শিল্প-স্থাপত্য প্রভৃতি সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিদেশি বিধর্মীর সংস্পর্শে আসার ফলে এভাবে দেশি মানুষের চিন্তা চেতনায় প্রথমে যে অভিঘাত সৃষ্টি হয় এবং তাতে দেশি মানুষের জীবন জিজ্ঞাসায় ও জগৎ ভাবনায় যে রূপান্তর ঘটে, তা সাহিত্যে-শিল্পে-সঙ্গীতে-স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে বিশেষভাবে অভিব্যক্তি পায়। এ জন্যেই সাহিত্যাদির ইতিহাসে রাজনৈতিক পরিবর্তন ও তজ্জাত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার কথা ও আলোচনা অবশ্যিক হয়ে পড়ে।[১৮]

এবার সংক্ষেপে এ দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন, উত্থান-পতনের ঘটনাপঞ্জি উল্লেখ করা যাক। এদেশের ইতিহাসের সূত্রপাত মূলত মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সিন্ধু সভ্যতাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। আর্য-সভ্যতার পূর্বেই যে সিন্ধু সভ্যতার প্রচলন ঘটেছিল- এ বিষয়ে পণ্ডিত সমাজ প্রায় একমত। ১৯৩১ খ্রি. স্যার জন মার্শাল মহেঞ্জোদারোর সময়কাল নির্ণয় করেছেন ৩২৫০-১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে। ১৯৫০ খ্রি. স্টুয়ার্ট পিগট হরপ্পার সময় নির্ণয় করেছেন ২৫০০-১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে। ১৯৬৪ খ্রি. ডি.পি অগ্রবাল সিন্ধু সভ্যতার সময়কালকে ২৩০০-১৭৫০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেছেন। সুতরাং খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০-১৫০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়কে সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল হিসেবে সাব্যস্ত করার যায়। এ সভ্যতার নাগরিক জীবনের উৎকর্ষের চিত্র প্রতিফলিত হয়।[১৯]

এরপর আসে হিন্দুদের বেদ (৪ বেদ- ঋক, সাম, যজু, অথর্ব) আশ্রিত বৈদিক বা আর্য সভ্যতা। বেদ ছাড়াও বিভিন্ন সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্রসাহিত্য- বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। পণ্ডিতদের ধারণা ঋগ্বেদ সংহিতার রচনাকাল- ১২০০ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এ.এল ব্যাসাম ঋগ্বেদের রচনার উর্ধ্বসীমাকে ১৫০০ থেকে ১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে সীমাবদ্ধ করেছেন। সুতরাং আর্য বা বৈদিক সভ্যতার সময়কালকে ১৫০০ থেকে ৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী বলা যায়। এ সভ্যতায় কৃষিভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজ, ব্রাহ্মণ্য শাসন, বর্ণ প্রথার দৌরাত্ম্য ও পশুসম্পদে সমৃদ্ধ জীবন-ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়।[২০] এরপর ব্রাহ্মণ্য সমাজ ব্যবস্থার দমন-পীড়ন, সমাজ শোষণ ও শাস্ত্রাচারের বিরুদ্ধাচারণ করে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তন শুরু হয়। সর্বজীবে দয়া ও মানবতার বাণী নিয়ে আবির্ভূত হন দুই ক্ষত্রিয় যুবরাজ মহাবীর (৫৪৭-৪৭৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) ও গৌতম বুদ্ধের (৫৬৬-৪৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) মতো মহাপুরুষ। এ দুই ধর্মের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য প্রতাপ ও দৌরাত্ম্যের ওপর আঘাত নেমে আসে সমাজ জীবনে। ব্রাহ্মণদের প্রভাব ও আধিপাত্য কিছুটা হলেও খর্ব হয়ে যায়। এর ধারাবাহিকতায় মগধে মৌর্য নামক এক শক্তিশালী রাজবংশের উত্থান ঘটে। এটি ইতিহাসের ধারায় এক যুগান্তকারী ঘটনা। প্রথমে শিশুনাগ বংশীয় ১০ জন রাজা ৩৬২ বছর রাজত্ব করেন। এরপর নন্দ বংশের মহাপদ্মের নেতৃত্বে ক্ষত্রিয় বিনাশ করে মৌর্যবংশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এ মহাপদ্মই ভারতের প্রথম ঐতিহাসিক সার্বভৌম বা একরাট সম্রাট। এ বংশের চন্দ্রগুপ্ত (৩২৫-৩০০ খ্রি. পূর্বে) ও অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) ছিলেন ঐতিহাসিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কারণ রাজা চন্দ্রগুপ্তের সময়কালেই গ্রিক বীর আলেকজান্ডার (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭/৩২৬ অব্দে) ভারত আক্রমণ করেছিলেন।

আর আশোকের নেতৃত্বেই বৌদ্ধ ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত হয়। শিবভক্ত অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ (২৬১ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে কলিঙ্গ যুদ্ধের পর) করেন। মৌর্য বংশের পতনের পর উত্থান ঘটে কুষাণ রাজ বংশের। বিদেশ থেকে এসে এরা প্রায় ২০০ বছর এদেশ শাসন করেন। কনিষ্ক, কুজুল কদফিস ও বিম কদফিস এ বংশের উল্লেখযোগ্য শাসক। এছাড়া শকদের ক্ষহরাত বংশ, শুঙ্গ বংশ, কন্ব বংশ, কার্দমক বংশ, সাতবাহন বংশ ও গণরাজ্যসমূহের উদ্ভব ঘটে। ইতিহাসের ধারায় এসব রাজ বংশের প্রণিধানযোগ্য তেমন কোন অবদান পরিলক্ষিত হয় না।

খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের গোড়ায় যে মগধকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিক মৌর্য রাজ বংশের উত্থান ঘটেছিল, তার প্রায় আট-নয়শত বছর পরে সেই মগধেই আবার পরবর্তী গুপ্তবংশের (Later Guptas Dyanesty) পুনরুত্থান

ঘটে। শ্রীগুপ্তের হাত ধরে যে গুপ্তবংশের (আনু. খ্রিষ্টীয় ৩২০-৬০০ অব্দ) প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে, এর মধ্যে সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ গুপ্ত যুগেই বাংলা আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য অগ্রগতি ঘটে। এ সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরবঙ্গের রাজশাহী, দিনাজপুর ও বগুড়া অঞ্চলেও বিস্তৃত ছিল। গুপ্তরাজবংশের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বৃহৎ বঙ্গদেশের থানেশ্বরের (পাঞ্জাবের আম্বালায়) পূষ্যভূমিতে 'পূষ্যভূতি রাজবংশ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বংশের বিশিষ্ট রাজা ছিলেন- রাজ্যবর্ধন, আদিত্যবর্ধন, প্রভাকরবর্ধন ও মহাধিরাজ হর্ষবর্ধন। এদের মধ্যে হর্ষবর্ধন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর সময়ে বঙ্গদেশে সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। এ সময় বঙ্গদেশে বেশ কিছু স্বাধীন সামন্ত বংশের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এর মধ্যে- বলভীর মৈত্রক বংশ, কনৌজের মৌখরী বংশ, চালুক্য বংশ ও পল্লব রাজবংশ উল্লেখযোগ্য। এসব রাজবংশে তেমন বলিষ্ঠ কোন শাসক না থাকায় সমগ্র গৌড়বঙ্গে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। আর এ সুযোগকে পূর্ণ কাজে লাগিয়ে এক সামন্ত রাজ গৌড়ে স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ইতিহাসখ্যাত মহারাজাধিরাজ শশাঙ্ক (৬০৫-৬৩৭খ্রি.)।

গৌড়রাজ শশাঙ্কের শাসনামলই বাংলার ইতিহাসের এক স্মরণীয় যুগ। তিনি অপূর্ব দক্ষতায় সমগ্র বাংলায় সার্বভৌম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। শশাঙ্কের রাজধানী ছিলো- কর্ণসুবর্ণ। ড. রমেশচন্দ্রের মতে, 'বাঙ্গালী রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই প্রথম সার্বভৌম নরপতি।' অন্যভাবে বলা যায়, বাংলার প্রথম জাতীয় রাজা।

শশাঙ্কের পর বাংলায় শতবর্ষ ব্যাপী (৬৫০-৭৫০খ্রি.) অরাজকতা দেখা দেয়। শক্তিশালী কোন কেন্দ্রীয় শাসন না থাকায় ক্ষুদ্র সামন্তরাজগণ পরস্পরের সঙ্গে আত্মকলহে লিপ্ত থাকতেন। যাকে ঐতিহাসিকগণ- 'মাৎস্যন্যায়' বলে অভিহিত করেছেন। এর মুক্তির উপায় ও পরিত্রাণ হিসেবে অভিজাতগণ ৭৫০ খ্রি. গোপালকে গণতান্ত্রিকভাবে রাজা নির্বাচন করে বাংলার সিংহাসনে বসান। এ গোপালের নামানুসারেই পাল বংশের সূচনা ঘটে। বিখ্যাত এ বৌদ্ধরাজ বংশের (৭৫০-১১৬২খ্রি.) মোট ১১ জন শাসক এদেশ শাসন করেন। এদের মধ্যে ধর্মপাল, দেবপাল, মহীপাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে সম্রাট ধর্মপালকে- 'বঙ্গপতি'[২১] ও 'বঙ্গেশ্বর'[২২] বলা হতো।

পাল রাজত্বকালে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। বৌদ্ধ পালবংশের পতনের পর বাংলার সিংহাসনে বসেন ব্রাহ্মণ বংশীয় বীরসেনের পুত্র সামন্তসেন। এ সেন বংশের (১০৭০-১২৪৬খ্রি.) প্রায় ১০ জন শাসক বাংলাকে শাসন করেছেন। এদের মধ্যে রাজা বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বল্লাল সেনের মাধ্যমে বাংলার হিন্দুসমাজে কৌলিন্য প্রথার সূত্রপাত ঘটে। আর লক্ষ্মণ সেন (১২০৪খ্রি.) বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী নবদ্বীপ (নদীয়া) থেকে পালিয়ে পূর্ববঙ্গে আশ্রয় নেন। মূলত লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের মাধ্যমেই বাংলায় হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে এবং মুসলিম রাজত্বের শুভ সূচনার পথ উন্মুক্ত হয়ে যায়।

বাংলায় ইসলামের জয়যাত্রা

মক্কা-মদিনার ইসলাম ভারতের মুলতান পর্যন্ত প্রবেশ ও প্রচারে যতটা সহজসাধ্য ছিল, কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ভারতের বাংলায় ততটা ছিল না। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমরের (রা.) শাসনকালে (৬৩৪-৬৪৪খ্রি.) সর্বপ্রথম ভারত বিজয়ের প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। ৬৬৪ খ্রি. আরব সেনাপতি মুহল্লাব কাবুল হয়ে ভারত আক্রমণ করে সর্বপ্রথম মুলতান পৌছান। এরপর উমাইয়া খলিফা আল-ওয়ালিদের শাসনকালে (৭০৫-৭১৫খ্রি.) সাম্রাজ্যের পূর্বপ্রদেশের গভর্নর হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নির্দেশে প্রথমে ওবায়দুল্লাহ ও পরে বুদাইল ভারতবর্ষের সিন্ধু আক্রমণ করেন। কিন্তু তারা উভয়েই নিহত হলে, হাজ্জাজ নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা ইমদাদ উদ্দিন মুহম্মদ বিন কাসিমকে তৃতীয়বার সিন্ধুতে প্রেরণ করেন এবং তিনি ৭১২ খ্রিষ্টাব্দের ২০ জুন সিন্ধুর রাজা

দাহিরকে পরাজিত করেন এবং ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয়পতাকা সর্বপ্রথম উত্তোলন করেন। কিন্তু তাঁর রহস্যজনক ভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও মৃত্যুতে এ বিজয়ের ধারাবাহিতকায় ছেদ ঘটে।

এরপর প্রাক্-সালতানাত যুগে গজনী বংশের ১৬ জন তুর্কি শাসকের (৯৭৭-১১৮৬খ্রি.) মধ্যে সুলতান মাহমুদ ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন এবং ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে আবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তবে মুইজউদ্দিন মুহাম্মদ ঘুরী ১১৯২ খ্রি. দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে চৌহানের রাজা পৃথ্বিরাজকে পরাজিত করে ভারতে দ্বিতীয়বারের মতো প্রকৃত অর্থে তিনিই প্রথম ইসলামী রাজত্ব পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরবর্তীকালের ৩২০ বছরের (১২০৬-১৫২৬খ্রি.) শাসন কালকে বলা হয় সালতানাত যুগ। যা মূলত সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেক হতে ইব্রাহিম লোদীর রাজত্ব কালকেই বোঝানো হয়। এর মধ্যে ৫টি রাজবংশ রয়েছে; যথা- মামলুক বা দাস বংশের (১২০৬-১২৯০খ্রি.) ১১ জন শাসকের ৮৪ বছরের শাসন, খলজী বংশের (১২৯০-১৩২০খ্রি.) ৪ জন শাসকের ৩০ বছরের শাসন, তুঘলক বংশের (১৩২০-১৪১৩খ্রি.) ৯ জন শাসকের ৯৩ বছরের শাসন, সৈয়দ বংশের (১৪১৪-১৪৫১ খ্রি. ৩ জন শাসকের ৩৭ বছরের শাসন এবং লোদী বংশের (১৪৫১-১৫২৬খ্রি.) ৩ জন শাসকের ৭৫ বছরের শাসনকাল।

এরপর শুরু হয় ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যবাহী ও জগৎখ্যাত মুঘল শাসনামল। এ মুঘল বংশের (১ম পর্ব ১৫২৫-১৫৪০, ২য় পর্ব ১৫৫৫-১৮৫৮খ্রি.) মোট ১৭ জন শাসকের ৩১৭ বছরের শাসন, শূরবংশের (১৫৪০-১৫৫৫খ্রি.) ৩ জন শাসকের ১৫ বছরের শাসনকাল। সম্রাট শেরশাহ মাত্র ৫ বছর (১৫৪০-১৫৪৫খ্রি.) তাঁর বংশধরদের ১০ বছর (১৫৪৫-১৫৫খ্রি.) এ মোট ১৫ বছর মুঘল শাসনামলের ছেদ ঘটায়। তুঘলক বংশের (১৩২০-১৪১৩খ্রি.) সমসাময়িক কালে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল শুরু হয়। এ আমল শুরু হয় ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৫০খ্রি.) সোনার গাঁ-র সিংহাসনে আরোহনের মাধ্যমে। এরপর ইলিয়াস শাহী বংশের (১৩৪২-১৪১৪খ্রি. ও ১৪৪২-১৪৮৭খ্রি.) মোট ১১ জন শাসকের ১১৭ বছরের শাসন, মধ্যবর্তী গণেশ বংশের (১৪১৫-১৪৩৩খ্রি.) ৪ জন শাসকের ১৮ বছরের শাসন, হাবসী বংশের (১৪৮৭-১৪৯৩খ্রি.) ৪ জন শাসকের ৬ বছরের শাসন, হোসেন শাহী বংশের (১৪৯৩-১৫৩৮খ্রি.) ৪ জন শাসকের ৪৫ বছরের শাসনকালই মূলত বাংলার সুলতানদের স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসনের সময়কাল। এরপর অর্থাৎ ১৫৩৯-১৭১৭ খ্রি. পর্যন্ত মোট ১৭৮ বছর বাংলাদেশ তুর্কি ও মুঘল সুবাদার মুনিম খান (১৫৭৪খ্রি.) থেকে মুর্শিদকুলী খান (১৭১৬খ্রি.) পর্যন্ত মোট ৩২ জনের মোট ১৪২ বছরের সুবাদারি শাসনে শাসিত হয়েছে। মুঘল সম্রাটের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেওয়ান ও সুবাদার মুর্শিদকুলী খান (১৭০৪-১৭২৭খ্রি.) ১৭১৭ খ্রি. বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা করেন। এ নবাবী শাসনামলের (১৭১৭-১৭৫৭খ্রি.) ৪০ বছরে মোট ৫ জন নবাব বৃহৎ বাংলা শাসন করেন। এদের মধ্যে মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭খ্রি.) সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯খ্রি.), সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০খ্রি.), আলীবর্দি খান (১৭৪০-১৭৫৬খ্রি.) সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৬খ্রি.) অন্যতম। পলাশীর যুদ্ধের (২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা অবাহত ছিল।

এভাবে ৫৫৩ বছর (১২০৪ থেকে ১৭৫৭খ্রি.) শাসন করার পর বাংলায় মুসলিম রাজত্বের অবসান ঘটে। স্বাধীন নবাবী আমলের পর যারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ছিলেন, তারা ছিলেন মূলত পরাধীন ও ইংরেজ বণিকদের আস্থাভাজন। এরা হলেন- মীর জাফর আলী খান (১৭৫৭-১৭৬০ ও ১৭৬৩-১৭৬৫খ্রি.), মীর কাসিম আলী খান (১৭৬০-১৭৬৩খ্রি.), নাজিমউদ্দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬খ্রি.) ও সইফুদ্দৌলা (১৭৬৬-১৭৭০খ্রি.) প্রমুখ। মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানির বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫খ্রি.) ও রবার্ট ক্লাইভ প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন পদ্ধতি (Dual Govt. system) নবাবী আমলের অবসান ঘটায়।[২৩] কোম্পানির ১০০ বছরের (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রি.) শাসন-শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে সমগ্র দেশে শুরু হয় সিপাহী বিদ্রোহ

(১৮৫৭খ্রি.)। এর ফলে সমগ্র ভারতবর্ষ মহারানী ভিক্টোরিয়ার (১৮৫৮ খ্রি.) প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে চলে যায় এবং এ দেশ বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত হয়।

পাঁচ

আর্য-পূর্ব যুগে বাংলা

মোটা দাগে বলা যায়, বৈদিক আর্যদের পূর্ববর্তী সিন্ধুর হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো সভ্যতাই আর্য-পূর্ব যুগ বলে পরিগণিত হয়। এর সময়কালকে আনুমানিক ৩০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যবর্তী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। ১৯২০-র দশকে পাকিস্তানের সিন্ধুর লারকানায় মহেঞ্জোদারো এবং পাঞ্জাবের রাভী নদী তীরবর্তীস্থানে হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন মেলে। সাধারণত সিন্ধু, পাঞ্জাব ও বালুচিস্তানের মতো এলাকায় এ সভ্যতাটি গড়ে ওঠেছিল। প্রাক্-দ্রাবিড় ও অস্ট্রিক জাতিই এ সভ্যতার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। এটি ছিল একটি নগর কেন্দ্রিক সভ্যতা। এর শুকনো ও পোড়া মাটির ইট দিয়ে তৈরি ঘরবাড়ি-দালান-কোঠা, পাকা রাস্তা-ঘাট, নগর, দুর্গ, জল নিকাশী পয়ঃপ্রণালী, শস্যাগার, বৃহৎ স্নানাগার (দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতায় ৩৯/২৩/৮আকৃতির) ও শস্যমাড়াইয়ের নিদর্শন পাওয়া যায়। শস্য হিসেবে গম, যব, বার্লি, কলাই, তেজবীজ, খেজুর ও তরিতরকারির প্রমাণ মেলে। মহিষ, ভেড়া, শূকর, উট, হাঁস-মুরগি ও পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা পশুর মাংস খেতো। এরা তাঁতশিল্পের মাধ্যমে কার্পাস তুলা ও পশমজাত বস্ত্র উৎপাদন করতে পারতো।

তামা ও ব্রোঞ্জের হাতিয়ার যেমন- 'কোদাল, বর্শা, তরবারি, তীর, কুড়াল, ছুরি, করাত ও দাঁড়িপাল্লা তৈরি ও এর ব্যবহার জানতো। এরা লিখন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত ছিলো এবং পাটিগণিত, দশমিক, গুণন ও জ্যামিতির বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল। এ সময় কৃষি ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। তিলমুন, মাগান, মেলুহা, কালিবঙ্গান ও লোথালের মতো ব্যস্ত বন্দরের সঙ্গে বাণিজ্য বিনিময় হতো। বাণিজ্য দ্রব্য হিসেবে সোনা,রূপা, তামা, সিসা, ব্রোঞ্জ, ময়ূরের পালক, উন্নত মানের কাঁচ, মুক্তা, হাতির দাঁতের চিরুনি ও চুনাপাথর ছিল প্রাধান। বর্তমান পাঞ্জাবের লোথাল ছিল তৎকালীন প্রধান বাণিজ্য বন্দর ও নগরী। দু-চাকার এক্কা জাতীয় গাড়ি, উট, নৌকা ও পালতোলা জাহাজ ছিল যোগাযোগের বাহন। কৃষি ও বাণিজ্যের চাকাকে কামার, কুমার, কাঠমিস্ত্রি, রাজমিস্ত্রি, স্বর্ণকার, ভাস্কর, বণিক ও কৃষকেরা গতিশীল রেখেছিল। ঘর-গৃহস্থালিতে কালো ও লাল রঙের নানা মৃৎপাত্র ব্যবহৃত হতো। মেয়েরা নানা রকম অলংকার ব্যবহার করতো। এ নগরবাসী লিঙ্গপূজা ও মাতৃদেবীতে বিশ্বাস করতো এবং পূজায় অভ্যস্ত ছিল। মৃত্যুর পর মৃতদেহ সৎকার বা কবরস্থ করার প্রথা প্রচলিত ছিল।[২৪]

ছয়

আর্য যুগে বাংলা

আর্যদের আগমন ও বসতি স্থাপনের মাধ্যমেই মূলত বাংলায় আর্য প্রভাবিত সংস্কৃত ভাষা, ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির স্থায়িত্ব লাভ করে এবং বাংলা আর্যাবর্তের অংশে পরিণত হয়। বেদ (৪ বেদ- ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব) আশ্রিত বৈদিক বা আর্যগণ সম্ভবত এশিয়া মাইনর বা উত্তর-পশ্চিম অংশ হতে আগমন করে ভারতবর্ষে বসতি স্থাপন করেন। আর্যরা গাঙ্গেয় উপত্যকা, পাঞ্জাব (পঞ্চনদের দেশ) ও সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে যে বসতি স্থাপন করে তা খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৫০০ অব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। যাযাবর পশুচারী আর্যগণ ঘোড়া ছুটিয়ে এসে অনার্যদের (আর্যদের দেয়া অবজ্ঞাত অভিধা) পরাজিত করে, নগর সভ্যতা ধ্বংস করে নিজেরা ক্রমাগত কৃষিজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়। মূলত আর্যরা ছিল বহিরাগত জাতি। তারা এদেশে এসে অনার্যদের সাথে মিশে গিয়ে যে আর্য সভ্যতা বা

যুগের বিকাশ ঘটায়, তার যুগান্তকারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বাংলার আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন ধারায়।

প্রশাসন

আর্যযুগ ছিল মূলত বেদ শাসিত, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য বিস্তারের যুগ। ধারণা করা হয় খ্রিষ্টপূর্ব ৯০০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের (যদি হয়ে থাকে) যুদ্ধ হয়েছিল। এ পর্বে ভারতবর্ষে কৌরব, পাণ্ডব, পাঞ্চাল, তুরবশ, ক্রিবি, কাশী, কোশল, বৎস, বিদেহ রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজাই ছিলেন রাজ্যের প্রধান মর্যাদাবান ব্যক্তি। রাজাকে দেবতাদের সমকক্ষ ভাবা হত এবং রাজপদে যারা অধিষ্ঠিত থাকেন তারা মূলত প্রজাপতি ব্রহ্মার প্রতিনিধি। আর এ বিষয়টি প্রচার ও প্রসারের দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতো ব্রাহ্মণগণ। ব্রাহ্মণ তার নিজের মর্যাদা আধিপত্য বজায় রাখতেই রাজার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখতো এবং রাজার কল্যাণে রাজসূয়, অশ্বমেধ ও বাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করতো। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' গ্রন্থের মাধ্যমে জানা যায়, রাজাগণ বিভিন্ন সম্মানসূচক উপাধি গ্রহণ করতেন। পূর্ব ভারতের রাজারা– 'সম্রাট', দক্ষিণাংশে- 'ভোজ', উত্তরাংশে- 'বিরাট' পশ্চিমাংশে- 'স্বরাট' মধ্যদেশে (পাঞ্জাব ও উত্তর) 'রাজন' উপাধিতে ভূষিত হতেন। যিনি সমগ্রদেশ জয় করতে পারতেন, তিনি 'একরাট', 'সার্বভৌম' ও 'বিশ্বজনীন' অভিধা লাভ করার গৌরব পেতেন। রাজা নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্বাচন ও সমর্থন-সম্মতির প্রয়োজন বা গুরুত্ব ছিল। সাধারণত ক্ষত্রিয়রাই রাজা হতেন। অভিজাতদের মধ্যে 'সভা' ও 'সমিতির' গুরুত্ব ছিল। প্রশাসনের ক্ষেত্রে- 'গ্রামীণ' ও 'সূত্র'- এর প্রভাব ছিল। বিচারকদের বলা হতো- 'গ্রাম্যবাদীন'। সেনাবাহিনীর প্রধানকে বলা হতো- 'সেনানী'। স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকতা ছিলেন- 'গ্রামীণ'। 'সংগ্রাহীতৃ' ও 'ভাগদুখ' যথাক্রমে কোষাধ্যক্ষ ও রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব পালন করতো। বিভিন্ন কর আদায় করতো- 'বলি' নামক কর্মচারী। এছাড়া সূত (রথচালক), ক্ষত্রী (রাজপ্রাসাদ অধ্যক্ষ), পালাগল (সংবাদ বাহক), গো-বিকর্তন (শিকার সঙ্গী), অক্ষ্যবাপ (জুয়ার অধ্যক্ষ) ও সচিবের (অমাত্য) ইঙ্গিতে পাওয়া যায়। এছাড়া গ্রামীণ কর্মচারীদের ভেতরে স্থপতি, শতপতি ও অধিকৃত উল্লেখযোগ্য। রাজা ও ব্রাহ্মণ ছিলেন করমুক্ত।

অর্থনীতি

আর্যযুগের অর্থনীতিতে গ্রামীণ কৃষিজীবী ব্যবস্থার প্রাধান্য বিদ্যমান ছিল। আর্যগণ ক্রমশ পশুচারী থেকে কৃষিজীবীতে পরিণত হয়ে কৃষি-শিল্প ও বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি লাভ করে। গাঙ্গেয় উপত্যকা, গঙ্গা, যমুনা, পাঞ্জাব ও সপ্তসিন্ধুর উর্বর নদী অঞ্চল কৃষি প্রসারে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। জমির মালিক রাজা ছিলেন না, বরং পরিবারই ছিল জমির স্বত্বাধিকারী। বন-জঙ্গল পুড়িয়ে জমি তৈরি করে লোহার লাঙ্গল দিয়ে বলদের (ছয়, আট, বারো, চব্বিশ) সাহায্যে জমি চাষ করা হতো। জমিতে লাঙ্গলের কর্ষণজাত দাগকে বলা হতো- 'সীতা' আর কৃষককে বলা হতো- 'কীনাশা' বা 'কৃষ্টি'। কর্ষিত ভূমিকে বলা হতো- 'ক্ষেত্র' বা 'উর্বরা' এবং অকর্ষিত ভূমিকে বলা হতো 'অকষিবল'। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত ও হেমন্তকালকে চাষোপযোগী সময় বিবেচনায় রেখে বার্লি, ধান, গম, যব, তিল, মটরশুটি চাষ করা হতো। 'শকৃৎ' (গোবর) ও 'করীষ' (শুকনো গোবর) জমিতে সার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ভূমি চাষ, বীজ বপন, শস্যকাটা ও মাড়াই-ঝাড়াই- এ চারটি পর্যায় মানা হতো। অনেক সময় অনাবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, ইঁদুর ও পঙ্গপাল ফসলাদি নষ্ট করে ফেলতো। এছাড়া কৃষিকাজে দাত্র বা কাস্তে, খনিত্র যন্ত্র এবং জলসেজ ব্যবহার করা হতো।

আর্যযুগে ব্যবসায়-বাণিজ্য ব্যাপক প্রসার ঘটে। বৈশ্য বণিকদের বলা হতো- শ্রেষ্ঠিন ও কুসীদিন। স্থল ও জলপথে রথ ও নৌকার মাধ্যমে পণ্যদ্রব্য বহন করা হতো। ওজনের একক হিসেবে- মান, কৃষ্ণল ও নিষ্ক ব্যবহৃত হতো। এছাড়া অন্যান্য বৃত্তিজীবী মানুষের তালিকায় ছিল- চিকিৎসক, জেলে, ধোপা, স্বর্ণকার, কামার, কুমার ও নৃত্যশিল্পী ও সুরা প্রস্তুতকারক। এ যুগে লোহার ব্যাপক ব্যবহার ও ধূসর রঙের মৃৎপাত্র তৈরি করা হতো। পশু সম্পদের মধ্যে ছিল- ঘোড়া, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, হাঁস-মুরগি প্রধান।

ধর্ম

আর্য যুগ ছিল মূলত বেদ আশ্রিত ধর্মীয় প্রাধান্যের যুগ। আর্যদের প্রভাবে সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়- ৪ বেদ (ঋক, সাম, যজু, অথর্ব), সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ও সূত্র সাহিত্য। এর লেখকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন- বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ, রামদেব, ভরদ্বাজ, কণ্ব, ভৃগু, যম ও যাজ্ঞবাল্ক্য প্রমুখ। আর্যদের ধর্মীয় জীবন পরিচালিত হতো ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের নেতৃত্বে। এ যুগে ৪ শ্রেণীর ব্রাহ্মণের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, যথা- হোত্রি বা আহবায়ক, উদগাত্রী বা গায়ক, অধবর্যু বা সংস্কারণ এবং ব্রাহ্মণ বা উচ্চতর পুরোহিত। পুরোহিতগণ- অশ্বমেধ, বাজপেয় ও রাজসূয় যজ্ঞসহ সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করতো। এ সময় থেকে ইন্দ্র, বরুণ, বিষ্ণু ও মহাদেব নামক পুরুষ দেবতার পূজা পদ্ধতির প্রচলন ঘটে। পূর্ববর্তীযুগের মাতৃদেবীর (পৃথিবী, অদিতি, ঊষা, রাত্রি ও সরস্বতীর) প্রাধান্য বিনষ্ট হয়ে পুরুষ দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতেই বিষ্ণুকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণব ধর্মমতের প্রসার ঘটে। এ সময় মানুষ কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে। আর্যরা মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাহ করতো।[২৫]

ধারণা করা হয়- এ সময় হতেই পূজায় পশুবলির প্রচলন ঘটে। তবে কৃষি অর্থনীতি ও জীবন ব্যবস্থাপনায় গরুর বিশিষ্ট ভূমিকা থাকায় গো হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়। এর প্রমাণ মেলে ঋগ্বেদেব 'অঘ্ন্যা' শব্দ থেকে। ধর্মীয়ভাবে গরুকে দেব মহিমার বাতাবরণে রক্ষা করার বিধান জারি করা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে আর্যাবর্ত পশুবলির কারণে পশু সম্পদে (গাভী, বলদ, ষাঁড়) প্রভূত ক্ষতি ও অস্তিত্বশূন্য হবার উপক্রম হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করে সর্বপ্রাণ বা জীবে দয়ার বাণী নিয়ে ক্ষত্রিয় রাজপুত্র মহাবীর (৫৪৭-৪৭৭ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) জৈন ধর্ম এবং গৌতমবুদ্ধ (৫৬৬-৪৮৬খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন।

সমাজ

আর্যযুগের সমাজ ছিলো ব্রাক্ষণদের শাস্ত্রাচার শাসিত এবং পরিবার ছিলো পিতৃতান্ত্রিক। সঙ্গত কারণেই পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা ও পুরুষের দাপট ছিলো অনিবার্যভাবেই। কন্যা সন্তানকে অভিশাপ মনে করে পুত্র কামনায় গর্ভবতী নারীরা- 'পুংসবন'[২৬] নামক অনুষ্ঠান পালন করতো। এ সমাজ মূলত হিন্দু সমাজের চতুর্বর্গীয় (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) ও চতুর্বর্ণ (ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) দ্বারা পরিচালিত হতো। এ চারবর্ণের বাইরের লোকদের বলা হতো- ব্রাত্য বা নিষাদ। মানুষ তার কর্মসূত্রে নয়, বরং জন্মসূত্রে মর্যাদা পেতো। পুরুষের বহুবিবাহ, বিধবা বিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। যদিও স্বামী মারা গেলে দেবরের সঙ্গে বিয়ের প্রথা গড়ে উঠেছিলো, তারপরেও সমাজে বিধবা বিবাহ স্বীকৃত ছিলো। বাল্যবিবাহ তেমন ছিল না, তবে বিয়ের যৌতুক হিসেবে কন্যা পণই প্রচলিত ছিল। শুধু কন্যার দৈহিক ক্রটি থাকলেই কেবল বরপণ দিতে হতো। এছাড়া বিয়ের ক্ষেত্রে বর্ণবিন্যাস খুব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা ও মানা হতো। অনুলোম বিয়ে স্বীকৃত হলেও প্রতিলোম বিয়ে সহ্য করা হতো না। বিয়ের ক্ষেত্রে কন্যার পাঁচটি গুণ মানা হতো। যথা- রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বংশ।[২৭]

সাধারণ মানুষের চেয়ে রাজা ও অভিজাত বর্গ বেশি সংখ্যক স্ত্রী রাখতো। রাজাদের চারটি পর্যন্ত বৈধ স্ত্রী থাকতো। যজুর্বেদের আমল থেকে দেখা যায়,- মাহিষী, বাবাতা, পরিবৃক্তি বা পরিবৃত্তি ও পালাগলী নামক স্ত্রী থাকতো।[২৮] এছাড়া রাজ অন্তঃপুর বা হেরেমে বহু উপপত্নী থাকতো। মৈত্রায়নী সংহিতায় দেখা যায়- মনুর দশটি ও চন্দ্রের সাতাশটি স্ত্রী।[২৯] আর বিয়ের মাধ্যমে কন্যাকে দান করা হতো স্বামীকে নয়, বরং স্বামীর পরিবারকে। এ জন্য নারীর জীবন-যন্ত্রণার অন্ত ছিল না।

নারীকে ‘ভার্যা’, ‘পত্নী’, ‘জায়া’ ও ‘অর্ধাঙ্গী’ বিবেচনা করে তার জন্য বিয়েকে বাধ্যতামূলক করা হয়। তখনও সহমরণ ব্যবস্থা সমাজে প্রথায় পরিণত হয়ে ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারেনি। সহমরণের কথা প্রথম শোনা যায়- অথর্ববেদে।[৩০] আর্য সমাজে নারীর বিশেষ মর্যাদা ও উচু স্থান ছিল না। যদি এ সময়ে- ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, বাক্, শশ্বতী, লোপামুদ্রা, গোধা, মৈত্রেয়ী ও গার্গীর মতো বিদুষী নারীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।[৩১] এছাড়া মুদ্‌গলিনী, বিশপলা, বধ্রিমতী ও শশীয়সীর- মতো বীরাঙ্গনা নারীর কথা শোনা গেলেও সমাজ জীবনে নারীর মান মর্যাদা তেমন ছিলই না।[৩২] কারণ নারী শুধু পুত্র সন্তান জন্মদানের আধার হিসেবে গুরুত্ব পেতো পুরুষ সমাজে। এছাড়া নারী ছিল ভোগ্যবস্তু, দান সামগ্রীর মতো হাতফেরি সম্পত্তি। নারীর যজ্ঞানুষ্ঠানে যাওয়া নিষেধ, পিতৃধন বঞ্চিত, জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পিতা-পতি ও পুত্রের অধীন। সমাজ ও শাস্ত্রের কাছে নারী বৈষম্যের শিকার। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে- ‘কালো পাখি, শকুনি, নেউলে, ছুঁচো ও কুকুর হত্যা করলে যে প্রায়শ্চিত্ত নারী ও শূদ্র হত্যাতেও সেই একই প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ মাত্র একদিন উপবাস বা কৃচ্ছসাধান [১/৯/২৩/৪৫]।[৩৩]

আর্য সমাজে নারী হিসেবে শুধু গণিকাই ছিলো স্বাধীন।[৩৪] কারণ সে উপার্জনক্ষম ও শিক্ষিতা। পেশার স্বার্থেই তাকে সুশিক্ষিত, কলাবতী ও সংস্কৃতিমনা হতে হয়। এছাড়া সমাজের প্রায় সকল নারী ছিল অন্তঃপুরবাসিনী, কিছুটা বন্দি ও পুরুষ নির্ভরশীল। অন্যদিকে সমাজের প্রাচুর্য থাকলেও চোর-ডাকাত, ঠেঙারের উৎপাত ছিল। মাঝে মাঝে দেখা দিত-দুর্ভিক্ষ। যৌনাচার, মদ ও জুয়া খেলার অবাধ প্রচলন ছিল। দাস প্রথার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দাসদের প্রতি আর্যদের ঘৃণার মনোভাব ছিল। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার অভাবে ধনী ও বণিকরা (পণি→ পণ্য→ বিপণি→ বণিক) সোনা-রূপা মাটিতে পুতে রাখতো।

আর্যযুগে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল গুরুগৃহ বা আশ্রম কেন্দ্রিক। শিক্ষার্থীদের গুরুগৃহে গিয়ে ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে বিদ্যাভ্যাস করতে হতো। বেদ, সাহিত্য, ব্যাকরণ ছিলো শিক্ষার বিষয়। সূত্র বা বেদাঙ্গের বিষয় ছিল ৬টি– শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। শিক্ষার বিনিময়ে গুরু পেতেন গুরুদক্ষিণা। সত্যবাদিতা, উদারতা, নৈতিকতা, বিশ্বাস ও চরিত্র গঠন ছিল শিক্ষার উদ্দেশ্য। বছরকে বারো মাসে, মাসকে ত্রিশ দিনে বিভক্ত করা হয়েছিলো। আর্যযুগের বর্ণমালা বা লিখন পদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত পরবর্তীকালেই সংস্কৃত ভাষার প্রচলন হয়। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় নারীর অংশ গ্রহণছিল সীমিত। চিকিৎসা পদ্ধতিও এ সময়ে বেশ উৎকর্ষ লাভ করেছিলো।

খাদ্য-বস্ত্র ও অবসর বিনোদনে আর্যরা পিছিয়ে ছিল না। দুধজাত ঘি, মাখন ছিল তাদের নিত্যদিনের খাদ্য। গোধূম বা গম, ব্রীহি বা ধান, যব, বার্লি, ফলমূল, গরম দুধ ও সবজি ছিলো এদের খাদ্য তালিকায়। চাল বা বার্লির সঙ্গে ঘি মিশায়ে ‘অপূপ’ নামে পিঠা তৈরি করা হতো। চাল, দুধ ও মটর শুটির সমন্বয়ে পায়াস রান্না করা হতো। ভেড়া, ছাগ, গো মাংস তখনো সবার জন্য নিষিদ্ধ ছিল না। শুধু যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণ মাংস ও মদ খেতে পারতো না। কারণ পাঁচটি পশু (মানুষ, অশ্ব, গরু, মহিষ ও অজ) মেধযজ্ঞ বলে তা ব্রাহ্মণের জন্য নিষিদ্ধ ছিল। কারণ আর্য যুগের প্রথম দিকে এ নিষেধাজ্ঞা না থাকার কারণে পূজা ও যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে পশু বলি দেয়া হতো। গোধন ক্ষয় ও ঘোড়ার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাওয়ায় এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়।[৩৫] সুরা বা মদ্যপান সাধারণত নিন্দনীয় হলেও যজ্ঞানুষ্ঠানে এর বহুল ব্যবহার ছিল। খাবার জল কুয়া ও নদী থেকে সংগ্রহ করা হতো।

পোশাক ও অলংকার ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে তেমন পার্থক্য ছিল না। সাধারণত পোশাকের দুটি অংশ হতো- ‘বাস’ (উর্ধ্বাঙ্গের) ও ‘অধিবাস’ (নিম্নাঙ্গের)। এছাড়া ‘নীবি’ (ভেতরের পোশাক) ও দ্রাপী (মাথার আচ্ছাদন) প্রচলিত ছিল। যজ্ঞানুষ্ঠানে সিল্কের তৈরি ‘তার্প্য, (অন্তর্বাস) ব্যবহৃত হতো। নারী-পুরুষ উভয়েই মাথায় পাগড়ি পরতো। এগুলো সুতি, সিল্ক ও পশম দ্বারা বুনন করা হতো। এছাড়া শূকরের চামড়ায় তৈরি জুতা

ব্যবহারের কথা জানা যায়। কর্ণশোভন, কুরীর, মণি ও নিষ্ক- নামক অলংকারের নাম জানা যায়। কর্ণশোভন পুরুষেরা, মহিলারা মাথায় কুরীর ব্যবহার করতো। গলায় মণি বা সোনার তৈরি নিষ্ক ব্যবহৃত হতো। অবসর বিনোদন হিসেবে আর্যরা সঙ্গীত চর্চা, খেলা-ধুলায় অভ্যস্থ ছিলো। কণ্ঠ সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, বীণা, বাঁশির ব্যবহার হতো। মুষ্টিযুদ্ধ, রথের দৌড়, পাশাখেলা, জুয়াখেলা, নর্তকীদের নৃত্যকলা এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩৬] শিকারের বিনোদন রাজা ও অভিজাতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

সাত

মৌর্য যুগে বাংলা

গ্রিক বীর আলেকজান্ডারের (খ্রি.পূর্ব ৩৫৬-৩২৭) ভারতবর্ষ আক্রমণের (৩২৭/৩২৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে) পূর্বেই মগধকে কেন্দ্র করে কয়েকটি রাজবংশের উত্থান ঘটে; তারমধ্যে শিশুনাগ বংশ, নন্দবংশ ও মৌর্য বংশ উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরাণ মতে- শিশুনাগ বংশের ১০ জন শাসক মোট ৩৬২ বছর রাজত্ব করেন।[৩৭] এর মধ্যে বিম্বিসার (৫৪৪-৪৯৪খ্রিষ্টপূর্ব) অন্যতম। এরপর মহাপদ্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় নন্দবংশ (৩৬৪-৩২৪খ্রিষ্টপূর্ব)। আর এ মহাপদ্মই ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট। অন্যভাবে বলা যায়– প্রথম একরাট বা সার্বভৌম শাসক।[৩৮] মহাপদ্ম ছিলেন নীচ বংশজাত। তাঁরপুত্র নন্দকে উৎখাত করেন বিখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। চন্দ্রগুপ্তকে সিংহাসন পেতে সাহায্য করেন ব্রাহ্মণ চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন মহাপদ্মের শূদ্রানী স্ত্রী মুরার পুত্র– এমন ধারণা অনেকে করে থাকেন। এ মুরার নাম থেকেই এ রাজবংশের নাম হয় মৌর্য বংশ। এ মুরা সম্পর্কে এইচ.সি. রায় চৌধুরী বলেন- ‘It is therefore practically certain that chandragupta belonged to a khatriya community, viz the Moriya.[৩৯] ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর ‘Early History of India’ গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠায় চন্দ্রগুপ্তের জন্ম নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করেছেন। তবে চন্দ্রগুপ্ত যে ব্রাহ্মণ বংশীয় ছিলেন না, একথা নিশ্চিত। বরং চাণক্যের কূটচালে তিনি নন্দ বংশ উৎখাত করেন। অনেকের মতে, তিনি আলেকজান্ডারের সেনাপতি সেলুকাসের কন্যাকে বিয়েও করেছিলেন।

এ মৌর্য বংশের রাজাদের মধ্যে- চন্দ্রগুপ্ত (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৪-৩০০), বিন্দুরসার (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০-২৭৩) এবং অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২) ছিলেন অন্যতম। মহামতি অশোকের প্রথম জীবন নাকি পাশবিকতায় পূর্ণ ছিলো। বিন্দুসার ও সুভদ্রাঙ্গীর পুত্র অশোক পিতার মৃত্যুর পরই সুসীমসহ ৯৯ জন ভ্রাতাকে হত্যা করেন। কেবল কনিষ্ঠ ভ্রাতা তিষ্যককে তিনি অত্যাধিক স্নেহ করতেন বিধায় সে রক্ষা পায়। তিনি ‘চণ্ডগিরিক’ নামক এক জল্লাদের মাধ্যমে ‘নরক’ নামক বধগৃহ তৈরি করেন। এখানে তাঁর নির্দেশে পাঁচশত বিদ্রোহী অমাত্যের শিরশ্ছেদ করা হয়। এখান থেকেই তাঁর চরিত্রে ‘চণ্ডাশোক’ কলঙ্ক স্পর্শ করে।[৪০]

এরপর তিনি দিগ্বিজয়ে মন দেন। কলিঙ্গ যুদ্ধের (২৬১খ্রিষ্টপূর্ব) বিভীষিকা অশোকের মানসিকতায় আমূল পরিবর্তন আনে। এ যুদ্ধে প্রায় ১ লক্ষ সৈন্য নিহত ও দেড় লক্ষ আহত হয়েছিলো। এরপর থেকেই অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তারঁ ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় (প্রায় ১০ কোটি) স্বর্ণ দানে এ ধর্ম বিশ্বজনীন ধর্মে রূপলাভ করে। তিনি চিরতরে যুদ্ধ বন্ধ করে মানব সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি উত্তপ্ত লোহার শলা দ্বারা ঘোড়াকে চিহ্নিত করার জন্য দাগ দেবার প্রথা বন্ধ করেন। এছাড়া মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। এভাবে তিনি পূর্ব জীবনের কালিমা দূর করে প্রজাহিতৈষী মহান শাসক ও মহামতি অশোক হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পান। মৌর্য রাজবংশ ভারতীয় আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ সম্পর্কে আলোচনা নিম্নরূপ-

প্রশাসন

এ সাম্রাজ্যের শুরুতে ভারতবর্ষ যে ষোলটি মহাজনপদে (কাশী, কোসঙ্গল, মগধ, বৃজি, মল্ল, চেদি, বৎস বা বংস, কুরু, পঞ্চাল, মৎস, শূরসেন, অশ্মক বা অস্‌সক, অবন্তী, গান্ধার ও কম্বোজ) বিভক্ত ছিল; তা এ আমলে একত্রিত হয়ে বিশাল রাজ্যে রূপ লাভ করে। কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রধান ছিল ৭টি বিভাগ। যথা- রাজা, অমাত্য, জনপদ, দুর্গ, কোষ, বল (সামরিকশক্তি) ও সুহৃৎ (মিত্র)। একত্রে একে বলা হতো সপ্ত অঙ্গ। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন রাজা। এছাড়া মন্ত্রি, উপদেষ্টা, রাজস্ব নিরূপক, অমাত্য, সমাহর্তা (রাজস্ব প্রধান), সন্নিধাতূরা (রাজকোষ প্রধান), অর্থপধাশুদ্ধ, ধর্মোপধাশুদ্ধ অন্যতম। পুরোহিতদের বলা হতো- ধর্মমহাপাত্র। কিছু উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের নাম পাওয়া যায়- নগরাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, রথাধ্যক্ষ, আকরাধ্যক্ষ, গবাধ্যক্ষ, মুদ্রাধ্যক্ষ, পণ্যাধ্যক্ষ, শুল্কাধ্যক্ষ, দুর্গপাল ও অন্তপাল প্রমুখ। এছাড়া সেনাবাহিনীতে ৬টি উপসমিতির কথা বলা হয়েছে। যথা- পদাতিক, অশ্বারোহী, রথ, হস্তী, যোগাযোগ ও নৌ- বাহিনী। নগরের বিচারকদের বলা হতো পৌর ব্যবহারিক বা নগর ব্যবহারিক। গ্রামাঞ্চলে বিচার করতেন- রজুকগণ। এছাড়া গুপ্তচরদের বলা হতো- তত্ত্বাবধায়ক বা পতিবেদক। অনেক সময় রাজসভার গণিকাকেও গুপ্তচরবৃত্তিতে নিয়োগ দেয়া হতো। অপরাধের শাস্তি হিসেবে মৃত্যুদণ্ড, কারাবাস, অঙ্গচ্ছেদ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে ফেলার রীতি প্রচলিত ছিলো। প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশের নিম্ন পর্যায়ে ছিলো- 'দেশ', 'অহল বা অহাল' যা জেলাকে ইঙ্গিত করে। প্রদেশগুলো নিয়ন্ত্রণ করতো- 'মহামাত্র'। মহামাত্রদের অধস্তন ছিলো- প্রাদেশিকগণ। গ্রাম নিয়ন্ত্রণ করতো- গ্রামীণগণ। প্রদেশের শাসনকর্তা মহামাত্র হতো সাধারণত রাজকুমারগণ। সেচ বা জলকর, বনকর, খনিকর, সেতুকর ও রাজস্বকর সংগ্রহ করা হতো।

সমাজ

মৌর্য যুগের সমাজ ছিলো পিতৃতান্ত্রিক। ব্রাহ্মণ্য ও পরবর্তীকালে বৌদ্ধ ধর্ম প্রভাবিত সমাজে চতুর্বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ও চতুরাশ্রম (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) প্রথা প্রচলিত ছিলো। এছাড়া সমাজে মিশ্র বা সংকর জাতির (mixed caste) উপস্থিতি ছিলো এবং অনুলোম ও প্রতিলোম বিয়ের প্রচলন ছিলো। কৌটিল্যের অর্থ শাস্ত্রানুযায়ী এ যুগেও ৮ প্রকার বিয়ের প্রচলন ছিলো। যথা- ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। এছাড়া দুই প্রকার স্ত্রীধন- বৃত্তি (ভূমিজাত) ও আবন্ধ্য (গহনা) প্রথা বিদ্যমান ছিলো।[৪১]

যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও যৌতুক প্রথার প্রচলন ছিলো। রাজা বিম্বিসারের (৫৪৫-৪৯৪খ্রি. পূর্ব) কোসলাদেবী, চেল্লনা, বাসবী ও ক্ষেমা নামক ৪ স্ত্রী ব্যতীতও প্রায় ৫০০ স্ত্রী ছিলো। কোসাল রাজকন্যা কোসলা দেবীকে বিয়ে করে বিম্বিসার যৌতুক হিসেবে কাশী গ্রাম লাভ করেছিলেন।[৪২] এছাড়া রাজা অশোকের অসন্ধিমিত্রা ও তিষ্যরক্ষিতা ছাড়াও বহু স্ত্রী ছিলো।[৪৩] মৌর্য সমাজের অপরিহার্য অঙ্গ ছিলো দাস প্রথা। বিভিন্ন প্রকার দাসদের মধ্যে– বন্ধক দাস, উদর দাস, ক্রীতদাস, দণ্ডপ্রাপ্ত দাস ও পুরস্কারপ্রাপ্ত দাস।[৪৪] যুদ্ধবন্দী হিসেবে অসংখ্য দাস পাওয়া যেতো। এসব দাসদের সৈন্যবিভাগে, গৃহকর্মে ও জমির উৎপাদন কাজে ব্যবহার করা হতো। মহামতি অশোকের বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হবার পরে দাসদের প্রতি উদার ব্যবহার করার রীতি চালু হয়। দাসদের মর্যাদা বাড়াতে তিনি কিছু আইন জারি করেন। সমাজে নারীর মর্যাদা হিসেবে বিধবা বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিলো। নারীদের গুপ্তচর পেশায় ও রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরেও নিরাপত্তা কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হতো। যদিও বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অস্তিত্বকে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হতো না।

অর্থনীতি

মৌর্য যুগের অর্থনীতি মূলত কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের ওপর নির্ভরশীল ছিলো। মেগাস্থিনিস তাঁর 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থে মৌর্য যুগের সমাজ ব্যবস্থায় ৭ শ্রেণির পেশাজীবীদের উল্লেখ করেছেন। যথা- পণ্ডিত বা দার্শনিক, কৃষক, পশুপালক-শিকারী, কারিগর-শিল্পী বা পণ্যজীবী, যোদ্ধা, পর্যবেক্ষক ও অমাত্য শ্রেণি।[৪৫] সুতরাং দেখা যায়- সমাজে কৃষকদের অবস্থান ছিলো দ্বিতীয় স্তরে। রাজ্যের খাদ্যশস্য উৎপাদনে কৃষকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিলো। সাধারণত বছরের গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে চাষ হতো ও দুইবার ফসল উৎপন্ন করা হতো। সিন্ধু ও গঙ্গা নদীর অববাহিকায় এসব শস্যক্ষেত্র বা ভূমি গড়ে ওঠেছিলো। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের জমি বা ভূমির উল্লেখ পাওয়া যায়- কৃষ্ট (চাষযোগ্য), অকৃষ্ট (চাষ অযোগ্য), স্থল (উঁচু ও ডাঙা), কেদার (ফসলী), আরমা (বন সংলগ্ন), শণ্ড (ফসল উৎপন্ন), মূলবাপ (আদা, হলুদ মসলা উৎপন্ন), বাত (আখ উৎপন্ন), বন (জ্বালানী উৎপন্ন), বিবীতা (গোচারণ ভূমি) ও পথি (রাস্তা নির্মাণ যোগ্য)। এছাড়া বাস্তু (গৃহভূমি), দেবগৃহ (মন্দির), সেতুবন্ধ (বাঁধ), হলঘর (নৃত্যানুষ্ঠান), সতত্র (অনাথাশ্রম) ও শ্মশান ভূমির কথা জানা যায়।[৪৬] এ সমস্ত জমিতে ধান, আখ, গম, ডাল (মুগ, মাশ, মসুর), সরিষা, তিল ও ফল-সবজি উৎপাদিত হতো। জলসেচ নিয়ন্ত্রণ করতেন 'জনপদ নিবেশ' আর জমি বণ্টন করতেন 'সীতাধ্যক্ষ'। সেচ প্রকল্প ছিলো দুই ধরনের- সহোদক (প্রাকৃতিক জলাধার) ও আহার্যদক (কৃত্রিম জলাধার)। এছাড়া বনকে আবার প্রথম, দ্বিতীয় ও শ্রেণির মানে বিভক্ত করা হতো। এ বন থেকে কাঠ, বাঁশ, বেত, দড়ির উপকরণ, রঙের উপকরণ, বন্যপশু, জ্বালানী, ভেষজ ঔষুধ সংগ্রহ করা হতো। বনাধ্যক্ষ বন নিয়ন্ত্রণ করতো।

এ সমস্ত ভূমির মালিক ছিলেন রাজা। ভূমির শ্রেণি অনুযায়ী রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিলো। ফসলী জমি থেকে রাজা এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব পেতেন। রাজস্ব আবার- সীতা, ভাগ, বলি, কর, উদকভাগ, সেনাভক্তম ও উৎসঙ্গ নামক করের উল্লেখ পাওয়া যায়। কারিগরি শিল্পেও মৌর্য সাম্রাজ্য পিছিয়ে ছিলো না। বৌদ্ধ জাতক গ্রন্থে-১৮ ধরনের শিল্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে- কাঠমিস্ত্রি বা সুতার, কর্মকার, স্বর্ণকার, মৃৎশিল্পী, বয়নশিল্পী, তীর প্রস্তুতকারক, হাতির দাঁত শিল্পী ও ভাস্কর প্রমুখ। এ সময় তামা, লোহা, ও স্বর্ণের খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় এ সবের ব্যবহার বহুগুণে বেড়ে যায়। এছাড়া শঙ্খ, প্রবাল, মুক্তা, হীরা ও মূল্যবান পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। খনি বা খনিজ সম্পত্তি 'রাজ সম্পদ' বলে গণ্য হতো। এছাড়া লোহা, সোনা, রূপা ও লবণ নিয়ন্ত্রণ করতে একজন করে অধ্যক্ষ নিয়োগ দেয়া হতো। এছাড়া বস্ত্রশিল্পেও প্রভূত অগ্রগতি লাভ করে। নারীদের সুতা কাটায় অধিক হারে নিয়োগ দেয়া হতো। প্রতিবন্ধী নারী, রাজার অবসর ভাতা প্রাপ্ত নারী ও দেবদাসীদের এখানে নিয়োগ দেয়া হতো। হাতির দাঁত দিয়ে অলংকার তৈরির শিল্পী, সুরা (মদ), প্রস্তুতকারক, রঞ্জন (রঙ) শিল্পী, অস্ত্র নির্মাতা ও জাহাজ শিল্প এসময় প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিলো। এ সময় ক্ষুদ্র কুটির শিল্পও গড়ে ওঠেছিলো।

ব্যবসায়-বাণিজ্যে মৌর্য যুগ ব্যাপক প্রসার লাভ করে। স্থল ও জলপথে বাণিজ্য চলতো। কৌটিল্য তাঁর অর্থশাস্ত্রে লঘুযান (হালকা গাড়ি), গোলিঙ্গম (গরুর গাড়ি) ও শকটের (ঘোড়া ও উটের) উল্লেখ করেছেন। সাধারণত গরু, ঘোড়া, মহিষ, উট, নৌকা ও জাহাজে করে ব্যবসায়িক পণ্য বহন করা হতো। গ্রিক লেখক স্ট্র্যাবোর মতে, তক্ষশিলা হতে পাটালিপুত্র পর্যন্ত ১০ হাজার স্টেডিয়া (প্রায় ১১৫৬ মাইল) দীর্ঘ একটি রাজপথ বিদ্যমান ছিলো। এছাড়া প্লিনি ও মেগাস্থিনিস ১০টি প্রধান সড়কের কথা উল্লেখ করেছেন। নগর থেকে নদী বন্দর পর্যন্ত এ সমস্ত রাস্তা নির্মিত হয়েছিলো। নদী ও সমুদ্র পথে বড় বড় নৌকা ও জাহাজে করে পণ্য সামগ্রী নদী ও সমুদ্র বন্দরে আনা হতো। ডাকাত ও জলদস্যুর আক্রমণ হতে বনিকদের রক্ষার জন্য বিভিন্ন রাজকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিলো। এ সময় চম্পা, পাটালিপুত্র, বারণাসী, কৌশাম্বী ছিলো প্রধান বাণিজ্য বন্দর। এছাড়া তক্ষশিলা,

ভৃগুকচ্ছ (ব্রোচ), সোপারা (মহারাষ্ট্র) ও তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর) বন্দরগুলোর সঙ্গে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, শ্রীলঙ্কা, চীন ও জাভার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দামী পাথর, অলংকার, সুগন্ধি দ্রব্য, হাতির দাঁতের তৈরি দ্রব্য, মূল্যবান কাঠ, মসলা, তামা, সুতি বস্ত্রের মতো জিনিসগুলো রপ্তানি করা হতো। অন্যদিকে এসব দেশ থেকে নীলকান্ত মণি, ঘোড়া ও রেশম ভারতে আমদানি করা হতো।

এ বাণিজ্য ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে পরিচালনা করা হতো। কেউ কালোবাজারী ও মজুতদারীর সঙ্গে জড়িত থাকলে তাকে ১ হাজার পণ জরিমানা দিতে হতো। এসব ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড দেখাশোনা করতেন একজন পন্যাধ্যক্ষ। রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য পণ্যকে 'রাজপণ্য' 'স্বদেশে উৎপন্ন পণ্যকে 'স্ব-ভূমিকা' এবং বিদেশে উৎপন্ন পণ্যকে 'পর-ভূমিজ' বলা হতো এবং এদের ওপর শতকরা পাঁচ ভাগ (দেশিপণ্য) লাভ করার বিধান ছিলো। এ সময় রাজার প্রতীকধারী সুবর্ণ, কার্ষাপণ ও দারিক নামক মুদ্রা প্রচলিত ছিলো। এ ব্যবসায়িক বিষয়টি সুশৃঙ্খল করতে তৎকালীন সময়ে ধনী বণিকদের সমন্বয়ে 'গিল্ড বা সংঘ' অথবা 'শ্রেণি বা শ্রেনিবল'[৪৭] নামক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিলো।

সংস্কৃতি

মৌর্য যুগে কয়েকটি নগরকে কেন্দ্র করে উন্নত মানের সাংস্কৃতিক জীবন যাত্রার পরিবেশ গড়ে ওঠেছিলো। পাটালিপুত্র (বিহার), পুণ্ড্রনগর, মথুরা, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বীর মতো বিশাল নগর এ সময় গড়ে ওঠেছিলো। স্থাপত্য, ঐশ্বর্যময় কারুকার্য, বিত্ত-বৈভবে পাটালিপুত্র ছিলো প্রধান। মেগাস্থিনিসের মতে, এ বিশাল শহরের চারদিক কাঠের খুঁটি দ্বারা বেষ্টিত, ৫৭০টি তোরণ ও ৬৪টি প্রবেশপথ ছিল। এছাড়া ৮০টি কাঠের স্তম্ভ দ্বারা নির্মিত হলঘর সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত সভাকক্ষ হিসেবে ব্যবহার করতেন। চারু ও কারুশিল্পে এ সময় তেমন অগ্রগতি বা উৎকর্ষ সাধিত হয়নি। সূচশিল্প, কাঠ, হাতির দাঁত ও তালপাতার ওপর অঙ্কিত চিত্রকলা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠতে পারেনি। তবে স্থাপাত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে প্রভূত অগ্রগতি সম্পন্ন হয়। এর প্রমাণ বহন করে পাটালিপুত্রের রাজপ্রাসাদ, হলঘর ও সংঘরাম, মঠ, বিহার ও বিজয়স্তম্ভ নির্মাণে। মহামতি অশোকের বিজয়স্তম্ভগুলো– সারানাথ, সাঁচী, রখিরা, রামপূর্বা, লৌড়িয়া নন্দনস্ত, দিল্লী তোপড়া, এলাহাবাদ, রুক্মিনীদেই অঞ্চলে স্থাপিত হয়েছিল। এর মধ্যে সারানাথের স্তম্ভটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ স্তম্ভের শীর্ষদেশে চারটি সিংহমূতি। এর নিচেই রয়েছে- হাতি, ঘোড়া, ষাঁড় ও সিংহের মূর্তি। প্রতিটি পশুর অঙ্কিত প্রতীকের সঙ্গে সংযুক্ত আছে একটি করে চক্র। এ চারটি পশু মূর্তির প্রতীকীমূল্য জড়িয়ে আছে বুদ্ধদেবের জীবনের সঙ্গে। হাতি বুদ্ধের মাতা মায়াদেবীর শ্বেতহস্তী স্বপ্নে দেখার ঘটনা। ঘোড়া বুদ্ধের গৃহ ত্যাগের ঘটনা। ষাঁড় বা বৃষ বুদ্ধের বৃষ রাশিতে জন্মের ঘটনা এবং সিংহ দ্বারা বুদ্ধের ধর্ম প্রচারের বিষয়টিকে ইঙ্গিত করে। পশুর সঙ্গে জড়িত যে চক্র রয়েছে, তা মূলত- ধর্মচক্রের প্রবর্তন করে।[৪৮] আর এ ধর্মচক্রটিই বর্তমান ভারতের 'জাতীয় প্রতীক' হিসেবে গৃহীত হয়েছে। অশোকের এ বিজয়স্তম্ভ শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যকেই তুলে ধরেনি, বরং একদিকে যেমন তাঁর দম্ভ, আত্মঅহং ও আভিজাত্যকে ইঙ্গিত করেছে, তেমনি আবার তাঁর বিনয়, নম্রতা ও মহানুভবতাকে প্রকাশ করেছে।

আট

গুপ্তযুগে বাংলা

মহাপদ্ম মগধে যে মৌর্য বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এর প্রায় আট-নয়শত বছর পর তাঁরই বংশধর শ্রীগুপ্তের হাত ধরে সেই মগধেই আবার গুপ্ত বংশের (আনু. ৩২০-৬০০ খ্রিষ্টাব্দ) পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এর মধ্যবর্তী সময়ে শুঙ্গবংশ, কণ্ববংশ, চেদিবংশ, শকবংশ, কুষাণবংশ ও সাতবাহন বংশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। এ বংশের রাজাদের

মধ্যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৩৭৫খ্রি.) ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫-৪১৫খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয় ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড গুপ্তবংশের ঐশ্বর্য আভিজাত্যকে পূর্ণমাত্রায় পৌছে দেয়। এ জন্যই ভিনসেন্ট সমুদ্র গুপ্তকে 'ভারতের নেপোলিয়ান'[৪৯] বলে উল্লেখ করেন। এছাড়া দ্বিতীয় চন্দগুপ্তের আমলে গুপ্তবংশ শিল্পসাহিত্যে সমৃদ্ধির শীর্ষ শিখরে পৌছায়। তিনি 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন এবং দরবারের 'নবরত্নের' মাধ্যমে শিল্প-কলার বিশিষ্ট অবদান রাখতে সক্ষম হন।

প্রশাসন

গুপ্তযুগেও প্রশাসনের সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন রাজা। গুপ্ত রাজাগণ অন্যান্য রাজাদের মতো-'মহারাজ' বা 'রাজন' এসব সাধারণ খেতাবের পরিবর্তে 'রাজাধিরাজ' 'রাজাধিরাজর্ষি' ও 'পরম-রাজাধিরাজ' অভিধা গ্রহণ করেন। তারা নিজেদেরকে দেবতাদের সমকক্ষ প্রতিপন্ন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন। রাজা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দিতেন। গুপ্ত আমলে প্রশাসনিক কাঠামো ছিলো এরকম– বিভাগ⟶ দেশ/ভুক্তি⟶ জেলা/বিষয়⟶ বিথী⟶ গ্রাম। এসব বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ছিলেন যথাক্রমে-

দপ্তর	–	**দপ্তর প্রধান**	**দপ্তর**	–	**দপ্তর প্রধান**
বিভাগ	–	প্রশাসক	বিথী	–	মণ্ডলচৌকি
দেশভুক্তি	–	উপরিক	গ্রাম	–	গ্রামিক
জেলা/বিষয়	–	বিষয়পতি			

এছাড়া পৌর এলাকায় শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে 'অষ্টকুলাধিকরণ' ও 'অধিষ্ঠানাধিকরণ' গঠন করা হতো। এসব পরিষদ যথাক্রমে ৮ জন ও ৪ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠন করা হতো। অধিষ্টানাধিকরণের বা পরিষদের সদস্যবৃন্দ যথাক্রমে- নগরশ্রেষ্ঠী⟶ প্রথম সার্থবাহ ⟶ প্রথম কুলিক ⟶ জ্যেষ্ঠ কায়স্থ। এরপরও পুস্তপাল, দণ্ডনায়ক, দণ্ডপাসিক, চৌরদ্ধরণিক, পুরপাল বা নগর রক্ষক, বিচারক ও পুলিশের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'পুলিশী ব্যবস্থা' গুপ্তদের দ্বারা প্রথম প্রচলিত হয় এবং যার উল্লেখ 'মৃচ্ছকটিক' (শূদ্রকের) ও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম' (কালিদাসের) গ্রন্থে পাওয়া যায়। অপরাধ ছিল ১০ প্রকার; যথা- ৩টি কায়িক- চুরি, হত্যা ও ব্যভিচার, ৪টি বাচনিক- কূটভাষণ, অসত্য ভাষণ, স্বস্তহীণ ও অপমান এবং ৩টি মানসিক- পরধনে লোভ, অধর্ম চিন্তা ও অসত্যানুরাগ। সামরিক বিভাগে মহাদণ্ডনায়ক (প্রধান সেনাপতি), রণভাণ্ডাগারাধিকরণ (যুদ্ধাধ্যক্ষ), বলাধিকরণ (যুদ্ধ দপ্তর) ও মহাপীলুপতি (হস্তি বিভাগের প্রধান) উল্লেখযোগ্য কর্মকর্তা। গুপ্ত আমলে প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

সমাজ

গুপ্তযুগের সমাজও ছিলো ব্রাক্ষণ্য শাস্ত্র দ্বারা শাসিত। এ যুগের সামাজিক স্তর বা বিন্যাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়- বিষ্ণু, যাজ্ঞবাল্ক্য, নারদ, বৃহস্পতি, কাত্যায়ন, কালিদাস, বরাহমিহির, বাৎস্যায়ন, অমরসিংহ ও পর্যটক ফা-হিয়েনের গ্রন্থ থেকে। এ সময়েও সমাজ চতুর্বর্ণীয় প্রথা অর্থাৎ ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এ চারটি স্তরে বিন্যস্ত ছিল। এদের কাজও ছিল জন্মসূত্রে নির্দিষ্ট। বরাহমিহিরের 'বৃহৎ সংহিতা' গ্রন্থে নগরের উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্ররা বসবাস করতো। এদের আবাসস্থল যথাক্রমে ৫ কক্ষ, ৪ কক্ষ, ৩ কক্ষ ও ২ কক্ষ বিশিষ্ট বাসগৃহে নির্ধারিত ছিলো। তবে এ যুগে বর্ণভিত্তিক বৃত্তি বা পেশা পরিবর্তনের ইঙ্গিত মেলে। সমাজে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিলো। এছাড়া অসমবর্ণ বিবাহও দেখা যেতো।

ব্রাহ্মণের সঙ্গে ক্ষত্রিয়ের বিবাহ অনুমোদন যোগ্য ছিল। রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও হর্ষবর্ধন উভয়ে বৈশ্য হওয়া সত্ত্বেও অন্য গোত্রে বিবাহ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ চারুদত্ত এক গণিকা বসন্তসেনাকে বিয়ে করেন। এক ক্ষত্রিয় রাজা চম্পা নগরীর এক গণিকার কন্যাকে বিবাহ করেন। চতুর্বর্ণীয় জাতি ছাড়াও এ সমাজে মিশ্র বা সংকর (Mixed caste) জাতির অস্তিত্ব ছিলো। অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে- কসাই, জল্লাদ ও চণ্ডালগণ পরিচিত ছিলো। নগরের বাইরে এরা বাস করতো।

গুপ্তযুগের সমাজ ব্যবস্থায় দাসপ্রথা বিদ্যমান ছিলো। কাত্যায়ন, যাজ্ঞবাল্ক্য ও নারদ স্মৃতির মাধ্যমে এ প্রথা সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। যুদ্ধবন্দী ও ক্রয়সূত্রে সমাজে বহু দাস সংগ্রহ করা হতো। ধাতব মুদ্রার প্রচলনের ফলে হাটে বাজারে দাস-দাসী কেনা-বেচা হতো। যাজ্ঞবাল্ক্য স্মৃতি অনুসারে ব্রাহ্মণ কন্যা বা স্ত্রীকে দাসী হিসেবে রাখা বা বিক্রি করা যেতো না। অনেকে দাসীকে উপপত্নী বা বিয়ে করে স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করতো। সমাজে নাবীর কন্যা-জায়া-জননী এ ত্রিমূর্তির অস্তিত্ব গুপ্তযুগেও বিরাজমান ছিলো। পুত্র সন্তানের জননী হিসেবে নারীকে শ্রদ্ধা করা হতো। এ যুগে ধনী অবস্থা সম্পন্ন সকল শ্রেণির (কুমারী, বিবাহিতা, বিধবা, গণিকা) নারীকে গৃহকর্ম ছাড়াও বিভিন্ন কলাবিদ্যায় পারদর্শী করে গড়ে তোলা হতো। এ যুগেই বাৎস্যায়ন তাঁর কামসূত্রের মাধ্যমে নারীর জন্য ৬৪টি কলাবিদ্যার প্রবর্তন করেন। এ কলাবিদ্যা হলো- ১. গীত ২. বাদ্য ৩. নৃত্য ৪. আলেখ্য ৫. বিশেষকচ্ছেদ্য, ৬. তণ্ডুল-কুসুম বলি বিকার ৭. পুষ্পাস্তরণ ৮. দশন-বসনাঙ্গরাগ ৯. মণি ভূমিকা কর্ম ১০. শয়ন রচনা ১১. উদকবাদ্য ১২. উদকাঘাত ১৩. চিত্রযোগ ১৪. মাল্য গ্রন্থন বিকল্প ১৫. শেখরকাপীড় যোজন ১৬. নেপথ্য-প্রয়োগ ১৭. কর্ণপত্রভঙ্গ ১৮. গন্ধযুক্তি ১৯. ভূষণযোজন ২০. ঐন্দ্রজাল ২১. কৌচুমার যোগ ২২. হস্তলাঘব ২৩. রন্ধন ক্রিয়া ২৪. সূচীবাণকর্ম ২৫. সূত্রক্রীড়া ২৬. বীণা-ডমরুবাদ্য ২৭. প্রহেলিকা ২৮. প্রতিমালা ২৯. দুর্বাচক যোগ ৩০. পুস্তকবাচন ৩১. নাটক খ্যায়িকা দর্শন ৩২. কাব্য সমস্যা পূরণ ৩৩. পট্টিকা-বেত্র-বাণ- বিকল্প ৩৪. তক্ষকর্ম ৩৫. তক্ষণ ৩৬. বাস্তুবিদ্যা ৩৭. রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা ৩৮. ধাতুবাদ ৩৯. মণিরাগাকর জ্ঞান ৪০. বৃক্ষায়ুর্বেদযোগ ৪১. মেষকুক্কুট-লাবক যুদ্ধবিধি ৪২. শুক সারিকা প্রলাপন ৪৩. উৎসাদন, সম্বাহন-কেশমর্দন ৪৪. অক্ষরমুষ্টিকাকথন ৪৫. ম্লেচ্ছিত-বিকল্প ৪৬. দেশ-ভাষা বিজ্ঞান ৪৭. পুষ্প-শকটিকা ৪৮. নিমিত্ত জ্ঞান ৪৯. যন্ত্রমাতৃকা ৫০. ধারণ মাতৃকা ৫১. সংপাঠ ৫২. মানসী ৫৩. বাক্যক্রিয়া ৫৪. অভিধানকোষ ৫৫. ছন্দঃপাঠ ৫৬. ক্রিয়াকল্প ৫৭. ছলিতক যোগ ৫৮. দ্যূত বিশেষ ৫৯. বস্ত্রগোপন ৬০. আকর্ষ ক্রিড়া (পাশা) ৬১. বালক্রীড়নক ৬২. বৈনয়িকী বিদ্যা ৬৩. বৈজয়িকী বিদ্যা ৬৪, বৈয়ামিকী বিদ্যা। বাৎস্যায়নের মতে- এ চৌষট্টি কলাবিদ্যার পারদর্শিনী নারীর সুখ-সৌভাগ্য অনিবার্য।[৫০]

নারীর সামাজিক মযার্দা বা অবস্থান গুপ্ত আমলেও আশানরূপ ছিল না। কারণ এ সময়েও নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা ছিল না। স্ত্রীধন যা ছিলো, সে ধন থেকে বিধবা পুনরায় বিয়ে করলে বঞ্চিত হতো। পুত্র সন্তান না জন্মালে বা স্বামীর স্থায়ী অসুখ হয়ে পড়লে 'নিয়োগ'[৫১] প্রথার প্রচলন ছিলো। বিধবা বিবাহ তেমন প্রচলিত ছিল না। কারণ যে বিধবা পুনরায় বিবাহ করতো, তাকে বলা হতো-'পুনর্ভু বা পনুর্ভবলা'।[৫২] এ 'পুনর্ভু' সম্পর্কে সমাজে ঘৃণা-অবজ্ঞা প্রচলিত ছিলো এবং সে স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হতো। পুত্র সন্তান জন্মদান ছাড়া নারীর বাড়তি গুরুত্ব ছিল না। সতীদেহ বা সহমরণ বিষয়টি এ সমাজে তেমন প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়ে ওঠেনি। এর প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ৫১০ খ্রি. এরান শিলালেখে। গুপ্তরাজা ভানুগুপ্তের সামন্ত প্রধান গোপরাজা এক যুদ্ধে নিহত হলে তার স্ত্রী স্বামীর চিতায় আত্মাহুতি দেন।[৫৩] এ সতী হবার প্রবণতা সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিল কিনা তা সুস্পষ্টভাবে বলা যায় না। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন তাঁর গ্রন্থে এর উল্লেখ করেননি।

খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে প্রাচীন সুমেয়ের উরুক শহরে পৃথিবীর আদিমতম গণিকালয়ের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকাল থেকেই এ আদিম পেশার প্রচলন ঘটে।[৫৪] গুপ্ত সমাজে গণিকা (পাঁচ শ্রেণির– রাজবেশ্যা, নাগরী, গুপ্তবেশ্যা, দেববেশ্যা ও ব্রহ্মবেশ্যা বা তীর্থগ) ও দেবদাসীর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে ছিলো। যদিও এরা শিক্ষা-সংস্কৃতি, নাগরিক রুচিবোধে অনেক অগ্রগামী ছিলো, তারপরও এরা সমাজের কোন শ্রেণির মধ্যে গণ্য হতো না। কারণ সমাজে পুরুষের প্রয়োজন ও বিনোদনের খাতিরে- এ পেশায় নিয়োজিত হলেও সমাজে তাদের আলাদা মর্যাদা ও অবস্থান ছিল না। গণিকার বিয়েতে সমাজের স্বীকৃতি ছিল না। গণিকাদের সহকারীকে বলা হতো 'বিট' বা 'পীঠমর্দ'। গণিকার কন্যাকে বলা হতো 'গণিকা' আর পুত্রকে বলা হতো 'বন্ধুল'।[৫৫] গণিকা ও দেবদাসীগণ মগধ, উজ্জয়িনী, থানেশ্বর, মহেশ্বরপুর ও জিঝোতির নগর ও মন্দিরে অভিজাত তথা পুরোহিতদের কাঙ্ক্ষিত হলেও সমাজের কাছে ছিলো ঘৃণার ও অবজ্ঞার পাত্র। অর্থ উপার্জন ও পেশার স্বাধীনতা থাকা স্বত্ত্বেও এরা ছিল সমাজ ও পুরুষতন্ত্রের বলির শিকার। এ যুগের বিখ্যাত গণিকা ছিলো- সিরিমা, সালাবতী ও অম্বাপালী। 'বৃহৎকল্প' গ্রন্থানুসারে, সেকালে গণিকাদের মোট ৭২ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হতো।[৫৬]

সংস্কৃতি

ভারতবর্ষের সংস্কৃতির বিকাশে গুপ্তযুগের (৩২০-৬০০খ্রি.) তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, জ্যোতির্বিদ্যায় গুপ্তযুগ সমৃদ্ধির শীর্ষ শিখরে পৌছায়। সাধারণভাবে গুপ্তযুগকে বলা হয়- 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবনের যুগ'। কারণ আর্য ও মৌর্যযুগের প্রথম দিকে ব্রাহ্মণ্যবাদের যে প্রভাব-প্রতাপ ছিলো, তা সম্রাট অশোকের পর থেকে ভাটা পড়ে। কিন্তু এ যুগে যাজ্ঞবাল্ক্য, কাত্যায়ন, নারদ ও বৃহস্পতি প্রমুখ পণ্ডিতগণের স্মৃতিশাস্ত্র ও গুপ্তরাজদের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রাহ্মণ্য মতবাদ পুনরায় জৌলুস ফিরে পায়। মৌর্য যুগ থেকেই বৈষ্ণব, শৈব, বৌদ্ধ, জৈন ও আজীবিক ধর্ম প্রচলিত ছিলো। কিন্তু এ গুপ্তযুগে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো- হিন্দু শাক্ত ধর্মের উদ্ভব। এ শক্তি পূজার উৎস হিসেবেই- কালী বা দুর্গা ও লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটে। পুরুষদেবতা শিব ও বিষ্ণুর সঙ্গে কালী ও লক্ষ্মীর মিলনে পুরুষের কর্মশক্তি সুদৃঢ় হয়। সূর্য দেবতার পূজাও এ গুপ্তযুগেই আরম্ভ হয়। হিন্দু ধর্মের ৫টি প্রধান ধারা, যথা- বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এ পঞ্চোপসক শ্রেণির বিকাশ ঘটে। এছাড়া হিন্দুদের ষড়দর্শন; যথা- ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত এসব সূত্র ও মতবাদগুলো সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠা পায়।[৫৭] তাই পণ্ডিতমহল গুপ্তযুগকেই- 'ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুজ্জীবন বা নবজাগরণ' বলে চিহ্নিত করে থাকেন।

শিক্ষাই হলো সভ্যতা ও সংস্কৃতির অপরিহার্য অঙ্গ। আর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৫-৪১৫খ্রি.) ছিলেন এ শিক্ষা সংস্কৃতির একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। মূলত তাঁরই অনুপ্রেরণায় গুপ্তযুগে শিক্ষার বিকাশ ঘটে। এ যুগেও গুরু-শিষ্যের মাধ্যমে লেখাপড়া হতো। শিক্ষককে বলা হতো আচার্য বা উপাধ্যায়। আর ছাত্রকে বলা হতো- শিষ্য বা ব্রহ্মচারী। এ যুগে কাব্য ও গদ্যরচনাশৈলীর যে উন্নতি ঘটেছিলো, তার প্রমাণ মেলে। বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা, ধর্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, ইতিহাস, দর্শন ও ব্যাকরণ- বিষয়ে বিদ্যা দান করা হতো। এ বিদ্যা শিক্ষাকে কেন্দ্র করে- গান্ধার, তক্ষশিলা, মথুরা, কান্যকুব্জ, কপিলাবস্তু, পাটালিপুত্র, গয়া, বারাণাসী ও কৌশাম্বী শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ফাহিয়েন পাটালিপুত্রে বিশাল গ্রন্থাগারের কথা বলেছেন। হিউয়েন সাঙের মতে; তক্ষশিলা- চিকিৎসাবিদ্যায়, উজ্জয়িনী- জ্যোতির্বিদ্যায় ও বারণাসী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো। তবে সবচেয়ে খ্যাতিতে বিখ্যাত হয়ে ওঠেছিলো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেটি- নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিহারের রাজগিরির ৭ মাইল উত্তরে বড়গাঁও নামের যে গ্রাম, সেখানেই গড়ে ওঠেছিলো এ জগৎ বিখ্যাত বিদ্যাতীর্থ। শোনা যায়, ৫শত বণিক ১০কোটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে গৌতম বুদ্ধের জন্য যে আম্রকানন কেনেন, পরবর্তীকালে সেখানেই নালন্দার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়।[৫৮] প্রথম পর্যায়ে ৬জন রাজা (বুধগুপ্ত, তথাগতগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত, বালদিত্য, শক্রুদিত্য, বজ্র বা হর্ষ) যে ৬টি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করে দেন, তা নিয়েই এর কার্যক্রম শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে এখানে ১০৮টি বিহার গড়ে ওঠে, যার মধ্যে ৩০০ কক্ষ ও ৮টি বিশাল পাঠাগার ছিলো। প্রধান বিহারটি আকারে ছিলো সুবৃহৎ। এখানে মূলত স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে পাঠদান করা হতো। অর্থাৎ কলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, যথা- বেদ, বেদাঙ্গ, দর্শন, ব্যাকরণ, যোগশাস্ত্র, উপনিষদ, মীমাংসা, গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসা বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা দান করা হতো। এর সুনাম সুদূর কোরিয়া, জাপান, মঙ্গোলিয়া, তিব্বত, চীন ও সিংহলে পৌছে গিয়েছিলো। এসব দেশ থেকে ছাত্ররা পড়তে আসতো।

পর্যটক হিউয়েন সাঙও এখানে ২ বছর পড়াশোনা করেন। শিক্ষার্থীকে প্রথমে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, তবেই পড়ার জন্য ছাত্র হিসেবে গণ্য হতে হতো। এখানে ১৫শত শিক্ষক ও প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী বিনা ফি ও খাদ্য খেয়ে আবাসিকভাবে অবস্থান করতেন। এছাড়া বিনামূল্যে পোশাক, শয্যা ও ঔষধ দেয়া হতো। এসব ব্যয় মেটাতে রাজাগণ এ বিশ্ববিদ্যালকে ২০০ গ্রাম দান করেছিলেন আয়ের উৎস হিসেবে।[৫৯] বাণভট্ট ও হিউয়েন সাঙের বর্ণনামতে পাওয়া যায়, আম্বালার (পাঞ্জাব) থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজা হর্ষবর্ধনের সময় নালন্দা খ্যাতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষ পর্যায় পৌছায়। সম্রাট হর্ষ বর্ধনের সময় এর অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত শীলভদ্র। দেবপালের সময় (৮১০-৮৫০খ্রি.) এর আচার্য ছিলেন ব্রাহ্মণ ইন্দ্রদেব। এ প্রতিষ্ঠানটি প্রায় ৮০০ বছর (আনু. ৪২৭-১১৯৭খ্রি.) সগৌরবে টিকে ছিলো। ধারণা করা হয়, বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণের সময় এটি ধ্বংস হয়ে যায়। আবার প্রায় ৮০০ বছর অর্থাৎ ২০১4 সালের সেপ্টেম্বরে ভারত সরকারের উদ্যোগে এ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

এ সময় বিজ্ঞান ও চিকিৎসা শাস্ত্রেও প্রভূত উন্নতি হয়। গ্রহ-নক্ষত্র ও বিজ্ঞান বিষয়ে বরাহমিহির তাঁর- 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থ রচনা করেন। সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী, ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প, রামধনু ও ধূমকেতু সম্বন্ধেও বরাহমিহির যথেষ্ঠ পাণ্ডিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর্যভট্ট সূর্যগ্রহণ ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আর্যভট্ট তাঁর 'দশগীতিকাসূত্র' ও 'আর্যাষ্টশত' গ্রন্থে পাটিগণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি ও দশমিক পদ্ধতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা দান করেন। বহুকাল পূর্বে তিনিই সৌর বছরের দৈর্ঘ্য হিসাব করেছিলেন। চিকিৎসাবিজ্ঞানে ভেষজ বিষয়ে এ যুগ বেশ অগ্রগতি লাভ করে। মানুষের চিকিৎসা শাস্ত্র হিসেবে 'নবনিতকম্' এবং পশু চিকিৎসা শাস্ত্র হিসেবে পালকপ্য রচনা করেন- 'হস্তায়ুর্বেদ'। এছাড়া শালিহত্র রচিত 'অশ্বশাস্ত্র' পশু চিকিৎসার ওপর রচিত বই বস্তুত এ যুগেই রচিত হয়েছিলো। সাহিত্য; বিশেষত সংস্কৃত সাহিত্যের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এ গুপ্ত আমলেই। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে (৩৭৫-৪১৫খ্রি.) তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হয়। কাব্য, মহাকাব্য, নাটক, সংহিতা, শাস্ত্র, কাহিনিকাব্য, অলংকার ও যৌন গ্রন্থ রচনায় বিশেষ অগ্রগতি হয়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজদরবারের নয়জন পণ্ডিতের সমাহারে যে 'নবরত্ন' প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, তাদের অবদানই এতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। এ নবরত্নগণ হলেন- ধন্বন্তরি, ক্ষপর্ণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটখর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির ও বররুচি প্রমুখ।[৬০] এ যুগেই সংস্কৃত ভাষা; সরকারি ভাষা বা দরবারী ভাষায় পরিণত হয়।

এ গুপ্ত যুগেই রামায়ণ, মহাভারত দুটি চূড়ান্ত রূপ পায়। কবি ও নাট্যকার কালিদাস রচনা করেন- ঋতুসংহার, মালবিকাগ্নিমিত্র, মেঘদূত, রঘুবংশ, অভিজ্ঞানশকুন্তলম, বিক্রমোর্বশী ও কুমারসম্ভব গ্রন্থ। এছাড়া ভারবির- কিরাতার্জুনীয়, ভট্টির- রাবণবধ, শূদ্রকের- মৃচ্ছকটিম, বিশাখ দত্তের- মুদ্রারাক্ষস ও দেবী চন্দ্রগুপ্তম, বাৎস্যায়নের-

কামসূত্র এবং খনার– কৃষি ও আবহাওয়া বিষয়ক বচনসমূহ। তাই ঐতিহাসিকগণ গুপ্তযুগকে- ‘সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্বর্ণযুগ’ বলে অভিহিত করেছেন।

স্থাপত্য শিল্পে গুপ্তযুগ মূলত পর্বত গুহা স্থাপত্য ও মন্দির স্থাপত্যে উৎকর্ষ লাভ করে। অজন্তা, ইলোরা, ঔরাঙ্গবাদ ও মধ্যপ্রদেশের পবর্তগুহা চিত্রের বিষয়টি সাফল্যের সঙ্গে উৎকলিত হয়েছে। এছাড়া অসংখ্য বিহার বা সংঘরাম এর প্রমাণ বহন করে। মন্দির স্থাপত্যেও ৫টি ভিন্ন রীতির আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়ে ওঠেছে। এছাড়া দেব-দেবী ও নর-নারীর মূর্তি ভাস্কার্য নির্মাণেও কৃতিত্বের ছাপ পড়েছে। এছাড়া গুপ্তযুগের দেওয়াল চিত্রও বিকশিত হয়। রাজপ্রাসাদ, নগর ও গৃহস্থ বাড়ির ঘরের দেয়ালে চিত্র অঙ্কনের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করে। এসব দেয়াল চিত্রের মধ্যে- রাজা, রানী, রাজকন্যা, পশু, পাখি, ফুল, কৃষক, সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকের চিত্র প্রাধান্য পায়। সাদা, কালো, লাল, নীল, সবুজ ও হলুদ- এ ৬টি রঙের ব্যহার বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। যন্ত্র সঙ্গীত ও কণ্ঠ সঙ্গীতে এসময় বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাঁর আমলে (৩৩৫-৩৭৫খ্রি.) একজন শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

অর্থনীতি

গুপ্তযুগের অর্থনীতিতে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য বেশ অগ্রগতি লাভ করে। জমির বা ভূমির ওপর রাষ্ট্রীয় প্রভুত্ব বিদ্যমান ছিলো। রাজাকে উৎপন্ন শস্যের এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব দিতে হতো। ধারণা করা হয়, জমি রাষ্ট্রীয় মালিকানার পাশাপাশি ব্যক্তি মালিকানাতেও ছিল। জমি ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল দস্তাবেজ সংরক্ষণ করতেন ‘পুস্তপাল’। অমরসিংহ তাঁর ‘অমরকোষ’ গ্রন্থে ১২ ধরনের জমির উল্লেখ করেছেন, যথা- ১. উর্বরা, ২. ঊষরা, ৩. মরু, ৪. অপ্রহত (চাষ হয়নি এমন), ৫. সাদ্বল (ঘাস জমি), ৬. পঙ্কিল (কর্দমাক্ত), ৭. জলপ্রায়মনুপম, ৮. কচ্ছ (জলাভূমি), ৯. শর্করা, ১০. শর্কাতি, ১১. নদীমাতৃক, ১২. দেবাতৃক। তবে গুপ্তযুগের তাম্রশাসন থেকে ৭ ধরনের জমির কথা জানা যায়;- যথা ১. ক্ষেত্র (চাষযোগ্য), ২. বাপক্ষেত্র (বীজ বপন যোগ্য), ৩. খিল বা খিলক্ষেত্র (পতিত জমি), ৪. অপ্রহত (অকর্ষিত ভূমি), ৫. অপ্রদ বা অপ্রদা (উর্বর ভূমি), ৬. অপ্রতিকর (অনুর্বর ভূমি) ও অরণ্য বা বনাঞ্চল। জমি পরিমাপের একক ছিল চারটি, যথা- আঢ়বাপ→দ্রোণবাপ→কুল্যবাপ→পাটক। সর্বনিম্ন ছিল আঢ়বাপ এবং সর্ব উপর ছিল পাটক।

৮ মুষ্টি	= ১ কুঞ্চি	৪ আঢ়বাপ	= ১ দ্রোণবাপ
৮ কুঞ্চি	= ১ পুস্কল	৮ দ্রোণবাপ	= ১ কুল্যবাপ
৪ পুস্কল	= ১ আঢ়ক (আঢ়)	৫ কুল্যবাপ	= ১ পাটক
৪ আঢ়ক	= ১ দ্রোণ		

বিভিন্ন তাম্রশাসনে দেখা যায়- ১ কুল্যবাপ জমির দাম যথাক্রমে ২, ৩ ও ৪ দিনার পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। নারদ, বৃহস্পতি ও অমরকোষের মতে–

১ দীনার	= ১২ ধানক	১ দীনার	= ১ নিষ্ক
১ ধানক	= ৪ আণ্ডিকা	১ নিষ্ক	= ৪ সুবর্ণ
১ আণ্ডিকা	= ১ কাষাপণ (তাম্রমুদ্রা)		

অমরকোষ ও বৃহৎ সংহিতায় দেখা যায়- বছরে ২ বার অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শরৎকালে ফলের চাষ হতো।[৬১] ফসল হিসেবে- ধান, গম, আখ, মটরশুটি, গোলমরিচ, পেয়াজ, রসুন, তিল, সরিষা, সবজি ও তুলার চাষ করা হতো।

এসময় বিখ্যাত- বিদুষী নারী খনার উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার কৃষি, জলবায়ু ও আবহাওয়ার ওপর যাঁর ভালো ধারণা ছিল। চাষাবাদ প্রসঙ্গে খনা যেমন বলেছেন-

ষোলো চাষে তুলা।
তার অর্ধেকে মুলা ॥
তার অর্ধেকে ধান।
বিনা চাষে পান ॥

রাজস্ব হিসেবে উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজাকে দিতে হতো। বিভিন্ন ধরনের কর প্রচলিত ছিল। যেমন- কর, উপরিকর, উদ্রঙ্গ, বিষ্টি, বেগার বা পীড়নমূলক কর উল্লেখযোগ্য। মাঝে মাঝে ভূস্বামীর বাড়িতে কৃষক ও নারীদের ধান কাটা ও মাড়াইয়ের মতো কাজ বিনা পয়সায় করে দিতে হতো। বস্ত্রশিল্পে গুপ্তযুগ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করে। রেশম ও পশম-এ উভয় ধররের বস্ত্র উৎপাদিত হতো। মোটা ও মিহি দুই ধরনের কাপড় তৈরি হতো। এ সময় থেকেই রেশম, উল ও মসলিনের ব্যবহার শুরু হয়। কাপড় রঙ করার এক শ্রেণির কর্মচারীর উদ্ভব ঘটে। এছাড়া লৌহকার, তাম্রকার, কাংসকার, স্বর্ণকার, রৌপ্যকার, অস্ত্রাকার, মালাকার, ধোপা, রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী, দর্জি ও মৃৎশিল্পীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া হাতির দাঁতের তৈরি জিনিসপত্র, বিভিন্ন মণি-মুক্তার অলংকার এ সময় তৈরি করা হতো। মাটির তৈরি থালা-বাটি ও ঘড়া ব্যবহৃত হতো। চামড়া দিয়ে পাখা, জুতা ও তেলের পাত্র তৈরি করা হতো। মদ প্রস্তুতকারকের উপস্থিতিও লক্ষ করা যায়।

বাণিজ্যের প্রসার গুপ্ত আমলে বেশ গতিশীলতা লাভ করেছিলো। ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের কথা জানা যায়। জল ও স্থলপথে বাণিজ্য চলতো। আগে যে ব্রাহ্মণগণও বাণিজ্য করতো তার প্রমাণ মেলে- প্রথম কুমার গুপ্তের (৪৩৬খ্রি.) তুমেনলেখ থেকে। এ সময় শ্রীদেব, হরিদেব, ধন্যদেব, ভদ্রদেব ও সজ্মদেব- এ পাঁচভাই সবাই ছিলেন ব্রাহ্মণ। এদের বসত ছিল মধ্য প্রদেশের ভিল্সা জেলার ভতোদকে। বণিকদের সাধারণত 'শ্রেষ্ঠী' বা শ্রেষ্ঠীন' ও নগরশ্রেষ্ঠী, (নগরের প্রধান বণিক) বলা হতো। গঙ্গা, যমুনা, নর্মদা ও গোদাবরী নদীর মাধ্যমে বড় বড় নৌকা ও জাহাজে করে মসলা পণ্য হিসেবে বহন করা হতো। নগদ অর্থ বা কড়ি বিনিময়ের মাধ্যমে পণ্য কেনা বেচা করা হতো। রোমের পূর্বদেশীয় রাজধানী কনস্টানটিনোপল এর সঙ্গে এদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। রোম সাম্রাজ্যের পতন হলে এ বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং সোনা-রূপার আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। তাই মুদ্রার পরিবর্তে কড়ির প্রচলন ঘটে।

এ সময় দুটি বাণিজ্যিক প্রধান বন্দর ছিলো সিবোর (চৌল) ও কোঞ্চন (কল্যাণ)। ভৃগুকচ্ছ ও ক্যাম্বে নামক আরো দুটি বন্দরের কথা শোনা যায়। রপ্তানি পণ্য হিসেবে- মসলা, গোলমরিচ, মুক্তা, চন্দন কাঠ, পাথর, তিল, রেশমের মতো জিনিস ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, মালয়, জাভা ও চীন দেশে পাঠানো হতো। আর ইথিওপিয়ার হাতির দাঁত, আরবদেশের ঘোড়া ভারতে আমদানি করা হতো। এ বাণিজ্য ব্যবস্থা সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে- 'গিল্ড বা নিগম' গঠন করা হয়। যা বর্তমান যুগের চেম্বার অব কমার্সের মতো একটি প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন শ্রমিক বণিক ও শিল্পীদের সমন্বয়ে এ গিল্ড গঠন করা হতো। গুপ্তযুগের গিল্ড বা নিগমে ১৮ শ্রেণির শিল্পী শ্রমজীবীর অংশগ্রহণ ছিলো। গুপ্তযুগের কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির উৎকর্ষ ও বিকাশের অদানের জন্য ভিনসেন্ট স্মিথ তাঁর 'The Early History of India' গ্রন্থে গুপ্ত যুগকে- 'ক্লাসিক্যাল এজ বা সুবর্ণ যুগ' বলে অভিহিত করেছেন।

নয়

পালযুগে বাংলা

বাংলার প্রথম জাতীয় রাজা শশাঙ্কের (আনু. ৬০৫-৬৩৭খ্রি.) পর সমগ্র বাংলায় ভয়াবহ বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। শক্তিশালী কোন শাসক না থাকায় রাজাগণ প্রায় শতবর্ষ ব্যাপী (৬৫০-৭৫০খ্রি.) আন্তকলহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এসময় বাংলা কয়েকটি নতুন রাজবংশের উত্থান ঘটে, যথা- পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট। এরমধ্যে পাল বংশ বিশেষ ভাবে বিখ্যাত। 'মাৎস্যন্যায়' এর মতো আত্মঘাতী কলহ থেকে পরিত্রাণ পেতে বাংলার সামন্তগণ গণতান্ত্রিকভাবে একজন রাজা মনোনীত করেন। এ রাজাই হলো বিখ্যাত পাল বংশের (৭৫০-১১৬২খ্রি.) প্রতিষ্ঠাতা গোপাল। এ গোপালের পিতা- বপ্যট এবং পিতামহ ছিলেন- দয়িতবিষ্ণু।[৬২] পালগণ ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। ধারণা করা হয়- গোপালের নামানুসারেই এ রাজবংশের নাম হয় পাল বংশ। বিখ্যাত এ পালবংশের মোট ১১ জন শাসক প্রায় সাড়ে চারশত বছর (৭৫০-১১৬২খ্রি.) গৌরবের সঙ্গে রাজত্ব করেন। এদের মধ্যে- গোপাল (৭৫০-৭৭০খ্রি.), ধর্মপাল (৭৭০-৮১০খ্রি.), দেবপাল (৮১০-৮৫০খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলায় আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ বিকাশ ঘটে।

প্রশাসন

প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন রাজা। তারপর রাজমন্ত্রী ও পুরোহিতবর্গ সম্মান ও মর্যাদা লাভ করতেন। পাল আমলে সমগ্র রাজ্য প্রধান তিনটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিলো। যথা- বৃহত্তম ভুক্তি, পুণ্ড্রবর্ধন ভুক্তি এবং বর্ধমান ভুক্তি ও দণ্ড ভুক্তি। বিহার, ত্রিহুত, শ্রীনগর, আসাম, বগুড়া ও কুমিল্লা-ত্রিপুরা অঞ্চলে এ তিনভুক্তি বিস্তৃত ছিলো। ভুক্তির শাসনকর্তা- উপরিক, বিষয়ের শাসনকর্তা- বিষয়পতি, বীথি/মণ্ডলের শাসনকর্তা- মণ্ডলাধিপতি, গ্রামের শাসনকর্তা- গ্রামপতি। এছাড়া জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, মহা-মহত্তর, মহত্তর, দাশগ্রামিক কর্মচারীর নাম পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন বিভাগের প্রধানকে বলা হতো অধ্যক্ষ। এ অধ্যক্ষকে সহায়তা করতো- বহুকারণ (করণিক)। সেনাপতির অধীনে ছিলো সৈনিক সংঘের কর্মচারীগণ এবং পররাষ্ট্র বিষয়ে মন্ত্রপালের ও গূঢ়পুরুষের (গুপ্তচর) নিয়ন্ত্রণ করতেন দূত (পররাষ্ট্র কর্তা)। এছাড়াও পাল আমলে রাজ্যের প্রশাসন কাঠামো ছিলো নিম্নরূপ :

বিভাগের নাম		কর্মকর্তার নাম	বিভাগের নাম		কর্মকর্তার নাম
বিচার বিভাগ	–	মহাদণ্ড নায়ক	কৃষি বিভাগ	–	ক্ষেত্রপ
রাজস্ব বিভাগ	–	সর্বাধ্যক্ষ	পররাষ্ট্র বিভাগ	–	দূত
আয়-ব্যয় হিসাব বিভাগ	–	মহাক্ষপটলিক	শান্তিরক্ষা বিভাগ	–	মহাপ্রতীহার
ভূমি বিভাগ	–	প্রমাতৃ	সৈন্যবিভাগ	–	মহাসেনাপতি বা সেনাপতি

এছাড়া হস্তী, অশ্ব, বথ, পদাতিক এ চতুরঙ্গ বল ছাড়াও নৌবল ছিল। এ ৫ বিভাগের প্রধানকে বলা হতো বল। পদাতিক প্রধান- বলাধ্যক্ষ, নৌবলের প্রধান- নামাধ্যক্ষ। এছাড়া একজন উষ্ট্রবলের কথাও জানা যায়। এসবের পরেও অভিত্বরমান, গমাগমিক দুত- প্রৈষাণিক, খণ্ডরক্ষ, নামের কর্মচারীদের উল্লেখ রয়েছে।[৬৩]

অর্থনীতি

পালযুগের অর্থনীতিও কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছিলো। ভূমি বন্দোবস্ত, রাজস্ব, শস্য ও পরিমাণের বিষয়গুলো অনেকটা গুপ্ত আমলের মতোই ছিলো। অষ্টম শতকের রামপাল তাম্রপট্টে দেখা যায় ভূমি পরিমাপের পদ্ধতি। যেমন-

৩ ক্রান্তি	=	১ কড়া	৪ রেখা	=	১ ষষ্ঠী
৪ কড়া	=	১ গণ্ডা	৭ ষষ্ঠী	=	১ পোয়া
২০ গণ্ডা	=	১ পণ	৪ পোয়া	=	১ কেদার বা কেয়ার
৪ পণ	=	১ রেখা			

১২ কেয়ার = ১ হল (১হল = ১০$\frac{১}{২}$ বিঘা = ৩$\frac{১}{২}$ একর)[৬৪]

এছাড়া 'নল'- ভূমি পরিমাপের একক হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ভূমি থেকে প্রাপ্য কর বা রাজস্বই ছিলো রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস। এ কর ছিলো আবার ৫ প্রকারের- ভাগ, ভোগ, কর, হিরণ্য ও উপরিকর। রাজ্যের আয়ের উৎসসমূহের উপর নির্দিষ্ট হারে কর আরোপ করা ছিলো। জমির উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ রাজা রাজস্ব হিসেবে পেতেন। এর সংগ্রাক ছিলেন- ষষ্ঠাধিকারী বা ষষ্ঠাধিকৃত। খেয়া পারাপারের কর সংগ্রাহক ছিলেন তারিক বা তরপতি। বাণিজ্য শুল্ক আদায়কারী- দাশাপরাধিক, চোর-ডাকাত থেকে নিরাপত্তা বিধানের ওপর ধার্য কর আদায়কারী চৌরদ্ধরণিক। এছাড়া বণ বা হিরণ্য থেকে কর আদায়কারী কর্তার নাম- গৌল্মিক। জমিতে ধান, গম, যব, মটরশুটি, মরিচ, রসুন, পেয়াজ, মুগ, মসুর, তিল, সরিষা উৎপন্ন করা হতো। নদীবহুল ও দেশে কৃষিফসল প্রচুর উৎপন্ন হতো। কৃষকের অবস্থা মোটের ওপর সচ্ছল ছিলো। জমির উপর রাজার অধিকার থাকলেও ব্যক্তি মালিকানা বহাল ছিলো।

বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য পালযুগে সমৃদ্ধি লাভ করে। তাম্রলিপ্ত ও সপ্তগ্রাম পাল আমলে দুটি প্রধান বাণিজ্য বন্দরের খ্যাতি লাভ করে। বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হিসেবে এ দুটি বন্দর ব্যবহৃত হতো। স্থল ও জলপথে পশুর গাড়ি, ঘোড়া, নৌকা ও জাহাজের মাধ্যমে পণ্য বহন করা হতো। রেশম, সিল্ক, কাপাসবস্ত্র, চন্দন কাঠ, বিভিন্ন অলংকার, শঙ্খ, প্রবাল, মসলা বিদেশে রপ্তানি করা হতো। আরব, চীন, তিব্বত, সিংহল, জাভা, ইন্দোনেশিয়া, ইথিওপিয়া থেকে ঘোড়া, হাতির দাঁত, স্বর্ণ, মুক্তা, মূল্যবান পাথর আমদানি করা হতো। মোট কথা কৃষি সম্পদের প্রাচুর্য ও শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ফলে পাল যুগে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। স্বর্ণকার, কামার, ছুতার, চামার, কাঁসারি, তাঁতি, শঙ্খশিল্পী ও ভাস্করগণ পাল যুগের শিল্পকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

সমাজ

পাল শাসকেরা ছিলো বৌদ্ধ ধর্মানুসারী। সঙ্গত কারণেই সমাজে পুরুষের আধিপত্য বিদ্যমান ছিলো। পুরুষ বহু বিবাহ করতে পারতো। বিধবা ও সতীদাহ প্রথা তেমন ছিল না। পাল রাজাগণ বৌদ্ধ হলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাই রাজ কাজে ব্রাহ্মণ ও কৈবর্তগণ অংশগ্রহণ করতে পারতো। তাই এ সময় বাংলার সমাজে জীবনে সহাবস্থান বা সংহতি গড়ে ওঠে। মানুষের জীবনযাত্রা ছিল সরল- অনাড়ম্বর। সমাজে যেমন- শৎ, শুদ্ধচারী লোক ছিল, তেমনি আবার দুর্নীতিবাজ, ব্যভিচারী লোকের অভাব ছিল না। চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ বলেছেন- 'সমতটের জনগণ কষ্টসহিষ্ণু, তাম্রলিপ্তের অধিবাসী সাহসী, চঞ্চল, ব্যস্তবাগীশ এবং কর্ণ সুবর্ণের মানুষ সাধু ও অমায়িক।' হিউয়েন সাঙ ছিলেন একজন পর্যটক মাত্র। তাই সমাজের গভীরে তাঁর দৃষ্টি পড়েনি। সমাজে বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, বৈদ্য, বণিক, ডোম, চণ্ডাল, হাড়ি, শুরি, পাটুনি, কাপালিক, তান্ত্রিক, ভিক্ষু, চোর, ডাকাত ও প্রতারকের বসবাস ছিলো। ধনী অভিজাতগণ নগরে আর মধ্যবিত্তগণ গ্রামে এবং অস্পৃশ্য বা নিম্নবর্ণের লোক গ্রামের প্রান্ত সীমানা ও পাহাড়ে বসবাস করতো। এ যুগ ছিলো গ্রামকেন্দ্রিক।

সংস্কৃতি

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পাল আমল নানাভাবে গৌরবমণ্ডিত। পাল শাসকগণ শিক্ষা ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসেবে উদন্তপুর (বিহার), বিক্রমশীলা ও সোমপুর বিহারগুলো খ্যাতি অর্জন করে। এছাড়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুখ্যাতি তখন পর্যন্তও বিদ্যমান ছিলো। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এ আমলেই রচিত হয়। এ চর্যাপদে বাউল, বৈষ্ণব ও সহজিয়া গানের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়। চর্যাপদ রচয়িতার মধ্যে- ভুসুকপা, লুইপা ও কাহ্নপা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ যুগের সাহিত্য গ্রন্থগুলো হলো- সন্ধ্যাকর নন্দীর- রামচরিত, রামাই পণ্ডিতের- শূন্যপুরাণ। এছাড়া জীমুতবাহন, শ্রীধরভট্ট, ভবদেব ও চক্রপানি ছিলেন সে যুগের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের পণ্ডিত। পালযুগে স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রকলায় বেশ উন্নতি ঘটে। বৌদ্ধবিহার বা মঠ নির্মাণ শৈলী এযুগেই মূলত পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। তিব্বতের বৌদ্ধ বিহার, উদন্তপুর বিহার, বিক্রমশীলা বিহার ও নালন্দার বৌদ্ধ বিহারগুলো এর প্রমাণ বহন করে। বুদ্ধের মূর্তি ও দেব-দেবী তথা নারী-পুরুষের মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রেও উৎকর্ষ সাধিত হয়। আবার চিত্রাঙ্কনেও এ আমলে- ধীমান, বীতপাল, বিমলদাস ও কর্ণভদ্র ছিলেন বিখ্যাত। পালযুগে বাঙালির সমাজে বারো মাসে তেরো পার্বণ উদ্‌যাপিত হতো। নবান্ন, পৌষপার্বণ, পূজা ও উৎসবের প্রচলন ছিলো। প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি দূর করতে জনগণ- নাচ, গান, খেলাধুলা ও যাত্রাভিনয়ে অংশগ্রহণ করতো। কুস্তি, শিকার, শরীরচর্চা ও জাদুমন্ত্র খেলায় পুরুষেরা উৎসাহী ছিলো। আবার গোলক ধাম, কড়ি খেলায় মেয়েরা আনন্দ পেতো। পুরুষেরা বাবড়ি চুল, ধুতি ও চাদর পরতো। আর মেয়েরা ব্যবহার করতো শাড়ি ও ওড়না। নারী-পুরুষ উভয়েই অলংকার পরতো। পালযুগে মানুষের খাদ্য তালিকার মধ্যে ছিল- ভাত, মাছ, মাংস, শাক-সবজি, ফল, দুধ, ঘি ও দধি। এছাড়া বাঙালির প্রিয় খাবার- পিঠা ও পায়েসের প্রচুর ব্যবহার ছিল। সুরাপান প্রচলিত ছিল। তবে ব্রাহ্মণদের জন্য- সুরা, মাংস ও মাছ নিষেধ ছিল।

দশ

সেন যুগে বাংলা

সেন বংশের পূর্বপুরুষ বীর সেন। তিনি সম্ভবত দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হলেও পরবর্তীকালে এ বৃত্তি ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করেন। তার পুত্র সামন্ত সেন সম্ভবত চালুক্যরাজ ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে বঙ্গ দেশে আসেন। কর্ণাটে থাকাবস্থাতেই সামন্ত সেন যুদ্ধ-বিগ্রহ করে খ্যাতি অর্জনে সক্ষম হন। এ সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন, যিনি ছিলেন পাল রাজাদের অধীনস্থ রাঢ়দেশীয় সামন্ত রাজা। পালরাজা রামপালের মৃত্যুর পর সুযোগ বুঝে সেন বংশের ভিত্তি স্থাপন করেন। এ বংশের ১০ জনের মতো শাসক প্রায় ১৭০ বছর (১০৭০-১২৪৬খ্রি.) এ দেশ শাসন করে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে পূণঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। এ বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন- বিজয়সেন, বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন প্রমুখ। লক্ষ্মন সেন যখন প্রধান রাজধানী গৌড় (মালদহ) ছেড়ে দ্বিতীয় রাজধানী নদীয়ায় অবকাশ যাপন করছিলেন, তখন সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেকের তুর্কি সেনাপতি বখতিয়ার খিলজীর আক্রমণে পালিয়ে ঢাকার বিক্রমপুরে আশ্রয় নেন। এরপর হতেই মূলত বাংলায় হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে এবং মুসলিম শাসনের সূত্রপাত ঘটে।

প্রশাসন

পাল যুগের মতো সেন যুগেও প্রশাসনের শীর্ষে অবস্থান করেন রাজা। তবে সেনদের শাসন ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণ ও পুরোহিততন্ত্র প্রতাপের সঙ্গে জেকে বসে। ব্রাহ্মণ ও রাজপুরোহিত রাজ্যের ধর্মীয় ও সমাজ ব্যবস্থাপনায় কর্তৃত্ব খাটাতে শুরু করে। জ্যেষ্ঠ রাজকুমার যুবরাজ পদে অধিষ্ঠিত হতেন এবং রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ব্যাপারে রাজাকে সহায়তা করতেন। রাজার দেহরক্ষক পদে- শিরোরক্ষিক, রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর রক্ষকপদে- অন্তঃপ্রতীহার, রাজার ব্যক্তিগত অনুচর পদে- মহাপদমূলিক নিয়োগ পেতো। মন্ত্রীদের ভেতর- মহামন্ত্রী, মহামহাত্তক, মহাসন্ধিবিগ্রহিক, বৃহদুপরিক, মহাভোগিক বা মহাভোগপতি, মহাধর্মাধ্যক্ষ, মহাসেনাপতি, মহাগণস্থ, মহামুদ্রাধিকৃত, মহাবলাধিকরণিক, মহাবলাকোষ্ঠিক ও মহাকরণাধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায়। পুরোহিতগণের মধ্যে- পুরোহিত, মহাপুরোহিত, মহাতন্ত্রাধিকৃত ও রাজপণ্ডিত প্রমুখ। এছাড়া প্রশাসনের কাঠামো ছিলো এরূপ–

বিভাগের নাম	–	কর্মকর্তার নাম	বিভাগের নাম	–	কর্মকর্তার নাম
ভুক্তি	–	ভুক্তিপতি/উপরিক	বিষয়	–	বিষয়পতি
মণ্ডল	–	মণ্ডলপতি	গ্রাম	–	গ্রামীক/গ্রামপতি

গ্রাম প্রশাসনের বিন্যাস ছিলো- পাটক, চতুরক, চক। গোটা সেন সাম্রাজ্য কয়েকটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিলো। যেমন- পুণ্ড্রবর্ধনভুক্তি, বর্ধমানভুক্তি ও কঙ্কগ্রামভুক্তি। এছাড়াও রাষ্ট্রীয় অন্যান্য যে বিভাগ ছিলো তা এরূপ-

বিভাগের নাম	–	বিভাগ প্রধানের নাম	বিভাগের নাম	–	বিভাগ প্রধানের নাম
বিচার বিভাগ	–	মহাধর্মাধ্যক্ষ/দণ্ডনায়ক	পররাষ্ট্র বিভাগ	–	মহাসন্ধিবি গ্রাহক
রাজস্ব বিভাগ	–	ষষ্ঠাধিকৃত/ঔপধিক	সৈন্য বিভাগ	–	মহাসেনাপতি
হাট-বাজার বিভাগ	–	হট্টপতি	শান্তিরক্ষা বিভাগ	–	মহাপ্রতীহার
রাজকীয় পানশালা	–	পানীয়া গারিক	ভূমি ও কৃষি বিভাগ	–	কর্মকর ঔপধিক
রাজকীয় অতিথিশালা	–	বাসাগারিক	আয়-ব্যয় হিসাব বিভাগ	–	মহাক্ষপটলিক
আন্তঃরাষ্ট্র বিভাগ	–	মহামন্ত্রী/মহামহত্তক			

এছাড়াও পররাষ্ট্র বিভাগে- দূত, মন্ত্রপাল, গূঢ়পুরুষবর্গ (গুপ্তচর) থাকতো। শান্তিরক্ষা বিভাগে- চৌরোদ্ধরণিক, দণ্ডপাশিক ও চাটপাট থাকতো। সৈন্য বিভাগে থাকতো- কোট্টপাল (কোটাল), মহাব্যুহপতি, নৌবলাধ্যক্ষ, বলাধ্যক্ষ, মহাপুলপতি, মহাগণস্থ, মহাবলাকোষ্ঠিক ও বৃদ্ধধানুষ্ক। এছাড়া হাতি, ঘোড়া, গরু, মহিষের অধ্যক্ষও ছিলো। সেন আমলে কিছু রাজপুরুষ- একসরক, মহকটুক, শান্তবিক, তদানিযুক্তক ও খণ্ডপাল পদে নিযুক্ত থাকতেন।[৬৬]

অর্থনীতি

সেনযুগের অর্থনীতিও কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ওপর গড়ে ওঠেছিলো। সাধারণ জনগণের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। ভূমির উপর রাজার অধিকার থাকলেও জনগণ এর মালিক বা রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার পেতো। ভূমি ক্রয় বা দান করতে গেলে রাজার নিকট আবেদন ও অনুমতি লাগতো। দলিল দস্তাবেজের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ ছিলো। উৎপন্ন ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসেবে রাজাকে দিতে হতো। ভূমি পরিমাপের পদ্ধতি ছিলো পালযুগের মতোই। লক্ষ্মণ সেনের সুন্দরবন লিপিতে উল্লিখিত ভূমি পরিমাপের চিত্র এরূপ-

১২ অঙ্গুলি = ১ হাত, অথবা, ৪ কাক/কাকিনী/কানি = ১ উয়ান (চট্টগ্রামে- কানি, রাঢ়ে- কান প্রচলিত)

৩২ হাত = ১ উম্মান (উয়ান)   ৫০ উয়ান = ১ আড়ি

৪ আড়ি = ১ দ্রোণ

আর একটি নমুনা- ৪ কুড়ব = ১ প্রস্থ

৪ প্রস্থ = ১ আঢ়া (আঢ়বাপ)

৪ আঢ়া = ১ দ্রোণ

অর্থাৎ ৬৪ কুড়বে এক দ্রোণ এবং যেহেতু ৮ দ্রোণে ১ কুল্যবাপ, সেহেতু ১ কুল্যবাপ ৫১২ কুড়বের সমান। সাধারণত বলা যায়- ১ কুল্যবাপ প্রায় ১৫ বিঘার সমান। তখন ১ কুল্যবাপ ভূমির মূল্য ছিলো উর্বরতার ভিত্তিতে ৩ থেকে ৪ দীনার। অমরকোষের মতে, ১ দীনার সমান ১ নিষ্ক এবং ১ নিষ্ক সমান ৪ সুবর্ণকে বোঝায়।[৬৭] নদীবহুল বাংলায় জমিতে প্রচুর ধান, গম, পাট, আখ, তুলা, সরিষা, নারকেল, সুপারি উৎপন্ন হতো। কৃষকের ছাগল, গরু, ভেড়া, ঘোড়া ও হাতির সমাদর করতো। কৃষকের অবস্থা মোটের ওপর সচ্ছল ছিলো। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সেন আমল সমৃদ্ধশালী ছিলো। বাংলার কাপার্স ছাড়াও বিভিন্ন শিল্পজাত দ্রব্য দূর-দূরান্তে প্রেরণ করা হতো। বাংলার সঙ্গে স্থল ও জলপথে বিদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিলো। তাম্রলিপ্ত (মেদিনীপুর) ও সপ্তগ্রাম বহির্বাণিজ্যের জন্য ছিলো প্রধান দুটি বাণিজ্যিক বন্দর। এ সকল স্থান হতে জলপথে সিংহল, যবদ্বীপ, চীন দেশে পণ্য রপ্তানি করা হতো। স্থলপথের মাধ্যমে আসাম, তিব্বত, নেপাল ও ভুটানে বণিকদের যাতায়াত ছিলো।

সমাজ

সেনরা ছিলেন ব্রাহ্মণ। বাংলায় ব্রাহ্মণদের আগমন মৌর্যযুগে (আনু. ৩২০-১৮৭খ্রি.পূর্ব) হলেও গুপ্তযুগে (আনু. ৩২০-৬০০ খ্রি.) অনুপ্রবেশের ধারা ব্যাপকতর হয়। গুপ্তযুগের পূর্বে এদেশে ব্রাহ্মণদের বিশেষ প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। পরবর্তীকালে এ সেন যুগেই হিন্দু ব্রাহ্মণ্য মতবাদ, শাস্ত্রাচার, কৌলিন্য প্রথা ও লোকাচার সমাজকে জেঁকে ধরে। কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, কন্যাসন্তান হত্যা, দেবদাসীকরণ, সতীদাহ, সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধকরণ, ধর্মীয় আচারের বাড়াবাড়ির কারণে সমাজে ভাঙন, বিশৃঙ্খলা, অসন্তোষ ও নির্মমতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। সমাজে কৌলিন্য প্রথা এনেছিল এক অসামান্য জটিলতা। এ প্রথা বিশেষ করে প্রচলিত ছিল বাঙলা ও মিথিলাতে। কিংবদন্তি অনুযায়ী বাঙলাদেশে কৌলিন্য প্রথা সৃষ্টি করেছিলেন বল্লালসেন, আর মিথিলাতে কর্ণাটবংশীয় শেষ রাজা হরিসিংহ।[৬৮]

বল্লাল সেনকেই (১১৫৮-১১৬৯খ্রি.) সাধারণত কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তক বলা হয়ে থাকে। তবে এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কুলীন ব্রাহ্মণদের বংশীয় বিবেচনায় এ কৌলিন্য প্রথার উদ্ভব ঘটে। কারণ হিন্দুর চতুর্বর্ণীয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) সমাজে ব্রাহ্মণরাই ছিলেন মান-মর্যাদা, বিদ্যা-শিক্ষা ও প্রভাব-প্রতাপে শ্রেষ্ঠ। উত্তর ভারত থেকে এরা বাংলায় এসে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে। যতদূর জানা যায়, রাজা আদিসুর তাঁর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করার জন্য কান্যকুব্জ রাজার কাছে ৫ জন ব্রাহ্মণ চেয়ে পাঠান। প্রেরিত ৫ জন ব্রাহ্মণের গোত্র পরিচয় নিম্নরূপ–

১. ভট্টনারায়ণ – শাণ্ডিল্য গোত্র

২. দক্ষ – কশ্যপগোত্র

৩. ছান্দড় – বাৎস্যগোত্র

৪. শ্রীহর্ষ – ভরদ্বাজগোত্র

৫. বেদগর্ভ – সাবর্ণগোত্র

এ ৫ জন ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক গৌড়রাজ্যে এসে প্রভূত উপহার গ্রহণ করে পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করেন। রাজমহিষীর পুত্র হলে রাজা খুশি হয়ে এ ৫ জন ব্রাহ্মণকে ৫টি গ্রাম (পঞ্চকোটি, কামকোটি, হরিকোটি, কঙ্কগ্রাম ও বটগ্রাম) দান করেন। এ ৫ গ্রাম জনবসতি স্থাপনের পর ৫ ব্রাহ্মণের মোট ৫৬ জন সন্তান হয়। এ ৫৬ থেকেই ৫৬ গাঁইয়ের (গোত্র চিহ্নিত) জন্ম। এদের হতে পরবর্তীকালে ৭ শত ঘর ব্রাহ্মণ সৃষ্টি হয়। তখন থেকে এ ব্রাহ্মণদের 'সপ্তশতী ব্রাহ্মণ' নামে অভিহিত করা হতো। বল্লাল সেন প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথায় কুলীন ব্রাহ্মণদের ৯টি গুণ থাকতে হতো।

এ ৯টি গুণ হলো- ১. আচার, ২. বিনয়, ৩. বিদ্যা, ৪. প্রতিষ্ঠা, ৫. তীর্থদর্শন, ৬. নিষ্ঠা, ৭. আবৃত্তি, ৮, তপস্যা, ৯. দান।[৬৯]

ব্রাহ্মণ্য গাঁইয়ের ভিত্তিতে কুলীনদের আবার মুখ্যকুলীন, গৌণকুলীন ও শ্রোত্রিয়- এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। মুখ্যকুলীনের মধ্যে- বন্দ্যো, চট্ট, মুখটি, ঘোষাল, পুতিতুণ্ড, গাঙ্গুলী, কাঞ্জীলাল ও কুন্দলাল। আর গৌণকুলীনের মধ্যে- রায়ী, গুড়, মাহিন্ত, কুলভী, চৌতখণ্ডি, পিপ্পলাই, গড়গড়ি, ঘণ্টাসরী, কেশরকোনা, দিমসাই, পরিহল, হাড়, পিতমুণ্ডী ও দীর্ঘতি অন্যতম। এছাড়া বাকি ব্রাহ্মণরা শ্রোত্রিয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এ শ্রোত্রিয়রা আবার ৩ উপশ্রেণিতে বিভক্ত; যথা- ১. সিদ্ধ শ্রোত্রিয়, ২. সাধ্য শ্রোত্রিয়, ৩. কাষ্ঠ শ্রোত্রিয়।[৭০] কৌলিন্য মর্যাদার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণগণ আবার ৫ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। যথা- ১. কুলীন, ২. শ্রোত্রিয়, ৩. বংশজ, ৪. গৌণ, ৫. পঞ্চগোত্র বর্হিভূত সপ্তশতী সম্প্রদায়।

'ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে পাওয়া যায়- আদি ব্রহ্মার মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, হাত থেকে ক্ষত্রিয়, উরুদেশ থেকে বৈশ্য এবং পায়ের পাতা থেকে শূদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। বল্লাল সেন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করে বাঙালি হিন্দু সমাজকে চতুর্বর্ণীয় শ্রেণিতে নির্দিষ্ট করে দেন। এছাড়াও অন্যান্য জাতির মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের ওপর বিধান জারি করেন। এতে করে সমাজে গৌরীদান ও বাল্যবিবাহের প্লাবন শুরু হয়। পুণ্যের উন্মাদনায় অপকর্মে- অজাচারে সমাজ ভরে যায়। কারণ এ বাল্য বিবাহের কারণেই মূলত বিধবার সংখ্যা বেড়ে যায়। আর এ অসংখ্য বিধবার চারিত্রিক শুদ্ধতা রক্ষার জন্য সতীদাহ প্রথার মতো অমানবিক বিষয়ের উদ্ভব ঘটে। আবার বল্লাল সেনের কোপানলে পড়েই বণিক বল্লভানন্দ শেঠ উত্তম সংকর থেকে বিচ্যুত হয়ে মধ্যম সংকরে পতিত হন। কারণ তিনি বল্লালসেনের দাবি মতো দেড়কোটি স্বর্ণ মুদ্রা দিতে অস্বীকার করেন। তাকে জব্দ করতেই মূলত বল্লভানন্দের ভাগ্নে মণিদত্তের স্বর্ণ চুরির বিচার করেন। অর্থাৎ ব্রাহ্মণ কুন্দনের সোনার ধেনু থেকে তৈরি ঢেঁপুতে খাঁদ থাকার অপরাধে 'স্বর্ণ বনিক' জাতিকে উত্তম সংকর থেকে নামিয়ে মধ্যম সংকরে দেয়া হয়। এতে কররে তারা পৈতা ধারণের অধিকার হারায়।[৭১]

অন্যদিকে তিনি কৈবর্ত জাতির প্রতি অনুগ্রহ করে তাদের উপরের স্তরে উন্নীত করেন। ব্রাহ্মণরা মাত্র ৯টি বর্ণের মানুষের হাত থেকে খেতেন। এদের বলা হতো নবশাখা; যথা- তিলি, তাঁতি, মালাকার, সদ্‌গোপ, নাপিত, বারুই, কামার কুমার ও ময়রা। এছাড়া 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' বর্ণিত জাতি উপজাতিসমূহ সেন রাজত্ব কালেও বিদ্যমান ছিলো। যেমন-

১. উত্তম সংকর – করণ, অম্বষ্ঠ, উগ্র, মগধ, গন্ধবণিক, কাংস্যবণিক, শঙ্খবণিক, কুম্ভকার, তন্তুবায়, কর্মকার, সদগোপ, দাস, রাজপুত, নাপিত, মোদক, বারুজীবী, কৈবর্ত, সুত, মালাকার, তাম্বুলি, তৈলক প্রভৃতি।
২. মধ্যম সংকর – তক্ষ, রজক, স্বর্ণকার, সুবর্ণ বণিক, আভীর, ধীবর, শৌণ্ডিক, নট, শবক ও জালিক প্রভৃতি।
৩. অন্ত্যজ – গৃহি, কুড়ব, চণ্ডাল, বাদুর, চর্মকার, ঘট্টজীবী, ডোম, বাগদি, দোলবাহী ও মল্ল।

এছাড়া ম্লেচ্ছ জাতি হিসেবে- পুলিন্দ, কক্কস, যবন, খস, সৌম্য, কম্বোজ, শবর ও খর উল্লেখযোগ্য। উপর্যুক্ত শ্রেণিকরণ করা হয়েছে ৩ ভাবে- (ক) বংশগত/বৃত্তিগত (খ) কর্মগত (গ) নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠীগত।

আবার কায়স্থ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলো। যথা- ১. কুলীন ও ২. মৌলিক। এ মৌলিক আবার সিদ্ধ ও সাধ্য উপশ্রেণিতে বিভক্ত।

১. কুলীন – ঘোষ, বসু, মিত্র।
২. সিদ্ধমৌলিক – দে, দত্ত, কর, সেন, সিংহ, দাস, গুহ, পালিত।

৩. সাধ্যমৌলিক – সোম, রুদ্র, পাল, নাগ, ভঞ্জ, বিষ্ণু, ভদ্র, রাহা, কুণ্ড, সুর, চন্দ্র, নন্দী, শীল, নাথ, রক্ষিত ও আইচ। এদের ৭২ ঘর কায়স্থই 'বোহাত্তরিয়া' নামে পরিচিত।

গৌরীদান ও বাল্যবিবাহ বাংলায় প্রবর্তন করেন নবাগত কনোজিয়া ব্রাহ্মণগণ।[৭২] যদিও পুরাণে, রামায়ণে, মহাভারতে গৌরীদান ও বাল্য বিবাহের উল্লেখ নেই, তথাপি সেন যুগে ব্রাহ্মণগণ মনগড়া ভাবে শ্লোক রচনা করে একে শাস্ত্রাচারে পরিণত করে তোলেন। গৌরীদানের মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও পুণ্যের কথা ফলাও করে প্রচার করা হয় ধর্মের বাতাবরণে। তাই বলা হয়- ৮ বছর বয়সী কন্যাকে বিয়ে দিলে- 'গৌরী' ৯ বছর বয়সীকে 'রোহিনী' এবং ১০ বছর বয়সীকে- 'কুমারী' বলা হতো। তবে 'গৌরীদানকেই' উত্তম ভাবা হতো। এছাড়া শাস্ত্রের নামে প্রচার করা হয়- কন্যাকে অবিবাহিত অবস্থায় রজস্বলা দেখলে পিতা-মাতা ও জেষ্ঠ ভ্রাতাকে নরকগামী হতে হয়। ভ্রূণ হত্যার পাপে তারা লিপ্ত হয়। আর যে ব্রাহ্মণ সে কন্যাকে বিয়ে করে সে হয়- অসম্ভাষ্য, অপাংক্তেয় ও বৃষলীপতি। সে কন্যাকে বলে বৃষলী।[৭৩]

এর ফলে বাঙালি হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহের ধূম পড়ে যায়। কুল রক্ষা করতে গিয়ে অনেক কন্যার পিতা ঘরবাড়ি, জমিজমা হারান, সমাজে পতিত হন। কন্যা দায়গ্রস্ত পিতা যেন-তেন প্রকারে মুমূর্ষু ব্রাহ্মণ বৃদ্ধের সঙ্গে নাবালক কন্যাকে বিয়ে দিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এতে লোভী ব্রাহ্মণগণ একদিকে যেমন টাকার লোভে বিয়ে ব্যবসা শুরু করেন তেমনি অন্যদিকে অধিকহারে বিধবার সংখ্যা বাড়তে থাকে। অল্পবয়সী বিধবাগণ অনেক সময় বিপথগামী হয়ে পতিতায় পরিণত হয় এবং সামাজিক অনাচার বাড়ে। এর ফলে সমাজপতিগণ সমাজের সম্মান বজায় রাখতে 'সতীদাহ' প্রথা প্রবর্তন করে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১খ্রি.) তাঁর সমকালে হুগলি, নদীয়া, যশোর, বরিশাল ও ঢাকা অঞ্চলে বহু বিবাহের যে তালিকা তৈরি করেছিলেন, তা ছিলো রীতিমতো ভয়াবহ। হুগলী জেলার ৫৫ বছর বয়সী ভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিয়ে করেছিলেন ৮০টি। আর ৬৪ বছর বয়সী ভগবান চট্টোপাধ্যায় বিয়ে করেছিলেন ৭২টি।[৭৪]

এ রকম বহু প্রমাণ ও তথ্য পাওয়া যায়। এ বাল্যবিবাহ ও গৌরীদানের ফলে ক্ষতি ও যন্ত্রণার ভুক্তভোগী হতো নারী সমাজ। বিবাহিত ও বৈধব্য জীবনে এদের যন্ত্রণার শেষ ছিল না। যার উ্বল দৃষ্টান্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৮৯৪-১৯৫০খ্রি.) 'পথের পাঁচালী' (১৯২৯খ্রি.)-র ইন্দির ঠাকুরুণ। বল্লাল সেন কর্তৃক প্রবর্তিত প্রায় ৭ শত বছরের (১১৫৮-১৮৫৬খ্রি.) এ বল্লালী বালাই বাংলার সমাজকে কলুষিত করে ফেলে। বিদ্যাসাগরের ঐকান্তিক ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে ১৮৫৬ খ্রি. ১৬ জুলাই ভারতে বিধবা বিবাহের প্রচলন ঘটে। এ বল্লালী বালাই বিদ্যাসাগরকে দূর করতে হয়।

সতীদাহ প্রথা প্রচলনের জন্য গৌরীদান, বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহই দায়ী। কারণ স্বামী মারা গেলেই তার স্ত্রীগণ অসহায় হয়ে পড়তো। কঠিন বৈধব্যব্রত অনেকে পালন করতে চাইতো না। আবার বয়সের দোষে, টাতগৃহ ও পিতৃগৃহের যন্ত্রণায় অনেকে বিপথগামী হয়ে কুলে কলঙ্ক দিতো। বৈধব্য ব্রতের ব্যর্থতায় সমাজপতিগণ সতীদাহ বা সহমরণ প্রথার প্রবর্তনে উৎসাহ পান। 'সতী' হবার অশেষ পুণ্য ও অক্ষয় স্বর্গলাভের কথা প্রচার করা হয়। এতে কেউ কেউ উৎসাহ পেলেও অধিকাংশই অনিহা প্রকাশ করতো। তখন ব্রাহ্মণ, আত্মীয়রা জোর করে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীদের নিক্ষেপ করতো। সহমরণ প্রথার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়- মহাভারতে মাদ্রীর মাধ্যমে। তবে সে নিজের অপরাধবোধ থেকেই তা করে।[৭৫] এরপর গুপ্তযুগে (আনু.৩২০-৬০০খ্রি.) রাজা ভানুগুপ্তের সামন্ত ভোজ রাজা যুদ্ধে নিহত হলে তার স্ত্রীকে সহমৃতা হতে দেখা যায়। তবে সমাজে তখন এটি সেন আমলের মতো প্রথায় পরিণত হয়েছিল না। এর বিভীষিকাময় পরিস্থিতির অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার। তিনি ৭টি সতীদাহ প্রত্যক্ষ করেছিলেন।[৭৬] অসহায় নারীর গগণবিদারী আর্ত-চিৎকার, অনুনয়-বিনয় ও কাকুতি-মিনতি দেখে

বেদনার্ত হয়েছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩খ্রি.)। তাঁর সাহস, উদ্যোমের ফলেই মূলত ১৮২৯ খ্রি. ৪ ডিসেম্বর ভারতবর্ষে সতীদাহ প্রথার বিলুপ্তি ঘটে এবং বাংলার বিধবা নারীগণের জীবন রক্ষা পায়।

দেবদাসী প্রথা সেন আমলে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতে এ প্রথা চলে আসলেও ব্রাহ্মণদের প্ররোচনায় তা বহুগুণ বেড়ে যায়। নৃত্যগীতের মাধ্যমে দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধান, পুরোহিত ও সমাজপতিদের রিরংসা মেটাতেই মূলত এ প্রথা গড়ে ওঠে। ওড়িশার মন্দির, মুলতানের সূর্য মন্দির, তাঞ্জোরের মন্দির, সোমনাথ মন্দির, ত্রিবাঙ্কুরের মন্দির ও কেরোলাপুরম মন্দিরে অসংখ্যা দেবদাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া উত্তর বঙ্গের বানগর মন্দির, প্রদ্যুনেশ্বেরের মন্দিরে দেবদাসীর উল্লেখ পাওয়া যায়। সাত ভাবে এদের সংগ্রহ করা হতো; যথা- দত্তা, হৃতা, বিক্রেতা, ভৃত্যা, ভক্তা, সালংকার ও গোপিকা বা রুদ্র গণিকা।

সেন যুগে সমাজে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এতে বৌদ্ধ ধর্ম অস্তিত্ব সংকটে পড়ে। শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম সমাজে প্রসার লাভ করে। বৈদিক যাগযজ্ঞ, স্মৃতি সংহিতা ও শাস্ত্রের প্রাধান্য বেড়ে যায়। রক্তের বা ফুলের বিশুদ্ধতা রক্ষায় চতুর্বর্ণীয় ব্যবস্থা আরোপ করা হয়। সমাজে মানুষের জীবন-যাপন কঠোর হয়ে পড়ে। মধ্য ও নিম্নশ্রেণির সম্মান, মান-মর্যাদা লোপ পায়। অন্যদিকে উচ্চ শ্রেণির মধ্যে ভোগ-বিলাস, দুর্নীতি ও ব্যভিচার বেড়ে যায়। বর্ণভেদ ও শ্রেণিভেদ দ্বারা জনগণের নৈতিক চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখা হয়। এতে সমাজে উচু-নিচু, অভিজাত-অস্পৃশ্য, হিন্দু-বৌদ্ধদের মাঝে ঘৃণা ও দ্বন্দ্ব বেড়ে যায় এবং সমাজের ভাঙন অনিবার্য হয়ে ওঠে। লক্ষ্মণ সেনের এক রানী বল্লভার ভাই কুমারদত্ত কর্তৃক স্বর্ণকার বধূ মাধবীর ওপর অত্যাচারের ঘটনা এর প্রমাণ বহন করে।[৭৭] এ সময় শেখ জালালউদ্দিন তাব্রিজীর প্রভাবে বাংলায় ইসলাম ধর্মের প্রসার ঘটতে শুরু করে।

সংস্কৃতি

সেনযুগের শাসকগণ সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেন যুগে রচিত হয় জয়দেবের- গীতগোবিন্দ, ধোয়ীর- পবনদূত, হলায়ুধ মিশ্রের- সেক শুভোদয়া, রাজা বল্লাল সেনের- অদ্ভুত সাগার ও দানসাগর প্রভৃতি। এছাড়া রাজা লক্ষ্মণ সেন, উমাপতি, শরণ ও সোবর্ধন ছিলেন সে যুগের খ্যাতিমান সাহিত্যিক। সদুক্তিকর্ণামৃত সেনযুগের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিল্প ও স্থাপত্যে সেনযুগ উৎকর্ষ লাভ করে। শূলপাণি ছিলেন সেনযুগের একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। বিদ্যুৎপ্রভা ও শশীকলা নামে দুই বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর উপস্থিতি লক্ষ্মণ সেনের দরবারকে গৌরবান্বিত করেছিলো। সেন যুগে বাঙালির খাদ্য তালিকায় ছিলো- ভাত, মাছ, মাংস, দুধ, দই, ক্ষির, ঘি, সবজি ও ফলমূল। সুরা পান নিষিদ্ধ হলেও তা অনেকে মানতো না। নারী ও পুরুষের বাঙালি পোশাকে তেমন চাকচিক্য ছিল না। কিন্তু বিত্তবান ও রাজ পরিবারে এর ব্যতিক্রম ছিল। নারী ও পুরুষ উভয়ে অলংকার ব্যবহার করতো। প্রসাধনী হিসেবে আলতা, সিঁদুর, চন্দন ও কর্পূরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। আপ্যায়নে পানের প্রচলন ছিল। সেন যুগেও সমাজে নানা রকম খেলাধুলা, আমোদ-প্রমোদ ও ধর্মীয় উৎসব প্রচলিত ছিল। জনসাধারণ নাচ-গান উপভোগ করতো। দাবা, পাশা, কুস্তি, শিকার ও নৌকা বাইচ খেলার প্রচলন ছিলে। পূজা-পার্বণ হিসেবে মাঘে- শ্রীপঞ্চমী, ফাগুনে- দোলপূর্ণিমা, ও বাসন্তী পূজা, চৈত্রে- চড়ক পূজা, বৈশাখে- বাস্তুপূজা, জ্যৈষ্ঠে- জামাই ষষ্ঠী, আশ্বিনে- দুর্গা পূজা, অগ্রহায়ণে- নবান্ন ও পৌষপার্বণ প্রচলিত ছিল। এসবের সঙ্গে বাঙালি হৃদয়ের আত্মিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

এগারো

সালতানাত যুগে বাংলা

মুসলমানগণ এ ভারতবর্ষ সাড়ে পাঁচশত বছর (১২০৪-১৭৫৭খ্রি.) শাসন করেন। সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক হতে ইব্রাহিম লোদীর শাসনকালে মধ্যবর্তী ৩২০ বছরের (১২০৬-১৫২৬খ্রি.) শাসনকালকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বলা হয় সালতানাথ যুগ। এর মধ্যে ৫টি রাজবংশ রয়েছে। যেমন- মামুলক বা দাসবংশের ৮৪ বছরের (১২০৬-১২৯০খ্রি.) ১১ জন শাসক, খলজী বংশের ৩০ বছরের (১২৯০-১৩২০খ্রি.) ৪ জন শাসক, তুঘলক বংশের ৯৩ বছরের (১৩২০-১৪১৩ খ্রি.) ৯ জন শাসক, সৈয়দ বংশের ৩৭ বছরের (১৪১৪-১৪৫১খ্রি.) ৩ জন শাসক এবং লোদী বংশের ৭৫ বছরের (১৪৫১-১৫২৬খ্রি.) ৩জন শাসকের শাসনামল। এ দীর্ঘ সালতানাত যুগের শাসনামলে উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন- কুতুবউদ্দিন আইবক (১২০৬-১২২০খ্রি.), গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-১২৮৭খ্রি.), আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬খ্রি.), গিয়াসউদ্দিন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫খ্রি.) ও ফিরোজ শাহ তুঘলক (১৩৫১-১৩৮৮খ্রি.) প্রমুখ। এদের সুযোগ্য নেতৃত্বেই মূলত ভারতবর্ষে মুসলিম রাজত্বের ভিত সুদৃঢ় হয়। প্রশাসন, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ ঘটে। অন্যদিকে দিল্লীর তুঘলক বংশের (১৩২০-১৪১৩খ্রি.) সমসাময়িক কালে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমল শুরু হয়। ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৫০খ্রি.) সোনার গাঁয়ের সিংহাসনে আরোহনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সুলতানী আমলের যাত্রা শুরু হয়। এবার সালতানাত যুগের প্রশাসন, সমাজ, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রশাসন

এ যুগে রাষ্ট্র পরিচালনা হতো ধর্মের ভিত্তিতে (Theocracy)। যদিও কুরআনকে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনার সংবিধান ভাবা হতো, তবু সুলতানের আদেশই ছিলো আইন। রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ চূড়ায় ছিলেন সুলতান। উত্তরাধিকারী নির্বাচনের বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকলেও সুলতানের ইচ্ছা ও অভিজাত বর্গের মতামত এতে প্রাধান্য পেতো। 'মজলিসে খালওয়াত' নামক পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করেই সুলতান রাজ্য চালাতেন। উজির বা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান কর্তাব্যক্তি। প্রশাসনিক দপ্তর সমূহের নাম হলো-

১. দিওয়ানে রিসালাত বা আপীল বিভাগ
২. দিওয়ানে আরজ বা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ
৩. দিওয়ানে বন্দেগান বা ক্রীতদাস বিভাগ
৪. দিওয়ানে কাজী বা বিচার ডাক বিভাগ
৫. দিওয়ানে আমীর কোহী বা কৃষি বিভাগ
৬. দিওয়ানে খয়রাত বা দানসত্র বিভাগ
৭. দিওয়ানে ইনসা বা যোগাযোগ বিভাগ
৮. দিওয়ানে ইসতিহকাক বা পেনশন বিভাগ

এসব বিভাগ ছাড়াও কিছু নিম্নপদস্থ বিভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা-

১. মুসতানাফিয়ে মামলিক বা প্রধান হিসাব নিরীক্ষক
২. আমীর-ই-বাহর বা জাহাজ নিয়ন্ত্রণকারী
৩. বখসিয়ে ফৌজ বা সৈনিকের বেতন দাতা
৪. নায়েবে উজিরে মামলিক বা সহকারী উজির

রাজস্ব বিভাগ

এ আমলে রাষ্ট্র বিভিন্ন উৎস হতে রাজস্ব লাভ করতো। সাধারণত এক পঞ্চমাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা ছিল। রাজস্বের উৎসগুলো হলো-

১. আল গনিমাহ্ বা যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য
২. যাকাত বা মুসলিমদের থেকে প্রাপ্য
৪. খালসা বা খাস জমি হতো আদায়কৃত ভূমি কর
৫. জিজিয়া বা অমুসলিমদের জান-মাল নিরাপত্তা বাবদ কর

৩. খারাজ বা হিন্দু জমিদারদের দেয়া ভূমি কর

এছাড়া পণ্য শুল্ক, গৃহকর, গোচারণ ভূমিকর ও জল করের উল্লেখ পাওয়া যায়। আলাউদ্দিন খিলজী করের হার নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সময় উৎপন্ন দ্রব্যের শতকরা এক দশমাংশ কর আদায় করা হতো। এছাড়া কাজীউল কোজাত ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান। মুফতি, কাজী, কোতোয়াল ও পুলিশ কাজিকে তার বিচার কাজে সাহায্য করতো। সামরিক বাহিনী ছিলো তিনভাগে বিভক্ত। যথা- পদাতিক, অশ্বরোহী ও হস্তীযূথ বাহিনী। এছাড়া গোলন্দাজ বাহিনীও ছিল। প্রাদেশিক সরকারের প্রধান ছিলেন নায়েব-ই-সুলতান বা গভর্নর। প্রতিটি প্রদেশেই আবার শাসন, বিচার ও সামরিক বিভাগ থাকতো। মুকতা বা আমীরদের অধীন থাকতো ক্ষুদ্র প্রদেশ। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তুঘলকের সময় সমগ্র রাজ্য মোট ২৩টি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রদেশ থেকে রাজস্ব কেন্দ্রে পাঠানো হতো।

সমাজ

সুলতানী আমলে হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণির মধ্যে অভিজাত, জ্ঞানী-গুনীগণ বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা পেতেন। সমাজে বহু বিবাহ প্রচলিত ছিলো। সতীদাহ প্রথার প্রচলন ছিলো, তবে তাতে সুলতানের অনুমতি লাগতো। হিন্দু-মুসলিম উভয় শ্রেণির অভিজাত নারীরা পর্দা প্রথায় অভ্যস্থ ছিলো। সমাজে মদ নিষিদ্ধ থাকার পরও এর বহুল প্রচলন ছিল। হিন্দুদের সঙ্গে মুসলিমদের সুসম্পর্ক ছিল। হিন্দুগণ বহু উচু রাজপদে অধিষ্ঠিত থেকে স্বাধীনভাবেই সম্মানের সঙ্গে জীবন যাপন করতো। যদিও ফিরোজ শাহ তুঘলকই প্রথম অভিজাত ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর আরোপ করেন। একে হিন্দুরা ভালো চোখে দেখতো না। আবার তিনি ধনী আলেম-উলামাদের ওপর যাকাত আরোপ করেন। এ সময় সমাজে দাস প্রথার বহুল প্রচলন ছিল। কারণ সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুতমিশ ও গিয়াসউদ্দিন বলবন প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। দাসদের রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত করা হতো। যুদ্ধবন্দী ও ক্রয়ের মাধ্যমে এদের সংগ্রহ করা হতো। অনেক দাস নিজ যোগ্যতার বলে সেনাপতি, রাজ জামাতা ও সুলতান পর্যন্ত হতে পারতো। সুলতান ফিরোজ শাহের ১ লক্ষ ৮০ হাজার দাস-দাসী ছিলো। সুলতান দাসদের ভরণ-পোষণ করতে ‘দিওয়ান-ই-বন্দেগান’ নামক আলাদা দফতর খুলেছিলেন। এছাড়া সুলতান ইলতুতমিশের কন্যা সুলতানা রাজিয়ার (১২৩৬-১২৪০খ্রি.) দিল্লীর সিংহাসনের ঘটনা নারীর সামাজিক মর্যাদার বিষয়টি উন্মোচিত করে। অভিজাত নারীরা শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত ছিলো।

অর্থনীতি

সুলতানী আমলে অর্থনীতির নির্দিষ্ট কোন কাঠামো ছিল না। তারপরও এ আমলে অর্থনীতির মূলভিত্তি ছিল কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য। কৃষিকাজে সুলতানগণ কৃষকদের জলসেচ, বীজ শস্য ও দাদন প্রদান করতেন। শস্যগুলো অনেক সময় রাজকীয় শস্যাগারে জমা রাখা হতো। দুর্দিনে তা জনগণের কাছে বিক্রী করা হতো। আলাউদ্দিন খিলজীর সময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বহু সংস্কার সাধিত হয়। তিনি বেতন কাঠামো প্রবর্তন করে বিশাল সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন। একজন সৈনিক ১টি ঘোড়া ও মাসিক ২০ টাকা বেতনের কম পেয়েও সচ্ছল জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়। তিনি খাদ্যশস্য ছাড়াও পশুপাখি, দাস-দাসী, ফুল-ফল, শাক-সবজি, টুপি, জুতা, থালা-বাসন, এমনকি সুঁচের দাম পর্যন্ত নির্ধারণ করে দেন। তাঁর সময়ে প্রবর্তিত দ্রব্যাদির বাজার মূল্য নিম্নরূপ :

দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য/টাকা	দ্রব্য	পরিমাণ	মূল্য/টাকা
গম –	১ মণ –	৭$\frac{১}{২}$ জিতল	গুড় –	১ সের –	$\frac{১}{৪}$ জিতল
যব/বার্লি –	১ মণ –	৪ জিতল	ঘি –	২$\frac{১}{২}$ সের –	১ জিতল
ধান –	১ মণ –	৫ জিতল	তেল –	৩ সের –	১ জিতল
মাস কলাই –	১ মণ –	৫ জিতল	উত্তম ঘোড়া –	১টি –	১২০ তঙ্কা
লবণ –	২$\frac{১}{২}$ মণ –	৫ জিতল	দুগ্ধবতী গাভী –	১টি –	৪ তঙ্কা
চিনি –	১ সের –	২$\frac{১}{২}$ জিতল	দুগ্ধবতী মহিষ –	১টি –	৬ তঙ্কা

[বাংলাদেশি ৬ পয়সা = ১ জিতল]

সুলতান এজন্য 'শাহানা-ই-মণ্ডি', 'দিওয়ান-ই-রিয়াসত' ও 'সরাই আদল' নামক কর্মচারী নিয়োগ দেন ব্যবসা-বাণিজ্য ও বাজার নিয়ন্ত্রণের জন্য। দুর্নীতি ও ওজনের চুরি প্রতারণা ঠেকাতে কঠোর আইন প্রবর্তন করা হয়েছিলো। ব্যবসায়ীদের কাপড় আমদানি বাবদ ২০ লক্ষ তঙ্কা পর্যন্ত আগাম দেয়া হতো। কৃষি ও বাণিজ্যের মতো শিল্পখাতেও সুলতানগণ শিল্পীদের উৎসাহ দিতেন। এসময় বাংলা, গুজরাট, ব্রোচ ও কালিকট ব্যবসার শিল্পকেন্দ্র গড়ে ওঠে। দিল্লীসহ বিভিন্ন কারখানায় সিল্ক, রেশমী ও মসলিন উৎপাদনে অসংখ্য তাঁতী নিযুক্ত হতো। তাঁতশিল্প, চিনি, কাগজ, জুতা, ধাতব, পাথর, অলংকার, অস্ত্র, আতর শিল্পের বিকাশ ঘটে। স্থল ও জলপথে বাণিজ্যিক লেনদেন হতো। জাহাজে করে মালয়, চীন, সিংহল, আরব দেশসমূহের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য বিনিময় হতো। আবার স্থলপথে আফগানিস্তান, পারস্য, তিব্বত, নেপাল, ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য চলতো। খেলনা, ঘোড়া, খচ্চর বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো। রেশমজাত বস্ত্র, মসলিন, মসলা, গাজা, আফিম রপ্তানি করা হতো। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরেও ধনী-গরীবের পার্থক্য ছিলো প্রকট। কৃষকের ওপরেই পরতো সমস্ত করের বোঝা। বিত্তশালীগণ ভোগ বিলাসে গা ভাসিয়ে দিতো। রাজবংশের উত্থান পতনে জনগণ তথা কৃষকের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন আসতো না।

সংস্কৃতি

সুলতানী আমলে সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ সাধিত হয়। তুর্কি সুলতান, আমীর, ওমরাহ ও প্রাদেশিক গভর্নরদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফারসি সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয় এবং সংস্কৃতের পরিবর্তে দরবারি ভাষা হিসেবে ফারসি গৃহীত হয়। আলাউদ্দিন খিলজীর সময়ে আমীর খসরু (ভারতের তোতাপাখি) ও আমীর হাসান (ভারতের সাদী) কাব্য রচনায় বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। এ সময় জিয়াউদ্দিন বারানীর– 'তারিখ-ই ফিরোজশাহী' গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত ভাষাও এ সময় বিশেষ বুৎপত্তি ঘটে। পার্থ-সারথী-মিশ্র-কর্ম-মীমাংসার উপর অনেকগুলো গ্রন্থ রচিত হয়। তার মধ্যে- 'হামিদ-মদ-মরদানা' 'প্রদ্যুমনালে যুদ্ধ' ও ও 'প্রতাপরুদ্র কল্যাণ' অন্যতম। রামানন্দ, কবিরের প্রচেষ্টায় যেমন 'হিন্দি' ভাষার উদ্ভব ঘটে তেমনি আবার মুসলমানদের উদ্যোগে 'উর্দু' ভাষার উৎপত্তি ঘটে। এ সময় রচিত হয় মালিক মুহাম্মদ জায়সীর 'পদুমাবদ বা পদ্মাবতী' উপাখ্যান। এ সময় ভারতবর্ষে সুফিবাদ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। আলাউদ্দিন খিলজীর সময় ভারতবর্ষে আসেন- বিখ্যাত দরবেশ শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়া ও শেখ রুকনউদ্দিন। এদের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে ইসলামের প্রচার-প্রসার ঘটে এবং ৪টি মতবাদ, যথা- চিশচিতয়া,

কাদেরিয়া, নকসবন্দিয়া ও মোজাদ্দেদিয়া প্রতিষ্ঠা পায়। অন্য দিকে হিন্দু ধর্মে রামনুজ, রামানন্দ, কবীর, নানক, ও শ্রীচৈতন্যের মাধ্যমে ভক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ভারতে হিন্দু মুসলমানের মধ্য সম্প্রীতির বন্ধনকে জোরদার করে তোলে।

স্থাপত্যশিল্পে সুলতানী যুগ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। মসজিদ, মাদ্রসা, খানকাহ, দুর্গ, সমাধি, মিনার তৈরিতে পারস্য স্থাপত্যের সমন্বয় ঘটে। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ মেলে দিল্লীর বিখ্যাত কুতুব মিনার, কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, নিজামুদ্দিন আওলীয়ার দরগাহ, আলাই দরওয়াজা, ফিরোজ শাহের সমাধি, অতলাদেবী মসজিদ, আদিনা মসজিদ, গৌড়ের ছোট সোনা ও বড় সোনা মসজিদ, আদিল শাহের সমাধি অন্যতম। শুধু সুলতান ফিরোজ শাহই নির্মাণ করেন ৩০টি রাজপ্রাসাদ, ২০০টি পান্থশালা, ৫টি জলকূপ, ৫টি চিকিৎসালয়, ১০টি স্নানাগার, ১০০টি সেতু ও ১০টি সমাধি। এছাড়া তিনি অসংখ্য বাগান তৈরি করে দিল্লী শহরকে সুস–িত করেন। আলাউদ্দিন খিলজীর দেবগিরি (দৌলতাবাদ) আক্রমণ থেকে প্রাপ্য ৬০০ মণ স্বর্ণ, ১০০ মণ রূপা, ৭ মণ মুক্তা, ২ মণ মূল্যবান পাথর এবং সুলতান ফিরোজ শাহের ৭০ হাজার তঙ্কায় তৈরি ১ জোড়া জুতার বিষয়টি তৎকালীন ঐশ্বর্য বিত্তবিলাসের চিত্র উন্মোচিত করে। এছাড়া সুলতান মুহাম্মদ বিন তুঘলক তাঁর আমীর ওমরাহদের গ্রীষ্ম ও শীতকালের জন্য প্রতিবছর ২ লক্ষ পিছ পোশাক উপহার দিতেন। ফিরোজ শাহ তুঘলকের আরিজ-ই-মুমালিক বশির তার মৃত্যুর সময় ১৩ কোটি তঙ্কা রেখে যান। আবার মালয়ার সুলতান গিয়াস উদ্দিনের হেরেমে ১৫ হাজার রমণী ছিল। তিনি এদের জন্য আলাদা শহর নির্মাণ করেন এবং সকল প্রকার কলাবিদ্যা, শিক্ষা ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করেন।

বারো

মুঘলযুগে বাংলা

মুঘলযুগ ভারতবর্ষের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা ঐতিহ্যবাহী ও ঐশ্বর্যময় শাসনামল। এ বংশের মোট ১৭ জন শাসক দীর্ঘ ৩১৭ বছর (১ম পর্ব ১৫২৬-১৫৪০খ্রি., ২য় পর্ব ১৫৪৫-১৮৫৮খ্রি.) ভারতবর্ষ শাসন করে এ দেশকে সারা বিশ্বের মাঝে সমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যে পরিণত করে তোলেন। এর মাঝে শূর বংশীয় ৩ জন শাসকদের ১৫ বছরের (১৫৪০-১৫৫৫খ্রি.) শাসনকাল মুঘলযুগের ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটায়। এর মধ্যে শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫খ্রি.) অন্যতম। সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি.), জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭খ্রি.), শাহজাহান (১৬২৭-১৬৫৮খ্রি.) ও আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭খ্রি.) এ ৪ জন সম্রাটের বলিষ্ঠ নেতৃত্বেই মূলত মুঘল সাম্রাজ্য ধন-ঐশ্বর্য, বিত্ত-বৈভবে, শক্তি-সামর্থ্যে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে জগৎজুড়ে খ্যাতি অর্জন করে। এ সাম্রাজ্য ছিল তৎকালীন পৃথিবীর ঈর্ষা ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এ বিশাল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় তুলে ধরা হল-

প্রশাসন

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামো বহু বিবর্তন ও সংস্কারের মাধ্যমে গড়ে ওঠে। সালতানাত যুগে (১২০৬-১৫২৬খ্রি.) বিশেষত শের শাহের (১৫৪০-১৫৪৫খ্রি.) শাসনামলে প্রশাসনের যে কাঠামো গড়ে ওঠেছিলো, তারই পরিমার্জিত রূপ ছিল মুঘল কাঠামো। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক প্রশাসনের শীর্ষে ছিলেন সম্রাট। তিনিই ছিলেন একাধারে সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক, ধর্মনেতা ও বিচারক। অর্থাৎ সম্রাটের কথাই ছিল আইন এবং তিনি ছিলেন জনগণের দণ্ড-মুণ্ডের অধিশ্বর। সম্রাটের পরেই ছিলেন ওয়াকিল বা ভকিল। তিনি সম্রাটের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করতেন। তার-এ পদের যথেষ্ঠ গুরুত্ব ছিল। আকবরের সময় কয়েক বছর বৈরাম খান এ পদে ছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দপ্তরসমূহ নিম্নরূপ-

দপ্তরের নাম	দপ্তর প্রধান	দপ্তরের নাম	দপ্তর প্রধান
১. অর্থনৈতিক বিভাগ	দিওয়ান বা উজির	৬. গণচরিত্র পর্যবেক্ষণ বিভাগ	মুহতাসিব
২. সামরিক বিভাগ	মীর বখশী	৭. অস্ত্র বিভাগ	মীর আতীস
৩. গৃহ বিভাগ	খান-ই-সামান	৮. গুপ্তচর ও ডাক বিভাগ	দারোগা-ই-ডাকচৌকি
৪. বিচার বিভাগ	কাজি	৯. মুদ্রা বিভাগ	রাজস্ব দারোগা
৫. ধর্মীয় ও দাতব্য বিভাগ	সদর-ই-সুদুর		

আকবরের রাজত্বকালে দিওয়ান বা উজির ছিলেন রাজ্যের প্রধান কর্মকর্তা। তিনি অর্থনৈতিক বিভাগ দেখাশোনা, রাজকোষ পরিদর্শন ও সমস্ত হিসাবপত্র নিরীক্ষা করতেন। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসনকর্তা হতে শুরু করে আমীর ও পাটোয়ারীর কর্মকাণ্ড পর্যবেক্ষণ করতেন। বিচার বিভাগের প্রধানকে বলা হতো কাজি-উল-কুজাত। তাকে অন্যান্য কাজি, মুফতি ও মীর আদল সহায়তা করতো। তবে সম্রাটও সপ্তাহে এক বা দুইদিন কিছু বিশেষ বিষয়ের বিচার করতেন। তবে তার বিচার করা পেশাদারিত্বের আওতায় ছিল না। সামরিক বিভাগের বিচারক- কাজি-ই-আসকার এবং গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পঞ্চায়েত। সামরিক বিভাগ সার্বিক দেখাশোনা করতেন- মীর বখশী। পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনীর সমন্বয়ে আরো বহু ধরনের কর্মচারী থাকতো। আবার ১৫৭১খ্রি. আকবর শাহবাজ খানকে 'মীর বখশী' পদে নিযুক্ত করে 'মনসবদারী' প্রথার প্রবর্তন করেন। সৈন্য সংখ্যার উপর কর্তৃত্বের মাপকাঠিতে ৬৬ প্রকার মনসবদার গড়ে ওঠে। সর্বোচ্চ পর্যায়ে ১০ হাজার সৈনিক এবং সর্বনিম্নপদে ২০ জন সৈনিক রাখার দায়িত্ব পেতো একজন মনসবদার। তবে প্রকৃত পক্ষে কার্যকর ছিল মাত্র ২৭টি মানসবদার। যুবরাজ ও বিশ্বস্তদের উপরের পর্যায়ে নিয়োগ দেয়া হতো।

বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য শাসন করতে প্রাদেশিক শাসন কাঠামো প্রবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। শাসনের সুবিধা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই সমগ্র সাম্রাজ্যকে আকবরের সময় ১৫টি, জাহাঙ্গীরের সময় ১৭টি এবং আওরঙ্গজেবের সময় ২১টি প্রদেশ বা সুবায় বিভক্ত করা হয়। প্রদেশ বা সুবার প্রধানকে বলা হতো প্রাদেশিক গভর্নর বা সুবাদার। প্রত্যেক প্রদেশের সুবাদারের অধীনে থাকতো একজন করে দিওয়ান, বখশী, সদর, আমিল, ফৌজদার, কতোয়াল, কাজি, বিতিকচি, পোতদার ও ওয়াকেয়া নবীশ। শের শাহের আমলে প্রদেশকে বলা হতো-সরকার ও পরগণা।

অর্থনীতি

মুঘল অর্থনীতির মূল ভিত্তিই ছিল কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায় বাণিজ্য। সম্রাটের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। এ রাজস্ব দুটি খাতে অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিকভাবে সংগ্রহ করা হতো। কেন্দ্রীয় রাজস্বের প্রধান উৎস হলো-ভূমি রাজস্ব, শুল্ক, টাকশাল, উত্তরাধিকার, যুদ্ধলব্ধ দ্রব্য ও জিজিয়া। রাজা টোডরমলের উদ্‌যোগে ভূমি ব্যবস্থা পুনর্গঠন করা হয়। রাজস্ব আদায়ের জন্য তিনি ৩টি বিষয়ের ওপর জোর দেন, যথা- ১. ভূমি জরিপ ও নির্ধারণ, ২. ভূমির শ্রেণিকরণ ও ৩. খাজনার হার নির্ধারণ। উর্বরা শক্তির ওপর ভিত্তি করে জমিকে মোট ৪ ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন- ১. পোলাজ বা বাৎসরিক উপযুক্ত, ২. পারাওটি বা স্বল্প অনাবাদি, ৩. চাষার বা ৩ বা ৪ বছর অনাবাদি এবং ৪. বানজার বা ৫ বছরের বেশি অনাবাদি ভূমি। প্রথম দুই ভূমির সমন্বয়ে আবার ভূমিকে- উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট- এ তিন পর্যায়ে ফেলা হতো। উর্বরতা ও শস্যের ধরন অনুযায়ী রাজস্ব নির্দিষ্ট ছিল। ফসলের এক-তৃতীয়াংশ খাজনা হিসেবে সম্রাটকে দিতে হতো। ফসল বা টাকায় রাজস্ব দেয়া যেতো। সম্রাট নগদ টাকায় রাজস্ব দেয়া অধিক পছন্দ করতেন।

আমালগুজার ছিলেন জেলা পর্যায়ে প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা। তাকে সাহায্য করতো- বিতিক্‌ছি, পোদ্দার, কানুনগো, পাটোয়ারি ও মোকাদ্দম। এ রাজস্ব পদ্ধতিতে রাষ্ট্র ও কৃষক উভয়েই লাভবান হতো। রাজস্ব আদায়কারী হিসেবে সম্রাট ও কৃষকের মাঝে কোন মধ্যবর্তী দালাল বা খাজনা সংগ্রাহক এজেন্ট ছিল না। সরকারি কর্মচারীগণ সততার সঙ্গে রাজস্ব সংগ্রহ করতো। জমিতে ধান, গম, যব, আখ, নীল, তিল, মটরশুটি, মসুর, সরিষা, সবজি ও ফলমূল উৎপন্ন হতো। সার, বীজ ও কৃষিযন্ত্র ক্রয়ের জন্য সম্রাট কৃষকদের 'তাকাভি' বা কৃষি ঋণ দিতেন। জলসেচের ব্যবস্থা করা হতো। অনেক সময় বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে সম্রাট কৃষকের রাজস্ব মওকুফ করে দিতেন। এতে করে কৃষক সমাজ ভূমি চাষাবাদে উৎসাহ পায় এবং কৃষিতে দ্রুত আয়ের পরিমাণ বেড়ে যায়।

এছাড়া সম্রাট আকবর রাজ্যের প্রতিটি শ্রমিকের কাজের ধরন ও দক্ষতা অনুযায়ী পারিশ্রমিক নির্ধারণ করে দেন। শ্রমিককে দক্ষতা অনুযায়ী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়য় শ্রেণিতে ফেলা হয়। যেমন-

শ্রমিক	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি
১. গিলকার (চুন মিস্ত্রি)	৭ দাম	৬ দাম	৫ দাম
২. সাঙ্গ-তারাস (পাথর কাটা)	৬ দাম	৫ দাম	×
৩. বিলদার (রাজ মিস্ত্রি)	$৩\frac{১}{২}$ দাম (গজ প্রতি)	৩ দাম	
৪. কাঠ মিস্ত্রি	৭ দাম	৬ দাম	৪ দাম
৫. চাপকান (কূপ খননকারী)	২ দাম (গজ প্রতি)	$১\frac{১}{২}$ দাম	১ দাম
৬. ঘর-খুড়	৪ দাম (শীতকাল)	৩ দাম (গ্রীষ্মকাল)	×
৭. কিস্ত তারাস (টালি প্রস্তুতকারী)	৮ দাম (১০০ ছাঁচের জন্য)	×	×
৮. কাঁচ কাটারু	১০০ দাম (দৈনিক)	×	×
৯. বাঁশ কাটারু	২ দাম (দৈনিক)	×	×
১০. ছাপ্পর বন্দর (ঘরামী)	৩ দাম	২ দাম	×
১১. আকবাশ (পানিবাহক)	৩ দাম	২ দাম	×

অর্থাৎ দিনে যে ২ দাম মুজুরি নিয়ে কাজ করতো, সে মাসে ৬০ দাম আয় করতো। মাসে ৬০ দাম সমান $১\frac{১}{২}$ টাকা এবং বছরে ১৮ টাকার সমান।[৭৮] ইবনে বতুতার সময়ে এদেশে ৩জন লোকের সারা বছরের খরচ ছিলো মাত্র ৮ দিরহাম বা ১টাকা। এ থেকেই বোঝা যায়, মুঘল যুগে নিত্যপণ্যের দাম কত সুলভ ছিল এবং জীবন যাত্রার মান কত সহজ, শান্তি ও আরামদায়ক ছিল।

মুঘল আমলে ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভারতবর্ষ প্রভূত উন্নতি লাভ করে। স্থল ও জলপথে ইউরোপ, আরব ও এশিয়ার প্রায় সমগ্রদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সময় রেশম ও মসলিন সারা বিশ্বে সুনাম অর্জন করে। বিদেশ হতে হাতির দাঁত, সোনা, মুক্তা, ঘোড়া, উট আনা হতো। আরবদেশের ঘোড়া ও আফ্রিকার দাসের কদর ভারতবর্ষে ছিল। ভারতবর্ষের ধন-ঐশ্বর্যের কথা শুনেই আরবদেশ ও ইউরোপ থেকে দলে দলে বণিক ও পর্যটকরা এ দেশে আসে ভাগ্য উন্নয়নের আশায়। মশোরেট (Monserrate) দাবি করেন, ১৫৮১ সাল নাগাদ লাহোর ইউরোপ বা এশিয়ার কোন নগরের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে ছিল না। পূর্ব ভারতের বেনারস, পাটনা, রাজমহল,

বর্ধমান, হুগলী, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি নগর অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। আগ্রা ও ফতেহপুরের মাঝখানবর্তী দীর্ঘ ১২ মাইলের স্তক ছিল, তা মানুষ খাদ্যদ্রব্য ও পণ্যতে এত পরিপূর্ণ থাকতো যে, একজনের মনে হতো সে সর্বদা বাজারের ভেতরেই রয়েছে। বাংলা, বিহার জম্মু কাশ্মীরে আখ ও নীল চাষের পাশাপাশি সুতা, রেশম ও তুলার চাষ হতো। ১৬০৪ বা ১৬০৫ খ্রি. দিকে তামাকের চাষ আরম্ভ হয়। দেশের অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ছিল- খনিজ পদার্থ, লবণ, চিনি, আফিম, মদ, বরফ, তামা ও লোহা। আবুল ফজলের মতে, আকবরের রাজত্বকালে রাজকীয় পরিবারের ছিল একশতেরও অধিক অফিস ও কারখানা, প্রত্যেকটি দেখতে একেকটি নগর বা একটি ছোটখাটো রাজ্যের মতো দেখাতো।[৭৯]

আবার ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার বলেছেন- দুর্গের মধ্যে কারিগরদের জন্য কারখানা বা শিল্পালয় নামে বড় বড় ভবন দেখা যায়। এক ভবনে একজন তত্ত্বাবধায়কের পরিচর্যায় সূচিকর্মকার, স্বর্ণকার, চিত্রশিল্পী, বার্ণিশকার, সূত্রধর, চর্মকার ও তাঁতীরা সিল্ক, বুটিদার রেশমী বস্ত্র দ্বারা মসলিন, পাগড়ি, কটিবন্ধ ও মহিলাদের পরিধানের পোশাক নিখুঁতভাবে করা হতো।[৮০] ব্যবসায়-বাণিজ্য স্থল ও জলপথে সম্পন্ন হতো। স্থলপথের বাণিজ্য দুটি পথে আনা-নেয়া হতো, যথা- লাহোর হতে কাবুল এবং মুলতান হতে কান্দাহার। জলপথের প্রধান বন্দরগুলো ছিলো সিন্ধুর লাহোর বন্দর, সুরাট, ব্রোচ, ক্যাম্বে, বেসিন, দেবল, গোয়া ও মালাবার বন্দরসমূহ। সবচেয়ে ব্যস্ত বন্দর ছিলো- কালিকট, কোচিন, নেগারপটম, সাতগাঁও, শ্রীপুর, চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁ। রপ্তানি দ্রব্যের ভেতর ছিলো- কার্পাস, মরিচ, নীল, আফিম, রেশম, চিনি ও বারুদ। আমদানিকৃত পণ্যের মধ্যে- ঘোড়া, সোনা-রূপা, ধাতব দ্রব্য, হাতির দাঁতে নির্মিত দ্রব্য, প্রবাল, তৈলস্ফটিক, ক্রীতদাস, ওষুধ, মূল্যবান পাথর, লবঙ্গ, জায়ফল, দারুচিনি, মৃগনাভি, বাদাম, পেস্তা, আপেল, নাসপাতি ও চীনামাটির জিনিসপত্র। পারস্য, তুরস্ক, মিশর, ইয়েমেন, পেগু, শ্যাম, সিংহল, আচেহ, মালদ্বীপ, জাপান, মালাক্কা, চীন, মক্কা, সমরকন্দ, বলখ, ইথিওপিয়া ও বোখরার সঙ্গে ভারতবর্ষের বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। শুল্ককর শতকরা সাড়ে তিনের অধিক ছিল না। সিল্ক, রেশম ও বস্ত্র শিল্পে পূর্ববঙ্গ, লাহোর, আগ্রা, ফতেহপুর, গুজরাট ও কাশ্মীর বিখ্যাত ছিল। এছাড়া পোতাশ্রয় গুলিতে নৌকা ও জাহাজ নির্মিত হতো।

সম্রাট আকবরের সময় ভারতবর্ষ খনিজ শিল্প, ধাতব শিল্প, লৌহশিল্প, স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করে। সম্রাটের কোষাগার ব্যবস্থাপনা, মূল্যবান পাথরের শ্রেণিকরণ, টাকশাল ব্যবস্থাপনা, স্বর্ণের পরিশোধন পদ্ধতি, মুদ্রা ব্যবস্থাপনা ও খনিজ শিল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি তৎকালীন অর্থনীতির সমৃদ্ধিকে ইঙ্গিত করে। রাজ্যে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা ও তাম্রমুদ্রা প্রচলিত ছিলো। এগুলো দিনার, দিরহাম ও দাম নামে পরিচিত ছিল। এসবের ভেতর নানা মানের আরো মুদ্রার প্রচলন ছিল। ভূমি পরিমাপের ক্ষেত্রে নল ও ইলাহী গজ ব্যবহৃত হতো। দেশের সমস্ত ভূ-সম্পত্তির মালিক সম্রাট। এছাড়া আমীর-ওমরাহদের মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করা হতো। এর জন্য অভিজাত সমাজে ভোগ বিলাসের মাত্রা বেড়ে যায়। ধনী ব্যক্তি ও বণিকরা ধন-সম্পদ, সোনা-দানা, টাকা-পয়সা মাটিতে পুতে রেখে গরীবের ভান ধরে থাকতো। সোনা-রূপা গলিয়ে অলংকার হিসেবে ব্যবহার করায় অর্থসম্পদ কোন লাভজনক বা উৎপাদনশীল খাতে পরিণত হয়নি। তাই প্রকৃত অর্থে ভারতবর্ষ গরীবই রয়ে যায়।[৮১] কারণ এতে করে ধনী, বণিক ও কৃষকের উৎসাহ হ্রাস পায়।

সমাজ

মুঘল আমলে সমাজে সাধারণত ৩ শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল, যথা- অভিজাত শ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও নিম্ন শ্রেণি। অভিজাত শ্রেণি যেমন শিক্ষা-দীক্ষা, মান-মর্যাদায় অগ্রগামী ছিল, তেমনি আবার ভোগ-বিলাস, মদ-নারীতে আকণ্ঠ নিম–িত ছিল। মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির অবস্থা ছিল মোটের উপর ভালো। সমাজে হিন্দু ও মুসলমানের সম্পর্ক সম্রাট আওরঙ্গজেবের পূর্ব পর্যন্ত সম্প্রীতিতে পূর্ণ ছিল। কারণ সম্রাট আকবরের উদারতা, রাজপুত নীতির কারণে

হিন্দু তথা রাজপুতদের মনে অসন্তোষ ছিল না। সম্রাট আকবরই ১৫৬৩ খ্রি. তীর্থযাত্রা কর ও ১৫৬৪ খ্রি. হিন্দুদের উপর চলে আসা আরোপিত জিজিয়া কর (ফিরোজ শাহ কর্তৃক আরোপিত) রোহিত করে দেন। গরু হত্যা নিষিদ্ধ করে দেন। বহু রাজপুতকে তিনি উচ্চ পদে নিয়োগদান করেন। এছাড়া তিনি ১৫৬২ খ্রি. আম্বরের রাজা বিহারীমলের কন্যা ও রাজা ভগবান দাসের বোন যোধাবাঈকে বিয়ে করেন। ১৫৭০ খ্রি. বিকানী ও জয়সলমিরের রাজকন্যাকেও বিয়ে করেন। অন্যদিকে আকবর তার পুত্র যুবরাজ জাহাঙ্গীরকে ১৫৮৬ খ্রি. রাজা ভগবানদাসের কন্যা ও মানসিংহের বোন মানবাঈয়ের সঙ্গে বিয়ে দেন। এছাড়াও জাহাঙ্গীর মেবারের রানা উদয় সিংহের কন্যা জগৎগোসাইকেও বিয়ে করেন। এমন বিয়ের মাধ্যমে সম্রাট আকবর হিন্দু রাজপুতদের আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ করতে সক্ষম হন। যদিও এ নীতি সম্রাট বাবুরের আমল থেকেই শুরু হয়। বাবুর ১৫২৭ বা ১৫২৮ খ্রি. চান্দেরীর হিন্দু রাজার মেদিনী রাওয়ের দুই কন্যার সঙ্গে হুমায়ুন ও কামরানের বিয়ে দেন। এ উদারতার ফলেই মুঘলরা রাজা বিহারীমল, ভগবানদাস, রাজা মানসিংহ, রাজা টোডরমল ও বীরবলের মতো বিজ্ঞ, দূরদর্শী ও সাহসীদের সেবা লাভ করেছিলো।

এছাড়া সমাজে বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ, সতীদাহ, দেবদাসী ও কন্যাসন্তান হত্যার মতো অমানবিক বিষয়গুলো প্রচলিত ছিল। সম্রাট আকবর দৃঢ়তার সঙ্গে কন্যা সন্তান হত্যা নিষিদ্ধ করেন এবং সতীদাহ প্রথা বিলোপের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। রাজা ভগবান দাসের পিতৃব্যপুত্র জয়মলের মৃত্যু হলে তার বিধবা স্ত্রী (উদয় সিংহের কন্যা) সতীদাহের 'সতী' হতে অস্বীকার করেন। এতে তার আত্মীয়রা জোর করে তাকে চিতায় দিতে চেষ্টা করে। সংবাদ পেয়েই আকবর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন এবং এতে বাধা প্রদান করেন।[৮২]

সতীদাহের জন্য সম্রাটের পূর্ব অনুমতির দরকার হতো। এছাড়া আকবর সতীদাহের নিবারণকল্পে 'পরিদর্শক' ও কন্যা সন্তান হত্যা বন্ধে- 'তুরবেগ' নামক কর্মচারী নিয়োগ দেন। মুঘল আমলের সতীদাহের প্রত্যক্ষ বর্ণনা দিয়েছেন পর্যটক ফ্রাঁসোরা বার্নিয়ার। এছাড়া মাঝে মাঝে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিতো। শাহজাহানের রাজত্বকালে দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে (১৬৩০-১৬৩২খ্রি.) এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এ সময় অনেক লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং মানুষকে বাধ্য হয়ে সন্তান বিক্রী ও মৃত গবাদি পশুর মাংস খেতে হয়েছিল।

মুঘল আমলে সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। সম্রাট ও অভিজাত মহলে একাধিক স্ত্রীর পাশাপাশি হেরেমে অসংখ্য বাদী বা উপপত্নী সংরক্ষণ করা হতো। ভবেশ রায় তাঁর 'জ্ঞানকোষ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- সম্রাট আকবরের সময় শাহী হেরেমে বাদীর সংখ্যা ছিল ৩ হাজার এবং জাহাঙ্গীরের সময় তা বেড়ে ৫ হাজারে উন্নীত হয়।[৮৩] আবার আবুল ফজলের মতে, আকবরের হেরেমে ৫ হাজার বেগম ও সেবিকা ছিল। এদের কঠোর সুরক্ষায় খোজাদের পাহারায় সংরক্ষণ, ভরণ-পোষণ করা হতো। রাজ পরিবারের বাইরের কেউ এখানে প্রবেশ করতে পারতো না। শাহজাহানের আমলে 'কাঞ্চবালা'[৮৪] প্রথা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। এদের বয়স, রূপ-গুণের ও কলাবিদ্যার উপর ভিত্তি করে ১৮০০ থেকে ২০০০ টাকা পর্যন্ত মাসোহারার ব্যবস্থা ছিল। 'সিন্ধুকী'[৮৫] নামক কর্মচারীদের মাধ্যমে দেশ-বিদেশ থেকে, উপঢৌকনের মাধ্যমে ও যুদ্ধবন্দী হিসেবে ক্রীতদাসী রূপে এদের সংগ্রহ করা হতো।

মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দু সমাজেও এ প্রথার দ্রুত প্রসার ঘটে। মুঘল আমলে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষ তেমন ছিল না। কারণ মুঘলরা হিন্দুদের কাছে আর বিদেশি না থেকে ক্রমশই ভারতীয় হয়ে ওঠেছিলো। তাছাড়া কবীর, রামানন্দ, নানক ও চৈন্যের মানববাদ ও ভক্তিবাদের জোয়ারে মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প জমাট বাঁধতে পারেনি। এছাড়া সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-ইলাহী' (১৫৭৮খ্রি.) ধর্মের প্রচলন এ বিষয়টিকে আরো প্রশস্ত রূপ দিয়েছিল। আওরঙ্গজেবের কারণে এ ধারা কিছুটা বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যে ন্যায়বিচার ছিল। এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ সম্রাট জাহাঙ্গীরের প্রবর্তিত ৬০টি সোনার ঘণ্টা ও ৬০ গজ লম্বা সোনার শিকল যুক্ত 'বিচার ঘণ্টা' বা 'Chain of Justice'.

সংস্কৃতি

মুঘল আমলে ভারতবর্ষ শিল্প সাহিত্য, শিক্ষা-দর্শন, স্থাপত্য-চিত্র ও সঙ্গীত শিল্প বিকাশের শীর্ষ শিখরে পৌছায়। এ ধারা সূচিত হয়েছিলো সম্রাট আকবরের উদারতা, মহানুভবতা ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে। আকবরের রাজদরবারের 'নবরত্নগণ' শিল্প সংস্কৃতির বিকাশে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন। এ 'নবরত্ন' বা নয় রত্নরা হলেন- ১. মির্জা আবদুর রহিম, ২. আবুল ফজল, ৩. মির্জা আব্দুল আজিজ, ৪. সভাকবি ফৈজী, ৫. বীরশ্রেষ্ঠ হুসায়েন খান, ৬. বাক্যবাগীশ আবুল ফাতাহ গিলানী, ৭. রাজস্ববিদ রাজা টোডরমল, ৮. হাস্যরসিক বীরবল ও ৯. সঙ্গীত বিশারদ তানসেন। এছাড়াও ঐতিহাসিক আব্দুল কাদের বাদাউনী, নিজামউদ্দিন আহমদ, কবি তুলসী দাস, সঙ্গীতজ্ঞ- বৈজুবওরা, রাম দাস, চিত্রশিল্পী খাজা সামাদ, মীর সৈয়দ আলী ও মুকুন্দ দাসের মতো জ্ঞানী-গুণীগণ সম্রাট আকবরের দরবার অলঙ্কৃত করতেন।

শিক্ষা বিস্তারে মসজিদ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করে আরবি, ফারসি ও সংস্কৃত ভাষার প্রসার ঘটে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বৃত্তির ব্যবস্থা করা হতো। আকবরের সময় রাজভাষা হিসেবে ফারসির প্রচলন হলে হিন্দুরাও ফারসি শিখতে মুন্সির শরণাপন্ন হতো। ফারসিতে বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনুবাদ করা হয়। সম্রাট বাবুরের- 'তুজুক-ই-বাবুরী', আবুল ফজলের- 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' জাহাঙ্গীরের- 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গিরী' আব্দুর রহিমের- 'রহিম-ই-সাতসাই' তুলসি দাসের- 'রামকৃত মানস' সুরদাসের- 'সুরাসাগর' অন্যতম। এছাড়া এ সময় হিন্দি কবিতা, গজল, মসনভি ও রুবাইয়াতের ব্যাপক প্রসার ঘটে। দিল্লী, আগ্রা ও ফতেহপুর সিক্রি জ্ঞানের নগরীতে পরিণত হয়। সম্রাট আকবরের নিজস্ব গ্রন্থাগারে প্রায় ২৪ হাজার গ্রন্থের বিশাল সমাহার ছিল। শিক্ষা-সংস্কৃতিতে মুঘল রাজপরিবারের মহিষী, রাজকুমারী ও অভিজাত নারীরাও পিছিয়ে ছিল না। এদের শিক্ষা ও সু-রুচির ফলে সমাজে অনেক পোশাক, সুগন্ধি ও গহনার ফ্যাশন প্রবর্তিত হয়। এদের মধ্যে খানজাদা বেগম, গুলবদন বেগম, মহাম অনগা, সম্রাজ্ঞী নূরজাহান, মমতাজ মহল, জাহান আরা, রওশন আরা ও জেবুন্নিসা অন্যতম। গুলবদন বেগমের- 'হুমায়ূন নামা' এবং জেবুন্নিসার- 'দিওয়ান-ই-মাসফি' অন্যতম। জাহানারা ও রওশন আরা কবিতা ও চিত্রশিল্পে এবং নূরজাহান- গোলাপজল, আতর, পোশাক ও গহনায় কৃতিত্বে স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

আকবরের সময় রাজা টোডরমলের পরামর্শে ফারসি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়। এছাড়া উর্দু, হিন্দি, মারাঠি ভাষাও বেশ উৎকর্ষ লাভ করে। ফারসির প্রভাব কমাতে বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ হিন্দিকে দরবারি ভাষার মর্যাদা দান করেন। এরপরও ফারসির প্রভাব কমেনি। উত্তর ভারতে উর্দু বা হিন্দুস্থানি ভাষাই সাধারণ জনগণের ভাষা বলে পরিগণিত হতো। স্থাপত্যশিল্পেও মুঘল যুগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সম্রাট শাহজাহানের আমলেই মূলত স্থাপত্য শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়। এজন্য তাঁকে স্থাপত্যের যুবরাজ (the prince of Builders) বলা হতো। মুঘলরা রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, খানকাহ, সমাধি, তোরণ, দুর্গ ও দুর্গ নির্মাণে পারস্য রীতির প্রবর্তন করেন। এসবের মধ্যে দিল্লীর রাজপ্রাসাদ, লাহোর দুর্গ, আগ্রা দুর্গ, হুমায়ুনের সমাধি, আকবরের সমাধি, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, আগ্রার জামে মসজিদ ও মতি মসজিদ, জাহাঙ্গীরের সমাধি, শীষমহল, রংমহল, যুহমহল, তাজমহল, নূরমহল ও ময়ূর সিংহাসন অন্যতম। দিওয়ান-ই-খাসের দরজায় লেখা ছিল-

'স্বর্গ যদি ধরা মাঝে (পৃথিবীতে) থাকে কোন খানে,
তা এইখানে, তা এইখানে তা এইখানে"

চিত্রশিল্পেও মুঘল আমল বেশ উন্নতি হয়। সম্রাট বাবুর, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও দারা- এরা সবাই চিত্র শিল্পের খাঁটি সমঝদার ছিলেন। মীর সৈয়দ আলী, কাজী সামাদ, ফারুক বেগ, মুহাম্মদ নাদের, আকা রেজা, মীর হাসান, বীষণ দাস, মনোহর, মাধব, তুলসী, অনুপা চিত্র ও চিত্রমণি প্রমুখ মুঘল চিত্র শিল্পকে গৌরবমণ্ডিত করে

তোলেন। সঙ্গীত, গজল, মসনবি, কাওয়ালি ও রাগসঙ্গীতেও মুঘল যুগ পিছিয়ে ছিল না। তানসেন, রামদাস, বৈজু বাওলা, সুরদাস, মুহম্মদ সালেহ, মহাপাত্র ছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ। এ সময় বিভিন্ন যন্ত্রশিল্প ও রাগের সৃষ্টি হয়। এতে তানসেনের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মুঘল আমলে কিছু নতুন খাবার আমদানি হয়। যেমন- পোলাও, মুগলাই, কালিয়া, কোপ্তা, বিরিয়ানি এসব মুঘলাই কায়দায় তৈরি খাবার পূর্বে ভারতবর্ষে ছিল না। মুঘল আমলে নাগরিক সমাজ অবকাশ- বিনোদন হিসেবে বেশ কিছু ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতো। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে রাখী, বৈশাখী, দশোহরা, শিবরাত্রী, হোলী, বসন্ত, পঞ্চমী, ঈদ, রমজান, শব-ই-বরাত, চেহলাম, ফাতেহা-ই-ইয়াজদহাম, ইরানীদের মিনাবাজার, নওরোজ ও আবাহন অনুষ্ঠানে যোগ দিতো। পার্সিয়ানদের আরদিবিশ্ত, খোরদাদ, বাহমান এবং খ্রিষ্টানদের খ্রিষ্টমাস, ঈস্টার প্রচলিত ছিল। সম্রাটগণ দেশীয় খেলা যেমন- হাতির লড়াই, ঘোড়া দৌড়, কুস্তি ও শিকারের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতেন। সম্রাট হুমায়ুন কর্তৃক চিতোরের রানীর সঙ্গে 'রাখী ভাই' সম্পর্ক পাতানো বিষয়টা দুই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক সমন্বয়কে আরো জোরালো করেছিলো।

মুঘল ঐশ্বর্য-বিলাসের কয়েকটি নমুনা এরকম–

ক. প্রায় চার লক্ষ সৈনিক নিয়ে আওরঙ্গজেব কাশ্মীর অভিযান করেন। এ সময় সম্রাটের পুরো রাজধানী সে সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে থাকতো।[৮৬]

খ. সম্রাট শাহজাহান প্রিয়তমা স্ত্রী মমতাজের মৃত্যুতে (১৬৩১খ্রি.) তার স্মৃতি রক্ষার্থে ২০ হাজার শ্রমিক দিয়ে ওস্তাদ ঈশা খানের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘ ২২ বছর ধরে (১৬৩১-১৬৫৩খ্রি.) যে তাজমহল তৈরি করেন, এতে ব্যয় হয়েছিল তৎকালীন ৩ কোটি টাকা।[৮৭]

গ. শাহজাহান দরবারের জৌলুশ বাড়াতে শিল্পাধ্যক্ষ বেবাদল খাঁর তত্ত্বাবধানে প্রায় ৮ বছর ধরে (১৬৩৪-১৬৪২খ্রি.) যে ময়ূর সিংহাসন (দৈর্ঘ্য ৩$\frac{১}{৪}$ গজ, প্রস্থ ২$\frac{১}{২}$ গজ ও উচ্চতা ৫ গজ) তৈরি করেন, তাতে খরচ হয়েছিল প্রায় ৪ কোটি টাকা।[৮৮]

ঘ. তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন তৈরি করার পরও রাজকোষের হীরা-রত্ন, স্বর্ণ ছাড়াই শাহজানের কাছে ছিল ৬ কোটি টাকা।[৮৯]

ঙ. বৃটিশ বণিক ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স ১৬০৯ খ্রি. সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন এবং সম্রাটের বাৎসরিক ব্যয় বছরে ৫০ কোটি টাকা, রাজদরবারের ব্যয় প্রতিদিনে ৫০ হাজার টাকা এবং হেরেমের ব্যয় প্রতিদিন ৩০ হাজার টাকা বলে উল্লেখ করেছেন।

চ. সম্রাট জাহাঙ্গীর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় আগ্রা দুর্গের শাহ বুরজি হতে যমুনা নদীর তীর পর্যন্ত স্বর্ণের ৬০টি ঘণ্টাযুক্ত ৩০ গজ লম্বা একটি সোনার শিকল ঝুলিয়ে দেন। ইতিহাসে এই ঘন্টা 'Bell of Justice' এবং এই শিকল 'Chain of Justice' নামে খ্যাত।

ছ. সম্রাট আকবর তাঁর পুত্র সেলিম, মুরাদ ও দানিয়েলের গৃহশিক্ষক মির্জা আব্দুর রহিমকে শিক্ষাদানের পারিশ্রমিক বছরের শেষে একদিন দিতেন। যুবরাজদের দাঁড়িপাল্লায় উঠিয়ে তাদের সমপরিমাণ মুদ্রা শিক্ষককে দিতেন।[৯০]

জ. সম্রাট আকবর অবকাশ যাপনে যে দাবা খেলতেন, সে দাবা খেলার ক্ষেত্র তৈরি করা হতো রাজপ্রাসাদের বাগানে। দুই পাশে উচু আসনে বসে খেলোয়ারগণ ইশারা দিতেন। সৈন্যগণ দাবার ঘর থেকে বাস্তবের ঘোড়া, হাতি, নৌকা, সেনা, মন্ত্রী ও রাজাকে টেনে সরিয়ে দিতেন।[৯১]

ঝ. ১৭১৯ খ্রি. আগ্রা দুর্গের পতনের পর মুঘল ধন ভাণ্ডার হস্তগত করেন হুসাইন আলি। শুধু নূরজাহান ও মমতাজের অলংকারের দামই ছিল ২ থেকে ৩ কোটি রুপি। [সাযযাদ কাদির তাঁর 'হারেমের কাহিনী: জীবন ও যৌনতা' গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন।]

তেরো

স্বাধীন সুলতানী ও স্বাধীন নবাবী যুগে বাংলা

সেন যুগের (১০৭০-১২৪৬খ্রি.) শেষ পর্যায় বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে কিছু তাৎপর্যময় ঘটনা সংঘটিত হয়। দিল্লী সালতানাতের (১২০৬-১৫২৬খ্রি.) প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবকের (১২০৬-১২১০খ্রি.) আমলে অযোধ্যার শাসনকর্তা হুশামউদ্দিনের অধীনস্থ সামন্ত শাসক ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী নদীয়া দখল করেন (১২০৪ অথবা ১২০৬খ্রি.)। বখতিয়ারের হাত ধরেই মূলত বাংলায় মুসলমান রাজত্বের সূত্রপাত ঘটে। এরপর বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে অস্থিরতা ও হত্যাযজ্ঞের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। কারণ বখতিয়ারের মৃত্যুর (১২০৬খ্রি.) পর থেকে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯খ্রি.) পর্যন্ত ৩১৩ বছরের (১২০৬-১৫১৯খ্রি.) শাসনামলে মোট ৯ বংশের ৪২ জন শাসক ক্ষমতায় আসেন। এ ৪২ জন শাসক গড়ে ৭ বছর করে দেশ শাসন করেন। আত্মকলহে খুনাখুনি করে সিংহাসন লাভ করাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়, দেশ শাসনটা যায় গৌণ হয়ে।

আবার অন্যদিকে বাংলায় পাঠানদের শাসনামলও এক জটিলতা তৈরি করে। ৬টি বংশের মোট ৪০ জন শাসক ৩৬২ বছর (১১৯২-১৫৫৪খ্রি.) শাসন করেন। যদিও এ ধারা ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সেনাপতি ইসলাম খাঁর হাতে ওসমানের মৃত্যু পর্যন্ত বলবৎ ছিল। দিল্লীর তুঘলক বংশের (১৩২০-১৪১৩খ্রি.) সময়ে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা হয়। এ আমল শুরু ফখরুদ্দিন মুবারক শাহের (১৩৩৮-১৩৫০খ্রি.) সোনার গাঁর সিংহাসনে আরোহনের মধ্য দিয়ে। এ বংশের ৪ জন শাসক মোট ১৩ বছর (১৩৩৮-১৩৫৩খ্রি.) শাসন করেন। এরপর শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৮খ্রি.) মাধ্যমে যে ইলিয়াস শাহী বংশ (১৩৪২-১৪১৪খ্রি. ও ১৪৪২-১৪৮৭খ্রি.) প্রতিষ্ঠা করেন, তা মোট ১১ জন শাসক ১১৭ বছর শাসন করেন। এর মধ্যবর্তী গণেশ বংশের (১৪১৪-১৪৩৩খ্রি.) ৪ জন শাসক শাসন করে মোট ১৮ বছর। হাবসী বংশের (১৪৮৭-১৪৯৩খ্রি.) ৪ জন শাসকের ৬ বছরের শাসন এবং এরপর শুরু হয় হুসেনশাহী বংশের (১৪৯৩-১৫৩৮খ্রি.) ৪ জন শাসকের ৪৫ বছরের শাসনামল। এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা আলাউদ্দিন হুসেন শাহর (১৪৯৩-১৫৯ খ্রি.) মাধ্যমেই মূলত বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের স্বর্ণযুগ। এখানে উল্লেখ প্রয়োজন; পানিপথের ১ম যুদ্ধের (১৫২৬ খ্রি.) সময় বাংলার শাসক ছিলেন হুসেন শাহের পুত্র নুসরত শাহ (১৫১৯-১৫৩২খ্রি.) এবং পানিপথের ২য় যুদ্ধের (১৫৫৬ খ্রি.) সময় ছিলেন আদিল শাহ।

এরপর শুর বংশের (১৫৩৯-১৫৬৪খ্রি.) ১৫ বছর এবং কররানী বংশের (১৫৬৪-১৫৭৫খ্রি.) ১১ বছরের ৩ জন শাসকের শাসনামল। সম্রাট আকবরের বঙ্গ বিজয়ের সময় (১৫৭৬ খ্রি.) খানজাহান হুসেন কুলীর হাতে দাউদ কররানীর পরাজয় ঘটলে বাংলায় সুবাদারী (১৫৭৪-১৭১৬খ্রি.) শাসনের সূত্রপাত হয়। ১৪২ বছরের এ সুবাদারীতে মুনিম খান (১৫৭৪খ্রি.) থেকে মুর্শিদকুলী খান (১৭১৫খ্রি.) পর্যন্ত মোট ৩২ জন বাংলা শাসন করেন মুঘল সম্রাটদের প্রতিনিধি হিসেবে। মুঘল সম্রাটগণের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে দেওয়ান ও সুবাদার মুর্শিদকুলী খান (১৭০৪-১৭২৭খ্রি.) ১৭১৭ খ্রি. বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের সূচনা করেন। এ নবাবী আমলের ৪০ বছরের (১৭১৭-১৭৫৭খ্রি.) মোট ৫ জন নবাব বাংলা শাসন করেন। এদের মধ্যে মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭খ্রি.), সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯খ্রি.), সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০খ্রি.), আলীবর্দি খান (১৭৪০-১৭৫৬খ্রি.) ও

সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭খ্রি.) অন্যতম। পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭খ্রি.) পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত থাকে। স্বাধীন নবাবী আমলের পর যারা বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব ছিলেন, তারা ছিলেন মূলত পরাধীন ও ইংরেজ বণিকদের আস্থাভাজন। এরা হলেন- মীর জাফর আলী খান (১৭৫৭-৬০ ও ১৭৬৩-১৭৬৫খ্রি.) মীর কাসিম (১৭৬০-১৭৬৩খ্রি.) নাজিমউদ্দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬খ্রি.) সইফুদ্দৌলা (১৭৬৬-১৭৭০খ্রি.) প্রমুখ। এভাবে ৫৫৩ বছর (১২০৪-১৭৫৭খ্রি.) শাসন করার পর বাংলায় মুসলিম রাজত্বের অবসান ঘটে।

মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছ থেকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদানের শর্তে ইংরেজ কোম্পানির বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫খ্রি.) ও রবার্ট ক্লাইভের প্রবর্তিত দ্বৈতশাসন পদ্ধতি (Dual Govt. System) নবাবী আমলের তথা মুসলমান শাসনের অবসান ঘটায়। কোম্পানির ১০০ বছরের (১৭৫৭-১৮৫৭খ্রি.) শাসন-শোষণের প্রতিবাদে সারা দেশে দেখা দেয় সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭খ্রি.)। এর ফলে ভারতবর্ষ মহারানী ভিক্টোরিয়ার (২ আগস্ট, ১৮৫৮খ্রি.) প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে চলে যায়। স্বাধীন সুলতানী আমলে বাংলার শাসক হিসেবে ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৫০খ্রি.), শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-১৩৫৮খ্রি.) ও আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ এরাই ছিলেন মূলত যোগ্য ও স্বাধীন শাসক, যাদের সুশাসনে বাংলার উত্তাল রাজনীতিতে শান্তি, স্থিতি ও স্বস্তি ফিরে আসে। এমনকি বাংলার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জাগরণ এদের মাধ্যমেই সূচনা হয়।

মুর্শিকুলী খানের রাজস্ব ব্যবস্থা

স্বাধীন নবাবী আমলের (১৭১৭-১৭৫৭খ্রি.) ৪০ বছরে মুর্শিদকুলী খানের (১৭১৭-১৭২৭খ্রি.) ১০ বছরের শাসনামল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের এক তাৎপর্যময় ঘটনা। কারণ তাঁর নেতৃত্বেই বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে প্রচলিত রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধিত হয় এবং বাংলার রাজনীতি নতুন রূপ ও গতি লাভ করে। মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় মধ্যস্বত্ব ভোগীর কোন স্থান ছিল না। কারণ সে ব্যবস্থা অনুযায়ী সরকার প্রত্যেক গ্রামে গ্রাম্য মাতাব্বরের সহায়তায় কৃষকদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ রক্ষা করতো। এজন্য মুঘল ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা কোন বংশানুক্রমিক জমিদারি স্বত্বের জন্ম দেয়নি এবং জমির ওপর দখলী স্বত্বের ভিত্তিতে মুঘল আমলে অভিজাত শ্রেণি গড়ে ওঠারও কোন ব্যবস্থা ছিল না।[৯২]

মুর্শিদকুলী খানের বাংলায় আগমনের (১৭০৪খ্রি.) পূর্বে এখানকার রাজস্ব ব্যবস্থার কোন সুষ্ঠু কাঠামো ছিল না। বাংলার প্রায় সমস্ত ভূমিই সৈনিকদের বেতনের পরিবর্তে জায়গীর রূপে নির্দিষ্ট ছিল। এর ফলে ভূমি রাজস্ব হতে সরকারের অর্থাগম ছিল না বললেই চলে। বাণিজ্য শুল্কই ছিল রাজকোষের একমাত্র আয়ের পথ। তাছাড়া মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর নতুন করে জমি জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারিত হয়নি। রাজস্ব ব্যবস্থাকে এ শোচনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার করার জন্য মুর্শিদকুলী খান কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যথা–

১. জায়গীরদারী প্রথার পরিবর্তে ইজারাদারী প্রথা প্রবর্তন। তিনি সরকারি কর্মচারীদের জায়গীরগুলো খাস করে নিয়ে এর পরিবর্তে ইজারাদারী ব্যবস্থা চালু করেন। ইজারাদারগণ যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করতেন, তাদেরকে জামিন স্বরূপ সেই পরিমাণ টাকার চুক্তিপত্রে সই করতে হতো। এ ব্যবস্থাকে বলা হতো- ‘মাল জামিনি’। ইজারাদারগণ নির্দিষ্ট রাজস্ব প্রদানের শপথ গ্রহণ করতেন এবং আদায়কৃত রাজস্বের উপর কমিশন পেতেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে হিন্দুদের মধ্যে থেকেই বেশি ইজাদার নিয়োগ করা হয়। এতে করে প্রাচীন জমিদার পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং এক নতুন শ্রেণির জমিদার জন্মলাভ করে।

২. সুনির্দিষ্ট সরকারি আয় নিশ্চিতকরণ। মুর্শিদকুলী খান নির্ধারিত রাজস্বের কখনোই বেশি দাবি করতেন না। ইজারাদারগণ অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় ও জুলুম করছে কিনা, তা পর্যবেক্ষণ করতেন এবং জুলুমকারীদের

উপর কঠোর শাস্তির ব্যবস্থাও নিতেন। পূর্বে যে রাজস্ব পাওয়া যেতো, তা ছিল অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত। কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে সরকারি রাজস্ব আয় সুনিশ্চিত হয়।

৩. রাজস্ব সংক্রান্ত নির্দিষ্ট বিধি-বিধান অনুসরণ। তিনি বাংলার সমুদয় আবাদী ও অনাবাদী জমি জরিপ করে জমির উর্বরতা অনুসারে রাজস্ব নির্দিষ্ট করে দেন। জমির বিবরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষকদের নাম, ঠিকানা, রাজস্বের পরিমাণ লেখা থাকতো। দরিদ্র কৃষকদের তিনি 'তাকভী ঋণ, দেবার ব্যবস্থা রাখেন।

৪. প্রাচীন জমিদারদের প্রতি সহানুভূতি। এ রাজস্বনীতির ফলে বহু প্রাচীন জমিদার পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তিনি তাদের ভরণ-পোষণ করতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তা 'নানকর' নামে পরিচিত ছিল। অনেককে ইজারাদার পদে নিয়োগ করা হয়েছিল। অবার অনেককে উড়িষ্যার মতো অনুন্নত জায়গায় জায়গীরও প্রদান করেন।

৫. ব্যয় সংকোচন নীতি। রাজস্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ব্যয় সংকোচন নীতি গ্রহণ করেন। তিনি পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করেন এবং প্রশাসনেও বহু ব্যয় হ্রাস করে রাজকোষের আয় বৃদ্ধি করেন।

৬. বাণিজ্যে উৎসাহ দান। তিনি দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে দেশীয় ও ইউরোপীয় বণিকদের সুবিধার্থে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। নির্দিষ্ট হারের অতিরিক্ত বাণিজ শুল্ক তিনি কখনোই বরদাস্ত করতেন না। মুঘল সম্রাট কর্তৃক নামে মাত্র শুল্ক দিয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যে বাণিজ্য চালাতো, সে বিশেষ সুবিধা বাতিল করে নির্দিষ্ট বাণিজ্য শুল্ক ধার্য করেন।

৭. করদ (করদাতা) রাজ্যগুলোর রাজস্ব সংস্কার। তিনি যশোর, খুলনা ও ময়মনসিংহের বহু অনাবাদী জমি সরকারের খাস জমিতে পরিণত করেন এবং কুচবিহার ও ত্রিপুরার রাজাদের নির্দিষ্ট ও ধার্যকৃত বাৎসরিক কর প্রদানে বাধ্য করেন।

উপর্যুক্ত এ রাজস্ব নীতির ফলে সরকারি রাজস্বের আয় সুনির্দিষ্ট হয়। কৃষকগণ জায়গীরদার ও সংশ্লিষ্ট রাজস্ব কর্মচারীদের অত্যাচার হতে রক্ষা পায়। তবে এতে আবার নতুন ধরনের সংকট তৈরি হয়। কারণ এ ব্যবস্থায় মুর্শিদকুলী খান রাজনৈতিকভাবে সুবিধা পেতে ইজারাদার পদে বেশির ভাগ হিন্দুদের নিয়োগ দান করেন। এতে করে পুরো বাংলায় যে হিন্দু জমিদার বা হিন্দু অভিজাত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে, তার ভবিষ্যৎ ফলাফল ছিল ভয়াবহ। কারণ এ সমস্ত হিন্দু জমিদার, অভিজাত ধনী গোষ্ঠীই পরবর্তীকালে মুসলমান নবাবদের বিরোধিতা করেন এবং নানা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের পথকে সুগম করে দেন। এ ব্যবস্থার পূর্বে কৃষক ও মুঘল সম্রাটের মাঝখানে ছিলো রাজস্ব কর্মচারী। এ ব্যবস্থার চিত্ররূপ-

মুঘল সম্রাট (রাষ্ট্র)

↑

রাজস্ব কর্মচারী

↑

কৃষক প্রজা

কিন্তু মুর্শিদকুলী খানের এ রাজস্ব ব্যবস্থায় যে ইজারদার নিয়োগ করেন, তারা পরবর্তীকালে জমিদার ও মধ্যস্বত্বভোগী তথা দালাল শ্রেণিতে পরিণত হয়। সম্রাট ও কৃষকের মাঝখানে দুটি নতুন শ্রেণি অর্থাৎ জমিদার ও মধ্যস্বত্ব ভোগীর উদ্ভব ঘটে। কারণ জমিদারগণ এমন কাজ নিজেরা না করে বরং তাদের অনুগত লোকদের এজেন্ট নিয়োগ করতেন। এতে করে এ রাজস্ব ব্যবস্থায় যে কাঠামো রূপলাভ করে, হলিং বেরীর বর্ণনা অনুযায়ী

[R.H. Hollingbery; Zemindary Settlement System of Bengal (1879)] ভূমি ব্যবস্থাকে নিম্নলিখিত স্তরে বিভক্ত করা যায়-

মুঘল সম্রাট (রাষ্ট্র)

↑

জমিদার (ইজারদার)

↑

মধ্যস্বত্ব ভোগী শ্রেণি

↑

↓ ↓

খুদখাস্ত রায়ত (জমির ওপর প্রত্যক্ষ স্বত্বাধিকারী চাষী বা জোতদার)

পাইকাস্ত রায়ত[৯৩] (জমির ওপর স্বত্ববিহীন চাষী)

ড. দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর ‘বৃহৎ বঙ্গ’ গ্রন্থে (২য় খণ্ডের, পৃ- ৮৪১-৮৪২) মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর এ রাজস্ব ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেছেন। তবে একথা বলা যায়, মুর্শিদকুলীর আমলে ইজারদার বা মধ্যস্বত্বভোগীর জুলুম বা নিপীড়ন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারেনি। তিনি কঠিন হস্ত তা দমন করে সুশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু পরবর্তীকালের নবাব সুজাউদ্দিন (১৭২৭-৩৯খ্রি.) ও সরফরাজ খানের (১৭৩৯-৪০খ্রি.) আমলে এ ব্যবস্থাপনার ক্রমশ অবনতি ঘটে। এ সময় নবাবগণ ভোগ-বিলাসে গা ভাসিয়ে দিতেন। তাদের এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জমিদার, ইজারদার, পত্তনিদারসহ মধ্যস্বত্ব ভোগীরা কৃষকদের উপর নানা অত্যাচার চালাতো। এ রকম শাস্তির কয়েকটি নমুনা নিম্নরূপ-

১. দণ্ডঘাত ও বেত্রাঘাত, ২. চর্মপদুকা প্রহার, ৩. বাঁশ বা কাঠ দিয়ে বক্ষস্থল দলন, ৪. খাপরা দিয়ে নাসিকা-কর্ণ মর্দন, ৫. মাটিতে নাসিকা ঘর্ষণ, ৬. পিঠে হাত বেঁকিয়ে বেঁধে বংশ দণ্ড দিয়ে মোড়া দেয়া, ৭. গায়ে বিছুটি দেয়া, ৮. হাত-পা নিগড়বদ্ধ করা, ৯. কান ধরে দৌড়ানো, ১০. ফাটা দু’খানা বাঁধা বাখারি দিয়ে হাত দলন করা, ১১. গ্রীষ্মকালের প্রখর রৌদ্রে পা ফাঁক করে দাঁড় করিয়ে, পিঠ বাকিয়ে পিঠ ও হাতের উপর ইট চাপানো, ১২. প্রচণ্ড শীতে জলমগ্ন করা ১৩. বৃক্ষে বেঁধে লম্বা করা, ১৪. ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে ধানের গোলায় পুরে রাখা, ১৫. চুনের ঘরে বন্ধ করে রাখা, ১৬. কারারুদ্ধ করে উপোস রাখা, ১৭. গৃহবন্দী করে লঙ্কা মরিচের ধোঁয়া দেয়া প্রভৃতি।[৯৪]

এমন নিপীড়ন নির্যাতনের ধারাবাহিক চিত্র দেখা যায় ১২০ বছর পরে দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩খ্রি.) ‘নীলদর্পণ’ (১৮৬০ খ্রি.) নাটকে নীলকরদের মাধ্যমে। পরবর্তীকালে এ ইজারাদার মধ্যস্বত্বভোগী, জমিদার ও বণিক গোষ্ঠীগণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য নবাবকে পরিহার করে বিদেশি বণিকদের আপন করে নেয়। কারণ সময়ের দাবির মুখে বণিকদের কাগজী নোটের কাছে নবাবদের ধাতবী মুদ্রার পরাজয় অনিবার্য হয়ে ওঠে। তাই পলাশীর যুদ্ধের (২৩জুন, ১৭৫৭খ্রি.) মাত্র ৩৬ বছর পরে ১৭৯৩ খ্রি. ইংরেজগণ ও নিজেদের অনুগত শ্রেণি সৃষ্টির লক্ষ্যে ও শোষণের হাতিয়ার হিসেবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (parmanent settlement system) প্রবর্তন করে। এর মডেল হিসেবে এরা মুর্শিদকুলী খানের এ রাজস্বনীতিকেই গ্রহণ করেছিল।

প্রশাসন

সেনদের পর বাংলার সিংহাসনে মুসলমানগণ বসায় অনেক কিছু পরিবর্তনের সঙ্গে প্রশাসনিক পদবীর নামেরও পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। হিন্দুদের মহাপাত্র, নিশাপতি, মন্ত্রী প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের পদবী উঠে গিয়ে উজির, নাজির, সেরেস্তাদার, কাজি, ওমরাহ, জমানবিশ, খাসনবিশ, তালুকদার প্রভৃতি নানা পারসি ও আরবি সম্ভূত নাম রাজসভায় প্রচলিত হয়।[৯৫]

পাঠান আমলে বাংলা ১৯টি সরকার ও ৫৫৮টি মহালে বিভিক্ত ছিল। মুঘল আমলে বাংলার আয়তন ছিল ২,৪৫,০০০ বর্গমাইল। টোডরমলের বন্দোবস্ত বাংলা ও উড়িষ্যার ২৪টি সরকার ও ৭১৭টি পরগনা ছিল। যার রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৫৯৮৭৫৯৩১৯ টাকা। এর মধ্যে শুধু উড়িষ্যার ছিল ৫টি সরকার ও ৯৯ মহাল। রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১২৫৭৩২৬৩৮ টাকা। মূল বাংলায় ছিল ১৯টি সরকার ও ৬২৮২ পরগনা এবং রাজস্বর ছিল ১০৬৯৩১৫২ টাকা।[৯৬]

আওরঙ্গজেবের সময় বাংলা ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০ মহাল পরগনায় বিভক্ত ছিল। রাজস্বের পরিমাণ ছিল-১৩১১৫৯০৭ টাকা। কিন্তু মুর্শিদকুলী খান তখনকার সরকারগুলিকে ১৩টি চালকায় বিভক্ত করেন এবং পরগনা ও মহালগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৬০টি। ১৭১৭খ্রি.মুর্শিদকুলী খান দিল্লীর সম্রাটের কাছে বার্ষিক ১ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বাংলার রাজস্ব হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন।[৯৭]

সুলতানী আমলে প্রশাসনের সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন সুলতান। তিনি ছিলেন একাধারে প্রধান শাসক ও সেনাবাহিনীর প্রধান। এরপর ছিলেন উজির (প্রধানমন্ত্রী), কয়েকজন মন্ত্রী, ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী (দিওয়ান-ই-আরজ), দবীর-ই-খাস, সাকর-মালিক, প্রধান কাজি (দিউয়ান-ই-রিসালাত), মীর-ই-বহর (নৌবাহিনীর প্রধান), কতোয়াল (পুলিশ প্রধান), সুবাদার (প্রদেশ প্রধান), দিওয়ান, বকশি (প্রদেশ সামরিক কর্তা) সদর (প্রদেশ ধর্মীয় নেতা), ইকতাদার বা মুক্তা, সর-ই-লস্কর, জাসুস (গুপ্তচর), আমীর-ই-হাজির (দরবার কর্তা) নকিব, ছত্রী, সিলাদার (দেহরক্ষী), জমাদার, গোমস্তা, আমিন ও পাইক অন্যতম।

নবাবী শাসনামল বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর (১৭০৭খ্রি.) পরপরই মুঘল শাসকদের দুর্বলতার সুযোগেই মুর্শিদকুলী খান বাংলায় (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা) নবাবী নিজামত প্রতিষ্ঠা করেন। এ নবাবী প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিলেন নবাব। তিনি নামে মাত্র দিল্লীর সম্রাটের অনুগত থেকে বার্ষিক রাজস্ব বা নজরানা পাঠাতেন। এছাড়া সমস্ত কর্মকাণ্ডই প্রায় স্বাধীনভাবে সম্পন্ন করতেন। নবাবের সুপারিশ বা পরামর্শ মোতাবেক সম্রাট অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ দান করতেন। নবাবের পরেই থাকতেন নায়েব-ই-সুবা, দিওয়ান, নায়েব, নাজিম, বখ্‌শী, মীর বহর, সদর ও কাজি, ফৌজদার, মুতাসাররিফ, আমিন মুশরিফ, কারকুন, চৌধুরী ও কানুনগো। পরগনার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বা প্রশাসক ছিলেন শিক ও শিকদার। এছাড়া আমিন, কারকুন, ফোতাহদার, কানুনগো, মোকাদ্দম ও সার্দি উল্লেখযোগ্য।

পরগনার রাজস্বের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন আমিন। রাজস্ব লেখক ছিলেন কারকুন। জমি জরিপের বিষয়াদি লেখতেন মোকাদ্দম ও পাটোয়ারিগণ। এছাড়া কারকুন রাজস্বের হিসাব ও আদায়ী রাজস্বের রশিদ প্রদান করতো। এছাড়া পরগনার রাজকোষের খাজনাদার ও আমিনের সঙ্গে কারকুনের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। ফোতাহদার শব্দের বাংলা অপভ্রংশ হলো পোদ্দার। তিনি কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব বাবদ খাজনা আদায় করতেন। এ বিষয়ে শিকদার ও কারকুন তাকে সহায়তা করতো। কানুনগোর দায়িত্ব ছিলো প্রতিটি পরগনার জমি জরিপ, জমির দলিল দস্তাবেজ, রেকর্ড ও হিসাবের নথিগুলো সংরক্ষণ করা। ভূমির অতীত ও বর্তমান নথিপত্র সংরক্ষণে এবং ভূমি জরিপে তাকে

মোকাদ্দম (গ্রাম-প্রধান), এমনকি খাজনার হিসাব পরীক্ষায় চৌধুরী সাহায্য করতেন। চৌধুরী ছিলেন পরগনার রাজস্ব বিভাগের আধা সরকারি কর্মচারী। চৌধুরী ও সার্দি ছিলেন একজন হিন্দু প্রধান ও হিন্দুদের প্রতিনিধি। এরা রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ ও তালিকা প্রস্তুতে আমিণকে সহায়তা করতেন। এছাড়া রায়তের (কৃষক) প্রতিনিধি হিসেবে তাঁদের স্বার্থ, অভাব ও অভিযোগ প্রশাসকের নিকট পেশ করার দায়িত্ব ছিলো চৌধুরীর ওপর। চৌধুরীর সুপারিশেই রায়তদের তাকাভী (কৃষি ঋণ) ও খাজনা মওকুফ করা হতো।[৯৮]

এছাড়া ডিহিদার ও মুস্তাজিরগণ ও রাজস্ব আদায়ের দালাল হিসেবে কাজ করতো। এরা রাজস্ব সংগ্রহের উপর কমিশন পেতো। এদের সহায়তা করতো পেয়াদা নামক কর্মচারী। এরা জমিদার ও ইজারাদারদের লাঠিয়াল হিসেবে কাজ করতো। এছাড়া গ্রামীণ প্রশাসনিক দুটি স্তর পরিলক্ষিত হয়। ১. গ্রামীণ তহবিল ও ২. গ্রাম পঞ্চায়েত (গ্রামীণ পরিষদ)।[৯৯] গ্রামের সার্বিক বিষয় দেখা-শোনা ও ব্যয়ভার মেটানোর জন্য এ দুটি বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতো।

অর্থনীতি

আর্থিক ঋদ্ধির জন্য বাঙলাকে ‘সোনার বাঙলা’ বলা হত। মধ্যযুগের বৈদেশিক পর্যটকরা বাঙলাদেশকে ‘ভূস্বর্গ’ বলে অভিহিত করে গেছেন। সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য থেকেও আমরা বাঙলার বিপুল ঐশ্বর্যের কথা জানতে পারি। বাঙলার আর্থিক সম্পদ প্রতিষ্ঠিত ছিল তার কৃষি ও শিল্পের ওপর।[১০০] এই জন্য পর্তুগিজ, ডাচ, ইংরেজ প্রভৃতি খ্রিস্টানদের মধ্যে একটা প্রবাদ চালু আছে- ‘বাংলায় আসার দরজা আছে একশটা, কিন্তু যাবার দরজা একটিও নেই।’ অর্থাৎ বাংলায় আসার আকর্ষণ আছে অনেক এবং একবার এলে আর ছেড়ে যাওয়া যায় না।[১০১] নদীমাতৃক বাংলা প্রকৃতিগত ভাবেই ছিল উর্বর ও ফসলাদি উৎপন্নের উপযুক্ত ক্ষেত্র। শুধু কৃষিতেই নয়, বরং ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পে বাংলা বেশ সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প ক্ষেত্রের উৎকর্ষই বাংলাকে তৎকালে কিংবদন্তির দেশে পরিণত করে।

কৃষি

প্রাক-ব্রিটিশ ভারতে ভূমি ছিল সম্পদের প্রধান উৎস। আর কৃষি ছিল প্রধান অর্থনীতি। বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কগুলো ছিল কৃষি অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল। ভারতে কৃষি অর্থনীতি গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত হয়।[১০২] নবাবী আমলও এর ব্যতিক্রম ছিল না। এ সময় জমিকে প্রধানত ৪ শ্রেণিতে বিভক্ত করা হতো। যেমণ- ১. জমিদারি অথবা কর প্রদায়ী জমি, ২. ইজারাদারি বা রাজস্ব দালালদের অর্থাৎ ডিহিদারদের আওতাধীন জমি, ৩. শিকদার বা আমিলদের অধীনে জমি, ৪. জায়গীর বা আয়মার জমি। এসব জমি থেকে জমিদার বা ইজারাদারগণ তাদের এজেন্টদের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ করে সরকারি কোষাগারে জমা দিতো। এভাবে বাংলায় দুই শ্রেণির জমিদার গড়ে ওঠে, যথা- ১. পেশকাশ বা কর প্রদানকারী জমিদার, ২. রাজস্বের ইজারাদার বা বংশানুক্রমিক ভাবে রূপান্তরিত জমিদার।

উৎপন্ন ফসলের এক-চতুর্থাংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য ছিল। রাজস্ব পরিশোধ শস্য ও নগদ অর্থে করার ব্যবস্থা ছিল। তবে নগদ অর্থে রাজস্ব প্রদান ব্যবস্থা নবাবগণ অধিকতর পছন্দ করতেন। রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে অনেক সময় কড়াকড়ি জুলুম-নির্যাতন করা হতো। সাধারণত পোদ্দার ও ডিহিদারগণ ইজারাদারদের অজান্তেই রায়তদের গরু, বাছুর ধরে আনতো এবং রায়তদের আটকে রেখে অত্যাচার করতো। আবার জমি বণ্টনের ক্ষেত্রেও ডিহিদারগণ দুর্নীতির আশ্রয় নিতো। সাধারণত ভূমি বণ্টন করা হতো নল বা লোহার

আংটাকযুক্ত বাঁশের দণ্ড দ্বারা। ২০ কাঠায় ১ বিঘা ধরা হতো। অর্থাৎ ৬০ গজের সমতুল্য, ৩৩০০ বর্গগজের একখণ্ড জমি ১ বিঘায় পরিগণিত হয়। ডিহিদারগণ অনেক সময় ১৫ কাঠায় (২৭০০ বর্গ গজে) ১ বিঘা বলে বন্দোবস্ত করে দিতো। আবার অনেক সময় অনুর্বর (খিলভূমি) ভূমিকে উর্বর ভূমি বলে চালিয়ে দেয়া হতো। শাসকগণ সচেতন না থাকলে কৃষক প্রজাদের দুঃখের সীমা থাকতো না। জমির উর্বরতা ও শস্যের ধরণ অনুসারে রাজস্ব নির্ধারণ করা হতো।

বাংলার কৃষি জমিতে নানা রকম ফসল উৎপাদিত হতো। এর মধ্যে- ধান, গম, আখ, পাট, নীল, আফিম, লাক্ষা, সুতা, তিল, সরিষা, মটরশুটি, মুগ, মসুর, সবজি, ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। তবে ধান উৎপাদনেই বেশি ভূমি ব্যবহার করা হতো। আর এ ধানের জাতও ছিল বিচিত্র রকমের। এর নামগুলো হলো- আমলো, আষাঢ়ে, আশাঙ্গ, উড়াশালি, কাকচী, কনকচুর, কাঙ্গাদ, কামা, তুজনা, কালাকরিৎ, মসুমালি, খিরাকম্বা, খেজুরসারি, খাইমরাই, গুজুরা, গুণতামপালাল, গোপালজুরি, গোপালভোগ, কাটারিভোগ, ছিছড়া, ঝিঙ্গাশাল, মুক্তাহার, মাওকালো, লাউশালি, পর্বতীজিরা, ফেরফেরি, ভোদোলি, মণপল, শানাখারকি, সলছটি, সীতাশালি, হালিপাঞ্জর, শালি মাউকলাস, লালকামিণী, বাসমতি, কালোজিরা ও বোয়ালি অন্যতম।[১০৩] এসব চাউল আকারে সরু, মধ্যম ও মোটা হয়ে থাকে। বাংলার ধানের প্রাচুর্যের কথা পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়ার স্বীকার করে বলেছেন- বাংলাদেশে ধান-চাল এত প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যে, আশেপাশের এবং দূরের অনেক দেশে ধান চালান দেয়া হয় এখান থেকে। গঙ্গানদীর উপর দিয়ে নৌকাভরা ধান চালান যায় পাটনার এবং সমুদ্রপথে যায় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন বন্দরে। বিদেশেও ধান চাল যায় বাংলাদেশ থেকে, প্রধানত সিংহল ও মালদ্বীপে।[১০৪] এছাড়া চিনি ও পাট থেকেও বাংলার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো। তিল, তিসি, শিম, বরবটি, শাকসবজি, পেয়াজ, রসুন, শসা ও লাউ প্রচুর পরিমাণে উৎপাদিত হতো। অন্যদিকে লঙ্কা, আদা, হলুদ ও নারকেল পারস্য ও লোহিত সাগরের বিভিন্ন দেশে এবং ম্যানিলা ও চীন পর্যন্ত রপ্তানি করা হতো।

শিল্প

বিভিন্ন শিল্পে বিশেষ করে গ্রামীণ শিল্পে বাংলা ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। লোহা ও লবণ বাদে আর সবই প্রায় বাংলার গ্রামে উৎপাদিত হতো। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় কর্ম নয় বরং বর্ণের ভিত্তিতেই বিভিন্ন পেশাজীবী বা বর্ণজীবী সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ পেশাজীবী গোষ্ঠীই মূলত বাংলার বস্ত্র শিল্প, লৌহ, মৃৎ, কাসা, কাঠ, শাখা, শঙ্খ, কাগজ, কার্পেট, ইস্পাত, কামান ও নৌকাশিল্পের বিকাশ ঘটে। গ্রামীণ এ শিল্প প্রসঙ্গে ব্রিটিশ অফিসার স্যার চালর্স ম্যাটক্যাফ বলেন- বাংলার গ্রামীণ সম্প্রদায় গুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র সদৃশ, যেসবের অভ্যন্তরে প্রয়োজনীয় প্রায় সবকিছুই পাওয়া যেত, এসব ছিল প্রায় বৈদেশিক সম্পর্কমুক্ত। যেখানে কোন কিছুই স্থায়ী নয়, সেখানে গ্রামীণ সম্প্রদায় স্থিতিশীল ছিল। রাজবংশের পর রাজবংশের পতন হয়েছে। বিপ্লবের পরে বিপ্লব ঘটেছে; হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা, শিখ, ইংরেজ পর্যায়ক্রমে ক্ষমতায় এসেছে; কিন্তু গ্রামীণ সম্প্রদায়গুলো অপরিবর্তিতই থেকেছে। ,,, এভাবে একটা প্রজন্ম অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও পরবর্তী প্রজন্মে প্রত্যাবর্তন করতো। ছেলেরা পিতার স্থান দখল করতো।[১০৫]

আবার ইরফান হাবিব বলেন- যদিও গ্রামের উৎপাদিত দ্রব্যের একটি বড় অংশই শহরের বাজারে নিয়ে যাওয়া হতো, তবুও গ্রামগুলো বিনিময়ে শহরগুলোর কাছ থেকে কদাচিৎ কিছু পেত। এভাবে গ্রাম পণ্য উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হলেও নিজেই নিজের সকল চাহিদা সাধ্যমতো পূরণ করত। অতএব সে সময় গ্রামে মুদ্রা অর্থনীতি ও স্বয়ং সম্পূর্ণতার পরিস্থিতি যুগপৎ বিদ্যামান ছিল।[১০৬] বিখ্যাত জার্মান সমাজ বিজ্ঞানী

ম্যাক্স ওয়েবার বলেন- ভারতবর্ষ হচ্ছে একটি গ্রাম সর্বস্ব দেশ; সামাজিক স্তর বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় শুধু গ্রামীণ কারিগরের অবস্থানই নয়, বরং সমগ্র জাতিবর্ণ ব্যবস্থাকে এখানে স্থিতিশীলতার বাহক হিসেবে বিবেচনা করতে হবে।[১০৭]

সুতরাং বাংলার অর্থনীতি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্থিতিশীল হবার পরও এর শিল্পক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রগতি ও খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়। এর প্রধান শিল্প হলো বস্ত্রখাত। বাংলার তাঁতি বা কারিগর সম্প্রদায় এক বিশেষ কায়দা-কৌশলে রেশম থেকে সুতা তৈরি করতে পারতো। তুত গাছের পাতা খাইয়ে যে রেশম কীট তৈরি করা হতো, তা ছিল ৪ প্রকারের। এ রেশম কীট থেকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুতা তৈরি করে বিভিন্ন প্রকার বস্ত্র তৈরি করা হতো। চরকা ও ডলন কাঠির এ সুতা থেকেই ঢাকা ও পাবনার কারিগরগণ তৈরি করতেন বিশ্বখ্যাত ‘মসলিন’ নামক কাপড়। সাধারণত মনে করা হয় মাদ্রাজের ‘মছলিপত্তন’ বন্দর থেকে বিদেশি বণিকগণ এ বস্ত্র ইউরোপে চালান দিতো। এ ‘মছলিপত্তন’ নাম থেকেই ‘মসলিন’র উৎপত্তি। চরকা কাটা বা কার্পাস থেকে বস্ত্র তৈরির পদ্ধতি বৈদিকযুগ থেকেই এ দেশে প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের গ্রন্থেই তাঁতিদের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাংলার সমস্ত ঘরের মেয়েরা চরকা কাটাতে জানতো। গ্রামের সাধারণ নারী হতে সুসঙ্গদুর্গাপুরের রাজা জানকীনাথের রানী পর্যন্ত এ চরকা কাটা জানতেন। পূর্ববঙ্গের ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, ও মেঘনার কূল ঘেষে গড়ে উঠেছিল এ বস্ত্র শিল্পের কারখানা। এরা যে মসলিন তৈরি করতো, তা মানে ও গুণে এত খ্যাতি অর্জন করেছিল যা শুধু বাংলা ও দিল্লীর রাজা বাদশাগণ নয় বরং রোম, তুরস্ক, আরব আফ্রিকা ও ইউরোপের রাজা-রানী ও অভিজাতগণের বিলাস ও আভিজাতের প্রতীক হয়ে ওঠেছিল। এ মসলিনগুলো খুবই সূক্ষ্ম ও টেকসই হতো। মসলিনের গুণাগুণ প্রসঙ্গে কয়েকটি নমুনা-

১. ১৬০ বা ১৭৫ হাত দীর্ঘ মসলিনের ওজন মাত্র ৪ তোলা।

২. ঘাসের উপর বিছানো এক মসলিন কাপড়কে ঘাস মনে করে একটি গরু তা খেয়ে ফেলে।

৩. ঢাকার মসলিন মানুষের হাতের তৈরি নয়, উহা পরীদের হাতের কাজ।

৪. একদিন মসলিন (আবরোয়ান) পরিহিতা রাজকুমারী জেবউন্নিসাকে নগ্ন ভেবে সম্রাট আওরঙ্গজেব খুব বকাঝকা করেন। তখন জেবউন্নিসা বলেনছিলেন- আমি তো কাপড় খানি সাতবার ঘুরিয়ে পরেছি।

৫. মসলিনকে ছোট বাক্সে (দেশলাই বাক্সে) রাখা যায় এবং এ টিকে একটি আংটির রন্ধ্রপথের ভেতর দিয়ে টেনে আনা যায়।

৬. চার দণ্ডী পৈতার চার পাঁচটা পৈতা একটি বড় এলাচের খোসার ভেতর অনায়াসে ভরে রাখা যেতো।

ঢাকা, বিক্রামপুর, গাজীপুর ও পাবনা অঞ্চলের তৈরি মসলিন বিভিন্ন নামে ও শ্রেণিতে পরিচিত ছিল। এর মধ্যে অন্যতম হলো– ঝুনো, রঙ, সরকার, আলি, খাসা, শবনম, আবরোয়ান, হাম্মাম, মামোনা, মলমলখাস, আলাবালী, রাঙ, রাফতা, তঞ্জেব, তরুন্দম, সরবন্দ, সরবতী, নয়নসুখ, কোমিস, ডোরিয়া, চারখানা ও জামদানী উল্লেখযোগ্য। এ মসলিন থেকে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। ইংরেজ বর্ণিক গোষ্ঠী বহু কলা-কৌশল করে ও এটি নকল করতে পারেনি বা এর সমকক্ষ কাপড় তৈরি করতে পারেনি। তাই তারা একে ‘হাওয়ার ইন্দ্রজাল’ বলে অভিহিত করেছিল। তাই ওয়াটসন বলেছিলেন- With all our machines and wonderful in ventions we have hither to been unable to produce a fabric. Which for fineness or utility can equal the ‘wovenair’ of Dacca. ঢাকার মসলিনে যেখানে সুতার প্রত্যেক ইঞ্চিতে গড়ে দেয়া হতো ১১০০১ এবং ৮০০৭ টি পাক। যেখানে নকল মসলিনে দেয়া হতো মাত্র ৬৮০৮ এবং ৬৫০৬ পাক।[১০৮]

তাঁতি একা হলে একটি মসলিন তৈরি করতে প্রায় ৩ মাস সময় লাগতো। এতে করে উত্তম শ্রেণীর কারিগর ৭-৮ টাকা, মধ্য শ্রেণীর ৫ টাকা এবং সাধারণ শ্রেণীর ৩-২ টাকা উপার্জন করতে পারতো। অন্যান্য কাপড়ের মধ্যে গঙ্গাজলী, নীলাম্বরী, মেঘডুম্বর, পীতরি.আসমানতারা, হীরামণ, অগ্নিপাট, পীতাম্বর, চিকমিকি, উলঙ্গবাহার প্রভৃতি। বস্ত্র শিল্পের প্রাচুর্য দেখে পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার বলেছেন- তুলো ও রেশমের এত রকমের জিনিস তৈরি হয় এবং এত প্রচুর পরিমাণে হয় যে এণ বাংলাদেশকে হিন্দুস্থানের কাপড়চোপড়ের প্রধান আড়ৎ বললেও ভুল হবে না। শুধু হিন্দুস্থানের বা মোগল সাম্রাজ্যের নয়, প্রতিবেশি সমস্ত দেশের এবং ইউরোপেরও কাপড়- ১৬৬ দেশের কাপড়ের আড়ৎ হল বাংলাদেশ। সরু, মোটা, সাদা, রঙিন, নানা রকমের তাঁতের কাপড় তৈরি হয় বাংলায়। তাঁতের কাপড়ের এ রকম প্রাচুর্য ও বৈচিত্র আমি কোথাও কখনো দেখিনি।[১০৯]

বাঙালি জাহাজ নির্মাণ শিল্পেও পিছিয়ে ছিল না। চট্টগ্রামে এ শিল্প গড়ে ওঠে। সপ্তগ্রাম ও হুগলি বন্দার প্রাচীন কাল থেকেই বড় বড় জাহাজ নির্মাণে পারদর্শী ছিলো। এছাড়া জলমগ্ন বাংলায় এলাকা ও ভৌগোলিক ভাবেই নৌকা শিল্প গড়ে ওঠে। উল্লেখযোগ্য নৌকা হলো– বালাম, গোধা, শ্লপ, সারেঙ্গা, সাম্পান, কোন্দা, স্পিপ, ঘাইসা, কেয়ারা, বজরা অন্যতম।[১১০] শাঁখা শিল্পেও বাংলা বেশ অগ্রগতি লাভ করে। পাবনা ও ঢাকায় এ শিল্প উৎকর্ষ লাভ করে। বাঙালির নিত্য দিনে এর ব্যবহার রয়েছে। সাধারণত মাদ্রাজ ও কলম্বো হতে এ শঙ্খ সংগ্রহ করা হতো। এ শঙ্খ থেকে তৈরি করা হতো শাঁখা, আতরদানি, মালা, এসট্রে, সেফ্‌টিপিন, ঘড়ির চেইন, আংটি, বোতাম, ক্রুশ, ব্রেসলেট, সুরমাদানী, জলশঙ্খ ও বাদ্যশঙ্খ প্রভৃতি। এ শাঁখাগুলোর নামও খুব চমৎকার; যথা- গাড়া, সাতকানা, পাঁচদানা, তিনদানা, বাচ্চাদার, সাদাবালা, আউলাকেশী, লতাবালা, ধানছড়ি, চৌমুক্ষি, জয়শঙ্খ, মুড়িদার, আঙ্গুরপাতা, গোলাপবালা ও নাগরীবালা প্রভৃতি।[১১১] এ শিল্প থেকেও বেশ বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতো।

বাণিজ্য

কৃষি ও শিল্পজাত পণ্যের ব্যাপক উৎপাদন এবং নদ-নদী ও সাগরের স্বাভাবিক পরিবহনের সুবিধা থাকায় বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য সমৃদ্ধি লাভ করে। শুধু গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহনে ৩০ হাজার নাবিকের চাকরির সংস্থান ছিলো। বাংলার খাদ্যশস্য, বাণিজ্য পণ্য ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এতে সস্তা আর সুলভ ছিল যে, তা এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বণিকদের দারুণভাবে আকৃষ্ট করে। তারা স্থল ও জলপথে বাংলায় প্রবেশ করে। বাংলায় আগত বিদেশি বণিকদের ধারাবাহিক সময়কাল হলো-

১. ১৪৯৮খ্রি. মে মাসে বিখ্যাত পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ভারতের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন। তিনিই ইউরোপ থেকে ভারতে আসার নৌ-পথ আবিষ্কার করেন। আফ্রিকা থেকে ভারতে আসতে তাকে সাহায্য করেছিলেন গুজরাটের এক মুসলিম নাবিক।
২. ভাস্কো-ডা-গামার বহুপূর্ব থেকেই স্থল ও জলপথে আরব বণিকগণ ভারতবর্ষে আসেন।
৩. ১৫১০খ্রি. পর্তুগিজ গভর্নর আল বুকার্ক গোয়া বন্দরে পর্তুগিজ আধিপত্য বিস্তার করেন এবং বাংলাদেশ, হুগলি ও চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন।
৪. ৩১ ডিসেম্বর ১৬০০ খ্রি. ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।
৫. ১৬০২ খ্রি. ডাচ বা ওলন্দাজ কোম্পানি।
৬. ১৬১৬ খ্রি. ডেনিশ বা দিনেমার কোম্পানি।
৭. ১৬৬৪ খ্রি. ফ্রেঞ্চ বা ফরাসি কোম্পানি।
৮. ১৭২২খ্রি. অস্টেণ্ড কোম্পানি।
৯. ১৭৩১ খ্রি. সুইডিশ কোম্পানি।

১৬০৮ খ্রি. ইংরেজ ক্যাপ্টেন উইলিয়াম হকিন্স রাজা প্রথম জেমসের প্রতিনিধি হিসেবে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৮খ্রি. দরবারে এসে উপস্থিত হন।[১১২] হকিন্সের দূরদর্শিতায়, উপহার-উপঢৌকনের বিনিময়ে অন্যান্য দেশের বণিকদের মতো ইংরেজগণও বাণিজ্যিক সুবিধা লাভ করে। বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় ইংরেজগণ ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়। রাজনৈতিক সুবিধা ও ব্যবসায়িক সুরক্ষা হিসেবে জব চার্নক ১৬৯৮খ্রি. জুলাই মাসে সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে মাত্র ১৬ হাজার টাকার বিনিময়ে সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালিঘাট নামক ৩টি গ্রামের জমিদারি কিনে নেন এবং এখানেই পরবর্তীকালে রাজধানী কলকাতা শহরের গোড়াপত্তন ঘটে।[১১৩] বাণিজ্য করতে আসা ইংরেজ বণিকগণ বাংলা তথা ভারতবর্ষ দখল করে রাষ্ট্র ক্ষমতায় বসার দুর্লভ সুযোগ লাভ করে।

সুলতানী ও নবাবী আমলে চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, হুগলি, গৌড় ও কলকাতায় সমৃদ্ধ বাণিজ্য বন্দর গড়ে ওঠে। বাংলার সুতিবস্ত্র, রেশমি কাপড়, মসলিন, যবক্ষার, আফিম, লাক্ষা, মরিচ, চাল, চিনি, লবণ, তেল, মাখন, ঘি, শুটকি মাছ, পান-সুপারি, মোম, গন্ধদ্রব্য, মসলা, আম, হরতকি, লেবু, আদা, ছাগল, কবুতর, মহিষ, হরিণ, মহুয়া, পাটের দড়ি, তুলা, সরিষা ও এলাচের মতো বহু দ্রব্য- এশিয়া, আরব, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা হতো। বহির্বিশ্ব থেকে বাংলায় ঘোড়া, হাতির দাঁত, ক্রীতদাস, চীনামাটির বাসনপত্র আমদানি করা হতো।

বস্ত্র শিল্পের প্রসার প্রসঙ্গে ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার বলেছেন- ডাচরা এইসব কাপড় যথেষ্ঠ পরিমাণে জাপানে ও ইউরোপে চালান দেয়। ইংরেজ ও পর্তুগিজ বণিকরা এবং দেশীয় বণিকরাও প্রধানত এণ কাপড়ের ব্যবসাই করে। তাঁতের কাপড়ের মতন সিল্কের কাপড়ও প্রচুর তৈরি হয় এবং তাঁর বৈচিত্র্যও যথেষ্ঠ। ডাচদের কাশিম বাজারের রেশম কুঠিতে সাতশ-আটশ তাঁতি কাজ করে। ইংরেজ ও অন্যান্য বণিকদেরও এরকম অনেক কুঠি আছে বাংলাদেশে।[১১৪] এসময় ব্যবসায়িক লেনদেন হিসেবে রৌপ্য, তাম্র, স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন ছিল। আবার কড়িরও উল্লেখ পাওয়া যায়। বিনিময় প্রথা গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত ছিল। কড়িতে রৌপ্য ও তাম্রমুদ্রায় পরিণত করতে নিম্নলিখিত পদ্ধতি প্রচলিত ছিল; যথা–

৪ কড়ি	=	১ গণ্ডা	২০ পণ	=	১ কাহন
৫ গণ্ডা	=	১ বুড়ি	৫ কাহন	=	১ টাকা[১১৫]
৪ বুড়ি	=	১ পণ			

ইউরোপীয় বণিকদের কিছু সংখ্যক দলিলপত্র থেকে বাংলার বিরাট রপ্তানি বাণিজ্যের ফলে এ প্রদেশে স্বর্ণ ও রৌপ্যের অনুপ্রবেশের পরিমাণ জানা যায়। নিম্ন তালিকা থেকে বাংলায় ইংরেজদের ক্রয়ের পরিমাণ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়-

১৬৬৮	: পা. ৩৪,০০০	১৬৮০	: পা. ১,৫০,০০০
১৬৭৫	: পা. ৮৫,০০০	১৬৮১	: পা. ২,৩০,০০০
১৬৭৭	: পা. ১,০০,০০০		

সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে বাংলায় ইংরেজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে এর পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। যেমণ-

১৭৩৬/৩৭	: ২,২২,৩৬৬	১৭৪৩/৪৪	: ৫,৬৭,৭৯১
১৭৩৭/৩৮	: ৩,৪৮,৯৬২	১৭৪৪/৪৫	: ৫,৬৬,৬২৭

পলাশী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজদের বাংলার পণ্য কেনার পরিমাণ বাড়লেও এরপর থেকেই ক্রমশই অবনতি শুরু হয়। রাজনৈতিক কারণেই তারা বাংলাকে ইংল্যান্ডের কাঁচাবাজারে পরিণত করে ফেলে।[১১৬] তারপরেও ১৭৫০ খ্রি. বিভিন্ন কোম্পানির বস্ত্র রপ্তানির মূল্য ছিল প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এমনকি ১৭৭০ খ্রি. দুর্ভিক্ষ বাংলার হাজার হাজার লোকের মৃত্যু মহামারীতেও ইংরেজদের বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিলো ৫০ হাজার পাউন্ড।[১১৭]
নবাবী আমলে বাংলায় খাদ্য-বস্ত্রসহ প্রাত্যহিক জিনিসপত্রের দাম ছিল অত্যন্ত সুলভ। এর বাস্তবভিত্তিক তথ্য উপস্থাপন করেছেন- মরক্কোর পর্যটক ইবনে বতুতা (১৩৪৫-১৩৪৬খ্রি.) এবং ফরাসি পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ার (১৬৫৬-১৬৬৮খ্রি.)। বতুতার সময় দিল্লীর সুলতান ছিলেন মুহাম্মদ বিন তুঘলক (১৩২৫-৫১খ্রি.) এবং বাংলার শাসক ছিলেন ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৩৮-১৩৪৯খ্রি.)। তৎকালীন বাংলার পণ্য দ্রব্যের মূল্যমানের তালিকা নিম্নরূপ-

পণ্য	পরিমাণ	মূল্য	পণ্য	পরিমাণ	মূল্য
১. ধান	৮০ রাতল/ ২৮ মণ	৭.০০ টাকা	৭. মুরগি	৮টি	০.৮৮ টাকা
২. চাল	২৫ রাতল/ ৮ মণ ৩০ সের	৭.০০ টাকা	৮. ভেড়া	৮টি	১.৭৫ টাকা
৩. ঘি	১৪ সের/ ১ রাতল	৩.৫০ টাকা	৯. গাভী	১টি	২১.০০ টাকা
৪. তিলের তেল	১৪ সের/ ১ রাতল	১.৭৫ টাকা	১০. কবুতর	১৫টি	২ আনা
৫. চিনি	১৪ সের/১ রাতল	৩.৭৫ টাকা	১১. সুন্দর ক্রীতদাসী	১টি	১০ টাকা[১১৮]
৬. মধু	১৪ সের/১ রাতল	১.০০ টাকা			

[১ রাতল = সেকালের ১ মণ = ২৮ পাউন্ড = বর্তমান ১৪ সের]

ইবনে বতুতা মাত্র ১০ টাকা দিয়ে আশুরা নামের এক সুন্দরী বালিকাকে দাসী হিসেবে কিনেন। এছাড়া তার সফরসঙ্গী বন্ধুও ২০ টাকায় এক বালককে দাস হিসেবে কিনে দেশে নিয়ে যান। সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫খ্রি.) বঙ্গবিজয়ের (১৫৭৫খ্রি.) পর বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীল হয়। এসময় বাংলার পণ্যসমূহের দাম অত্যন্ত কম ছিল। জিনিসের প্রাচুর্যে দেশ ভরে গিয়েছিলো। আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে নিম্নোক্ত তালিকা উল্লেখ করেছেন-

পণ্য	পরিমাণ	মূল্য	পণ্য	পরিমাণ	মূল্য
১. চাল	১ মণ	১৬ দাম	১৪. ছাগলের মাংস	১ মণ	৫৪ দাম
২. গম	১ মণ	১২ দাম	১৫. ঘি	১ মণ	১০৫ দাম
৩. বার্লি	১ মণ	৮ দাম	১৬. দুধ	১ মণ	২৫ দাম
৪. বুট	১ মণ	৬ দাম	১৭. তেল	১ মণ	৮০ দাম
৫. মুগ ডাল	১ মণ	১৮ দাম	১৮. দধি	১ মণ	১৮ দাম
৬. মসুর ডাল	১ মণ	১৬ দাম	১৯. চিনি (সাদা)	১ মণ	১২৮ দাম
৭. গমের ময়দা	১ মণ	২২ দাম	২০. তসর কাপড়	২০ গজ	১-৩ টাকা
৮. যব ময়দা	১ মণ	১১ দাম	২১. বাফতা কাপড়	২০ গজ	$১\frac{১}{২}$ টাকা
৯. গমের ছাতু	১ মণ	১২ দাম	২২. মখমল কাপড়	২০ গজ	৪ টাকা

১০. পেঁয়াজ	১ মণ	১৬ দাম	২৩. মাহমুদী কাপড়	২০ গজ	$\frac{১}{২}$ টাকা
১১. মটর	১ মণ	১২ দাম	২৪. গঙ্গাজল কাপড়	২০ গজ	৪ টাকা
১২. রসুন	১ মণ	৪০ দাম	২৫. জোলা কাপড়	২০ গজ	$\frac{১}{২}$ টাকা[১১৯]
১৩. মহিষের মাংস	১ মণ	৬৫ দাম			

[এখানে ৪০ দাম = ১ টাকা ধরে]

সম্পদের এ প্রাচুর্য সুবাদার শায়েস্তা খানের সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। শায়েস্তা খান মোট ২ পর্বে ২৫ বছর (১৬৬৪-১৬৭৮খ্রি. ও ১৬৭৯-১৬৮৮খ্রি. বাংলা শাসন করেন এবং প্রভূত সম্পদের মালিক হন। তিনি মোট ৩৮ কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করেন এবং তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত টাকার পরিমাণ ছিল ১৭ কোটি টাকা। শায়েস্তা খানের দৈনিক আয় ছিল ২ লক্ষ টাকা ও ব্যয় ছিল প্রায় ১ লক্ষ টাকা। এক বছরে শায়েস্তা খান দিল্লীতে প্রেরণ করেন ৯ কোটি টাকা এবং খানজাহান বাহাদুর ২ কোটি প্রেরণ করেন। যুবরাজ আযম তাঁর সুবাদারি আমলে ৮ কোটি টাকা উপার্জন করেন। এছাড়া নবাব সিরাজউদ্দৌলার সম্পদের পরিমাণ ছিল ৬ কোটি টাকা।[১২০] শায়েস্তা খানের সময় ১ টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়ার কিংবদন্তি আজও প্রচলিত আছে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য পণ্যের প্রাচুর্য, সুলভতায় বাংলা তৎকালীন বিশ্বে বসবাসের উত্তম স্থান হিসেবে পরিগণিত হয়। ১৭২৯ খ্রি. বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদের বাজারে পণ্য দ্রব্যের যে মূল্য পাওয়া যায়, আর তালিকা নিম্নরূপ-

পণ্য	**পরিমাণ**	**মূল্য**	**পণ্য**	**পরিমাণ**	**মূল্য**
১. চাউল (১ম শ্রেণির)	১০ মণ ১০ সের	১ টাকা	৬. তেল (১ম শ্রেণির)	২১ সের	১ টাকা
২. চাউল (২য় শ্রেণির)	১ মণ ২০ সের	১ টাকা	৭. তেল (২য় শ্রেণির)	২৪ সের	১ টাকা
৩. চাউল (৩য় শ্রেণির)	১ মণ ৩৫ সের	১ টাকা	৮. ঘি (১ম শ্রেণির)	১০$\frac{১}{২}$ সের	১ টাকা
৪. গম (১ম শ্রেণির)	৩ মণ	১ টাকা	৯. ঘি (২য় শ্রেণির)	১১$\frac{১}{২}$ সের	১ টাকা
৫. গম (২য় শ্রেণির)	৩ মণ ৩০ সের	১ টাকা			

ব্যাংকের কারবার

ভারতবর্ষে মুসলিম আমলে (১২০৪-১৮৫৮খ্রি.) বিশেষ করে মুঘল আমলে (১৫২৬-১৮৫৮খ্রি.) ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটলে এ ব্যাংক কারবার বা মহাজনী ব্যবসার প্রচলন শুরু হয়। বাংলার নবাবী আমলে (১৭১৭-১৭৫৭খ্রি.) এ ব্যাংক কারবার ফুলে-ফেঁপে ওঠে। ব্যবসায়ীদের ঋণ দান, আমানত জমা রাখা এবং নবাবদের ও জমিদারদের বিশেষ সুদে টাকা ঋণ দান করে জগৎশেঠ, দুর্লভরাম, রাজবল্লভ ও শান্তিদাস বিখ্যাত হয়ে ওঠেন।

এদেরকে সাধারণত শেঠ, সাহা, মহাজন ও সাররাফ নামে অভিহিত করা হতো। এ মহাজনগণ ৪ প্রকার হুণ্ডি বা চেক ব্যবহার করতো; যেমন-

১. দর্শনী হুণ্ডি বা দর্শনমাত্র পরিশোধ যোগ্য

২. মিথি হুণ্ডি বা নির্দিষ্ট তারিখে পরিশোধ যোগ্য

৩. শাহযোগ হুণ্ডি বা মুদ্রার মতো, যে কোন মুহূর্তে বিক্রয় যোগ্য

৪. জোহখামি হুণ্ডি বা বিনিময়পত্র।

জগৎশেঠ এ ব্যবসা করে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন। 'জগৎশেঠ' তাঁর উপাধি, আসল নাম ফতেহ চাঁদ। জাতিতে জৈন সম্প্রদায়ের হলেও তিনি অনেকটা হিন্দু সমাজভুক্ত হয়ে ওঠেন। জগৎশেঠ তাঁর টাকার প্রভাবে নবাব সরফরাজ, আলীবর্দী খান ও সিরাজের সময় রাজনৈতিক প্রভাব খাটাতে শুরু করেন। নবাব ও বণিকদের তিনি ঋণদান করে বিশাল ক্ষমতাধর ব্যক্তিতে পরিণত হন। জগৎশেঠের কাছ থেকে ১৭৫৬ খ্রি. ডাচ বণিকগণ বার্ষিক ৯% সুদে সাড়ে চার লক্ষ টাকা গ্রহণ করে। জগৎশেঠ অনেক সময় জমিদারদের বকেয়া রাজস্বের জামিন থাকতেন এবং নবাবের জন্য মুদ্রা অঙ্কনের বিরাট সুবিধা লাভ করেন।[১২১]

বাংলার ঐশ্বর্য-বিলাসের কয়েকটি নমুনা-

১. সেন রাজা বল্লাল সেনের (১১৬০-১১৭৮খ্রি.) সময়কার ধনকুবের স্বর্ণবণিক বল্লভানন্দের ঘরে তৎকালীন ১৬ কোটি স্বর্ণমুদ্রা মজুত ছিল।[১২২]

২. জগৎ শেঠদের (ফতেহ চাঁদ ও মাহতাব চাঁদ) গদিতে তৎকালীন সময়ে (১৭৪৪-১৭৫৬খ্রি.) সব সময় ১০ কোটি টাকার ব্যবসা চলতো।[১২৩]

৩. পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭খ্রি.) পর সিরাজউদ্দৌলার হীরাঝিলের প্রকাশ্য ধনভাণ্ডারে পাওয়া যায়- ১ কোটি ৭৬ লক্ষ রৌপ্য মুদ্রা, ৩২ লাখ স্বর্ণ মুদ্রা, ২ সিন্ধুক অমুদ্রিত স্বর্ণপিণ্ড, ৪ বাক্স হীরা-জহরত এবং ২ বাক্স চুনী-পান্না প্রভৃতি।[১২৪]

৪. হীরাঝিলের গোপন ভাণ্ডারে মজুত ছিল প্রায় ৮ কোটি টাকা। এ টাকা ভাগ করে নিয়েছিলেন মীর জাফর, বেগ খান, রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণ। পলাশীর যুদ্ধের সময় রামচাঁদ ও নবকৃষ্ণের বেতন ছিল মাসিক ৬০ টাকা অথচ ১০ বছর পর ১৭৬৭খ্রি. রামচাঁদ মৃত্যুর সময় রেখে গিয়েছিলে ৭১ লক্ষ টাকা, ৪০০টি কলস ভরা স্বর্ণ, ২০ লক্ষ টাকার জহরত ও ১৮ লক্ষ টাকার জমিদারি। আর নবকৃষ্ণ পলাশীযুদ্ধের (১৭৫৭খ্রি.) কয়েক বছর তার মায়ের শ্রাদ্ধে ব্যয় করেন তৎকালীন ৯ লক্ষ টাকা।[১২৫]

৫. বাংলায় প্রথম শারদীয় দুর্গা পূজার প্রচলন করেন রাজশাহীর তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। ১৫৮০ সালেই তিনি পূজায় ব্যয় করেছিলেন প্রায় ৯ লক্ষ টাকা।[১২৬]

৬. নদীয়ার রাজা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় ১৭৫৩ খ্রি. মাঘ মাসে যে অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ করেন, তাতে ব্যয় হয়েছিল তৎকালীন ২০ লক্ষ টাকা। [অতুলসুর : বাঙলা ও বাঙলীর বিবর্তন, পৃ-৩০৪]

৭. মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩খ্রি.) পিতৃব্য রাধামোহন দত্ত তাঁর পুত্রের কল্যাণে ১০৮টি কালীপূজা করেন। এতে ১০৮টি মহিষ, ১০৮টি ভেড়া ও ১০৮টি সোনার জবাফুল ব্যবহার করেন।[১২৭]

৮. মধুসূদনের শৈশবস্থায় কলকাতার এক বাবু 'নিকি' নামক এক বাইজি কিনেন ১ লক্ষ টাকা দিয়ে। তাকে প্রতিমাসে মাসোহারা দেয়া হতো ১ হাজার টাকা। এছাড়া বাবু রামদুলাল দে তার মায়ের শ্রাদ্ধে ব্যয় করেন ১ লক্ষ টাকা।[১২৮]

৯. ভারতের হায়দারাবাদের ৭ম নিজাম ১ম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৯১৮খ্রি.) ব্রিটিশ যুদ্ধ তহবিলে দান করেন আড়াই কোটি পাউন্ড। তার পূর্ব পুরুষগণ ১০০ সোনার থালায় খাবার খেতেন। নিজামের ছিল ২৮০ ক্যারেটের বিশ্বখ্যাত জ্যাকব হীরা, কয়েক ডজন ট্রাংক বোঝাই ছিল স্বর্ণ, হীরা জহরত ছিল অসংখ্য এবং মজুদ ছিল ২০ লাখ পাউন্ড। তৎকালে তিনিই ছিলেন বিশ্বের অন্যতম ধনী ব্যক্তি।[১২৯]

১০. ঢাকার অদূরে মানিকগঞ্জের মত্ত মঠের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের সময় (১৮৯৪ খ্রি.) দেয়া হয়েছিল ৫টি সোনার কলস। প্রসন্নকুমার সেন তার পিতা রামকৃষ্ণ সেনের স্মৃতি রক্ষার্থে এ মঠটি নির্মাণ করেছিলেন। [মহা. সাইফ উদ্দিন (সম্পা.) মানিকগঞ্জ জেলার ইতিহাস; ১৯৮৭, পৃ- ৪১০]

১১. পূর্ণিয়া বিজয়ের পর নবাব সিরাজউদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ ফিরে তার ধন সম্পদের হিসাব নেন। মণিমুক্তা ছাড়াই এর পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৮ কোটি টাকা। যা কোন ভাবেই ৪০,০০,০০০ পাউন্ডের কম ছিল না।[১৩০]

১২. ১৮২০ খ্রি. কলকাতার ধনকুবের রাম দুলাল দে ও রামরত্ন মল্লিক তাদের ছেলেদের বিয়ে দেন। সরকারি গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়ে সবাইকে গণহারে নিমন্ত্রণ দেয়া হয়। ইংরেজদের জন্য ২দিন ধরে খাবার ও আনন্দের আয়োজন করা হয় এবং হিন্দু-মুসলিমদের ৪দিন ধরে খানা-পিনা ও আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। এতে খরচ হয় প্রায় ৭-৮ লক্ষ টাকা।

১৩. নবাব আলীবর্দী খান তার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ও ইকরামউদ্দৌলার বিয়েতে মুর্শিদাবাদে ২০০০ খিলাত প্রদান, অতিথিদের খাবারের তোড়া এবং ১০০০০০ সৈনিক ও ১০০০০০০০ প্রজা ৩ মাস যাবত যে আতশবাজি ও গান-বাজনার মাধ্যমে আনন্দ উৎসব করে তাতে অন্যান্য খরচ বাদে শুধু আলোকসজ্জাতেই তৎকালীন ১২ লক্ষ টাকার মতো ব্যয় হয়েছিল। এ আড়ম্বরপূর্ণ বিয়ে পরবর্তীকালে মানুষের মুখে মুখে গল্পের খোরাক জুগিয়েছে। [এম.এ রহিম; বাংলা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; পৃ- ৯৬]

সমাজ

বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি মূলত স্বাধীন সুলতানী ও স্বাধীন নবাবী আমলে (১৭১৭-১৭৫৭খ্রি.) বিকশিত হয়। সুলতানী আমলে বাংলার রাজধানী ছিল সোনার গাঁও, মুঘল সুবাদারী আমলে ঢাকা (জাহাঙ্গীর নগর-১৬১০খ্রি.) ও নবাবী আমলে মুর্শিদাবাদ (১৭১৭খ্রি.)। যদিও বাংলার সমাজ জীবন দুটি ধারায় গড়ে ওঠেছিল, যথা- গ্রামীণ সমাজ ও নাগরিক সমাজ। কিন্তু নগরগুলো একটি 'বর্ধিষ্ণু গ্রাম' (overgrown village) ছাড়া অন্য কিছু ছিল না বলেই ইরফান হাবিব মনে করেন। মুঘল আমলে বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যে মোট ১২০টি বড় শহর এবং ৩২০০টি ছোট শহর গড়ে ওঠেছিল।[১৩১] তবু বলা যায়- এসব শহরের গঠন কাঠামো ছিল অনেকটা গ্রামের মতো এবং প্রাণশক্তি ছিল গ্রামীণ অর্থনীতি।

নগরের রাজ দরবার, রাজপ্রাসাদ, হেরেম, সামরিক, রাজস্ব, শিল্প-কারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্য বিভাগের সংশ্লিষ্ট জনবল নিয়েই মূলত নাগরিক সমাজ গড়ে ওঠেছিল। অন্যদিকে গ্রামীণ সমাজ গড়ে ওঠেছিল ভূমিজীবী (ভূমি নির্ভর) ও বর্ণজীবী সম্প্রদায়ের সমন্বয়ে। এ সামন্ততান্ত্রিক ভূমি নির্ভর সমাজ কাঠামোতে সুলতান বা নবাবের বাইরে ছিল- ১. জায়দীরদার বা জমিদার ২. রাজস্ব আদায়কারী, ৩. চৌধুরী, লম্বরদার, মণ্ডল, মাতব্বর ও সরপঞ্চ পদবিধারী ব্যক্তিবর্গ ও ৪. কৃষক (খোদকাস্ত ও পাইকাস্ত)। এছাড়া পাঠান আমলে লগ্নিপুজি বা মহাজন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এ পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি নির্ভরশীল সমাজকে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়- ১. জায়গিরদার, জমিদার, রাজস্ব সংগ্রহকারী, মহাজন ও ব্যবসায়ী, ২. ধনী কৃষক ৩. মধ্যস্তরের কৃষক ৪. নিম্নস্তরের কৃষক ও ৫. ভূমিহীন কৃষক।[১৩২]

আর বর্ণ বা বৃত্তিজীবী শ্রেণিতে ছিল অসংখ্য জনগোষ্ঠী যেমন- তাঁতী, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, ধোপা, নাপিত, ডোম, হাড়ি, চামার, ছুতার, রাজমিস্ত্রি, মজুর জনগোষ্ঠীর লোক। এদের কর্ম পেশাসূত্রে নয়, বরং জন্ম বা উত্তরাধিকার সূত্রে নির্ধারিত। তৎকালীন অপরিবর্তনীয় স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতিতে এ সমস্ত বর্ণজীবী মানুষের কর্মগুলো ধর্মাচার বা শাস্ত্রাচারানুযায়ী বহুকাল যাবত সমাজে স্বীকৃত ছিল। এছাড়া বাংলায় প্রধানত হিন্দু ও মুসলিম জাতির বসবাস দীর্ঘকাল যাবত মোটামুটি সম্প্রীতির ভেতর দিয়েই চলে এসেছিলো।

মুসলিম সমাজ

এয়োদশ শতকের শুরুতে বাংলার সমাজে একটি সুস্পষ্ট বাংলাভাষী মুসলিম জনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটে। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থাভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে আপাতত অব্যাহতি পাবার আশায় যেমন বাংলার কৃষক, কারিগর ও বণিক শ্রেণির লোকেরা পূর্ব জাতিবর্ণ বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হয়, তেমনি সকল সামাজিক গোষ্ঠীর লোকজন আবার একইভাবে গণতান্ত্রিক ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এতে বাংলার সমাজ কাঠামোর কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি। কারণ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত বৃহত্তর গরীব জনগোষ্ঠীর আর্থিক অবস্থার তাৎপর্যপূর্ণ কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। বস্তুত ইসলামের ধর্মীয় গণতন্ত্রের সাথে অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের কোন যোগসূত্র ছিল না। নিম্নশ্রেণির ধর্মান্তরিত লোকেরা ধর্মাচারণে কতকটা সাম্যভাব অনুভব করলেও বৈষয়িক ব্যাপারে তারা প্রায় আগের মতোই নিম্নস্তরে রয়ে গেল। জীবন যাত্রার দিক থেকে মুসলিম নিম্নশ্রেণি অনেকটা হিন্দু নিম্নশ্রেণির ন্যায় সামাজিক স্তর বিন্যাসের নিচের তলায় পড়ে থাকে। বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থকে বাংলার মুসলিম সমাজে ৪টি গোষ্ঠী লক্ষ করা যায়, যথা- ১. বহিরাগত আমীর-ওমরাহ, ২. আগন্তুক মুসলিম জনগোষ্ঠী, যারা এদেশে বিয়ে করে, ৩. ধর্মান্তরিত মুসলমান, যারা এদেশে নিম্নবর্ণের গ্রামবাসী ও ৪. মিশ্র মুসলমান, যাদের পিতা বা মাতা কেউ হিন্দু ছিল। এ ৪টি শ্রেণির মুসলিম গোষ্ঠী মূলত ২টি শ্রেণিতে গিয়ে নির্দিষ্ট হয়, যথা- অভিজাত শ্রেণি ও নিম্নশ্রেণি।[১৩৩]

আবার ড. অতুল সুরের মতে, বাঙলার মুসলমানদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যেতে পারে। যথা- ১. আগুন্তক মুসলমান, ২. ধর্মান্তরিত মুসলমান ৩. উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত মুসলমান। প্রথম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক হচ্ছেন শাসকগণ কর্তৃক আনীত বিদেশি মুসলমানদের বংশধর। যারা আমীর-ওমরাহর পদ অলংকৃত করতেন। দ্বিতীয় শ্রেণির মুসলমানদের মধ্যে যারা স্বেচ্ছায় বা জোর করে ইসলামে দীক্ষিত হতো। আর তৃতীয় শ্রেণির মুসলমান হলো পূর্বোক্ত দুই শ্রেণির সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানগণের বংশধর।[১৩৪] আবার অনেকে এ তিন শ্রেণির নামকরণ করেছেন; যথা- ১. আশরাফ ২. আতরাফ ৩. আরজফ।

বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয়ের (১২০৪খ্রি.) পূর্ব থেকেই এদেশে আরব বণিকগণের যাতায়াত ছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে তারা মুসলিম উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বখতিয়ারের বঙ্গ বিজয়ের পর বাংলায় দলে দলে পীর-দরবেশ, সাধু, সন্ত, ওলি-আউলিয়াদের প্রবেশ ঘটে। এদের উদার-মহানুভবতা ও আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে এদেশের ব্রাহ্মণ্য নিপীড়িত নিম্নবৃত্তিজীবী হিন্দুদের বৃহৎ অংশ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। আবার মুসলিম কাজি, কর্মকর্তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমর্থনে কিছু অংশ ইসলামে দীক্ষিত হয়। তবে এ হার অনেক কম। মুর্শিদকুলী খান, খান জাহান আলী, ইলিয়াস শাহ, সিকান্দার শাহ, জালালুদিনের বিবাহ ও ধর্মান্তকরণ প্রথা এর ব্যতিক্রম ও সংখ্যায় নগণ্য। আবার কালাপাহাড়ের মতো হিন্দুর মুসলমান হয়ে স্বজাতি বিদ্বেষী হবার কাহিনিও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। আবার পদস্থলিত হিন্দু বিধবা ও সধবা নারী সমাজে স্থান না পেয়ে মুসলিম দরগাহ ও খানকায়ে সহজে আশ্রয় পেতো। কিছু হিন্দু নারী মুসলিম সৈনিক কর্তৃক বলাৎকারের শিকার হলে, তারাও ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হতো।

অন্যদিকে মনিব বা জমিদার মুসলমান হলে তার অনুগত ক্রীতদাস ও নির্ভরশীল স্বজনদেরও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা ছাড়া উপায় থাকতো না। এরা মুসলমান হবার পরও পূর্বের বৃত্তি বা পেশা ত্যাগ না করে বরং বহাল থাকতো। আবার নামের ক্ষেত্রেও তেমন পরিবর্তন আসতো না। যেমন- কালু শেখ, কালাচাঁদ, ব্রজ শেখ, গোপাল মণ্ডল, হারুশেখ, কানু মাতবর প্রমুখ।

এছাড়া পূজা-পার্বণ, লোকাচার ব্রত উৎসব ও পোশাকেও হিন্দু-মুসলমান প্রায় সমগোত্রীয় হয়ে ওঠে। আবার মুসলিম সমাজে শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান, খন্দকার বংশীয় গৌরব বা কৌলিন্য বজায় ছিল। এছাড়া সুন্নি, শিয়ার প্রভাব এবং হানাফী, মালেকী, হাম্বলী ও সাফেয়ী মাজহাবী গোত্রে বিভক্ত ছিল। অভিজাত শ্রেণির মধ্যে সুবাদার, আমির-ওমরাহ, দিউয়ান, বকশি, মনসবদার, কাজি, আলেম, উলামা, বণিক ও বারো ভূইয়া জমিদারগণ। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিলেন মূলত শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে সুলতান বা নবাবের প্রতিনিধি। এদের দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার উপরই রাজ্যের সমৃদ্ধি ও শৃঙ্খলা নির্ভর করতো। এদের মধ্যে ছিলেন- সামরিক, বেসামরিক, বিচার ও রাজস্ব বিভাগের নিম্নপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ। শিক্ষক, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ, কবি, লেখক, ধর্ম-প্রচারক, স্থপতি, শিল্পী, কারিগর, ধনী কৃষক ও মহাজন এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ শ্রেণির মধ্যে ছিলেন- দরিদ্র ও ভূমিহীন কৃষক, ছোট ব্যবসায়ী, অদক্ষ কারিগর, কারখানার শ্রমিক, নিম্নশ্রেণির সৈনিক, পেয়াদা ও রাজকর্মচারী। এছাড়া দর্জি, তাঁতি, মুকেরি, পিঠারি, কাবারি, সানাকার, তীরকার, কাগজি, কলন্দর, হাজাম, রাখাল, সিউলি (গাছি), পটুয়া ও রঙরেজিনী প্রমুখ। সমাজের অর্থনীতির চাকাকে এরা তাদের ঘামের বিনিময়ে সচল রাখতো।

হিন্দু সমাজ

বৈদিক যুগ থেকেই বাংলার হিন্দু সমাজ চতুর্বর্ণে (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র), চতুরাশ্রমে (ব্রহ্মচর্য, গ্রার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) ও চতুর্বর্গে (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) বিভক্ত বিন্যস্ত ও প্রভাবিত ছিল। শাস্ত্র ও সংহিতাই ছিল সমাজ শাসনের সংবিধান। সাধারণভাবে ব্রাহ্মণরা ধর্মীয় পূজা-পার্বণ ও সমাজ শাসনের বিধানদাতা রূপে কাজ করতেন। ক্ষত্রিয়গণ রাষ্ট্রশাসন ও পরিচালনা করতেন। বৈশ্যগণ ব্যবসায়-বাণিজ্য করতেন। আর শূদ্রগণ পূর্বোক্ত তিন শ্রেণির সেবামূলক কাজ করতে বাধ্য থাকতো। তবে বাংলার সমাজ বিন্যাসে ৪ বর্ণের পরিবর্তে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র- এ দুই বর্ণের প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণগণ ১. শিক্ষিত বা শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ, ২. যাজনিক ব্রাহ্মণ ৩. গ্রত-বিপ্র ব্রাহ্মণ ও ৪. অগ্রদানী ব্রাহ্মণ- এসব শ্রেণিতে বিভক্ত ছিলেন। এ ব্রাহ্মণদের পরে যে ব্রাহ্মণেতর শূদ্র রয়েছে, তা আবার ৪১টি উপবর্ণে বিভক্ত। প্রতিপত্তি ও মর্যাদার দিক থেকে বাংলার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের পরই সৎ শূদ্রভুক্ত বৈদ্য ও কায়স্থদের স্থান। এদের নিচেই রয়েছে- নবশাম নামে পরিচিত বিভিন্ন সৎ শূদ্রগোষ্ঠী (শাঁখারী, মোদক, তাঁতী, কর্মকার, স্বর্ণকার ও বারুজীবী)। আর সবার নিচে রয়েছে অন্ত্যজ জনগোষ্ঠী, যাদেরকে বিখ্যাত বাঙালি সমাজতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক রণজিৎ গুহের ভাষায়- নিম্নবর্গের লোকজন (Sub-alturn people) বলা যেতে পারে।[১৩৫]

ব্রাহ্মণ ছাড়া আর যত উপবর্ণ সমাজে বিদ্যমান রয়েছে, এদেরকে সমাজপতিগণ ৩টি শ্রেণিতে বিভক্ত করেছেন। যথা- উত্তম সংকর, মধ্যম সংকর ও অধম সংকর তথা অন্ত্যজ শ্রেণি। ব্রাহ্মণরা এ সকল শূদ্রভুক্ত সংকর উপবর্ণগুলোর সামাজিক স্থান, মর্যাদা ও বৃত্তি বা পেশা নির্দিষ্ট করে দেন। তিন পর্যায়ে বিভক্ত ৪১টি উপবর্ণের মধ্যে উত্তম সংকর পর্যায়ে ২০টি, মধ্যম সংকরে ১২টি এবং অধম সংকরে ৯টিতে বিন্যস্ত ছিল। এসব মিলিয়েই হিন্দু সমাজ যে বিভিন্ন গোত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়, তারা হলো- করণ, কায়স্থ, বৈদ্য, কৈর্বত মাহিষ্য, দত্ত, পাল, মিত্র, বর্মণ, দাস ভদ্র, সেন, দেব, ঘোষ, কুণ্ড, পালিত, নাগ, চন্দ ও দাস অন্যতম। পেশাজীবীদের মধ্যে- অম্বষ্ঠ, আগুরি, কর্মকার, করণ, তেলি, তামলি, কংস বণিক, সুবর্ণ বণিক, গন্ধবণিক, তন্তুবায়, পোদ, মালাকার, মোদক,

রজক, বারুজীবী, গোপ, বৈদ্য, শুড়ি, ধীবর, নিষাদ, নাপিত, বাগদি, হাড়ি, ডোম, চর্মকার, চণ্ডাল অন্যতম। এদের মধ্যে- হাড়ি, বাগদি, নিষাদ, ডোম, চর্মকার ও চণ্ডাল হলো অস্পৃশ্য বা ম্লেচ্ছ জাতি। যাদেরকে সমাজে সকলে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করতো।

সেন আমলে ব্রাহ্মণদের প্রতাপে হিন্দু সমাজে শাস্ত্রকারগণ খুবই রক্ষণশীল হয়ে পড়েন। এরা হিন্দু সমাজের আভিজাত্য বজায় রাখতে প্রচার করেন- 'যবন দোষে, কাশীদাশে ও বামুন ঘেষে– এই তিন সর্বনেশে।' ব্রাহ্মণগণ হিন্দুদের জন্য সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করেন, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ করেন, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা চালু করেন এবং মুসলমান কর্তৃক ধর্ষিতা নারীকে সমাজচ্যুত করেন। এভাবে হিন্দু জাতি যখন অস্তিত্বের সংকটে পড়ে, তখন শ্রী চৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রি.) মানব ধর্মের আলোড়নে হিন্দুধর্ম রক্ষা পায়। চৈতন্যের উদারতা, মানবতা ও প্রেমের বাণীতে হিন্দুগণ পুনরায় আর্যাবর্তের ঐতিহ্যে উজ্জীবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বিরত হয়। তখন শাস্ত্রকার রঘুনন্দন খুব অল্প প্রায়শ্চিত্তে হিন্দু নর-নারীকে পুনরায় হিন্দু জাতে তুলতে শাস্ত্র ও বিধানকে শিথিল করেন।

সতীদাহ প্রথা বহুকাল যাবতই এদেশে প্রচলিত ছিল। তবে সেনযুগ থেকে এটি প্রথায় পরিণত হয় এবং ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। পুরাণে মাদ্রি, গুপ্তযুগে ভোজরাজের স্ত্রী, সিন্ধুরাজ দাহিরের স্ত্রী, চৌহান রাজ পৃথ্বিরাজের স্ত্রী পদ্মিনী ও রাজপুত রমণীদের জওহরব্রত বা সতী হবার কথা শোনা যায়। কিন্তু সেন আমল থেকে এ প্রথা ভয়ংকর আকার ধারণ করে। কারণ কঠিন বৈধব্য রীতি বা একাদশী পালন করা ও পুরুষের লালসা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে ব্যর্থ হবার দরুন সমাজে অনাচার বৃদ্ধিপায়। এ অনাচার ও কুলের কলঙ্ক দূর করতেই এ সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা চলে আসে। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩খ্রি.) এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁর নিজের বড় ভাইয়ের স্ত্রী সহমরণে আত্মবিসর্জন করেন।[১৩৬] এতে তিনি খুবই ব্যথিত হন এবং এ প্রথা দূর করতে দৃঢ় পণ করেন। বাল্যবিবাহ ও গৌরীদান প্রথাও এ সতীদাহের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়েছিল। রামমোহনের অক্লান্ত পরিশ্রম, যুক্তি-দর্শন, সাহস ও উদ্যমের ফলে তৎকালীন বড়লাট উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ খ্রি. ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা আইন করে নিষিদ্ধ করেন। ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত ও বাস্তবভিত্তিক বর্ণনার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাল্যবিবাহ ও গৌরীদানের প্রথাও এ সময় ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। মুসলমানদের প্রভাব ও বর্গিদের অত্যাচার হতে হিন্দু নারীদের রক্ষা, কুলের সম্মান বাঁচানো ও পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে সমাজপতিগণ বাল্যবিবাহের প্রচলন করেন। দেবিবর ঘটকের কৌলিন্য প্রথাই এর জন্য দায়ী। নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩খ্রি) লীলাবতী (১৮৬৭ খ্রি.) নাটকে কৌলিন্য প্রথার বিজয় ও অন্ধমোহ ঘোষণা করা হয়েছে। এতে করে এক দিকে কুলীন ব্রাহ্মণদের বিয়ে করার ব্যবসা শুরু হয়ে যায় এবং অন্যদিকে অকুলীন ও দরিদ্র পিতা-মাতা কন্যা দায়গ্রস্ত হয়ে পড়ে। কুল রক্ষার্থে ৭০ বা ৮০ বছরের ব্রাহ্মণের কাছে শিশুকন্যাকে বিয়ে দিয়ে জাত রক্ষা করতে সমাজ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণগণ যৌতুক ও নারী লাভের কারণে এক-দেড়শ পর্যন্ত বিয়ে করে ফেলে। কিন্তু তার একার মৃত্যুর ফলে যে এক-দেড়শ নারী বিধবা হয়ে যায়, তাদের দুঃখের আর সীমা থাকতো না। আবার সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ থাকায় সমাজ আযাচারে-পাপাচারে ভরে ওঠে। কারণ অল্পবয়সী নারীদের সংযম রক্ষা করে একাদশী পালন করা অসম্ভব হয়ে ওঠে এবং পুরুষের লালসার কাছে অনেকে যায় বন্দি হয়ে। বাংলার বিধবা নারীদের এ চরম দুর্দশা ও লাঞ্ছিত জীবনের করুণ অবস্থা দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১খ্রি.) মর্মাহত হয়ে পড়েন। তিনি শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা পুস্তক লিখে বিধবা বিবাহের বৈধতা প্রচার করেন। সমাজের ভয়কে উপেক্ষা করে, সীমাহীন শ্রম ও উদ্যোগের মাধ্যমে এবং বিপুল টাকা খরচ করে তিনি এর বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তাঁর

ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮৫৬ খ্রি. ১৬ জুলাই এদেশে আইনগতভাবে বিধবা বিবাহ বৈধ করা হয় এবং এর প্রচলন ঘটে। এছাড়া কন্যা সন্তান হত্যা বা গঙ্গায় সন্তান বিসর্জনও আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। বিধবা বিবাহ সংক্রান্ত কয়েকটি নমুনা-

১. রাজা রাজবল্লভ তাঁর ৯ বছর বয়সী বিধবা মেয়ের (অভয়ার) বিয়ে দেবার অনেক চেষ্টা করে পণ্ডিতদের বিধান আদায় করেছিলেন। কিন্তু নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের (১৭১০-১৭৮২খ্রি.) চক্রান্ত ও বিরোধিতায় তা ব্যর্থ হয়।[১৩৭]

২. নাটোরের রানী ভবানীর বালিকা কন্যা তারা সুন্দরীর বিয়ে হয় জমিদার রঘুনাথ লাহিড়ীর সঙ্গে। তার মৃত্যু হলে অপূর্ব সুন্দরী বিধবা তারা সুন্দরীকে নিয়ে রানী ভবানীর দুঃখ-কষ্টের সীমা ছিল না। বহু চেষ্টা করেও সেই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমর্থনের অভাবে তিনি ব্যর্থ হন।[১৩৮]

৩. বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের প্রায় ১০ বছর পূর্বেই কলকাতার বউ বাজার অঞ্চলের নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে একদল প্রগতিশীল লোক এর চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়।[১৩৯]

৪. এদেশের প্রথম বিধবা বিবাহ হয় ১৮৫৬ খ্রি. ৭ ডিসেম্বর। রামধন তর্কবাগীশের পুত্র শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও ব্রক্ষানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ১০ বছরের বিধবা কন্যা কালীমতী দেবীর সঙ্গে।[১৪০]

৫. ১৮৫৬ সালের ৯ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ। কৃষ্ণকালী ঘোষের পুত্র মধুসূদন ঘোষের সঙ্গে ঈশানচন্দ্র মিত্রের ১২ বছরের বিধবা কন্যার।[১৪১]

৬. তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবা বিবাহ হয় বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর (মধুসূদন দত্তের সহপাঠী) জেঠতুতো দুই ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও মদনমোহন বসুর।[১৪২]

৭. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৭০ খ্রি. তার একমাত্র পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিয়ে দেন শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায়ের বাল্য বিধবা কন্যা ভবসুন্দরীর সঙ্গে।[১৪৩]

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৯ জানুয়ারি ১৯১০ খ্রি. তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিনয়িনী দেবীর বিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর বিয়ে দেন। এ প্রতিমা ছিলেন গগেন্দ্রনাথের ভাগ্নি।[১৪৪]

ক্রীতদাস

ক্রীতদাস প্রথা একটি প্রাচীনতম প্রথা, হিন্দু ও মুসলিম আমলে উপমহাদেশের অন্যান্য অংশের মতো বাংলায়ও প্রচলিত ছিল। আর্যদের সময় হতে ক্রীতদাস করার রীতি প্রচলিত ছিল। আর্যগণ বিজিত অনার্যগণকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে শুরু করে। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতেও বিজয়নগর রাজ্যে এ দাস প্রথার প্রচলন দেখা যায়। দিল্লী সালতানাত ও মুঘল আমলের মতো বাংলায়ও দাস প্রথা প্রচলিত ছিল। আবুল ফজল, ইবনে বতুতা, বারবোসা ও ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের বিবরণীতে বাংলায় দাস প্রথার চিত্র পাওয়া যায়। যুদ্ধ বন্দিদের দাস হিসেবে সংগ্রহ করা হতো। এদেরকে বিজেতারা ভাগ করে নিতো, আবার অনেক সময় বিক্রি করে দিতো। অনেক ক্ষেত্রে কোন যুক্তি ছাড়াই কোন গ্রামে অভিযান চালিয়ে দাস সংগ্রহ করা হতো। এটি সম্রাট আকবর ও জাহাঙ্গীর নিষিদ্ধ করে দেন। আবার অনেক সময় দরিদ্র ও ঋণগ্রস্থ বাবা-মাও নিজ সন্তানদের বিক্রি করে দিতো। এভাবে ক্রয়কৃত বালকদের খোজায় পরিণত করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিতে কিছু বালকের করুণ মৃত্যু হতো। পর্তুগিজ পর্যটক বারবোসা বলেন- এ শহরের (বাঙ্গালা) মুর দেশীয় বণিকগণ দেশের অভ্যন্তরভাগে চলে যায় এবং পিতামাতা এবং অপহরণকারীদের নিকট থেকে বহু হিন্দু বালক ক্রয় করে তাদেরকে খোজায় পরিণত করে। এর

ফলে কিছু সংখ্যক মারা যায়। ,,, পণ্যদ্রব্যের মতো পারস্য দেশীয়দের নিকট প্রত্যেককে ২০ বা ৩০ ডুকাটে (ভেনিসীয় মুদ্রায়) বিক্রয় করা হয়।[১৪৫]

এদেরকে রাজ অন্তঃপুর ও হেরেমের নিরাপত্তা ও দ্বার রক্ষকের কাজে নিয়োগ করা হতো। পর্তুগিজ, আরাকানের মগ ও কিছু দালাল শ্রেণির লোক এমন নিষ্ঠুর ব্যবসা করতো। সমুদ্র তীরবর্তী ও নদী অঞ্চলে হানা দিয়ে মানুষকে দাসে পরিণত করে বিক্রী করতো। আবার দুর্ভিক্ষের সময়ও স্থায়ী দারিদ্র্যের কারণে অনেক বাবা-মা তার নিজ সন্তানকে বিক্রি করে দিতো। ৭৬ ও ৪৩-র মন্বন্তরেও এ রকম চিত্র দেখা গেছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬খ্রি.) 'নমুনা' গল্পে এর জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া ক্রীতদাসের একটি বড় উৎস ছিল আবিসিনিয়া, ইথিওপিয়া, আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, পারস্য, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ার দেশসমূহ। ইথিওপিয়া ও আবিসিনিয়ার দাসদের বাংলায় খুব চাহিদা ছিল। বাঙালি সুলতানদের হাবশিগণ এত বেশি প্রতাপশালী হয়ে ওঠেছিল যে, তারা ইলিয়াস শাহী বংশের সিংহাসন দখল করে এবং হাবশি বংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে। সারা, গুল ও লালা নামের ৩ জন ক্রীতদাসী সুলতান গিয়াসউদ্দিন আজম শাহের হেরেমে বিরাট সম্মান লাভ করে। সিরাজউদ্দৌলার স্ত্রী লুৎফুন্নেসাও পূর্ব জীবনে একজন ক্রীতদাসী ছিলেন। ইবনে বতুতা (১৪৪৫-৪৬খ্রি.) বাংলার সোনারগাঁও ভ্রমণে এসে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে আশুরা নামে এক সুন্দরী দাসী কেনেন এবং তার সফরসঙ্গী বন্ধুও ২০ টাকায় এক নওজোয়ান দাস কিনেছিলেন। ইসলামে ক্রীতদাসকে সামাজিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী আদর্শ, সুফী-দরবেশদের মানবতাবাদের কারণেই ধীরে ধীরে এ প্রথা কোমলরূপ ধারণ করে এবং একসময় বিলুপ্তি ঘটে। বাংলার দাস প্রথা গ্রিক ও রোমানদের মতো ভয়াবহ ছিল না। বাংলার দাস-দাসীরা মূলত গৃহভৃত্য, চাষবাস ও সৈনিকের পেশায় নিযুক্ত হতো।

নারীর মর্যাদা

নারীর মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলায় হিন্দুদের তুলোনায় মুসলিম সমাজ কিছুটা অগ্রগামী ছিল। কারণ হিন্দু ধর্মে নারীর কোন স্বাধীনতা, পিতা বা স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকার ছিল না। আবার তাদের ব্যক্তিত্বের অবমাননাকর কৌলিন্য প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, কন্যা সন্তান হত্যা ও দেবদাসীকরণ প্রথা তখনো হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিল। এছাড়া মুসলমান মেয়ের মতো তাদেরও পর্দা প্রথা মানতে হতো। অবশ্য অভিজাত হিন্দু-মুসলিম নারীগণই এ পর্দা প্রথা রক্ষা করে চলতেন। রবীন্দ্রনাথের দাদিমা দিগম্বরী দেবী গঙ্গাস্নানের সময় পালকি থেকে বের হতেন না। পালকিসহ তাকে কয়েকবার নদীর জলে ডুবানো হতো। এতেই তিনি গঙ্গাস্নান সম্পন্ন করতেন, তবুও পালকি থেকে বের হতেন না।

তবে কিছু অভিজাত শ্রেণির নারীরা উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পেয়ে বিখ্যাত হয়েছিলেন। পাণ্ডিত্য ও প্রশাসক হিসেবে যোগ্যতার পরিচয় দিতেও সক্ষম হন। যেমন- নাটোরের নারী ভবানী, ঝাঁসির রানী লক্ষ্মীবাঈ (১৮৩৫-১৮৫৮খ্রি.), রাসসুন্দরী দেবী (১৮০৮-১৮৯৯খ্রি.), মল্লিকা, চন্দ্রবতী, রামী ও মাধবী অন্যতম। মুসলমান অভিজাত বংশেরও অনেক নারী বিদ্যা-শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লাভ করে। পাণ্ডিত্যে ও সাহসে স্বামীর যোগ্য সহচরী হতে পেরেছিলেন। মুসলমান নারীদের মধ্যে- দারদানা বেগম (সুজাউদ্দিনের কন্যা), সরফুন্নেসা বেগম (আলীবর্দীর স্ত্রী), ঘষেটি বেগম (আলীবর্দীর মেয়ে), জাহানজেব বানু (যুবরাজ আজমের স্ত্রী), জিনাতুন্নেছা (মুর্শিদকুলীর কন্যা), নাফিসা বেগম (সুজাউদ্দিনের কন্যা), লুৎফুন্নেসা (সিরাজের স্ত্রী) ও নওয়াব ফয়জুন্নেসা (১৮৫৫-১৯৩০খ্রি.) অন্যতম।

নিরাপত্তা

বাংলার সামাজিক নিরাপত্তায় কিছু কালের জন্য হলেও ছেদ ঘটে বর্গীর হাঙ্গামা বেড়ে যাওয়াতে। বর্গীর হাঙ্গামা বাঙালী জীবনে এক মহানিশার দুঃস্বপ্ন। মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের 'মারাঠা' বলা হতো। বাংলা ভূখণ্ডে এরা 'বর্গী' নামে পরিচিতি লাভ করে। নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে (১৭৪০-১৭৫৬খ্রি.) রেবারের মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে ৪০ হাজার অশ্বারোহী দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠিয়েছিলেন বাংলায় চৌথ আদায় করতে। মারাঠা এ দস্যু বাহিনী বাংলার বিভিন্ন অভিজাত ব্যক্তি ও অঞ্চলে হামলা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যালীলা চালিয়ে টাকা পয়সা নিয়ে চলে যেতো। এভাবে দীর্ঘ ৯ বছরে (১৭৪২-১৭৫১খ্রি.) মুর্শিদাবাদ, জগৎশেঠের বাড়ি, বর্ধমান, হুগলি, কলকাতার কিছু অংশ ও ইংরেজদের নৌকা লুটপাট করে। এদের দমন করতে নবাব আলীবর্দীকেও বেশ বেগ পেতে হয়। তিনি বালেশ্বরের যুদ্ধে বর্গীদের পরাজিত করেও সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করতে পারেননি। ১৭৪৪খ্রি. আলীবর্দী খান কিছুটা কূটকৌশলে ও শঠতার মাধ্যমে ভাস্কর পণ্ডিতকে মুর্শিদাবাদের মানকরা নামক স্থানের শিবিরে এনে হত্যা করেন। এরপর ১ বছর বর্গীর হাঙ্গামা বন্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে আবার আক্রমণ শুরু হয়। আলীবর্দী খান আর বর্গীদের সঙ্গে পেরে উঠেননি, বরং তাকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হয়। ১৭৫১খ্রি. সন্ধির শর্ত অনুযায়ী আলীবার্দী খান মারাঠাদের প্রতিবছর চৌথ বাবদ ১২ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুতি দেন এবং ওড়িশা বর্গীদের হাতে তুলে দেন। এর বিনিময়ে বর্গীরা বাংলায় আর আক্রমণ না করার ঘোষণা দেয়। এর ফলে বাংলা বর্গীদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পায়।

এ ভয়-ভীতির কথা আজো বাঙালি মা তার দুষ্ট-ডানপিটে ছেলেদের ঘুম পাড়াতে গিয়ে ছড়ার মাধ্যমে বলে শোনায়। ফিরিঙ্গি ও মগ দস্যুদের অপকর্মও বাংলার সমাজ জীবনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল, যা সামাজিক নিরাপত্তাকে দারুণভাবে ব্যহত করে। পর্তুগিজ বণিকদের সাধারণত 'ফিরিঙ্গি' এবং আরাকান অধিবাসীদের 'মগ' বলা হতো। ১৫৭৯খ্রি. সম্রাট আকবরের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে পর্তুগিজগণ বাংলার সাতগাঁও এবং নদী তীরবর্তী অঞ্চলগুলোতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। পরে হুগলীতে বাণিজ্যিক দুর্গ স্থাপন করে নিজেদের সুরক্ষিত করে এরা ব্যবসায় শুল্ক ফাঁকিসহ নানা দুর্নীতি আরম্ভ করে। পূর্ববঙ্গের ইছামতী নদীর তীরে তারা ১২ মাইল বিস্তৃত এলাকায় ফিরিঙ্গি বাজার স্থাপন করে। এছাড়া ঢাকা, বাখরাগঞ্জ, নোয়াখালিতে বসতি স্থাপন করে। পশ্চিমবঙ্গের তমলুক, হিজলি, পিপলি ও বালেশ্বর পর্যন্ত বসতি স্থাপন করে। বাংলার ২৫ হাজার পর্তুগিজ এদেশের নারীদের অপহরণ, ধর্ষণ, ধর্মান্তর করে রক্ষিতায় পরিণত করে। কৃষি, বাণিজ্য ও লাম্পট্যে তারা তৎকালে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। এছাড়া গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৃষকদের উপর অত্যাচার, যুবতী নারীদের ধর্ষণ, অপহরণ ও ক্রীতদাসে পরিণত করে আরাকানের মগের মুলুকে চালান দিতো। এরা ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিতো এবং গরু বাছুর লুট করতো এবং বন্দি মানুষদের হাতের তালু ছিদ্র করে বেত ঠুটিয়ে বেঁধে নিয়ে বিক্রী করে দিতো। এদের অপকর্ম ও অত্যাচার এতদূর পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের ২ জন যুবতী দাসীকে তারা অপহরণ করে নিয়ে যায়। সম্রাট শাহজাহান এতে মহাক্রুদ্ধ হয়ে ১৬৩২ খ্রি. বাংলার শাসনকর্তা কাসিম খান ও তার পুত্র এনায়েত উল্লাহকে দিয়ে হুগলী আক্রমণ করান এবং ৩ মাস অবরোধ করে রাখেন। এতে করে পর্তুগিজগণ পরাজিত হন এবং অত্যন্ত চড়ামূল্যে তাদের দমন করা হয়। ঐতিহাসিক আব্দুল হামিদ লাহোরীর মতে, এতে করে ১০ হাজার পর্তুগিজ প্রাণ হারায়, ৪,৪০০ জন বন্দি হয় এবং এদের ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করে কারারুদ্ধ করা হয়।

কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনকালে (১৬৫৮-১৭০৭খ্রি.) শুরুতেই আবার ফিরিঙ্গি ও মগরা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আরাকান রাজার ছত্রছায়ায় এ ফিরিঙ্গিরা গোয়া, সিংহল, কোচিন ও মালাক্কা থেকে পালিয়ে এসে আরাকানে আশ্রয় নিতো। এ দস্যুরা বাংলার নদীর তীরবর্তী গ্রামাঞ্চল, হাট-বাজার আক্রমণ করে, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট

চালাতো, ক্রীতদাস করতে অপহরণ করতো এবং আগুন লাগিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিতো। এতে করে বাংলার অনেক জনবহুল গ্রাম লোকালয়শূন্য অরণ্যে পরিণত হয়। শায়েস্তা খান বাংলার সুবাদারির দায়িত্ব নিয়েই ১৬৬৪-৬৫খ্রি. মুঘল নৌবাহিনীর মাধ্যমে মগ ও ফিরিঙ্গিদের পরাজিত করেন এবং সন্দ্বীপ কেড়ে নেন। এতে করে বাংলায় শান্তি-স্বস্তি-শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

ফিরিঙ্গি-মগ ও বর্গীর হাঙ্গামার রেশ কাটতে না কাটতেই নবাবী আমলের শেষ প্রান্তে গিয়ে বাংলায় দেখা দেয় ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তর (১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৯-৭০খ্রি.)। ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর শোষণ, নির্যাতন, অতিরিক্ত কর আরোপ, আদায়ের কঠোরতা ও অব্যবস্থাপনার কারণেই সমগ্র বাংলায় প্রাদুর্ভাব ঘটে এ ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের। খাদ্যের অভাবে মানুষ গরু-ছাগল, জোত-জমি, বীজধান এমনকি স্ত্রী-কন্যা বিক্রি করেও জীবন রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। গ্রামের পর গ্রাম খাদ্যের অভাবে উজাড় হয়ে যায়। খাবারের অভাবে মানুষ গাছের পাতা, কচু ও মৃত পশুর খাবার খেতে শুরু করে। এর ফলে কলেরার প্রকোপে গ্রাম-বাংলা শ্মশানে পরিণত হয়। হাট-বাজারে ক্রেতা খুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তৎকালীন বাংলার দেড়কোটি লোক বা জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশের নির্মম মৃত্যু ঘটে এ দুর্ভিক্ষে। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর- 'অ্যানালস অব রুরাল বেঙ্গল' গ্রন্থে এর বিশ্বস্ত বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন– ১৭৭০খ্রি. গ্রীষ্মকালের রৌদ্রের প্রবল উত্তাপে মানুষ মরতে লাগলো। কৃষক গরু বিক্রি করলো, লাঙ্গল-জোয়াল বিক্রি করলো, বীজধান খেয়ে ফেললো তারপর ছেলে মেয়ে বিক্রি করতে আরম্ভ করলো। খাদ্যাভাবে মানুষ গাছের পাতা খেতে লাগলো। ঘাস খেতে আরম্ভ করলো। এরপর মৃতের মাংস খেতে লাগলো। সারাদিন সারারাত অভুক্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ বড় বড় শহরের দিকে ছুটলো। তারপর মহামারী দেখা দিলো। লোকজন বসন্ত রোগে মরতে লাগলো। মুর্শিদাবাদের নবাব প্রাসাদও বাদ গেল না। বসন্তে নবাবজাদা সইফুজের মৃত্যু ঘটলো। রাস্তায় মৃত ও গৃধিনীর শবে পূর্ণ হয়ে পাহাড়ে পরিণত হলো। শৃগাল-কুকুরের মেলা বসে গেল। যারা বেঁচে রইলো, তাদের পক্ষেও বেঁচে থাকাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো।[১৪৬]

উপর্যুক্ত দুর্ভিক্ষের বর্ণনার চিত্র পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪খ্রি.) 'আনন্দমঠ' (১৮৮২খ্রি.) উপন্যাসে। এরকম আরো চিত্র পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের (১৮৯৪-১৯৫০খ্রি.) 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে। তারাশঙ্করের (১৮৯৮-১৯৭১খ্রি.) 'বোবা কান্না' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯১৮-১৯৭০খ্রি.) 'হাড়', 'পুষ্করা' ও 'দুঃশাসন' এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬খ্রি.) 'নমুনা', 'দুঃশাসনীয়', 'আজকাল পরশুর গল্প', 'সাড়ে সাত সের চাল' নামক ছোটগল্পসমূহে। এর ফলে বাংলায় কালোবাজারি, মজুতদারি ও নারী ব্যবসার প্রসার ঘটে। ইংরেজ বণিকদের মতো কর্মচারীরাও এরকম গোপন ব্যবসায় ও দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। সমাসাময়িক বর্ণনা হতে জানা যায়, যে কর্মচারীর এক বছর পূর্বে ১০০ পাউন্ডের সংস্থান ছিল না, দুর্ভিক্ষের পরের বছর সে ৬০,০০০ পাউন্ড দেশে পাঠাতে পেরেছিল। এ দুর্ভিক্ষে জমিদারগণ সবচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। বাংলার নায়েব দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ শতকরা ১০ টাকা হারে রাজস্ব বাড়িয়ে দিলে কৃষকদের দুর্দশার অন্ত থাকে না। কারণ কৃষক প্রজা রাজস্ব না দিতে পারলে জমিদারগণ কীভাবে রাজকোষাগারে জমা দেবে? এতে জমিদারদের উপরও চূড়ান্ত নির্যাতন শুরু হয়। এ বীভৎস নির্যাতন ও অপমানের শিকার হতে হয়েছিল- বর্ধমানের মহারাজার, নদীয়ার মহারাজার, নাটোরের রানী ভবানীর, বীরভূম ও বিষ্ণুপুরের রাজাদের। ১ বছরের এ মন্বন্তরে বাংলার অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়ে। এর আঘাত সামলে উঠতে অনেক সময় লাগে। তৎকালীন কয়েক বছরের খাজনা আদায়ের চিত্র নিম্নরূপ-

বছর	নির্ধারিত রাজস্ব	আদায়কৃত রাজস্ব
১৭৭২	৯৯,৪১০ পাউন্ড	৫৫,২৩৭ পাউন্ড
১৭৭৩	১,০৩,০৮৯ পাউন্ড	৬২,৩৬৫ পাউন্ড
১৭৭৪	১,০১,৭৯৯ পাউন্ড	৫২,৫৩৩ পাউন্ড
১৭৭৫	১,০০,৯৮০ পাউন্ড	৫৩,৯৯৭ পাউন্ড
১৭৭৬	১,১১,৪৮২ পাউন্ড	৬৩,৩৫০ পাউন্ড

দায়ে পড়ে অনেক জমিদার, ব্রাহ্মণ, ফকির, সন্ন্যাসী, নারী ও কৃষকগণ ডাকাতি করতে শুরু করে। এর ফলে সারা বাংলা বিপ্লব-বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। একে একে দেখা দেয়- ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩-১৮০০খ্রি.), চুয়ার বিদ্রোহ (১৭৬০-১৭৮৩খ্রি.), চাকমা বিদ্রোহ (১৮৮৩-৯৫ খ্রি.), ঘরুই বিদ্রোহ (১৭৭৩ খ্রি.), হাতিখেদা বিদ্রোহ (১৭৯৯ খ্রি.), সুবান্দিয়া গ্রামের বিদ্রোহ (১৭৯২ খ্রি.), সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৭০ খ্রি.)। তন্তুবায়দের বিদ্রোহ (১৭৭৮ খ্রি.), ফরায়েজী আন্দোলন। এতে করে ইংরেজ বণিকদের ভিত কেঁপে ওঠে। এরপর লর্ড কর্নওয়ালিস প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রি.) কার্যকর হলে বাংলার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অঙ্গনে আমূল পরিবর্তন আসে এবং অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে সংঘটিত সিপাহী বিপ্লব (১৮৫৭খ্রি.) নামক মহাবিদ্রোহ। যার ফলে এদেশ শাসনের ভার ব্রিটিশ বণিক গোষ্ঠীর হাত থেকে মহারানী ভিক্টোরিয়ার (১৮৫৮খ্রি.) হাতে চলে যায়।

বাঙালির চরিত্র

বাঙালির চরিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার। কারণ বাঙালি সংকর জাতি। নানা গোত্রের রক্তের মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন চারিত্রিক উপাদানের বিচিত্র সমন্বয় ঘটেছে বাঙালির জীবনে। এর ফলে বাঙালি চরিত্রে নানা বিরুদ্ধ গুণের সমাবেশ দেখতে পাওয়া যায়। ভাবপ্রবণতা ও তীক্ষ্ণবুদ্ধি, ভোগলিপ্সা ও বৈরাগ্য, কর্মকুণ্ঠা ও উচ্চাভিলাষ, ভীরুতা ও অদম্যতা, স্বার্থপরতা ও আদর্শবাদ, বন্ধন ভীরুতা ও কাঙালপনা প্রভৃতি দ্বান্দ্বিক গুণই বাঙালি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বাঙালি ভাবপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। উচ্ছ্বাস ও উত্তেজনাতেই এর প্রকাশ। তাই বাঙালি যখন কাঁদে, তখন কেঁদে ভাসায়। আর যখন হাসে, তখন সে দাঁত বের করেই হাসে। যখন উত্তেজিত হয়, তখন আগুন জ্বালায়। তার সবকিছুই মাত্রাতিরিক্ত। তার অনুভূতি- ফলে অনুভূতির গভীরে। কেঁদে ভাসানো, হেসে লুটানো আর আগুন জ্বালানো আছে বটে, কিন্তু কোনটাই দীর্ঘস্থায়ী নয়- যেহেতু উচ্ছ্বাস উত্তেজনা মাত্রই তাৎক্ষণিক ও ক্ষণজীবী। বাঙালির গীতি প্রবণতার উৎস এখানেই।

দুই হাজার ধরে নির্জিত শোষিত বাঙালি কালো পিঁপড়ার মতো অতি চালাক ও নিঃসঙ্গ স্বনির্ভর। তাই সে ধূর্ততা যত জানে, বুদ্ধির সুপ্রয়োগ তত জানে না। ফলে আত্মরক্ষার ও স্বার্থপরতার হীন প্রয়োগে তার তীক্ষ্ণবুদ্ধি কলুষিত হয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার মহৎ প্রয়াসে প্রযুক্ত হয় না। তাই বাঙালির সঙ্ঘশক্তি নেই, অভাব পীড়িত বাঙালি ব্যবহারিক জীবনের উন্নয়নে ও বুদ্ধির অধ্যবসায়ের অবদান গ্রহণে অক্ষম।[১৪৮] প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে যেসব বণিক-পর্যটক-প্রচারক বাঙলাদেশে এসেছে, তারা বাঙালিকে ভীরু, মিথ্যাভাষী, প্রতারক, কলহপ্রিয়, দরিদ্র ও চোর বলে জেনেছে। বিগত দুই হাজার বছর ধরে বাঙালি ছিল বিদেশি শাসিত ও শোষিত। চিত্ত বিকাশের ও আত্মোন্নয়নের কোন সুযোগই মেলেনি তাদের। কেন না উচ্চপদে, ব্যবসা-বাণিজ্যে, স্বাধীন জীবিকা সংস্থানে পরাধীন মানুষের কোন অধিকার বা সুযোগ সাধারণত থাকে না। কথায় বলে- ‘অভাবে স্বভাব নষ্ট।’ দারিদ্র্য মানুষের সবগুণই নষ্ট করে, অঙ্কুরে বিনাশ করে সব সম্ভাবনা। অন্নের কাঙাল মানুষে শাস্ত্র সমাজ সম্পৃক্ত মানবিক চেতনা কিংবা নীতি-

নিষ্ঠা ও আদর্শবোধ দুলর্ভ। অন্নসন্ধানী মানুষ তাই ছল-চাতুরী-প্রতারণা আশ্রয়ী না হয়েই পারে না। ভীরুতা, স্বার্থপরতা, আত্মাহুতি, হরণ স্পৃহা, নিঃসঙ্গ প্রয়াস, ঈর্ষা, অসূয়া ও কলহপ্রবণতা তার নিত্যসঙ্গী। চিত্ত বিকৃতির মৌল কারণ- জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে স্বাধীকার লাভের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগের অনুপস্থিতি।

অতএব বহু বহু কাল এই দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের মানুষ অভিন্ন জাতি সত্তায় সংহত হতে পারেনি। ,,, তাই এদেশের বৌদ্ধ মাত্রই ছিল মগধী, ব্রাহ্মণ্যবাদী মাত্রই আর্যাবর্ত-ব্রহ্মাবর্তের আর্য। মুসলিম মাত্রই আরব-ইরানী কিংবা মধ্য-এশীয়। ফলে আজো শিক্ষিত অভিজাত বাঙালি মাত্রই চেতনায় প্রবাসী ও বিদেশির জ্ঞাতিত্ববর্গী, তাই ভিন্নমতের প্রতিবেশি মাত্রই পর। ,,, তাই আজো হিন্দুগণ ঘুরে বেড়ায় আর্যাবর্তে, ব্রহ্মাবর্তে, রাজস্থানে ও হিমালয়ের বন্দরে। মুসলিম বিচরণ করে ষোলশতকে পূর্ব-উত্তর আফ্রিকায়, আরবে, ইরানে ও মধ্যে এশিয়ায়। ইতিহাস বলছে, এদেশে যারাই এসেছে কিছুকাল পরে তারা বীর্যহীন হয়ে পড়েছে। ফলে বিদেশ থেকে নতুন নতুন জাতি এসে তাদের উপর আধিপত্য করেছে। এটি হয়তো এদেশের আবহাওয়ারই প্রতিক্রিয়া। আসল কথা, কোন জাতির চারিত্রিক বিকৃতি না ঘটলে তার পতন হয় না। এ বিকৃতির দরুন যখন সমাজে, ধর্মে ও রাষ্ট্রে বিপর্যয় ঘটে, তখন তার পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে।[১৪৯]

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দমন-পীড়ন ও শোষণ-নির্যাতনের ফলেই মূলত এদেশের নিম্নশ্রেণির মানুষ মুসলমান শাসকদের স্বাগত জানিয়েছিল। যেমনটা জানিয়েছিল ও সাহায্য করেছিল মীর কাসিমকে সিন্ধুর জাঠ জাতি। আবার মুঘল সম্রাটদের রাজপুত জাতি। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুসলমান শাসনকে স্বাগত জানায় ও মেনে নেয়। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন তাঁর 'মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী' গ্রন্থে বলেছেন- আমাদের দেশের চিন্তাধারার একটা সাধারণ সূত্র হচ্ছে সুখের মতো দুঃখকেও ঈশ্বরের অলঙ্ঘ্যনীয় বিধান বলে মেনে নেয়া। ,,, তাই কিছুকাল পরে জনসাধারণ সহজেই মুসলমান বিজয়কে ঈশ্বরের মার বলে মেনে নিয়ে মনে সান্ত্বনা আনতে চেষ্টা করে।

আর এ সূত্র ধরেই সহদেব চক্রবর্তী রচনা করেছিলেন- 'নিরঞ্জনের উষ্মা' নামক গ্রন্থ। আবার মুসলিম শাসনামলের প্রথম দিকে মুসলমানদের চারিত্রিক দৃঢ়তা, শুদ্ধতা ও মহানুভবতা যে পরিমাণে ছিল, পরবর্তীকালে এর ক্রমশ পতন ঘটে। নবাবী আমলে মুসলিম শাসক ও অভিজাতবর্গ ভোগ-বিলাস, পাপাচার-ব্যভিচার-অযাচার, নারী হরণ-বলাৎকার, নির্যাতন-নিপীড়নে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে সমাজে দুর্নীতি, ঘুষ, ষড়যন্ত্র, অবিশ্বাস, অকৃতজ্ঞতা বহুগুণ বেড়ে যায়। সমাজের নৈতিক মূল্যবোধে পচন ধরে যায়। এর ফলে নবাব সিরাজউদ্দৌলার দুর্নীতিবাজ, ঘুষখোর, অকৃতজ্ঞ ও চরিত্রহীন আত্মীয়, আমীর-ওমরাহ মিলে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষায় ইংরেজদেরকে ক্ষমতায় বসায় এবং নিজ দেশকে বণিকগোষ্ঠীর কাছে বিকিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। নবাবী আমলে সমাজের অভিজাত ও নিম্নবর্গের চারিত্রিক শৈথিল্য প্রকট রূপ ধারণ করে। তবে মধ্যবিত্ত কিছু হিন্দু ও মুসলিম জনগোষ্ঠী তখনো ধর্মীয় আদর্শ ও নীতিবোধকে আঁকড়ে ধরে পরিশুদ্ধ ভাবে বেঁচে ছিল। এছাড়া মনোরিক (১৬২৮-২৯ খ্রি.), বাউরী (১৬৬৯-৭৯ খ্রি.), জোয়ানেস দ্য লায়েট (১৬৩০ খ্রি.), শুটেন, ইবনে বতুতা (১৩৪৫-৪৬ খ্রি.), মাহুয়ান, হিউয়েন সাঙ, বারবোসা, তোমেপিরেস (১৫১২-১৯ খ্রি.) ও সম্রাট বাবুর (১৫২৬-৩০ খ্রি.) প্রমুখ পর্যটক ও শাসকগণ বাঙালির চরিত্রের সমালোচনা ও প্রশংসা করেছেন। চরিত্রের এ অপূর্ব বৈপরীত্যের মিথষ্ক্রিয়া বাঙালি তার ভৌগোলিক ও উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করেছে।

বাংলার অন্ধকার যুগ: স্বরূপ সমীক্ষা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১২০১ খ্রি. থেকে ১৩৫০ খ্রি. পর্যন্ত এ দেড়শত বছরের সময়কালকে 'অন্ধকার যুগ' বলে অভিহিত করা হয়। সুকুমার সেন, দীনেশচন্দ্র সেন, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদারসহ আরো অনেক পণ্ডিতই এ সময়কালকে বন্ধ্যা, হত্যাযজ্ঞের হোলি উৎসব ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বিষ-বাষ্পীয় যুগ বলতে দ্বিধা করেননি। এর কারণ হিসেবে সবাই বাংলায় তুর্কি অভিযান ও তুর্কিদের বঙ্গবিজয়কেই (১২০৪খ্রি.) দায়ী করেছেন। তাদের মতে, বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গবিজয় (১২০৪খি.) থেকে শুরু করে প্রায় একশত বছর (১৩০০খ্রি. অবধি) এ দেশে চলে অনবরত যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, হানাহানি আর রক্তারক্তির তাণ্ডব। এর পরবর্তী ৫০ বছর (১৩০০-১৩৫০খ্রি.) ব্যয় হয় এদেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করতে। অর্থাৎ শাসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২-১৩৫৮খ্রি.) প্রতিষ্ঠিত ইলিয়াস শাহী বংশের (১৩৪২-১৪১৪খ্রি. ও ১৪৪২-১৪৮৭খ্রি.) ১১৭ বছরের শাসনামলে বাংলায় রাজনৈতিক অস্থিরতা কমে আসে এবং সাহিত্য রচনার পথ সুগম হয়। হুসেনশাহী বংশের (১৪৯৩-১৫৩৮খ্রি.) শাসনামলে বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগে উন্নীত হয়।

কিন্তু তথাকথিত 'অন্ধকার যুগে' (১২০১-১৩৫০ খ্রি.) 'শূন্য পুরাণ', 'সেক শুভোদয়া' ও 'নিরঞ্জনের উষ্মা' ছাড়া আর তেমন সাহিত্য কর্মের সন্ধান মেলে না। এর মূল কারণ হিসেবে জাতিগত বিদ্বেষ, না ভাষার দৈন্য দায়ী– এ সম্পর্কে তেমন জোর দিয়ে কিছু বলা যায় না। কারণ জাতিবিদ্বেষ শুধু বাংলা তথা ভারতবর্ষের ভূখণ্ডেই সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং আফ্রিকা, আমেরিকায় বর্ণভেদ ও গোত্রদ্বেষণা আজো বিলুপ্ত হয়নি। ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন- মুসলমান রাজত্বের পূর্বে 'হিন্দু' এই জাতীয় নামই ছিল না। ছিল ব্রাহ্মণ, শূদ্র ইত্যাদি। প্রাচীন বর্ণ মূলত জাতি কিংবা স্বর্ণকার, কর্মকার, তন্তুবায় ইত্যাদি ব্যবসায় মূলত জাতি। কিন্তু 'হিন্দু' জাতি ছিল না। হিন্দু ধর্মও ছিল না। ছিল শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-সৌর-গাণপত্য সম্প্রদায়[১৫০] (বাংলা সাহিত্যের কথা, মধ্যযুগ-পৃ-১৯)।

আসলে হিন্দু জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে অংশত শ্রীচৈতন্য দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রি.) প্রেমবাদে বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের (১৮৩৮-১৮৯৪খ্রি.) স্বদেশপ্রেমে এবং কিছুটা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৮৬৩-১৯১৩খ্রি.) স্বদেশ-স্বজাতির বিপর্যয়জনিত আত্মগ্লানির অনুসন্ধিৎসা থেকে। তুর্কি আক্রমণ ও মুসলিম শাসনের পূর্বে যে এ বাংলা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, ঘৃণা, বৈরিতা, দমন-পীড়ন মুক্ত ছিল না, বরং বহুপূর্ব থেকেই এ ধারা অব্যাহত ছিল। কিন্তু 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'- এর মতো এ দায়ভার শুধু মুসলমানদের ওপরই একতরফাভাবে চাপানো হয়েছে। মুসলিম আমলের পূর্বে জাতি বৈরিতার কিছু নমুনা এমন-[১৫১]

ক. সম্রাট অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ) পুণ্ড্রবর্ধনে বৌদ্ধ ধর্মের অবমাননায় রুষ্ট হয়ে ১৮ হাজার আজীবিক বা নির্গ্রন্থ জৈন হত্যা করিয়েছিলেন।

খ. রাজা বিম্বিসারের পুত্র অজাত শত্রুর বৌদ্ধ-বিদ্বেষও তৎকালীন সময়ে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

গ. ব্রাহ্মণ্যবাদী শশাঙ্ক বৌদ্ধদের নির্মূল করতে এমন আদেশ দিয়েছিলেন যে, সেতুবন্ধ থেকে হিমালয় অবধি যেখানে যত বৌদ্ধ রয়েছে, তাদের বৃদ্ধ ও বালকসহ যে ভৃত্য হত্যা করবে না, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

ঘ. সেন আমলে রামচন্দ্র কবি ভারতী বৌদ্ধ মত প্রকাশ্যে গ্রহণ করেছিলেন বলে তাঁকে দেশ ছাড়া হতে হয়েছিল।

ঙ. মৌর্য শাসনামলে রাজা চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী উপদেষ্টা চাণক্য কর্তৃক ব্রাহ্মণদের যে সমূলে বিনাশ করা হয়েছিল, তা শুধু জাতি বিদ্বেষের কারণেই।

চ. পাল রাজা দ্বিতীয় মহিপালের কৈবর্ত জাতির ওপর অত্যাচারের মাত্রা এত বেড়ে গিয়েছিল যে, দিব্যক রাজ বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং এতে রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্তদের হাতে নিহত হন।

ছ. সেন আমলে বৌদ্ধদের ওপর ব্রাহ্মণদের অত্যাচার-জুলুম-নিপীড়নের মাত্রা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল যে, তারা এদেশ ছেড়ে পালিয়ে জীবন বাঁচাতে বাধ্য হয়েছিল। এ কারণেই বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদের সন্ধান মেলে নেপালে।

জ. সিন্ধু আক্রমণের সময় (৭১২খ্রি.) মুহম্মদ বিন কাসিম যখন সিন্ধুরাজ দাহিরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তখন এদেশীয় জাট ও মেড উপজাতিগণ তাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করে। নিজ দেশের শাসকের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ নিম্নশ্রেণি বা জাতি-বর্ণের ওপর ঘৃণা বিদ্বেষ ও দমন পীড়নকেই ইঙ্গিত দান করে।

* বর্তমানকালে এ জাতিগত বিদ্বেষের কারণেই উগ্রবাদী হিন্দুরা যেমন অযোধ্যার ঐতিহাসিক বাবুরী মসজিদ ধ্বংস করে (১৯৯২ খ্রি.) তেমনি আবার উগ্রবাদী তালেবান মুসলিম গোষ্ঠীর হাতে আফগানিস্তানের বামিয়ানের ঐতিহাসিক বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস হয় (২০০১ খ্রি.)।

তাহলে দেখা যায় যে, তুর্কি আক্রমণের পূর্বেও এদেশে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহু মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। তুর্কিদের বঙ্গবিজয় (১২০৪ খ্রি.) থেকে শুরু করে আলাউদ্দিন হুসেন শাহ পর্যন্ত (১৪৯৩-১৫১৯খ্রি.) অর্থাৎ ৩১৫ বছরে কিছুটা রাজনৈতিক অস্থিরতা, উত্তেজনা, ষড়যন্ত্র বিদ্যমান ছিল। কারণ এসময় মোট ৪২ জন শাসক গড়ে ৭ বছর করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এঁদের মধ্যে হিন্দুপীড়ক ও অত্যাচারী শাসক ছিলেন বখতিয়ার খিলজী (১২০৪-০৭খ্রি.), আলী মর্দান (১২১০-১৩খ্রি.), মালিক তাজুদ্দিন আরসালান খান (১২৫৯-৬৫খ্রি.), ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ (১৩৫৩-৫৭খ্রি.) ও শামসুদ্দিন মুজাফফর ওরফে সিদিবদর (১৪৯১-৯৩খ্রি.)। এঁদের মোট রাজত্বকাল ২০ বছর। এদের মোট রাজত্বকালের ২০ বছরই ‘দুধে চনা’ কিংবা ‘দুধে গরলের’ মতো গোটা তুর্কি আমলকে ‘রক্ত ঝরানো ও আগুন জ্বালানো’ শাসন রূপে পরিচিত করেছে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হলো এই- তুর্কি শাসকরা শুধু নিজেদের মধ্যে মারামারি জিইয়ে রাখেননি, বরং রাজ্য বিস্তারেও উদ্যোগী ছিলেন। রাজ্যের সংখ্যাগুরু হিন্দুদেরকে শত্রু রেখে, অনেক ক্ষেত্রে হিন্দু সৈন্য রেখে (যেমন তুঘান খান ১২৭২-৮১খ্রি.) রাজ্যশাসন বা যুদ্ধাভিযান করা কিছুতেই সম্ভব হতো না। কাজেই রাজ্যের স্থায়িত্বের গরজেই হিন্দু নির্যাতন সম্ভব ছিল না। আর সুবাদারগণ ঘন ঘন মসনদ নিয়ে কাড়াকাড়ি করেছেন বটে, তাতে রাজধানীতে ও যুদ্ধক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা ও দুর্ভোগ হওয়ার সম্ভাবনা, অন্যত্র নয়। বিশেষ করে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর (শাসক ও বিদ্রোহী) কাড়াকাড়ি অবসরে প্রজাদের প্রশ্রয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক। আর প্রতিদ্বন্দ্বী যখন মুসলমান, তখন এরূপ ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুর উপরই পীড়ন হওয়ার কারণ নেই। যে যুগে রাজধানীর যুদ্ধ ও রাজা বদলের সংবাদ রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছয় মাসে নয় মাসেই পৌছাতো। সামন্ত যুগে প্রজা সাধারণের তাতে ক্ষতি-বৃদ্ধির তেমন কিছু ছিল না। তাই দেখা যায়, পলাশী যুদ্ধের পরাজয়ের খবরও এদেশ বাসীকে তেমন বিচলিত করেছিল না। কারণ শহুরে রাজনীতি, আন্দোলন কিংবা হাঙ্গামা এদেশে আজো গাঁয়ে ছড়িয়ে পড়ে না। এ প্রসঙ্গে ১৯৪২, ১৯৪৬ ও ১৯৫০ এর রাজনৈতিক- সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কথা স্মর্তব্য।

সম্রাট আকবরের সময়ে (১৫৭৫খ্রি.) বাঙলা বিজিত হলো বটে, কিন্তু নিরঙ্কুশ মুঘল অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি আকবর-জাহাঙ্গীরের আমলেও। শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের আমলে হার্মাদ ও ইউরোপীয় বণিকদের দৌরাত্ম্যের নতুন উপসর্গ দেখা দেয়। তা সত্বেও বাঙলা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ ছিল না। আর ভারতে ইসলাম প্রচারে কোন কোন রাজশক্তির সহানুভূতি ছিল হয়তো, কিন্তু সহযোগিতা যে ছিল না– তা ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করেন। জোর করে ইসলামে দীক্ষিত হবার কাহিনীও অমূলক। আলাউদ্দিন হুসেন শাহ (১৪৯৫-১৫১৯খ্রি.) উড়িষ্যা বিজয় কালে শত্রুর আশ্রয়স্থল দেউল-দেহারা ভেঙে বাঙলার হিন্দু মনেও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলেন বটে। কিন্তু রাজ্য শাসনে তাঁর দক্ষতা, ন্যায়নিষ্ঠা, প্রজাহিতৈষণা ও বিদ্যোৎসাহিতা তাঁকে শীঘ্রই লোকপ্রিয় শাসক হিসেবে

প্রখ্যাত করে। তাঁরপুত্র নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ, পৌত্র আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ এবং তাঁর অপর পুত্র গিয়াসউদ্দিন মাহমুদ শাহ প্রজাপীড়ক বলে এঁদের কারো নিন্দা ছিল না। হুসেন শাহের চট্টগ্রামস্থ লস্কর পরাগল খাঁ এবং তার পুত্র খুটি খাঁ মহাভারতের আদি অনুবাদক কবীন্দ্র পরমেশ্বর দাস ও শ্রীকর নন্দীর প্রতিপোষক হিসেবে অমর হয়ে আছেন।[১৫২]

এরপূর্বেও দেখা গেছে সুলতান মাহমুদ দীর্ঘ ২৭ বছরে (১০০০-১০২৭খ্রি.) মোট ১৭ বার ভারত আক্রমণ করে বহু মন্দির, মঠ, দুর্গ ধ্বংস করেছেন বলে অভিযোগ তোলা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো এই- এ মঠ-মন্দির ধ্বংসের পেছনে তাঁর বা মুসলমানদের তেমন ধর্মীয় উন্মাদনা বা গোঁড়ামি ছিল না। বরং দুটি কারণে তা সংঘটিত হয়েছে। যথা ১. এসব স্থানে এসে বিদ্রোহীগণ পালিয়ে আশ্রয় নিতো, ২. যুগ যুগ ধরে অগণিত ধন-রত্ন ও টাকা পয়সা এসব স্থানে সংরক্ষিত থাকার কারণে বিজয়ী শাসকগণ রাজনৈতিক নিরাপত্তা ও আর্থিক সুবিধা নিতেই তা ধ্বংস করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু এসব স্থানের অধিবাসীগণ আনুগত্য, আত্মসমর্পন ও কর দিতে প্রতিশ্রুতি দিলে মঠ-মন্দির পুনঃনির্মাণের আবার অনুমতি দেয়া হতো। এ কথা মুহাম্মদ বিন কাসিমের সিন্ধু বিজয় প্রসঙ্গে যেমন সত্য, তেমনি সত্য তুর্কিদের বঙ্গ বিজয় ও শাসনামল সম্পর্কে।

এ বাস্তবতা ও ইতিহাসের সত্য ভাষণ মানলে ড. অতুল সুরের তুর্কি শাসকদের প্রতি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের যে অভিযোগ, তা একরৈখিক, অতিরঞ্জিত বলে মনে হয়। কারণ তিনি বলেছেন- সার্ধ পাঁচশত বৎসর কাল (১২০৪-১৭৫৭খ্রি.) বাঙলায় মুসলমান রাজত্ব ছিল। বিজেতা বখতিয়ার খিলজী (১২০৪খ্রি.) এক হাতে কোরান ও অপর হাতে অসি নিয়ে বাঙলায় প্রবেশ করেছিল। ধর্মীয় উন্মাদনার নেশায় মত্ত হয়ে মুসলমানরা গোড়া থেকেই হিন্দু ও বৌদ্ধদের মঠ-মন্দির-মূর্তি ভাঙা ও ধর্মান্তরকরণের অভিযান চালিয়ে ছিল। ,,, বহু হিন্দুকে তারা ধর্মান্তরিত করেছিল ও মঠ-মন্দির ভেঙে ফেলে তারই উপাদান দিয়ে মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকা ইত্যাদি নির্মাণ করেছিল। এটা বখতিয়ার খিলজীর আমল থেকেই শুরু হয়েছিল এবং পরবর্তী অনেক সুলতানই তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। নিরীহ দরিদ্র লোকের ওপর তাদের অত্যাচার চরম সীমায় গিয়ে পৌছেছিল। নারীধর্ষণ হামেশাই ঘটত। এটাই ছিল ধর্মান্তরিত করবার একটি প্রশস্ত রাস্তা, কেননা ধর্ষিতা নারীকে হিন্দু সমাজ আর স্থান দিত না। এভাবে হিন্দু সমাজ ক্ষীয়মান হয়ে পড়েছিল। ক্ষীয়মান হিন্দুসমাজকে আসন্ন বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য স্মার্ত রঘুনন্দন বিধান দেন যে, ধর্ষিতা নারীকে সামান্য প্রায়শ্চিত্তের পর পুনরায় হিন্দুসমাজে গ্রহণ করা চলবে।[১৫৩]

উপর্যুক্ত বক্তব্যে অতুল সুর মোটা দাগে তুর্কি শাসকদের সম্পর্কে যে সরল সমীকরণ ও সহজ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, তা সর্বাংশে সত্য নয়, বরং অতিরঞ্জিত ও কিছুটা আবেগজড়িত। মুসলমানদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বলেই এ আঘাত মর্মভেদী ও মনস্তাপের যন্ত্রণা বহুগুণে বেড়ে গিয়েছে। যদিও এমন নিপীড়ন-নির্যাতন পূর্বে মৌর্য, পাল ও সেন আমলে বহুবার ঘটেছে। তথাপি মুসলমানদের বিজাতি, বিদেশি, বিধর্মী ও বহিরাগত আখ্যা দিয়ে শতদোষ তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এমনকি এদেশ মুসলমানদের অধিকারে যাবার ঘটনাকে ধর্মীয় বাতাবরণে 'নিরঞ্জনের উষ্মা'-র মতো অনাচারী ব্রাহ্মণদের প্রতি বিধাতার মার বলে প্রচার করে দুদণ্ড শান্তি-সান্ত্বনা লাভ করেছে।

সেন আমলে উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদীরা শাস্ত্র সাহিত্য সংস্কৃতি বিহার চৈত্য প্রভৃতি নিশ্চিহ্ন ও বিলুপ্তি করে দিয়েছিল। বাঙলাদেশে যে কোন কালে বৌদ্ধ শাস্ত্র, সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল তা অনুমান করবার মতো কোন নিদর্শনাদি ছিল না। কিন্তু গায়ের উপর জোর খাটে, মনের উপর খাটে না। সেন আমলে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্র, সমাজ ও সরকার জনগণের উপর ব্রাহ্মণ্য আচার ও রীতি-নীতি জোর করে চাপিয়েছিল। কিন্তু অন্তরে তারা পূর্বপুরুষের বিশ্বাস-সংস্কারই লালন করতো। তুর্কি বিজয়ের ফলে বিদেশি রাজশক্তির প্রশ্রয়ে সমাজপতির শাস্তির ভয়মুক্ত হয়ে তারা তাদের লালিত পূর্ব বিশ্বাস-সংস্কার নতুন করে সগৌরবে ও অত্যুৎসাহে প্রকাশ করতে লাগলো।[১৫৪]

সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত এই যে, বাংলার জনগণ মৌর্য পাল ও সেনদের মনে করেছে দেশের লোক—আপনজন। আর তুর্কি মুসলমানদের ভেবেছে বিধর্মী-বিজাতি-বিদেশি-বহিরাগত পরজন হিসেবে। তাই মৌর্য, পাল ও সেনদের শত অত্যাচারেও এ দেশবাসীর শরীরে ক্ষত থাকলেও মন ছিল অক্ষত। তাই এ দেশবাসী আপনজনের (পাল, সেনদের) দেয়া শরীরী আঘাতকে ভুলে গেছে সহজে কিন্তু পরজনের (মুসলমানদের) দেয়া হৃদয়াঘাতকে ভুলতে পারেনি কোনমতেই। বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক ও ক্রমজটিল। তাই ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, কূটনীতিক ও লেখক আর্ল অব চেস্টার ফিল্ড বলেছেন- 'An injury is much sonner forgotten than an insult.' [chesterfield : Letters to his son; 9 october, 1745] অর্থাৎ মানুষ শারীরিক জখম দ্রুত ভুলে যায়, কিন্তু অপমান নয়। যারা পাশবিকতা ও লাম্পট্যের কায়েম করেছিল তাতে তারা মুসলমান তুর্কিদের মতো অপবাদের ভাগিদার হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালের মগ-ফিরিঙ্গি ও বর্গী হাঙ্গামায় বাংলায় যে পাশবিকতা ও লাম্পট্যের আধিপত্য কায়েম হয়েছিল, তাতে তাদের মুসলমান তুর্কিদের মতো এমন অপবাদের অংশীদার হতে হয়নি। তাই মধ্যযুগে তুর্কি শাসকদের বিরুদ্ধে সুকুমার সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, দীনেশচন্দ্র সেন ও মণীন্দ্রমোহন বসু নানা রকম অভিযোগ দাঁড় করালেও তা পক্ষপাতদুষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়েছে। কারণ প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, অসিতকুমার চন্দ্যোপাধ্যায়, সুখময় মুখোপাধ্যায় ও বঙ্কিমচন্দ্র যে মতামত দিয়েছেন, তা অনেকাংশেই নির্মোহ, নিরপেক্ষ, পক্ষপাতমুক্ত, উদার ও সমকালাশ্রিত বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন। এ বিষয়ক কয়েকটি নমুনা এ রকম—[১৫৫]

ক. মুসলমানদের বাঙলা আক্রমণকালে হিন্দুধর্ম শিথিল ও দুর্বল ছিল। নিম্নবর্ণের লোকদের দাসে পরিণত করা হয়েছিল। তাদের ধর্মান্তরিত করতে বিশেষ পীড়নের প্রয়োজন হয়নি। [১৮৯১ সালের আদমশুমারীর রিপোর্ট]

খ. পাঠান যুগে দেশ শাসনে যে বাঙালী হিন্দুর অধিকতর অধিকার ছিল, তাহার প্রমাণ হুসেন শাহী বংশ ও কররানী বংশের অধীনে বহু বাঙালী হিন্দু কর্মচারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পাঠান আমলে রাজ্য শাসনে, বিশেষত রাজস্ব ব্যাপারে একটি হিন্দু আমলাতন্ত্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। [অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ বাঙলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত; ২য় খণ্ড, পৃ-৩৫]

গ. স্বাধীন সুলতানদের আমলে বাংলাদেশের শাসন ব্যবস্থায় শুধু মুসলমানেরা নয়, হিন্দুরা গুরুত্বপূর্ণ পদে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁরা অনেক সময় মুসলমান কর্মচারীদের উপরওয়ালি অর্থাৎ প্রধান তত্ত্বাবধায়কের পদে নিযুক্ত হতেন। বাংলার সুলতানদের মন্ত্রী, সেক্রেটারি এমনকি সেনাপতির পদেও অনেক হিন্দু নিযুক্ত হয়েছেন। [সুখময় মুখোপাধ্যায় : বাংলার ইতিহাসের দুশো বছর; পৃ-৪৬৩]

ঘ. পাঠান শাসনকালে বাঙালির মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। (১৫-১৬শতকে) এই দুই শতাব্দীতে বাঙালির মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই। [বাঙ্গালার ইতিহাস : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ঙ. তাহাদিগের (পাঠানদের) আমলে বাঙ্গালীরাই বাঙলা শাসন করিত। ইহারা (হিন্দুরাজাগণ ও সামন্তরা) রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন, দণ্ড বিধান করিতেন এবং সর্ব প্রকার রাজ্য শাসন করিতেন, [বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

চ. মুসলমান রাজশক্তি তখন স্বাধীন এবং সেই স্বাধীনতা অর্জনে ও রক্ষণে বাঙালী হিন্দু সবিশেষ সহায়তা করিতেছে। রাজ্য শাসনে ও রাজস্ব ব্যবস্থায় এমনকি সৈন্যাপত্যেও হিন্দুর প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত। [সুকুমার সেনঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস; ১ম খণ্ড, পৃ- ৮৮]

ছ. এ দেশে আসিয়া মুসলমান রাজারা সংস্কৃত হরফে মুদ্রা ও লিপি ছাপাইয়াছেন, বহু বাদশা হিন্দু মঠ-মন্দিরের জন্য বহু দানপত্র দিয়াছেন। সেসব ঐতিহাসিক নজীর দিন দিনই নূতন করিয়া বাহির হইতেছে। [ক্ষিতিমোহন সেন]

জ. অধিকাংশ আফগানই তাঁহাদের জায়গীরগুলি ধনবান হিন্দুদের হাতে ছাড়িয়া দিতেন। এই জায়গীরগুলির ইজারা সমস্তই ধনশালী হিন্দুরা লইতেন এবং ইহারাই ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিতেন। [স্টুয়ার্টের বাঙলার ইতিহাস]

ঝ. 'মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ই বঙ্গভাষার এই সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ''' গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্ত্তনায় হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।' [দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য; ১ম খণ্ড, পৃ- ১২৭]

প্রতাপ ও শিবাজীর সৈন্যবাহিনীতে বহু মুসলমান সৈনিক ছিল। আবার আওরঙ্গজেবের পূর্বে আকবরের রাষ্ট্রীয় কাজে শতকরা ১৩ জন অমুসলিম নিয়োগ পেতেন, আর আওরঙ্গজেবের আমলে তা বেড়ে শতকরা ২০ গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থাৎ ৫৩৯ জনের মধ্যে ১০৪ জনই ছিল অমুসলিম কর্মকর্তা। রাজসিংহ, ভীমসিংহ, জয়সিংহ, ইন্দ্রসিংহ ও যশোবন্ত সিংহের মতো বিখ্যাত হিন্দুদের তিনি রাজকাজে নিয়োগ দিয়েছিলেন। এরা হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধেই সম্রাটের হয়ে যুদ্ধ করেছিল। তাই সম্রাট আওরঙ্গজেবকে যে হিন্দু বিদ্বেষী বলে সচরাচর উল্লেখ করা হয়, তা সর্বাংশে ঠিক নয়।

তুর্কি আমলে বাংলার জনসংখ্যার দিক থেকে মুসলমানরা ছিল সংখ্যালঘু জাতি। এ সংখ্যালঘু মুসলমান শাসকগণ কোনক্রমেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ওপর ধারাবাহিক ভাবে দেড়-দুইশত বছর জুলুম-নির্যাতন করে শাসন কর্ম অব্যাহত রাখতে পারেনি এবং তা সম্ভবও না। তাছাড়া এদেশের মুসলমানদের মধ্যে (বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত) জনসংখ্যার শতকরা ২৯.৬ ভাগ বহিরাগত মুসলমান এবং শতকরা ৭০.৪ ভাগ ধর্মান্তরিক মুসলমান। এ ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ এসেছে বৌদ্ধ ও উচ্চশ্রেণির হিন্দু থেকে। আর অবশিষ্ট ৭০ ভাগ এসেছে নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজ থেকে। বাংলার জনসংখ্যার বৃদ্ধির আনুপাতিক তালিকা–[১৫৬]

বাংলা	মোট জনসংখ্যা	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	৩৬৭৬৯৭৩৫	১৮১০২৩৪৮	১৬৩৭০৯৬৭
১৮৮১	৩৮৬০৭৬২৮	১৭২৫৪১২০	১৭৮৬৩৪১১
১৮৯১	৩৮২৭৭৩৩৮	১৮০৬৮৬৫৫	১৯৫৮২৪৮১
১৯০১	৪২৮৭৪৮৪৩	২২০১৫০৫১	২১৯৪৭৯৮০
১৯১১	৪৬৩০৩৪২১	২০৯৪৫৩৭৯	২৪২৩৭২২৮
১৯৪১	৭ কোটি	৩.১০ কোটি	৩.৭০ কোটি

উপর্যুক্ত তালিকার মাধ্যমে জানা যায়, ১৮৭২ সাল পর্যন্ত বাংলায় হিন্দুরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল। আর শাসক শ্রেণি হয়েও মুসলমানগণ সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি হিসেবে এ বাংলা শাসন করেছে। এরপর থেকে মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বেড়ে সংখ্যাগরিষ্ঠে পরিণত হয়েছে। আর এ সময়কাল ছিল ব্রিটিশ মাসনামল। তাই বলা যায়– সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান জাতির পক্ষে এদেশ শাসন করে এবং অধিকাংশ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ওপর দীর্ঘকাল ধরে নিপীড়ন করা কোন ক্রমেই সম্ভবপর নয়।

পাণ্ডব বর্জিত দেশ বলে বাংলা চিরকালই ছিল ঘৃণিত এবং এর ভাষা বাংলা ছিল অবহেলিত, অনাদৃত ও অপাঙ্‌ক্তেয়। ব্রাহ্মণ্য আধিপত্য ও সংস্কৃত ভাষার প্রতাপে বাংলায় কোন সাহিত্য সৃষ্টি ও অনুবাদ করা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। এর বিরুদ্ধে বাধাও ছিল প্রকট। কেবল চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাসই দুজন ব্রাহ্মণ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। ব্রাহ্মণ সমাজপতিদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে বাংলায় সাহিত্য রচনা করার সাহস বা আগ্রহ তেমন কারো ছিল না। তাছাড়া 'কৃত্তিবেসে কাশীদেশে আর বামুনঘেঁষে এ তিন সর্বনেশে'- এমন প্রবাদ আঠারো শতক অবধি এদেশে প্রচলিত ছিল। অতএব যে শাস্ত্রিক ও সামাজিক বাধা ছিল, তা তুর্কি বিজয়ের মাধ্যমেণ অপসারিত হয়।[১৫৭]

ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন না হলে আগের যুগের কোন বুলিই (ভাষাই) লেখ্য সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত হতো না। আদিযুগে সংস্কৃতই ছিল ভারতের ধর্মের, শিক্ষার, দরবারের, সাহিত্যের, সংস্কৃতির ও ভাব বিনিময়ের বাহন। তাই কোন আর্য ভারতীয় আঞ্চলিক বুলিই লেখ্য ভাষার মর্যাদা কিংবা শালীন সাহিত্যের বাহন হবার সুযোগ পায়নি। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের হয়েও শুধু রাষ্ট্র শাসন ও ধর্ম প্রচারের কাজে না লাগায় পালি ও প্রাকৃত ভাষা লেখ্যভাষার স্তরে উন্নীত হয়নি। অবহট্‌ঠ প্রাচ্য অঞ্চলে লিখিয়েদেরও আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তীকালে একই কারণে উত্তর ভারতীয় ভাষা অনুকৃত হয়ে, 'ব্রজবুলি'র সৃষ্টি হয়।

এরপরে তুর্কি আমলে ফারসি হয় দরবারী ভাষা। মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে এদেশি জনজীবনে যে ভাব-বিপ্লব আসে, বিশেষ করে তারই ফলে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলোর দ্রুত সাহিত্যিক বিকাশ সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে ধর্মমত প্রচারের বাহনরূপেই সব কয়টি আঞ্চলিক বুলি লেখ্য ও সাহিত্যের ভাষা হবার সৌভাগ্য লাভ করে। তুর্কি আমলে রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বাঙলা লেখ্য শালীন সাহিত্যের বাহন হয়। আর এর দ্রুত বিকাশের সহায়ক হয় বৈষ্ণবমত ও দেব পাঁচালী। পরবর্তীকালে খ্রিষ্টান ও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের, হিন্দু সমাজ সংস্কারের ও কোম্পানীর শাসন পরিচালনার প্রয়োজনে বাঙলা গদ্যের সৃষ্টি ও দ্রুত পুষ্টি হয়। এসব আকস্মিক সুযোগ-সুবিধা পেয়েও বাংলা ভাষা স্বাভাবিক ও স্বাধীনভাবে বিকাশ লাভ করেনি। কারণ পর পর সংস্কৃত, ফারসি ও ইংরেজির চাপে পড়ে বাঙলা কোন দিন জাতীয় ভাষা বা সাংস্কৃতিক জীবনের প্রধান ভাষার মর্যাদা পায়নি।

আজ অবধি বাঙলা একরকম অযত্নে লালিত ও আকস্মিক যোগাযোগ পুষ্ট। সুতরাং আলোচ্য দুশ বছরের মধ্যেকার বাঙলা সাহিত্যের কোন নিদর্শন না মেলার অনুমিত কারণ এই :

ক. ধর্মমত প্রচারের কিংবা রাজ্যশাসনের বাহন হয়নি বলে বাঙলা তুর্কি বিজয়ের পূর্বে লেখ্য ভাষার মর্যাদা পায়নি।

খ. তেরো-চৌদ্দ শতক অবধি বাঙলা উচ্চবিত্তের সাহিত্য রচনার যোগ্য হয়ে ওঠেনি। এ সময় প্রাকৃত জনের মুখে মুখে গাথা ও ছড়া পাঁচালী চলতো।

গ. তেরো-চৌদ্দ শতকে সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্র ছিল হিন্দুশাসিত মিথিলা। তাই এই সময় বাংলাদেশে সংস্কৃত চর্চা বিশেষ হয়নি। কেবল কিছু কিছু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুশীলন হয়েছিল।

ঘ. চর্যাগীতির রচনার শেষ সীমা যদি বারো শতক হয়, তাহলে তেরো-চৌদ্দ শতক বাঙলা ভাষার গঠন যুগ তথা স্বরূপ প্রাপ্তির যুগ। কাজেই এ সময়কার কোন লিখিত রচনা না থাকারই কথা।

ঙ. দেশজ মুসলমানের ভাষা চিরকালই বাঙলা। বাঙলায় লেখ্য রচনার রেওয়াজ থাকলে তুর্কি বিজয়ের পূর্বে বা পরের মুসলমানের রচনা নষ্ট হবার কারণ ছিল না। ,,, দেশে বাঙলায় রচনার রেওয়াজ থাকলে তাদের কেউ কেউ তেরো-চৌদ্দ শতকে কিছু রচনা করতেন এবং তার উল্লেখ পাওয়া যেতো। হিন্দুরা যে অশ্রদ্ধাবশত বাঙলায় কখনো সাহিত্য সৃষ্টি করতে চায়নি, লৌকিক দেবতার পূজা প্রচারে প্রয়াসীই ছিল,

> তার প্রমাণ রয়েছে আঠারো শতক অবধি লিখিত হিন্দুর রচনায়। বিদেশী-বিভাষী-বিজাতি-বিধর্মী ঘাড়ে চেপে বসবে, ভাতে ও ভিটাতে ভাগ বসাবে, আর দেশি লোকেরা তাদের সাদরে আত্মীয়রূপে বরণ করে নেবে, এমন অশম্ভব আশা নিশ্চয় কেউ করে না। কাজেই পরাধীনতার ক্ষোভ ও গ্লানি হিন্দু মনে অবশ্যই ছিল। তেমন অবস্থাও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা হতে পারে, তার সাক্ষ্য রয়েছে উনিশ-বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্যে। বাঙলা ও সাহিত্যের যে চারশত বছরেও আশানুরূপ উন্নতি ও বিকাশ হয়নি; বাঙলা দরবারী কিংবা জাতীয় ভাষার মর্যাদা পায়নি বলেই।[১৫৮]

অতএব অনুমান করা যায়, বাংলা বারো, তেরো ও চৌদ্দ শতকের মধ্যভাগ অবধি লেখ্য ভাষার স্তরে উন্নীত হয়নি। বরং এ সময়কাল হলো বাংলার সাকার (অবয়ব) প্রাপ্তির কালে ও মৌখিক রচনার যুগ।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

মধ্যযুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অগ্রগতিতে মুসলমানদের অবদান ছিল হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যময়। মুসলমান শাসকগণ বাংলা ভাষাভাষী বিভিন্ন অঞ্চল ও অধিবাসীদের একত্র করে একটি রাজনৈতিক ও ভাষাভিত্তিক ঐক্য গড়ে তোলেন। ‘বাংলা’ ও ‘বাঙালি’ নামক এ দুটি শব্দ মুসলিম শাসনামলেই পরিচিতি লাভ করে। কারণ হিন্দু শাসনামলে সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। আর এর সংস্কৃত দেব ভাষায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত নিম্নবর্ণের কারো অধিকার ছিল না। এর ফলে ব্রাহ্মণগণ যেমন ভাষার অধিকার থেকে নিম্নশ্রেণির আপামর জনসাধারণকে দূরে ঠেলে দেয়। তেমনি কালের করাল গ্রাসে সে ভাষারও ঘটে অপমৃত্যু। কেননা জনসাধারণের সঙ্গে ভাষার আত্মিক যোগ না থাকলে, প্রাণের টান না থাকলে এবং বুলির উপায় না হলে তার বিলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। সংস্কৃত ভাষার ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছিল। কারণ- ব্রাহ্মণ্য দৌরাত্ম্যের বাহন দেবভাষা সাধারণ বাঙালীকে বহুকাল মূক করে রেখেছিল। বাঙালী তার বুকের আশা মুখের ভাষায় বহুকাল প্রকাশ করতে পারেনি। সেন রাজাদের আমলে শূদ্রমাত্রেরই উচ্চ শ্রেণীর লেখাপড়ার অধিকার কেড়ে লওয়া হলো। ,,, তাই জনসাধারণ অজ্ঞ ও মূর্খ হয়ে রইলো।[১৫৯]

তাই বলা যায়, বাঙ্গালা দেশে পাঠান প্রাবল্যের যুগ এক বিষয়ে বাঙলার ইতিহাসে সর্ব প্রধান যুগ। আশ্চর্যের বিষয় হিন্দু স্বাধীনতার সময়ে বঙ্গদেশের সভ্যতার যে শ্রী ফুটেছিল, এই পরাধীন যুগে সেই শ্রী শতগুণে বেড়ে গিয়েছিল। ,,, তাই পাঠান যুগেই সর্বপ্রথম হিন্দু সমাজে নতুন বিক্ষোভ দৃষ্ট হলো। জনসাধারণের মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ প্রচারিত হওয়াতে, তারা গুরুড় পক্ষী হয়ে ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে থাকতে দ্বিধাবোধ করলো। ব্রাহ্মণরা বাধ্য হয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ বাঙলায় প্রচার করলেন। তারা ঘোর অনিচ্ছায় এটি করেছিলেন। এই পাঠান প্রাধান্য যুগে চিন্তাজগতে সর্বত্র অভূতপূর্ব স্বাধীনতার খেলা দৃষ্ট হলো, এই স্বাধীনতার ফলে বাঙলার প্রতিভার যেরূপ অদ্ভূত বিকাশ ঘটেছিল, এদেশের ইতিহাসে অন্যকোন সময়ে তদ্রূপ বিকাশ সচরাচর দেখা যায় নাই।[১৬০]

মুসলমান সুলতান ও নবাবদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে সকল সামাজিক ও শাস্ত্রীয় ভয়কে উপক্ষো করে প্রথম বারের মতো ধর্মগ্রন্থকে বাংলা ভাষায় রূপদানের দুঃসাহস দেখা যায়। এতে করে সমাজে বিদ্যমান হাজার বছরের প্রতিষ্ঠিত সংস্কার বিশ্বাসের পতন হয় এবং বাংলা ভাষা নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। বাংলা ভাষা লেখার ভাষার মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়। ব্রাহ্মণ্য শাসনের অক্টোপাস থেকে ছাড়া পেয়ে বাঙালির যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত রুদ্ধ আবেগ নানা ধারায় প্রকাশিত হয় এবং বাঙালিকে আর্য প্রভাবমুক্ত পৃথক জাতিরূপে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। এমন শুভযুগ বাঙালির জাতীয় জীবনে এর আগে ও পরে কোনদিন আসেনি।

ইলিয়াস শাহী শাসনামল (১৩৪২-১৪১৪খ্রি. ও ১৪৪২-১৫৮৭খ্রি.) থেকেই বাংলার শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ব্যাপক চর্চা শুরু হয়। হোসেন শাহী শাসনামল (১৪৯৩-১৫৩৮খ্রি.) বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের সুবর্ণযুগ। এসময় বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। সোনারগাঁও এবং আরাকান রাজসভাকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। এ দুই রাজদরবারের সুলতান, নবাব ও আমীর-ওমরাহদের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতায় শাস্ত্র ও সাহিত্যের বাংলা অনুবাদ ও রচনা সম্পন্ন হয়। এর তথ্য সম্পর্কিত একটি তালিকা ড. ওয়াকিল আহমদের 'বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত' গ্রন্থে এরূপ পাওয়া যায়–

পৃষ্ঠপোষক	কবি/লেখক	গ্রন্থ	সময়কাল
* লক্ষ্মণ সেন	হলায়ুধ মিশ্র	শেক শুভোদয়া	(১২০০-০৩)
১. গিয়াসউদ্দিন আজম শাহ	শাহ মু. সগীর	ইউসুফ-জুলেখা	(১৩৮৯-১৪১০)
২. জালাল উদ্দিন মাহমুদ শাহ	কৃত্তিবাস	রামায়ণ	(১৪১৮-১৪৩১)
৩. শামসউদ্দিন আহমদ শাহ	বড়ু চণ্ডীদাস	শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	(১৪৩১-৪২)
৪. জালাউদ্দিন ফতেহ শাহ	ধ্রুবানন্দ মিশ্র	মহাবংশীবলী	(১৪৮৫)
৫. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	বিজয়গুপ্ত	মনসামঙ্গল	(১৪৯৪)
৬. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	যশোরাজ খান	ব্রজবুলি	(১৪৯৩-১৫৩৮)
৭. সেনাপতি পরাগল খাঁ	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	মহাভারত পাচালী	(১৪৯৩-১৫৩৮)
৮. রুকন উদ্দিন বরবক শাহ	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়	(১৪৫৯-৭৪)
৯. শামসউদ্দিন ইউসুফ শাহ	জৈনুদ্দিন	রসুল বিজয়	(১৪৭৪-৮১)
১০. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	বিজয় গুপ্ত	পদ্মপুরাণ	(১৪৯৩-১৫১৯)
১১. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	বিপ্রদাস	মণসা-বিজয়	(১৪৯৩-১৫১৯)
১২. আলাউদ্দিন হুসেন শাহ	যশোরাজ খান	বৈষ্ণবপদ	(১৪৯৩-১৫১৯)
১৩. নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ	বিদ্যাপতি	বৈষ্ণবপদ	(১৫১৯-৩১)
১৪. নাসির উদ্দিন নুসরত শাহ	শেখ কবির	বৈষ্ণপদ	(১৫১৯-৩১)
১৫. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	আফজাল আলী	বৈষ্ণপদ	(১৫৩২-৩৩)
১৬. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	দ্বিজ শ্রীধর	বিদ্যাসুন্দর	(১৫৩২-৩৩)
১৭. আশরাফ খান (লস্কর উজির)	কাজী দৌলত	সতী ময়না লোর চন্দ্রানী	(১৬২২-৩৮)
১৮. আশরাফ খান (লস্কর উজির)	মরদন	নসিবনামা	(১৬২২-৩৮)
১৯. মাগন ঠাকুর (প্রধান অমাত্য)	আলাওল	পদ্মাবতী	(১৬৪৮/১৬৫১)
২০. সৈয়দ মুসা	আলাওল	সয়ফুলমুলক বদিউজ্জামাল	(১৬৬৯)
২১. সোলায়মান (অমাত্য)	আলাওল	সতীময়না লোর চন্দ্রানী	(১৬৫৯)
২২. সোলায়মান (অমাত্য)	আলাওল	তোহফা	(১৬৬৪)
২৩. সৈয়দ মুহা. খান (সৈন্যমন্ত্রী)	আলাওল	সপ্তপয়কর	(১৬৬৫)
২৪. মজলিস নবরাজ (রাজ সচিব)	আলাওল	সিকান্দারনামা	(১৬৭৩)
২৫. মজলিস নবরাজ (রাজ সচিব)	কোরেশী মাগন	চন্দ্রাবতী	(১৬৪৫-১৬৫৯)
২৬. আতিবর (রাজ কোষাধ্যক্ষ)	আব্দুল করিম খোন্দকার	দুল্লা মজলিস	(১৬৯৮)
২৭. আতিবর (রাজ কোষাধ্যক্ষ)	আব্দুল করিম খোন্দকার	হাজার মসায়েল	(১৬৯৮)

২৮. আতিবর (রাজ কোষাধ্যক্ষ)	আব্দুল করিম খোন্দকার	নূরনামা	(১৬৯৮)
২৯. ছুটি খান	শ্রীকর নন্দী	মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব	অজ্ঞাত
৩০. মুনাইন মুনশী	কমর আলী	সরসালের নীতি	(১৬০০-১৬৫৭)
৩১. নাসিরউদ্দিন নুসরত শাহ	শেখ কবির	পদকর্তা	(১৫১৯-৩২)
৩২. আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ	আফজাল আলী	নসীহৎনামা	(১৫৩২-৩৩)
৩৩. নেজাম শাহ	দৌলত উজির বাহরাম খান	লাইলী মজনু	(১৫৬০-৭৫)
৩৪. পীর সৈয়দ সুলতান	মুহাম্মদ খান	সত্য কলি বিবাদ সংসার ও হানিফার লড়াই	(১৫৮০-১৬৮০)
৩৫. শাহজাদা নাজির আলী	মুহাঃ উজির আলী	শাহনামা, সায়াৎ কুমার	১৭১৮
৩৬. পীর শাহ দৌলা	শেখ চান্দ	শাহদৌলা, রসুল বিজয় ও গৌরী সংবাদ	(১৫৬০-১৬২৫)
৩৭.	সৈয়দ সুলতান	নীববংশ, ওফাৎনামা ও ইবলীসনামা	(১৫৫০-১৬৪৮)
৩৮.	শেখ ফয়জুল্লাহ	গোরক্ষ বিজয়, গাজী বিজয় ও সত্যপীর	(১৫৭০)
৩৯.	ফকীর গরীবুল্লাহ	জঙ্গনামা, সত্যপীর ও ইউসুফ-জুলিখা	(১৬০০-১৭৫৭)
৪০.	মুহাম্মদ কবির	মধুমালতী	(১৫৮৩-১৫৮৮)
৪১.	আব্দুল হাকিম	শিহাবুদ্দীন নামা, লালমতী সয়ফুলমুলক, কারবালা ও শহরনামা	(১৬২০-৯০)
৪২.	নওয়াজিশ খাঁ	গুল-ই-বকাওলী	১৬০০-১৭৫৭
৪৩.	মাধবাচার্য	শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল গঙ্গামঙ্গল	(১৫৭৯)

এভাবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মুসলমান সুলতান, আমীর-ওমরাহদের আন্তরিকতা ও উদারতার ফলে হিন্দু-মুসলিম লেখকদের দ্বারা বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বাংলা ও বাঙালি সমৃদ্ধ ভাষা ও জাতিতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মঙ্গলকাব্যের প্রাসঙ্গিক পরিচয় ও শ্রেণিবিভাগ

মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক বিশিষ্ট শিল্প-সম্ভার ও সমৃদ্ধ শাখা। সাধারণ ভাবে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর কাল প্রবাহকে অর্থাৎ ভারতচন্দ্রের (১৭১২-১৭৬০খ্রি.) কাল পর্যন্ত এ সময় পরিধিকে মঙ্গলকাব্যের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। মধ্যযুগের রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও সামাজিক পালাবদলের অনিবার্য দাবির প্রসূনরূপে প্রস্ফুটিত হয় এ মঙ্গলকাব্য। এ মঙ্গলকাব্যের আদর্শ বাংলার লৌকিক ধর্ম, লক্ষ্য নিম্নবর্গের সামাজিক প্রতিষ্ঠা এবং ধারক-বাহক এদেশের বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ গণমানব। মঙ্গলকাব্য যদিও দেবনির্ভর, সগোত্রীয়, দেবতার মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজা প্রচলনের উদ্দেশ্যে রচিত তথাপি শেষ পর্যন্ত সে দেবতাই এখানে উপলক্ষ্য মাত্র, মানুষই লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে। এমনকী দেবতাটিকে পর্যন্ত ক্রোধহিংসায় রূপ দিয়ে পৃথিবীর সাধারণ মানুষরূপেই আঁকা হয়েছে। এজন্য এ মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন বাংলার সাধারণ মানুষের পারিবারিক, সামাজিক, দৈনন্দিন এবং ক্ষেত্রবিশেষ রাষ্ট্রীয় জীবনের যে চিত্র পাওয়া যায়, তা অন্য কোন সাহিত্যের শাখায় এর নাম মাত্রও পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন রাজা ও ভিন্ন ভিন্ন আদর্শ আশ্রয়ী রাষ্ট্রের উত্থান-পতন এবং সামাজিক আবর্তের কম্পন লৌকিক জীবনেই অনুভূত হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। আর সামাজিক সংঘাত ও যুদ্ধ বিগ্রহ মানুষের জীবন বা তার সমাজ-জীবনের কোন অঙ্গাবরণকেই কোনরূপ সম্মান বা ক্ষমা করে না বলেই মানুষের জীবনে যা কিছু মূল্যবান, যা কিছু কল্যাণকর, যা কিছু মানবীয় তা সমস্ত যায় নিঃশেষ ধূলিস্যাৎ হয়ে। আর এ ধ্বংসের ধূলি মেখেই মানুষ নিজেকে মনে করে অসহায় এবং জীবনকে মনে করে দুর্বিষহ। কিন্তু এই অসহায় চেতনা তার মধ্যে যতো প্রবল হোক না কেন, মানুষের কাছে এর থেকেও বড় সত্য হলো- সে যে মানুষ এবং মানুষ হিসেবে তার জীবনের অবিশ্রান্ত সাধনা হলো নিজেকে সৃষ্টি করা, প্রতিকূল পরিবেশকে জয় করে নিজের পরিপূর্ণ শক্তি সৌন্দর্যে নিজেকে উপলব্ধি করা। তাই তার পরাজয়ের দিনেও তার মধ্যেই এই চেতনা বর্তমান। মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের সঙ্গে এই চেতনা ও তার সার্থক প্রকাশ অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে। মঙ্গলকাব্যগুলির মূল সুরের মধ্যে এর অভিপ্রকাশ রয়েছে। অধিকাংশ মঙ্গলকাব্যে উদাসীন শিবের প্রভাবের বিরুদ্ধ প্রভাব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।[১]

কারণ এ লৌকিক শিবের ওপর মানুষ আর বল-ভরসা রাখতে পারছে না। কারণ এ শিব পৌরাণিক শিবের মতো ক্ষমতাধর ও প্রতাপশালী নয় বরং কর্মবিমুখ, উদাসীন ও আত্মভোলা। তাই মানুষ এ লৌকিক শিবকে পরিত্যাগ করে শক্তিকে গ্রহণ করে। ,,, এই শক্তির আরও একটা দিক আছে। সেটা হলো সৃষ্টির, এই শক্তি মেয়ে দেবতা, তাই প্রচণ্ড হলেও তা মাতৃরূপা। আর মাতৃরূপে দেবতার কল্পনার মাধ্যমে মানুষ তার অন্তর্নিহিত সৃষ্টি-লালন পালন প্রেরণারই সংগঠিত রূপের অভিব্যক্তি দিয়েছে। এই শক্তি কল্পনার মধ্যে মানুষের দুটো সহজাত প্রবৃত্তি পরিশোধিত রূপে প্রকাশ লাভ করেছে– একদিকে তার বাঁচার আকুতি, আত্মরক্ষা ও সেজন্য সংগ্রামের প্রেরণা এবং অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনের আকুতি।[২] ফলশ্রুতিতে মনসা, বাসুলি ও চণ্ডী নিম্নবর্ণ পূজিত দেবীগণ উচ্চবর্ণের হিন্দু কর্তৃক যেমন স্বীকৃতি লাভ করল। তেমনি উচ্চবর্ণের বেদ-পুরাণে আশ্রিত ব্রাহ্মণ্য ধর্ম যে ধর্মের দ্বার নিম্নবর্ণের হিন্দুগণের জন্য এতদিন রুদ্ধ ছিল; সে দ্বারও এখন তাদের জন্য উন্মুক্ত হল।

কারণ মুসলমানের বঙ্গ বিজয় এবং ইসলাম ধর্মে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধে অনুপ্রাণিত হয়ে নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলামের দীক্ষার প্রয়াস চললে, উচ্চবর্ণের হিন্দুগণ এর প্রতিরোধ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালাল। মুসলমানদের এই সাংস্কৃতিক বিজয়কে অবদমিত করবার জন্যই হিন্দুধর্মের দুই কোটীতে অবস্থিত নিম্নবর্ণ ও উচ্চবর্ণের মধ্যে একটা আপোষরফা করে সংযোগ নিকটতর করবার প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে পড়ল। একান্তভাবে লৌকিক

জীবনাশ্রয়ী, সমাজের সর্ব প্রান্ত বিস্তৃত গণমানবজীবনের সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনা চিহ্নিত জগৎটিকে বক্ষে ধারণ করেই সৃষ্টি হল বাঙলা সাহিত্যের নতুন পথিকৃত মঙ্গলকাব্য। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাশ্রিত সামন্তবাদী শাসনের বহু ধাপ বিশিষ্ট নিষ্ঠুর শাসনযন্ত্রের চাপে পিষ্ট-ক্লিষ্ট গণমানস তাদের বহু যুগ সঞ্চিত ক্ষোভ বেদনাকে রূপ দিল লৌকিক ধর্মের কাহিনীর আবরণে রচিত এই মঙ্গলকাব্যগুলির মাধ্যমে।[৩]

তাই এ পথ ধরেই রচিত হল- 'শাসক ধর্ম ও শাসক সংস্কৃতির বিরুদ্ধে শাসিত ধর্মের ও শাসিত সংস্কৃতির প্রতিরোধের সাহিত্য।[৪] তাই মঙ্গল কাব্যগুলি অতি স্বাভাবিকভাবেই ধর্মগত আবরণের আড়ালে সৃষ্ট হল। কেননা মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী অর্থনৈতিক অবকাঠামোয় ধর্মই ছিল সমাজ ব্যবস্থার প্রথম এবং প্রধানতম পরিচয়। এছাড়া শাসক শ্রেণির রোষানলের দাবদাহ থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যও একটা একটা কার্যকরী পন্থা বিবেচিত হল। তাই ধর্মীয় কাহিনীর আবরণে যেমন বৃহত্তর গণমানসের সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনা, পাওয়া-না পাওয়া দীর্ঘশ্বাসমণ্ডিত কাহিনীটি এখানে ব্যক্ত হয়েছে। তেমনি দেবী হিসেবে যাকে বর্ণনা করা হয়েছে, তিনিও কোন স্বর্গলোকের অধিবাসিনী নন, বরং বহু বঞ্চনা, বহু অত্যাচারের শিকার এই গণজীবনের শাসক শক্তিরই প্রতীক। বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষ সামন্ত শাসক শক্তির রোষ-আক্রোশ প্রদর্শনে ভীত সন্ত্রস্ত করে শাসিত জনের নিকট থেকে কার্যোদ্ধারের দৃষ্টান্ত সহজেই এইসব গণমানুষের পূজিত দেবীকেও ভীষণা-ভয়ঙ্করী হিসেবে চিত্রিত করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।[৫]

তাই মঙ্গলকাব্যগুলিতে চণ্ডী ও মনসাকে স্বীয় উপাসক ভক্তগণের জন্য যেরূপ কার্য তৎপর দেখা যায়, সে তুলোনায় শিব ঠাকুরকে নিতান্তই নিশ্চেষ্ট বলে মনে হয়। খুল্লনার বিপদে, শ্রীমন্তের খেদে, লাউসেনের দুঃখে চণ্ডীর হৃদয় বিদীর্ণ হয়েছে। সুন্দর দেবীর প্রাসাদে কাব্য অপেক্ষা চৌর্য্যেও কম কৃতিত্ব লাভ করেন নাই। বিষহরি দেবীকে পূজা করে বিপুলা (বেহুলা) কতদূর কৃতকার্য হয়েছিলেন তা কে না জানে? ভক্তের স্মরণ মাত্র এরা কখনও সাশ্রুনেত্রে, কখনও খড়গহস্ত। ভগবানকে পিতৃরূপে এবং মাতৃরূপে তারা প্রত্যক্ষ করতে চায়। বোধ হয়- শক্তি আরাধনা এ জন্য তাদের অধিকতর আকর্ষণ করেছিল। ভগবতী মাতৃরূপে শ্রীমন্তকে বা সুন্দরকে মশানে ক্রোড়ে ধারণ করে বসেছেন কিংবা বেহুলাকে তার মৃত স্বামী ফিরিয়ে দিয়েছেন; তাই সচেষ্ট দয়ার ভাব ও গুণবত্তার পরিচয় তাদের নববল সম্পন্ন করেছিল। বিশেষত, যখন মুসলমানগণ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরে জ্বলন্ত বিশ্বাসের পরিচয় দিচ্ছিল, তখন তারাও নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনালয়ে নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে নাই। মুসলমান বিজয়ের পর এই জন্যই শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্ম বিশেষরূপে পুষ্টিলাভ করেছিল।[৬]

রাজরোষ ছাড়াও মধ্যযুগে বাঙালি বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, সাপ ও বাঘভীতিসহ নানাবিধ দুর্যোগের সম্মুখীন হয়েছে। এসবের পীড়নে এদেশের জনগণ যতোই মুখোমুখি হয়েছে, এতেই তারা বিভিন্ন লৌকিক দেব-দেবীর আশ্রয় নিয়েছে এবং প্রতিকারের প্রার্থনা জানিয়েছে। দেবতাদের মানুষ সৃষ্টির ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ থাকলেও, মানুষ যে দেবতা সৃষ্টি করেছে তা নিয়ে কোন সংশয় নেই। মানুষ দেবতা সৃষ্টি করেছে বলেই পৃথিবীর বিভিন্ন জনসমাজে দেবতাদের মধ্যে এত বৈচিত্র্যময় রূপ দেখা যায় এবং একই জনসমাজে দেবতা কল্পনায় দেশকাল ভাব অনুসারে দেবতাদের রূপ ও স্বরূপের প্রতিনিয়ত পরিবর্তন ঘটেছে।

ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিপত্তনের কাল নির্ধারণ করা যেমন অসাধ্য ব্যাপার, তেমনি ভারতবর্ষীয় দেবতাদের উদ্ভব নিরূপণ করা সম্ভব নয়। দেবতাদের প্রকৃতি ও আচরণেও বৈচিত্র্য বিদ্যমান। ভারতীয় দেবতাদের একটি ক্রম বিবর্তনের ইতিহাস সুস্পষ্টত বেদ থেকে উপনিষদ, উপনিষদ থেকে পুরাণ এবং পুরাণ থেকে লৌকিক রীতিতে বিকাশ ঘটেছে। দেব উপাসনার রীতি-প্রকৃতিও ক্রমশ পরিবর্তিত হয়েছে। পৌরাণিক যুগে দেবপূজায় বৈদিক যজ্ঞ ও ব্রহ্মচিন্তা পরিবর্তিত আকারে স্বীকৃতি পেয়েছে। এই যুগেই দেবতাকে প্রত্যক্ষগোচর করে তোলার জন্য প্রস্তরময়ী ও মৃন্ময়ী প্রতিমা গঠন করে পূজার আয়োজন জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এদের সম্পর্কে কৌতূহলোদ্দীপক

ও চমকপ্রদ কাহিনীর অভাব নেই। আর্যরা যখন এদেশে আসেন তখন তাঁদের বৈদিক ধর্ম এদেশে বসবাসকারীদের ধর্মের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। ঋক, সাম ও যজুর বেদের কাল পর্যন্ত সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বৈদিক ধর্ম তার নিজস্ব সত্তা কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হলেও অথর্ব বেদের সময়েই বৈদিক ধর্মের ওপর লোকায়ত ধর্মের ছাপ পড়তে থাকে। পুরাণ, রামায়ণ এবং মহাভারতের যুগে লোকায়ত ধর্মেরই জয়জয়াকার অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ স্বরূপ শিব বা মহেশ্বরের কথা উল্লেখ করা যায়।

বেদে শিব বা মহেশ্বর বা মহাদেবের কোন কথা উল্লেখ নেই। সেখানে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সঙ্গে রুদ্রের উল্লেখ আছে। অথচ পুরাণের যুগে রুদ্র অর্থাৎ অগ্নির জায়গায় শিব দেবাদিদেব মহাদেব হিসেবে ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সঙ্গে মিলে- 'ত্রয়ীদেবতা' হয়েছেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু পালন কর্তা এবং শিব সংহারকর্তা হিসেবে মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন। এমনকী কোন কোন সময় ব্রহ্মা-বিষ্ণুসহ সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তির চেয়েও শিব শক্তিমান। কিন্তু এই শিব হচ্ছেন প্রাক্ আর্য যুগের মানুষের অর্থাৎ অনার্যদের দেবতা। এ উপমহাদেশে বৈদিক ধর্মের ক্রমবর্ধমান প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার আদিম অধিবাসীরা বৈদিক ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাদের নিজস্ব ধর্মের প্রভাব আর্য ধর্মের মধ্যে সংক্রমিত করতে সক্ষম হয়েছে। এরই ফলস্বরূপ অসংখ্য অবৈদিক যেমন- চণ্ডী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভৈরব-ভৈরবী, ষষ্ঠী, শীতলা, ঘট-লক্ষ্মী, শ্মশান শিব, লিঙ্গ-যোনী, চড়ক, মনসা প্রমুখ দেব-দেবীরা কালের পরিক্রমায় আর্য-ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূজিত হয়েছেন।[৭] গুপ্ত আমলে এবং সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসক অবস্থান করলেও বাংলাদেশের মানুষ প্রাচীন জড়বাদের সংস্কারপুষ্ট জৈন-বৌদ্ধ হওয়ার কারণে এখানে মহাযান ও তজ্জাত মন্ত্র-তন্ত্র, কালচক্র-বজ্র-সহজযানী বিকৃত বৌদ্ধ মতই জনপ্রিয়তা পেয়ে লোকধর্মে পরিণত হয়।[৮]

গুপ্ত ও সেন আমলের মধ্যবর্তী প্রায় চারশত বছর বাংলার শাসন ক্ষমতায় বৌদ্ধ পালরা অধিষ্ঠিত থাকার পরেও বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে বিশেষ করে সেন আমলে বৌদ্ধ বিলুপ্তি প্রায় সম্পন্ন হয়ে আসে। এই সময়েই নিম্নবিত্তের এবং সমাজ বহির্ভূত বৌদ্ধরা নির্যাতনের আশঙ্কায় ভীত হয়ে আত্মগোপনের মাধ্যমে সুপ্তভাবে স্বধর্ম রক্ষায় ব্রতী হয়। সেনদের উচ্ছেদ করে তুর্কি আমল এলে দেখা যায়– সেন আমলের ব্রাহ্মণ্য সমাজপতির রোষের ভয়ে এতকাল যারা তাদের বিশ্বাস ও সংস্কারে গড়া লৌকিক দেবতার তথা জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও ঋদ্ধির প্রয়োজনে সৃষ্ট ইষ্ট ও অরি দেবতার পূজা কিংবা মাহাত্ম্য কথা নির্বিঘ্নে-নির্দ্বিধায় প্রকাশ্যে প্রচার করতে পারেনি, তারা বিদেশি-বিধর্মী তুর্কি শাসনের প্রশ্রয়ে কিংবা ঔদাসীন্যে কিংবা উৎসাহে ক্ষমতাবিচ্যুত সমাজপতির পীড়নের ভয়মুক্ত হয়ে স্ব স্ব ইষ্ট ও অরি দেবতার মঙ্গল গানে মুখর করে তুললো বাঙলার পরিবেশ।[৯]

এভাবে অরি (মনসা, শীতলা ও শনি) এবং মিত্র (চণ্ডী, ধর্ম ঠাকুর, সত্যনারায়ণ) শক্তির প্রতীক বিভিন্ন লৌকিক দেবতার সৃষ্টি হওয়ায় পাশাপাশি তাঁদের পূজার প্রসার এবং মাহাত্ম্য প্রচারিত হতে থাকে। দ্বাদশ শতাব্দীর তুর্কি আক্রমণের পটভূমিকায় বাংলাদেশের সন্ত্রস্ত হিন্দু সমাজকে নিজেদের দুর্গ শক্তিশালী করার প্রক্রিয়ায় নিম্নবর্ণের অনেক আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে আপোষ করতে হয়েছে। সামাজিক অনাচারের দিনে যখন নিষ্ক্রিয় শৈবধর্মের আদর্শ এদেশের সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে; তখন প্রবল রাষ্ট্রশক্তির সম্মুখে সমগ্র সমাজ নিজেকে সম্পূর্ণ অসহায় বিবেচনা করে তার কবল হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ভয়ঙ্করী শক্তি দেবতার উদ্বোধন করলো।[১০]

এ লৌকিক দেবতাদের নেই স্বর্গীয় মাহাত্ম্য, প্রতাপ ও মহিমা বরং তারা স্বর্গপুরীর মোহনীয় আবেষ্টনী ভেদ করে নেমে এসেছেন আমাদের মর্ত্যভূমিতে, যেখানে দেবতারাও ধূলি-ধূসরিত বাঙালি নর-নারীতে পরিণত হয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- 'কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আম বাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। যদি তাহারা নিজ নিজ অভ্রভেদী মূর্তি ধারণ করিবার চেষ্টা মাত্র করিতেন, তাহা হইলে বাংলার গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের স্থান হইত না।'[১১] এ জন্যই

মঙ্গলকাব্যসমূহকে বাংলার মাটির সম্পদ (product of the soil) হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কারণ মঙ্গলকাব্য ধারার উদ্ভব ও বিকাশ বাংলার লোকজীবনের জন্ম ও বিবর্তন ধারার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। মোট কথা 'বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে এই কাব্য প্রকাশের ধারা বিচিত্র সম্পর্কে যুক্ত হয়ে আছে।'[১২] তাই রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন- 'মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমেই প্রথম বাঙালির সামাজিক অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটে'।[১৩] কারণ- 'বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কীভাবে এক দেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়'।[১৪]

ইতিহাসবিদদের ধারণা, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজাগণ এদেশের নগণ্য সংখ্যক উচ্চবর্ণের সমর্থন আদায়ে সক্ষম হয়েছিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ নিম্নশ্রেণির উৎপীড়িত জনসাধারণ তুর্কি আক্রমণের সময় হয় রাজবিরোধী কিংবা উদাসীন ছিলেন। ফলে সেন রাজাগণ তুর্কিদের এ লঘু আক্রমণেই ক্ষমতাচ্যুত হয়ে পড়েন। এ সত্ত্বেও মিশ্র জাতি বাঙালি অধ্যুষিত এ বঙ্গদেশে- 'যে সমাজ সংহতি সংঘটিত হয়েছিল, যে ভাব সাঙ্কর্যের সৃষ্টি হয়েছিল, বাংলাদেশের মৃত্তিকা উপাদানের সঙ্গে পৌরাণিক ও শাস্ত্রানুগ বোধবুদ্ধির যে মিশ্রণ ঘটেছিল এবং এই মিশ্রণের ফলশ্রুতি স্বরূপ বাংলা কাব্য ধারায় যে প্রবল উচ্ছ্বাসময়, প্রচণ্ড বেগ সমন্বিত বন্যাপ্রবাহ সঞ্চারিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্য তারই সার্থক সাক্ষ্যবাহী।[১৫] ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য তাঁর 'জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম' গ্রন্থে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব ও আর্য-অনার্য, লৌকিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিথষ্ক্রিয়ায় উদ্ভূত দেব-দেবীদের নতুন রূপ, পরিচয় সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত- মনসা, মঙ্গলচণ্ডী বা চণ্ডী, অন্নদা, শীতলা, ধর্ম ও দক্ষিণ রায় প্রমুখ দেব-দেবীর উৎপত্তি সম্পর্কিত ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

ক. আর্য সংস্কৃতির প্রভাবাধীনে থেকেও বাংলার কৃষি ভিত্তিক লৌকিক ধর্ম সংস্কার, লৌকিক ধর্মমতের সৃষ্টির ধারা অব্যাহত ছিল।

খ. অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে মহাযানী পন্থী তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ নিজেদের ধর্মমতের সঙ্গে ঐ সকল লৌকিক ধর্মমতকে মিশিয়ে নূতন নূতন দেব-দেবী সৃষ্টি করছিল।

গ. মুসলমান ধর্মমত ও অত্যাচারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে অসহায় জনসাধারণ এক অলৌকিক দৈব শক্তির কল্পনা করে এবং সে শক্তিকে নানাভাবে পূজা করে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে বাংলাদেশের লৌকিক দেবতারা ভয় ও সাংসারিক স্বার্থবুদ্ধি হতে সৃষ্ট হলেন। এ সকল দেবতার মধ্যে বৈদিক বা পৌরাণিক দেবতার উদার ও কারুণিক রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরং এ দেবতারা নীচ, ক্রূর, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং ভয়ানক স্বার্থপর। ,,, ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত মঙ্গলকাব্যগুলিতে আমরা এ সকল ভীষণ প্রকৃতির দেবতার সাক্ষাৎ পাই। পরে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে এ সকল ক্রূরমনা দেবতা শান্ত ও করুণাময় হয়ে পড়েন। উগ্র চণ্ডী শেষ পর্যন্ত অভয়দাত্রী অভয়া অন্নদায় পরিণত হলেন।[১৬]

এসব লৌকিক দেবতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কালান্তর' (১৩২৬খ্রি.) গ্রন্থের 'বাতায়নিকের পত্র' নামক প্রবন্ধে বলেছেন- 'এককালে পুরুষ দেবতা যিনি ছিলেন তাঁর বিশেষ কোন উপদ্রব ছিল না। খামকা মেয়ে দেবতা জোর করে এসে বায়না ধরলেন, আমার পূজা চাই। অর্থাৎ যে জায়গায় আমার দখল নেই, সে জায়গা আমি দখল করবই! তোমার দলিল কী? গায়ের জোর ! কি উপায়ে দখল করবে? যে উপায়ে হোক! তারপর যে সকল উপায়ে দেখা দেয় মানুষের সদবুদ্ধিতে তাকে সদুপায় বলে না। কিন্তু পরিণামে এই সকল উপায়েরই জয় হলো। ছলনা, অন্যায় এবং নিষ্ঠুরতা কেবল যে মন্দির দখল করল তা নয়। কবিদের দিয়ে মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে আপন জয়গান গাইয়ে নিলে।'[১৭] একথা প্রায় সর্বজন বিদিত যে, প্রাচীন ও

মধ্যযুগের পদ্য সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যেই রচিত হতো। মঙ্গলকাব্যও এর ব্যতিক্রম ছিল না। ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক প্রয়োজনে দেবতার সহযোগিতা ও সহানুভূতি প্রাপ্তির আশায় মঙ্গলকাব্য সমূহ সম্মিলিত ভাবে গীত বা গাওয়া হতো। আবার এ মঙ্গলকাব্য সমূহের উদ্ভবের কারণ নির্ণয় করতে বিখ্যাত গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে দেখিয়েছেন-

'হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মের সংঘাতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ যেমন সংস্কৃত পুরাণগুলির সৃষ্টি হইয়াছিল। বাংলাদেশে হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলমান সমাজের প্রথম সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তেমনিই মঙ্গল কাব্যগুলির উদ্ভব হইয়াছিল।' –(পৃ.-৬৮)।

অন্যদিকে মঙ্গলকাব্যগুলোর তাৎপর্যপূর্ণ দিক এই যে, এগুলো হচ্ছে রূপক কাব্য। সমসাময়িক ঘটনাবলি, সংঘাত, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ও টিকে থাকার অধিকারের স্বীকৃতির লড়াই প্রভৃতি রাজনৈতিক বিষয়াবলিও কবিগণ দেব-দেবীর সংগ্রামের গাথায় রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন। এদিক লক্ষ্য রেখে তাই বলা যায়– সকল মঙ্গলকাব্যে মানুষ ও মানুষের কথাই মুখ্য, দেবতা সেখানে নিছক উপলক্ষ্য রূপক মাত্র।

মানুষের সাধারণ বিশ্বাস মতে, দেব-দেবীর গৌরব ও মাহাত্ম্যমণ্ডিত যে সাহিত্য রচনা, পাঠ ও শ্রবণ করলে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও দেশের পার্থিব মঙ্গল বা কল্যাণ সাধন হয় তাকেই বলে মঙ্গল সাহিত্য। যেহেতু এগুলো এক শ্রেণির ধর্ম বিষয়ক আখ্যান বা কাহিনীধর্মীয় রচনা এবং গঠনকাঠামো তথা শিল্প-শৈলীর মানদণ্ডে কাব্যের পর্যায়ে পড়ায় এ সাহিত্যকে মঙ্গলকাব্য বলে অভিহিত করা হয়। বাংলার পল্লীর জনসভায় এর উদ্ভব হলেও শেষ পর্যন্ত রাজসভায় এটি পুষ্টি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এটি বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্য-সাধনা হলেও এর সৃষ্টির প্রেরণা কোন একটি বিশেষ যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যগুলো তারই পরিচয় বহন করছে। এদেশের বিভিন্নযুগের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি ও ধর্ম বিশ্বাসের বিস্তৃত ভিত্তির উপর এর প্রতিষ্ঠা বলেই এ মঙ্গলকাব্যকে বাংলার সামাজিক দর্পণ বলা যায়।

অরবিন্দ পোদ্দারের 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থের আলোকে বলা যায়– মঙ্গলকাব্যের বাইরের ছাঁচটা পৌরাণিক, কিন্তু তার অন্তর সম্পদ মানবিক। বিভিন্ন দেব-দেবীর জন্ম, ঘর-সংসার, দ্বন্দ্ব ও প্রাধান্য লাভের উপাখ্যান মঙ্গলকাব্যের উপজীব্য– এটা তার বাইরের রূপ। কিন্তু এই বাহিরাবরণের মধ্যে যে কাহিনী রূপায়িত হয়েছে তা একান্তভাবেই মানবিক এবং বিভিন্ন দেব-দেবীর যে পারস্পরিক কলহ এবং শক্তির সংগ্রাম তা সংগঠিতও হচ্ছে এই মানবিক পটভূমিতেই। মানুষের পরিকল্পিত দেবতা মানুষেরই প্রতিবিম্ব স্বরূপ; তাই তাদের আচার-আচরণ ব্যবহার ইত্যাদি সম্পূর্ণ মানুষেরই মত স্থান-কাল-বিধৃত যে কোন সামাজিক মানুষের মতো। ,,, তাই কাব্য ও লৌকিক জীবন ক্রমে পৌরাণিক ও অলৌকিক শক্তির কাল্পনিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে সহজ রূপ গ্রহণ করেছিল। জীবনটা স্বর্গীয় না হয়ে পার্থিব হয়ে উঠেছিল এবং কাব্যও স্বর্গকে রূপ না দিয়ে পৃথিবীকে সৃষ্টি করে চলছিল। ,,, সুতরাং সব দিক থেকেই কাহিনীর দিক থেকে পাত্র-পাত্রীর আচরণের দিক থেকে, সমাজ সংস্কৃতির দিক থেকে এই কাব্য লৌকিক জীবনের উপরই প্রতিষ্ঠিত জীবনের রং-এ আঁকা। ,,, তাই এই কাহিনীই সেই কালের সেই সমাজের সাধারণ মানুষের মানস জীবনের প্রতিচ্ছবি, তার জীবন কাব্য।

'মঙ্গল' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো কল্যাণ। এ কাব্যের নাম 'মঙ্গলকাব্য' হবার পেছনে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। মঙ্গলকাব্য নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের কল্যাণ কামনার বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের রাগ-রাগিনীর মধ্যে 'মঙ্গলরাগ' অন্যতম। যেহেতু প্রাচীন ও মধ্যযুগের পদ্য সাহিত্য মাত্রই গানের উদ্দেশ্যে রচিত হতো এবং আসর জমিয়ে তা গাওয়া হতো, সেহেতু

মঙ্গলকাব্য এর ব্যতিক্রম ছিল না। আবার মঙ্গলগানের মধ্যে পাঁচালীর সুরও ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো বলে একে 'মঙ্গল পাঁচালী' বলা হতো। চর্যাপদও এর ব্যতিক্রম ছিল না। শুধু মঙ্গলরাগে গাওয়া হতো বলে যে এর নাম মঙ্গলকাব্য হয়েছে তা নয়, বরং ব্যাপক অর্থে দেব মহিমা প্রচারক গীত মাত্রই মধ্যযুগের 'মঙ্গলগীত' নামে পরিচিতি লাভ করে। এ অর্থেই 'মঙ্গল' শব্দটি এদেশে সর্ব প্রথম ব্যবহার করেন জয়দেব গোস্বামী তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে।[১৮] আবার হিন্দি ভাষায় বিবাহ অর্থে কোন কোন সময় 'মঙ্গল' শব্দটি ব্যবহৃত হতো। মালয়ালাম ভাষায় বিবাহ অর্থে 'মঙ্গল্যম' শব্দটি আজো ব্যবহার করা হয়। বিবাহের সঙ্গে মাঙ্গলিক বিষয়টি জড়িত বলে বিবাহের নাম মঙ্গল ভাবা হয়। আবার দ্রাবির ভাষায় মঙ্গল শব্দের অর্থই বিবাহ। অনেকে অনুমান করেন- There were several kinds of mangles and the narrowing down of mangle to mean marriage exclusively in a fairly recent phenomenon.[১৯]

দক্ষিণ ভারতের কুর্গ অঞ্চলে প্রায় প্রত্যেক জাতকর্মকে 'মঙ্গল' নামে অভিহিত করা হয়। যেমন- বালকের কর্ণভেদ অনুষ্ঠানকে 'হেম্মিকুট্টি মঙ্গল' বালিকার কর্ণভেদকে 'পোলেকণ্ড মঙ্গল', নারীর প্রথম গর্ভধারণকে 'কুলিয়ম্মে মঙ্গল' দশপুত্র সন্তানের জননীর সম্মানার্থে পালনীয় অনুষ্ঠানকে বলে 'মঙ্গল' এবং গৃহারম্ভ কালের পূজানুষ্ঠানকে বলে 'মনে মঙ্গল'। দ্রাবিড় ভাষায় 'মঙ্গল' শব্দটি ভিন্নার্থক অর্থে ব্যবহৃত হলেও তা কালক্রমে বিবাহ বিশেষত দেব-দেবীর বিবাহ অর্থে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। অতঃপর বাংলায় দেব-দেবীর মাহাত্ম্য সূচক রচনা মাত্রই মঙ্গল নামে পরিচিতি লাভ করে। মঙ্গল গানকে সাধারণ ভাবে 'জাগরণ' বলা হয়। এ জাগরণ শব্দটি চৈতন্য যুগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়ে'র কবি মালাধর বসু সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন। বিভিন্ন পূজা বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাত জেগে পুথি ও গান পালা করে গাওয়া হতো। চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীন হস্তলিখিত পুথিতে দিবাপালা ও নিশাপালার বিভাজন রয়েছে। এ পালাগুলোর বিভিন্ন নামও রয়েছে। আবার ধর্মমঙ্গল কাব্যে মোট চব্বিশ পালার মধ্যে একটি পালার নাম জাগরণ পালা। মনসামঙ্গল কাব্যেরও একটি পালার নাম এ জাগরণ পালা। সাধারণত এ পালাটি হতো দীর্ঘ এবং এক মঙ্গলবার হতে শুরু করে পরবর্তী অষ্টম দিনের মঙ্গলবার এ কাব্য গেয়ে শেষ করা হতো বলে একে আবার 'অষ্টমঙ্গল' বলা হয়।

সুতরাং লৌকিক দেবতার মাহাত্ম্য জ্ঞাপক কাব্য পাঠ ও শ্রবণ করলে মঙ্গল হয়- এসব দেবতায় বিশ্বাস ভক্তি স্থাপন করলে পার্থিব জীবনে কল্যাণ ঘটে- এ অর্থেই 'মঙ্গল' শব্দটি এতটা রূপ লাভ করে। এ মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে পুরাণ, লৌকিক ধর্ম, বৈষ্ণবধর্ম, চরিতকাব্য, নাটগীত, নাথ সাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা, মুসলিম আখ্যায়িকা, অনুবাদ সাহিত্য, ব্রতকথা, পাঁচালী ও লোককথার আকৃতি ও প্রকৃতিগত সুস্পষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। তাছাড়া মঙ্গলকাব্যের বিষয়বস্তুরও অভিনবত্ব শিল্প-শৈলীর অর্থাৎ ভাষার চমৎকারিত্ব, ছন্দের ব্যঞ্জনা-ঝঙকার ও সঙ্গীতের সুর লহরী একে স্বাতন্ত্র্য ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। এ মঙ্গলকাব্যগুলোর আঙ্গিকশৈলী বা গঠনকাঠামোর বৈচিত্র্য অনুসারে মোট পাঁচটি খণ্ডে বিভাজন করা যায়। যথা-

প্রথম অংশ — বন্দনা। এ অংশে দেবতা গণেশের বন্দনার মধ্য দিয়ে শুরু হলেও অন্যান্য দেবতারও বন্দনা করা হয়।

দ্বিতীয় অংশ — আত্মপরিচয়। এ অংশে কবি বিভিন্ন ভণিতার মাধ্যমে তার আত্মপরিচয় ও বংশ পরিচয় দান করেন এবং গ্রন্থ রচনার কারণ ব্যাখ্যা করেন।

তৃতীয় অংশ — দেবখণ্ড। পৌরাণিক দেবতাদের সঙ্গে লৌকিক দেবতাদের সম্বন্ধ সৃষ্টিই এর মূল কথা। অর্থাৎ স্বর্গের দেবতার অভিশাপবরণ এবং মর্ত্যে গমনের প্রস্তুতি। এ অংশে শিবের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

চতুর্থ অংশ — মর্ত্যখণ্ড বা নরখণ্ড। এ অংশই মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ অংশ। কাহিনীর ঘাত-প্রতিঘাত ও উত্থান-পতনের মাধ্যমে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাগণ মর্ত্যে মানব জন্ম লাভ করে দেবতার পূজা প্রচারে সংগ্রামে লিপ্ত হন। এ অংশেই নারীদের বারোমাস্যা, চৌতিশা ও পতিনিন্দা বর্ণিত হয়।

পঞ্চম অংশ — শ্রুতিফল বা গ্রন্থ শ্রবণের ফল। এ অংশে মঙ্গলকাব্যের পরিণতি লাভ। অভিশপ্ত দেবতাদের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার হলেই দণ্ডাদেশ শেষ হয় এবং শাপান্তে মর্ত্য ছেড়ে স্বর্গধামে প্রত্যাবর্তন। কাব্য শ্রবণের ফলশ্রুতিতে পার্থিব কল্যাণ ও মঙ্গলের আশ্বাস।

এখানে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন যে, কাব্যের নামের সঙ্গে শুধু 'মঙ্গল' শব্দটি যুক্ত থাকলেই তা মঙ্গলকাব্য হয় না। এর জন্য কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়। উক্ত লক্ষণগুলো হল–

১. প্রায় সব কবি স্বপ্নে দেবতার নির্দেশ পেয়ে কাব্য রচনা করেন।
২. প্রথম থাকে সিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা।
৩. এটি হবে দীর্ঘ আখ্যায়িকামূলক রচনা।
৪. এটিকে হতে হবে জনসম্মুখে আবৃতি ও সঙ্গীতযোগে পরিবেশনযোগ্য।
৫. কাব্যের অধিকাংশ ঘটনা সাধারণ নয়, বরং অসাধারণ। মঙ্গলকাব্যের নায়ক-নায়িকারা সবাই শাপভ্রষ্ট দেবতা।
৬. কোন বিশিষ্ট দেবতার পূজা বা মাহাত্ম্য প্রচারের লক্ষ্যেই সমস্ত ঘটনাগুলো সংঘটিত হবে।
৭. তিনি হবেন বাংলার লৌকিক দেবতা।
৮. মর্ত্যে পূজা প্রচারের সময় দেবতাদের আচরণ হবে সাধারণ মানুষের মতো।
৯. শাপান্তে স্বর্গভ্রষ্ট দেবতাগণের মর্ত্যলোক ছেড়ে স্বর্গলোকে প্রত্যাবর্তন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল অভিধেয় কাব্যে কীর্তিত তিন শ্রেণির দেবতার সঙ্গে পরিচিতি হওয়া যায়। যেমন–

১. বৈষ্ণব– চৈতন্যমঙ্গল, অদ্বৈতমঙ্গল, গোবিন্দমঙ্গল, কৃষ্ণমঙ্গল, রাধিকামঙ্গল, জগৎমঙ্গল, কিশোরীমঙ্গল, স্মরণমঙ্গল, গোকুলমঙ্গল, রসিকমঙ্গল, জগন্নাথমঙ্গল প্রভৃতি।

২. পৌরাণিক– গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, কমলামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডিকামঙ্গল প্রভৃতি।

৩. লৌকিক– শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, কালিকামঙ্গল বা বিদ্যা সুন্দর, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সারদামঙ্গল, সূর্যমঙ্গল প্রভৃতি।

বৈষ্ণব শ্রেণির মঙ্গলকাব্যগুলো আন্তঃপ্রকৃতি ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিধায় সেগুলো মঙ্গলকাব্য ধারার আলোচনায় স্থান পায় না। তাছাড়া স্মরণযোগ্য, লৌকিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্য (মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল) সাহিত্যে প্রথম উদ্ভূত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে সেগুলোরই প্রভাব পৌরাণিক বিষয়ক কাব্যসমূহেও প্রসারিত হয়েছিল। তার ফলস্বরূপ পৌরাণিক শ্রেণির মঙ্গলকাব্যসমূহের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে মঙ্গলকাব্যগুলোকে আবার বিশেষ বিভাজনে বিভক্ত করা যায়। যথা–

১. প্রধান মঙ্গলকাব্য — মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল প্রভৃতি।

২. বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য — শিবমঙ্গল বা শিবায়ন, অন্নদামঙ্গল বা কলিকামঙ্গল বা বিদ্যা-সুন্দর প্রভৃতি।

৩. গৌণ মঙ্গলকাব্য — শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি।

বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যসমূহের উপাখ্যানবীজ সম্ভবত খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লক্ষ করা যায়। অবশ্য পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্বে রচিত পূর্ণাবয়ব কোন মঙ্গলকাব্য পাওয়া যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত তো বটেই এবং

এরপরেও বাংলা সাহিত্যে অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হতে থাকে। আলোচনার সুবিধার্থে তিন যুগে বিভাজন করে মঙ্গলকাব্যগুলোকে একনজরে দেখা যাক। আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর– 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে এভাবে বিভাজন করেছেন–

১. উদ্ভব যুগ (age of origin)
২. সৃজন যুগ (age of creation) এবং
৩. ঐশ্বর্যময় যুগ (age of glory)

১. উদ্ভব যুগ (age of origin) :

খ্রিষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব যুগ (age of origin) বলা যেতে পারে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে রচিত 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ'–র চণ্ডী স্ত্রোত্রের একটি শ্লোক (বঙ্গবাসী সংস্করণ- ৩,১৬,৪৫) উল্লিখিত হয়েছে-

'ত্বং কালকেতু বরদা চ্ছলগোধিকাসি
যা ত্বং শুভা ভবসি মঙ্গলচণ্ডিকাখ্যা।
শ্রীশালবাহন নৃপাদ্ বণিজ্যঃ সসুনো
রক্ষেহম্বুজে করিচয়ং প্রসভী বমণ্ডী ॥'

এই একই শ্লোকে চণ্ডী যে কালকেতুকে বর দিয়েছিলেন, তিনি যে গোধিকারূপ ধারণ করেছিলেন, সিংহলের রাজা শ্রী শালবাহন যে বণিকপুত্রকে নিজের কন্যা দান করেছিলেন, চণ্ডী যে কমলেকামিনী রূপ ধারণ করে হস্তী একবার গ্রাস করে পুনরায় বমন করেছিলেন ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হয়েছে। এ হতেই মনে হয় 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' রচিত হবার কালে চণ্ডীমঙ্গল এর নিজস্ব রূপ লাভ করেছিল। কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনীযুক্ত যে চণ্ডীমঙ্গলের বিষয়বস্তু আমরা শুনতে পাই, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' এর উক্ত শ্লোকটিতে তারই ইঙ্গিত প্রকাশ পেয়েছে। বিশেষজ্ঞগণের মতে, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত হয়েছে।[২১]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ইতোপূর্বেই যে একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করেছিল, 'বৃহদ্ধর্মপুরাণ' এর উল্লেখ হতেই তা জানতে পারা যায়। কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনী পরস্পর স্বতন্ত্র দুটি কাহিনী হওয়া সত্ত্বেও এটি যে তখন হতেই একই চণ্ডীমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, তা বৃহদ্ধর্মপুরাণের একই শ্লোকে এর উল্লেখ দেখে বুঝতে পারা যায়। এ যুগের সাহিত্যিক নিদর্শন কোন কিছুই তেমন হস্তগত হয়নি, তবে এ যুগের মঙ্গলকাব্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে পরবর্তী কবিগণের রচনার মধ্যেও উল্লেখ দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গল রচয়িতা কানা হরিদত্ত সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন–

মুর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরি দত্ত ॥
হরিদত্তের যত গীত লুপ্ত হইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥
কথার সঙ্গতি নাই নাহিক সুস্বর।
এক গাইতে আর গায় নাহি মিত্রাক্ষর ॥
গীতে মতি না দেয় কেহ মিছা লাফ ফাল।
দেখিয়া শুনিয়া মোর উপজে বেতাল ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিলীয়মান স্মৃতি হরিদত্তের বৈশিষ্ট্যহীন রচনার উপর বিজয়গুপ্ত নতুন করে মনসামঙ্গলকাব্য রচনা করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর পূর্ববর্তী কবি মানিক দত্তকে যথোচিত বৈষ্ণব বিনয় সহকারে স্মরণ করেছেন এভাবে-

মানিক দত্তেরে বন্দোঁ করিয়া বিনয়।
যাহা হইতে হইল গীত পরিচয় ॥

এখানেও দেখতে পাওয়া যায়, চণ্ডীমঙ্গলের প্রাচীনতম কবি মানিকদত্ত এ জাতীয় কাব্য রচনার পথ প্রদর্শক মাত্র। মানিক দত্ত সম্ভবত ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। মধ্যযুগের ধর্ম মঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ও ধর্ম মঙ্গল কাব্যের আদি কবি ময়ূর ভট্টের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন-[২২]

ময়ূর ভট্টেরে বন্দি সঙ্গীত আদ্য কবি।

ধর্মমঙ্গলের প্রথম কবি ময়ূর ভট্টের সময়কাল ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ১১৮০ খ্রি. অনুমান করেছেন। কিন্তু ড. আহমদ শরীফ এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কবি ময়ূর ভট্টের সময়কাল যথাক্রমে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী বলে অনুমান করেছেন। কিন্তু আশুতোষ ভট্টাচার্য, সুকুমার সেন প্রমুখ বসন্ত কুমার সম্পাদিত 'শ্রীধর্মপুরাণ' এর রচয়িতা হিসেবে ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারার পরবর্তী কবি মানিক গাঙ্গুলি, ঘনরাম চক্রবর্তী, সীতারাম দাস প্রমুখ নন্দিত আদি কবি ময়ূর ভট্টের রচনা বলে স্বীকৃতি না দিয়ে তাকে আধুনিককালের রচনা বলে অনুমান করেছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ক্ষেত্র গুপ্ত ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্টের কাব্য নিদর্শন পাওয়া যায়নি বলে মত প্রকাশ করেছেন।[২৩]

২. সৃজন যুগ (age of creation)

সাধারণত পঞ্চাদশ ও ষোড়শ শতাব্দীই মঙ্গল কাব্যের সৃজন যুগ (age of creation)। পরবর্তী যুগের বিশিষ্ট আখ্যায়িকাগুলো এ যুগে এসে সংহতি (Compractness) লাভ করেছে। মঙ্গল কাব্যের ধারায় এ যুগ সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। কোন বিষয়ই যেমন উদ্ভবকালেই তার পরিপূর্ণতা আশা করা যায় না, মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেও সে কথা প্রযোজ্য। উদ্ভব যুগের কোন পূর্ণায়ব মঙ্গলকাব্য পাওয়া না গেলেও সৃজন যুগে তার যথেষ্ট সন্ধান মেলে। সৃজন যুগের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে রয়েছেন– মনসামঙ্গলকার- নারায়ণদেব, বিজয়গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই প্রমুখ (চৈতন্য পূর্ববর্তী) দ্বিজ বংশীদাস, তন্ত্রবিভূতি, শ্রীরায় বিনোদ প্রমুখ (চৈতন্য সমকালীন বা পরবর্তী), চণ্ডীমঙ্গলকার– কবি দ্বিজ মাধব, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখ এবং ধর্মমঙ্গলকার- মানিক গাঙ্গুলী, খেলারাম প্রমুখ। এ সময়ে এসব শক্তিমান কবিদের হাতে মঙ্গলকাব্যগুলো পরিপূর্ণ অবয়ব লাভ করে।

তৎকালীন উচ্চতর হিন্দু সমাজের নিকট পুরাণ বহির্ভুত লৌকিক কাহিনীর কোন আবেদন না থাকায় সৃজন যুগেই প্রথম বিভিন্ন লৌকিক কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক কাহিনীর অংশ মিশ্রিত করে লৌকিক কাহিনীর মধ্যস্থতায় পৌরাণিক দেবতাদের মহিমা প্রচার করার প্রয়াস দেখা যায়। ফলে সৃজন যুগে মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে একটি আভিজাত্যের ভাব প্রকাশ পায়। যদিও ভাষায় ও কল্পনায় তখনও সম্পূর্ণভাবে গ্রাম্যতা মুক্ত হয়ে সাহিত্যিক রূপ অর্জন করতে পারেনি। অবশ্য, সত্যিকার মৌলিক কবিত্ববিকাশ একমাত্র লৌকিক দেব-দেবীর মাহাত্ম্যসূচক মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়েছে। যার জন্য রমেশচন্দ্র দত্ত এ যুগের মঙ্গল কাব্যকে- First original poem in Bengali apart from songs and translations[২৪] বলেছেন।

৩. ঐশ্বর্যময় যুগ (age of glory)

অষ্টাদশ শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যের যুগ বলা হয়। ষোড়শ শতাব্দীর পর হতেই বাংলার সমাজে ক্রমান্বয়ে পৌরাণিক আদর্শ সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। তার ফলে লৌকিক চণ্ডীর আখ্যানক্রমে জনপ্রিয়তা হারাতে শুরু করে। এ সময় মার্কাণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত চণ্ডী আখ্যায়িকার অনুবাদ কাব্যগুলো- কালিকাপুরাণ, দেবী মাহাত্ম্য বা দেবীমঙ্গল, চণ্ডিকাবিজয়, চণ্ডীবিজয়, গৌরীমঙ্গল, ভবানীমঙ্গল, দুর্গাপুরাণ, দুর্গাবিজয়, দুর্গালীলা, দুর্গামঙ্গল, দুর্গাভক্তি তরঙ্গিনী, চণ্ডীমঙ্গল, অভয়মঙ্গল প্রভৃতি নামে রচিত হতে থাকে। অবশ্য চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার কবিদের মধ্যে দ্বিজরামদেব, মুক্তারাম সেন, জয়নারায়ণ সেন, কৃষ্ণরাম দাস প্রমুখ কবি এ যুগে আবির্ভূত হন। এ যুগের মনসামঙ্গল রচয়িতারা হচ্ছেন- কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, জগজ্জীবন ঘোষাল, বিষ্ণুপাল, ষষ্ঠীবর দত্ত, জীবন মৈত্র প্রমুখ। এ সময়কালেই শিব বিষয়ক বিভিন্ন পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান অবলম্বন করে রামকৃষ্ণ রায়, রামেশ্বর ভট্টাচার্য প্রমুখ কবি শিবমঙ্গল বা শিবায়নকাব্য রচনা করেন। এ যুগেই কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। এ সময়কার ধর্মমঙ্গলকারদের মধ্যে রয়েছেন- ঘনরাম চক্রবর্তী, রামনারায়ণ, ধর্মদাস বৈদ্য, রামকান্ত রায় প্রমুখ।

বিশেষ করে অষ্টম শতাব্দীকে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্যময় যুগ বলা যেতে পারে। ধর্ম মঙ্গলের কবি ঘনরাম চক্রবর্তী এবং অন্নদামঙ্গলের রূপকার ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর মূলত এ দুজনই এ যুগের স্রষ্টা। তাঁদের পূর্ববর্তী যুগের ভাষা যেমন- সরল-সোজা ছিল, তেমনি ভাবও আয়াসসাধ্য ছিল। সহজ কথায় প্রত্যক্ষ সত্যটি অন্তরের অন্তস্থলে স্পর্শ করতো। কিন্তু ঐশ্বর্যময় যুগে যে একই বিষয়বস্তুর ওপরই শব্দ ঝঙকার ও রচনা পারিপাট্য এক কৃত্রিম বাহ্যিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। এ ঐশ্বর্যময় যুগেই বাংলা সাহিত্য, ভাষা ও ভাবে গ্রাম্যতা মুক্ত হলো। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এ যুগেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার প্রয়াস হয়নি, কিন্তু এতে চরিত্রগুলিকে অভিনব রূপদান করে কাব্যদেহে অলংকার সজ্জার যে নিপুণ ব্যবস্থা করা হলো, তা সমগ্র মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের এক অতি মূল্যবান সম্পদ হয়ে রইলো।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শ্রী চৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৩খ্রি.) প্রভাব সর্বব্যাপী ও সর্বপ্লাবী। শ্রী চৈতন্যদেব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ। তাঁর মধ্যে যুগপৎ সম্মিলিত হয়েছিল ধর্মনেতা, চিন্তানায়ক ও সমাজ সংস্কারের দুর্লভ গুণ। নিজে সৃষ্টিশীল না হয়েও মধ্যযুগের কয়েক শতাব্দী বিস্তৃত বাংলা সাহিত্যের তিনি প্রেরণাশক্তি, তাঁর প্রত্যয় ও জিজ্ঞাসা ষোড়শ শতাব্দী থেকে অন্ত্য-মধ্যযুগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিবিধ শাখার বিশ্বাসে-ভক্তিতে, প্রেমে-অনুরাগে হয়ে উঠেছে শিল্পরূপময়।[২৫] শ্রীচৈতন্য এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি এক বর্ণ না লিখেও সাহিত্যের যুগ স্রষ্টা হিসেবে সমাদৃত। নদীয়ার জগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর ঘর আলো করে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব। শৈশবের বিশ্বম্ভর, নিমাই ও গৌরাঙ্গই পরবর্তীকালে শ্রী চৈতন্যদেব নামে বাংলার আকাশ-বাতাস প্রেমের বাণীতে প্লাবিত করেছিলেন। চৈতন্য দেবের প্রেমবাদ ও উদার মানবতার জোয়ারেই হিন্দুধর্মের তথা হিন্দু সমাজের ভাঙন রক্ষা পায়। বাংলায় তুর্কি বিজয়ের (১২০৪খ্রি.) ফলে নিম্নশ্রেণির হিন্দুগণ ইসলামী সাম্য ও মানবতায় আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হবার যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, এবং হিন্দু সমাজ যে হুমকীর সম্মুখীন হয়েছিল, এ সঙ্কট থেকে হিন্দুধর্ম ও সমাজকে নীলকণ্ঠের মতো রক্ষা করেছিলেন চৈতন্যদেব। তাঁর সম্পর্কে কয়েকটি উক্তি স্মরণীয়–

ক. 'যে নবদ্বীপ একদা পলায়নপর হিন্দু রাজার একখানি মলিন আলেখ্য দ্বারা ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছিল, খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সে নবদ্বীপ তিনটি শ্রেষ্ঠ পুরুষের চিত্রপট উপহার দিয়া স্থানীয় স্বীয় ঐতিহাসিক ত্রুটি উৎকৃষ্টভাবে সংশোধন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইহারা রঘুনাথ শিরোমণি,

স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ও শ্রী চৈতন্যদেব। ,,, প্রথম দুইজনের সমকক্ষ আছে। কিন্তু তৃতীয়জন তুলনারহিত, মানবজাতির তপস্যার ফলস্বরূপ।’[২৬]

খ. ‘সেই সময় এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ তনয় মস্তকে ও চরণে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে সেই সমবেদনা সূচক প্রীতি জাগাইয়া দিয়াছিলেন। প্রেমের পতাকা উড্ডীন করিয়া।’[২৭]

গ. ‘বাঙলাদেশে দুইবার একদেহে অসামান্য রূপগুণের সমাবেশ হয়েছিল। একবার চৈতন্যদেহে, অন্যবার রবীন্দ্র শরীরে। বিমুগ্ধ দীনেশচন্দ্র সেন চৈতন্যকে প্রমূর্ত প্রেমরূপে বর্ণনা করেছিলেন- ‘প্রেম একবার মাত্র এই পৃথিবীতে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল, সে বঙ্গদেশে।’ এ কথাগুলো নিতান্ত আবেগ সর্বস্ব নয়।’[২৮]

ঘ. ‘তাঁর এই মন মাতানো, ঘর ভোলানো, সুখ জাগানো প্রেমতত্ত্বের প্রভাবে কিছু কালের জন্য বাঙালীর অন্যসব চিন্তা-চেতনা যেন বন্যার তোড়ে ভেসে গেল। ,,, চৈতন্য আন্দোলনে ইসলামের প্রসার রুদ্ধ হল, বলা চলে প্রায় বন্ধই হল। কেননা, ইসলামের যেসব বৈশিষ্ট্য নিপীড়িত অবজ্ঞাত জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল, তাদের সবগুলোই চৈতন্য মতবাদে গৃহীত হল।’[২৯]

ঙ. ‘এমনি অবস্থায় উত্তর ভারতীয় আদলে হিন্দু সমাজ রক্ষায় এগিয়ে এলেন চৈতন্যদেব। সেদিনকার হিন্দু সমাজে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটা উনিশ শতকের রামমোহনের মতো।’[৩০]

চ. ‘এক কথায় বাঙালী পরোক্ষ নব জীবনচেতনা ও উদার জগৎ ভাবনা লাভ করল চৈতন্য প্রসাদে। তাই ষোল শতক সর্বার্থেই অবিশেষ বাঙালী জীবনে রেনেসাঁসের যুগ।’[৩১]

চৈতন্যদেব তাঁর জীবিত অবস্থায় কোন বিধিবদ্ধ গ্রন্থ বা শাস্ত্র রচনা করেননি বা রেখে যাননি। কিন্তু তাঁর প্রধান শিষ্য বা ষড় গোস্বামীদের (রূপ, সনাতন, জীব, গোপাল ভট্ট, রঘুনাথ ভট্ট ও রঘুনাথ দাস) এবং অন্যান্য শিষ্যবৃন্দ যেমন- অদ্বৈতাচার্য, হরিদাস, নিত্যানন্দ, নরহরি সরকার, বাসুদেব সার্বভৌম, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ ও গদাধর পণ্ডিতের প্রয়াস প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে জীবনী গ্রন্থ, চরিত্রাবলী ও কড়চা, কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, তত্ত্ব, দর্শন, ভক্তিবাদের বিকাশ ঘটে।

সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রি.) শাসনামলেই শ্রীচৈতন্য প্রেমের পূজারী রূপে আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন বাঙালীর নররূপে নারায়ণ। মধ্য-মধ্যযুগের বাংলাদেশের সমাজ সংস্কৃতি ধর্ম দর্শন সাহিত্য চৈতন্যদেবের চেতনালোকের দীপ্তিতে প্রদীপ্ত। তাঁর প্রচারিত দর্শন, লোক হিতকর কর্মোদ্যোগে সমকালীন বাংলাদেশে সূচনা করেছিল নবযুগের– আধুনিক বিদ্বৎ সমাজ তাই তাঁকে অভিহিত করেছেন ‘যুগস্রষ্টা’ বলে। নবযুগের স্রষ্টা রূপে যুগাতিক্রমী প্রভাব বিস্তারের কারণেই চৈতন্যদেব মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ‘যুগন্ধর’ পুরুষ।[৩২] এ শ্রী চৈতন্যদেবকে ভিত্তি করেও বাংলা মঙ্গলকাব্যসমূহকে তিন শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়। যথা-

১. চৈতন্য পূর্ব
২. চৈতন্য প্রভাবিত ও
৩. চৈতন্য উত্তর।

উদাহরণ স্বরূপ মনসামঙ্গলের কথা ধরা যেতে পারে। এ তিন পর্যায়ের কবিদের মধ্যকার কাহিনী বিন্যাস, উপস্থাপনা পদ্ধতি ও চরিত্র চিত্রণের মধ্যে যথেষ্ঠ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। চৈতন্য পূর্বযুগের কবিদের কাব্যে মনসাদেবীর প্রতি ছিল আতঙ্কগ্রস্ত ভক্তি, স্বৈরাচারী ভাগ্যবিধাতার নিকটে মানুষের ভয় মিশ্রিত ভক্তি।[৩৩] অর্থাৎ তখন লৌকিক চেতনা এবং অব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই প্রধান ছিল। কিন্তু চৈতন্য প্রভাবে কিংবা চৈতন্যোত্তর যুগের কবিদের কাব্যে সেই ভয়-ভক্তির মধ্যে দেখা দিল দাস্যরসের একটা স্থির আচার। বিনয়-সহিষ্ণুতা, স্নেহ-প্রীতি, মমতা, সখ্য প্রভৃতি মানবীয় গুণাগুণের একটু নতুন স্পর্শ।[৩৪]

বাংলা সাহিত্যে বিভিন্ন শ্রেণির মঙ্গলকাব্য থাকলেও মঙ্গলকাব্য বলতে মূলত মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলকেই বুঝিয়ে থাকে। শিবমঙ্গল বা শিবায়ন মঙ্গলকাব্য কী না- এ প্রশ্নে গবেষকদের মধ্যে মতোবিরোধ রয়েছে। যদিও বেশ কয়েজন কবি এ কাব্য রচনা করেছেন। আবার অন্নদামঙ্গল কাব্যের একক রচয়িতা হিসেবে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর তাঁর অতুলোনীয় কবি প্রতিভা দিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে নতুন ধারার মঙ্গল সাহিত্য রচনা করেন, গবেষকদের দৃষ্টিতে তা পুরোপুরি মঙ্গলকাব্য হয়ে ওঠতে পারেনি। আর গৌণ মঙ্গলকাব্যসমূহ যেমন- শীতলামঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি স্বাভাবিক কারণেই যথার্থ মঙ্গলকাব্য হয়ে ওঠেনি। চাঁদ-মনসা ও বেহুলা-লক্ষিন্দরের কাহিনী নিয়ে মনসামঙ্গল, কালকেতু ও ধনপতি সওদাগরের কাহিনী নিয়ে চণ্ডীমঙ্গল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের ও লাউসেনের কাহিনী নিয়ে ধর্মমঙ্গল এবং বিদ্যা-সুন্দর ও মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান নিয়ে রচিত হয়েছে অন্নদামঙ্গল কাব্য। এ চারটি কাব্যে- যথাক্রমে মনসা, চণ্ডী, ধর্ম ও অন্নদার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচারই মূল বিষয়ে পরিণত ও প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অবশ্য যে কোন উপায়ে-অজুহাতে-ছলে-বলে-কলে-কৌশলে পূজা আদায়ের জন্য উন্মুখ মঙ্গলকাব্য ধারার দেবতাদের মধ্যে ধর্মঠাকুর যথেষ্ঠ ব্যতিক্রম। কারণ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ধর্মমঙ্গল প্রাচীনতম, কিন্তু কাব্য নিদর্শন সমূহের দিক দিয়ে নবীনতম। চতুদর্শ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই চণ্ডী ও মনসা উভয় দেবী পৌরাণিক ভক্তি, রূপ প্রভৃতি আত্মসাতের মাধ্যমে অনার্য-অস্পৃশ্য, অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের সীমানা ভেদ করে বৃহত্তর হিন্দু সমাজের মূল কেন্দ্রের অভিমুখে যে অগ্রসর হচ্ছিলেন- সেটা জোর দিয়েই বলা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত। 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থেও এ সত্যতা ধরা পড়ে-

ধর্মকর্ম লোক সবে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলী করয়ে কেহ দিয়া মহাধন ॥[৩৫]

গবেষকগণ যথার্থই মন্তব্য করেছেন, হয়তো চৈতন্য ধর্ম, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদের মধ্য দিয়ে ক্রমপ্রতিষ্ঠিত পৌরাণিক আদর্শ ও তন্ত্র শাসনের মাধ্যমে শক্তিপূজার বিশুদ্ধতার ভাব-দীক্ষা প্রাচীনতর লৌকিক ধর্মগুলির বেগবান প্রবাহকে প্রতিরুদ্ধ না করলে মনসা ও অনার্য চিন্তা প্রসূতা উগ্রচণ্ডী দেবীই আজ পর্যন্ত আমাদের প্রধান দেবতারূপে পূজিতা হতে থাকতেন।[৩৬] ধর্মমঙ্গলের ঐতিহ্য আর মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য এক মূল থেকেই উদ্ভূত। সুকুমার সেন এ অভিমত ব্যক্ত করার পাশাপাশি এর সমর্থনে নাথ পন্থীদের প্রাচীন ছড়ারও উল্লেখ করেছেন–

মাতা হমারী মনসা বোলিয়ে।
পিতা কেলিয়ে নিরঞ্জন নিরাকার ॥

অর্থাৎ আমাদের মাতাকে বলা হয় মনসা, নিরাকার নিরঞ্জনকে পিতা বলা হয়। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের যে পরিচয় ফুটে ওঠেছে তাতে তাঁকে অনেকটা বৌদ্ধ প্রভাবজাত বলে মনে করা হয়। সুকুমার সেনের অভিমত এই যে- ঋগ্বেদের নামদীয় সূক্তের বর্ণনার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টির পত্তন কাহিনীর যোগাযোগ আছে। প্রাচীন মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ঋগ্বেদীয় সৃষ্টিপত্তন কাহিনীর ভাবই অনুবৃত্ত।[৩৭]

নীচ জাতীয় জনসাধারণই সকল দেবতার আদি পূজক। মনসাদেবীর আদি পূজক হিসেবে দেখা যায়- কৈবর্ত ও চণ্ডালদের, চণ্ডীদেবীর আদি পূজক হিসেবে দেখা যায় কিরাত বা ব্যাধ সম্প্রদায়কে, ধর্মঠাকুরের আদি পূজক হিসেবে পাওয়া যায় ডোমদের এবং অন্নদা দেবীর পূজক হিসেবে লক্ষ করা যায় ঘুটেঁ কুড়ানী সম্প্রদায়কে। আঞ্চলিক কাব্যধারা ধর্মমঙ্গলের কাহিনী- মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের তুলোনায় স্বতন্ত্র। ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। অবশ্য যুদ্ধের বর্ণনা মনসামঙ্গলে ও চণ্ডীমঙ্গলেও আছে। কিন্তু সেসব স্থানে যুদ্ধ অনেকটা ঘরোয়া পর্যায়ের কিংবা দেবতাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশের প্রেক্ষাপটে কল্পিত। পক্ষান্তরে ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গলের যুদ্ধ মূলত রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত এবং অনেকটা ইতিহাস স্বীকৃত ও দৈবপ্রভাব মুক্ত। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দেবতারা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবতারা প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি। বর্তমান গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনী ও প্রাসঙ্গিক বিষয়াদির আলোচনা করা হলো।

তৃতীয় অধ্যায়
বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট

মনসা দেবীর পরিচয়

বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় ‘ মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ’ এক বিশিষ্ট সংযোজন। মনসার পদ্মবনে জন্ম ও পদ্মাবতী নামের সূত্র ধরে মনসামঙ্গল কাব্যকে ‘পদ্মাপুরাণ’ নামেও অভিহিত করা হয়। এ জন্যই বাংলায় মনসামঙ্গল ও পদ্মাপুরাণ সমার্থক রূপেই পরিচিতি লাভ করে। মনসার উৎপত্তির ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে বিষয়টি বাংলার সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত এবং এতে আদিযুগের স্মৃতি বহন করছে। আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- ‘মনসা’ শব্দটি ভারতীয় কোন অনার্য ভাষা থেকে আগত।[৩৮] তবে একটি মাত্র ঐতিহ্য থেকেই যে ‘মনসা’ নামক ধারাটি বিকাশ লাভ করেছে এমনও নয়, বরং বিভিন্ন মতাদর্শ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহী এক অভূতপূর্ব সমন্বয়ের ফল এই মনসা।

একটি বিষয়ে ধারণা থাকা দরকার তা হলো মনসা মূলত সর্প বিষয়ক দেবী, কিন্তু নিজে সর্পরূপী নয়।[৩৯] এ সর্প বিষয়ের সঙ্গে ‘নাগ’ শব্দের একটি সম্পর্ক আছে। যদিও শব্দ দুটি ভিন্ন, তথাপি এদের সম্পর্কের তাৎপর্যগত দিক হচ্ছে, উপমহাদেশের কথিত নাগ উপজাতিরাই প্রথম সর্প পূজার প্রবর্তক অথবা নাগ-টোটেম গোষ্ঠী গোড়া থেকেই সর্পপূজার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল কিংবা ভারতীয় নাগ জাতিরা সর্পকে তাদের জাতীয় অভিজ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করত।[৪০] মহাভারতেও ‘নাগ’ নামে একটি জাতির কথা পাওয়া যায়। যারা ছিল অত্যন্ত আর্য বিরোধী মনোভাবসম্পন্ন। শুধু তাই নয়, প্রায়ই তারা আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়তো। পদ্মাপুরাণের কাহিনীও মহাভারতের আদি পর্বের নাগ কাহিনীর উপরই স্থাপিত।[৪১]

এদিক থেকে নাগ, সর্প ও মনসার একটি সম্পর্ক আবিষ্কার করা সম্ভব। এর ফলে মনসার অনার্যত্বের দাবিও প্রতিষ্ঠিত হয়। সুকুমার সেনও মনসার রূপ কল্পনায় নানা দেবভাবনা ও কাহিনীর বিচিত্র উপাদানের সংমিশ্রণের কথা বলতে গিয়ে পরবৈদিক নাগ মূর্তির কথা উল্লেখ করেছেন।[৪২] আবার জৈনদেবী পদ্মাবতীকেও মনসার সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করা হয়েছে।[৪৩] কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশে মনসার আরেক নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। এ জৈন ধর্ম থেকে পদ্মাবতীর ঐতিহ্যের ধারাটি কালক্রমে এসে মনসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। বৌদ্ধ মহাযান তন্ত্র সাধনায় জাঙ্গুলী দেবীর সঙ্গে বাংলার মনসার শুধু সাদৃশ্যই নয়, মৌলিক সম্পর্কও রয়েছে। বাংলায় সেন শাসনামলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণের পর্যায়ে নির্যাতন-নিবর্তনে বৌদ্ধ আদর্শ বিলুপ্ত হবার পথে আত্মগোপন করতে আরম্ভ করলে অনেক বৌদ্ধ আচার ও সংস্কৃতি পূর্ব পরিচয় ত্যাগ করে নতুন লোকায়ত রূপে আশ্রয় গ্রহণ করে। বৌদ্ধ ইতিহাসের জাঙ্গুলীও এভাবে মনসার বিবর্তিত কিংবা একীভূত রূপ লাভ করে।[৪৪]

মনসামঙ্গল কাব্য সৃষ্টির পেছনে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের স্বাক্ষর পাওয়া যায়। সমাজে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ জনমানসের যে অংশকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছিল, প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যই লোকধর্ম তাদেরই গৌরবের সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করেছে। রক্ষণশীল ধর্মীয় আচরণ বিরোধী লোকায়ত ধারা দীর্ঘকাল থেকেই এদেশীয় জনমানসে সুপ্ত ছিল। যখনই অমানবিক রীতি-নীতি সমাজ মানসকে জগদ্দল পাথরের মতো চেপে ধরতে চেয়েছে, তখনই লোকায়ত ধর্ম, মত এবং পথকে আশ্রয় করে গণমানুষের মুক্তি-কামনা উৎসারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সমালোচক যতীন সরকার তাঁর ‘বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য’ গ্রন্থে বলেছেন-

সেন রাজশক্তি ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীকে, ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় সকল আনুষ্ঠানিকতাকে, ব্রাহ্মণদের স্মৃতি ও ন্যায়ের শাসনকে, পুরোহিতদের সকল মতলবী বিধানকে– বাংলার মানুষের মাথার উপর বিষম বোঝার মতো চাপিয়ে দেবার ব্যবস্থা করল। বাংলার লোক সমাজও বসে থাকল না। বাস্তবে যাই হোক, মানস সৃজনে সে সমাজ পিছিয়ে রইল না।

লৌকিক দেব-দেবীদের সে খাড়া করল ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর বিপরীতে, পরিণামে এই বাংলায় ব্রাহ্মণ্য দেবতা ম্লান হয়ে গেল লৌকিক দেবতার রূঢ়, ক্রুর কঠিন ও আক্রমণাত্মক উপস্থিতির সামনে। ,,, ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যধীন শ্রেণি সমাজের সংস্কৃত দেবতাদের মুখোমুখি যখন দাঁড়াতে হল আদিম সমাজের এই মানুষদের, তখন শ্রেণি সংগ্রামের প্রয়োজনেই তাদের দেবতাদের আদিম অমার্জিত জঙ্গীরূপকে আরো তীব্র করে নিতে হয়েছিল; ব্রাহ্মণ দেবতাদের সামনে চ্যালেঞ্জ হিসেবেই লৌকিক দেবতারা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল (পৃষ্ঠা- ১৭২-১৭৩)।

সুতরাং দেখা যায়, স্বাভাবিকভাবেই এ লৌকিক মতাদর্শী দেব-দেবীসমূহ ছিল আর্যবিরোধী অনার্য-চেতনাপ্রসূত। মনসার উদ্ভবও এরই প্রমাণ বহন করে। এ প্রসঙ্গে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর– 'হিন্দুদের দেব-দেবী; উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে বলেছেন- পণ্ডিত সমাজে মনসা অবৈদিক, অপৌরাণিক লৌকিক দেবতারূপে স্বীকৃত। অনার্যগোষ্ঠী সম্বন্ধে একটি ধারণা এমন প্রচলিত আছে যে, এ সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। এভাবে আর্যদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক বলে এদের ভিতরে মাতৃদেবতার প্রাধান্যও বেশি। সেন আমলে বৈদিক মতবাদীদের চরম অভ্যুত্থানে এ অনার্য লৌকিক দেবীরা প্রায় বিলুপ্তির দিকে চলে যায়, কিন্তু এদেশে মুসলিম বিজয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিপরীতে মাতৃপূজা ও ব্যক্তিসাধনাকে দাঁড় করতে সাহায্য করেছিল। এ প্রসঙ্গে শশিভূষণ দাশগুপ্ত তাঁর– 'ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন–

মুসলমান বিজয়ের পর হইতে উচ্চকোটির ধর্মমতের উপরে যখন প্রবল আঘাত দেখা দিল, তখন স্বাভাবিক ভাবেই সমাজ দেহের অন্যান্য স্তর হইতেই এ মাতৃতান্ত্রিকতার প্রবণতা প্রবল হইয়া উঠিল এবং তাহার ফলেই হয়তো বাংলাদেশে মাতৃপূজা ও শক্তি সাধনার এত প্রসার ঘটেছিল (পৃষ্ঠা-৬৮)।

আর্যতের এ সকল দেব-দেবীকে নিয়ে যে নতুন সাহিত্য গড়ে উঠেছিল, তাকে আর্য-অনার্য মতবাদের বিরোধের ফসলও বলা যায়। কারণ পূর্বে আর্য সমাজের সৃষ্ট ব্রাহ্মণ্যধর্মের কাছে নিম্নশ্রেণির পূজিত এ আর্যতের দেব-দেবীর স্বীকৃতি লাভ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় মনসার আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের কাহিনীতে ইতিহাসের এ দিকটিরও ছায়া প্রতীকার্থে পড়েছে বলে অনুভূত হয়। এছাড়া সংস্কৃত উপ-পুরাণসমূহে মহাভারতের অনুসরণে মনসা-নাগপিতা কশ্যপ কর্তৃক সৃষ্ট এবং অন্যত্র নাগরাজ বাসুকীর ভগ্নী, জরুৎকারুমুণির পত্নী বলে পরিচিত থাকলেও সমসাময়িককালে প্রচলিত শৈব-ধর্মের প্রভাবে কাব্যসমূহে মনসা শিবের কন্যা বলেও বর্ণিত হয়েছে।[৪৫] মনসার উৎপত্তি সংক্রান্ত উৎসের চিত্ররূপ দিয়ে গবেষক মোহাম্মদ হান্নান বিষয়টি খুব চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন–[৪৬]

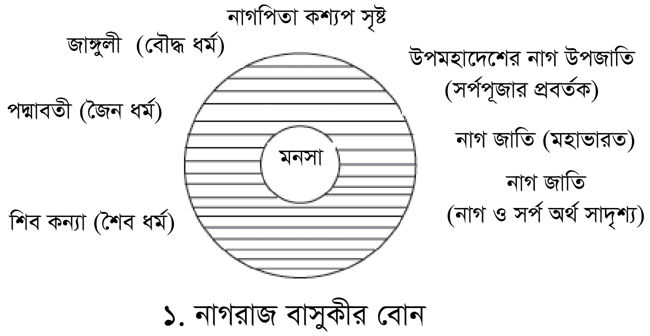

১. নাগরাজ বাসুকীর বোন

২. জরৎকারুমুণির স্ত্রী

উপর্যুক্ত পর্যালোচনার মাধ্যমে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বিভিন্ন মতাদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের (যার বেশির ভাগই মূলত অবৈদিক ও অনার্য) এক সমন্বিত রূপের ফসল হলো এ মনসা। মনসা প্রতীকে একটি ব্যাপকতর তাৎপর্য বিদ্যমান- একথা অনস্বীকার্য সত্য। একমাত্র মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনীগত

ঐক্য গড়ে ওঠেছিল সমগ্র বঙ্গদেশে, পক্ষান্তরে ধর্মমঙ্গল সীমাবদ্ধ ছিল রাঢ় এলাকায়, চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বঙ্গদেশের ভেতরের সব অঞ্চলেই প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি এবং অন্নদামঙ্গলের সীমানা দিল্লী-কাশী বিস্তৃত হলেও তা ছিল বিক্ষিপ্ত আকারে, বরং মূল কেন্দ্র ছিল বর্ধমান ও যশোর অঞ্চল। কেবল মনসামঙ্গলই এ কাজটি করতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায়- 'যে সকল উপকরণের উপর ভিত্তি করিয়া সমগ্র বাংলায় একটি অখণ্ড লোকসংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, মনসামঙ্গল তাহাদেরই অন্যতম।[৪৭]

পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, রাঢ় অঞ্চলের শত শত কবি মনসামঙ্গল রচনা করেন এবং এর রসে জনসাধারণও সতঃস্ফূর্তভাবে অবগাহন করেছিল। সমগ্র মঙ্গল সাহিত্যে এ এক পরম বিস্ময়। স্বাভাবিক ভাবে মনে হতে পারে, নদীমাতৃক বঙ্গদেশের সর্পসঙ্কুল পরিবেশের কারণে বাঙালি কবিগণ ভয়ে-ভক্তিতে মনসার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন। কিন্তু আসল কারণ তার চেয়েও গভীরতর। মনসামঙ্গলের কাহিনীর বৈশিষ্ট্যই তাদেরকে স্বতঃপ্রবৃত্ত করেছে এ পথে। চাঁদ সওদাগারের সংসারের শত দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও চারিত্রিক দৃঢ়তা, সতী বেহুলার বেদনা-বিধূর রূপ বাঙালির অন্তরের অন্তরতম প্রদেশকে তীব্রভাবে আন্দোলিত করেছে। এর মাঝেই বাঙালি তাদের স্বতন্ত্র, নিজস্ব, একান্ত কাছের রামায়ণকে খুঁজে পেয়েছে।[৪৮] পরিপূর্ণ জীবনরসের দিশারী মনসামঙ্গলকাব্য বাংলার প্রকৃতির রূপ-রস-রঙ-রেখার সঙ্গে গভীরভাবে মিশে আছে। এ চিত্রটি রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতায় বানীমূর্তি লাভ করেছে-

মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল- তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ
দেখেছিল : বেহুলাও একদিন গাঙুরের জলে ভেলা নিয়ে
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়
সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বটে দেখেছিল হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিল- একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিল পায়।[৪৯]

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্য নানাভাবে মনসামঙ্গলের কাহিনী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।[৫০] এ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে গবেষকগণ দুটি কারণ চিহ্নিত করেছেন- ১. গঠনশৈলীর সংহত ও সংঘাতকেন্দ্রিক কাহিনী ঐক্য ও ২. চরিত্র নির্মাণের অভিনব ঐশ্বর্য।[৫১]

মনসামঙ্গলের কাহিনীর জনপ্রিয়তার দিক থেকে কেবল বঙ্গদেশে নয়, বরং আসাম, বিহার ও উড়িষ্যায় অর্থাৎ বৃহৎ বঙ্গেও বিস্তার লাভ করে। চৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পূর্বেই সুসংহত হয়ে ওঠা কাহিনী (যা অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে গড়ে ওঠেনি) নিয়ে রচিত মনসামঙ্গল ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সুদীর্ঘ ছ'শ বছর ব্যাপী শত-সহস্র কবি-গায়কের কল্যাণে ব্যাপক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে সদম্ভে পদাচরণা করতে থাকে।[৫২] এ জন্যই অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে- 'ধর্মমঙ্গল নহে, মনসামঙ্গল কাব্যকেই মধ্যযুগীয় বাংলার জাতীয় কাব্য বলা যাইতে পারে।'[৫৩] আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন- 'মনসামঙ্গল হচ্ছে বাংলাদেশের রামায়ণ।'[৫৪] এছাড়া ড. সাঈদ-উর রহমান সঙ্গত কারণেই মনসামঙ্গলকে- 'বাঙালির জাতীয় কাব্য'[৫৫] বলে অভিহিত করেছেন।

এ মনসামঙ্গল রচয়িতা যে সমস্ত কবির নাম বর্তমানে পাওয়া যায়, কালের গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া কবিদের সংখ্যার তুলোনায় প্রাপ্ত পুঁথি কাব্যের পরিমাণ আরো কম। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর বিখ্যাত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে নিম্নোক্ত ৬২ জন মনসামঙ্গল কবির নাম উল্লেখ করেছেন–

১. কানা হরিদত্ত ২. নারায়ণ দেব ৩. বিজয় গুপ্ত ৪. রঘুনাথ ৫. যদুনাথ পণ্ডিত ৬. বলরাম দাস ৭. জগন্নাথ সেন ৮. বংশীধর ৯. দ্বিজ বংশীদাস, ১০. বল্লভ ঘোষ ১১. বিপ্রহৃদয় ১২. গোবিন্দ দাস ১৩. গোপী চন্দ্র ১৪. বিপ্র জানকীনাথ ১৫. দ্বিজ বলরাম ১৬. কেতকাদাস ১৭. ক্ষেমানন্দ ১৮. অনুপমচন্দ্র ১৯. রাধাকৃষ্ণ ২০ হরিদাস ২১. কমলনয়ন ২২. সীতাপতি ২৩. রামনিধি ২৪. কবিচন্দ্র পতি ২৫. গোলক চন্দ্র ২৬. কবি কর্ণপুর ২৭. জানকীনাথ দাস ২৮. বর্দ্ধমান দাস ২৯. ষষ্ঠীবর সেন ৩০. গঙ্গাদাস সেন ৩১. রাম বিনোদ ৩২. আদিত্য দাস ৩৩. কমললোচন ৩৪. কৃষ্ণানন্দ ৩৫. পণ্ডিত গঙ্গাদাস ৩৬. গুণানন্দ সেন ৩৭. জগদ্বল্লভ ৩৮. বিপ্র জগন্নাথ ৩৯. জগমোহন মিত্র ৪০. জয়দেব দাস ৪১. দ্বিজ জয়রাম ৪২. নন্দলাল ৪৩. বাণেশ্বর ৪৪. মধুসূদন দেব ৪৫. বিপ্র রতিদেব ৪৬. রতিদেব সেন ৪৭. রামকান্ত ৪৮. দ্বিজ রসিকচন্দ্র ৪৯. রাজা রাজ সিংহ ৫০. রাম চন্দ্র ৫১. রামজীবন বিদ্যাভূষণ ৫২. বিপ্র রামদাস ৫৩. রামদাস সেন ৫৪. দ্বিজ বনমালী ৫৫. বনমালী দাস ৫৬. বিপ্রদাস ৫৭. বিশ্বেশর ৫৮. বিষ্ণু পাল ৫৯. সুকবি দাস ৬০. সুখদাস ৬১. সুদাম দাস ৬২. দ্বিজ হরিরাম।

এছাড়া কেতকা দাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল কাব্য সম্পাদনায় যতীন্দ্র মোহন ভট্টাচার্য গ্রন্থের ভূমিকায় ১৪৮ জন মনসামঙ্গলের কবির নাম উল্লেখ করেছেন। এ সমস্ত কবিদের মধ্যে অনেক গায়েনের নামও থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রায় ৬ শত বছর যাবৎ শত শত কবি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করলেও প্রকাশ ভঙ্গিতে বৈচিত্র্য এসেছে অনিবার্যভাবে। কাহিনীর দিক থেকে পর্যালোচনা করলে এ কাব্যের সাধারণত তিনটি ধারা পরিলক্ষিত হয়–[৫৬]

১. **রাঢ়ের ধারা-** এ ধারার কবিদের মধ্যে আছেন- বিপ্রদাস, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, বিষ্ণুপাল, সীতারাম দাস, রসিক মিশ্র, বাণেশ্বর রায় ও দ্বারিকা দাস প্রমুখ।

২. **পূর্ববঙ্গের ধারা-** বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব, দ্বিজ বংশীদাস, শ্রীরায় বিনোদ, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ। এ ধারার কাব্য সমূহকে প্রায়ই ‘পদ্মাপুরাণ’ নামে অভিহিত করা হয়েছে।

৩. **উত্তরবঙ্গ ও কামরূপের ধারা-** তন্ত্রবিভূতি, জগজ্জীবন ঘোষাল, জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, নারায়ণ দেব, মনকর ও দুর্গাবর প্রমুখ এ ধারার কবি।

উল্লিখিত এসব কবিদের মাঝে কানা হরিদত্ত ও বিজয়গুপ্ত বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। মনসামঙ্গলের আদি কবি হিসেবে কানা হরিদত্ত ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছেন। বিজয়গুপ্তের কাব্য ভণিতায় তাঁর সম্পর্কে কিছু তথ্য জানা যায়। ধারণা করা হয়, তিনি মুসলমানদের বঙ্গবিজয়ের (১২০৪খ্রি.) অব্যবহিত পূর্বে তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন। সম্ভবত তিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বা চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সময়কালকে একাদশ বা দ্বাদশ শতকের শুরু বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৭] আদি কবি হিসেবে কাব্য রচনায় কিছু সীমাবদ্ধতা নিশ্চয়ই ছিল। তারপরও তাঁর কবিত্ব, পাণ্ডিত্য ও রসরুচির বদৌলতে তিনি কালের গ্রাস থেকে রক্ষা পেয়ে আজো টিকে আছেন- এটাই কৃতিত্বের বিষয়। তাঁর সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য চমৎকার ভাবে বলেছেন- ‘মনসামঙ্গল বাঙালীর রামায়ণ’। বেহুলা ইহার সীতা, চাঁদ-সদাগর ইহার রাবণ, সে জন্যই ইহা বাঙালীর জাতীয় কাব্য। অতএব বাঙালীর জাতীয় কাব্যের যিনি আদি কবি কেবল ইতিহাসের মধ্যেই তাঁহার স্থান নহে, সমগ্র জাতির হৃদয়পদ্মের উপর তাঁহার অধিষ্ঠান- তাহা লক্ষ্যগোচর নহে বলিয়া উপেক্ষনীয়ও নহে।” (বাইশ কবির মনসামঙ্গল; পৃ-১) বর্তমান গবেষণার মূল বিষয়বস্তু হিসেবে বিজয় গুপ্তের জীবনকাল সম্পর্কে আলোচনা করা হল।

বিজয় গুপ্ত

পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যের অন্যতম প্রধান কবি বিজয়গুপ্ত। কবির জন্ম ও জীবনকাল সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায়নি। মধ্যযুগের অপরাপর কবির মতো তাঁর ক্ষেত্রেও কাব্যের ভণিতার ওপর নির্ভর করতে হয়। মনসামঙ্গল কাব্যের ‘মনসার জন্মপালা’ নামক অধ্যায়ে তিনি বলেছেন–

'ঋতু [শ] শী বেদ শশী পরিমিত শক।
সুলতান হুসেন রাজা পৃথিবী পালক ॥
সমরে দুর্জ্জয়ে রাজা বিপক্ষের যম।
দানে কল্পতরু রাজা রূপে কামসম ॥
যাহার পালনে প্রজা সুখে ভুঞ্জে [অ]ধিক।
মুলকি ফতোয়াবাদ বঙ্গিরোরা [তম] সিক ॥
পশ্চিমে গর্গর নদী পূর্বে ঘণ্টস্বর।
মধ্যে ফুলশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর ॥
বৈদ্য জাতি বৈসে তথা লেখনে চতুর।
একাদশীর ব্রত করে পুজয়ে ঠাকুর ॥
স্থানগুণে জেই বৈসে সেই জ্ঞানময়ে।
হেন ফুলশ্রী গ্রামে বাস করেন বিজয়ে ॥'

[পদ্মাপুরাণ : মনসার জন্মপালা, পৃ-৮-৯]

বিজয়গুপ্তের আত্মপরিচয়মূলক উপর্যুক্ত ভণিতা সূত্রে জানা যায়- তিনি ছিলেন বর্তমান বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী (আধুনিক গৈলা) গ্রামের অধিবাসী। তিনি জাতিতে বৈদ্য। পিতার নাম সনাতন এবং মাতার নাম রুক্মিণী দেবী। এ রুক্মিণী দেবীর পিতা হেরম্ব দাশগুপ্ত ছিলেন ফরিদপুর জেলার বুলিয়া গ্রামের অধিবাসী। হেরম্বদাস তাঁর দুই পুত্র– ত্রিলোচন, রাঘবেন্দ্র ও কন্যা রুক্মিণীর জন্মের পূর্বেই পিতৃভূমি ছেড়ে বরিশালের গৈলা গ্রামে এসে বসতি স্থাপন করেন এবং ফুল্লশ্রী গ্রামের সনাতন গুপ্তের সঙ্গে রুক্মিণীর বিয়ে দেন।

কবির জন্মভূমি (মুলুক) ফতোয়াবাদের অন্তর্ভুক্ত। কবি আলাওলের 'পদ্মাবতী' গ্রন্থ সূত্রে আমরা জানি যে, সতেরো শতকে ফরিদপুর ছিল এ মুলুক ফতেহাবাদের শাসনকেন্দ্র। এ পরগণার পশ্চিমে সাগর নদী, পূর্বে ঘণ্টেশ্বর, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং উত্তরে বঙ্গিরোরা তমসিক (প্রশাসনিক উপবিভাগ) অবধি বিস্তৃত।[৫৯] এই সাগর নদীটি বর্তমানে ফরিদপুর জেলার অধীন কোটালীপাড়া গ্রামের পশ্চিম-দক্ষিণ সীমান্তে স্বল্পকায়া স্রোতস্বিনীর আকারে বর্তমান আছে। কোটালীপাড়া ফুল্লশ্রী হতে প্রায় ১২ মাইল পশ্চিমে ঘণ্টেশ্বর অধুনা গৌরনদী থানার পূর্ব দিকে ভিন্ন নামে পরিচিত। বিজয়গুপ্তের জন্মভূমি ফুল্লশ্রী গ্রামের পরিসর পূর্বে প্রায় সাড়ে চার মাইল ছিল। ইদানীং এ গ্রাম গৈলা গ্রামের অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীস্থানীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিজয়গুপ্তের বাসভূমি ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবীর মন্দির ও দীঘি অদ্যাপি ফুল্লশ্রী গ্রামে বর্তমান আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবী জাগ্রত দেবতারূপে স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দের নিকট এখনোও বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে।[৬০]

ফুল্লশ্রী গ্রামে চতুর্বেদী ব্রাহ্মণ, চিকিৎসাশাস্ত্রকুল বৈদ্য, লিখনপটু কায়স্থ এবং অন্যান্য বৃত্তিজীবী মানুষের বাস। এ গ্রামের পশ্চিমে সাগর নদী ও পূর্বে ঘণ্টেশ্বর নদী অনেকটা বিলের রূপধারণ করে এখনো বর্তমান আছে। কবির বসত-ভিটায় তাঁর স্থাপিত মনসামন্দির ও মনসা প্রতিমার কারণে তা এখন মনসা বাড়ি নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। এখানে প্রতিবছর শ্রাবণ মাসে মাসব্যাপী মেলা হয়। এ মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে আগত ভক্তবৃন্দ মনসা গান, রয়ানী শুনে ভাবাবেগে আপ্লুত হয়। কবির কাব্যে সমকালীন গৌড় সুলতানের নাম আছে এবং সে সঙ্গে রচনাকালও–

১. ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক। [১৪১৬ শকাব্দ = ১৪৯৪-৯৫ খ্রি.]
সুলতান হুসেন রাজা পৃথিবী পালক ॥

কোন কোন পুথিতে এর পাঠান্তর মেলে, তা নিম্নরূপ–

২. ঋতু শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। [১৪০৬ শকাব্দ = ১৪৮৪-৮৫খ্রি.]

সুলতান হুসেন শাহ নৃপতি তিলক ৷৷

৩. ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক। [১৪০০ শকাব্দ = ১৪৭৮ খ্রি.)

সুলতান হুসেন শা নৃপতি তিলক ৷৷

দ্বিতীয় পাঠ বেশি পাওয়া গেলেও পণ্ডিতদের আগ্রহ প্রথমটির দিকে। কারণ- এর মাধ্যমে সুলতান হুসেন শাহের শাসনামলের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রি.) নাগাল পাওয়া যায়। তার তৃতীয় পাঠটি হয়তো কোন চতুর লিপিকর উদ্দেশ্যে প্রণোদিতভাবে 'ঋতুর' স্থলে 'ছায়া' বসিয়ে দিয়েছেন পাণ্ডিত্য জাহির করতে। তবে যদি দ্বিতীয় পাঠের ১৪৮৪-৮৫খ্রি. বিজয়গুপ্তের কাব্য রচনার শুরুকাল ধরে এবং প্রথম পাঠকে অর্থাৎ ১৪৯৪-৯৫ খ্রিষ্টাব্দকে রচনার শেষ বিবেচনা করলে এর গ্রহণযোগ্য সমাধান মেলে। যদিও ড. আহমদ শরীফ জালাল উদ্দিন ফতেহ শাহকে (১৪৮৪-৮৭খ্রি.) বিজয়গুপ্তের সমকালীন হুসেন শাহ বলে অভিহিত করেছেন।[৬১]

তারপরও এ সিদ্ধান্তে পৌছাতে অসুবিধা হয় না- বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতকের শেষার্ধ ও ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে বর্তমান ছিলেন। বরিশাল থেকে ১৩০৩ বঙ্গাব্দে সর্ব প্রথম বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণ ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হয়। এর ভাষা বিশেষ প্রাচীন নয় এবং বিজয়গুপ্তের ভণিতার সঙ্গে আরো অনেকের ভণিতা মিশে গেছে। বিজয় গুপ্তের কবিকৃতীর ক্ষেত্রে অনেকে একবাক্যে প্রশংসাসূচক শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কাব্য লক্ষণের মাপকাঠিতে তাঁর কাব্যেও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শিবের হাস্যরস ভাঁড়ামি ধূলিধূসর মঙ্গলকাবের ধাচেই গড়ে ওঠেছে, চাঁদ সওদাগরের প্রচণ্ড পৌরষ স্থূল রসের কারণে এর মহিমা ক্ষুণ্ন হয়েছে। মনসার চরিত্রটির ঈর্ষাকুটিল দিকটিই উন্মোচিত হয়েছে, তবে বেহুলার চরিত্রাঙ্কণে কবি সমস্ত মাধুর্য ও পবিত্রতা ঢেলে দিয়েছেন। তাই বিজয়গুপ্ত সম্পর্কে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন- স্থূল রঙ্গরসে বৈদ্যকবির বিশেষ কৃতিত্ব ছিল, তা স্বীকার করতেই হবে। সে যাই হোক, কাব্যটি যতটা জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছে, ততটা কাব্যগুণের অধিকারী নয়।[৬২]

বিজয়গুপ্তের কাব্যে যেমন ব্যঙ্গের প্রাবল্য ছিল, তেমনি তিনি মনে ও মেজাজে ছিলেন হাস্য-রসিক। সেকালের রসিকতা ও বর্তমানকালে ভাঁড়ামি বলে প্রচলিত হলেও বিজয়গুপ্ত যে ভাঁড় ছিলেন না– একথা নিশ্চিৎ। বরং হাস্যরস ও ব্যঙ্গকে তিনি জীবনের জ্বালা-যন্ত্রণা, ব্যর্থতা-বেদনার ক্ষতকে ক্ষণিকের জন্য হলেও ভুলে থাকার প্রতিষেধকে রূপদান করেছেন। এতে করে ব্যথিত-বঞ্চিত-অসহায় মানব খুঁজে পেয়েছে দুদণ্ড সান্ত্বনার অবলম্বন। বাঙালি জাতীয় চরিত্র ও স্বভাব এতে ধরা পড়েছে গভীরভাবে। বিজয়গুপ্ত সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন- 'বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ বঙ্গদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক এবং ধর্ম তথ্যের খনি। ইহার ভাষা প্রাচীন ও কতকটা অমার্জ্জিত হইলেও এই কাব্যের পত্রে পত্রে পল্লী প্রাণের করুণ সাড়া পাওয়া যায়। পূর্ব বঙ্গের বিশেষ বরিশাল, নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে ঘরে ঘরে এই পুস্তক পঠিত হইয়া থাকে। বেহুলার অমানুষী কষ্ট সহিষ্ণুতার মর্ম্মভেদী কাহিনী পল্লীবাসিনীগণের প্রাণ নিরবধি কাঁদিয়া ওঠে এবং তাঁহাদের হৃদয়ে বেহুলা সতীর মূর্ত্তি উজ্জ্বল মহিমায় চিরকালের জন্য অঙ্কিত হইয়া যায়। পাঁচশত বৎসর যাবৎ বিজয়গুপ্ত বাঙ্গালীর চিত্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত আছেন। ইহা সামান্য গৌরবের কথা নহে। তাঁহার রচনা মেকী কিছুই ছিল না। খাঁটি বাঙ্গালী প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তিনি মিটাইতে পারিয়াছিলেন, এই জন্যই তিনি এত আদর পাইয়াছেন।[৬৩] বিজয়গুপ্তের এ কৃবিকৃতীর স্বীকৃতি স্বরূপ বাংলার সুলতান হুসেন শাহ তাঁকে 'ছোট বিদ্যাপতি'[৬৪] উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন।

এছাড়া বিজয়গুপ্তের কাব্যে নৈতিকতা-রস-রুচির যে সংযমবোধ রয়েছে, তা অপরাপর কবিদের তুলোনায় প্রশংসনীয়। তিনিই প্রথম বাংলা কাব্যের পয়ার ও লাচারী ছন্দের পাশাপাশি স্বরবৃত্ত ও একাবলী ছন্দের প্রয়োগ শুরু করেন। আর করুণ রসের চিত্র অঙ্কনে তিনি ছিলেন সমকালে অদ্বিতীয়-অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কারণ দৈবের হাতে মানুষের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরাজয়, তৎকালের জনসমাজে সমাদর ও সহানুভূতি লাভ করায় বিজয়গুপ্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হন। আদর্শ বাঙ্গালি নারীর সতী-সাধ্বী, সংসার-সন্তান ও স্বামীর মঙ্গল কামনার চিত্র অঙ্কনে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাই দেখা যায়- 'বেহুলার মাজুষ যাত্রার প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত রূপকচ্ছলে কবি বিজয়গুপ্ত মনুষ্যজীবনের সাধনা পথের পরীক্ষাগুলি অতি নিপূণভাবে অঙ্কিত করিয়া দেখিয়াছেন। ,,, দুস্তর সাধন সমুদ্র পার হওয়ার পথে প্রত্যেক সাধককেই এরূপ বহু পরীক্ষা পার হইয়া সাধ্যবস্তুর সম্মুখীন হওয়ার অধিকার লাভ করিতে হয়। কোথাও কোথাও মানুষের দুর্দশায় বেহুলার দরদী মন জগতের কল্যাণ কামনায় উছলিয়া উঠিতে দেখা যায় মাত্র। কিন্তু অন্তররাজ্যে স্থির যোগাসনে অধিষ্ঠিতা বেহুলা সতীর ধ্যানে শান্তিতে পরিপূর্ণ মনের চিত্রটি কবি বিজয়গুপ্ত যেমনটি আঁকিয়াছেন, অন্য কোন কবির হস্তে সেরূপটি হয় নাই।[৬৫]

এ জন্যই স্যার যদুনাথ সরকার তাঁর 'হিস্ট্রি অব বেঙ্গল' গ্রন্থে বলেছেন- His literary appreciation was not confined to Arabic and persian only, but was extended in an increasing degree to the vernacular literature. ,,, Bejoy Gupta (Chotto Vidyapati) and Jasoraj Khan mentioned his name with gratitude.[৬৬]

সুতরাং বলা যায়, বিজয়গুপ্ত তাঁর প্রতিভার জাদুকরী স্পর্শে, বাঙালির মাটি সংলগ্ন দরদী মনের আশ্রয়ে মনসামঙ্গল কাব্যকে জনপ্রিয়তার শীর্ষে পৌছে দেন। বাঙালী তার জীবন-জিজ্ঞাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এ কাব্যের ভেতরে খুঁজে পেয়েছিল বিধায় তা সমকালে জাতীয় কাব্যের মর্যাদা লাভ করে।

মনসামঙ্গলের কাহিনী

বিজয়গুপ্ত রচিত 'পদ্মাপুরাণ' বা 'মনসামঙ্গল' কাব্য বন্দনাসহ মোট পঁচিশটি পালা বা অধ্যায়ে বিভক্ত। সমগ্র কাব্যের কাহিনী বা বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটকে দুটি প্রধান অংশে বিভাজন করা যায়, যথা–

১. দেবখণ্ড ও

২. মর্ত্যখণ্ড।

দেবখণ্ড অংশে দেবী মনসার জন্ম, সামাজিক স্বীকৃতি, সৎ মা কর্তৃক লাঞ্ছনা, স্বামীর গঞ্জনা- পরিত্যাগ, নির্বাসন সর্বোপরি পূজা প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলোনায় এ মনসামঙ্গলের দেবখণ্ডের কার্যক্রম অধিক পরিমাণে বিস্তৃত, সরব ও সক্রিয়। সমগ্র ঘটনার অনুঘটক হিসেবে দেবখণ্ডের দেব-দেবীগণ ব্যতিব্যস্ত থেকেছেন।

মর্ত্যখণ্ডে প্রাধান্য পেয়েছে দুটি কাহিনী, যথা- চাঁদ-সনকা ও বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী। মনসার বিরুদ্ধে চাঁদ সওদাগরের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-প্রতিরক্ষার বিক্রম এবং স্বামীসোহাগী বেহুলার সাধনায় প্রত্যয় ও প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটেছে এ দুটি কাহিনীতে। এ বিষয়বস্তুই মনসামঙ্গল কাব্যের মূল প্রাণ ও গৌরবের দীপ শিখায় উন্নীত।

যথারীতি দেব বন্দনার মাধ্যমে বিজয়গুপ্ত মনসামঙ্গল কাব্য রচনা শুরু করেছেন। প্রথমেই আসে মনসার জন্মবৃত্তান্ত পালা। শিবের কৈলাসে গিয়ে হাজির হন নারদ মুণি। শিব ও নারদের কথোপকথনের সূত্র ধরেই বেড়িয়ে আসে কাশী-বারণাসীর পার্শ্ববর্তী সরযূ নদীর দক্ষিণাংশের পুষ্পবনের কথা। যেখানে দেবী চণ্ডী প্রতিরাতে তার সহযোগী ডাকিনী-যোগিনীদের নিয়ে নৃত্য-গীত করেন। একথা শুনে শিব পরের দিন সেখানে যাবার কথা নারদকে বলেন।

সঙ্গে নারদকে এ কথাও বললেন- এ চুপিসারে যাবার বিষয়টি যেন গোপন থাকে। কিন্তু নারদ মুণি শিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সোজা চণ্ডীর কাছে গিয়ে হাজির হন এবং স্বামী শিবের মতলবের কথা ফাঁস করে দেন। এর সুরক্ষা হিসেবে দেবী চণ্ডী আঁচল দিয়ে স্বামী শিবের কাপড় বেঁধে তার বামপাশে ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু শিব চুপিসারে স্ত্রী চণ্ডীকে ফাঁকি দিয়ে অনুচর নন্দীর মাধ্যমে বলদ সাজিয়ে দ্রুত সরযূ নদীর তীরে পৌছে গেলেন। জালুয়া ডোমের মেয়ে গৌরী শিবকে খেয়া পাড় করে দেয়। পুষ্পবনের সৌন্দর্য দেখে শিব মাতোয়ারা হয়ে যান। পুষ্পবনে ভ্রমর ও পাখিদের মধুপান ও মিলন দেখে শিব নিজেও কামক্রিড়ায় অস্থির হয়ে পড়েন। এতে শিবের বীর্যপাত (রেতঃপাত) ঘটে এবং তা রাখেন এক পদ্মপাতায়।

এ বীর্য জল মনে করে এক পাখি খেয়ে ফেলে এবং পরে উগরে ফেলে পদ্মবনে। পদ্মের মৃণাল বেয়ে তা নেমে যায় পাতালে। এ পাতালেই শিবের ঔরসে (মতান্তরে মানসজাত) জন্ম নেয় কন্যা মনসা। পদ্মবনে জন্ম বলে মনসার আরেক নাম হয় পদ্মা বা পদ্মাবতী।

পদ্মবনে যুবতী মনসাকে দেখে মদনবাণে আক্রান্ত হন শিব। নিরুপায় মনসা নিজের জন্ম ইতিহাস পিতা শিবের কাছে বর্ণনা করে রেহাই পান এবং শিবও লজ্জিত হন। কিন্তু মনসাকে প্রকাশ্যে বাড়িতে নিতে সাহস পান না। কারণ স্ত্রী চণ্ডী মনসাকে কোন ভাবেই মেনে নিবেন না। এদিকে স্বামীকে ধরতে চণ্ডী সিংহের উপর চড়ে সরযূর খেয়াঘাটে এসে উপনীত হন। ঘাটের ডোমনী পাটুনীর সঙ্গে সখী সম্বন্ধ পেতে ও যুক্তি করে চণ্ডী পাটুনীর ছদ্মবেশ ধরেন। ডোমনী ছদ্মবেশী চণ্ডীকে দেখে শিব কামার্ত হয়ে আলিঙ্গন প্রার্থনা করেন। কিন্তু চণ্ডীর আসল রূপ দেখে শিব ভীষণ লজ্জা পান এবং চণ্ডী স্বামীকে ভর্ৎসনা করে বাড়ি চলে যান।

স্ত্রী চণ্ডীর ভয়ে শিব মনসাকে ফুলের ঝুড়ির মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। চালের উপর ফুলের ঝুড়ি রেখে শিব যান জাহ্নবীর ঘাটে স্নান করতে। কিন্তু সন্দেহের বশে চণ্ডী ফুলের ঝুড়ির ঢাকনা খুললে দেখতে পান ষোড়শী যুবতী মনসাকে। চণ্ডীর সন্দেহ বাস্তব রূপ নিলে তিনি মনসাকে নিজের সপত্নী ভেবে বেদম প্রহার করতে শুরু করেন। অসহায় মনসা বার বার অনুরোধ করে, নিজের পরিচয় প্রদান করলেও চণ্ডীর আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। বরং তাদের কোলাহল ও আর্ত-চিৎকারে গঙ্গা, জয়-বিজয়া, সুচরিতা ও সুমিত্রা ছুটে চলে আসে। এদেরকে দেখে চণ্ডী ক্রুদ্ধ হয়ে মনসাকে আঘাতে আঘাতে জর্জড়িত করেন এবং মনসার বাম চোখ বিনষ্ট করে দেন।

এতে করে মনসার বাম চোখ কানা হয়ে যায়। এ অত্যাচার ও অপমান সইতে না পেরে মনসা তার বিষবৃষ্টি দিয়ে চণ্ডীকে মূর্ছাহত করে ফেলেন। বাড়ি ফিরে শিব স্ত্রী চণ্ডীকে দেখে আর্তনাদ শুরু করেন। পরে নারদের পরামর্শে ও পিতা শিবের অনুরোধে মনসা চণ্ডীকে বাঁচিয়ে তোলেন। এতে উপস্থিত সকলে জোকার বা উলুধ্বনি দেয়। কিন্তু এরপরও পিতার বাড়িতে মনসার স্থান মেলেনি। মায়ে-ঝিয়ের ঝগড়া-মারামারি দূর করতে নারদই ঘটকের দায়িত্ব নেন। মনসার বর হিসেবে চাল-চুলোহীন জরৎকারু মুণিকেই নির্বাচন করেন ঘটক নারদ। বিশ্বকর্মা ও কুবেরের সহায়তায় শিব কন্যা মনসার বিয়ের আয়োজন করেন। যথারীতি শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের মধ্য দিয়েই মনসা-জরৎকারুর বিয়ে সম্পন্ন হয়। কিন্তু বাসররাতেই দেখা দেয় গোলযোগ। কারণ সে রাতেই জরৎকারু মনসাকে পূজার তিল, তুলসী ও কুশা আনতে আদেশ করেন। কিন্তু শিব কন্যা পিতার গৌরবে তা প্রত্যাখ্যান করলে জরুৎকারু স্ত্রীকে পিতার নাম ধরে গালি দেন। এতে ক্রোধান্বিত মনসার রক্তচক্ষু দেখে জরৎকারু অচেতন হয়ে পড়েন। সবার অনুরোধে স্বামীকে জীবিত করলে জরৎকারু তাকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে চলে যান। অবশ্য চলে যাবার পূর্বে মনসাকে আস্তিক ও অষ্টনাগ জন্মের সন্তান বর দিয়ে যান। এতে করে বিয়ের দিনেই মূলত মনসা বিধবায় পরিণত হন। অর্থাৎ বিয়ের শুভরাত তার জীবনের কালরাত হয়ে দেখা দেয়।

মনসার গর্ভে জন্ম হয়- আস্তিক ও অষ্টনাগের। মনসার বুকের দুধ শুকিয়ে গেলে শিব গোমতী নদীকে ক্ষীরে ভর্তি করে দেন। শিব সুরভীকে দিয়ে আনেন গাভী। ক্ষীরনদীতে বিষ মিশে গেলে শিব এ বিষ পান করেন এবং অচেতন হয়ে যান। ব্রহ্মার আদেশে শিবকে জীবিত করে তোলেন মনসা। আবার অন্যদিকে দুর্বাশার শাপে ইন্দ্র লক্ষ্মীহারা হওয়ায় লক্ষ্মীর সঙ্গে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য ক্ষীরোদ সাগরে আশ্রয় নিলে সমুদ্র মন্থন করতে উদ্যোগ নেন দেবতাগণ। মন্দার পর্বত ও বাসুকির সাহায্যে মন্থনের কাজ শেষ হলে উঠে আসে লক্ষ্মীসহ চণ্ডী ও ঐরাবত। সবশেষে অমৃত হাতে করে আর্বিভূত হন ধন্বন্তরি। কিন্তু বিষ্ণু মোহিনীরূপ ধরে প্রতারণার মাধ্যমে অসুরদের বঞ্চিত করে সমস্ত অমৃত দেবতাদের দিলে অসন্তুষ্ট হন শিব। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেবতারা শিবের মতামত মেনে নেন। কিন্তু দেবতাদের কপটতায় শিব ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর কোপানলে সমুদ্র বিষমিশ্রিত হয়ে পড়ে। অসুর ও বাসুকি পালিয়ে গেলে হনুমানের অনুরোধে বিষ পান করে শিব অচেতন হয়ে পড়েন। এতে করে দেব সমাজে হাহাকার ওঠে। নারদের কাছে খবর পেয়ে মনসা বিষমন্ত্র উচ্চারণ করে শিবকে পুনরায় জীবিত করেন। ফলে মনসার জয়ধ্বনি করেন দেবতারা। শিবের অচেতন অবস্থায় চণ্ডী সহমরণের জন্য চিতায় শয়ন করলে মনসা ইচ্ছে করেই শিবের পরিবর্তে চণ্ডীর মুখে আগুন দেন এবং চণ্ডী জলে ঝাঁপ দিয়ে রক্ষা পান।

সে যাত্রায় শিবকে বাঁচিয়ে তুললেও চণ্ডী মনসাকে আর বাড়ির সীমানায় ঘেষতে দেননি। চণ্ডীর কারণেই শিব মনসাকে নৌকস পর্বতে নির্বাসন দিতে বাধ্য হন। নির্বাসনের কথা শোনে মনসা কাঁদতে থাকেন। অসহায় মেয়েকে দেখভাল করতে শিব তার জটার জলে (মতান্তরে শরীরের ঘাম থেকে) উদ্ভূত কন্যা নেতাকে রেখে যান। শিব বিশ্বকর্মাকে দিয়ে সিজুয়া পর্বতে মনসার জন্য পুরী নির্মাণ করে দেন। জয়ন্তী নগরীর পুরী নির্মাণ সম্পন্ন হলে সেখানকার শাসনকর্ত্রী হলেন মনসা এবং তার প্রধান সহকারী উপদেষ্টা হলেন নেতা।

এবার মনসা আপন প্রভাব, প্রতিপত্তি, পূজা ও মাহাত্ম্য প্রচারে মনোযোগী হলেন। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে মনসামঙ্গলের পালা শুরু। শিবের কাছে মনসা তার মর্ত্যে পূজা প্রচারের ব্যাপারে অনুযোগ করলে বিশ্বকর্মাকে দিয়ে একটি ‘দিব্যঘট’ তৈরি করে দেয়া হয়। মনসা বাম হাতে কমণ্ডুল ও ডান হাতে কুশা নিয়ে এবং মাথায় ঘট নিয়ে যতিরূপী ছদ্মবেশে রাখালদের কাছে যান। তাদের কাছে গরুর দুধ চাইলে, তারা মনসাকে অপমান করে। মনসাও মায়াবলে সমস্ত গরু গ্রাস করলে, বাধ্য হয়ে রাখালগণ মনসার পূজা করে। রাখাল ভক্তদের উপর অত্যাচার করায় তকাই মোল্লা, কাজির দুইপুত্র হাসান-হুসেনসহ কাজীহাটী ও জোলাহাটীর লোকদের মনসা শায়েস্তা করেন এবং এদের পূজা আদায় করে নেন।

শিবভক্ত শৈব চাঁদ সওদাগর মনসার বড় ধরনের হুমকি হয়ে দাঁড়ান। কারণ এ চাঁদ সওদাগরই একদিন স্বর্গের নন্দনকাননে শিব পূজার জন্য ফুল তুলতে গেলে সেখানে মনসাকে নাগাবরণ ভূষিতা হয়ে থাকতে দেখেন। কিন্তু চাঁদের ভয়ে সমস্ত নাগগণ পালিয়ে গেলে মনসা নিরাবরণ হয়ে যান। এতে অপ্রস্তুত হয়ে অপমানিতা মনসা চাঁদকে বণিক গোত্রে জন্ম গ্রহণ করে পৃথিবী চলে যাবার অভিশাপ দেন। চাঁদও ছাড়বার পাত্র নয়। তিনি মনসাকে নানাভাবে কটাক্ষ করেন এবং বলেন- ‘আমি পূজা না দিলে তোমার পূজা সম্পন্ন হবে না এবং তোমার পূজা আমি হতে দেব না।’ এমন চ্যালেঞ্জকে গ্রহণ করেই চাঁদ সওদাগর চম্পকনগরে কশ্যপগোত্রের বণিক বংশে নীলাম্বর সাধুর দৌহিত্র ও জীব সাধুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। চাঁদের স্ত্রী সনকা, যে শৈশবকাল থেকেই মনসাভক্ত। মনসার বরেই সনকা ছয় পুত্রের জননী হন। কিন্তু চাঁদ এ ছয় পুত্রকে শিবের দান বলে প্রচার করেন। সনকার মনসা পূজার কথা অনুচর ধনার মাধ্যমে জানতে পেরে চাঁদ হেতালের লাঠি দিয়ে পূজার ঘট ভেঙে ফেলেন এতে করে চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

চম্পকনগরে চাঁদ মনসাপূজা নিষিদ্ধ করলে এ দ্বন্দ্ব-শত্রুতা কপট-প্রকট ও হিংস্ররূপ ধারণ করে। চাঁদকে শায়েস্তা করতে মনসা নেতার পরামর্শে তাঁর নন্দন কানন সদৃশ গুয়াবাড়ি ধ্বংস করে ফেলেন। কিন্তু চাঁদের ডান হাত স্বরূপ সঙ্কুর ওঝা মন্ত্রবলে পুনরায় সে গুয়াবাড়ি উদ্ধার করেন। শিবের বরে মহাজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন চাঁদ। চাঁদের এ মহাজ্ঞান হরণ করতে মনসা নটীর (বাইজীর) ছদ্মবেশ ধারণ করে তার মন্ত্রবৎ গামছা ও খাড়ু হরণ করে নেয়। চাঁদ মনসাকে ধরতে চাপা গাছে উঠতে গেলে মনসার লাথিতে তার দাঁত ভেঙে যায়। ভাঙা দাঁত নিয়েই চাঁদ মনসাকে 'কানী' বলে উপহাস করেন।

এবার শঙ্কুর গারুড়িকে বধ করতে নেতার পরামর্শে মনসা গোয়ালিনীর ছদ্মবেশ ধরে বিষাক্ত দই খাওয়ায়ে তার ১৬ শিষ্যকে মেরে ফেলেন। কিন্তু শঙ্কু শিষ্যদের পুনরায় জীবিত করে তোলেন। এবার মনসা শঙ্কুর স্ত্রী কমলার মাসীর ছদ্মবেশে বাড়িতে প্রবেশ করেন। কমলার কাছ থেকে কৌশলে শঙ্কুর মৃত্যুর রহস্য জেনে নেন এবং ঔষুধপত্র হরণ করেন। শঙ্কুরকে দংশনের মাধ্যমে হত্যা করেন এবং ভেলায় ভাসানো মৃতদেহ গঙ্গাদেবীর জিম্মায় রাখেন। এদিকে চাঁদের ৬ পুত্রকে (নীলপাণি, শূলপাণি, গদাপাণি, চক্রপাণি, হলধর ও সূর্যাই) হত্যার উদ্দেশ্যে নেতার পরামর্শ মতো মনসা গোয়ালিনীর ছদ্মবেশ ধরেন। বিষমিশ্রিত দই খেয়ে চাঁদের ৬ পুত্রের মৃত্যু হলে পুত্রশোকে সনকা কেঁদে কেঁদে বুক ভাসায়। চাঁদের কাছে মনসা এসে পূজা দাবি করেন এবং তার মহাজ্ঞান ও ছয়পুত্রের জীবন ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন।

কিন্তু চাঁদ এ কথায় কান না দিয়ে বরং হেতালের লাঠির আঘাতে মনসার কাঁকাল (কোমড়) ভেঙে দেন। সনকা ও ৬ পুত্রবধূদের অনুরোধেও চাঁদের মনের পরিবর্তন হয়নি। তিনি সোমাই পণ্ডিতের পরামর্শ মতো কলার ভেলায় ৬ পুত্রের মৃতদেহ নদীতে ভাসিয়ে দেন। মনসা এদের মৃতদেহ গঙ্গাদেবীর জিম্মায় রেখে দেন। মনসার স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে দরিদ্র ঝালু-মালু নদীতে সোনার ঘট পায় এবং পূজার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। মনসার প্রত্যক্ষ এ দেবতাপুরীতে এসে সনকা ও তার ৬ পুত্রবধূ (সুরক্ষা, তিলোত্তমা, সত্যবতী, ধনমালা, হৃদয়া, জয়ন্তাই) গোপনে পূজা করে এবং সনকা পুত্রবর লাভ করে। কিন্তু এ পুত্রবর শর্ত সাপেক্ষভাবে দেয়া হয়। পুত্রকে বিয়ে করানো যাবে না, কারণ বাসর রাতেই তার মৃত্যুর নিয়তি লেখা। তবে বিয়ে না করালে বিপদ খণ্ডানো যাবে।

এবার লখিন্দর ও বেহুলাকে পৃথিবীতে পাঠানোর প্রক্রিয়া স্বরূপ শিবপুরীর নর্তক-নর্তকী অনিরুদ্ধ ও ঊষাকে অভিশাপ দেয়া জরুরি হয়ে পড়ে। নেতার পরামর্শে মনসা তার কূটকৌশলে শিবপুরীর নৃত্য-গীতের সময় অনিরুদ্ধ ও ঊষার তালভঙ্গ হয়ে যায়। এতে শিব রাগান্বিত হয়ে গায়ক পবন দেবতার দৌহিত্র ও মদন দেবতার পুত্র অনিরুদ্ধকে এবং বনমালীর দৌহিত্রী, অসুর বাণের কন্যা ও অনিরুদ্ধের স্ত্রী ঊষাকে পৃথিবীতে দুঃখের মানব জন্মগ্রহণের অভিশাপ দেন। অনিরুদ্ধ দেহ ত্যাগ করলে তার চিতায় (দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে ১৩ গজ ও উচ্চতায় ৯ গজ) আত্মাহুতি দেবার পূর্বে ঊষা নিজ দেহের রক্ত মাংস দিয়ে অগ্নিদেবতার পূজা করেন। এতে ঊষা সুন্দরী, সতী, আগুন হতে মুক্ত ও জাতিস্মর হবার বর লাভ করেন। অনিরুদ্ধ ও ঊষার প্রাণ যমদেবতার কাছে থেকে ছিনিয়ে মনসার মাধ্যমে চম্পক নগরের চাঁদের স্ত্রী সনকার গর্ভে যায় অনিরুদ্ধের প্রাণ এবং উজানী নগরের সাহে সওদাগরের স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভে যায় ঊষার প্রাণ।

সনকার ৫ মাসের গর্ভের সময় আত্মীয়স্বজন আয়োজন করে সাধ ভক্ষণের। এ সময় চাঁদ দক্ষিণ পাটনে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুতি নেন এবং মঙ্গলার্থে ছাগ-মহিষ বলি দিয়ে শিব পূজা করেন। স্ত্রী সনকার গর্ভের বর্ণনা দিয়ে চাঁদ দিয়ে যান 'গর্ভপত্র' নামক অভিজ্ঞান। চাঁদ ফাগুন মাসে তাঁর চৌদ্দ নৌকায় (মঙ্গলা, চন্দ্রপাট, সিন্দুর কটুয়া, হাসমোড়া, মগর, ধুতুরারফুল, গৌরাঙ্গা, সমুদ্র উত্থান, সুমন্ত বহাল, সঙ্কুচুর, গরুর মহারথী,

সিংহমুখ, চন্দ্ররেখা ও মধুকর প্রভৃতি) চাল, পাট, রত্নপ্রবাল, মণি, গজমুক্তা, কর্পূর, মুসুরি, ছাগল, ঘোড়া, কলই, মুগ, মুলা, নারকেল, কলা, পান, সুপারি, চট ও ফুল নিয়ে দক্ষিণ পাটনের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। চাঁদ মধুকর নৌকায় উঠে অন্যান্য দেবতার সঙ্গে জল-ফুল দিয়ে পূজা করেন শিবের। এবারও মনসা চাঁদের নিকট এসে তার পূজা দাবি করায় বরাবরের মতোই অপমানিত হয়ে তাড়া খেয়ে ফিরে আসতে হয়।

চাঁদ যাত্রাপথে বিশ্বশ্রবা ঘাট, সঙ্ক নদী, কালিদহ, লবণাম্বু ও জম্বুদ্বীপ অতিক্রম করেন এবং এ সময় সমুদ্রের মাঝে দেখতে পান মনসাপুরী। কৈর্বত জাতি মনসার পূজা করে। চাঁদের আদেশে মনসার নৈবেদ্যের পূজা মাঝিরা খেয়ে ফেলে। এছাড়া চাঁদ হেতালের লাঠি দিয়ে মনসাপুরী ভেঙে ফেলেন। এতে মনসা ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে চাঁদের উপর প্রতিশোধ নিতে সুযোগের অপেক্ষায় থাকেন। চাঁদ দীর্ঘ ১ বছর পর তাঁর বাণিজ্য তীর সমেত দক্ষিণ পাটনে পৌছান। নগর কতোয়ালকে নানা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করে চাঁদ রাজদরবারে যান এবং রাজার জন্য নিয়ে যান উত্তম বস্ত্র, মিষ্টি নারকেল, নারঙ্গ ও শুকনা খেজুর। বিনিময় প্রথার (Burter system) মাধ্যমে চাঁদ ব্যবসায় প্রচুর লাভবান হন। হৃষ্টচিত্তে চাঁদ এবার স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন।

১ মাস নৌকা চালানোর পর চাঁদ যখন সমুদ্রে উপনীত হলেন তখন তার সামনে এসে মনসা আর্বিভূত হন এবং যথারীতি পূজা দাবি করেন। এবার চাঁদ ঘোষণা দেন- 'যে হাত দিয়ে শিবের পূজা দেন, সে হাতে তিনি কখনোই দুষ্ট কানীকে পূজা দিতে পারবেন না।' চাঁদের এ অপমানে মনসা ক্রুদ্ধ হয়ে শিব ও গঙ্গাদেবীর অনুমতিক্রমে মাঝ সমুদ্রে অসময়ে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ করেন। এতে করে চাঁদের মধুকর নৌকাসহ ১৪টি নৌকাই মালামাল ও মাঝিসহ সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। চাঁদ জলে হাবুডুবু খেতে থাকেন। মৃত প্রায় চাঁদকে সাহায্য করার জন্য মনসা একখণ্ড কাঠ জলে ভাসিয়ে পাঠান, কিন্তু চাঁদ যখনই বুঝতে পারেন-এ মনসার দান তখনই তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে। চাঁদের দাড়িতে মাছ এসে বাসা করে। আবার চাঁদ মারা গেলে মনসার পূজাও পৃথিবীতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হবে না বিবেচনা করে চাঁদকে প্রাণে না মেরে অনেক কষ্টের বিনিময়ে সমুদ্র তীরে পৌঁছে দেন।

কিন্তু এখানেই চাঁদের বিড়ম্বনা, লাঞ্ছনা, দুঃখ-কষ্টের শেষ হয়নি বরং শুরু হয়। চাঁদ মনসার দেয়া বস্ত্র প্রত্যাখ্যান করে কলাগাছের বাকল পড়তে গেলে তাও পড়তে পারেনি। মনসার দেয়া বাবকের অন্ন ছুঁড়ে ফেলে নিরুপায় হয়ে চাঁদ খালের জল গ্রহণ করে। বনে কাঠ কাটতে গিয়ে মনসার মায়াবী কাঁঠাল খেতে গিয়ে ভেঙুর মৌমাছির কামড়ের শিকার হন। আবার চাঁদের কাঠের বোঝায় নাগ লুকিয়ে থাকায় কুমারের স্ত্রীর কাছে বিক্রি করার অপরাধে গলায় গামছা দিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়। জগাই মণ্ডলের ধানক্ষেত নিড়ানোর কাজে গেলে মনসার মায়ায় ঘাস মনে করে ধানের চাড়া কাটার অপরাধে রাখাল-কামলাদের হাতে মার খেতে হয়। এরপর চাঁদ আশ্রয় নেন তাঁর মণ্ডল মিতার বাড়ি। এখানেও চাঁদ খাবার খেতে পারেনি বরং মনসার প্ররোচনায় অষ্টনাগগণ তাকে কিল ঘুষি মারে। মনসার মায়ায় চাঁদ মিতার দেয়া পথচলার দোলা বাদ দিয়ে বরং মনসার মায়া দোলায় ওঠে পড়েন। পথিমধ্যে চাঁদকে মেরে অচেতন করে রাখে অষ্টনাগেরা। অবশেষে চাঁদ লাঞ্ছনা অপমানের একশেষ হয়ে পথ ভুলে ভিক্ষা করতে যায় শ্রীকলার হাটে। পূর্বেই তার হেতালের লাঠি সমুদ্র ভাসিয়ে দেয়া হয়। যা পরবর্তীকালে পুত্র লখিন্দর নদী থেকে পেয়ে বাড়ি নিয়ে আসে। এতে করে চাঁদ একান্ত ভাবেই রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

এভাবে চাঁদের কেটে যায় প্রবাস জীবনের দীর্ঘ ১২ বছর। অন্যদিকে চাঁদ নিজদেশ চম্পকনগর ছেড়ে আসার পরই সনকার কোল জুড়ে আসে ৭ম পুত্র লখিন্দর। ৬ মাসে লখিন্দরের করা হয় অন্নপ্রাশন, ৫ বছরে করা হয় হাতেখড়ি ও কর্ণভেদ অনুষ্ঠান এ সময় অর্থাৎ লখিন্দের জন্মের ৫ বছর পর উজানী নগরের সাহে সওদাগরের স্ত্রী সুমিত্রার গর্ভে জন্ম নেয় বেহুলা। দিনে দিনে লখিন্দর ও বেহুলা বড় হতে থাকে। এ সময় বাড়ির বাজার করতে রতিদাইকে শ্রীকলার হাটে পাঠান সনকা। বাজারের কুলি হিসেবে রতিদাই চাঁদ সওদাগরকে নিয়ে যায় সনকার বাড়ি অর্থাৎ

চাঁদের নিজের বাড়ি। কিন্তু মনসার মায়ায় বাড়ির রাখাল চাকরদের হাতে চোর বলে দারুণভাবে লাঞ্ছিত হন। তবে অন্নপাপ থেকে চাঁদকে রক্ষা করেন এবং তার দিব্যচক্ষু খুলে দেন মনসা। চাঁদের হীরা বাঁধানো দাঁত ও গজ ইন্দ্র কপাল এবং সনকার উরুর বাম পাশের কালো একটি জটের অভিজ্ঞান থেকে স্বামী-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে চিনতে পারেন। সনকার ৫ মাসের গর্ভপত্রের অভিজ্ঞান দেখে চাঁদ লখিন্দরকে পুত্র হিসেবে গ্রহণ করে নেন। এভাবে প্রবাস জীবনের দীর্ঘ ১২ বছরের দুঃখ লাঞ্ছনার পর অবশেষে চাঁদ বাড়িতে ফিরে আসেন এবং পুত্রমুখ দেখে সকল ব্যথা বেদনা ভুলে যান।

লখিন্দরের দুরন্তপনায় চাঁদ-সনকা পুত্রের নিয়তির কথা জেনেও বিয়ে করাতে বাধ্য হন। চাঁদ এ বিয়ে উপলক্ষ্যে উজানীনগরের শিবভক্ত সাহে সওদাগরের বাড়ির দিকে রওনা করেন। সাহে সওদাগরের মুক্তসার পুকুরের কাছে তাবু খাটান চাঁদ। এ পুকুরেই ১০০ সখী নিয়ে স্নান করতে আসে বেহুলা। আবার এ পুকুরঘাটে আসেন জ্যোতি নাম্নী বিধবা ব্রাহ্মণীরূপী মনসা। বেহুলার সাঁতার কাটার সময় পায়ে ছিটানো জল জ্যোতি ব্রাহ্মণীর গায়ে লাগলে তিনি বেহুলাকে বাসর রাতে স্বামী মৃত্যুর অভিশাপ দেন। বেহুলা স্নান সেরে মনঃক্ষুণ্ন হয়ে মনসার পূজা করতে যায়। বেহুলার শারীরিক সুলক্ষণ দেখে চাঁদ সাহে সওদাগর কন্যাকেই পুত্রবধূ করতে মনস্থির করেন। চাঁদ বেহুলাকে রান্না করার জন্য মরা শৈলমাছ ও লোহার কলাই রান্না করতে দেন। মনসার বরে ভক্ত সাধ্বী বেহুলা শৈলকে জীবিত করে ও লোহার কলাই সিদ্ধ করে রান্না করতে সক্ষম হয়। পরে মুকাই গণক ও নারদের পরামর্শ মতো বৈশাখ মাসের শুভলগ্নে লখিন্দর-বেহুলার বিয়ের দিন ধার্য্য করা হয়।

এদিকে মনসা সনকার মাসীর ছদ্মবেশে লখিন্দরকে বাসর রাতে মৃত্যুর অভিশাপ দেন। এতে চাঁদ হেতাল দিয়ে মনসাকে মারতে তাড়া করে বাড়িছাড়া করে দেন। পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য চাঁদ কামার সর্দার তারাপতিকে দিয়ে লোহার বাসর নির্মানের উদ্যোগ নেন। তারাপতি তার ১৪০০ কারিগর দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই নিশ্ছিদ্র বাসর ঘর (দৈর্ঘ্য ৯ গজ, প্রস্থ ৬ গজ ও উচ্চতা ৭ গজ বিশিষ্ট) তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু নেতার পরামর্শে মনসা তারাপতিকে সবংশে প্রাণনাশের ভয় দেখিয়ে লোহার বাসর ঘরের বায়ুকোণে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র রেখে তা শিমুল তুলা দিয়ে রাখতে বলেন। চাঁদ তারাপতিকে বখশিশ দিয়ে বিদায় করেন। এরপরও চাঁদ পুত্রের জীবন সুরক্ষা হিসেবে বাসর ঘরের চারপাশে ১২ গজ গভীর করে পরিখা খনন করেন, রাখা হয় কাক, ময়ূর, সারস, ঈগল, ভেষজ ওষুধী গাছ ও সাপের ওঝা।

তারপর বিয়ের সকল লোকাচার মেনে বিরাট শোভাযাত্রা করে লখিন্দর বিয়ে করতে উজানীনগরে গিয়ে উপস্থিত হন। শাস্ত্রীয় আচার মেনে লখিন্দর ও বেহুলার বিয়ে সম্পন্ন হয় এবং আশীর্বাদ, শুভ দর্শনের পর মনসার মায়ায় আহিরাজ সাপের ফনা দেখে লখিন্দর অচেতন হয়ে পড়েন। এতে চারদিকে কান্নার রোল উঠলে নববধূ বেহুলা বহুকষ্টে মনসাপুরী গিয়ে নিজ দেহ কেটে মনসার পূজা করে স্বামীকে সুস্থ করে তুলতে সক্ষম হয়। এরপর শাস্ত্রাচার মেনে কন্যা সম্প্রদান করার পর লখিন্দর নববধূ নিয়ে চম্পকনগরের নিজ বাড়িতে উপস্থিত হয়। সনকা বধূবরণের পর নব দম্পতিকে রাতে পাঠানো হয় লোহার বাসর ঘরে। বাইরে চাঁদ তার পাইক বাহিনীও সুরক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে পাহারায় থাকেন। মনসা লখিন্দরকে দংশন করতে প্রথমে পাঠান অষ্টনাগকে। বেহুলা কৌশলে দুধ-কলা দিয়ে অষ্টনাগকে আটকে রাখে। এছাড়া বেহুলা খাটের ৪ পায়ায় ৪টি বেজি (নকুল) বেঁধে রাখে।

লখিন্দর কামার্ত হয়ে ওঠলে বেহুলা কথার মারপ্যাচে তাকে নিবৃত্ত করে। আবার লখিন্দরের ক্ষুধা পেলে নিরুপায় বেহুলা বরণ ঘটের চাল, পূর্ণঘটের জল ও আঁচলে আগুন দিয়ে রান্না করে স্বামীকে খাওয়ায়। খেয়েদেয়ে লখিন্দর ঘুমিয়ে পড়লে, বেহুলা স্বামীর মঙ্গলের জন্য শিয়রে রাত জেগে বসে থাকে। এরপর মনসা দ্বিতীয়বার কালিনাগকে পাঠান লখিন্দরকে দংশন করতে। কিন্তু বাসর ঘরের সুরক্ষার ব্যবস্থা ও বেহুলার তৎপরতায় ভয় পেয়ে কালিনাগ

ফিরে যায়। নেতা তার মহাজ্ঞানের মায়ামন্ত্র দ্বারা বাসর ঘরের প্রহরায় নিযুক্ত সকলকে অচেতন করে রাখে। বেহুলাও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কালিনাগ বাসর ঘরে ঢুকে খাটে উঠতে গিয়ে প্রথমে ঝামেলায় পড়ে। কারণ বেহুলা খাটের ৪ পায়ার সঙ্গে ৪টি বেজি (নকুল) বেঁধে রেখেছিল। তাই কালিনাগ অন্য উপায় না দেখে বেহুলার মাথার যে চুল খাট হয়ে মেঝেতে পড়েছিল, সে চুল বেয়েই কালিনাগ খাটে ওঠে। ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরতে গিয়ে লখিন্দরের হাত গিয়ে সাপের ওপর পড়ায় কালিনাগ তার হাতের কড়ে আঙ্গুলে দংশন করে। এতে করে লখিন্দরের ললাট লিখন বা নিয়তি বাস্তবে রূপ নেয়।

লখিন্দরের আর্তনাদে বেহুলার ঘুম ভাঙে এবং স্বামীর এ অবস্থা দেখে দিশাহারা হয়ে যায়। কালিনাগকে পালিয়ে যেতে দেখে বেহুলা তার লেজ কেটে আঁচলে বেঁধে রাখে। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুতে মা সনকার মাতম দেখে সবাই অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু দৃঢ়চেতা চাঁদ ভেঙে না পড়ে বরং লোকাচার অনুযায়ী চিতা না সাজিয়ে কলাগাছের ভেলা তৈরি করেন মৃতদেহ জলে ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু যখন বেহুলা স্বামীকে পুনর্জীবিত করতে দেবপুরীতে যেতে চায়, তখন সবাই প্রাথমিকভাবে তাকে বারণ করে। কিন্তু বেহুলার সুদৃঢ় প্রত্যয় আর পণ দেখে সকলে আশীর্বাদ দিয়ে তাকে বিদায় জানায়। বিদায়কালে বেহুলা তার শাশুড়ি সনকাকে কাজের সাফল্যের নিদর্শন স্বরূপ ৪টি অভিজ্ঞান দিয়ে যায়। যেমন- শুকনা ধানে অঙ্কুর দেখা দেবে (দেবপুরে পৌছালে), সিদ্ধ হলুদে চাড়া গজাবে (উদ্দেশ্য সফল হলে) ভাজা কলাইতে পাতা গজাবে (লখিন্দর জীবিত হলে) আর বিনা জ্বালে হাড়ির ভাত রান্না হবে (দেশে প্রত্যাবর্তন করলে) প্রভৃতি।

স্বামীকে নিয়ে একা গাঙুরের জলে ভাসতে ভাসতে তৃতীয় দিনে বেহুলা পৌছায় গোদার ঘাটে, এরপর ধনা-মনার ঘাটে, তারপর টেটনের ঘাটে, এখান থেকে শালবন এবং শালবন থেকে গঙ্গার মাঝখানে মনসাপুরী বা জয়ন্তপুরী। এসব ঘাটের লোভ-লালসা, প্রলোভন ও বিপদকে বেহুলা তার সতীত্বের দৃঢ়তা ও উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। পথিমধ্যে একমাস পর লখিন্দরের শরীর থেকে মাংস খসে পড়ে এবং গায়ে পোকা ধরে। বেহুলার পতিভক্তি পরীক্ষা করতে নেতা বাঘের ছদ্মবেশ ধরে লখিন্দরকে খেতে আসলে বেহুলা প্রথমে তাকে খেতে বলে স্বামীকে আগলে রাখে। নেতা বেহুলার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হন। নদীর ঘাটে দেবতাদের কাপড় ধোয় নেতা ধোপানী। তিনি কাপড় ধোয়ার সময় ছেলে ধনপতিকে মেরে রাখে এবং বাড়ি ফেরার সময় জীবিত করে চলে যায়। কারণ মায়ের কাজে ধনপতি ব্যাঘাত ঘটায়। এ দৃশ্য দেখে বেহুলার প্রাণে আশার সঞ্চার হয়। স্বামীর প্রাণ ফিরে পাবার জন্য বেহুলা নেতার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকে। বেহুলার ব্যথায় নেতাও সহানুভূতিতে সিক্ত হয়ে ওঠেন।

মূলত নেতার সহযোগিতায় বেহুলা ৬ মাসে দেবপুরীতে পৌছায় এবং দেবতাদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ধনপতিকে বাদক বানিয়ে নিজে নৃত্য-গীত আরম্ভ করে। বেহুলার নাচ-গানে সন্তুষ্ট হয়ে দেবতা শিব তাকে বর চাইতে বলেন। বেহুলা এ সুযোগে স্বামী লখিন্দরের জীবন ভিক্ষার বর প্রার্থনা করে। মনসাকে ডাকতে প্রথমে নন্দী ও পরে কার্তিককে শিব পাঠিয়ে দেন। মনসা দেবপুরীতে আসলে বেহুলা শিব ও মনসার স্তব করে। শিব মনসাকে আদেশ করেন লখিন্দরকে জীবিত করে দিতে। কিন্তু মনসা নানা অজুহাত দেখান এবং লখিন্দরের মৃত্যুতে নিজের দায় অস্বীকার করেন। তবে তার এ অজুহাত মিথ্যা প্রমাণিত হয়, যখন বেহুলা তার আঁচল থেকে অষ্টনাগ ও কালিনাগের কাটা লেজ বের করে দেখায়। অপ্রস্তুত হয়ে মনসা বেহুলা ও শিবের কাছে নিজের দুঃখের (চাঁদ সওদাগর কর্তৃক প্রাপ্ত) বারোমাস্যা বর্ণনা করেন।

মনসাভক্ত বেহুলা মনসার দুঃখের সান্ত্বনা স্বরূপ শ্বশুর চাঁদ সওদাগর দ্বারা তার (মনসার) পূজা করানোর প্রতিশ্রুতি দেয়। ফলশ্রুতিতে মনসা অমৃতকুণ্ডের জল ও অষ্টফুলের ডালা দিয়ে লখিন্দরের শরীর গঠন করেন এবং গঙ্গাদেবীর

কাছে থেকে প্রাণ এনে তাকে পুনর্জীবিত করেন। এরপর বেহুলা তার ৬ ভাসুর ও শ্বশুরের চৌদ্দ নৌকা ফিরে পেতে স্বামীসহ নৃত্য-গীত আরম্ভ করে এবং মনসা যথারীতি গঙ্গাদেবীর কাছ থেকে এনে এদের ফিরিয়ে দেন। স্বামী, ৬ ভাসুর, ধন্বন্তরি ওঝাসহ লোকজন, শ্বশুরের বাণিজ্য নৌকাসহ সতীত্বের গরবে গরবিনী বেহুলা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য যাত্রা শুরু করে।

প্রত্যাবর্তনের ষষ্ঠদিনে বেহুলা টেটনের ঘাটে ফিরে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো টেটনকে পঞ্চম বিয়ে করায়, এরপর গোদার ঘাটে গিয়ে লঘু শাস্তি দিয়ে গোদাকে বড়শিমুক্ত করে বাড়ির দিকে এগিয়ে যায়। শ্বশুর বাড়ির ঘাটে ভিড়লে সনকা ও ৬ পুত্রবধূ বেহুলার রেখে যাওয়া ৪ লক্ষণের সত্যতা দেখতে পায়। লখিন্দর, ৬ পুত্র, ১৪ নৌকাসহ বেহুলাকে দেখে চাঁদ, সনকা ও পুত্রবধূরা বিস্মিত ও আনন্দিত হন। তবে মুকাই ব্রাহ্মণ চাঁদকে মনসা পূজার শর্তের কথা বলায় চাঁদ গম্ভীর হয়ে পড়েন। চাঁদ কোন মতেই মনসার পূজা দিতে চান না। পরিবার, আত্মীয়স্বজন, অনুগত শ্রেণির অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেও চাঁদ বেহুলার অনুরোধ ও আত্মনিবেদনকে ফিরিয়ে দিতে পারেননি। বেহুলার পতিপ্রেম, সাধনা ও স্নেহের দাবির কাছে অটল-অবিচল চাঁদও পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। তিনি বাম হাতে মুখ ফিরিয়ে মনসার পূজা দিতে চান।

তবে দেবী চণ্ডীর দৈববাণী ও ধর্মীয় তত্ত্বে চাঁদের সকল প্রকার মনসাবিদ্বেষ দূর হয়ে যায়। চাঁদ সোনার (মনসার) প্রতিমা দিয়ে, হেতালোর লাঠি কেটে ধূপ জ্বালিয়ে, ছাগ-মহিষ বলি করে ১৬ উপাচারে পূজা করেন। অষ্টনাগসহ মনসা খেতে আসে চাঁদের পূজা। মনসার কাছে চাঁদ তার পরিবারের ১৬ সদস্যের স্বর্গে ফিরে যাবার বর লাভ করেন। এতেই মনসা খুশি হলেন এবং মর্ত্যে মনসার পূজা প্রচলিত হলো; সেই সঙ্গে প্রতিশ্রুতি রক্ষা পেল।

এরপর চাঁদ সওদাগর তার বাড়িতে ভোজানুষ্ঠানের আয়োজন করলে, দেশ-বিদেশ থেকে বহু আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও সমাজপতিগণ উপস্থিত হন। এরমধ্যে সঞ্জয় সাধু বেহুলার হাতে রান্নাকৃত খাবার খেতে অস্বীকার করেন। তিনি বেহুলার সতীত্বের ওপর সন্দেহ পোষণ করেন। এ জন্য বাধ্য হয়ে বেহুলাকে সতীত্বের জন্য ৩টি পরীক্ষা (অগ্নিপরীক্ষা, জতুগৃহ পরীক্ষা ও ঘৃত-কাঞ্চন পরীক্ষা) দিতে হয়। মনসার বরে বেহুলা এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তার সতীত্বের খ্যাতি দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। অভিশাপের কালপূর্ণ হলে লখিন্দর-বেহুলা যথাক্রমে অনিরুদ্ধ ও ঊষারূপে স্বর্গে ফিরে যান।

সুতরাং দেখা যায়, মনসামঙ্গলের এ কাহিনীটি বারণাসী, কাশী, বর্ধমান, গৌড়, পাটনা, বাখরাগঞ্জ ও সিংহলের অন্তর্গত চম্পকনগর, উজানি নগর, হালিয়ার নগর, জোলাহাটী, কাজিহাটি ও শিবপুরী পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠেছে। এছাড়া অসংখ্য দেব ও মানব চরিত্রের (শিব, মনসা, চণ্ডী, নেতা আর চাঁদ, সনকা, বেহুলা ও লখিন্দর প্রমুখ) ঘাত-প্রতিঘাতে কাহিনীটি জীবন্তরূপ লাভ করেছে।

বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল বিকাশ লাভ করে হুসেনশাহী বংশের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫৩৮খ্রি.)। এ শাসনামলে বাংলার সীমানা পশ্চিমে ত্রিহূত, দক্ষিণ-পশ্চিমে উড়িষ্যা, পূর্বে কুচবিহার ও দক্ষিণে- চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৬৬] আবার সমগ্র বাংলাদেশ চারটি সুনির্দিষ্ট বিভাগে বিভক্ত ছিল; যথা- লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম), সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি। বঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁও লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনের অনিবার্য সোপান হিসেবে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। এ প্রসঙ্গে কে. আর কানুনগো বলেছেন-

'The history of the muslim principality of Lakshanawati emerges at the close of this period as the history of Bengal proper with its well-defined divisions, Lakshanawati, Satgaon, Sonargaon and chatgaon (Chittagong). It also becomes clear that Sonargaon the capital of Bengal or East Bengal, became at this time in

variably the stepping stone to the throne of Lakshanawati and the eastern capital out-shown in power, wealth and grandeur the historic capital of Lakshanawati.[৬৭]

দেশের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্য যে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহাবস্থান প্রয়োজন হয় তা অনেকাংশেই আলাউদ্দিন হুসেন শাহের শাসনামলে (১৪৯৩-১৫১৯খ্রি.) বিরাজমান ছিল। এ সংহতির কথা স্বীকার করেই গোপাল হালদার বলেছেন- "একই রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জীবন যাপন করে একই ভাষা বলে, একই সাহিত্য ও সংস্কৃতি সৃষ্টিতে যোগদান করে সাধারণত হিন্দু ও সাধারণ মুসলমানতো নিশ্চয়ই, উচ্চবর্গের মুসলমান ও উচ্চবর্গের হিন্দুও বাঙালী বনে গিয়েছিল; বলতে গেলে, 'বাঙালীর' একটা রাষ্ট্র, 'জাতি বা নেশন'- হয়ে ওঠার মত অনুকূল অবস্থা তখন দেখা দিয়েছিল।"[৬৮] এ সুসংহত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ ও বাঙালির পরিচয় আরো বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় কতগুলো বিষয়ের ওপর, যেমন- ১. ভৌগোলিক পরিবেশ ২. শাসক শক্তির অবস্থান ৩. উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থা ৪. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ৫. ভাষা বা ভাবের আদান প্রদান ব্যবস্থা ৬. মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী আর্থ-সামাজিক অবস্থা। আবার অন্যদিকে প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী টি.বি বটোমোর সমাজ কাঠামোর পাঁচটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদানের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন। যথা- ১. ভাবের আদান-প্রদান ব্যবস্থা ২. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৩. পরিবার, শিক্ষাসহ সমগ্র সামাজিকীকরণ ব্যবস্থা ৪. ক্ষমতার ভাগ-বাটোয়ারা অধিকার ব্যবস্থা এবং ৫. ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ব্যবস্থা। অর্থাৎ "The minimum requirement seem to be (i) a system of communication (ii) an economic system, sealing with the production and allocation of goods (iii) arrangements, including the family and education for the socialisation of new generations (iv) a system of distribution of power and perhaps (v) a system of rituals, serving to maintion of increase social cohesion and to give social recognition to significant personal events, such as birth, puberty, courtship, marriage and death.''[৬৯]

আবার সমাজবিজ্ঞানী রেডফিল্ড সমাজের চারটি উপাদানের উপর সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। যথা- ১. পরিবার ও জাতি ব্যবস্থা ২. গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠান ৩. কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ৪. ধর্মও উপসম্প্রদায় এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সুতরাং উপর্যুক্ত সমাজ বিজ্ঞানীদের মতবাদগুলো মেনে নিয়েই সমাজ কাঠামোকে মোটা দাগে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়; যথা- ১. অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ২. সামাজিক ব্যবস্থা ও ৩. সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যের আলোকে এ বিষয় সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নরূপ-

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন

বাংলার অর্থনীতির প্রাণ ছিল কৃষি। কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কৃষির ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করতো। এছাড়া কৃষি সম্পর্কজাত শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়েই মূলত বাংলার অর্থনীতি যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠেছে। বাংলার অর্থনীতির চালিকাশক্তি ছিল মূলত গ্রাম। কারণ গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপরই বাংলার অর্থনীতির স্থায়িত্ব নির্ভরশীল ছিল। গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ তার উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থার অবস্থানও ছিল প্রায় গ্রামে; যার ফলে সৃষ্ট হয় বিভিন্ন গ্রাম্য বাজার, হাট প্রভৃতি। কিন্তু এ যুগে এসে কৃষি ও হস্তশিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার ঘটে- কৃষি ও হস্তশিল্প, গ্রামীণ অর্থনীতির এ দুই ধন উৎপাদন ব্যবস্থা স্বতন্ত্র ধারায় বিকশিত হয়। উৎপাদন শক্তির ক্রমবিকাশের দরুণ উৎপাদিত দ্রব্য বিনিময়ের প্রসার আরও বৃদ্ধি

পায়। এ বিনিময় ব্যবস্থার বদৌলতেই সৃষ্ট হয় নতুন শ্রমবিভাগ। জন্ম নেয় এক নতুন শ্রেণি, যারা পরিচিতি লাভ করে বণিক সম্প্রদায় হিসেবে। বিনিময় প্রথা সমৃদ্ধতর করার লক্ষ্যে সৃষ্ট হয় নগর। গড়ে ওঠে একাধিক বাণিজ্যকেন্দ্র। মূলত জলপথের সুযোগেই নদীর তীরেই গড়ে ওঠে বড় বড় নদীবন্দর ও সমুদ্র বন্দর। এ বাণিজ্য বন্দরগুলোকে কেন্দ্র করেই বাংলার অর্থনীতি বেশ গতি লাভ করে এবং দেশ-বিদেশে প্রসার লাভ ঘটে।

কৃষি

সুলতানী আমলে সমগ্র বাংলা কয়েকটি 'ইকলিম' এ বিভক্ত ছিল। প্রতিটি ইকলিম আবার কতগুলো উপবিভাগে 'অরসহ' নামে বিন্যস্ত থাকতো। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে এ উপবিভাগকে 'মুলুক' বলা হয়েছে। এ মুলুক আবার 'তকসিম' নামে উপবিভাগে বিন্যস্ত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক ভূমি ব্যবস্থায় তৎকালীন বাংলার সমাজে কাঠামোতে সুলতান বাদে চারটি প্রধান স্তর বা শ্রেণি লক্ষ করা যায়; যথা–

১. জায়গীরদার (সকল মনসবদারই জায়গীরদার কিন্তু সকল জায়দীদার মনসবদার নয়। কারণ সামরিক বিভাগ ছাড়াও বহু বেসামরিক পদস্থ ব্যক্তি জায়গীর ভোগ করতো)।

২. রাজস্ব আদায়কারী সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ।

৩. গ্রাম পর্যায়ে গ্রামীণ, চৌধুরী, লম্বরদার, ডিহিদার, মণ্ডল-মাতব্বর, পাটোয়ারি, সরপঞ্চ পদবিধারী বক্তিবর্গ।

৪. কৃষক (ভূমির স্বত্বাধিকারী কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক, যারা সরাসরি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকতো)।

মনসামঙ্গল কাব্যেও জগাই মণ্ডল নামে এক অবস্থাপন্ন ভূস্বামীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসার কূটকৌশলে চাঁদ সর্বস্বান্ত হয়ে এ জগাই মণ্ডলের কাছে এসে খাবারের সংস্থান চান। কিন্তু মণ্ডল চাঁদকে বিনা পরিশ্রমে খাদ্য দিতে নারাজ। তাই বাধ্য হয়ে চাঁদকে ধান নিড়ানোর কাজে জমিতে যেতে হয়। যেমন–

'জগাই নামে মণ্ডল নগরেত ঘর।
ধনের অন্ত নাহি রাজার সমোসর ॥
ধীরে ধীরে করি গেল চান্দো তাহার সদন।
স্তুতি স্তবন করি কহে বিনয় বচন ॥
অন্ন দিয়া দুঃখিতের রাখহ জীবন।
,,,
এত শুনি মণ্ডলিয়া কহে চান্দের কাছে।
আগে কর্ম করিবার ভাত পাবা পাছে ॥
এতেক ভাবিয়া মণ্ডল মনে মনে পাছি।
ধান্য নিড়াইতে চান্দোর হাতে দিল কাঁচি ॥
ধান্য নিড়ায় চান্দ মনে বাসে ভাল।
অন্তরীক্ষে থাকি পদ্মা পাতিল জঞ্জাল ॥
ধান্য না চিনে চান্দো সবে চিনে দুর।
ধান্য কাটিয়া চান্দো কৈল ভুর ভুর ॥.
,,,,
একি একি বলি মণ্ডল সর্ব্বজন ডাকে।
ধান্যশোকে মণ্ডল অধিক জলে কোপে ॥

মার মার বলিয়া মণ্ডল করে হাহাকার।
এতশুনি আসিল তথায়ে কিষান তাহার ॥
সকলে আসিয়া তখন চান্দেরে ধরিল।
চোপার চাপড় মারি ঘাড়কাতা দিল ॥' –(পৃ-২৯৪-২৯৫)

বেগার শ্রম

চাঁদ সওদাগর মনসার মায়ায় ধান গাছকে ঘাস মনে করে কাটতে থাকলে মণ্ডলের নির্দেশে তার কৃষাণ রাখাল কামলারা মিলে চাঁদকে মেরে বেগার খাটিয়ে তাড়িয়ে দেয়। এসব মণ্ডল-মাতাব্বর-জোতদার ভূস্বামীরা স্বভাবে শাসকশ্রেণির মতোই কঠোর হতেন। অনেক সময় ভূমিহীন কৃষক প্রজা ও কামলাদের বেগার খাটাতেন, ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করতেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত খাজনার দায়ে জুলুম করতেন। চাঁদও জগাই মণ্ডলের অধীনে বেগার খাটতে বাধ্য হয়েছিলেন। কৃষকদের এ বেগার শ্রম সম্পর্কে রামশরণ শর্মা বলেছেন–

"মৌর্য যুগে ক্রীতদাস ও ভাড়াটে শ্রমিকদের কাছ থেকেই বেগার আদায় করা হতো। কিন্তু খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে সকল শ্রেণির প্রজাদের কাছ থেকেই বেগার আদায় করা হতো। ,,, বাংলাদেশ ও বিহারে কৃষকগণ সর্ব প্রকার অত্যাচারের শিকার হতো এবং পালদের দ্বারা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে অনুদত্ত গ্রামগুলোই একমাত্র এই সর্ব পীড়ার হাত থেকে অব্যাহতি পেতো। শাসক সর্দারগণ সময় সময় বেগার আদায় করতেন। কিন্তু এ অধিকার দান গ্রহিতার হাত চলে গেলে তা নিশ্চিতরূপে আরো ভয়ানক হয়ে উঠতো, কারণ দান গ্রহিতা গ্রামের আয়ের সকল উৎসগুলি পরিপূর্ণভাবে শোষণ করার জন্য বেগার প্রথার পূর্ণ সুযোগ নিতো"।[৭০]

বেগার শ্রমিক অনেক সময় শুধু পেটে ভাতের বিনিময়েও ঠিক করা হতো। দীন-হীন ও আর্থিক দুরবস্থায় পতিত মানুষ শুধু পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যই এ শ্রমে নিযুক্ত হতো। যেমন- শ্রীকলার হাটে রতিদাই চাঁদকেও এ পেটে ভাতের বেগার শ্রমে নিয়োগ করে-

'কাহার ঠাই দিব বোঝা নিয়ম না পায়।
হেন কালে দেখে চান্দো কান্দিয়া বেড়ায় ॥
রতি বলে কাঙ্গালিয়া কেন কান্দ তুই।
বোঝা লইয়া সঙ্গে চল ভাত দিব মুই ॥
ভাতের কথা শুনিয়া চান্দোর গায়ে বল হইল।
বোঝা লইয়া রতির সঙ্গে তখনে চলিল ॥' –(পৃ-৩১২)

হালচাষী

তৎকালীন বাংলায় গরু লাঙল দিয়ে হালচাষ করে তবে ফসল বোনা হতো। 'মনসামঙ্গল কাব্যে' চাঁদ মনসাপুরী ভেঙে হালচাষীদের দিয়ে সেখানে জমি চাষ করা–

'ঘট ভরা ভাঙ্গিয়া জলে ফালাইল।
হালিয়া আনিয়া তবে ভিটাতে চাষ কৈল ॥' –(পৃ- ২৫১)

দাওয়াল শ্রমিক

বছরের বিভিন্ন সময়ে মৌসুমী ফসল বা ধান কাটার জন্য 'দাওয়াল' নামক এক শ্রেণির শ্রমিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। দাওয়ালগণ সাধারণত অন্য এলাকায় গিয়ে ধানের বিনিময়ে ফসল কাটতো। বিঘা প্রতি নির্দিষ্ট হারে তারা জমির মালিকের কাছ থেকে ধান গ্রহণ করতো। চাঁদের দক্ষিণ পাটন যাত্রাকালে দক্ষিণরাজ্যের বর্ণনা উপলক্ষ্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়–

'সোনার কাচি দিয়া দাওালে ধান দায়ে।
হীরামণ মাণিক্য তারা রৌদ্রেতে শুখায়ে ॥' –(পৃ-২৪৬)

শস্য

বাংলাদেশ নদীবহুল দেশ। গঙ্গা, ভাগীরথী, গোমতী, যমুনা, জাহ্নবী, কর্ণফুলী, গোদাবরি, মন্দাকিনী, কালিন্দী, গর্গর (গৈলা), গাঙুর ও কালিদহের অববাহিকার পলিজমিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল, শাক-সবজী উৎপন্ন হতো। এসব ফসলের মধ্যে ধান, পাট, মসুরি, খেসারি, মুগ, কলাই, তিল, তিশি, সরিষা, মটর, আদা, মরিচ, পান ও সুপারি অন্যতম। এ সবের উল্লেখ করা হয়েছে এভাবে–

'কলই মুগ মুসুরির থেলা নৌকায় তোলিয়া লইলা
মুলা ভরি লইল অনুপাম।
দ্রব্য উঠায়ে নানা মত নারিকেল ভরিল তাত
পাটনে নাহিক যাহার নাম ॥' –(পৃ-২৩৮)

শিল্প

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ভূখণ্ড বিভিন্ন প্রকার শিল্পে উৎকর্ষ লাভ করে। এসব শিল্পকে ধারণ করে বাংলার সমাজে বিভিন্ন বৃত্তিজীবী বা পেশাজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এসব শিল্পের মধ্যে- বস্ত্রশিল্প বা তাঁত শিল্প, লৌহশিল্প, স্বর্ণ-রৌপ্য শিল্প, তামা-কাসা শিল্প, শঙ্খ শিল্প, মৃৎ বা পোড়ামাটির শিল্প, কাঠ-বাঁশ-বেত শিল্প, দন্ত-পট-আল্পনা শিল্প ও স্থাপত্য শিল্প অন্যতম।

বস্ত্রশিল্প

মধ্যযুগে বাংলার রেশম বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। বাংলার মসলিন, জামদানি, পাটের শাড়ি দেশ-বিদেশে খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়। বিশেষ করে 'মসলিন' কাপড় ইউরোপ, ইতালি, আফ্রিকা ও আরব দেশের রাজা বাদশাহ ও অভিজাত শ্রেণির কাছে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। পাটবস্ত্র বা পাটের শাড়ি পড়ে সনকাকে সাধভক্ষণ করানো হয়। আবার চাঁদ সওদাগরও পাটবস্ত্র পড়ে দক্ষিণ পাটনের রাজদরবারে উপস্থিত হন উপঢৌকন নিয়ে। যেমন-

'নারীগণে তৈল দিল সোনকারে বেড়ি।
স্নান করিয়া সোনাই পৈরে পাটের শাড়ি ॥' -(পৃ- ২৩৭)

এ পাটবস্ত্র তৈরি করতে যে অনেক ধৈর্য, শ্রম ও সুরুচির প্রয়োজন হতো- তা চাঁদ দক্ষিণ পাটনের রাজাকে বলেছেন। যেমন-

'আমার দেশে এক জাতি জনমত আছে তাঁতি
বলিতে অনেক দিন লাগে।
কেবল ধীরের কাম বস্ত্র বড় অনুপাম
প্রাণ সতি ভাঙ্গিলে না চিরে ॥" -(পৃ-২৭২)

ব্যবসায়-বাণিজ্য

সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহের শাসনামলে (১৩৪২-১৩৫৭খ্রি.) বাংলা ও লক্ষ্মণাবতী একত্রিত হলে স্বাধীন বাংলা সালতানাতের সীমানা তেলিয়াগর্হি থেকে চট্টগ্রাম এবং হিমালয়ের পাদদেশ থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় অর্থাৎ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে তখন বাংলায় ব্যবসায় বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করে। পূর্বের অর্থাৎ পাল আমলের মাঝামাঝিতে এসে ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে মন্দা,

প্রতিবন্ধকতা সর্বোপরি বিপর্যয় নেমে এসেছিল, তা এ সময়ে আবার বাণিজ্যের দুয়ার উন্মুক্ত হয়। যদিও নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন-

> "অষ্টম শতক হইতেই দেখা যাইবে বঙ্গীয় সমাজ ক্রমশঃ কৃষি নির্ভর হইয়া পড়িতে বাধ্য হইয়াছে এবং কৃষকরাই সমাজদৃষ্টির সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে।"[৭১]

কিন্তু বিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বৃত্তান্ত হতে সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সহ সমগ্র বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঐশ্বর্য ও বিত্ত-বৈভবের সন্ধান পাওয়া যায়। এ সাতগাঁও বন্দরের বর্ণনা দিতে গিয়ে বতুতা বলেছেন-

> "He made a detour round Bengal in his Voyage to china. He entered the province throught the esturary of the Hooghly and passing by Satgawn, a great port situated on the sea-coast, proceeded, direct to Sylhet." [৭২]

সুতরাং বলা যায়, অষ্টম শতকের দিকে বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে অবনতির কথা বলা হয়, তা পুরোপুরি সর্বাংশে সত্য নয়। বরং এমন ধারণা করা যায়, পূর্বের সমৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল অথবা সে ধারাই সুলতানী আমলের সার্বভৌমত্ব তথা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এর কারণ হিসেবে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন-

> 'পঞ্চম হইতে অষ্টম শতক পর্যন্ত দেখিতেছি, ভূমিদান বিক্রয়ের দলিলগুলিতে স্থানীয় অধিকরণে যাঁহাদের আহবান করা হইয়াছে, সেই পাঁচজনের মধ্যে দুইজন তো রাজকর্মচারীই বিষয়পতি স্বয়ং এবং প্রথম কায়স্থ বা জ্যেষ্ঠ কায়স্থ, বাকি তিনজনের মধ্যে দুইজন ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতিনিধি নগরশ্রেষ্ঠী এবং প্রথম সার্থবহ; অবশিষ্ট যিনি রহিলেন, তিনি প্রথম কুলিক অর্থাৎ শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধি, তাহা হইলে দেখিতেছি, রাষ্ট্রেও কতটা আধিপত্য এই বণিক ও ব্যবসায়ীরাই করিতেছেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের ফলে এইসব শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের হাতে যে অর্থাগম হইতো, তাহার ফলেই ইহারা রাষ্ট্রে আধিপত্য লাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। প্রাচীন বাঙালীর লক্ষ্মী ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভরই ছিল বেশি, এবং সেই লক্ষ্মীই বাস করিতেন বণিক, ব্যাপারী ও শ্রেষ্ঠীদের ঘরে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে সওদাগরদের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাহিনীগুলিতেও সে কথার প্রমাণ আছে।'[৭৩]

বাণিজ্য বন্দর

বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্য চলতো প্রধানত স্থল ও জলপথে। তবে জলপথই ছিল নিরাপদ ও সহজলভ্য। তৎকালীন বাংলায় সপ্তগ্রাম, সোনার গাঁ, চাটগাঁ (চট্টগ্রাম) ও হুগলী বন্দর বিশেষ ভাবে বিখ্যাত ছিল। এসব বন্দরগুলো গড়ে ওঠেছিল প্রধানত নদীকে কেন্দ্র করেই। নদীর মধ্যে গঙ্গা, ভাগীরথী, গোমতী, যমুনা, গোদাবরী, কর্ণফুলী, কালিদহ অন্যতম। এছাড়া বঙ্গোপসাগর ধরে বাংলার বাণিজ্য সুদূর সিংহল, মালয়, যবদ্বীপ, মালদ্বীপ, চীন, জাপান, কোরিয়া, আরব ও আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন–

> "মধ্যযুগীয় সাহিত্য পাঠ করিলে মনে হয়, এখন এই পথ ধরিয়া, অর্থাৎ সমুদ্রোপকূল বাহিয়া সিংহল হইয়া গুজরাট পর্যন্ত সমুদ্র পথ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছে। সিংহল হইতে মালয়-নিম্নব্রহ্ম, সুবর্ণদ্বীপ, যবদ্বীপ, চম্পা, কম্বোজের সমুদ্র পথতো ছিলই এবং তাহার প্রমাণও সুপ্রচুর। ,,, সিংহলের সঙ্গে তাম্রলিপ্তির (মেদিনীপুর) বাণিজ্য পথের আভাস ফা-হিয়েন রাখিয়া গিয়াছেন। তাহাও তিন-চারিশত বৎসর আগে ভারতের দক্ষিণ সমুদ্র তীর বাহিয়া গঙ্গাবন্দর ও তাম্রলিপ্তির (মেদিনীপুর) সঙ্গে সুদূর রোম সাম্রাজের বাণিজ্য সম্বন্ধের আভাস তো পেরিপ্লাস ও টলেমির গ্রন্থেই পাওয়া যায়। ,,, বহু পরবর্তীকালেও ভৃগুকচ্ছ

সুরাষ্ট্রা- পাটন পর্যন্ত এই বাণিজ্য সম্বন্ধের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যাইবে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ধারায়।"[৭৪]

চাঁদ সওদাগর চম্পক নগরী থেকে যে দক্ষিণ পাটন বাণিজ্য যাত্রা করেন, তার সঙ্গে ঐতিহাসিক জলপথের সাদৃশ্য আছে। যেমন-

"দেখিতে না দেখি নৌকা পবন গতি ধায়ে।
নানা ধন ভরিয়াছে সেইত নৌকায়ে ॥
,,,
ধবল নদী এড়াইয়া মাণিক্যপুর যায়ে।
হাতা তালি দিয়া গাবরে গীত গায়ে ॥
কালিদহে এড়াইল গেল কথদুর।
তথা হতে গেল ডিঙ্গা বিজয়ারপুর ॥
,,,
নর্ম্মদা এড়াইল নামে গোদাবরী।
শ্বেতগঙ্গা এড়াইল নামে মন্দাকিনী ॥' -(পৃ- ২৪৩-৪৪)

গঙ্গার এই ধারাটি আরও দক্ষিণে বহরমপুর, নবদ্বীপ, কালনা, চুঁচড়া, চন্দন নগর, কলকাতা প্রভৃতি শহরের পাশ দিয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে। চুঁচড়ার অদূরে ত্রিবেণীতে ভাগীরথীর শাখানদী সরস্বতী ও যমুনার সঙ্গমস্থল। কলকাতার দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রাচীন প্রবাহ পথ আদিগঙ্গা নামে পরিচিত। এরই তটে কালীঘাটের মন্দির। এই পথেই আসত গ্রিক ও রোমান জগতের বণিকেরা বাঙলার সঙ্গে বাণিজ্য করতে।[৭৫]

পরিবহন ব্যবস্থা

ব্যবসায়-বাণিজ্যের পরিবহনের মধ্যে ছিল- নৌকা, ডিঙা, জাহাজ, হাতি, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষ, গাধা প্রভৃতি। জলপথে নানারকম পালতোলা নৌকায় ও পালতোলা জাহাজে করে মালামাল বহন করা হতো। নৌকা বা জাহাজে নাবিক, মাঝি-মাল্লারা কাজ করতো। নৌকাগুলো নামে আকারে, আয়তনে ও গতিতে হতো বিভিন্ন ধরনের। চাঁদ সওদাগর দক্ষিণ পাটনে যাত্রার সময় ১৪ ডিঙা নিয়ে যাত্রা করেন। যেমন-

"সবের আগে চলে ডিঙ্গা নামেতে মঙ্গলা।
,,,
তার পাছে চলে ডিঙ্গা নামে চন্দ্রপাট।
,,,
তার পাছে চলে ডিঙ্গা গঙ্গার চরণ।
,,,
তার পাছে চলে ডিঙ্গা সিন্দুর কটুয়া।
,,,
তার পাছে চলে ডিঙ্গা নামে হাসমড়া।
,,,
তার পাছে ডিঙ্গা নামে চন্দ্ররেখা।
,,,

তার পাছে চলে ডিঙ্গা নামে মধুকর।

এই ডিঙ্গায়ে চড়িয়াছে চান্দো সওদাগর ॥' -(পৃ- ২৪১-৪৪)

চাঁদের ১৪ ডিঙ্গার নামগুলো হলো- ১. মঙ্গলা, ২, চন্দ্রপাট, ৩. সিন্দুর কটুয়া, ৪. হাসমোড়া, ৫. মগর, ৬. ধুতুরার ফুল, ৭. গৌরাঙ্গা, ৮. সমুদ্র উত্থান, ৯. সুমন্ত বহাল, ১০, সঙ্কুচুর, ১১. গরুর মহারথী, ১২. সিংহমুখ, ১৩. চন্দ্ররেখা এবং ১৪. মধুকর প্রভৃতি।

রপ্তানি পণ্য

বাণিজ্য দ্রব্যের মধ্যে বাংলা থেকে সাধারণত খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল, পশুপাখি, মসলা, বস্ত্র ও কারুশিল্পের জিনিসপত্র রপ্তানি করা হতো। চাঁদ সওদাগর দক্ষিণ পাটনে ব্যবসায়ের জন্য নিয়ে যান- চাল, পাটজাত দ্রব্য, চট, রত্ন, প্রবাল, গজমুক্ত, কর্পূর, সুপারি, পান, মসুরি, মুগ, কলাই, মুলা, নারকেল, শুকনো খেজুর, হলুদ, ঘি, মধু, ছাগল, চড়ুই পাখি ও কবুতর প্রভৃতি। যেমন-

"চাউল পাটে খনি রত্ন প্রবাল মণি
গজমুক্তা লইল বিস্তর।
কাপোরিয়া তোলে গরা ইজার মসরির ধরা
আর তোলে চট ঝগরা।

,,,

কলই মুগ মুসুরির থেলা নৌকায় তুলিয়া লইলা
মুলা ভরি লইল অনুপাম।
দ্রব্য উঠায়ে নান মত নারিকেল ভরিল তাত
পাটনে নাহিক যাহার নাম।' -(পৃ- ২৩৮)

এছাড়াও চাঁদ সওদাগর দক্ষিণ পাটনের রাজাকে পরের বছর– ডৈয়া, আমড়া, চালতা, লাউ, বেল, বরই, শটীর মূল, খেজুর ও মাঁদার ফুল, এনে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এসব দ্রব্য-সামগ্রীও বিদেশে রপ্তানি করা হতো।

আমদানি পণ্য

চাঁদ সওদাগর তার পণ্যের সঙ্গে বিনিময় পদ্ধতিতে (Burter system) যে সকল পণ্য দেশে নিয়ে আসেন তা অনেকটাই অভিজাত শ্রেণির বিলাস-সামগ্রীর পর্যায়ে পড়ে। টাকার মূল্যে তার দাম অনেক হলেও সমাজ জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা ছিল স্বল্প। কারণ সমাজের নগণ্য অনুৎপাদনশীল অভিজাত শ্রেণির তুলোনায় বৃহৎ উৎপাদনশীল শ্রমজীবী শ্রেণির তেমন কোন কাজে লাগতো না। এসব পন্যের মধ্যে ছিল- শঙ্খ, হীরা-মাণিক্য, হাঁতির দাঁত, স্বর্ণ, মুক্তা, হিঙ্গুল, লবঙ্গ, জয়ফল, হরিণ, পিতলের থালা, খরগোস ও মদ বা সুরা অন্যতম। যেমন-

"নারিকেল হেনফল শঙ্খ তার বদল।

,,,

পাকৈর বদলে ছিল হিরামন মানিক।

,,,

মুলার যতেক গুণ কহন না যায়ে।
গজ হস্তীর দন্ত বদল দিলেন রাজায়ে ॥

,,,

বিক্রমে কিশোর রাজা ধনের নাহি উনা।

হরিদ্রা বদলে খোজিয়া লইল সোনা ॥

,,,

কলই খাইয়া রাজা কৌতুক বিশাল।
এহার বদলে দিল মুকুতা প্রবাল ॥

,,,

মোসুর বদলে লইল হিঙ্গল সকল।
নওস বদলে লইল লঙ্গ জাতিফল ॥
ছাগল বদলে লইল হরিণ যে ভাল।
বারকোস বদলে পীতলের থাল ॥
কুকুর বদলে মেড়া লইয়া বড়খোস।
ঘৃত মধু বদলে লইল বাটী বাটী রস ॥”

,,,

কবুতর বদলে সাড়াব (সরাব) ভাল দেখি।
চড়া (চড়ুই) বদলে লইল ময়না হেন পাখি ॥” -(পৃ-২৬৭-২৭৫)

উপর্যুক্ত ছাগলের বদলে হরিণ, ঘি-মধুর বদলে রস এবং কবুতরের বদলে মদ ও সরাব প্রভৃতি দ্রব্য যে বিত্তবান অভিজাত শ্রেণি আমোদ উল্লাস ও ভোগের জন্যই আমদানি করা হতো এতে কোন সন্দেহ নেই।

মুদ্রা ও বিনিময় প্রথা

তৎকালীন গ্রাম বাংলা ছিল স্বয়ং সম্পূর্ণ। এ কারণেই মূলত বিনিময় প্রথার (Burter system) উদ্ভব ঘটে। দুটি বস্তুর মূল্যমানের কাছাকাছি দ্রব্যের মধ্যে এ বিনিময় হবার কথা থাকলেও তা ছিল বেশ জটিল ও ত্রুটিযুক্ত। এরপর স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, তঙ্কা, কড়ি ও টাকার প্রচলন হয়। ধারণা করা হয় অষ্টম শতাব্দীর পর বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবনতি ঘটলে স্বর্ণ-রৌপ্যের দুস্প্রাপ্যতার জন্যই কড়ির প্রচলন করা হয়। চাঁদ সওদাগরেরের বিনিময় প্রথায় প্রাপ্ত দ্রব্যগুলোর তালিকা-

“মুলার যতেক গুণ কহন না যায়ে।
গজ হস্তীর দন্ত বদল দিলেন রাজায়ে ॥

,,,

বিক্রমে কিশোর রাজা ধনের নাহি উনা।
হিরদ্রা বদলে খোজিয়া লইল সোনা ॥

,,,

কলই লইয়া রাজা কৌতুক বিশাল।
এহার বদলে দিল মুকুতা প্রবাল ॥

,,,

ছাগল বদলে লইল হরিণ যে ভাল।
বারকোস বদলে পীতলের থাল ॥
কুকুর বদলে মেড়া লইয়া বড়খোস।
ঘৃত মধু বদলে লইল বাটী বাটী রস ॥

কবুতর বদলে সাড়াব (সরাব) ভাল দেখি।

চড়া (চড়ুই) বদলে লইল ময়না হেন পাখি ॥" -(পৃ-২৬৭-২৭৫)

উপর্যুক্ত বস্তু বা দ্রব্য বিনিময় ক্ষেত্রে মনে হতে পারে চতুর চাঁদ কথার চাতুর্যে দক্ষিণ পাটনের রাজাকে বোকা বানিয়ে অধিক লাভবান হয়েছেন। আসলে মূল কারণটি বোধ হয় অন্য, কেননা সমযোগ্য বস্তুর মিলবিন্যাসের (Massing) অভাব বা সীমাবদ্ধতার কারণেই এরূপ ঘটেছে।

মুদ্রা হিসেবে কড়ি

তৎকালীন বাংলায় মুদ্রার বিকল্প হিসেবে কড়ি ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে শিব তাই বলেছেন–

'হাত সানে মহাদেব ডাকে বারে বার।

কৌড়ি লইয়া ডুমনি আমারে কর পার ॥' -(পৃ-৩৩)

গণনা পদ্ধতি

তৎকালীন সমাজে ভূমির গণনার একক হিসেবে সাধারণত কড়া, গণ্ডা, পণ, রেখা, ষষ্ঠী, পোয়া, কেয়ার ও হল ব্যবহার করা হতো। আবার মুদ্রামান হিসেবে কড়ি, পণ, গণ্ডা, কড়া, গুটি, গুঁড়া, ঘুটি ও কাহন প্রভৃতি প্রচলিত ছিল।

"এক বোঝা কাষ্ঠ বেচিলাম চারি পোন।

এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু।

এক পোন দিয়া আমি চিড়া-কেনা খামু ॥

এক পোন দিয়া আমি নটী-নৃত্য চাব।

এক পোন দিয়া আমি সোনকা ভেটিব ॥' -(পৃ- ২৯২)

ওজন পদ্ধতি

বস্তুর ওজনের মান হিসেবে- তুলা, রতি, সটাক, পোয়া, সের ও মণ প্রচলিত ছিল। ওজন করতে দাড়িপাল্লা বা বাটখাড়া ব্যবহৃত হতো। লখিন্দরের লোহার বাসর ঘর তৈরিতে এ বাটখাড়ার ব্যবহার দেখা যায়–

'এতেক শুনিয়া চান্দো কামারের বচন।

যুখিয়া মাপিয়া ভিটা করহ ওজন ॥' –(পৃ- ৩৫০)

পরিমাপ পদ্ধতি

বস্তুর আকার আকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে- দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা ও ব্যাস প্রচলিত ছিল। আবার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে গজ ও হাতের মাপ ব্যবহৃত হতো। লখিন্দরের সুরক্ষায় নির্মিত লোহার বাসর ঘরের আয়তন ছিল-

'এতেক শুনিয়া চান্দো কামারের বচন।

বুঝিয়া মাপিয়া ভিটা করহ ওজন ॥

আপনার হস্তে মাপ উভে সাত গজ।

দৈর্ঘ্যে নও গজ প্রমাণ আড়ে ছয় গজ ॥' -(পৃ-৩৫০)

সুতরাং দেখা যায়, চাঁদ সওদাগর লোহার ওজন দিয়ে, দৈর্ঘ্য- ৯ গজ, প্রস্থে- ৬ গজ এবং উচ্চতায় ৭ গজ বিশিষ্ট লোহার বাসর ঘর নির্মাণে কামার সর্দার তারাপতিকে নির্দেশ দেন।

হাট-বাজার

বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য যেমন সপ্তগাঁও, সোনারগাঁও, চাটগাঁও ও হুগলী বন্দর গড়ে ওঠেছিল; তেমনি গ্রামের জনসাধারণের দ্রব্য কেনা-বেচার জন্য বিভিন্ন হাট-বাজারের প্রচলন ছিল। এমনি এক শ্রীকলার হাটে সনকা বাজার করতে রতি দাইকে পাঠান। যেমন-

‘পুরোহিত বচনে সোনাই ক্ষেমা দিল চিতে।
রতি ধাইরে পাঠাইল বেসাতি আনিতে ॥
এতেক শুনিল যদি ধাই নামে রতি।
শ্রীকলার হাটে যায়ে করিতে বেসাতি ॥’ -(পৃ-৩১২)

রাজস্ব ব্যবস্থা

ভূমিই হল সামন্ত শাসকের প্রধান অবলম্বন ও আয়ের প্রধান উৎস। রাজা বা সুলতান যদিও ভূমির সঙ্গে যুক্ত নন, তথাপি স্বত্বাধিকারী সূত্রে মধ্যবর্তী বিভিন্ন মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে কৃষকের খাজনা রাজকোষাগারে গিয়ে জমা হতো। বাংলায় বিভিন্ন সময়ে ভূমিস্বত্ব ও ভূমি সম্পর্কের বহু রদবদল হয়েছে এবং রাজস্বের পরিমাণও উঠানামা করেছে, তথাপি কৃষকের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি। কারণ শাসক, আমলাদের ক্রমাগত চাহিদা ও শোষণের শিকার হতে হয়েছে কৃষক সমাজকে। সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় ৩ ধরনের খাজনা প্রচলিত ছিল, যথা- ১. শ্রম খাজনা, ২. দ্রব্যখাজনা ও ৩. মুদ্রাখাজনা। তবে দ্রব্য বা শস্যের চেয়ে টাকা বা মুদ্রায় খাজনা পরিশোধ শাসকদের পছন্দনীয় ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যেও এর পরিচয় মেলে। চাঁদ সওদাগরের দক্ষিণ পাটন যাত্রাকালে জলকরের পরিচয় পাওয়া যায়–

‘মধ্যগাঙ্গে একপুরী দেখিল তখন।
করপুরী দেখি এই সমুদ্র ভিতর।
কেহ বলে ডাকাইতে ভাত রান্ধি খায়।
কেহ বলে রাজা বুঝি জলকর লয় ॥ -(পৃ- ২৫০)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সামাজিক জীবন

মধ্যযুগ ছিল একান্তভাবেই সামন্তবাদী সমাজ। সামন্ত প্রভুর (রাজা বা সুলতান) লক্ষ্যই হলো নিজ শক্তি বা পরাক্রমের মাধ্যমে ভূমি দখল করা। ভূমির সঙ্গে আরেকটি বিষয় জড়িত, তা হলো নারী। কারণ জমি ও জরু (নারী) উভয়েই উর্বরতার প্রতীক এবং উভয়েই শস্য, সন্তান, শক্তি, সমৃদ্ধি বয়ে আনে। সামন্ত শাসক সাধারণত ধর্মকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে জন-সাধারণকে জিম্মি করে রেখে, সবার সামনে বিধাতার বংশধর বা প্রতিনিধি রূপে নিজেকে উপস্থাপন করেন।

সামন্ত শাসকের স্বরূপ

এ সামন্ত শাসকগণ স্বভাবে উগ্রপন্থী, বিশ্বাসে গোড়া, আদর্শে পশ্চাৎমুখী, সংস্কারে অবিশ্বাসী, মানবতার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত এবং নৈতিকতার মানদণ্ডে ইন্দ্রিয়াসক্ত। সামন্ত শাসক একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও ধর্মীয় নেতা বলে জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের মালিক বা অধিকর্তা। তার কথা বা ইচ্ছাই আইন। এ প্রবণতাই মধ্যযুগের সামন্ত প্রভুদের স্বৈরাচারে পরিণত করে তোলে।

হুসেন শাহী শাসনামলে (১৪৯৩-১৫৩৮খ্রি.) প্রশাসনিক স্তরের সর্বোচ্চ শিখরে ছিলেন সামন্ত শাসক বা সুলতান। এরপর থাকতেন জায়গীরদার, রাজস্ব আদায়কারী, গ্রাম পঞ্চায়েত ও কৃষক প্রজা। এ সকল কর্মকর্তা, কর্মচারী ও কৃষকদের মধ্যে আরো বহু বৃত্তিজীবী শ্রেণির অস্তিত্বও সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। প্রশাসনিক বা আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামন্ত প্রভু রাজ্যে শৃঙ্খলা বিধান করেন। নিজ ক্ষমতা ও সিংহাসন রক্ষায় যে কোন বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ও

হুমকি কঠোর হস্তে দমন করেন। এ বিষয়ে তারা সর্বদা থাকেন সজাগ ও সতর্ক। আর এ কারণেই দক্ষিণ পাটনে রাজা চাঁদ সওদাগরের দেয়া নারকেল খেতে ভয় পান। রাজ্য হারানোর ভয়ে রাজা দারোয়ান উসাকে বলেন-

'রাজা বলে উসা তুই শোনহ বচন।
এই ফলটি খাও তুমি আমার সদন ॥
ভিন্ন দেখি সদাগর নহে বুজি কায়্যে।
আমারে মারিয়া পাছে লয়ে এই রাজ্যে ॥' -(পৃ-২১৬)

গবেষক জয়া সেনগুপ্তা দেবী মনসাকে সামন্ত শাসক শক্তির প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। কারণ মনসামঙ্গল কাব্যে মনসার কল্যাণী-বরদা মূর্তির চেয়ে মানবের ওপরে দৈব শক্তির প্রতিষ্ঠা লাভের আপ্রাণ সংগ্রাম এবং মানবের ওপরে দেবতার মহিমা প্রচার করবার রুদ্র প্রয়াসটিই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। এ কাব্যে মানব বিনা দ্বিধায় বিনা প্রশ্নে বিনা প্রতিবাদে দেবীকে মানতে সম্মত হয়নি, বরং যুক্তি দিয়ে-বুদ্ধি দিয়ে দেব মহিমা সম্পর্কে মানব বার বার প্রশ্ন তুলেছে।[৭৬] তাই চাঁদ সওদাগর বলেছেন-

"তুমি বল পদ্মাবতী বর দিতে পারে।
তার কেন কানা চক্ষুর ঔষুধ না করে ॥[৭৭]

পূজা দিতে অবাধ্য, অস্বীকৃত, প্রতিবাদী ও বিদ্রাহী চাঁদকে মনসা নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন-লাঞ্ছনা ও অপমান করেছেন। চাঁদ মনসার পূজার ঘট ও মনসাপুরী ভাঙলে ক্রুদ্ধ হয়ে মনসা বলেছেন-

'পদ্মা বলে নেতা মোর বোল সার।
চান্দের পুত্র কিরূপে করিব সংহার ॥

,,,

বিষদধি লও তুমি পসার ভরিয়া।
দুগ্ধ লইয়া চম্পক নগরে যাও চলিয়া ॥ -(পৃ-১৮৩)

এভাবে মনসা বিষদই খাইয়ে চাঁদের ৬ পুত্রকে মেরেছেন, কূটকৌশলে চাঁদের ডান হাত ধন্বন্তরি ওঝাকে হত্যা করেছেন, ছলনা করে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেছেন, নৌকা ডুবিয়ে সর্বস্বান্ত করে লাঞ্ছিত করেছেন এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে জীবিত একমাত্র পুত্র লখিন্দরকে বাসর রাতে হত্যা করে চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেছেন। শুধু পূজা দিতে অস্বীকৃতি জানানোর জন্য নয়, কিংবা মনসাকে নানা কূটক্তি করার জন্যও নয়, বরং ক্ষমতা, প্রতাপ, ধন-ঐশ্বর্যে চাঁদ মনসার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই মনসা চাঁদ প্রসঙ্গে বলেছেন-

'মনুষ্য জাতি চান্দ বেটা ধরে রাজছত্র।
মনুষ্য হইয়া বলে দেবতার পুত্র ॥' -(পৃ-১৯৫)

অত্যাচারী শাসক শক্তির প্রতীক দেবী-মনসা। নিগৃহীত-নিপীড়িত, শাসিত সমাজের প্রতিভূ মানব চাঁদ সওদাগর। শাসিত সমাজে প্রতিভূ মানব তার সমগ্র শক্তি দিয়ে শাসক শক্তির প্রতীক দৈবশক্তিকে প্রতিরোধ করবার প্রয়াস পেয়েছে। যার জন্য তার ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক জীবনে নেমে এসেছে চরম বিপর্যয়, অর্থনৈতিক জীবনে অপূরনীয় ক্ষতি, সমাজের কাছে হয়েছে হেয়, হয়েছে লাঞ্ছিত। কিন্তু তবুও শেষ শক্তি দিয়ে মানব দৈব শক্তিকে প্রতিহত করবার প্রয়াস পেয়েছে।[৭৮]

বর্ণবাদী সামাজিক স্তর বিন্যাস

মধ্যযুগে বাংলার সমাজ একান্তভাবে চতুর্বর্ণীয় (ব্রাক্ষ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ও চতুর্বর্গীয় (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) উপাত্ত দ্বারা শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো। কারণ বৌদ্ধ পালরাজা, ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী সেনরাজা এবং মুসলমান

পাঠান ও মুঘল সম্রাটদের শাসনামলে বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতা ও সামাজিক মর্যাদা একচ্ছত্রভাবে যে গোষ্ঠী বা শ্রেণি ভোগ করে এসেছে, তারা মূলত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। আর অল্প পরিসরে বৈদ্য ও কায়স্থগণ। ব্রাহ্মণদের অবস্থান রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনো কখনো উঠা-নামা করলেও সামাজিক সম্মান ও মর্যাদা প্রায় অপরিবর্তিত ছিল। এর মূল তাৎপর্য হল, বাংলাদেশের সমাজের মৌল কাঠামোর প্রধান উপাদান যেমন- ভূমি ব্যবস্থা, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে বরাবর উচ্চ জাতি বর্ণভুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল। আর এ উচ্চজাতি বর্ণভুক্তদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের ছিল নিরঙ্কুশ আধিপত্য। এর পেছনের কারণটি হচ্ছে- ব্রাহ্মণরা সমাজে প্রভুত্ব করার ধর্মীয় তত্ত্বগত স্বীকৃত পেয়েছিল নানাভাবে। কর্মসূত্রে নয়, বরং জন্মসূত্রেই এ চতুর্বর্ণীয় সমাজের অবস্থান-মর্যাদা পুরুষানুক্রমিক ভাবে চালিয়ে দেয়া হয়। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের সন্তান ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের সন্তান বৈশ্য এবং শূদ্রের সন্তান শূদ্র হিসেবে যথাক্রমে ধর্মীয় কর্মযজ্ঞ, যুদ্ধ, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সেবামূলক কাজ করে যাবে। ফলে সমাজের কেন্দ্র বা মূল ক্ষমতায় থাকতেন ব্রাহ্মণ। রাজা ক্ষত্রিয় বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন হলেও ব্রাহ্মণের বিধান মতেই তাকে চলতে হতো।

কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার চিত্ররূপ দিলে এরূপ দাঁড়ায়-

বর্ণবিন্যাসের এ শ্রেণিচেতনায় ব্রাহ্মণরা রয়ে যায় সমাজের উচ্চ শ্রেণির সামাজিক মর্যাদায়। কারণ- বর্ণ বিন্যাসের এ তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছিল ধর্মীয় বাতাবরণে ও সৃষ্টিকর্তার নামে–

> 'গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এ চারবর্ণের সৃষ্টি করেছি। ,,, এ বিভাগ মানুষের কৃত নয়।' –(অতুল চন্দ্র সেনঃ শ্রীমদ্ভগবদ গীতা; ১৯৭৫, পৃ-১৮৪)

এভাবে ব্রাহ্মণগণ সমাজ কাঠামোর সকল ক্ষেত্রে অনমনীয় ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। আবার অনেক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে, বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোতে দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। যেমন- এক ব্রাহ্মণ আর বাদবাকি সব শূদ্র-অন্ত্যজ। এ ব্রাত্য বা অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যে পড়ে– ডোম, চণ্ডাল, হাড়ি, কসাই ও ম্লেচ্ছ গোত্রের মানুষ।[৭৯] এ সমাজ কাঠামোর ক্ষমতার শীর্ষ থেকে নিম্ন পর্যন্ত দাঁড় করালে অনেকটা পিরামিডের মতো দেখায়-

অর্থাৎ সর্বোচ্চ চূড়ায় ব্রাহ্মণ এবং একেবারে নিচে শূদ্র আর তারও নিচে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য শ্রেণি। এরা কোন বর্ণের আওতায়ই পড়ে না। রণজিৎ গুহ ও গায়ত্রী চক্রবর্তী এ শ্রেণিকে তাই বলেছেন- 'Sub-altern class' বা 'প্রান্তজন বাসী'। অর্থাৎ যারা ভদ্র সমাজের প্রান্তসীমায় বা বাইরে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এ অন্ত্যজ শ্রেণি সম্পর্কে আল বিরুনী বলেছেন- চণ্ডাল ব্যতিত অন্য আর সবাই হিন্দু না হলে, ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত হয়। ম্লেচ্ছ অর্থ কলুষিত; যারা প্রাণি হত্যা, পশু বধ ও গোমাংস ভক্ষণ করে।[৮০]

এভাবে সমাজে একটাই বর্ণ (ব্রাহ্মণ্য বর্ণ), একটাই ধর্ম (ব্রাহ্মণ্য ধর্ম) এবং একটাই আদর্শ (ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ) প্রভুত্ব ও প্রাধান্য বিস্তার করে ফেলে। এদিক থেকে রাজা বা সামন্ত শাসকের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল ধর্মীয় নিয়মসমূহ সে দিক থেকে পালিত হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) সম্প্রদায়ের আধিপত্যকে সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করা। এভাবে রাজা বা সামন্ত ব্যবস্থার সমর্থন যোগাতো ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে ধর্ম, অন্যদিকে রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থাও টিকিয়ে রাখতো ধর্ম এবং ব্রাহ্মণদের সামাজিক গুরুত্বকে। এ ব্রাহ্মণদের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করতে গিয়ে নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন–

> "ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভূমি নির্ভর সামন্ত প্রথার প্রতিষ্ঠায় এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সংস্কার ও সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দুইটি শ্রেণির সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইল একটি বহুস্তরবদ্ধ ভূম্যাধিকারী শ্রেণি এবং আর একটি জ্ঞান ধর্মজীবী শ্রেণির সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ। ,,, জ্ঞান ধর্মজীবী ব্রাহ্মণদের জীবিকা নির্ভর ছিল ধর্মদেয়, ব্রহ্মদেয় ভূমি ও দক্ষিণা পুরস্কারলব্ধ অর্থ। এই ভূমি অর্থ প্রাপ্তি নির্ভর করিত এক দিকে রাষ্ট্র ও অন্যদিকে অভিজাত ভূম্যাধিকারী শ্রেণির কৃপার উপর। কাজেই ব্রাহ্মণরা এই দুয়েরই পোষক ও সমর্থক হইবেন। ইহাই তো স্বাভাবিক।"[৮১]

মনসামঙ্গল কাব্যে ব্রাহ্মণদের কতগুলো পেশায় ও অবস্থানে সক্রিয় থাকতে দেখা যায়। যেমন-[৮২]

১. বিত্তবান সামন্ত ২. রাজার উপদেষ্টা ৩. কুল পুরোহিত ৪. ধর্মীয় আচরণ প্রদর্শক ৫. অধ্যাপনা ৬. জোতিষী গণক ৭. কুলপণ্ডিত এবং ৮. ঘটক প্রভৃতি।

রাজ উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ

এ ব্রাহ্মণরা চাঁদ সওদাগরের ঘনিষ্ঠজন, পরামর্শক ও উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। সোমাই পণ্ডিত, রোঙ্গাই পণ্ডিতরা চাঁদ সওদাগরের ওপর প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তি খাটাতে দেখা যায়। এদের উপস্থিতি কেবল চাঁদের দরবারে সীমাবদ্ধ নয় বরং বাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্বের চরম প্রকাশ দেখা যায় রাজ্য শাসনভার হাতে নেবার মাধ্যমে। চাঁদ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ পাটন যাত্রাকালে ব্রাহ্মণ সোমাই পণ্ডিতের হাতে অস্থায়ীভাবে রাজ্য শাসনভার অর্পণ করে যান। তাই চাঁদ বলেছেন–

'চান্দো বলে শুন সোমাই আমার বচন।
দেশ ছাড়ি যাব আমি দক্ষিণ পাটন ॥
দেশের যত ভার দিলাম তোমার তরে।
সর্ব্বলোকে পালন করিও আমার অগোচরে ॥' -(পৃ- ২৩৭)

বৈদ্য/ওঝা ব্রাহ্মণ

ধন্বন্তরী ওঝা শঙ্কুর গারুড়ির ওপর চাঁদ অনেকাংশেই নির্ভর করতেন। এ ব্রাহ্মণ ছিলেন চাঁদের ডান হাত স্বরূপ। মনসা চাঁদের গুয়াবাড়ির নন্দনকানন ধ্বংস করলে চাঁদ অনুচর ধনাকে দিয়ে ধন্বন্তরী ওঝাকে ডেকে পাঠান-

'চান্দ বোলে ধনা শীঘ্র গতি চল।
সঙ্কুর গাড়ির মোর মিত্র আছে বল ॥

তাহান ঠাই বল গিয়া এইসব কথা।
মন্ত্রবলে জিয়াইবে নাহিক অন্যথা ॥' -(পৃ-১৫৪)

ঘটক ব্রাহ্মণ

চম্পক নগরের সোমাই ব্রাহ্মণ ঘটক পেশায়ও পারদর্শী ছিলেন। লখিন্দর বেহুলার বিয়ের ঘটকালী হয় তার মাধ্যমেই। তাই চাঁদের কথায় পাত্রীর সন্ধান দিতে গিয়ে বলেছেন-

'কোথায় আছে যোগ্য কন্যা কহ বিপ্রবর।
হেন কালে কহিলেক সোমাই পণ্ডিত।
কাহিতে লাগিল তবে সভার বিদিত ॥
সাহে নামে সওদাগর উজানিতে ঘর।
তার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দর ॥' -(পৃ-৩১৯)

জ্যোতিষী ব্রাহ্মণ

আবার বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ের দিন ধার্য করার জন্য দিন-ক্ষণ-লগ্নের শুভ-অশুভ বিচার করতে ডাকা হয় মুকাই পণ্ডিতকে। তাই চাঁদ বলেছেন–

'সাহে বলে গণক আনি দিন ধার্য্য কর।
মুকাই গণক বলি চান্দো ডাকে উচ্চস্বরে।
পাঁজি হাতে করি আইল চান্দের গোচরে ॥
পাঁজি বিচারিয়া তবে নাহি দেখে ভাল।
বিবাহের দিনে দেখে সর্পের জঞ্জাল ॥' -(পৃ-৩৩২)

পণ্ডিত ব্রাহ্মণ

এছাড়া কুলপুরোহিত ও গৃহ শিক্ষক হিসেবেও অধ্যাপক ব্রাহ্মণ নিয়োজিত হতেন। লখিন্দরের গৃহ শিক্ষক ছিলেন সোমাই পণ্ডিত। যেমন–

'সম্বাদিয়া আনে তবে সোমাই ব্রাহ্মণ।
সোনকার মনে যুক্তি করিল তক্ষণ ॥
,,,
পঞ্চম বৎসরে যদি লখিন্দর হইল।
হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে হইল।' -(পৃ-৩০৩)

এসব পেশা ছাড়াও নিম্ন সম্মানের বা বৃত্তিধারী কিছু ব্রাহ্মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ, দুঃখিত ব্রাহ্মণ, কুশকাটা বামন (ব্রাহ্মণ) অন্যতম। মনসার স্বামী জরৎকারুও ছিলেন এমনই একজন দুঃখিত ও কুশকাটা ব্রাহ্মণ। স্বামীকে কটাক্ষ করে মনসা তাই বলেছেন–

'আমার নিন্দা কর তুমি দুঃখিত ব্রাহ্মণ।
চক্ষু মেলি দেখ তুমি আমার বিক্রম ॥' -(পৃ-৮৬)

সাধারণত ব্রাহ্মণগণ কায়িক পরিশ্রম তেমন করতো না বললেই চলে। কৃষি ও শিল্পে এদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত। নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি উৎপাদন কাজে নিয়োজিত থাকতো। কিন্তু ব্রাহ্মণরা এতে অংশ না নিয়ে বরং

পরজীবী শ্রেণিতে পরিণত হয়। শ্রমজীবীদের ঘামেই এদের খোরাক জুটতো। শ্রমজীবীদের উৎপাদনে জোরপূর্বক ভাগ বসাতো। এ আদায় কর্মে জড়িত থাকতো রাষ্ট্র বা সামন্ত শক্তি, যা ধর্মের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ছিল।

বণিক সমাজ

বাংলার সমাজ জীবনে বণিক সম্প্রদায় এক বিশেষ মর্যাদা, সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। কালক্রমে বণিকদের লক্ষ্মীভাগ্য রাজভাগ্যে উন্নীত হয়। সেন আমলে বণিক সম্প্রদায়ের (সুবর্ণ বণিকদের) প্রভাব কিছুটা কমে আসলেও পরবর্তীকালে বাংলার নবাবী আমলে তা বহুগুণে বেড়ে যায়। বাংলার বণিক সমাজ অর্থ বিত্তের বিবেচনাতেই একসময় শ্রেষ্ঠী, নগরশ্রেষ্ঠী, মহাজন, সাহা, সাধু, বণিক, বেনিয়া, সওদাগর, মণ্ডল ও বেপারী অভিধায় পরিচিতি লাভ করেন। বাংলার সমাজ কাঠামোতে এ বণিক শ্রেণির উদ্ভব, প্রতিষ্ঠা ও বিকাশের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। সমাজ বিজ্ঞানীগণ মনে করেন, ষষ্ঠ শতক থেকেই বাংলার গাঙ্গেয় উপত্যকায় সমাজ কাঠামোয় যে বিত্তবান শ্রেণির উদ্ভব ঘটেছিল, তারা ছিল বণিক। এ বণিকদের প্রসঙ্গে ডি.ডি কৌশাম্বী বলেছেন-

> "The traders had become so wealthy that the most important person in an eastern town was generally 'sresti'. The term not known earlier, is derived from the word for 'superior' or 'pre-eminent'. The 'sreti' was actually a financiar or banker; sometimes the head of a trade guild. Even absolute deseptic kings treated these 'srestis' with respect through they had no direct voice in politics.''[৮৩]

আর বর্ণনির্ভর বৃত্তির দেশে বাংলাদেশে এ বণিকশ্রেণির সুযোগ সম্মান বৃদ্ধির অর্থ একটি বিশেষ বর্ণেরই অর্থনৈতিক তথা সামাজিক জয়যাত্রার ইতিহাস।[৮৪] ঋগ্বেদে 'পণি' নামক যে শব্দ পাওয়া যায়, ধারণা করা হয় এ 'পণি' শব্দটি 'পণ্য' শব্দ থেকে উদ্ভূত। এ 'পণি' থেকেই 'বণিক' শব্দের উদ্ভব ঘটেছে। আর্যগণ পূর্বাঞ্চলের একটি শ্রেণিকে 'পণি' বলে গালি দিচ্ছে। বৈদিক সাহিত্য থেকে বলা যায়–

> 'পণিরা ধনী এবং উদ্যমী বণিক শ্রেণি ছিল। এদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল লাভ, তা যে ব্যবসায়েই হোক বা ঋণ দিয়ে হোক। এদের ঋণদাতাকে মহাজন বা বেকনাট বলা হয়েছে।'[৮৫]

বৃত্তি বা পেশার সহজাত বৈশিষ্ট্য হিসেবে এ মহাজনীর সঙ্গে সুদ, শোষণ, প্রতারণা, মিথ্যা ও ক্ষেত্রবিশেষ চুরির বিষয় জড়িত থাকতো বলে; এদের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বিরাজ করতো। বাংলার সমাজ কাঠামোতে এ মহাজন, বণিক ও সাহাদের অবস্থান নির্দেশ করা সম্ভব। এদেরকে জায়গীরদার ও জমিদারদের সঙ্গেই স্থান দিতে হয়। কারণ সুবর্ণ বণিক বল্লভানন্দ ও জগৎ শেঠ এর মতো বণিক ব্যাংকারগণ সমকালে রাজা নবাবদের সঙ্গেই প্রায় সমান প্রভাব প্রতিপত্তি ও সম্মান ভোগ করতেন। কারণ-

> 'মহাজনী ব্যবসাটা ছিল একমাত্র বণিকদের হাতে। মহাজনী নিছক বৃত্তি হিসেবে একটা বর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং সে বর্ণই হল বানিয়া।'[৮৬]

গৌতম ভদ্র মনে করেন এ মহাজনী প্রথা সমাজে আরো গভীরভাবে প্রচলিত ছিল। কারণ-

> 'অষ্টাদশ শতকে বাংলাদেশেও আমরা যেসব মহাজনের নাম পাই, তাতে সোনার বেনে থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত প্রায় সকল বর্ণের ও সম্প্রদায়ের লোকেরাই আছে। ,,, গ্রামীণ সমাজের কিছুটা সম্পন্ন লোকই মহাজনী ব্যবসায়ে হাত দিত- এটা মনে করা খুব আযৌক্তিক হবে না।'[৮৭]

মোট কথা, মনসামঙ্গলের গ্রামীণ সমাজ কাঠামো সামন্ত রাজা, রাজস্ব আদায়কারী ও মহাজন ব্যবসায়ীরা সকলে ছিল একটি শোষক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত এবং কৃষক-মজুরসহ বাকি সকল স্তরের মানুষেরা ছিল শোষিত শ্রেণির অন্তর্গত। 'মনসামঙ্গল' কাব্যে বণিকদের যে 'সাহা' বলা হতো- তার অস্তিত্বও বাংলার সমাজ কাঠামাতে পাওয়া যায়। সাহাদের সম্পর্ক লগ্নি পুঁজির সঙ্গে। লগ্নিপুঁজি একটি সুদখোর ও শোষণমূলক ব্যবসা, যার সঙ্গে বাংলার এক শ্রেণির হিন্দু বণিক জড়িত ছিল। কারণ ইসলাম ধর্মের মতো হিন্দু ধর্মে সুদি কারবার নিষিদ্ধ না থাকায় এ ব্যবসায় হিন্দু সমাজের অনেকে ফুলে-ফেঁপে ওঠেন। সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতিতে এ ধরনের লগ্নিপুজির বিকাশ সম্পর্কে বিখ্যাত দার্শানিক কার্লমার্ক্স বাংলাদেশের সাহা বণিকদের বেশ মিল খুঁজে পাওয়ার কথা বলেছেন–

> 'Interest bearing capital or as we may call it in its antiquated form usures's capital, belongs together with its too in brother, merchants capital, to the antiediluvian forms of capital, which long precede the capitalist mode of production and are to be found in the most diverse economic formations of society. The existence of usurer's capital merely requires that at least a portion of products should be transformed into commodities and that money should have developed in its various functions along with trade in commodities. ,,, The merchant borrows money in order to make a profit with it, in order to use it as capital, that is to expend it.'[৮৮]

ধর্মীয় বিধি-নিষেধ না থাকা এবং শাসক সমাজের আনুকূল্য পেয়ে বণিক সাহারা এ লগ্নিপুঁজির ব্যবসায় একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করে। এ প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব বলেছেন-

> 'The Hindu rich peasants and commercial castes who were religiously sanctioned to do usury ,,, the formation of a separate class of professional usuress who constitute a group of rural exploiters in medieval Bengal may be the mark of a certain economic development of society.''[৮৯]

বাংলার সামাজিক ইতিহাসে এ বণিক মহাজন সাহাদের সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া যায়, মনসামঙ্গল কাব্যেও এর চিত্র পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগরের শাসকসুলভ ও শোষণমূলক আচরণ এ পর্যায়ে আলোচনা করে দেখা যাক।

মনসামঙ্গল কাব্যের নায়ক বণিক চাঁদ সওদাগর কোথাও রাজা, কোথাও সওদাগর। বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রক, ধনোৎপাদনে বিশেষভাবে সহায়ক, বণিক শ্রেণি তাদের সঞ্চিত অর্থের আনুকূল্যে শাসনমন্ত্র রাজা সঙ্গে খুব নিকট অবস্থান লাভ করেছিল। ,,, যার ফলে চাঁদ সওদাগর কোথাও স্বয়ং রাজা, কোথাও বা রাজার অব্যবহিত পরের স্থানটির অধিকারী। ধন-ঐশ্বর্যে, বিত্ত-বিলাসে, সম্মান-সৌভাগ্যে এবং মান ও মর্যাদায় সমাজে রাজার মতোই প্রতাপ-প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার সম্পর্কে মনসার উক্তিটিই প্রণিধানযোগ্য–

> 'মনুষ্য জাতি চান্দ বেটা ধরে রাজছত্র।
> মুনষ্য হইয়া বলে দেবতার পুত্র ॥' -(পৃ-১৯৫)

তৎকালীন সমাজে ধন-সম্পদ বণ্টনে অসমতা থাকায় বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। চাঁদ সওদাগর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রভূত ধন-সম্পদের মালিক ছিলেন। তাই তিনি ধন-ঐশ্বর্যের দাপটে গর্ব করে বলেছেন-

> 'চান্দ বলে শুন দ্বিজ আমার বচন।
> আমার বাপ জীব সাধু ধনের ঈশ্বর।

হীরামনি মানিক্য আনি ভরিল চৌদ্দ ঘর ॥

,,,

ধনে মহাধনী হইলে সর্বোলোকে বশ।

বাহুতে অর্জ্জিয়া ধন খাইতে বড় রস ॥' -(পৃ-২৩৭)

চাঁদ সওদাগর চম্পক নগরে রাজার মতোই বসবাস করতেন। এ কারণেই তিনি তার রাজ্যে মনসা পূজা বন্ধন করে দেন এবং মনসার ঘট ও পুরী ধ্বংস করতে সক্ষম হন। তার সম্পর্কে মনসার অভিযোগ–

'চান্দো সওদাগর বেটা চম্পকিয়া রাজা।

চম্পক নগরে বেটা মানা করে পূজা ॥' -(পৃ-৪৯৮)

আবার চাঁদ সওদাগর শুধু ধন-ঐশ্বর্য ও নৌকার মালিকই ছিলেন না। বরং বিশাল লাঠিয়াল, পাইকবাহিনী এবং হাতি, ঘোড়ার অধিকারী ছিলেন। বেহুলাকে দেখতে যাবার সময় এবং লখিন্দরের বর যাত্রার সময় এ বিষয়টি ধরা পড়ে। যেমন-

পাত্র মিত্র পুরোহিত করিয়া সঙ্গতি।

কন্যা জড়িবারে যায়ে চান্দো অধিপতি ॥

সৈন্য সামন্ত হস্তি ঘোড়া চলিল বিস্তর।

হস্তীর পৃষ্ঠে চড়ি যায়ে সাধুর কোয়র ॥' -(পৃ-৩১৯-৩২০)

এ বর যাত্রার বর্ণনায় কিছুটা অতিরঞ্জন আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু বিভিন্ন সৈন্যবাহিনী, বৃত্তিজীবী লোক, হাতি-ঘোড়ার বহর ও ঢাক-ঢোলের সমারোহে তা যুদ্ধ যাত্রা বলে মনে হয়। এসব আয়োজন চাঁদ সওদাগরকে রাজার শ্রেণিতে উন্নীত করেছে নিঃসন্দেহে। চাঁদ সওদাগরের এ রাজকীয় ক্ষমতা ও সামাজিক অবস্থানকে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা আরো সুসংহত করেছে। কারণ বণিকরা নিজেদের স্বার্থেই ধর্ম তথা ব্রাহ্মণদের কাছে টেনে এনেছেন এবং স্বপক্ষে ব্যবহার করেছেন। সমাজের অর্থনীতি বণিকরা নিয়ন্ত্রণ করলেও বর্ণ বিন্যাসে তারা ছিল ব্রাহ্মণদের নিচে। তাই বণিকদের প্রয়োজন পড়েছিল ধর্মকে টেনে রাখা, সামনে রাখা। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ পুরোহিত বণিক সমাজের মধ্যে একটি আপসরফা সাধিত হয়। নীহাররঞ্জনের ভাষায়-

'সর্বাগ্রে বণিক, বনিকের সঙ্গে, বণিকের প্রয়োজনেই ধর্ম ও পুরোহিত।'[৯০]

ধর্ম ও বর্ণগত বিচারের বাইরে থেকেও শুধু অর্থ বলের কারণে বাংলার বণিক সম্প্রদায় শাসক ও শোষক শ্রেনিতে পরিণত হয়।

বিভিন্ন বৃত্তিজীবী ও বর্ণজীবী শ্রেণি

বাংলা ও বাঙালির সমাজ কাঠামো বর্ণ ও বৃত্তির ওপর আশ্রয় করেই গড়ে ওঠেছে। বর্ণ বিন্যাস ও শ্রেণিবিন্যাস প্রায় একই মাপকাঠিতে বাঁধা ছিল। বিশেষ করে; বংশগত শ্রমবিকাশের নীতির ওপর যেখানে বাংলাদেশের শ্রেণিসমূহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়েছিল, সেখানে এর পার্থক্য খুব সামান্যই আঁচ করা সম্ভব ছিল। এ প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জনের ব্যাখ্যাটি প্রণিধানযোগ্য-

> 'বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণ নির্ভর। আর বর্ণ ছিল জন্ম নির্ভর। বৃত্তি যেখানে বর্ণ অনুযায়ী সেখানে বর্ণ ও শ্রেণি একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে এবং শ্রেণির মর্যাদাও সেই সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহা বিচিত্র নয়।'[৯১]

এ প্রসঙ্গে সমালোচক যতীন সরকার আর একটু বিস্তৃত করে বলেছেন-

'সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকারের ফলে সৃষ্ট যে শ্রেণি বিভক্তি, ভারতবর্ষে তারই প্রকাশ বর্ণাশ্রমের মধ্যে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় সেই বর্ণাশ্রম প্রথাজাত কর্তৃত্বশীল শক্তি, সে শক্তির দাপটে সমাজের শ্রমজীবী শূদ্র, অন্ত্যজ ও ব্রাত্যরা নিষ্পিষ্ট ও নিগৃহীত।'[৯২]

বাংলার সমাজ কাঠামোতে নিম্ন ও নিম্নতর শূদ্র অন্ত্যজ শ্রেণি শুধু বর্ণ হিসেবেই নয়, বরং অর্থনৈতিক বিচারেও তারা ছিল সমাজের তলের তল (bottom of the bottom) পর্যায়ের মানুষ। এদের প্রায় সকলেই দিনমজুর। এ শ্রেণিকে রণজিৎ গুহ ও গায়ত্রী চক্রবর্তী আন্থোনী গ্রামশির- 'Selections from the prison Notebooks (1971)' গ্রন্থের আলোকে বলেছেন- Subaltern class বা প্রান্তজন বাসী। ভূমিহীন কিংবা অন্যান্য পেশার শ্রমিক।

মনসামঙ্গল কাব্যেও বাঙালি সমাজের বিভিন্ন বর্ণজীবী ও বৃত্তিজীবী শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা হলো- পুরোহিত, পণ্ডিত, কবিরাজ, বৈদ্য, ওঝা, কাজি, মোল্লা, মুসাফির, কৃষক, রাখাল, কামলা, দাওয়াল, গোয়াল, কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, জেলে, বেদে, যোগী, জ্যোতিষী, গণক, ঘটক, তাঁতী, করাতি, ছুতার, রাজমিস্ত্রি, স্বর্ণকার, কারিগর, কাঠুরে, নাবিক, মাঝি, বাদক বা ঢুলি, জাদুকর, বারুই, মালিক, মালাকার, গন্ধবণিক, কুলি, কোদালি, তেলি, অভিনয়শিল্পী, গায়েন, চিত্রগুপ্ত, জুয়ারি, টেটন, চোর, চাকর, দারোয়ান, পেয়াদা, পাইক, লাঠিয়াল, চৌকিদার, সৈনিক, কতোয়াল, ডোম, হাড়ি, পাটুনী, গোয়ালিনী, দাসী, দাই, নটী (অভিনেত্রী), বৈষ্ণবী, বাইজি, খোজা, গণিকা অন্যতম। এ সম্পর্কে আলোচনা নিম্নরূপ-

পুরোহিত

সাধারণ ব্রাহ্মণরাই বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও যজ্ঞের পৌরহিত্য করেন। জন্ম, বিয়ে, মৃত্যু, শ্রাদ্ধ ও পূজার বিধান দেন এবং লোকাচারসমূহ নিজেরাই সম্পন্ন করেন। লখিন্দরের জন্মের পর অন্নপ্রাশন, কর্ণভেদ, নামরাখা এবং চাঁদের ১২ বছর বাণিজ্য উদ্দেশ্যে অজ্ঞাত থাকায় (নদীতে চাঁদের হেতাল ভেসে আসায় মৃত্যু মনে করে) শ্রাদ্ধের বিধান সোমাই পণ্ডিত দিয়েছেন। যেমন-

'দিনে দিনে বর্দ্ধমান হইল লখাই।
এক চিত্তে বর দিল বিষহরি মাই ॥
এক দুই তিন চারি ছয় মাস হইল।
অন্নপ্রাশন হেতু কৌতুক জন্মিল ॥
সম্বাদিয়া আনে তবে সোমাই ব্রাহ্মণ।
সোনকার সনে যুক্তি করিল তক্ষণ ॥
নান্দীমুখ যজ্ঞ আদি করিলেক সুখে।
লখিন্দর নাম রাখি অন্নদিল মুখে ॥' -(পৃ-৩০৩)

পণ্ডিত

ব্রাহ্মণ সোমাই পণ্ডিত লখিন্দরের গৃহ শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। লখিন্দরের পাঁচ বছর বয়সে বিদ্যা শিক্ষা বা হাতেখড়ি দেয়া হয়। যেমন-

'সম্বাদিয়া আনে তবে সোমাই ব্রাহ্মণ।
সোনকার সনে যুক্তি করিল তক্ষণ ॥
,,,
পঞ্চম বৎসরে যদি লখিন্দর হইল।

হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালে কইল ॥' -(পৃ-৩০৩)

জ্যোতিষী

মুকাই পণ্ডিতকে লখিন্দর ও বেহুলার বিয়ের দিন ধার্য করার জন্য লগ্নের শুভ-অশুভ বিচার করার জন্য ডাকা হয়। যেমন-

'মুকাই গণক বলি চান্দো ডাকে উচ্চস্বরে।
পাঁজি হাতে করি আইল চান্দের গোচরে ॥
পাঁজি বিচারিয়া তবে নাহি দেখে ভাল।
বিবাহের দিন দেখে সর্পের জঞ্জাল ॥' –(পৃ-৩৩২)

ঘটক

সোমাই পণ্ডিত চাঁদ সওদাগরকে লখিন্দরের জন্য পাত্রীর সন্ধান দেন। সোমাইয়ের ঘটকালিতে লখিন্দর উজানি নগরের সাহে সওদাগরের মেয়ে বেহুলাকে বিয়ে করে। যেমন-

'হেনকালে কহিলেক সোমাই পণ্ডিত।
কহিতে লাগিল তবে সভার বিদিত ॥
সাহে নামে সওদাগর উজানিতে ঘর।
তার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দর ॥' -(পৃ-৩১৯)

বৈদ্য বা ওঝা

মনসা চাঁদের গুয়াবাড়ির নন্দন কাননের গাছ কেটে ধ্বংস করে ফেললে শঙ্কুর ওঝা তাঁর শক্তিবলে আবার তা পুনর্জীবিত করে তোলেন। যেমন–

'শুনি সঙ্কু মহাবল হাতে লইয়া জল
নন্দন বাড়ি গেলেন চলিয়া।
মহাজ্ঞান স্মরি বসিলেন ধন্বন্তরি
কত গাছ দিলা জিয়াইয়া ॥' -(পৃ-১৫৫)

কাজি

কাজিরা সাধারণত বিচার করতেন। এ প্রভাব-প্রতাপকে কাজে লাগিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের হাসন কাজি তকাই মোল্লার প্ররোচনায় সৈন্য সামন্ত নিয়ে মনসার ঘট-ভেঙে ফেলেন এবং মনসাভক্ত রাখালদের ওপর জুলুম করেন। যেমন-

'হাসন কাজি ঘরে গিয়া দিল ঠেলা।
পেয়াদারে হুকুম দিল ঘর ভাঙ্গি ফেলা ॥
হাসন কাজি বলে পেয়াদাগণ ভাই।
ধরিয়া রাখালগণ আন এই ঠাই ॥' -(পৃ-১২৯)

মোল্লা

মোল্লাগণ মুসলিম সমাজে নামাজে, মিলাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় বিধি-বিধান প্রণয়ন ও পরিচালনা করতেন। মনসামঙ্গল কাব্যে তকাই মোল্লা হাসন কাজির প্রভাবে মনসাভক্ত রাখালদের পূজার ঘট ভেঙে ফেলেন এবং পূজা বন্ধের জন্য কাজির দুই ছেলেকে রাখালদের পেছনে লেলিয়ে দেন। কাজিকে নানাভাবে উত্তেজিত করেন। যেমন-

'তকাই নামে মোল্লা বেটা কাজির সাক্ষাতে।

ইজার পৈরনে তার কালা তক্যা সাথে ॥

,,,

আল্লা আল্লা বলিয়া যায়ে ঘট ভাঙ্গিবার।

হাতে ধরি রাখাল সবে লাগে মারিবার ॥' -(পৃ-১২৯)

কৃষক

কৃষকরা সাধারণত জমি চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। মনসামঙ্গল কাব্যে ভূস্বামী জগাই মণ্ডল তার ধানক্ষেত নিড়ানির কাজে অন্যান্য কৃষক শ্রমিকদের সঙ্গে চাঁদ সওদাগরকেও নিযুক্ত করেন। যেমন-

'এতেক ভাবিয়া মণ্ডল মনে মনে পাছি।

ধান্য নিড়াইতে চান্দোর হাতে দিল কাঁচি ॥' -(পৃ-২৯৫)

দাওয়াল কৃষাণ

দাওয়াল কৃষাণ হলো এমন এক ধরনের শ্রমিক, যারা বিঘাপ্রতি ধান কাটার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে পারিশ্রমিক গ্রহণ করে। ধান সংগ্রহ বা উপার্জনের জন্য এরা নিজ এলাকা থেকে দূর দেশে গমন করে। চাঁদ সওদাগর দক্ষিণ পাটনে যাত্রাকালে ধনার গল্পসূত্রে দক্ষিণ রাজ্যের এসব দাওয়াল কৃষাণের কথা বলেছেন-

'সোনার কাঁচি দিয়া দাওয়ালে ধান দায়ে।

হীরামন মানিক্য তারা রৌদ্রে শুখায়ে ॥' -(পৃ-২৪৬)

জেলে

কৈবর্ত বা জেলে-ধীবররা নদী-নালা, খাল-বিলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। মনসামঙ্গল কাব্যের ঝালু-মালু দুই ভাই গরীব জেলে। যমুনা নদীতে এরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। মনসার বরে তারা নদীতে সোনার ঘট পায় এবং তাদের সৌভাগ্য ফিরে আসে। গোদাও বড়শি দিয়ে নদীতে পাঙ্গাস মাছ ধরে। যেমন-

'ঝালু-মালুরে বোল জাল বাহিবার।

তবে সকল দুঃখ ঘোচিবে তোমার ॥

,,,

জাল লইয়া তখন দুই ভাই চলে।

সুবর্ণের ঘট হইয়া পদ্মা নামে জলে ॥' -(পৃ-১৮৭)

কোদালি

শোভাযাত্রা বা যুদ্ধ যাত্রার সময় গাছপালা কাটা বা আগাছা পরিষ্কার এবং মাটি খুঁড়ার কাজে কোদালির প্রয়োজন হয়। যেমন-

'চল চল করিয়া শিঙ্গাতে দিল ফুক।

হাতে কোদাল করি সাজে হাড়ি লোক ॥' -(পৃ-৪১০)

গন্ধ বণিক

এ শ্রেণির লোকজন বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্য, ভেষজ উদ্ভিদ চাষ ও বিক্রি করে থাকেন। রোগের চিকিৎসা ও সাজ-সজ্জায় প্রসাধনী হিসেবে যা ব্যবহৃত হয়। যেমন-

'নয়শত উট চলে গোটা কত বিক।

তিন হাজার চলিয়াছে গন্ধ বণিক ॥

গন্ধবণিক সব রাজভোগে ভোলা।' -(পৃ-৪১০)

মালি

এ শ্রেণির কাজ হলো বাগানের দেখাশোনা ও পরিচর্যা করা। রাজপ্রাসাদ, সমাধি সৌধ, মসজিদ-মন্দির সংলগ্ন স্থানে বাগান তৈরিতে এদের নিয়োগ করা হয়। এছাড়া ফুলের মালা তৈরি ও সরবরাহ করে। যেমন-

'সুন্দর পরিধান সাথে পুষ্পের ডালি।
একে চাপে চলিয়াছে নওশত মালি ॥' -(পৃ-৪১০)

কামার

কামারেরা লোহা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার তৈজসপত্র তৈরি করে। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর লোহার বাসর ঘর তৈরির জন্য কামার সর্দার তারাপতিকে ডেকে আনেন। ১৪শত কামার কারিগর নিয়ে তারাপতি দ্রুত লখিন্দরের লোহার বাসর নির্মাণ করেন। যেমন-

'ভিটীর ওজন যদি সওদাগর করিল।
তাহা দেখি তারাপতি হরষিত হইল ॥
সকল কামার তবে হইলেক মেলা।
ভাগে ভাগে আনিলেক আঙ্গারের ছালা ॥' -(পৃ-৩৫০)

ছুতার বা কাঠমিস্ত্রি ও করাতি

এরা কাঠ দিয়ে ঘর-বাড়ি, আসবাবপত্র, লাঙল, ঢেঁকি, নৌকা সেতু বা পুল তৈরি করে থাকে। আবার যারা শুধু গাছ চিরাই বা ফাড়ে, তাদের বলে করাতি। যেমন-

'দুইশত ছুতার চলে তিনশত করাতি।
তিনশত কারিকর চলে এগারশত তাঁতী ॥' -(পৃ-৪১০)

তাঁতি বা জোলা বা কারিগর

এরা সুতা দিয়ে নানারকম লুঙ্গি, শাড়ি, ধুতি, গামছা, ওড়না, চাদর, শালসহ নানারকম বস্ত্র তৈরি করে। সমাজে এদের সম্মানজনক অবস্থান ছিল না। এ বস্ত্র কারিগরদের অবজ্ঞা করে জোলা বলা হতো। এদের কাজের বর্ণনা দিতে গিয়ে চাঁদ সওদাগর বলেছেন-

'আমার দেশে একজাতি জনকত আছে তাঁতি
বলিতে অনেক দিন লাগে।
কেবল ধীরের কাম বস্ত্র বড় অনুপণ
প্রাণসত্তি ভাঙ্গিলে না চিরে ॥' -(পৃ-২৭৩)

ধোপা

এরা মানুষের কাপড়- চোপড় ধুয়ে দেয়। সাধারণত সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষই এদের গ্রাহক। ধোপাদের আবার রজক বলা হয়। মনসার কাপড় ধুতো ধনপতির মা নেতা। নেতাকে খুশি করার জন্য বেহুলাও নেতার সঙ্গে ক্ষার-চুন দিয়ে কাপড় ধুয়েছে। যেমন-

'প্রভাত সময়ে কাক ডাকে উচ্চস্বরে।
দেবের কাপড় লইয়া নেতা যায়ে সরোবরে ॥
,,,
নেতা হতে বেউলার অনেক গুণ আছে।
খাড়চুন দিয়া আগে খান কত কাচে ॥' -(পৃ-৪৭)

এদের নরসুন্দর বলা হয়। এরা মানুষের ক্ষৌরকর্ম (চুল কাটা, শেভ বা দাড়ি-গোঁফ কাটা) করে থাকে। আবার বিয়েতে বর ও কনের নখ-নাপিতকে দিয়েই কাটাতে হয়। একসময় নাপিতরা ফোঁড়াও কাটতো। বিয়ের সময় লখিন্দরের হাত-পায়ের নখ নাপিত দিয়ে কাটানো হয়। যেমন-

'জয়ে জয়ে গুড়াগুড়ি মঙ্গল বাদ্য গীত।
করিলা খেউর কর্ম্ম সাধুর নাপিত ॥' -(পৃ-৩৬৪)

কুমার

এ শ্রেণির লোকজন মাটি দিয়ে হাড়ি-পাতিল, কলস, থালা, বাসন, প্রদীপ ও প্রতিমা তৈরি করে থাকে। যেমন-

'চারিশত কুমার চলে হইয়া হরষিত।
সাধু সঙ্গে চলিয়াছে শতেক নাপিত ॥' -(পৃ-৩৬৯)

সুবর্ণ বণিক

এরা স্বর্ণ ও রূপা দিয়ে নারী-পুরুষের নানা রকম অলংকার তৈরি করেন। স্বর্ণচুরি করার দায়ে সেন রাজা বল্লাল সেন এদেরকে সামাজিক সম্মানের স্তর থেকে নামিয়ে দেন বলে কথিত আছে। যেমন-

'এগার শত গোয়াল চলে তেরশত হালই।
নয়শত সুবর্ণ বণিক তেরশত বারই ॥' -(পৃ-৩৬৯)

মাঝি

নৌকা, ডিঙা চালিয়ে মাঝিরা জীবিকা নির্বাহ করতো। চাঁদ সওদাগরের ১৪ নৌকায় মাঝি-মাল্লারা বাণিজ্যের সফরসঙ্গী হিসেবে দক্ষিণ পাটন গমন করে। কর্মসূত্রে তাদের দেশ-বিদেশে যেতে হতো। আবার খেয়াঘাটের মাঝি হিসেবে ধনা-মনা দুই ভাই যাত্রী পারাপার করে জীবিকা নির্বাহ করতো। যেমন-

'ধনা মনা দুই ভাই ঘাটের ক্ষেয়ানি।
সর্ব্বক্ষণে থাকে তারা গাঙ্গুর পানি ॥
অন্ন খাইতে গেছে ধনা আপনার ঘর।
নৌকা লইয়া মনা ঘাটে রহিছে সত্বর ॥' -(পৃ-৪৫৮)

কাঠুরে

সেকালে কাঠুরে নামে এক নিম্নবিত্তের শ্রমজীবী শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা বন থেকে কাঠ কেটে মাথায় করে নগরে এনে বোঝা হিসেবে বিক্রি করতো। জ্বালানী হিসেবে এসব কাঠের নাগরিক সমাজে বেশ কদর ছিল। চাঁদ সওদাগর দীন-হীন অবস্থায় নিরুপায় হয়ে এক বোঝা কাঠ কুমার বধূর কাছে চারপণ দরে বিক্রি করে।

'দুঃখ পাইয়া চান্দো ভাবে মনে মনে।
এক বোঝা কাষ্ঠ লইল অনেক যতনে ॥

,,,

হেতাল বাড়ি হাতে চান্দো মন্দ গতি যায়ে।
কাষ্ঠ লবা কাষ্ঠ লবা করি ডাকে উচ্চরায়ে ॥
সহজে সুবোধ বড় কুমার বৌয়ারী।
চান্দের কাষ্ঠ কিনিল দিয়া পোন চারি ॥' -(পৃ-২৯১-২৯২)

সৈনিক

সৈনিকদের মধ্যে কতোয়াল, পাইক, পেয়াদা, লাঠিয়াল, চৌকিদার, দারোয়ান, অশ্বারোহী, গজারোহী ও পদাতিক উল্লেখযোগ্য। কাজির সেনাবাহিনী ও চাঁদ সওদাগরের সেনাবাহিনীতে এরকম সৈনিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কতোয়াল সাধারণত নগর প্রধান হিসেবে নগরের শান্তি-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বজায় রাখার দায়িত্বে নিযুক্ত থাকতো। যেমন-

'সাজ সাজ করিয়া কটকে দিল সাড়া।
ছোট বড় সাজিয়া আইল পাইক পাড়া ॥
শেক সাইদ চলে বড় বড় পাঠান।
সাচান সিচান চলে কাজির যোগান ॥

,,,

হাসন কাজি চলে পায়ে দিয়া মোজা।
ধোপ কাপড়ি চলে লক্ষ্যে লক্ষ্যে খোজা ॥
হাসন কাজি ঘরে গিয়া ঘটে দিল ঠেলা।
পেয়াদারে হুকুম দিল ঘর ভাঙ্গি ফেলা ॥' -(পৃ-১২৭-১২৯)

খোজা

সামন্তবাদী সমাজে খোজাদের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরে বা হেরেম সুরক্ষায় নিয়োগ দেয়া হতো। এসব খোজা জন্মগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ থাকতো, আবার অনেক সময় একশ্রেণির ব্যবসায়ী (মগ-পর্তুগিজ-হার্মাদগণ) শিশুদের কিনে বা অপহরণ করে বিক্রি করে দিত। আবার অভাব বা দারিদ্র্যের কারণে পিতা-মাতা নিজ সন্তানকে খোজা করে বিক্রি করে দিত। দক্ষিণ পাটন রাজার অন্তঃপুরেও এরকম খোজার দেখা মেলে-

'নপুংসক লোক রাজা আনে ডাক দিয়া।
পুরীর ভিতরে মুলা দিল পাঠাইয়া ॥' -(পৃ- ২৭০)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ

সামন্তবাদী সমাজ মূলত পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী সমাজ ব্যবস্থা। হিন্দু ও মুসলিম এ উভয় সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষের প্রতাপ ও প্রাধান্য বিদ্যমান। ধর্মের দোহাই দিয়ে এ ব্যবস্থা যুগ যুগ ধরে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। পুরুষ শাসক ও পুরুষ পুরোহিত-মোল্লারা নিজ স্বার্থে ধর্মগ্রন্থ রচনা করে তা চাপিয়ে দিয়েছে নারীদের ওপর। এভাবে শাস্ত্রাচার ও সমাজ শাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরুষের একক আধিপত্য। মধ্যযুগীয় রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ ও পারিবারিক কাঠামোতে পুরুষের সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ, আগ্রাসী মনোভাবের কারণে নারী সমাজ হয়েছে নিগৃহীত ও নিষ্পেষ্ট। এ সূত্রেই নারী সমাজের প্রতি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অনুদার, অমানবিক অবজ্ঞামিশ্রিত ও নেতিবাদী মানস প্রসূত। শাস্ত্র ও সমাজ নামক হাতিয়ার ব্যবহার করে পুরুষেরা নারীর ব্যক্তিসত্তার ওপর হেনেছে প্রবল আঘাত। এতে করে নারীর পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকারের জায়গাটি হয়েছে সংকুচিত, সম্মান-সৌভাগ্য হয়েছে বিপন্ন এবং জীবন হয়েছে অস্তিত্ব সংকটে আক্রান্ত।

মনসামঙ্গল কাব্যেও পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দাপটের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত নারী হৃদয়ের করুণ আর্তি-হাহাকারের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। শিব স্ত্রী চণ্ডীর জন্য (মনসার বিষ দৃষ্টিতে অচৈতন্য হয়ে পড়লে) কাঁদলে নারদ-মুণি এ নিয়ে তিরস্কার করেন। আবার বাসর রাতেই জরৎকারু মুণি মনসাকে অপমানজনক বকাঝকা করে চিরদিনের জন্য ত্যাগ করে চলে যান। ঊষা-অনিরুদ্ধকে নিয়ে যুদ্ধের সময় যমরাজ মনসাকে নারী বলে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য করেন।

ধন্বন্তরি সঙ্কুর গাড়রিও মনসাকে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে তাচ্ছিল্য করেছেন। এছাড়া চাঁদ সওদাগর শুধু নারী বলেই দেবী মনসার পূজা করতে চাননি। শিবভক্ত চাঁদের এ মানসিকতায় পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। যেমন-

ক. চাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি

'একথা শুনিয়া চান্দো বলিল উত্তর।
শিব সহায়ে থাকিতে কানির কিবা ডর ॥

,,,

যেই হাতে পূজি আমি শিবের চরণ।
সেই হস্তে পদ্মার পূজা করিব কেমন ॥

,,,

চান্দো বলে কানি তোর মনে ভয়ে আছে।
মোর ভয়ে ধনে জনে ডিঙ্গা পাঠাইয়াছে ॥' -(পৃ-৫২৯-৫৩০)

খ. সঙ্কুর ওঝার দৃষ্টিভঙ্গি

'এতেক শুনিয়া ওঝা বলিলেক বাণী।
মাসি নহে তোর আসিয়াছে কানী ॥ -(পৃ-১৭৫)

গ. জরুৎকারুর দৃষ্টিভঙ্গি

'ব্রাহ্মণের নারী হইয়া নাহি ধর্ম্মজ্ঞান।
ভাঙ্গড়ার ঝি তুই কিসে অপমান ॥' -(পৃ-৮৫)

পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি

তৎকালীন সমাজে নারীদের ওপর ধর্মীয় ও সামাজিকভাবে নিপীড়ন করেই পুরুষ সমাজ ক্ষান্ত হয়নি, বরং প্রতিজ্ঞা করার সময়ও অনেক ক্ষেত্রে নারীর অলংকার উল্লেখ করতো। কারণ নারীর অলংকার পুরুষের গায়ে ধারণ করাকে সমাজ অবজ্ঞার চোখে দেখতো। তাই উজানি নগরে বিয়ের আসরে মনসার কূটচালে সাপ দেখে ভীত হয়ে লখিন্দর চেতনা হারিয়ে ফেললে চাঁদ সওদাগর আর্তনাদ করতে থাকেন এবং বাড়িতে না ফিরে বরং হাতে-কানে চুড়ি ও কানফুল দিয়ে ভিক্ষা করে খাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন। একজন পুরুষ হয়ে পিতা হিসেবে তিনি নারী দেবতা মনসার হাত থেকে পুত্রকে রক্ষা করতে না পারার লজ্জায়-ঘৃণায় ও আত্মগ্লানিতে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে একথা ঘোষণা করেছেন। যেমন-

'বিহার বেশে সাজিয়া আইল পুত্র বিচিত্র বেশে।
ফিরিয়া না গোলা পুত্র চম্পকের দেশে ॥
কর্ণে কুণ্ডল দিব আমি হাতে হাতে তোড়ল।
দেশে দেশে মাগিয়া খাব আমি পৃথিবী উপর ॥' -(পৃ-৩৯৭)

পুত্র সন্তানের গুরুত্ব

সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্বাভাবিক ভাবেই পুত্র সন্তানের জয়গান গাওয়া হয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিক গুরুত্ব বিবেচনা করে পিতা-মাতা উভয়ের প্রত্যাশা থাকতো পুত্র সন্তানের। কারণ পুত্র পিতৃ বংশকে উদ্ধার করে, বংশধারা ঠিক রাখে এবং পিতার মৃত্যুতে মুখাগ্নি করতে পারে কেবল পুত্রই। তাই সনকা ৬ পুত্র হারিয়ে আবার মনসার কাছে পুত্র সন্তানের বর প্রার্থনা করেছেন। এমনকি পুত্রের জীবন আশঙ্কার নিয়তি জানার পারও এ দাবি

বহাল রেখেছেন এবং আঁচল পেতে গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ পাটনে যাত্রার পূর্বে চাঁদ ও সনকা তাদের অনাগত সন্তান যেন পুত্র হয়, সে বিষয়ে যার যার দেবতার ওপর ভরসা রেখেছেন। যেমন-

‘তুমি আমি বাঁচি যদি অনেক বৎসর।
আর বার হবে পুত্র মহাদেবের বর ॥
কালিকার সোনাই তুমি কিবা তোমার বয়স।
তুমি আমি বাঁচিলে পুত্র হইবে বিস্তর ॥’ -(পৃ-২৩৬)

সমাজ শাসন

বাংলার সমাজ বহুকাল থেকেই শাস্ত্র, আচার, নীতি-নৈতিকতা দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে। সমাজের উচু শ্রেণি থেকে নিম্নশ্রেণি পর্যন্ত সকলের মাঝেই সমাজ শাসনের ভীতি কাজ করতো। কারণ এদেশের মানুষের জীবন ব্যবস্থা রাষ্ট্রের বৃহৎ পরিসরে নয়, বরং সমাজের সীমিত সীমানাকে আশ্রয় করেই করে ওঠতো। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনীতির ব্যবস্থাপনায় একজন মানুষ গ্রামেই জন্মগ্রহণ করতো, বড় হতো এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করতো। সাধারণত রাজনৈতিক পরিস্থিতির ব্যাপক অভিঘাত না আসলে কোন কোন মানুষের সমগ্র জীবনে গ্রাম তথা সমাজের বাইরে যাবার প্রয়োজন পড়তো না। তাই এ স্থিরঅচলায়তন সমাজে মানুষের জীবন খুব কঠোর অনুশাসন দ্বারা চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হতো। সামন্ত শাসক, পুরোহিত ব্রাহ্মণ ও মোল্লাগণ সমাজের নীতি-নৈতিকতা, বিধি-বিধান, প্রথা-ঐতিহ্য ও অনুশাসনের বিষয়ে ছিলেন আপোষহীন।

মনসামঙ্গল কাব্য এর ব্যতিক্রম নয়। তাই দেখা যায়, সমাজের ভয়ে ৫ মাসের গর্ভবতী সনকা স্বামী চাঁদের প্রবাসে বাণিজ্যে যাবার পূর্বে গর্ভের অভিজ্ঞানপত্র সংগ্রহ করে রেখে দেন। আবার বেহুলাকে দেখতে গিয়ে চাঁদ যে লোহার শৈলমাছ ও লোহার কলই রান্না করতে দেন, তাতে প্রাথমিকভাবে অকৃতকার্য হয়ে সুমিত্রা ভয় পেয়ে যান। কারণ এতে তার সতীত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হবে। এছাড়া বিয়ের আসরে মূর্ছাহত স্বামী লখিন্দরকে জীবিত করতে বেহুলা কাচুলি ছিড়ে স্তন কেটে মনসার পূজা করে সফল হয়ে বাড়িতে ফেরার সময় এ অঙ্গহানির জন্য ভয়ে কাতর হয়ে পড়ে। অন্যদিকে বালিকা বেহুলা তাদের মুক্তাসার পুকুরে স্নান করার কথা বললে, তার মা সুমিত্রা তাকে ভর্ৎসনা করেন। যেমন-

ক. সনকার গর্ভপত্র প্রার্থনা

‘সোনাই বলে কথা শোন প্রাণেশ্বর।
পদ্মার বরে পুত্র হইল আমার উদর ॥
বৃদ্ধকালে দোচারিণী বলিবে আমারে।
তবে কি বলিব আমি লোকের গোচরে ॥

,,,

এত শুনি চান্দো গর্ভপত্র লিখি দিল।
রন্ধন করিতে সোনাই তখনে চলিল ॥’ -(পৃ-২৪০)

খ. কলঙ্কের ভয়

‘দুই স্তন কাটিলুম শূন্য হইল কাঞা।
শূন্য বুক দেখিয়া প্রভু না করিব দঞা ॥

,,,

না বুজিয়া কাছলি ছিঁড়িলাম বড় কোপে।

শূন্য বুক দেখিয়া কি বলিব লোকে।
বিহার কালে ছিল এখন কেন নাই।
দেখিয়া না কবির বিহা সন্দুব লখাই ॥' -(পৃ-৪০৫)

এ সমাজ শাসনের ভয়েই বেহুলা স্বাভাবিক ভাবে না গিয়ে বরং ডোমনীর ছদ্মবেশে শ্বশুর বাড়ি ঢোকে। আবার সমাজের রক্তচক্ষু ও দাবির মুখেই বেহুলাকে বাধ্য হয়ে সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়।

সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ

প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে এসেও বাংলার সমাজ জীবনে যে অল্প-বিস্তর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সর্বদা বিরাজমান ছিল; তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কারণ মৌর্য, গুপ্ত, পাল, সেন, পাঠান, মুঘল, সুলতানী, নবাবী ও বৃটিশ আমলেও সুস্পষ্ট ভাবে এ সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ, অবিশ্বাস-সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেছে। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রিষ্টান, শিখ ও জৈন এসব সম্প্রদায় বা ধর্মানুসারীদের মধ্যে নানা ভাবে ও নানা কারণে- সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প ধূমায়িত হয়েছে। ধর্মীয় গোঁড়ামি, উম্মাদনা ও রাজনৈতিক ইন্ধন বা ক্ষমতার পালাবদলে এ বিদ্বেষ নতুন মাত্রা পেতো। যার ফলে সংঘটিত হতো ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, বীভৎস দাঙ্গা ও সমাজ তথা রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়। পরবর্তীকালে পানিপথের তৃতীয়যুদ্ধ (১৭৬০খ্রি.) ও ৪৬-র দাঙ্গা (১৯৪৬খ্রি.) এ বিদ্বেষের কলঙ্কিত অধ্যায়। যার জন্য দেশভাগ (১৯৪৭খ্রি.) অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। দেশ ও জাতিকে রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে পঙ্গু-স্থবির ও বিকারগ্রস্ত করে রেখেছে এর দূষণ, পাপ ও পঙ্ক এতে কোন সন্দেহ নেই।

মনসামঙ্গল কাব্যও এ জাতিগত বিদ্বেষের বিষাক্ত দূষণ থেকে মুক্ত নয়। এখানে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘটিত জাতি বিদ্বেষ বড় হয়ে ওঠেছে। ভক্ত রাখাল ও মনসার সঙ্গে মুসলমান মোল্লাও কাজি বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। রাখালগণ মনসার ঘটে ধান-দূর্বা-ধূপ-দীপ দিয়ে পূজা করলে তা প্রথমে নিন্দা, অবজ্ঞা এবং পরবর্তীকালে এদেরকে নানাভাবে নির্যাতন করে কাজির দুই ছেলে। যেমন-

'নিত্য নিত্য পূজা সবে করে সেই স্থানে।
পদ্মাপূজা বিনে তারা অন্য নাহি জানে ॥
একদিন হইল তথায়ে অশুভ লক্ষণ।
হাসন-হুসন দুই কাজির নন্দন ॥
মহা দুরন্ত তারা কোন ভয় নাই।
ধর্ম কর্ম বেদ নিন্দা করে ঠাই ঠাই ॥

,,,

তুলসীর পত্র পায়ে যাহার মাথাতে।
চুলে ধরে আনে তারে আপনা সাক্ষাতে ॥

,,,

ব্রাহ্মণে অপমান করে পৈতা পাইয়া কান্ধে।
প্যাদ্যা সকলে তারা হাতে গলে বন্ধে ॥' -(পৃ-১২১-১২২)

এভাবে কাজির দুই ছেলে হাসন-হুসেনের হাতে মনসাভক্তবৃন্দ লাঞ্ছিত হয়। এ ঘটনার পর তকাই মোল্লা যাত্রাপথের ক্রান্তি দূর করতে বনের উপকণ্ঠে এক ঘরে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেটি ছিল মূলত মনসার মন্দির। মনসাভক্ত রাখালগণের নাচ-গান, ছাগল বলির ব্যবস্থা দেখে তকাই মোল্লা মনসার ঘট ভাঙতে গেলে রাখালদের হাতে দারুণ ভাবে অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হন-

"আল্লা আল্লা বলিয়া যায়ে ঘট ভাঙ্গিবার।
হাতে ধরি রাখাল সবে লাগে মারিবার ॥

,,,

দাড়িতে ধরিয়া কেহ মারে ঘারগাতা।
ইজার চিরিয়া কেহ করে ফেতা ফেতা ॥' -(পৃ-১২৫-১২৬)

এভাবে মনসাভক্ত রাখালদের হাতে তকাই মোল্লা নির্যাতিত হয়ে, নাকে খত দিয়ে রক্ষা পান। কিন্তু মনের ক্ষোভে-দুঃখে ও প্রতিহিংসায় তিনি সরাসরি হাসন কাজির দরবারে এসে উপস্থিত হন এবং নিজের দুরবস্থার কথা বর্ণনা করে হিন্দুজাতির বিরুদ্ধে কাজিকে উত্তেজিত করে তোলেন। এরফলে কাজি তার সৈন্যবাহিনী নিয়ে মনসার মন্দির ও ঘট ভেঙ্গে চুরমার করে আগুন লাগিয়ে দেন-

'সাজ সাজ করিয়া কটকে দিল সাড়া।
ছোট বড় সাজিয়া আইল যত পাইক পাড়া ॥

,,,

হাসন কাজি ঘরে গিয়া ঘটে দিল ঠেলা।
পেয়াদারে হুকুম দিল ঘর ভাঙ্গি ফেলা ॥

,,,

ঘর ভাঙ্গে তারা করে ছারখার।
পুরিয়া ফেলায় সব করে মারমার ॥' -(পৃ-১২৭-১৩০)

হাসন কাজি শুধু মনসার ঘট ও মন্দির ভেঙেই ক্ষান্ত হননি। বরং মনসাভক্ত রাখালদের নির্যাতন, ব্রাহ্মণদের ধরে নিয়ে হাঁস-মুরগির খোয়ারে আটকে রাখে। এমনকি নিষিদ্ধ গরুর মাংস খাইয়ে ব্রাহ্মণদের জাতি বিনাশ করেন। যেমন-

'যেই ঘরে আছে মোর কুকুড়ার বাসা।
সেই খানে দেও তুমি ব্রাহ্মণের বাসা ॥

,,,

রাখোয়ালগণেরে রাখিল বান্ধিয়া।
জাতি নাশ করো সবের গোস্ত খিলাইয়া ॥' -(পৃ-১৩৩)

হাসন কাজির এমন অপকর্মে মনসাদেবী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তার নাগবাহিনী নিয়ে জোলা হাটী, কাজির নগর ও হালিয়ার নগর আক্রমণ করে মুসলমান নর-নারীকে মেরে ফেলেন এবং কাজি চরম বিপদে পড়েন। পরে মনসার পূজা দেবার শর্তে কাজিসহ সকলকে জীবিত ও মুক্ত করে দেয়া হয়।

শুধু ভিন্ন ধর্মের মধ্যে নয়, বরং অনেক সময় একই হিন্দু ধর্মে থেকেও দেবতার অনুসরণ ভেদে অপরতাবোধ (otherness) থেকে ঘৃণা বিদ্বেষ দেখা দিতো এবং বর্ণ ও গোত্রগত বিদ্বেষ প্রকট হয়ে ওঠে। এ সূত্রেই শিবভক্ত শৈব চাঁদ সওদাগর মনসা দেবী ও মনসাভক্ত রাখাল, কৈবর্ত জেলেদের সহ্য করতে পারতেন না। তিনিও দেবীকে নানাভাবে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, কটূক্তি করেছেন এবং হাতের হেতালের লাঠি দিয়ে মনসার কোমড় ভেঙে দিয়েছেন। নিজ স্ত্রী সনকা মনসার পূজা করলে পূজার ঘট ভেঙেছেন, পায়ে ঠেলেছেন এবং চম্পক নগরে মনসা পূজা নিষিদ্ধ করেছেন-

'এইত বৈশাখ মাসে সরস রাত্র দিবা।
নিজ ঘরে সোনকা আমারে করে পূজা ॥
শুনিয়া কুপিত চান্দো বুদ্ধি গেল দূর।
হেতালের বাড়ি দিয়া ঘট করে চুর ॥

,,,

পাতিয়া বিচিত্র ঘট সমুখে গীত গায়ে।
কোন অপরাধে ঘট ঠেলে বাম পায়ে ॥
চান্দো সওদাগর বেটা চম্পকিয়া রাজা।
চম্পক নগরে বেটা মানা করে পূজা ॥

,,,

শুনিয়া কুপীল চান্দো মনে নাহি শঙ্কা।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাকাইল করে বেকা ॥' -(পৃ-৪৯৭-৪৯৮)

আবার চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যের জন্য দক্ষিণ পাটন যাত্রাকালে নদীর মাঝে মনসাপুরী দেখতে পান। মনসাভক্ত কৈবর্তদের ওপর নিপীড়ন চালান। ব্রাক্ষণ রোঙ্গাই পণ্ডিতের অনুরোধ উপেক্ষা করে মনসাপুরী ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলেন-

'লইয়া হেতাল বাড়ি চলিল সত্বর।
পুরী নাশ করিয়া ভাঙ্গিল দ্বার ঘর ॥
দেওয়াল পথের ভাঙ্গে, আর ভাঙ্গে খাট।
জলটাঙ্গি ভাঙ্গিল পথের কপাট ॥
ঘট ভরা ভাঙ্গিয়া জলে ফালাইল।
হালিয়া আনিয়া তবে ভিটাতে চাষ কৈল ॥' -(পৃ-২৫১)

এভাবে চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ প্রকট হয়ে ওঠে। মনসার প্রতিহিংসা ও আক্রমণে বিপর্যস্ত-বিপন্ন চাঁদ শেষ পর্যন্ত পূজা দিতে সম্মত হন। এতে করে মতাদর্শগত বিদ্বেষ দূর হয়। সুতরাং দেখা যায় অপরতাবোধ (otherness) আরো ভয়ংকর ভাবে সমাজ জীবনকে ব্যহত-বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

শোষণ

মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজ কাঠামোয় শোষণ-নিপীড়ন ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। সামন্ত রাজা বা ভূস্বামী অথবা আমলা শ্রেণি নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধি বা খেয়াল পূরণ করতে কৃষক প্রজাদের ওপর চালাতো শোষণ। এ শোষনের ধরন ছিল আবার দুই প্রকারের। যথা-

১. ধর্মীয় শোষণ ও
২. সামাজিক শোষণ।

মনসামঙ্গল কাব্যে উপর্যুক্ত দুই ধরনের শোষণ প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। সমাজের শোষণকারী শ্রেণির প্রতিভূ হাসন কাজি ও চাঁদ সওদাগর নানা ভাবে, নানা উপলক্ষ্যে কৃষক প্রজাদের ওপর শোষণ নিপীড়ন চালাতেন। হাসন কাজির দরবারের বর্ণনা দিলেই সহজে অনুমান করা যায়, প্রজাবর্গ তার দুঃশাসন ও শোষণ নির্যাতনে কেমন ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো-

'বসিয়াছে কাজি আপন কাচারিতে।
আপনার চাকর সব রহিছে জোড় হাতে ॥
সমুখে তামার বদনা হাতে ছড়িখান।
কাগজের বস্তাহাতে কিতাব কোরান ॥' -(পৃ-১২৫)

আবার চাঁদ সওদাগর যখন দক্ষিণ পাটন যাত্রা করেন, তখন গল্প প্রসঙ্গে যে পূর্ব রাজ্যের কথা বলা হয়েছে, সে দেশেও শাসকবর্গ গরীব চাষীর খাজনা অনাদায়ে বা অন্য কোন অন্যায়-অপরাধের কারণে তাদের পুত্র সন্তানদের ধরে নিয়ে খোজা করে বিক্রি করে দিতো। এভাবে শোষণ করে নির্ধারিত খাজনা আদায় করা হতো-

'ব্রাহ্মণে হাল চাষে পায়ে দিয়ে মোজা।
বাপের দোষ পাইলে পুত্রে করে খোজা ॥' -(পৃ-২৪৫)

এছাড়া নদীতে চাঁদ সওদাগরের নৌকার বহর ও মাঝি-মাল্লা, সৈন্য-সামন্ত দেখে কৈবর্ত জেলেগণ শোষণ নির্যাতনের ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। কারণ জলকর আদায়ে শোষণ নিপীড়ন এবং বিভিন্ন অজুহাতে মাছও কেড়ে নেয়া হতো। যেমন-

'মধ্যগাঙ্গে একপুরী দেখিল তখন।
করপুরী দেখি এই সমুদ্র ভিতর ॥
কেহ বলে ডাকাইতে ভাত রান্ধি খায়।
কেহ বলে রাজা বুঝি জলকর লয় ॥' -(পদ্মাপুরাণ: বসন্তকুমার সংকলিত; পৃ-১২৫)

অর্থনৈতিক শোষণ-বৈষম্যের মতো তৎকালীন সমাজে ধর্মীয় বা বর্ণবাদী শোষণেরও প্রচলন ছিল। কারণ- শূদ্র-অন্ত্যজ শ্রেণি বা প্রান্তবাসী মানুষদের (ডোম, চণ্ডাল, হাড়ি ও ব্যাধ) সমাজের উচু বর্ণের লোকেরা ঘৃণার চোখে দেখতো। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এদের ছায়া, ছোঁয়া ও জলস্পর্শ বাঁচিয়ে চলতো। এ অস্পৃশ্য মানুষদের পুশুর চেয়েও ঘৃণা করা হতো। এদের সামাজিক মর্যাদা-সম্মান-সৌভাগ্য বলতে কোন কিছুই ছিল না। এমনকি ভদ্র সমাজে বসবাস করার অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নেয়া হয়। এরা সমাজে বা নগরের বাইরের প্রান্তসীমায় বসবাস করতে বাধ্য হয়। তাই এদেরকে রণজিৎ গুহ ও গায়ত্রী চক্রবর্তী 'subaltern class' বা 'প্রান্তজনবাসী' বলে অভিহিত করেছেন। মনসামঙ্গল কাব্যে দেবতা শিব সরযূ নদীর ঘাটের পাটনী জালুয়া ডোমের স্ত্রী গৌরী ডোমনীর প্রতি আসক্ত হন। স্বামীর এ স্বভাব জেনে চণ্ডী পূর্ব কৌশল মতো ডোমনীর ছদ্মবেশ ধরে শিবকে তার ঘরে নিয়ে রান্নাভাত খাওয়ান এবং শিবকে জাতিনাশের প্রতি কটাক্ষ করতে থাকেন-

'মদন আনন্দে তোমার বুদ্ধি হইল ক্ষে।
খাইলা ডোমের অন্ন তোরে ছুইবে কে ॥' -(পৃ-৩৯)

আবার চাঁদ সওদাগর মনসার চক্রান্তে সব হাড়িয়ে ভিক্ষুক সেজে শ্রীকলার হাটে গেলে রতি দাই তাকে পেটে ভাতের কামলা-কুলি বানিয়ে বাড়ি এনে ভাত খেতে দেয়। কিন্তু এ অন্ত্যজ নারীর হাতে ভাত খেলে চাঁদের অন্নপাপ হবে এবং জাত চলে যাবে। তাই মনসার করুণায় চাঁদ তার দিব্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে রতির দেয়া ভাত দেখে গর্জন করে বলেন-

'চান্দো বলে রতি তোর এত অহঙ্কার।
তোর ভাত খাইয়া জাতি যাইত আমার ॥
আমি সাধু চন্দ্রধর রাজ্যের অধিকারী।
না চিনিয়া এত মোরে অপমান করি ॥' -(পৃ-৩১৪)

এছাড়া বেহুলা স্বামী, ভাসুর ও শ্বশুরের ধন-সম্পদ উদ্ধার করে দেশে ফিরেও সমাজের ভয়ে স্বাভাবিক ভাবে শ্বশুর বাড়ি যেতে পারেনি। তাই ডোমনীর ছদ্মবেশে গেলে সনকা তাকে দেখে ঘৃণা ও সন্দেহের চোখে তাকান এবং পান্তাভাত খেতে দেন। চাঁদ এ খবর শোনে ডোমনীরূপী বেহুলাকে পাকড়াও করতে গেলে ভয়ে বেহুলা খাবার ফেলে পিছনের খিড়কির পথে পালিয়ে যায়। অন্যদিকে মুসলমান সমাজেও আশরাফ ও আতরাফের ভেদাভেদ ছিল। উচু শ্রেণিতে ছিল- শেখ, সৈয়দ, পাঠান ও মুঘল সম্প্রদায়। আর নিম্নশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল- তাঁতি (জোলা), হাজাম, ঢুলি, কাবাড়ি শ্রেণির লোক। হাসন কাজিও এসব শেখ, সৈয়দ ও পাঠানদের নিয়ে ওঠাবসা করতেন।

দাস প্রথা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সমাজে দাসপ্রথার অস্তিত্ব ছিল। যদিও প্রকৃত দাসপ্রথার প্রকৃতি এদেশে ছিল না, তথাপি দাসপ্রথা সামন্তবাদী সমাজের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে সীমিত অর্থে হলেও ভারতে দাসপ্রথার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। মনসামঙ্গলের সমাজে যে দাসপ্রথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে বিষয়টা এমন মনে হয় না যে, সেখানে দাসপ্রথা এক বিরাট সামাজিক শোষণমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে উঠেছিল। তবে দাসদের প্রকৃতি দেখে মনে হয় তাদের জীবন খুব সহজও ছিল না। সমাজ বিজ্ঞানীগণ এ দাস প্রথাকে 'domestic slavery' 'nominal slavery' ও 'general slavery' প্রভৃতি বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের অধিকাংশ অঞ্চলের পশ্চাৎপদ লোকজনদের মধ্যে, বিশেষ করে গ্রামের গরিব জনগোষ্ঠীর মধ্যে অভাব অনটনের কারণে উৎপাদন পদ্ধতিতে দাস প্রথার অস্তিত্ব দেখা দিতে শুরু করে। এমনকি দাস কেনা-বেচার বিষয়টিও ক্রমে প্রাধান্য পেতে থাকে। এস প্রসঙ্গে এস.এ ডাঙ্গে বলেছেন-

'A question in raised as to what were the specific features of slevery in India? what role did it play in production? There are few who would deny altogether the existence of slavery in India. ,,, As already stated it was not the 'labour slavery' of the Roman of Greek type. It was 'domestic slavery'. ,,, This intertwining of the house community with domestic slavery and its existence over a long period without slavery supptanting other forms in a specific feature of Indian slavery.'[৯৩]

ভারতীয় সমাজের ইতিহাস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এখানে এ দাস বা ক্রীতদাস দুই প্রকার ছিল। এক- যারা জমি চাষ করতো, দুই- যারা গ্রামবাসী প্রজা হিসেবে সেবা করতো। প্রথমতো; ভাগচাষী এবং পরে সকল প্রকার চাষীরাই দাসপ্রথার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এছাড়া দাস হস্তান্তরিত হওয়ার বিষয়টিও কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাস সম্মত। যেমন ভূমির সঙ্গে সঙ্গে দাসরূপে চাষীদেরও হস্তান্তরিত হওয়ার সংবাদ সে যুগের ভারত ভূমিতে সুলভ। এছাড়া মেগাস্থিনিস ও ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ারের লেখায় ভারতের দাস প্রথার প্রচলনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অবশ্য ক্রীতদাস প্রথা থাকা না থাকার কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল না। কারণ যেখানে ইচ্ছা বা আবশ্যকতানুসারে বাসিন্দাসহ পুরো গ্রাম দান করার বিষয়টি প্রথাসম্মত ছিল। সেখানে পুরো ব্যাপারটিই শুধু দাস নয়, দাসানুদাসের পর্যায়ে চলে যায়। উচ্চ তিনবর্ণের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যদের) দাসরূপে গৃহিত হয়েছিল শূদ্র অন্ত্যজগণ। এরা পরবর্তী সময়ে (গুপ্তযুগের পর থেকে) কৃষকে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল এবং যারা ছিল জাত কৃষক তারা প্রায় অর্ধভূমিদাসে রূপান্তরিত হচ্ছিল। ভারত-বাংলাদেশের সামন্তবাদের আর একটি বৈশিষ্ট্য যে এখানে নিম্নতর খেটে খাওয়া মানুষগুলো দাস ভাড়াটে শ্রমিক থেকে ধীরে ধীরে কৃষকে রূপান্তরিত হতে পেরেছেল।[৯৪] এভাবেই বাংলাদেশসহ উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রেণিচেতনা বিকাশ লাভ করে। কারণ এখানে যে বর্ণপ্রথা ছিল, তা মূলত দাসপ্রথারই সামান্তর। এ প্রসঙ্গে এস.এ ডাঙ্গের মতামত প্রণিধানযোগ্য-

'The slave groups become the henna Jatis of the village community and the members of house hold community taking to different trades according to their choise of skill of need become crystallised into different castes. In this process the varnas lose their validity cund castes replace them in the structure of the new organization- The village community. ,,, This process requires a careful investigation and study of the concrete conditions in which it took place in the various ports of India. Because caste and village communities in India, while basically remaining the same in their production relations. ,,, with the advance in productive forces, the coming in of division of labour and the rise of classes the slave system arose.'[৯৫]

উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে এ caste-ই যে শ্রেণিচেতনার প্রাথমিক সূত্র ছিল তা ডি.ডি কোশাম্বী সমর্থন করেছেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষীয় দাসদের অবস্থা গ্রিক বা রোমের মতো অতটা নির্মম ছিল না। বরং এদেশের অনেক দাসই পরবর্তীকালে দিল্লীর সিংহাসনে বসেছিলেন। এদের মধ্যে-কুতুবউদ্দিন আইবক, ইলতুতমিশ ও গিয়াস উদ্দিন বলবন অন্যতম। দাসগণ নিজের যোগ্যতার বলেই শাসক, অভিজাত শ্রেণিতে উন্নীত হবার সুযোগ পেতো। এছাড়া মনিবের মর্জি মাফিক বিয়ে, ঘর-সংসার করতে পারতো। তবে অধিকাংশ দাস-দাসীর জীবনের তেমন স্বাধীনতা ছিল না। তাদের বিয়ে, সন্তান জন্মদানের অনুমতি নিতে হতো। তাদেরকে পশু-পাখি, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মতো বেচাকেনা করা হতো।

ইবনে বতুতাও বাংলা ভ্রমণকালে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে আশুরা নামের এক অপূর্ব সুন্দরী মেয়েকে ক্রয় করেছিলেন। বতুতার সফরসঙ্গী বন্ধুও ২০ টাকায় একটি সুন্দর বালক কিনেছিলেন। বাংলার ফিরিঙ্গি, মগ ও পর্তুগিজ জলদস্যু হার্মাদদের কারণে একসময় প্রচুর দাস-দাসী কেনাবেচা তথা সরবরাহ করা হতো। এসব দাস-দাসীর জীবন ছিল পরাধীন ও অসম্মানের-এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর– 'মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ' গ্রন্থে বলেছেন– ১৭১৭ সালে মগরা বাংলার দক্ষিণাঞ্চল থেকে ১৮০০ নর-নারী অপহরণ করে গলায় রশি বেধে আরাকানের বাজারে দাস হিসেবে নিয়ে যায় এবং ২০ থেকে ৭০ টাকা দরে বিক্রি করে। ক্রীতদাসদের বাধ্যতামূলক ভাবে কৃষি কাজে নিযুক্ত করা হতো এবং তাদের মাসিক খোরাক হিসেবে দেয়া হতো মাত্র ১৫ সের চাল।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এ দাস প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। হাসন কাজি মনসাভক্তের ওপর নির্যাতন চালালে মনসা তার বাহিনী নিয়ে হাসনাহাটী, কাজিহাটী, জোলাহাটী ও হালিয়ানগর আক্রমণ চালায়। হাসনা হাটীতে কাজির বাড়িতে আক্রমণ সূত্রে জানা যায়- কাজির ৩ স্ত্রীর বহু দাস-দাসী ছিল এবং তারা আয়েশী জীবন যাপন করতো। বাড়ির অন্যান্য দাস-দাসীর মধ্যে দুলাল-দুলালী ছিল কাজির প্রিয়পাত্র। তাদের মৃত্যুতে কাজি কান্না করেছেন-

'নামে দুলাল বান্দি তার লাগি কান্দে কাজি
চাখন চাহিয়া চাহিবেক।
দণ্ড সিমইলের ফুল বচন য়ানের গুণ
হেন বান্দি খাইল সাপে ॥' -(পৃ-১৪২)

আবার সমাজে সামন্ত প্রভু, জমিদার, বণিক সওদাগর ও অভিজাত কাজি শ্রেণির বাড়িতে ও দরবারে নানা কাজে বহু দাস-দাসী নিয়োগ করা হতো। হাসন কাজির দরবারেও এরকম দাস-চাকর দেখা যায়, যারা সর্বদা মনিব কাজির হুকুম পালনে প্রস্তুত থাকতো-

‘বসিয়াছে কাজি আপন কাচারিতে।
আপনার চাকর সব রহিছে জোড় হাতে ॥
সমুখে তামার বদনা হাতে ছাড়িখান।
কাগজের বস্তাহাতে কাগজ কোরান ॥’ -(পৃ-১২৫)

উজানিনগরের বণিক সাহে সওদাগরের বাড়িতেও বহু দাস-দাসী, চাকর-বাকর দেখা যায়। শুধু বেহুলার সখী পর্যায়ের দাসী ছিল একশত। যাদের নিয়ে বেহুলা তাদের মুক্তাসার পুকুরে স্নান করতে যায়-

‘কার্য্যের গৌরবে যদি তোমার আজ্ঞা পাই।
একশত সখী সঙ্গে মুক্তাসারে যাই ॥
,,,
তবে বেউলা পরিলেক নানা অলঙ্কার।
সখীগণ লইয়া চলে দিঘি মুক্তাসর ॥ -(পৃ-৩২৩)

দেবী মনসার পুরীতেও নানা ধরনের দাস-দাসী ছিল। শুধু বেহুলার স্নানের জল নিতেই নদীর ঘাটে আসে একশত দাসী। এদের মধ্যে নীলাবতী প্রধান-

‘চারিদিকে চাহে বেউলা রাজঘাটে বসি।
জল ভরিবারে আইসে মনসার দাসী ॥
একশত দাসী আইল বড়হী সুঠান।
নীলাবতী নামে দাসী সবের প্রধান ॥’ -(পৃ-৪৭১-৪৭২)

এছাড়াও চাঁদ সওদাগরের বহু দাস-দাসী, চাকর-বাকর ছিল। ধনা ছিল তার প্রধান অনুচর। যেমন ধামু ছিল মনসার এবং নন্দী ছিল শিবের অনুগত জন।

নারীর সামাজিক অবস্থান

মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী বণিক সমাজে নারীর সামাজিক মান-মর্যাদা-সম্মান ও অবস্থানযে মোটেও সুখকর ছিল না– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্মীয় ও সামাজিক শাসন শোষণের মাধ্যমে নারীকে কার্যত ভোগের সামগ্রী ও অবরোধবাসিনীতে পরিণত করে তোলে। পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর দুই সম্পদ- রূপ ও যৌবন। এ রূপ আর যৌবন সমাজ জীবনে নারীর সম্পদ না হয়ে শত্রুতে পরিণত হয়। আর এ জন্যেই মূলত নারীকে আপমান আর আক্রমণের শিকার হতে হয়। সমাজ ও ধর্মের নামে পুরুষ বিধাতার সমাজে নারী হয়ে পড়ে পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, অবলা ও অসহায়। বাঙালি সমাজ কাঠামোতে নারীর তেমন কোন সুস্পষ্ট স্থান বা অবস্থান খুঁজে পাওয়া যায় না। নারীর সামাজিক অবস্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে আন্তোনি গ্রামশির- Selections from the prison Notebooks (1971) অবলম্বনে রণজিৎ গুহ ও গায়ত্রী চক্রবর্তী তাদের ‘sub-altern class’ নামক অভিসন্দর্ভে প্রান্তজনবাসী বা অন্ত্যজ শ্রেণির ৫টি স্তরের উল্লেখ করেছেন; যথা-

১. বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় চতুর্মাত্রিক নিম্নবর্গ
২. সামাজিক পদ মর্যাদায় নিম্ন জনগণ
৩. পেশা-পদ-পদবিগত অধস্তন জনগণ

৪. ক্ষমতা কর্তৃত্বের দিক হতে গৌণ জনগোষ্ঠী ও

৫. পুরুষতন্ত্রের দাপটে ক্ষত-বিক্ষত নারী গোষ্ঠী।

নারীর এ ব্যক্তিক, পারিবারিক ও সামাজিক দুরবস্থার মূলে রয়েছে শাস্ত্রাচার ও সমাজ শাসন। কারণ নারীকে নারীরূপে (অসহায়-অবলা) গড়ে তোলে এ সমাজ। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত নারীবাদী সিমোন দ্য বোভোয়ার (১৯০৮-১৯৮৬খ্রি.) বলেছেন- 'one is not born, but rather becomes a woman.'[৯৬] পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও সামন্তবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নারী তার আপন সত্তা হারিয়ে স্বামী, সন্তান, সংসার ও সমাজের দায় মেটাতে গিয়ে এক 'আমি'-র স্থলে বহু 'আমি'-তে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। মনসাঙ্গল কাব্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কারণ-

'মনসামঙ্গলের সমাজ মূলত সামন্ত অর্থনীতির সমাজ। তথাপিও তা বণিকপুজির প্রাধান্যে সংমিশ্রিত। ইতিহাস ও স্মৃতিগ্রন্থসমূহে শিল্পী ও বণিক সংঘের কার্যকলাপ সম্পর্কে যেসব আলোচনা পাওয়া যায়। তাতে এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া চলে যে, এ সময়ে অভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের যা কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, তার প্রায় সবটাই সামন্তবাদে রূপ নিয়ে নিয়েছিল। কারণ বণিকরাও দ্রুত জমির মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে যাওয়ায় তারা ক্রমশ সামন্তে পরিণত হয়ে যাচ্ছিল।'[৯৭]

মনসামঙ্গল কাব্যের বণিক চাঁদ সওদাগরের বহু জমি ছিল, তিনি কৃষি কাজে অভ্যস্ত ছিলেন এবং নিজের তত্ত্বাবধানে জমি চাষাবাদ করতেন-

'ঘট ভরা ভাঙ্গিয়া জলে ফালাইল।
হালিয়া আনিয়া তবে ভিটাতে চাষ কৈল ॥' -(পৃ-২৫১)

এ সামন্ত জমিদার বণিকগণ অনেক সময় রাজনৈতিক বিবেচনায় অনেক কর বা খাজনা থেকে রেহাই পেতো এবং অধীনস্থ কৃষক প্রজা ও কর্মচারীদের ওপর স্বাধীনভাবে শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতো। এর ফলে বিত্তবান সামন্ত বণিক শ্রেণি অধিকমাত্রায় জমির পাশাপাশি নারীর প্রতি অতিমাত্রায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। এতে করে সমাজে নারীর আত্মসম্মান হয় অপহৃত এবং নারীকে পরিণত করা হয় ভোগ-বিলাসের সামগ্রীতে। এ জন্যই মনসামঙ্গল কাব্যের সমাজ ব্যবস্থাতেও বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, গান্ধর্ব বিবাহ, সহমরণ বা জওহর ব্রত, যৌতুক, সতীত্বের পরীক্ষা ও সামাজিক গঞ্জনার মতো অবমাননাকর বিষয়গুলো বিদ্যমান ছিল। এ সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নরূপ-

বাল্যবিবাহ

তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। লখিন্দর ও বেহুলার বিয়ে বাল্যকালেই সম্পন্ন হয়। বিয়ের সময় বেহুলার ৮ বছর এবং লখিন্দরের ১৬ বছর বয়স ছিল। লখিন্দরের চেয়ে বেহুলা ৮ বছরের ছোট। বিয়ের পূর্বে বেহুলা মুক্তাসার পুকুরে স্নান করার কথা বলতেই তার মা তাকে কোল থেকে রাগ করে ফেলে দেন এবং বিয়ের আসরে মূর্ছাহত লখিন্দরের জ্ঞান ফিরলে চাঁদ সওদাগর পুত্রকে কোলে নেন। এ থেকে বাল্য বিবাহের সত্যতাই উন্মোচিত হয়ে পড়ে। আবার মনসার দৈহিক বৃদ্ধিতে পিতা শিব মেয়ের বিয়ে দিতে অস্থির হয়ে পড়েন।

'লক্ষ লক্ষ চুম্ব দিল বদন কপালে।
পুত্র পুত্র বলি চান্দো লইলেক কোলে ॥
গেল গেল ধনজন লখাইর বালাই লইয়া।
বয়েস অধিক হইছে করাইব বিয়া ॥' -(পৃ-৩১৮)

এ ঘটনার পর হইতেই ৮ বছর বয়সী বেহুলাকে মা সুমিত্রার মনে হয়েছে যে, মেয়ে বিয়ের উপযুক্ত হয়ে গেছে। তাই চাঁদের প্রস্তাবে সাহে সওদাগর মেয়ে বিয়ে দিতে রাজি হয়ে যান। এছাড়া ধর্মীয় কারণে ৮-৯-১০ বছর বয়সী

মেয়েকে বিয়ে দিয়ে যথাক্রমে- গৌরী, রোহিণী ও কুমারী দানের পুণ্য লাভের আশায় তৎকালে বালিকা মেয়েদের বিয়ে দেয়া হতো। লখিন্দরের বড় ভাইদেরও বাল্যকালেই বিয়ে করানো হয়েছিল।

বহু বিবাহ

বাংলার তৎকালীন সমাজে কৌলিন্য প্রথার দাপটে পুরুষের বহু বিবাহ ভয়ংকর রূপে বৃদ্ধি পায়। শুধু সমাজের ধনী কুলীন ব্রাহ্মণ, শেখ, সৈয়দ ও পাঠানবর্গই নয় বরং নিম্নবর্ণের খেটে খাওয়া মানুষেরাও আসঙ্গলিপ্সা ও যৌতুকের লোভেই এমন কাজে আগ্রহী হয়ে ওঠে। স্বামীর একাধিক বিয়ের ব্যাপারে স্ত্রী কোন প্রতিবাদ করতে পারতো না। কেননা ধর্ম ও সামাজিকভাবে এ ঘৃণ্য-অবমাননাকর বিষয়টি স্বীকৃতি পেয়েছিল। সেন রাজা বল্লাল সেনের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণগণ কৌলিণ্যের দাপটে বিয়ে ব্যবসায়ে মেতে ওঠে। সমাজের এ বল্লালী বালাই বিদ্যাসাগরের (১৮২৮-১৮৯১ খ্রি.) কাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ ৬০ বা ৭০ বছর বয়সে একশত থেকে দেড়শত-দুইশত পর্যন্ত বিয়ে করতে দেখা যায়। শাসক রাজা-মহারাজাদের হেরেমে এ সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যায়। বিদ্যাসাগর এ ঘৃণ্য বিষয়ের বিরুদ্ধে ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলে ১৮৫৬ খ্রি. এদেশে বহুবিবাহ বন্ধ হয় এবং বিধবা বিবাহের প্রচলন আইনগত ভাবে সিদ্ধ হয়।
মনসামঙ্গল কাব্যে ধনী শ্রেণির মধ্যে কাজিহাটীর হাসন কাজি একাধিক বিয়ে করেছেন। মুসলমান সমাজে ৪টি পর্যন্ত বিয়ে করা বৈধ থাকায় কাজিও পিছিয়ে থাকেননি। এছাড়া অসংখ্য দাসী তার বাড়িতে ছিল। অনেকে এ দাসীদেরও উপপত্নীরূপে ব্যবহার করতেন। মনসার আক্রমণের সময় হাসন কাজির স্ত্রীদের পরিচয় পাওয়া যায়-

ক. হাসন কাজির বহু বিবাহ

'ছোট বিবি লর পারে মাঝিয়া বিবি গরি পারে
বড় বিবিকে খাইল বিষম ঠাই।
কিতাব কোরান এর আপোনে ফু দিয়া ঝড়
প্রাণ যায়ে দেখিবারে নাই ॥' -(পৃ-১৪১)

খ. টেটনের বহু বিবাহ

এছাড়া জাতে মালাকার ও ধনী বণিকের ছেলে টেটনও একে একে পাঁচ বিয়ে করেছে। টেটন জুয়া খেলে শুধু পিতার ধন সম্পদ সর্বস্ব খুয়ায়নি বরং ৪ স্ত্রীকেও হারিয়েছে। তার দুঃখে বেহুলা শুধু তাকে বহুমূল্যের গহনাই দেয়নি বরং লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করে ফেরার পথে টেটনকে পঞ্চম বিয়েও করিয়েছে-

'বেউলার বচনে লখাইর লড়ে হিয়া।
ধন দিয়া টেটনারে করায়ে পঞ্চ বিয়া ॥' -(পৃ-৫১৯)

সুতরাং দেখা যায়, শুধু ধনী সমাজে নয়, বরং নির্ধন গরীব সমাজেও বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল। সমাজের সর্বস্তরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু বিবাহে উৎসাহ পেয়েছে।

যৌতুক প্রথা

বহুবিবাহের ও কৌলিন্য প্রথার দরুন বাঙালি সমাজে যৌতুক বা পণ প্রথার প্রচলন হতে থাকে। বল্লাল সেনের কৌলিন্য প্রথায় কুলীন বংশের পাত্র সংকট থাকার কারণে কন্যা দায়গ্রস্ত পিতারা টাকা পয়সা ও দান সামগ্রীর লোভ দেখিয়ে নিজ কন্যাকে পাত্রস্থ করার কৌশল অবলম্বন করে। এতে করে কন্যা সন্তান পশু-পাখি ও পণ্য সামগ্রীতে পরিণত হয়ে পড়ে। আর পাত্রপক্ষও লোভের বশে টাকা উপার্জনের জন্য একাধিক বিয়ে, নারী নির্যাতন করতে শুরু করে। যৌতুকের জন্য একসময় বিয়েটা ব্যবসায়ে রূপ নেয়। আবার ধনী-বণিক ও অভিজাত শ্রেণি খুশি হয়ে জামাতা ও পুত্রবধূকে নগদ অর্থ, গহনা, দাস-দাসী, গ্রাম বা জায়গা-জমিসহ মূল্যবান সামগ্রী দান করতেন। এ

খুশির বিষয়টি পরবর্তীকালে দাস-দাসী বেচাকেনা, জুলুম, জবরদস্তির মতো পীড়নমূলক প্রথায় পরিণত হয়। তৎকালে যৌতুক বা পণ ছিল দুই ধরনের-

১. বর পণ এবং ২. কন্যা পণ

বাঙালি সমাজে এ দুই প্রকার যৌতুকেরই প্রচলন ছিল। পাত্র অভিজাত বংশের, উচ্চ শিক্ষিত ও ভাল চাকুরে বা বড় ব্যবসায়ী হলে বরপণের চাহিদা সঙ্গত কারণেই বেড়ে যেতো। আবার কিছু কিছু গোত্র বা বর্ণের প্রথা বা ঐতিহ্যানুসারে কন্যাপণ দিয়ে কন্যাকে বিয়ে করতে হাতে। যেমন রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১-১৯৪১খ্রি.) 'হৈমন্তী' (১৯১৪খ্রি.) গল্পে হৈমন্তীর বাবা অপুর বাবাকে বরপণ হিসেবে ১ জন দাসীসহ ১৫ হাজার টাকা ও ৫ হাজার টাকার গহনা দিয়েছিলেন। অন্যদিকে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬খ্রি.) 'পদ্মানদীর মাঝি' (১৯৩৬খ্রি.) উপন্যাসে পাত্র বঙ্কু গোপীকে বিয়ের জন্য কন্যাপণ হিসেবে কুবেরকে দেয় পাঁচ কুড়ি টাকা, তিন কুড়ি টাকার গহনা ও একদিনের ভোজ।

মনসার বিবাহের যৌতুক

মনসামঙ্গল কাব্যেও এ যৌতুক প্রথার উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসাকে জরৎকারু মুণির সঙ্গে বিয়ে দেবার সময় শিব দরিদ্র হয়েও কুবেরের সহযোগিতায় মনসাকে দেন- নাকের বেসর, নূপুর ও গলার হাসুলিসহ অন্যান্য অলংকার। আর জামাই জরৎকারুকে দেন- ধুতিবস্ত্র, সুগন্ধি, অগরু-চন্দন প্রভৃতি। যেমন-

'বিশ্ব কর্মা গড়ুক পদ্মার আভরণ।
নাকের বেসর, আর গলার হাসুলি।
পায়ের মল খাড়ু গড়ুক নূপুর পাসলি ॥'
হস্তের চারি তাড় গড়িল পরম সুন্দর ॥' -(পৃ-৭৯)

সহমরণ

তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সামন্তবাদী সমাজে আরেকটি অমানবিক ও পাশবিক প্রথা চালু ছিল, তা হলো সহমরণ ব্যবস্থা। মৃত স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীও পুড়ে মরে সতী হবার পৌরব লাভ করতো। এ সহমরণ প্রথার জন্য সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ বল্লালী বালাই বা কৌলিন্য প্রথার মাধ্যমে এক স্বামীর মৃত্যুতে সব বয়সী অসংখ্য নারী বিধবা হয়ে পড়তো। এসব বিধবা নারী অনেক সময় বৈধব্যের কঠোর একাদশী পালন করতে ব্যর্থ হয়ে বা সমাজের লালসার হাত থেকে অথবা জৈবিক চাহিদার দরুন বলাৎকার-ব্যভিচারে জড়িয়ে বংশে কলঙ্ক ডেকে আনতো। এসব নারীর স্থান স্বামী ও বাবার বাড়িতে মিলত না বিধায় পতিতা হওয়া ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকতো না। এসব বিষয় বিবেচনা করেই হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ-পুরোহিত সমাজপতিদের সঙ্গে পরামর্শ করেই কুল-বংশ, সমাজের পবিত্রতা রক্ষার্থে এ সহমরণ প্রথার প্রচলন ঘটান।

আবার অনেক সময় রাজনৈতিক কারণে বিধর্মী শাসকের রিরংসার হাত থেকে রক্ষা পেতেও এ বাংলার অসংখ্য হিন্দু রমণী আগুনে ঝাপ দিয়ে নিজের সতীত্বকে রক্ষা করতো। তবে নারীর এ আত্মবিসর্জনকে সমাজ সতী হবার গৌরব, স্বর্গের অক্ষয় লোকের সীমাহীন মর্যাদা-সম্মান পাবার বাতাবরণে ফলাও করে প্রচার করে উৎসাহ দিতো। বৈদিক যুগ থেকে চলে আসা এ প্রথাটি বল্লাল সেনের সময় এসে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় একটি প্রথায় রূপলাভ করে এবং বিভীষিকায় পরিণত হয়। পরবর্তীকালে রাজা রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রি.) ঐকান্তিক ও সাহসী পদক্ষেপের কারণে ১৮২৯ খ্রি. সহমরণ প্রথা আইনিভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। ফরাসি পর্যটক ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ার তাঁর গ্রন্থে এ বিষয়ে প্রামাণ্য ও বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এ সহমরণ প্রথার একাধিক চিত্র উল্লেখ পাওয়া যায়। শিবের মূর্ছাতে, চাঁদের ৬ পুত্রের মৃত্যুতে, অনিরুদ্ধের মৃত্যুতে ও লখিন্দরের মৃত্যুতে চণ্ডী-উষা, বেহুলা ও তার ৬ ভাসুর পত্নীদের সহমরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তবে সমাজে প্রচলিত প্রথার কারণে অপঘাতে (সর্পদংশন, বজ্রাঘাত প্রভৃতি) মৃত্যু হওয়ায় লখিন্দরসহ তার ৬ ভাইয়ের মৃতদেহ চিতায় না পুড়িয়ে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে শিব মনসার জাদু-মন্ত্রে পুনর্জীবিত হলে চণ্ডীও সহমরণ থেকে রক্ষা পান। শুধু শিবের অভিশাপে অনিরুদ্ধ ও উষা মানবদেহ ধারণ করার সময় এর আয়োজন করতে দেখা যায়। অনিরুদ্ধের চিতায় ঊষা আত্মাহুতি দান করেন-

‘পদ্মাবতী বোলে নাগ শোন মন দিয়া।
ঊষার তরে অগ্নিকুণ্ড দেও সাজাইয়া ॥

,,,

অগ্নিকুণ্ড সাজাইল যত নাগ সবে।
আড়ে দিঘে তের গজ নও গজ উভে ॥
আগর চন্দন কাঠে জ্বালিয়া অনল।
তার মধ্যে ঘৃত ঢালে নাগ সকল ॥

,,,

বাণের কুমারী উষা বড়হি সাহস।
অগ্নি মধ্যে ঘৃত ঢালে কলসে কলস ॥

,,,

ইন্দ্র চন্দ্র দিবাকর পূজি এক চিত্তে।
কুণ্ড প্রদক্ষিণ করি দাঁড়ায় জোড় হাতে ॥

,,,

এতেক বর যদি দিলা হুতাশন।
অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলা দুইজন ॥’ -(পৃ- ২০২-২০৫)

এভাবে দেখা যায়, সমাজের অযাচার, লালসা ও ব্যভিচারের হাত থেকে রক্ষা এবং পিতৃপুরুষ ও স্বামীর বংশীয় সম্মান বাঁচাতে পুরুষের দেয়া বিধান মোতাবেক নারীকে শুধু নয়, বরং তার জীবন বাসনা, স্বপ্ন-সাধ-আকাঙ্ক্ষাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছে যুগ যুগ ধরে।

সতীত্বের পরীক্ষা

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে চরমভাবে আঘাত করেছে সতীত্বের পরীক্ষার মাধ্যমে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও সহমরণের মাধ্যমে নারীর ব্যক্তিসত্তা যতটা না অপমানিত ও ভুলণ্ঠিত হয়েছিল, তার চেয়ে শতগুণ সন্দেহ ও অপবাদ নিয়ে আসে এ পরীক্ষা পদ্ধতি। যুগ যুগ ধরে পুরুষের চরিত্রের দোষ ত্রুটি ও লাম্পট্য নিয়ে সমাজ ও ধর্ম কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেনি। কিন্তু নারী পবিত্র ও পরিশুদ্ধ থাকার পরও তার কর্ম সাধনাকে তো মর্যাদা, অভিনন্দন জানানো হয়নি বরং কল্পিত শতদোষ-অপবাদ ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। এর সূচনা করেছিলেন রামচন্দ্রকে দিয়ে স্ত্রী সীতার ওপর অগ্নিপরীক্ষার মাধ্যমে অযোধ্যাবাসী।

মনসামঙ্গল কাব্যেও ধনঞ্জয় নামের প্রতাপশালী বণিক সওদাগর বেহুলার পরিবেশিত খাবার খেতে চায়নি। কারণ বেহুলার স্বামী লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করতে ৬ মাস একাকী নদীতে ভেসে দেবপুরীতে গিয়েছিল এবং তাদের ধারণা মতে বেহুলার চরিত্র আর পরিশুদ্ধ নেই, তার সতীত্বে কলঙ্কের কালিমা পড়েছে। এজন্য বেহুলাকে সতীত্ব

পরীক্ষা দিতে হবে। শুধু ধনঞ্জয় নয়, এরকম সমাজের বহু ধনঞ্জয়েরও এমনটাই দাবি পরিলক্ষিত হয়েছে। এসব পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধি ধনঞ্জয়দের চোখে রূপসী যৌবনবতী বেহুলার শারিরীক রূপ লাবণ্যই ধরা পড়েছে কিন্তু তার পতিপ্রাণা নারী চিত্তের সাধনার দৃঢ়তা দৃষ্টিগোচর হয়নি বা তারা দেখেও দেখেনি। কারণ নারীর এ দুঃসাধ্য, যশস্বী বিজয় কর্মে পুরুষ সমাজ খুশীতো হয়ইনি, বরং ভয় পেয়েছে এবং সমাজ ধর্মশাস্ত্রের প্রতি বড় ধরনের হুমকি মনে করেছে। কারণ-

মনুষ্য হইয়া বেউলা দেখিলা দেবগণ।
সফল হইল সিদ্ধি বেউলার বারণ ॥' -(পৃ-৫৪১)

তাই সমাজপতিদের খেয়াল খুশিতে গড়া শাস্ত্রের কাছে পরাভব মানতে বাধ্য করেছে নারী সমাজকে। আর নারী পরিবার, সমাজ ও ধর্মের কাছে পরাধীন বলে দৃশ্যমান হবার কারণে এ চাপানো বিধানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। পুরুষের চোখে নারী-

'তিন কালে স্ত্রীলোক নহে স্বতন্তর।
শিশুকালে রক্ষিতা বাপ থাকে সেই ঘর ॥
যুবা কালে রাখে স্বামী প্রাণের ঈশ্বর।
বৃদ্ধ কালেতে থাকে পুত্রের অভ্যন্তর ॥' -(পৃ-৫৪১)

তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে বেহুলা যেহেতু যুবতী অবস্থায় ৬ মাস স্বামী ছাড়া শ্বশুর, পিতা ও ভাইয়ের তত্ত্বাবধান মুক্ত হয়ে নদীতে একা যাতায়াত করেছে। সেহেতু সে তার সতীত্ব রক্ষা করতে পারেনি। তাই সমাজের দাবির মুখে বেহুলাকে এ সতীত্বের পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয়েছে। ধনঞ্জয় তাই বলেছেন-

'আপনে সকল জান শোন সদাগর।
মড়া লইয়া ছয় মাস ভাসিল সাগর ॥
নানা কণ্টক পথে আছে সাগরের পানি।
শুদ্ধভাবে আছে বেউলা নহে হেন জানি ॥
বিনে পরীক্ষায় অন্ন না করিব ভোজন।
পরীক্ষা লইয়া শেষে যেবা লয়ে মন ॥' -(পৃ-৫৪২)

সমকালীন সমাজে নারীর সতীত্বের পরীক্ষার মাধ্যম বা ধরন হিসেবে অনেকগুলো পদ্ধতি গ্রহণ করা হতো। এদের মধ্যে অগ্নিপরীক্ষা, ঘৃতকাঞ্চন পরীক্ষা, জতুগৃহ পরীক্ষা, সেতু পারাপার পরীক্ষা, জলে ভাসা পরীক্ষা, তুলা পরীক্ষা এবং ধান পরীক্ষা অন্যতম। বেহুলাকে ঘৃত কাঞ্চন, জতুগৃহ ও অগ্নিপরীক্ষার মতো এ তিনটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়-

'প্রথম পরীক্ষা দিব ঘৃত-কাঞ্চন।
আর পরীক্ষা জৌত ঘর নির্ম্মাণ ॥
আর পরীক্ষা রাম দিলেন সীতারে।
এই তিন পরীক্ষায়ে শুদ্ধ হইতে পারে ॥' -(পৃ-৫৪২)

এমন প্রস্তাব শোনে বেহুলা মনের দুঃখে অভিমানে সমাজ-সংসার ছেড়ে চলে যাবার ঘোষণা দেয়। কারণ স্বামী লখিন্দরকে বাঁচাতে তার শ্বশুর-শাশুড়ি, সমাজ-স্বজনেরা ছুটে আসেনি, সাহায্যের হাত বাড়ায়নি বরং তার মতো অসহায় সতী-সাধ্বীকেই একা এরূপ দুঃসাধ্য কাজে অগ্রসর হতে হয়েছিল। যাত্রাপথের নানা বাধা বিপত্তি, লোভ-লালসা বুদ্ধি দিয়ে, বল দিয়ে, ধৈর্য দিয়ে ও কর্মকুশলতা দিয়ে সর্বোপরি পতিপ্রাণা নারীর সতীত্বের জোরে বেহুলা

সফল হয়। কিন্তু সমাজ সংসারের কাছ থেকে এমন সন্দেহের অপবাদ পেয়ে এবার বেহুলা সত্যিই হতবল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাই সে আরাধ্য দেবী মনসার বরে ও সতীত্বের জোরে এ তিন পরীক্ষায় উর্ত্তীণ হয়ে স্বামীকে নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে অর্থাৎ স্বর্গলোকে পাড়ি জমায়-

'এহা শুনি কহে তবে বেউলা সুন্দরী।
সকল জ্ঞাতির স্থানে হস্ত জোড় করি ॥
পদ্মার বাদ খণ্ডাইতে আসিলাম মর্ত্ত্য ভুবন।
বাদ খণ্ডিলে স্বর্গে করিব গমন ॥
পদ্মার বাদ খণ্ডিল বাদ হইল দূর।
এইক্ষণে যাব আমি মহাদেবের পুর ॥
চম্পকনগরে আর না কবির ভোজন।' -(পৃ-৫৪২-৫৪৩)

এভাবে সমাজ সংসারে প্রতি অভিমানী বেহুলা না খেয়ে, স্বজনদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে মায়াবী পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গলোকে পাড়ি জমায়। বেহুলার এ স্থানান্তর মূলত সমাজে দুঃশাসন ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কোন নারীর প্রতীকী প্রতিবাদ। বেহুলার বহুপর্বেও একজন এমন প্রতিবাদের পতাকা উড়িয়েছিলেন; তিনি পুরুষ নন বরং সতী-সাধ্বী সীতা।

নারীর দায় ও আত্মসমর্পণ

বাঙালি সমাজ জীবনে নারীর সমাজ-সংসার, স্বামী ও সন্তানের এ চতুর্মাত্রিক দায় তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ একজন নারীকে তার সমগ্র জীবনে এ চারটি বিষয়ের দাবি-দাওয়া, অভাব-অভিযোগ মোকাবেলা করতে হয় জীবনের বিনিময়ে। আর নারীর জীবনের স্বপ্ন-সাধ, কামনা-বাসনার, উত্থান-পতন ঘটে এ চতুর্মাত্রিক উপাত্তকে আশ্রয় করেই।

মনসামঙ্গল কাব্যের নারীগণও এর ব্যতিক্রম নয়। মনসা, সনকা ও বেহুলার জীবনও আবর্তিত হয়েছে এ চারটি বিষয়কে উপজীব্য করে।

বেহুলার আত্মসমর্পণ

বেহুলাও স্বামী সংসারের দায় এড়াতে পারেনি। কারণ পূর্ব নিয়তি অনুসারে এবং পিতা চাঁদের একগুয়েমি ও বিরোধিতার কারণে মনসার কোপানলে লখিন্দরের বাসর রাতে মৃত্যু হয়। এ মৃত্যুর দায়ভার গিয়ে পড়ে সম্পূর্ণ বেহুলার ওপর। শ্বশুর-শাশুড়ি ও সমাজ বেহুলাকে রাক্ষুসী, কুলক্ষ্মী ও ভাতারখাগী বলে গঞ্জনা দিয়েছে। বাধ্য হয়ে বেহুলা স্বামী মৃত্যুর দায় নিজ মাথায় নিয়ে মনসাপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করে-

'সোনাই বলে বেউলা তুমি লঘুচর জাতি।
বিহার রাত্রে খাইলা পতি নহে বাসি রাত্রি ॥

,,,

বেউলা বলে মালি তুমি বড় গুণবান।
অভাগিনী বেউলা আমি কর অবধান ॥
বিধাতা পাষণ্ড হইলে কার্য্যে নাহি ভাস্য।
বিহার রাত্রে স্বামী মরে লোকে উপহাস্য ॥
শরীর বিদরে মোর বুক যায়ে চির।
মরা স্বামী লইয়া ভাসি গাঙ্গুরির তীর ॥

পার হইতে নাও নাহি নাহিক দোসর।
কলার মাজুষে চড়ি তরিব সাগর ॥' -(পৃ-৪৩৫-৪৩৯)

বেহুলাকে তার ভাই হরিসাধু স্বামী পুনর্জীবিতকরণের এমন দুঃসাধ্য কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে নানা অলংকার, শাড়ির লোভ দেখান এবং বাবার বাড়িতে আশ্রয় নিতে বলেন। কিন্তু স্বামী ব্যতীত বিধবা নারীর জীবন বাস্তবতা উপলব্ধি করে বেহুলা বলেছে-

'বেউলা বলে ভাই তুমি না বল উচিত।
স্বামী অভাবে নারী জীবন কুৎসিত ॥
চাউল দিবা কাষ্ঠ দিবা আর দিবা হাঁড়ি।
তোমার বধূয়ে বলিব বেউলা কাঁচা রাঁড়ি ॥' -(পৃ-৪৫৩)

সমাজে পুরুষ প্রচারিত ধর্মের সকল দায়ভার নারীকেই একা বহন করতে হয়েছে। ধর্মাচার-শাস্ত্রাচার এ সবের সুবিধা নিয়েছে পুরুষ সমাজ। আর নারীকে দেয়া হয়েছে সকল ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংযম রক্ষার সাধনা ও বিধি-বিধান। বেহুলা স্বামীর এ মৃত্যুজনিত অপবাদ গঞ্জনায় আরাধ্য দেবী মনসাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে-

'বেউলা বলে ধর্ম তোমার কেমন যন্ত্রণা।
স্ত্রী হইয়া এত দুঃখ পায়ে কোন জনা ॥
বিহার রাত্রি স্বামী মরে অযশ ঘোষণা।
বুঝিতে না পারি পদ্মা তোমার মন্ত্রণা ॥' -(পৃ-৪৪৬-৪৪৭)

নারীর এ আত্মত্যাগ প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন তার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন– আমাদের দেশে রমণীগণের কষ্টের সীমা নাই। দৈনন্দিন গার্হস্থ্য জীবনে পরার্থে আত্মোৎসর্গ, উপবাস, ব্রতাদির কঠোরতা ও স্বামীর জন্য প্রাণত্যাগ- তাই নানাবিধ সদগণের প্রতিভা যেন আপনা আপনি সমাজ হইতে সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া বেহুলার ন্যায় আদর্শ চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছে (পৃ- ১৮৯-১৯০)।

নারীর অবমাননা

মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজে নারীর ওপর জুলুম নির্যাতন ও তার নারীত্বের অবমাননা হর-হামেশাই ঘটেছে। কারণ- ধর্ম ও সমাজ ছিল পুরুষের হাতিয়ার এ হাতিয়ারকে তারা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। অর্থনৈতিক শক্তি, ধর্মীয় বিধান ও সমাজ শাসনের ক্ষমতা এককভাবে পুরুষের হাতে থাকায় কার্যত নারীশ্রেণি তাদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে যায়। পুরুষ প্রভুর খেয়াল-খুশি ও ইচ্ছার মূল্য দিতে গিয়ে নারী তার মানবিক সত্তা হারিয়ে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ও পাশা-জুয়ার বিনিময়ের ঘুটিতে পরিণত হয়। মনসামঙ্গল কাব্যে নারীর অবমাননার চিত্রও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে–

টেটনের স্ত্রী অবমাননা

নারীর ব্যক্তিসত্তার ওপর চরমভাবে আঘাত করেছে জুয়ারি টেটন। জাতিতে মালাকার এ টেটন শুধু ভোগবিলাস আর জুয়া খেলেই বণিক পিতার অঢেল সম্পদ নষ্ট করেছে। অবশেষে নিজ স্ত্রীকে বাজি ধরে জুয়া খেলে হারিয়েছে। এভাবে সে ৪ জন স্ত্রীকে জুয়া খেলার বিনিময়ের বস্তুতেও পরিণত করেছে। যেমন-

'জাতি মালাকার আমি সাধুর নন্দন।
শিশুকালে মৈল বাপ থুইয়া বহুধন ॥
বাপের ধন হারাইলাম করি অবহেলা।
সকল ধন হারাইলাম খেলাইয়া খেলা ॥

কাইল খেলায় হারিয়াছি ঘরের নারী।
সেই খেলা অভাগিয়া পাসরিতে নারি ॥
খাইতে নাহিক অন্ন পরিতে বসন।
ঘরের নারী হারাইলাম কি হবে এখন ॥' -(প-৪৬৩)

সুতরাং দেখা যায়, তৎকালীন সমাজে নারী তার আপন মানবিক সত্তা হারিয়ে হাতফেরি বিনিময়ের মুদ্রা ও পণ্যদ্রব্যে পরিণত হয়ে গিয়েছিল।

নারীর প্রতিবাদ

মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজে নারীর সম্মানযোগ্য কোন অবস্থান ছিল না। শুধু 'পুত্রার্থে ক্রিয়াতে ভার্য্যা' অর্থাৎ পুত্র সন্তানের জননী হিসেবে নারীকে কিছুটা গুরুত্ব দেয়া হতো। 'জননী' নামে বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজ ভক্তিতে, বিশ্বাসে, আনুগত্যে অগ্রগামী হলেও কন্যা ও স্ত্রীর মান মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে উদাসীন, অমনোযোগী ও নির্বিকার। সমাজ-সংসার, স্বামী ও সন্তানের দায়ভার একা বহন করে, জীবন বিসর্জন দিয়েও নারী পুরুষ তান্ত্রিক সমাজের ন্যূনতম সহানুভূতি, সমবেদনা ও সম্মান পায়নি। তাই এ পুরুষ শাসিত সমাজ ধর্মের প্রাধান্য, প্রতাপ ও আগ্রাসনের মধ্যে থেকেই নারীরা মাঝে মাঝে প্রতিবাদী-বিদ্রোহী হয়ে ওঠেছে। যদিও এ প্রতিবাদের ধরণ ছিল নারীর সহজাত স্বভাবের আয়ত্তাধীন, অভিশাপময় ভক্তি, অভিমানী কর্ম সর্বোপরি আত্মবিসর্জন। এ প্রতিবাদ-বিদ্রোহের মাত্রা যদিও দেখতে মনে হবে পুরুষতান্ত্রিক সমুদ্রের মাঝখানে অবস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সদৃশ, তথাপি তা সমুদ্রের স্বাভাবিক গতিপথের প্রতিবন্ধকতা স্বরূপ। সহসা জেগে ওঠা নারীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এ প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরে পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিও কেঁপে ওঠেছে। এমন সত্তাসন্ধানী জাগরণের সামিল হয়ে নারীও তাই বলতে পেরেছে-

ক. 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা?

,,,

যাব না বধূবেশে বাসর কক্ষে বাজায়ে কিঙ্কিনী
আমারে প্রেমের বীর্যে করো অশঙ্কিনী
বীর হস্তে বরমাল্য লব একদিন।'[৯৮] –(সবলা; মহুয়া)

খ. 'চোখে চোখে আজ চাহিতে পার না; হাতে রুলি, পায়ে মল
মাথায় ঘোমটা, ছিঁড়ে ফেল নারী, ভেঙে ফেল ও শিকেল !
যে-ঘোমটা তোমা করিয়াছে ভীরু ওড়াত সে আবরণ !
দূর করে দাও দাসীর চিহ্ন ঐ যত আভরণ !'[৯৯] –(নারী; সাম্যবাদী)

নারী তার অধিকারের প্রশ্নে ধীরে ধীরে জেগে ওঠতে শুরু করে। ধর্মে ও সমাজে তার অবস্থান, অধিকার ও ব্যক্তিসত্তার স্বীকৃতি আদায়ে সোচ্চার হয়ে ওঠে। তার জীবন ও জীবিকার অবলম্বনে যখন অন্যায়ভাবে নির্যাতন নিপীড়ন ও আঘাত করা হয়েছে। তখন নারী আর পূর্বেকার মতো নির্বাক, নিশ্চুপ ও নিশ্চেষ্ট না থেকে প্রতিবাদ করেছে।

বেহুলার প্রতিবাদ

আবার বিয়ের সময় মনসার চক্রান্তে লখিন্দর মূর্ছাহত হয়ে পড়লে তাকে সুস্থ করতে বেহুলা মনসাপুরীতে যায়। কিন্তু প্রবেশ করার সময় বাঁধা পেলে দারোয়ান ধামুকে এবং মনসার প্রথম পর্যায়ের উদাসীনতায় বেহুলা নিশ্চুপ না

থেকে বরং প্রবলভাবে প্রতিবাদ করেছে। আরাধ্য দেবতা বলে মনসাকেও বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়নি বরং ন্যায় ও ন্যায্যভাবে অধিকার বা দাবি আদায় করে বলেছে–

ক. ‘বেউলা বলে তোমরা কহ পদ্মার ঠাই।
দ্বার মানা হইল যদি আমি ঘর যাই ॥
শিবের সেবক বাপু আমি তার ঝি।
না করিব পদ্মার পূজা আমার হবে কি ॥’ –(পৃ-৩৯৯)

খ. ‘কর জোড়ে বলে বেউলা হইয়া বিকল।
সেবক ভাঁড়িতে তুমি এত পাত ছল ॥
কোন অপরাধ করিলাম আমি তোমার ঠাই।
যোগ্যফল দিলা মোরে বিষহরি আই ॥

,,,

মহাদেবের কন্যা হইয়া স্থির নাহি বোল।
বিহার কালে কর কেন এত গণ্ডগোল ॥’ -(পৃ-৪০৩)

এভাবে বেহুলা তার অধিকার আদায়ের প্রশ্নে শুধু দেবীর জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেনি, সঙ্গে সঙ্গে দেবীর ব্যক্তিগত স্বভাব-বৈশিষ্ট্য নিয়েও কটূক্তি করতে বাদ দেয়নি। এ ক্ষেত্রে বলা যায়- ‘মনসামঙ্গল কাব্যে তাই মানুষের সুখ-দুঃখের প্রথম জয়গানই নয়, পিতৃতান্ত্রিক সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রয়াসটিও বিশেষভাবে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।’[১০০] বিক্ষিপ্তভাবে হলেও নারীর জাগরণ, অধিকারের বিষয়ে সচেতন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর এ পর্যায়ে প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়।

নারীর কর্মক্ষেত্র

মধ্যযুগে বাঙালি নারী তার অলাভজনক সাংসারিক কাজ বাদেও কিছু অর্থ উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত হতো। যদিও কিছু নিম্নবর্ণের নারীরা এ ধরনের কাজ করতো, বিধায় সমকালে এর গুরুত্ব কম ছিল। কারণ এরা ছিল সমাজের মূল স্রোতধারার বাইরের বাসিন্দা।

পাটুনী বা ডোমনী

তৎকালীন সমাজে ডোম নারীদেরও খেয়া ঘাটে পাটুনীর কাজ করতে দেখা যায়। জালুয়া ডোমের স্ত্রী গৌরী সরযূ নদীর ঘাটে মহাদেবকে কড়ির বিনিময়ে পার করে দেয়। যেমন-

‘হাত সানে মহাদেব ডাকে বারে বার।
কৌড়ি লইয়া ডুমনি আমারে কর পার ॥

,,,

জালুয়া ডোমের নারী গৌরী নাম তার।
খেওয়া নাও পাতিয়া গোসাইরে করে পার ॥’ -(পৃ-১৬-৩৩)

গোয়ালিনী

তৎকালে গোয়াল রমণীরা দই, ঘোল, ছানা ও অন্যান্য দুগ্ধজাতীয় পণ্য হাট-বাজার, গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বিক্রি করতো। দেবী মনসার গোয়ালিনী ছদ্মবেশ থেকে এর প্রমাণ মেলে-

‘চলিল বিষহরি গোয়ালিনী বেশ ধরি
হরিতে সঙ্কুর নগর।

পরি পট বসন   অঙ্গে দিব্য আভরণ
দধি লইয়া বিস্তর ॥’ -(পৃ-১৬৯)

দাই-দাসী

তৎকালীন সমাজে ধনী-অবস্থাপন্ন গৃহে অনেক দাই, দাসী ও কাজের ঝি নিয়োগ দেয়া হতো। সনকার রতি দাই, মনসার নীলাবতীসহ একশত দাসী এবং বেহুলারও একশত সখী পর্যায়ের দাসী ছিল। যেমন-

ক. ‘এতেক শুনিল যদি ধাই নামে রতি।
শ্রীকলার হাটে যায়ে করিতে বেসাতি ॥’ -(পৃ-৩১২)

খ. ‘তবে বেউলা পরিলেক নানা অলঙ্কার।
সখীগণ লইয়া চলে দিঘি মুক্তা সার ॥’ -(পৃ-৩২৩)

গ. ‘চারিদিকে চাহে বেউলা রাজঘাটে বসি।
জল ভরিবারে আইসে মনসার দাসী ॥
একশত দাসী আইল বড়হী সুঠান।
নীলাবতী নামে দাসী সবের প্রধান ॥’ -(পৃ-৪৭১-৪৭২)

বাইজি-বারাঙ্গনা

সামন্তবাদী সমাজে বাইজি-বারাঙ্গনার প্রচলন স্বাভাবিক ভাবেই বেড়ে গিয়েছিল। কারণ সামন্ত প্রভু ও অভিজাত ব্যক্তিবর্গের ভোগ-বাসনা পূরণ করতে এ শ্রেণিকে গড়ে তোলা হয়েছিল। আবার এদের সংখ্যা ও সৌন্দর্যের ওপর সামন্ত প্রভুর আভিজাত্য-গৌরব নির্ভর করতো। এছাড়া বাইজিগণ নৃত্য-গীত, বেশ-ভূষা, ছলা-কলায় পারদর্শী থাকতো বিধায় সামন্ত শাসকেরা এদের গুপ্তচর হিসেবেও নিয়োগ দিতেন। অভিজাত শ্রেণি, সৈন্য সামন্ত, নাগরিক সমাজের বিনোদন ও সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষায় এ আদিম পেশাকে টিকিয়ে রাখা হয়। মনসা বারাঙ্গনার বেশে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করেছেন এবং লখিন্দরের বর যাত্রায় অংশগ্রহণ করতে এদের দেখা যায়। যেমন-

‘নটীরূপে পদ্মা গেল চান্দর নগর।
সুললিত নাচে গায়ে অতি মনোহর ॥
গীত গাহে মহাদেবী রাগে নহে ঢিল।
আলাপেন গীত যেন বসন্ত কোকিল ॥
গীত শুনিয়া চান্দর মজিলেক মন।
নটীর দিগে চান্দে চাহে ঘন ঘন ॥’ -(পৃ-১৫৮-১৫৯)

নৈতিক মূল্যবোধ

সামন্তবাদী বণিক সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের ধারা হ্রাস পেতে শুরু করে। তৎকালীন সমাজে ভূমির জোর, বিত্তের জোর ও বাহুর জোরই ছিল সম্মানের মানদণ্ডের পরিচায়ক। সঙ্গত কারণেই সামন্তপ্রভুর হাতে ভূমি, বিত্ত, বাহুবল ও ধর্ম কুক্ষীগত থাকায় অভিজাত শ্রেণি ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে ওঠে। ভূমি আর নারী ভোগ দখল করাই হয়ে ওঠে এদের প্রধান লক্ষ্য। অন্যদিকে সমাজের দীন-হীন শ্রমিক বঞ্চিত জনগোষ্ঠীও জীবনের প্রতিকারহীন হতাশা থেকেও হয়ে ওঠে ভোগী, আত্মঘাতী ও আসঙ্গলিপ্সু। জীবনের স্থিতি না থাকায় বাঙালি সমাজে ভোগ ও বৈরাগ্য সমান মাত্রায় সক্রিয় থেকেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যে বণিক সমাজে ও অভিজাত কাজি শ্রেণির মধ্যে নৈতিকতার বন্ধন ছিল শিথিল। আবার গরীব শিব, কৈবর্ত জেলে, গোদা, ঘাটের মাঝি, ধনা-মনা ও সাধারণ নর-নারীর চারিত্রিক স্থলন পরিলক্ষিত হয়।

ক. চাঁদের নৈতিকতার অবক্ষয়

বণিক চাঁদ সওদাগর নটীরূপী মনসাকে দেখেই কামনায় অস্থির হয়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েন। এ কারণেই তিনি মহাজ্ঞান হারান। আবার মনসা তার কাছে পূজা চাইতে এলে তিনি একাধিকবার আলিঙ্গন ও রতি শৃঙ্গার প্রার্থনা করেন। আবার স্ত্রীর সনকার কাছে শালীকে আলিঙ্গন করার ইচ্ছা প্রকাশের মধ্য দিয়ে চাঁদের রিরংসা লালসার উদগ্ররূপ পায়। অন্যদিকে মনসার ষড়যন্ত্রে একেবারে সর্বস্বান্ত ও নিঃস্ব অবস্থাতে উপনীত হয়ে কাঠ বিক্রির ৪ পণ পয়সা হাতে পেয়েই চাঁদ বলেছেন-

'এক পোন দিয়া আমি ক্রিয়া শুদ্ধি করিমু।
এক পোন দিয়া আমি চিড়া কলা খামু ॥
এক পোন দিয়া আমি নটী নৃত্য চাব।
আর এক পোন দিয়া আমি সোনকা ভেটিব ॥' -(পৃ-২৯২)

খ. গোদার নৈতিক অবক্ষয়

নদীতে বেহুলাকে একা যেতে দেখে জেলে গোদার কামনার আগুন জ্বলে ওঠে। দরিদ্র ও রোগগ্রস্ত গোদাও বেহুলাকে নানাভাবে প্রলোভন দেখাতে থাকে। বেহুলা গোদার কথায় কান না দিলে বেহুলাকে ধরতে নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে-

'ভোলে পড়িলা গোদা সুন্দরী দেখি জলে।
মদন উনমত্ত গোদা নাচে কতুহুলে ॥

,,,

বেউলার ধরিতে গোদা জলে দিল ঝাঁপ।
বেউলারে ধরিতে যায়ে মনের সন্তাপ ॥' -(পৃ-৪৫৫-৪৫৮)

গ. সামাজিক মূল্যবোধের বিপর্যয়

সমাজের সর্বস্তরে পুরুষের এমন নৈতিক অধপতনের কারণে আযাচার-ব্যভিচার বহুগুণে বেড়ে যায়। তাই এ ভয়েই চাঁদ বেহুলাকে একা দেবপুরীতে যেতে প্রথমে বারণ করেন-

'কূলে কূলে যাবা তুমি লাগ পাই ঘাটে।
লখিন্দর জলে ফেলি তোমা নিব ঠেটে ॥' -(পৃ-৪৩৮)

ঘ. নারীর পরকীয়া প্রবণতা

সমাজে নৈতিকার শৈথিল্য শুধু পুরুষের ছিল না বরং সাধারণ অভিজাত, যুবতী ও বৃদ্ধাদের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়। বেহুলার বিয়ের সময় আগত রাধা, রই, নীলা, রূই, রূপাই, চুয়া ও এক বৃদ্ধার পতিনিন্দার মাধ্যমে নারীদের ব্যভিচারী ও অযাচারী জীবনের ইঙ্গিত দেয়। একজন নারী লখিন্দরকে নিয়ে দেশান্তরি হবার কথা বলেছে। আর এক বৃদ্ধার বয়স কমানোর ব্যর্থ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েও এ দিকটি উন্মোচিত হয়েছে। যেমন-

'তাহারে দেখিয়া মোর গায়ে লাগে সলি।
লখাইর পায়ে কাটিয়া তাহারে দেই বলি ॥

,,,

মাগিয়া খাই যদি তবু মোর সুখ।
অনুক্ষণ দেখিব আমি লখাইর চন্দ্রমুখ ॥ -(পৃ-৩৮৩-৩৮৪)

এ সব আয়াগণের কথায় কামনা-বাসনা, লালসা ও রিরংসার আভাস ইঙ্গিত মেলে। জীবন যৌবনের ব্যর্থতা ও অচরিতার্থতায় নারীগণ প্রায় ভেকধারী বৈষ্ণবীতে পরিণত হয়ে পড়েছে।

ঘুষ-দুর্নীতি

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজে শুধু ভোগ-বিলাস, অযাচার-ব্যভিচার ও লাম্পট্যই প্রচলিত ছিল না বরং সঙ্গে সঙ্গে ঘুষ-দুর্নীতি সমাজকে সমানভাবে গ্রাস করছিল। কারণ স্বৈরাচারী সামন্ত প্রভুগণ তোয়াজ-তোষামোদ, চাটুকারিতা পছন্দ করতেন বা প্রশ্রয় দিতেন। বিলাসী-ব্যভিচারী-অলস-অকর্মণ্য সামন্ত শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তার অধিনস্ত মন্ত্রী-উজির, সেনাপতি, কতোয়াল, সৈনিকসহ আমলাগণ নানা রকম ঘুষ-দুর্নীতিতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এমনকী সমাজে বণিক, অভিজাত ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষেরাও এসব দুর্নীতি, মিথ্যা ও প্রতারণার সঙ্গে কম-বেশি পরিচিতি ছিল। এসব অপকর্ম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যেও ঘুষ-দুর্নীতি ও প্রতারণার চিত্র পরিলক্ষিত হয়। চাঁদ সওদাগর যখন তার ১৪ নৌকা নিয়ে দক্ষিণ পাটন রাজ্যে উপনীত হন, তখন সে দেশের নগর কতোয়াল চাঁদের কাছে থেকে ঘুষ হিসেবে টাকা, পান ও সুপারি গ্রহণ করেন-

‘এমতে না পাবা বর এরকম ভক্তি।
যদি পাবা বর সোনা আন এক রত্তি ৷৷
লক্ষ লক্ষ আছে তথা রাজার চৌকিদার।
,,,
সর্ব্বলোকে আনে সোনা এক এক রত্তী।
সোনা দিয়ে বর মাত্র কেমন ভক্তি ৷৷’ -(পৃ-২৫২)

এছাড়া কোন কিছুর জন্য আবেদন নিবেদন করতে গেলেও সামন্ত রাজাকে নানা উপহার ভেট সামগ্রী দ্বারা তুষ্ট করতে হতো। এমনকি বিনয় বাক্য ও স্তুতি-স্তব গান করে প্রশংসা করতে হতো। চাঁদ সওদাগর তার বাণিজ্য দ্রব্য বিনিময় করতে গিয়ে অনেক প্রকার মিথ্যা-প্রতারণা ও কূটকৌশলের আশ্রয় নেন। এতে করে দক্ষিণ পাটন রাজার মনে বাঙালি চাঁদ সম্পর্কে বিরূপ ধারণার জন্ম হয়-

‘বিষম বাঙ্গালী লোক   প্রকারে মারিব তোক
সেই লাগি আনিছে বিষফল।
আসিছে বিস্তর ঠাটে   যুজিতে কেহ না আঁটে
প্রকারে খাওয়ায়ে বিষফল ৷৷’ -(পৃ-২৬০)

অন্যদিকে শিব রিরংসা কামনায় স্ত্রী চণ্ডীকে প্রতারণা এবং মনসা পূজা আদায়কল্পে চাঁদ ও ধন্বন্তরি সঙ্কুর ওঝার সঙ্গে মিথ্যা প্রতারণা ও বারাঙ্গনার ছদ্মবেশে ভণ্ডামির আশ্রয় নিয়েছেন। নিজ স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য তৎকালীন সমাজের মানুষ যে কোন অপকর্মমূলক কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করতো না। এভাবেই বাঙালি সমাজ ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে চলে যায়। যার চরম প্রকাশ ঘটে পলাশীর (১৭৫৭খ্রি.) যুদ্ধের সমসাময়িক কালে।

সততা ও সাধনা

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজের নৈতিক অধপতন এবং মূল্যবোধের বিপর্যয়ের বিপরীত মেরুতে সততা ও শুদ্ধাচারী নৈতিক সাধনার চিত্রও সগৌরবে বিদ্যমান ছিল। কারণ হিন্দু ও মুসলমান সমাজে তখনো ধর্মীয় বিধি-বিধানের নৈতিক বল-বিশ্বাস, মানবিক ও মাঙ্গলিক উপাসনার ধারা অব্যাহত ছিল। এ সকল শুদ্ধাচারী মানুষ সমাজের নানা বিপর্যয়ের মধ্যে থেকেও নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

ক. তারাপতির সততা

মনসামঙ্গল কাব্যেও এ ন্যায়পরায়ণতা, সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন চাঁদ সওদাগর কর্মকার সর্দার তারাপতিকে দিয়ে লোহার বাসর ঘর নির্মাণ করছিলেন, তখন মনসা এসে তারাপতিকে পরিবারসহ প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র করতে বলেন। কিন্তু তারাপতি ভবিষ্যৎ বিপদের সকল আশঙ্কা করেও এমন ঘৃণ্য, প্রতারণামূলক ও কপটতাপূর্ণ কাজ করতে রাজি হয়নি। বরং নিজের সততার ওপর পূর্ণ আস্থা রেখে মনসার সামনেই ঘোষণা দিয়েছে-

> 'অষ্ট নাগের মাতা তুমি সর্ব্ব লোকে জানে।
> অকারণে আসিয়াছ আমার বিদ্যমানে ॥
> ফিরিয়া ঘরেতে যাও করি নমস্কার।
> আমা দিয়া কার্য্যসিদ্ধি নহিব তোমার ॥
> যাহার নিমক খাই তার কার্য্য করি।' -(পৃ-৩৫৪)

যদিও তারাপতি তার এ সত্যনিষ্ঠায় শেষ পর্যন্ত অবিচল থাকতে পারেননি, নিরুপায় হয়ে মনসার কথা মতো কাজ করতে হয়েছে। তথাপি তারাপতির সততা ও নিষ্ঠায় কোন কালিমা পড়েনি। কারণ তারাপতি একাজের উপলক্ষ্য মাত্র, বরং লখিন্দের নিয়তি জন্মের পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়েছিল।

খ. বেহুলার সাধনা

বেহুলা তার সতীত্বের সাধনা দিয়ে তৎকালীন সমাজের প্রচলিত ধারণাকে আমূল পাল্টে দিয়েছিল। সবার ধারণা ছিল বেহুলা মৃত স্বামীকে গাঙ্গুরের জলে ফেলে দিয়ে কোন পরপুরুষের হাত ধরে জীবন-যৌবন সার্থক করে তুলবে। কিন্তু পতিপ্রাণা বেহুলার চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং সতীত্বের সাধনা ছিল অদম্য। তাই সে শ্বশুর, শাশুড়ি, বাবা-মা, ভাই ও নিকট স্বজনদের বলতে পেরেছিল-

> 'যাইব পদ্মার পুরী দড়াইছি মন।
> মড়া স্বামী জিয়াইব ভাসুর ছয়জন ॥
> হারাইছে যত ধন করিব উদ্ধার।
> লোকেতে রাখিব যশ আসিব আরবার ॥
> জিয়াইতে না পারি যদি না আসিব আর।
> জলে ঝাপ দিয়া প্রাণ তেজিব আমার ॥' -(পৃ-৪৪৯)

বেহুলা তার পতিপ্রাণা মন, সতীত্বের সাধনার জোরে যাত্রা পথের সকল লোভ-লালসা, বাধা-বিপত্তি পাড় হয়ে নিজ কর্মদক্ষতা, উপস্থিত বুদ্ধি ও প্রতিবাদী নারী সত্তার মাধ্যমে স্বামী, ভাসুর ও শ্বশুরের ধন-সম্পদ পুনরুদ্ধার করে প্রত্যাবর্তন করতে পেরেছিল। এ সতীত্বের ও সত্যপথের সাধনাই তাকে দিয়েছিল দেবতার মহিমা।

বেহুলার সতীত্বের এ সাধনা প্রসঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন- 'সে ছয় মাস স্বামীর গলিত শব বক্ষে করিয়া ভেলায় ভাসিয়াছে, কত লোক তাঁহাকে লাভ করিতে হাত বাড়াইতেছে- সতীত্বের জোরে, কপালের সিন্দুরের জোরে বেহুলা চলিতেছে, তাহাকে কে স্পর্শ করিবে? ,,, সে কত প্রলোভন দলন করিয়া স্থলকুম্ভীর ও জলকুম্ভীরের লেলিহান জিহ্বা ও মুক্ত দশন হইতে একাগ্রতার বলে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া কঠোর তপস্যায় স্বজনবর্গকে বাঁচাইয়া আনিয়াছে।'[১০১]

আবার রামগতি ন্যায়রত্ন বেহুলার এ সাধনা ও পতিপ্রাণা রমণী হৃদয়ের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন-

'স্ফীত গলিত কীটকুলিত পুতিগন্ধি মৃতপতিকে ক্রোড়ে লইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে ও নির্ভয় মনে বেহুলার মান্দাসে যাত্রা ভাবিতে গেলে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সতীগণের পতিনিমিত্তক সেই ক্লেশ ভোগও সামান্য বলিয়া বোধ হয় এবং বেহুলাকে পতিব্রতার পতাকা বলিয়া গণ্য করিতে ইচ্ছা হয়।'[১০২]

মধ্যযুগীয় নারী অবমাননার কালে সতী-সাধ্বী বেহুলার এ নির্ভীকতা, নির্লোভ, নিষ্কামব্রতী সাধনা ও সাফল্য রমণীকুলের জন্য আদর্শ ও আশার দীপশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছিল।

যুদ্ধ ও সামাজিক নিরাপত্তা

সামন্তবাদী সমাজে মানুষের জীবনের কোন স্থিতি বা নিরাপত্তা ছিল না বললেই চলে। কারণ সামন্ত প্রভু বা শাসকদের সিংহাসনকেন্দ্রিক ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে গিয়ে বিভিন্ন যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্ভব হতো। এসব যুদ্ধ হতো দুই বিবাদমান শাসক, জমিদার, বিদ্রোহী সেনাপতি, বিজাতি-বিধর্মী ও বিদেশী শক্তির মধ্যে। কিন্তু দেখা যেত, এ দুই পক্ষের যুদ্ধে সাধারণ জনগণের জান-মাল, ঘর-বাড়ি, শস্য-সম্পদ বিনষ্ট হতো বেশি। অনেকটা- 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ, উলু খাগড়ার প্রাণান্ত'-র মতো এসব যুদ্ধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অভিশাপ বয়ে আনতো।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এ যুদ্ধকেন্দ্রিক ধ্বংসযজ্ঞ, মৃত্যুর বিভীষিকা, আর্ত-চিৎকার, রক্তের হোলি উৎসবের মত্ততা ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলতে দেখা যায়। মনসা কর্তৃক যমের সঙ্গে যুদ্ধ ও হাসনাহাটীর কাজির সঙ্গে যুদ্ধে অনিবার্যভাবে দেখা দেয় মৃত্যু আর ধ্বংস লীলা। জোলাহাটীর ও কাজিহাটীর যুদ্ধের বিভীষিকায় হাসন কাজির মায়ের আর্তনাদে পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠেছে-

'কান্দে হোসেনের মায় হাতে লইয়া মধু।
এক রাইতে মৈল মোর সাতশত বধূ ॥
কান্দেন হোসেনের মায় হাতে লইয়া গাজি।
এক রাইতে মৈল মোর সাতশত ঝি ॥
কান্দে হোসেনের মায়ে মাথে দিয়া হাত।
এক রাইতে মৈল মোর পুত্র শত সাত ॥
কাজিহাটী, জোলাহাটী মরিল সকল।
তাহাতে হোসনের মায়ে কান্দিয়া বিকল ॥' -(পৃ-১৪২)

তাই দেখা যায় মনসার কাজির সঙ্গে ও যমের সঙ্গে যুদ্ধের কারণে কাজিহাটী, জোলাহাটী ও হালিয়ার নগর ধ্বংস হয়ে যায়। এ যুদ্ধের অনিবার্য অভিশাপ নারীকেই সবচেয়ে বেশি দগ্ধ করে। কারণ পুরুষের এ যুদ্ধে স্বামী, পুত্র ও স্বজন হারিয়ে রিক্ত-নিঃস্ব-সর্বস্বান্ত নারীকেই চোখের জলে এর প্রায়শ্চিত করতে হয়েছে সর্বযুগে।

চোর-ডাকাত

তৎকালীন সমাজে শুধু সামন্ত শাসক, সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরই অত্যাচার-উৎপাত ছিল না বরং চোর-ডাকাতেরও আতঙ্ক সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যেও তাই দেখা যায়, মনসাকে ঘাটে পাহারায় রেখে ধনা বাড়িতে খেতে যায়। তারপর অপ্রত্যাশিত ভাবে মনা বেহুলার খবর দিতে বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলে নৌকা চুরির ভয়ে উৎকণ্ঠিত ধনা বলেছে-

'মনারে দেখিয়া ধনা কোপ করে তারে।
খুদায়ে ভাত খাইতে আইলাম নাও নিব চোরে ॥ -(পৃ-৪৫৮)

চোরের উৎপাতের পাশাপাশি সমাজে ডাকাত-ঠেঙারের আতঙ্কও বিরাজ করতো। মানুষ তার জান-মাল নিয়ে ডাকাতের ভয়ে সর্বদা আতঙ্কে থাকতো। এজন্য চাঁদ ও সাহে সওদাগরের মতো আরো অনেক বণিকরাই নিরাপত্তার জন্য ব্যক্তিগতভাবেই পাইক, লাঠিয়াল ও সেনাবাহিনী পালন করতো। চাঁদের দক্ষিণ পাটন যাত্রাকালে এ রকম ডাকাত আতঙ্ক দেখা যায়-

'মধ্যগাঙ্গে একপুরী দেখিল তখন।
করপুরী দেখি এই সমুদ্র ভিতর ॥
কেহ বলে ডাকাইতে ভাত রান্ধি খায়।' -(পৃ-১২৫)

উপর্যুক্ত ঘটনাবলী তৎকালীন বাঙালি সমাজে সংঘটিত মারাঠা বর্গী, ফিরিঙ্গি, মগ ও হার্মাদদের অত্যাচার-নিপীড়ন, অপহরণ-ধর্ষণ, ছেলে-মেয়ে বিক্রি ও ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেবার অপকর্ম-লাম্পট্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এজন্যই বেহুলাকে তাদের মুক্তাসাগর পুকুরে স্নান করতে যাবার সময় তার বাবা সর্তক করে দিয়ে বলেছেন-

'সাহে বলে রাজপথে জঞ্জাল বিস্তর।
স্নান করিয়া শীঘ্র আসিয় সত্বর ॥' -(পৃ-৩২৩)

সুতরাং দেখা যায়, তৎকালীন বাঙালি সমাজ যুদ্ধের আতঙ্ক-অস্থিরতা, চোর-ডাকাতের উৎপাত, বর্গী-মগ ও পর্তুগিজ জলদুস্যদের দুরন্তপনা তথা লাম্পট্যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিল। তবে হুসেন শাহের মতো সুযোগ্য শাসকদের উত্থানে বাঙালি সমাজ অরাজকতা-বিপর্যয় কাটিয়ে ওঠে এবং শান্ত ও স্থিতিশীল পর্যায়ে পৌছায়।

ঐশ্বর্য

অর্থ বিত্ত-বৈভব ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যের জন্যই এ বাংলাকে 'সোনার বাংলা' বলে অভিহিত করা হতো। মধ্যযুগে বিদেশি পর্যটকগণ এর অর্থ-সম্পদ দেখে বিস্মিত হয়ে এ বাংলাকে 'ভূস্বর্গ' নাম দিয়েছিলেন। নদী, আবহাওয়া ও জলবায়ুর সমন্বয়ে অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবেই এদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হতো এবং শিল্পে-বাণিজ্যে বিপুল অর্থের সমাগম ঘটতো। সারা বিশ্ব থেকে ব্যবসায়ী বণিক, শাসক, পর্যটক এর বিত্ত বৈভব ও ঐশ্বর্যের আকর্ষণে ছুটে আসতেন সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে। আবার আরব, এশিয়া ও ইউরোপের অনেক দীনহীন ব্যক্তি এদেশে এসেছেন ভাগ্য বদলানোর নিশ্চিত পথ ও পন্থা মনে করে। ব্রিটিশ-ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। ইবনে বতুতার বর্ণনায় বাংলার আর্থিক ঋদ্ধির যে পরিচয় মেলে তা যে কেউ বিস্মিত না হয়ে পারে না।

চাঁদ সওদাগরের ঐশ্বর্য

মনসামঙ্গল কাব্যেও বাংলার সামন্ত শাসক, বণিক ও অভিজাত শ্রেণির ঐশ্বর্য-বিলাসের পরিচয় মেলে। চাঁদ সওদাগর উত্তরাধিকার সূত্রেই ব্যবসায় বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ বিত্তের মালিক হয়েছিলেন-

'চান্দের পিতা জীব সাধু বণিক প্রধান।
ধনের অন্ত নাহি তার কুবের সমান ॥
চান্দের পিতামহের নাম নীলাম্বর।
পুরুষে পুরুষে রাজ্য চম্পক নগর ॥' -(পৃ-৩৩১)

দারিদ্র্য

বাংলার এ ধন ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য সারা দেশে থাকলেও সাধারণ মানুষের আর্থিক অবস্থা মোটেও সন্তোসজনক ছিল না। কারণ বাংলার এ বিপুল সম্পদের সিংহভাগই ছিল এদেশের সামন্ত শাসক, বণিক ও অভিজাত শ্রেণির হাতে কুক্ষিগত। দেশের ধনী মানুষের সংখ্যা ছিল কম আর গরীব-নির্ধন মানুষের সংখ্যা ছিল বেশি। কিন্তু সম্পদের স্বত্ব ও বণ্টন ব্যবস্থায় এ সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব জনগোষ্ঠী ছিল বঞ্চিত এবং ধনী বিত্তশালীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ হয়েও ছিল

সুর্বোচ্চ সুবিধাভোগী। শাসক, আমলা ও কর্মচারীদের সীমাহীন শোষণ নির্যাতনে বৃহত্তর কৃষক প্রজাগোষ্ঠী আরো দরিদ্রে পরিণত হয়। পেটের ক্ষুধার জ্বালায় স্ত্রী-পুত্র কন্যা এমনকি নিজেকে পর্যন্তও বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এর প্রমাণ বিভিন্ন পর্যটকদের বিবরণ ও সাহিত্যের মধ্যে পাওয়া যায়।

শিবের দারিদ্র্য

মনসামঙ্গল কাব্যেও দারিদ্র্যের এমন চরম বিপর্যয় ও অভিশপ্ত জীবনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। শিব এমন গরীব, যিনি মেয়ে মনসার বিয়েতে আয়াদের প্রাপ্য তেল-সিদূর, পান-সুপারি বাঁচাতে সবার সামনে দিগম্বর হবার কৌশল গ্রহণের চিন্তা করতে বাধ্য হন। শিব এখানে বিপর্যস্ত, ভাগ্যবিড়ম্বিত বাঙালির প্রতীক হয়ে ওঠেছে–

‘গৌরী বোলে কর কাজ তোমার মুখে নাহি লাজ
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে।
আইয় আসিবে মঙ্গল গাইতে তারা চাবে পান খাইতে
তৈল সিন্দুর পাইব কেথায়ে।
হাসি বলে শূলাপানি আইয় ভাড়াইতে জানি
লেংগটা হইয়া মধ্যে দাঁড়াইব
,,,
লজ্জা পাইয়া আইয় যাবে কেবা পানগুয়া খাবে
তৈল সিন্দুর দিবা কার তরে।’ -(পৃ-৭৪-৭৫)

মনসার বরে জাল-মালুর ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে সত্য, কিন্তু তা উদ্দেশ্যমূলক– ভক্তের প্রতি দেবতার অনুগ্রহ, করুণা প্রদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং সমকালের বিচারে তা একান্তই ব্যতিক্রম, অপ্রত্যাশিত ও অসম্ভব ঘটনা। কারণ তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজে ক্ষমতার সিংহাসনে শাসকের উত্থান-পতন ও পরিবর্তন ঘটতো। কিন্তু বৃহত্তর কৃষক প্রজা, দরিদ্র বৃত্তিজীবী মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটতো না বা ঘটার সুযোগই ছিল না। তারা গরীব-গরীবই থেকে যেতো বংশানুক্রমিকভাবে। রাজধানীর ক্ষমতার পালাবদলজনিত কোন রাজনৈতিক ঢেউ গ্রামের দরিদ্র পল্লীতে তেমন একটা লাগতো না। তাই দরিদ্র জনগোষ্ঠী সমকালের প্রভাবে তাদের এ ভাগ্য বিপর্যয় ও দারিদ্র্যকে নিয়তি বা ললাট লিখন বলে মেনে নিতো বা মেনে নিতে নানাভাবে (শাসকের প্রভাবে ধর্মগুরুরা) উৎসাহিত করা হতো। কারণ–

‘রাজ-রাজড়া, নবাব-বাদশাহেরা ক্ষমতা অধিকারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, সমাজ বিধায়করা নিজ নিজ সমাজ সংরক্ষণের দুশ্চিন্তায় ছিলেন মগ্ন, গ্রাম্য প্রধানরা রাজন্যবর্গের সুখ-বিধানের জন্য ছিলেন চিন্তিত, কিন্তু সাধারণ দুঃস্থ মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবসর বা চিন্তা কাহারও ছিল না। এদিকে দৃষ্টিপাত করার কথাও নয়। তাই বাংলার বৃহত্তর গণজীবন প্রাচুর্যের দেশও ছিল বঞ্চনার বেদনায় পাণ্ডুর।’[১০৩]

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন

জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান-কাল ও গোষ্ঠীগত। মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্য ঘটে এ কারণেই। বিভিন্ন প্রতিবেশে জীবন জীবিকার নিরাপদ নিরুপদ্রব লক্ষণ- লালন লক্ষ্যেই মানুষের মানব-সংস্কৃতি ও তজ্জাত ব্যবহারিক উপকরণ এবং

বৈষয়িক আচরণ নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন চেতনার বহিঃরূপই সংস্কৃতির সাক্ষ্য। সংস্কৃতির আবর্তন-নিবর্তন-উদবর্তন কিংবা বিকাশ বিবর্তন তাই শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক ও প্রশাসনিক সাবলীলতা স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দৌর্বল্য- দুর্দশার উপর নির্ভরশীল।[১০৪]

সামগ্রিক দৃষ্টিতে মানুষের জন্ম - বিবাহ ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত যাবতীয় সকল কিছুই সংস্কৃতির ভেতরে গণ্য করা হয়। সমাজবিজ্ঞানী জোনস্ বলেন– 'মানব সৃষ্ট সব কিছুর সমষ্টিই হল সংস্কৃতি' (Culture is the sum of man's creations Ñ Jones, Basic principles of sociology, p. 51)। আবার প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী টেইলর (Tylor) বলেছেন– 'জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন, অনুশীলন ও অভ্যাস, যেসব মানুষ কোন এক সমাজের পরিবেশে আয়ত্ত করে, সে সব কিছু সে সমাজের সংস্কৃতি' (Culture is that complex whole which includes Knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society Ñ Tylor : primitive culture, p;-1)

সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যকার স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে সর্বাপেক্ষা সহজ, অথচ তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন ম্যাকাইভার। ম্যাকাইভারের মতে– 'আমরা যেসব উপকরণ ও দ্রবসামগ্রী ব্যবহার করি, সেসব একযোগে হল আমাদের সভ্যতা এবং আমরা মানুষ হিসেবে কী বা যা; সে হল আমাদের সংস্কৃতি' (Our culture is that we are, our civilization is that we use- R.m. McIver : The modern state; p.-325)|

সুতরাং সংস্কৃতি বলতে মানব সৃষ্ট সবকিছুকেই বোঝায় এবং এ সংস্কৃতি বংশ পরাম্পরা উত্তরাধিকারসূত্রে মানব সমাজে বর্তায়। এ কথায় অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই যে, মানুষ শুধু সংস্কৃতির ধারক ও বাহকই নয়, বরং স্রষ্টাও বটে। প্রত্যেক সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে যে সমাজে বসবাসকারী মানুষের স্বতন্ত্র জীবনধারা, আহার-বিহার-আচার-অনুষ্ঠান-চিন্তা-ধারার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়- যা তাদেরকে পৃথক করে অন্য সমাজে বসবাসকারী মানুষ থেকে। এ স্বতন্ত্র জীবন-যাপন প্রণালীকেই সমাজ তত্ত্ববিদগণ 'জীবনধারা' বা 'সংস্কৃতির ধারা' নামে অভিহিত করেছেন। সংস্কৃতি সম্পর্কে বলতে গিয়ে Clyde kluchom বলেছেন-'As used in the social sciences, the term`Culture' refers to man's entire social heritage, all the knowledge, beliefs, customs and skills he acquires as a member of society.'[১০৫]

বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক স্বাতন্ত্র্য থাকার পরও সকল সমাজের কতগুলো বিষয়ে অভিন্নতা দেখা যায়। যাদের উপর ভিত্তি করে সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। যেমন- ১. পরিবার ২. ভাষা ৩. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ৪. সম্পত্তি ও স্বত্বাধিকার পদ্ধতি ৫. বিশ্বাস ও মূল্যবোধ ৬. ধর্মীয় উপাসনা পদ্ধতি। মানুষ সমাজে বহু অনুশাসন দ্বারা শাসিত হয়ে বসবাস করে। দীর্ঘদিনের জীবনাভিজ্ঞতায় সে উপলব্ধি করেছে, তার প্রয়োজনের স্বার্থে কোন আচার-আচরণ গ্রহণযোগ্য, কোনটি বর্জনীয়। এভাবে ধীরে ধীরে নানারকম বিধি-নিষেধ ও অনুশাসনের মধ্য দিয়ে কতগুলো বিষয়ে মানুষ স্বঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে এবং তাকে জীবনের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত করে যা লোকাচার নামে পরিচিতি পায়।

এ লোকাচার প্রসঙ্গে উইলিয়াম গ্রাহাম সামনার বলেছন–'Norms are classified as folk ways when the intensity of feeling associated with them is low and the modes of enforcing them, either by rewards or punishments'[১০৬] সমাপজ প্রচলিত এমন অনেক বিধি-নিষেধ থাকে, যে সবের উপর লোকাচারের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়া হয়। এসবকে লঙ্ঘন করলে সমাজ তাকে শাস্তি দিয়ে থাকে। যাকে সমাজবিজ্ঞানীগণ 'লোকনীতি' নামে অভিহিত করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী সামনার মনে করেন, লোকাচার

তখনই লোকনীতিতে পরিণত হয়, সুষ্ঠু জীবন যাত্রা ও কল্যাণভিত্তিক জীবনাদর্শ লোকাচারের তাত্ত্বিক ভিত্তি হয়। সামনারের ভাষায়- ‘When the elements of truth and right are developed into doctrines of welfare, we call them mores.’[১০৭]

এখানে বলা নিস্প্রয়োজন, লোকাচার ও লোকনীতি বিস্তৃত অর্থে সামাজিক প্রথার অন্তর্গত নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করা যেমন ব্যক্তি বিশেষের অভ্যাসে পরিণতহয়, ঠিক তেমনি সমাজ জীবনেও লোকচার ও লোকনীতি পালন করা অভ্যাসগত ক্রিয়ায় পরিণত হয় এবং এটাকেই সামাজিক প্রথা বলা হয়।

কিন্তু সব অভ্যাসই প্রথায় পরিণত হয় না। কারণ এ জন্য সমাজের স্বীকৃতি বা অনুমোদনের প্রয়োজন হয়। সাধারণত যেসব আচার-ব্যবহারের সঙ্গে সামাজিক মূল্যবোধ সম্পৃক্ত থাকে সেগুলোই কেবল সমাজের অনুমোদন ও স্বীকৃতি লাভ করে। তাই সামাজিক প্রথার কতগুলো দিক রয়েছে, যেমন- সকলের একই রকম আচরণ, রীতি, ঐতিহ্য, সামাজিক অনুমোদন, সামাজিক বৈশিষ্ট্য, মূল্যমান ও স্বয়ংক্রিয়তা। সমাজ যখন সহজ-সরল ও জটিলতামুক্ত ছিল, তখন সামাজিক প্রথার দ্বারাই সমাজ নিয়ন্ত্রিত হতো। দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত হবার কারণে সমাজে বসবাসকারী মানুষের কাছে সামাজিক প্রথার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। বাঙালি সংস্কৃতির উৎস ও ভিত্তি ছিল অস্ট্রিক-দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব ও মনন। বাঙালির মননে ও অধ্যাত্মবুদ্ধিতে সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাবে বরাবর প্রবল রয়েছে। সর্বপ্রাণবাদে তথা জড়বাদে ও যাদুতে তার আস্থা ও অবচেতন নিঃসঙ্গ মনে ক্রিয়াশীল থেকেছে চিরকাল। বৃক্ষ-দেবতা, নারী-দেবতা, পশুপাখি দেবতা, দেহচর্চা, জন্মান্তরে বিশ্বাস তাদেরই সৃষ্টি। তকু-তাক-দারু-টোনা, ঝাড়-ফুঁক, বাণ-উচাটন, কবজ, মাদুলী ও বশীকরণে আস্থা আজো অবিচল।

সভ্য বাঙালির অস্ট্রিক মোঙ্গলীয় জাতি পার্বত্য আরণ্য কৌম-কোল, সাঁওতাল, ওঁরাও, রাজবংশী, গারো, হাজং, খাসিয়া, মণিপুরী, লুসাই, নাগা, মিজো, খুমি, তিপরা, মুরং, কুকী ও কোচ প্রভৃতি আদিবাসীর মধ্যে যেসব নিয়ম-নীতি, রীতি-রেওয়াজ চালু রয়েছে, তাদের অনেকে প্রথাসিদ্ধ আচারে পরিণত হয়ে রয়ে গেছে। আমাদের ঘরোয়া ও সামাজিক অনেক আচার-অনুষ্ঠানে, প্রথায়-পার্বণে, মৃতের সৎকারে, শ্রাদ্ধে- সংস্কারে আদিম রীতি-নীতির ছিটে ফোঁটা এখনো মেলে।

জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য-খ্রিষ্টান এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেও বাঙালি তার আদিম ঐতিহ্য কখনোই সম্পূর্ণভাবে পরিহার করতে পারেনি। তাই গাছের মধ্যে বটে অশ্বত্থ, তাল, তেঁতুল, তুলসী প্রভৃতি; পাখির মধ্যে- কাক, পেঁচা, শকুন, শালিক প্রভৃতি; পশুর মধ্যে- গাভী, শেয়াল; সরীসৃপের মধ্যে- সাপ, টিকটিকি; নৈসর্গিক তিথি-নক্ষত্র-দিন-ক্ষণ-মাস, অশরীরী ভূত, প্রেত, পিশাচ ও ডাইনী প্রভৃতি বাঙালির চেতনায়, রোগের চিকিৎসায়, শুভাশুভ চিন্তায় এবং সিদ্ধি-সাফল্য কামনায় আজো উপযোগ হারায়নি।

আচারিক জীবনে ধান-দূর্বা, হলুদ, আমপাতা, কলাগাছ, ঘট, কলসী, কলা, দীপ, ধূপ, মাছ ও দই আজো মনোজীবনে বাঞ্ছাসিদ্ধির ভরসার জায়গা। ওলা-শীতলা-ষষ্ঠী কিংবা সাপ, হাতী, বাঘ, কুমীর আজো সভয় শ্রদ্ধা পায়।

নৈতিক সামাজিক জীবনে গোত্রে বিবাহ, অগোত্রীয় বিবাহ, বাল্যবিবাহ, অসবর্ণ-বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, ত্যাগ-তালাক প্রভৃতি বিধি-নিষেধও আদিম। গোত্রপতি, সমাজপতি ও গৃহপতির দাপট ও নেতৃত্ব আজো নিম্নতর সমাজে অবিলুপ্ত। গুরুবাদ ও মন্ত্রগুপ্তি সর্ব সমাজে আজো প্রবল।

হাতিয়ারের মধ্যে-লাঙল, জোয়াল, ফাল, ঈষ, দা, দড়ি, মই, কোদাল, বটি, বাটুল, ঝুড়ি, চুপড়ি, চাঙ্গাড়ি, ডিঙ্গি, ডোঙ্গা; তৈজসপত্রের মধ্যে- হাঁড়ি, সরা, পাতিল, ঝিনুক, মাচা, নল, পেটি, ঘটি, চাটাই, ঝাটা, বাখারি প্রভৃতি; নেশাদ্রব্য মধ্যে- গাঁজা, ধেনো মদ, চরস, সিদ্ধি প্রভৃতি; ফলমূলের মধ্যে- ধান, বেগুন, ঝিঙ্গা, কলা, পান, সুপারি,

আম, জাম্বুরা, শিমুল, তেঁতুল প্রভৃতি অস্ট্রিক দ্রাবিড় মোঙ্গলীয়-বাঙালির আবিষ্কৃত। মাছের মধ্যে- পুটি, টেঙরা, শিং, গজার, কই, মাগুর, টাকি, পাঙ্গাস প্রভৃতি অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-মোঙ্গলীয় নাম। খাদ্যবস্তুর মধ্যে ভাত, গুড়, মাড়, খই, চিড়া, মুড়ি, চচ্চড়ি, ভর্তা, আচার প্রভৃতিও অস্ট্রিক হবার কথা। কড়া, পণ, গণ্ডা, কুড়ি, কাহন- এ গণনা পদ্ধতিও অস্ট্রিক।[১০৮] এসব র্ধমীয়, সামাজিক আর্থিক-নৈতিক-শৈক্ষিক-রাজনৈতিক সর্বোপরি বিশ্বাস ও সংস্কারময় চিন্তা-চেতনা সবই সংস্কৃতি বলে গণ্য করা হয়।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যেও বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। বাঙালির জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুকেন্দ্রিক আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, উৎসব-উপাসনা, আবাসন-আহার-বিহার, অবসর-বিনোদন, পোশাক-পরিচ্ছেদ, ভোগ-বিলাস, দুঃখ ও দারিদ্র্যের চিত্র মনসামঙ্গল কাব্যে জীবন্তরূপে অঙ্কিত হয়েছে। এ সম্পকির্ত আলোচনা নিম্নে করা হল–

বিবাহ

বিবাহই বাঙালি জীবনের প্রধান সংস্কার। কনে বা বর দেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাস্ত্রাচার-সমাজাচার মেনে কন্যা সম্প্রদান এবং বধূবরণের মধ্য দিয়ে এ পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বাঙালি সমাজে বহুধরণের বিবাহের প্রচলন থাকলেও মধ্যযুগে অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রচলিত ছিল। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হবার কারণে কন্যার বাড়িতে গিয়ে বর বিয়ে করে নববধূকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে আসতো। সকল হিন্দু বিবাহের ক্ষেত্রেই নান্দীমুখ, অধিবাস, গাত্রহরিদ্রা, বরবরণ, সপ্তপদী গমন, অরুন্ধতী দর্শন, লাজাহোম, অশ্বারোহন, কুশণ্ডিকা, দ্বিরাগমন আবশ্যিক কর্ম হিসেবে পালনীয় ছিল। মনসা-জরৎকারু এবং বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহের সময় এসব চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এ প্রক্রিয়ায় ঘর-বাড়ি দেখা, বর-কণে দেখা, পাকা কথা, দিন-তারিখ ঠিক করা, বিয়ের ভোজ, কনে ভোজ ও বৌভাত প্রভৃতি অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত ছিল।

পাত্র নির্বাচন

বিবাহের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বরের বংশ, ধন-সম্পদ, স্বভাব-চরিত্র, দৈহিক সুগঠন, বল-বুদ্ধি ও সাহসকে প্রাধান্য দেয়া হতো। এছাড়া শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব প্রকৃতির পুরুষ নির্ণয় করা হতো। এরকম দেখা যায় জরৎকারু ও লখিন্দরের ক্ষেত্রে–

পাত্র লখিন্দর

> ‘চান্দোর কনিষ্ঠ পুত্র নাম লখিন্দর।
> নানা গুণ ধরে শাস্ত্র পড়িছে বিস্তর ॥, –(পৃ-৩৩১)

পাত্রী নির্বাচন

বাঙালি সমাজে বিয়ের পাত্রী বা কনে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও বংশ, রূপ, বিদ্যা, শারীরিক সুগঠন, সুস্বাস্থ্য, সাংসারিক কর্ম-নৈপুণ্যসহ বিভিন্ন কলাবিদ্যায় পারদর্শিতার ওপর গুরুত্ব দেয়া হতো। আর্যযুগে পাত্রীর ৫টি গুণ যথা- রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বংশ প্রভৃতি গুরুত্ব সহকারে মানা হতো। এছাড়া পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী নির্ণয় করা হতো। মনসা ও বেহুলার বিয়ের পূর্বেও এমনটিই ঘটেছিল।

পাত্রী বেহুলা

> ‘মরিলে জিয়াইতে পারে হারাইলে পাই।
> হেন গুণবতী কন্যা ত্রিভুবনে নাই ॥
> রূপে বিদ্যাধরী বধূ গুণের নাহি অন্ত।
> এইবধূ বিহা কৈলে লখাই ভাগ্যবন্ত ॥’ –(পৃ- ৩২৯-৩৩০)

ঘটকালী প্রথা

বাঙালি সমাজ হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিবাহের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে ঘটক। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অন্যান্য গোত্রের লোকও এ পেশায় নিয়োজিত থাকতো। পেশাদার এবং অপেশাদার ঘটক সমাজে বিদ্যমান ছিল। এসব ঘটক পেশা সূত্রেই অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই বাক্‌পটু, চতুর ও ধূর্ত স্বভাবের হতো। মনসার বিয়েতে নারদমুনি এবং বেহুলার বিয়েতে সোমাই পণ্ডিত ঘটকের দায়িত্ব পালন করেন।

বেহুলার বিয়ের ঘটকালী

'হেনকালে কহিলেক সোমাই পণ্ডিত ।
কহিতে লাগিল তবে সভার বিদিত ॥
সাহে নামে সদাগর উজানিতে ঘর।
তার ঘরে কন্যা আছে পরম সুন্দর ॥' - (পৃ-৩১৯)

বরসজ্জা (গায়ে হলুদ, স্নান ও ক্ষৌরকর্ম)

বিবাহের জন্য বরকে শাস্ত্র ও সামাজিক আচার মেনেই ক্ষৌরকর্ম, গায়ে হলুদ, স্নান, অলংকার ও পোশাক পরিধান করানো হতো। জরৎকারু ও লখিন্দরকেও এসব প্রথা মেনেই কনের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হয়েছিল–

লখিন্দরের বরসজ্জা

'ললিত মধুর বাদ্য বাজে মনোহর।
বিবাহ মঙ্গল স্নান করে লখিন্দর ॥

,,,

পুর্ণঘট হাতে করি আর দূর্ব্বা ধান।
কৌতুকেতে লখিন্দর করে মঙ্গল স্নান ॥
তিল তৈল আমলকি গিলা হরিদ্রা মিশালি।
লেপিয়া লখাইর অঙ্গে কৌতুকে জল ঢালি ॥

,,,

জয়ে জয়ে হুড়াহুড়ি মঙ্গল বাদ্যগীত।
করিলা খেউর কর্ম্ম সাধুর নাপিত ॥

,,,

নানা রত্ন অলংকার আনিল বিস্তর।
বরের বেশে সাজাও কুমার লখিন্দর ॥' (পৃ-৩৬২-৩৬৪)

কনের অধিবাস

বাঙালি হিন্দু সমাজে বিয়ের পূর্ব দিন কনেকে এবং কনের পিতাকে অভুক্ত থেকে অধিবাসব্রত পালন করতে হয়। শাস্ত্রাচার হিসেবে মনসাও তার বিয়ের পূর্বদিন অধিবাস পালন করেন-

'তিন জনের প্রতি শিব করিলা আদেশ।
কল্য বিবাহ পদ্মার অদ্য অধিবাস ॥' -(-৭৪)

কনের সাজ-সজ্জা

বাঙালি সমাজে বিয়ের কনেকে বিচিত্র বস্ত্র, অলংকার ও প্রসাধনের সমন্বয়ে সাজানো হয়। বিয়ের সময় মনসা এবং বেহুলাকেও এভাবে সাজানো হয়েছিল-

মনসার সাজ-সজ্জা

‘নানা আভরণে পদ্মা সাজে বাপের ঘরে।
সভাকার হিত হউক সেই পদ্মার বরে ॥’ -(পৃ-৮০)

অলংকার

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে নর-নারী উভয়ের মধ্যে অলঙ্কার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। সাধারণত হীরা-মুক্তা, স্বর্ণ-রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, শঙ্খ ও ফুলের তৈরি অলঙ্কার ব্যবহৃত হতো। সাধাণরত মেয়েরা মাথায়- টোপর, সিঁথিপাট, টিকলি, টায়রা; গলায় পড়তো- হাসুলি, হার, চেইন, টাকার ছড়া, তাবিজের ছড়া, কবচের ছড়া; হাতে ব্যবহার করতো- কঙ্কণ, বালা, বলয়, চুড়ি, তাড়, খাড়ু, অঙ্গদ, পেঁচি, তাগা; কানে দিতো- কানফুল, করমফুল, কুণ্ডল, ঝুমকা, বালি, কানবালা, মদনকড়ি, দুল ও রিং; পায়ে পরতো- পাঁসুলি, নূপুর, উছটি, ঘুঙুর, ঘুণ্টি, মল, খাড়ু ; কোমড়ে দিতো- কিঙ্কিণী, চন্দ্রহার ও বিছা; নাকের গহনা ছিলো- কোর, ডালবোলক, নাকফুল, বেসর, নাকছাবি ও নথ; হাত-পায়ের আঙ্গুলে উনচট, রতনচূড় ও আংটি পরতো, বাহুতে পরতো- বাজুবন্দ, তাড়, কেয়ূর, জসম; গ্রীবায় পরতো- গ্রীবাপত্র। অর্থাৎ বাঙালি রমণীগণ- মাথা থেকে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত সারা দেহেই অলঙ্কার পরতো।

মনসামঙ্গল কাব্যেও মনসা-জরৎকারু, বেহুলা-লখিন্দর ও সনকাকে এসব অলঙ্কার ব্যবহার করতে দেখা যায়। বিয়ে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে অলঙ্কারে সজ্জিত হবার চিত্র উন্মেচিত হয়েছে–

ক. মনসার অলংকার

‘নাকের বেসর আর গলার হাসুলি।
পায়ের মল খাড়ু গড়ুক নূপুর পাসুলি ॥
হস্তের চারি তার গড়িল পরম সুন্দর।
বিদায় হইয়া বিশ্বকর্মা গেল নিজ ঘর ॥ –(পৃ- ৭৯)

খ. বেহুলার অলংকার

‘আর নারী হতে সুমিত্রা বুদ্ধিমান।
দিবা ভাগে বেউলারে করায়ে মঙ্গলস্নান ॥

,,,

নিকটে আসিল বর দেখি বেউলার মায়ে।
নানা অলংকার দিল বেউলার গায়ে ॥’ –(পৃ- ৩৭৮)

প্রসাধনী ও রূপচর্চা

মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যের পূজারী। এছাড়া নারীরা সাজসজ্জা প্রিয়। বিয়ে, উৎসব-অনুষ্ঠান এবং স্বামী-সান্নিধ্যে যাবার পূর্বে নারী-পুরুষ উভয়েই প্রসাধন পরিচর্যা করতো। প্রসাধনী হিসেবে- সিঁদুর, কাজল, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুমকুম, গোলাপ জল, আতর, আলতা, কর্পূর, হলুদ, সুগন্ধি তেল, আমলকি, ফাউগ প্রভৃতি ব্যবহার করা হতো। এছাড়া পান শুধু মুখ শুদ্ধিতে নয় বরং ঠোঁট রাঙানোর প্রসাধনী হিসেবেও এর বহুল প্রচলন ছিল। এসব প্রসাধনী দিয়ে মনসা-জরুৎকারু, বেহুলা-লখিন্দর, শিব-চণ্ডী সাজসজ্জা করেছিলেন।

ক. জরৎকারুর প্রসাধন

‘তিল তৈল আমলকি হরিদ্রা পীঠালি।
লেপিয়া মুনির অঙ্গে কৌতুকে জল ঢালি ॥

অগুরুচন্দন গন্ধ সুগন্ধি বিশেষ।
ধুপের ধুয়া দিয়া শুকায় মাথার কেশ ॥' -(পৃ.-৭৮)

খ. লখিন্দরের প্রসাধন

'কস্তুরি কুমকুম ছন্দে   সর্ব্বাঙ্গ ভরিল গন্ধে
অঞ্জনে রঞ্জিত দুই আঁখি।
পারিজাত পুষ্পের মালা   ভরিয়া সকল গলা

বাঙালি নারীর প্রাত্যহিক প্রসাধন

বাঙালি নারী তাদের প্রাত্যহিক আটপৌরে জীবনে শাখা, সিঁদুর ব্যবহার করে থাকে। বিলাসিতা নয় বরং প্রয়োজনীয় এসব প্রসাধন-অলংকারেই বাঙালি নারী পরিতৃপ্ত থেকেছে। তাই বেহুলাকে তার ভাই হরিসাধু বলেছেন-

শঙ্খ বদলে দিমু সুবর্ণের চুড়ি
সিন্দুর বদলে খাসা ফাউগের গুঁড়ি ॥' -(পৃ-৪৫৩)

সাবান ও ক্ষারচুন

বাঙালি সমাজে নর-নারী স্নানে সুগন্ধি সাবান, গোলাপজল, তিলপাতা যেমন ব্যবহার করতো তেমনি জামা-কাপড়-কাঁথা পরিষ্কার করতে ক্ষারচুনের প্রচলন ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে নেতা ধোপানী ক্ষারচুন দিয়ে দেবতাদের কাপড় পরিষ্কার করেন-

'নেতা হতে বেউলার অনেক গুণ আছে।
খাড় চুন দিয়া আগে খান কত কাচে ॥' -(পৃ-৪৭৫)

প্রসাধনী হিসেবে পানের ব্যবহার

বাঙালি সামজে যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে, বিবাহ, উপহার- উপঢৌকন-বখশিশ হিসেবে ও আত্মীয় বাড়ি বেড়াতে সঙ্গে করে পান নেয়া হতো। তবে খাবার পর মুখশুদ্ধি করতে এবং ঠোট রাঙাতে বাঙালি নর-নারী পানকে প্রসাধনী হিসেবে ব্যবহার করতো–

'ভোজনের পর খাইলে মুখ শুদ্ধি হয়ে ভাল।
মন দিয়া শোন কহি এহার রসাল ॥
এহারে বলি গুয়া এহারে বলি পান।
পানে চুনে খাইলে মুখ হয়ে চন্দ্রের সমান ॥' -(পৃ- ২৫৫)

পোশাক

বাঙালি সমাজে হিন্দু ও মুসলিমদের পোশাকে ভিন্নতা ছিল। তবে মুসলিম শাসনের ফলে অভিজাত হিন্দুদের পোশাক ও বেশ-ভূষায় মুসলমানী ঢং চলে আসে। তবে হিন্দুরা সাধারণত ধুতি, চাদর বা উত্তরীয়, শাড়ি কাপড়, কৌপীন, গামছা, ব্যবহার করতো। উচু বর্ণের লোকজন কাঠের খড়ম ও পৈতা ধারণ করতো। অন্যদিকে মুসলিম সমাজে- তহবন বা লুঙ্গি, কুর্তা, টুপি, পাগড়ি, ইজার বা পাজামা, পাঞ্জাবি, আলখেল্লা বা জুব্বা, চাপকান, নাগরা জুতা, মোজা, শাড়ি কাপড়, কামিজ, সালোয়ার, ব্লাউজ, ছায়া, শেমিজ, নিমা, ঘাগরা, ওড়না, বোরকার প্রচলন ছিলো। তবে সাধারণ ও দরিদ্র বাঙালি নর-নারী লুঙ্গি, শাড়ি, কৌপীন, গামছা ব্যবহারেই সন্তুষ্ট থাকতো। পুরুষেরা প্রায়শই খালি গায়ে থাকতো। গ্রীষ্মে ও শীতকালে পোশাকে পরিবর্তন ঘটতো। মনসামঙ্গল কাব্যেও

এসব পোশাকের উল্লেখ পাওয়া যায়। মনসা, সনকা, বেহুলা, চাঁদ সওদাগর তকাই মোল্লা ও লখিন্দরের বেশ ভূষায় পাটাম্বর, খিরোদ, তসর, নেত, দোপাট্টা, ধুতি, ইজার, পিরহান বা জামার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়-

ক. জরৎকারুর পোশাক

'স্নান করিয়া মুনি কেশের তুলে জল।
তিতা বস্ত্র এড়িয়া মুনি ধুতি পরিল নির্ম্মল ॥' -(পৃ-৭৯)

খ. পাট বস্ত্র (শরীরের বিভিন্ন অংশের)

'যত্নক্রম রাখিয় ঘরে সর্ব্বক্ষণ লোকে পেরে
বড়হি দুর্ল্লভ পাটের খনি।

,,,

একখানি কাচিয়া পিন্ধে আরখানা মাথায়ে বান্ধে
আরখান দিল সর্ব্ব গায়ে। -(পৃ-২৭৩)

গ. ইজার বা পাজামা

'তকাই নামে মোল্লা বেটা কাজির সাক্ষাতে।
ইজার পৈরনে তার কালা তক্যা মাথে ॥' -(পৃ-১২২)

বর-বরণ

বাঙালি সমাজে বিয়ের বরকে নানা আচার ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে কন্যার মা ও আয়াগণের বরণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল। জরৎকারু ও লখিন্দরকেও ধান-দূর্বা, সোহাগ কাজল, সোহাগজল, আয়ুঘট, চন্দনসহকারে বরণ করা হয়।

লখিন্দর বরণ-

'পাদ্য অর্ঘ আচমনি গন্ধ চন্দন।
ফল তাম্বুল বস্ত্র নানাবিধ ধন ॥

,,,

শাস্ত্রে আছে যত পড়াইল সকল।
জামাই বরিয়া সাহে মন কুতূহল ॥
দুই পাশে নারীগণ দাড়াইছে সারি সারি।
সুমিত্রায়ে বরিতে আইল লইয়া কুলনারী ॥
কেহর হাতে ধান্য দুর্ব্বা কেহর হাতে ঘট।
আইয়গণ লইয়া আইল জামাইর নিকট ॥ –(পৃ- ৩৭৮)

বিবাহানুষ্ঠান ও আচার

মনসা-জরৎকারু এবং বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ের পুরো প্রক্রিয়া আগুন সাক্ষী রেখে শাস্ত্র পাঠ, গাঁটছাড়া বেঁধে সাত পাক, সপ্তর্ষি দর্শন, শুভদৃষ্টি, পানচিনি, কন্যা সম্প্রদান ও আশীর্বাদ মেনেই সম্পন্ন হয়।

বেহুলার বিবাহাচার

'সুমিত্রার যত জ্ঞান সবে বলে সাচ।
উভা করি বান্ধিল কলা দুই গাছ ॥

,,,

গোময়ে মৃত্তিকা দিয়া উকারে ঠাই ঠাই।
যেইখানে বসিবেন বেউলার জামাই ॥
ডাইন ভিতে বট পাতা কেওয়া বামভিতে।
চারিধারে কলাগাছ রূপিল তাহাতে ॥

,,,

গঙ্গাধর নাম আর সোমাই পণ্ডিত।
দুই কুলের পুরোহিত বসিল দুই ভিত ॥
উত্তর মুখ হইয়া বৈসে সাহে সদাগর।
পূর্ব্ব মুখ হইয়া বৈসে চান্দের কোয়র ॥

,,,

লখাই বেউলার বিহা সর্ব্বলোক সুখী।
অঙ্গুষ্ঠ ঘুচাইয়া ধরিল মুখোমুখি ॥
শুভক্ষণে লখাই বেউলার হইল দরশন।

,,,

বিহার নিত বেউলা জানে সাতবার সাবধানে।
স্বামীর পায়ে হইল প্রদক্ষিণ।
হাতে দর্পন করি লাল সুতা হাতে করি
নয়ানে কাজল দিল ঠানে।

,,,

হাতেতে লইয়া পান করিলেক প্রণাম
হস্তলেপ দিল বুকে পৃষ্ঠে।
নবরঙ্গ মালতীর মালা ভূষিত করিছ গলা
লখাই বেউলা পুষ্পের ছায়নি।

,,,

কন্যা উৎসর্গ করে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে
বসিল লখাই কনক আসনে।
হস্তের উপর হস্তখান সাহে করে কন্যা দান
শুভক্ষণে গ্রন্থি বন্ধন

,,,

কন্যা উৎসর্গিয়া দিল ততক্ষণ।
দাড়া ভাত খাইতে নিল আপন ভবন ॥' -(পৃ-৩৭৮-৪১১)

বিবাহের রঙ্গ-রসিকতা

'বিবাহের পান-চিনি করতে গেলে বেহুলার ভাবী তারকা নানা ভাবে লখিন্দরকে অপ্রস্তুত ও বিব্রত করে তোলে-

'ভোজ করিত বসিল লখিন্দর।
হরি সাধুর বধূ করিল অত্যান্তর ॥
কাঁচা পিটানি আর হরিদ্রা সুখান।
মুখে কাপড় দিয়া বেউলা হাসে মনে মন ॥' -(পৃ-৪১১)

বধূবরণ

বাঙালি সমাজে পূত্রের নববধূকে বরণ করারও কিছু আচার প্রচলিত ছিল। শাশুড়ি নববধূকে যে কোন সোনার গহনা ও ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করেন। বেহুলাকেও সনকা স্বর্ণালংকার দ্বারা আশীর্বাদ করে বরণ করে নেন।

'পুত্রবধূর মুখ দেখি সোনাই আনন্দিত।
মাণিক্য হস্তে দিয়া বলিল ত্বরিত ॥
লখাইরে তুলিয়া নিল লোহার বাসর।
রত্নময় খাটে থুইলা বেউলা লখিন্দর ॥' -(পৃ-৪১২)

সাধভক্ষণ

মধ্যযুগীয় বাঙালি হিন্দু সমাজে সামবেদীয় দশ সংস্কার অনুসৃত হতো। এগুলো হলো- গর্ভধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন ও বিবাহ। জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুকে আশ্রয় করেই মূলত বাঙালির সংস্কৃতির বলয় গড়ে উঠেছে। বাঙালি তার জন্মের পূর্ব থেকেই সে সব লোকাচরের সংস্পর্শে আসে, তা সমগ্র জীবনব্যাপী বলবৎ থাকে এবং মৃত্যুর পর পর্যন্ত ও তার অব্যাহত থাকে। একজন বাঙালি নারী সন্তান গর্ভধারণ করার পর থেকেই নিম্নোক্ত লোকাচারের সংস্পর্শে আসে-

বাঙালি সমাজে গর্ভবতী নারীকে ৪র্থ মাসে সীমন্তোন্নয়ন, ৫ম মাসে পঞ্চামৃত, ৬ষ্ঠ মাসে পরমান্ন ভোজন, ৭ম মাসে সাধভক্ষণ ও ৯ম মাসে নববস্ত্র পরিধানের আয়োজন করা হতো।

সনকার সাধ ভক্ষণ

সাধারণত গর্ভবতী নারীর পঞ্চম বা সপ্তম মাসে সাধভক্ষণ করানো হয়। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সাধ্যানুযায়ী পছন্দের খাবার ও নতুন বস্ত্রের মধ্য দিয়ে ধূমধামের সঙ্গে এ অনুষ্ঠান করা হয়। সনকার পঞ্চম মাসের গর্ভাবস্থায়ও এ সাধভক্ষণ অনুষ্ঠান আড়ম্বরের সঙ্গে চাঁদ সওদাগর উদ্‌যাপন করেন।

'পঞ্চমাসের গরভ সোনকা সুন্দরী।
সর্ব্বলোকে আনন্দিত সোনকারপুরী ॥

,,,

ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব আসিল সকল।
শুনিয়া সর্ব্বলোক আনন্দ মঙ্গল ॥

,,,

সোনকার গায়ে দিল গন্ধ আমলাকি।
নারীগণে তৈল দিল সোনকারে বেড়ি।
স্নান করিয়া সোনাই পৈরে পাটের শাড়ি ॥
নানা অলঙ্কার পৈরে গলায়ে হাসলি।
সাধ ভাত সোনকা খাইল তক্ষণি ॥' −(পৃ-২৩৭)

সাধের ব্যঞ্জন

সাধভক্ষণের খাবার হিসেবে সাধারণত বরই, করঞ্জা, চালতা, আমসি, নলিতা (পাট) শাক, কমলি শাক, গিমা শাক, পুই শাক, লাউ শাক, কচু, ফুলবড়ি, মরিচের ঝাল, হলুদের কাঞ্জি, লেবুর রস, বোয়াল মাছ, কৈ মাছ, পোনা মাছ, সইল মাছ, চিংড়ি বড়া, দই, মিঠা ঘোল, বিভিন্ন প্রকার আচার ও হাতে কাটা সেমাইসহ পিঠাপুলি।

সনকার সাধভক্ষণের ব্যঞ্জন

সনকা তার সাধভক্ষণের জন্য শাক-সবজি, মাছ, পিঠা-পুলি-পায়েস ও আচার-চাটনিসহকারে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করেন। এসব খাবরের কয়েকটি নমুনা-

'স্নান করাইয়া সোনাই চড়াইল রন্ধন ।
নিরামিষ আমিষ রান্ধে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥

,,,

শাক সুকুতা রান্ধে কলইর ভাঙ্গে বড়া।
কটু তৈল দিয়া ভাজে তাল বাইয়ন পোড়া ॥
বড় বড় সওল মৎস্য রাঙ্গা হইছে কোল।
কত তৈলেত ভাজে কত রান্ধে ঝোল ॥

,,,

খিড় খিড়িয়া রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ পিঠা।
গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা ॥
ইষ্ট মিত্র জ্ঞাতি আনিয়া সর্ব্বজন।
সকলের দিয়া সোনাই করিল ভোজন ॥' –(পৃ-২৯৭-৩০০)

নারীর গর্ভকালীন অবস্থা ও আচরণ

গর্ভ ধারণের প্রথম মাস থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবের পূর্ব-পর্যন্ত অর্থাৎ দশম মাস অবধি নারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পট পরিবর্তন হয়। চতুর্থ মাস থেকে গর্ভের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। যেমন–

'একমাস গর্ভ হইল সোনকা সোন্দরী।
দুই মাসের কালে হইল লোক জানাজানি ॥

,,,

সাদি খাইয়া সোনাইর হরষিত মন।
হেন কালে হইলেক প্রসব বেদন ॥
(উদরে দারুণ ব্যথা তুলিতে না পারি মাথা
এবার রক্ষা কর বিষহরি।
উদরে চিন চিন করে কাকালি ছিড়িয়া পড়ে
কিবা বর দিলা বিষহরি)।

,,,

এ খাটাল হইতে সোনাই ও খাটালে যায়ে।
মধ্য খাটালে সোনাই গড়াগড়ি বায়ে ॥
রামলক্ষ্মণ শুন সোনাই কাকালি চড়িল।
হস্তজোড়ে লখিন্দর ভূমিতে পড়িল ॥' –(পৃ- ৩০০-৩০১)

আতুর ঘর ও পরবর্তী পালনী

সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই আতুড় ঘরের চাল থেকে খড় পেরে আগুন প্রজ্বলন, উপনয়ন, নাড়ি ছেদন, জোকার বা উলু ধ্বনি, শঙ্খ-বাদ্য বাজানো, ও আনন্দ গীতের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ছয়দিনে-ষষ্ঠীপূজা, সাত দিনে- উঠানি, ছয়মাসে-অন্নপ্রাশসন-নাম রাখা ও নান্দীমুখ যজ্ঞ, পাঁচ বছরে-হাতেখড়ি ও কর্ণভেদ অনুষ্ঠান করা হয়। আতুড় ঘর থেকে সন্তানকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করাকেই বলা হতো জাতকর্ম।

'এক দুই তিন চাইর করিয়া গণন।
ছয়দিনে ষষ্ঠী পূজি করিল জাগরণ ॥
সাত দিনে উঠানি করে শাস্ত্রের বিহিত।
ইষ্টমিত্র আইয়গণ আসিল পুরীত ॥

,,,

এক দুই তিন চারি ছয় মাস হইল।
অন্নপ্রশান হেতু কৌতুক জন্মিল ॥

,,,

নান্দীমুখ যজ্ঞ আদি করিলেক সুখে ।
লখিন্দর নাম রাখি অন্ন দিল মুখে ॥
পঞ্চ বৎসরের যদি লখিন্দর হইল।
হাতেখড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল ॥' -(পৃ-৩০৫)

দাম্পত্য ধারণা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কে নর-নারীর উচু ধারণা বলবৎ ছিল। কারণ হিন্দু-মুসলিম ধর্মমতে নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্ক পরকাল পর্যন্ত অটুট থাকে। স্বামীর সংসার, সন্তান, সেবাকর্ম ও ধর্মাচরণে সহযোগিনীর ভূমিকা পালন করাতেই বাঙালি নারীকে 'অর্ধাঙ্গিনী' বলা হয়। তাই বাঙালি নারীও স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করতো এবং সতী-সাধ্বী নিষ্কলঙ্কের জীবন-যাপন করে মায়া-মমতা ও আত্মত্যাগী মনোভাব নিয়েই সংসার গড়ে তুলতো। স্বামীই ছিল আদর্শ নারীর জীবন-জীবিকার একমাত্র অবলম্বন। তাই বেহুলাও মা-বাবা-ভাই-বোনদের মত অনুরোধ উপেক্ষা করেই স্বামী সম্পর্কে বলেছেন-

'বেউলা বলে ভাই তুমি না বল উচিত।
স্বামী অভাবে নারী জীবন কুৎসিত ॥' -(পৃ-৪৫৩)

দাম্পত্য কলহ

বাঙালি নারী যেমন স্বামী-সংসার-সন্তানের স্বার্থের জন্য সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করে, তেমনি আবার স্বামীর আসক্তি, স্থূল রুচিবোধ, চরিত্রহীনতায় অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। দেবী চণ্ডীও তাই স্বামী শিবকে তাঁর নেশাসক্তি, পরনারী গমন ও কপট স্বভাবের জন্য বকা-ঝকা ও ভর্ৎসনা করেছেন—

'পাপ কপালের ফলে পতি পাইলাম ভাল।
ভাঙ্গ ধুতুরা খায়ে পরে বাঘের ছাল ॥

,,,

অগ্নি লাগুক কান্ধের ঝুলিত পড়িয়া ভাঙ্গুক লাউ।

,,,

ছিড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা ত্রিশূল নেওক চোরে।

’’’
পাগলের বেশে ফিরে ঘরে নাহি মন।
বুড় কালে অপযশ হাসে সর্ব্বজন ॥
ঘরের স্বামী হইয়া করে পরদার কেলি।
সহিতে না পারি দুঃখে দিলাম বড় গালি ॥’ -(পৃ-২৬-২৮)

নারীর কলহপ্রিয়তা

বাঙালি নারীর সতীন বা সপত্নী বিদ্বেষ বহুল আলোচিত স্বভাব। যদিও নারীর এ মনোভাবকে উস্কে দিয়েছে পুরুষের বহু বিবাহ ও পরকীয়া সম্পর্কের মতো ঘৃণ্য কর্ম। নারী তার তিল তিল করে গড়ে তোলা সংসার ও স্বামীর ওপর নিজ প্রভাব-প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব বজায় রাখতেই মূলত এ ঝগড়া-বিদ্বেষে জড়িয়ে পড়ে। দেবী চণ্ডীও মনসাকে যেমন সতীন ভেবে নির্মম নির্যাতন করেছেন, তেমনি সতীন গঙ্গার সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়েছেন। আবার বেহুলাকে যতিরূপী মনসা বিয়ের রাতে স্বামী মৃত্যুর অভিশাপ দিলে বেহুলাও যতি ব্রাহ্মণীকে গালমন্দ করেছে।

বেহুলা ও যতি ব্রাহ্মণীর কলহ

যতি (মনসা) : ‘শুদ্ধভাবে হই যদি ব্রাহ্মণের যতি।
বিবাহের রাতে বেউলা খাইয়া নিজ পতি ॥
স্বামীর পাতে না দিয় ভাত না পুড়িয় হাঁড়ি।
বিবাহের রাতে তুমি হইয় কাচা বাঁড়ী ॥’ -(পৃ-৩২৬)

বেহুলা : ‘নাম ধর তুমি যতি হেটে মাছ উপরে লতি
মৎস্য খাইয়া কর যতিপনা।
’’’
খাড়া দেখি দুই স্তন পুরুষের যায় মন
বেড়াও তুমি পুরুষ অন্বেষণে।
অনুমানে বুঝি বোলে তোমার পাপের ফলে
অল্প বয়সে মরিল ব্রাহ্মণ।
’’’
যার তার ঘরে যাও মৎস্য লুকাইয়া খাও
বৎসরে বৎসরে গর্ভপাত। -(পৃ-৩২৬-৩২৭)

নারীর সখী পাতানো

তৎকালীন বাঙালি সমাজে নারীরা নামের মিল দেখে বা ইচ্ছা করে নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে বা শৈশবে পিতা-মাতার আগ্রহে সখী বা সই পাতানো হতো। এসব অনুষ্ঠানও জাকজমকের সঙ্গে হাতে লাল-নীল সুতা বেঁধে করা হতো। এ সম্পর্ক অনেক সময় আপন আত্মীয়-স্বজনের মতোই গাঢ় হতো এবং সুখ-দুঃখের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে গণ্য হতো। দেবী চণ্ডীও সরযূ নদীর খেয়াঘাটের পাটনী গৌরী ডোমনীর সঙ্গে সখী সম্বন্ধ পাতান–

‘ডোমনির সঙ্গে সহিয়ালা করে সাধিবারে কাজ।
সেই চণ্ডী রক্ষা কর সুজন সমাজ ॥
’’’
একই নাম জানিয়া বোলে তুমি আমার সই।’ -(পৃ-২৭)

পুরুষের সখা বা মিতা পাতানো

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে পুরুষের নামের সাদৃশ্য বা মিলের কারণে কিংবা পিতা-মাতার মতো অভিভাবকের উদ্যোগেও অনেক সময় সখা বা মিতা পাতানো হতো। এসব সখা বা মিতার সম্পর্ক নিকট আত্মীয়ের মতো আপন বলে গণ্য হতো। ধূমধাম ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে দুই মিতার হাতে লাল-নীল সুতা বেঁধে মিতা সম্পর্কের সূচনা করা হতো। চাঁদ সওদাগরও তার বিপদের দিনে এমন একজন মিতার বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

> 'অবস্থা পাইয়া চান্দো পাইল মিতার ঘর।
> মিত্র মিত্র বলিয়া চান্দো ডাকিল উচ্চরায়ে।
> হেনকালে মিত্র সঙ্গে হইল পরিচয় ॥
>
> ,,,
>
> তোমার ঠাই দুঃখের কথা কী কহিব মিতা।
> অন্ন দিয়া প্রাণ রাখ পাছে কব কথা ॥' -(পৃ-৩০৩-৩০৪)

শ্রাদ্ধ বা মিলাদ মাহফিল

তৎকালীন বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সমাজে আত্মীয়স্বজন মারা গেলে তাদের মৃত আত্মার শান্তি-সদগতি কামনা করে শ্রাদ্ধ বা মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হতো। হিন্দু সমাজে সাধারণত ব্রাহ্মণগণ মৃত্যুর ১০ দিনে, ক্ষত্রিয়রা ১২ দিনে, বৈশ্যরা ১৫ দিনে এবং শূদ্ররা ৩০ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে থাকে। অন্যদিকে মুসলমানগণ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর ৩ দিনের দিন অথবা ৪০ দিনের দিন চল্লিশা এবং ১ বছর পর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে থাকে। নৌকা ডুবিতে চাঁদ সওদাগরের হেতালের লাঠি নদীর জলে ভেসে তা লখিন্দরের হস্তগত হলে সকলেই চাঁদের মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই শ্রাদ্ধ করতে পুরোহিত সোমাই ব্রাহ্মণের দ্বারস্থ হন। এ বিষয়ে সোমাই পণ্ডিত ৩য় দিনে শ্রাদ্ধ করার বিধান দেন-

> 'সোমাই পণ্ডিতে বলে স্থির কর মন।
> তেরাত্রি শ্রাদ্ধ হবে বেবস্থার বচন ॥' -(পৃ-৩১১)

শিক্ষা ব্যবস্থা

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে শিক্ষার কেন্দ্র বা বিদ্যাপীঠ হিসেবে টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মঠ, গুরুগৃহ, মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ ব্যবহৃত হতো। এসব প্রতিষ্ঠানে গুরু বা পণ্ডিত ও শিক্ষকের মাধ্যমে- ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীত, স্মৃতিশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, অভিধান, গণিত, দর্শন, রতিশাস্ত্র, কারিগরি, নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, পদার্থ, জ্যামিতি, বীজ গণিত ও চিকিৎসাবিদ্যায় পাঠদান করা হতো। সাধারণত ধনী শ্রেণির লোকজন ব্যক্তিগত উদ্যোগে সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য 'হাতে খড়ি' বা 'বিসমিল্লাহ খানি' অনুষ্ঠান পালন করতো। পুথি ও পাণ্ডুলিপিকে গ্রন্থ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। তালপাতা, চামড়া ও কাগজে বাঁশের কঞ্চি, পাখির পালক দিয়ে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তৈরি করা কালি দিয়ে লেখা হতো। মনসামঙ্গল কাব্যেও নারী ও পুরুষের বিদ্যা-শিক্ষার চিত্র পরিলক্ষিত হয়–

হাতেখড়ি অনুষ্ঠান

বাঙালি হিন্দু সমাজে সাধারণত সন্তানের ৫ বছর বয়সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে 'হাতেখড়ি' দেয়া হয়। লখিন্দরের বয়স ৫ বছর পূর্ণ হলে মা সনকা সোমাই ব্রাহ্মণের মাধ্যমে হাতেখড়ি সম্পন্ন করেন।

'পঞ্চ বৎসরের যদি লখিন্দর হইল।
হাতে খড়ি কর্ণভেদ এক কালেতে কইল ॥' -(পৃ-৩০৩)

চিঠিপত্র

তৎকালীন বাংলায় যোগাযোগের মাধ্যমে হিসেবে চিঠি-পত্রের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। শিক্ষিত নারী-পুরুষ উভয়েই চিঠি-পত্র লেনদেন করতো। পত্রবাহক হিসেবে দূত, কবুতর, ঘুঘু ও শিকারী জীবজন্তু ব্যবহার করা হতো। বেহুলাও মনসাপুরীতে যাত্রার পূর্বে কাকের মাধ্যমে বাবা-মা ও ভাইদের উদ্দেশ্যে লেখা চিঠি প্রেরণ করে। বেহুলা যে শিক্ষিত ও স্বাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বিদূষী নারী ছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই।

'সমুদ্রে ভাসিয়া যায়ে শকুনা কেওার পাতা ॥
সাহের কুমারী বেউলা বুদ্ধিতে আগলি।
নয়ানের কাজল দিয়া করিলেক কালি ॥
আপোনে পণ্ডিত বেউলা লেখে নানা ভায়ে।
প্রথমে প্রণাম লেখে বাপ-মায়ের পায়ে ॥

,,,

অবশেষে নমস্কার লিখে সভার পাশ।
মস্তকের কেশ দিয়া বান্ধিল নিয্যাস ॥
বাপের ঘরে যে অঙ্গুরি পাইল যৌতুক।
পত্রে বান্দিয়া দিল কাকের সমুখ ॥' -(পৃ-৪৪৮-৪৫০)

চিকিৎসা বিদ্যা

বাঙালি সমাজে ধর্মশাস্ত্র, বিষয়কর্ম ও রাজকার্যে অংশগ্রহণ ছাড়াও আর একটি বৃত্তি বা পেশা ছিল লাভজনক, তা হলো চিকিৎসাবিদ্যা। হিন্দু বৈদ্যরা আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে কবিরাজ হতো এবং মুসলমানেরা তিব্বতিশাস্ত্র বা ইউনানীশাস্ত্র অধ্যয়ন করে হেকিম বা তবির হতো। আবার বৌদ্ধরা মঘা তথা বর্মী চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী এদেশে শিশু ও নারী চিকিৎসার সূত্রপাত ঘটায়। আবার গোয়ালেরা গ্রামের পশু চিকিৎসক এবং নাপিতেরা ফোঁড়া কাটা বা অস্ত্রোপচারকারী চিকিৎসক হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এসব চিকিৎসকদের পাশাপাশি সমাজে সাধু-যোগী-পীর ফকিরেরা দোয়া-দরূদ, মন্ত্র-ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবচ, তাগা ও মাদুলির যে ব্যবস্থাপত্র দেয় তা বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। অন্যদিকে বাঙালি সমাজে এমন বিশ্বাস ছিল যে, জীন-ভূত-দেও-দানব-ডাকিনী ও ডাইনীর কুনজরের ফলেই রোগ-বালাইয়ের উদ্ভব হয়।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এমন চিকিৎসা ব্যবস্থাপনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্কুর ওঝা উচলি পবর্ত থেকে সংগ্রহ করা দেওলি বান্দুলি ও ইশ্বরীর মূল নামক ওষুধ দিয়ে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তুলতে পারতেন-

'শিয়রে আছে মোর ঔষধের ঝুলি।
দেওলি বান্দুলি আর ঈশ্বরের মুলি।
বিষবর্ণ ওষধ আছে উচলি পর্ব্বতে।
সেই ঔষধে মরা মানুষ পারি জিয়াইতে ॥' -(পৃ-১৭৫)

খাদ্য দ্রব্য

বহুকাল পূর্ব থেকেই এ বাংলার অধিবাসীদের বলা হতো 'মাছে ভাতে বাঙালি'। ভাত আর মাছই ছিল বাঙালির প্রধান খাবার। তবে হিন্দু-মুসলমান খাবারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলতো। বৌদ্ধ ও নমঃ শূদ্ররা খাবারের ব্যাপারে স্বাধীন ছিলেন। তারা শূকর, গরু, মোরগ ও পাখির মাংস খেতো। বিশ শতকে হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে তারা এসব খাবার বর্জন করে। হিন্দু-মসলমানের প্রাত্যহিক খাবার হিসেবে ভাত, মাছ, দুধ, কলা, ডাল, শাক-সবজি, নিরামিষ ও খিচুড়িই ছিল প্রচলিত। অভিজাত মুসলিম সমাজে মাংস-রুটি, বিরিয়ানী, খিচুড়ি, কোর্মা, পোলাও, কালিয়া, কাবাব, কোপ্তা, রেজালা, মোগলাই ছিল পছন্দের খাবার। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের আচার, চাটনি, সালাদ, কাসুন্দি, আমসি ও টক-ঝাল-ঝোল-খাটনার প্রচলন ছিল। মাংসপ্রিয় মুসলমানগণ গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও উটের মাংস পছন্দ করতো। অন্যদিকে বাঙালি হিন্দুরা মাংসের তুলোনায় মাছই বেশি পছন্দ করতো। তবে মাংসের ভেতর ছাগল, পাঠা ও কচ্ছপ প্রচলিত ছিল বেশি। এছাড়া নিম্নবর্ণের হিন্দু ও ব্যাধ শ্রেণির মধ্যে- ইঁদুর, গুইসাপ, শূকর, কাঁকড়া ও কাছিম এখনো প্রচলিত রয়েছে। দরিদ্র বাঙালির খাদ্য তালিকায় রয়েছে- পান্তাভাত, বাসীভাত, খুদের ভাত, জাউ, ছাতু, খাটনা, আলুপোড়া, ওলপোড়া, চাল ভাজা, বিভিন্ন ডাল ভাজা, মরিচ বাটা, শাক পাতা বাটা ও ভর্তা প্রভৃতি। ডালের ভেতর- মুসুরি, খেসারি, মুগ, কলই, মটর, ছোলা, ডাবরি ছিল প্রচলিত। বাঙালির শুকনো খাবারের মধ্য রয়েছে– চিড়া, মুড়ি, খৈ, মোয়া, বিন্নি, বাতাসা, খাজা, নাড়ু, কদমা, লাড্ডু ও বিভিন্ন প্রকার টানা। আর মিষ্টিজাতীয় খাবারের তালিকায় রয়েছে- তালের গুড়, আখের গুড়, খেজুরের গুড়, দই, ঘোল, মাঠা, মাখন, ছানা, সন্দেশ, ছানাবড়া, লুচি, ক্ষীর, পায়েস, পনির, ফিরনি, ক্ষীরসা, শিখারিনী, রসগোল্লা, চমচম, অমৃতী, জিলাপী প্রভৃতি। বাঙালি বিভিন্ন উৎসব-পার্বণ ও ঋতু উপলক্ষে দুধ-গুড় ও আতপ চাল মিশায়ে নানা রকম পিঠাপুলি খেতে পছন্দ করতো। এ সমস্ত পিঠার মধ্যে- চিতই, ভাঁপা, পাটি সাপটা, পাকোয়ান, তালপিঠা, তেলচিতই, হাতেকাটা সেমাই, বড়া, তিলকুলী, দুধকুলী, মোরগ সংসার, ক্ষীরপুলি, রুটি পিঠা, ছিদ রুটি, ধুয়াপিঠা, জলপিঠা, ভিজানো পিঠা প্রভৃতি। আবার ফল হিসেবে– আম, জাম, কাঁঠাল, জাম্বুরা, জলপাই, আমলকি, করমজা, বাঙ্গি, তরমুজ, আমড়া, কুল, কামরাঙ্গা, কলা, নারকেল, পেয়ারা, পেঁপে ও আনারসের প্রচলন ছিল। খাবার রান্না করতে বাঙালি সমাজে সরিষার তেল, তিলের তেল, তিশির তেল ও ঘি ব্যবহৃত হতো। মসলা হিসেবে- আদা, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, গরম মসলা, হলুদ, মরিচ, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, তেজপাতা, কালোজিরা, পেয়াজ, রসুন ও জয়ফলের বহুল ব্যবহার ছিল। নানা পদের শাক, ঘণ্ট, ভাজি, ঝাল-ঝোল, বড়া অপ্রধান খাবার হিসেবে থাকতো। খাবারের মাঝে মাঝে লেবু, কাচা মরিচ, শসা, গাজরের সালাদ খাওয়া হতো। আর খাবার শেষে পান-সুপারি, তামাক, কাঁজি বা আমানীর মতো হালকা নেশাজাতীয় বিষয়াদির প্রচলন ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে সনকার সাধভক্ষণ, বেহুলার বিয়ে ও চাঁদ সওদাগরের খাবার তালিকায় এসব খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়-

মাছ

বাঙালির খাবারের তালিকায় ইলিশ, বোয়াল, রুই, পাঙ্গাস, শৈল, কৈ, পুটি, টেংরা, চিংড়ি, বাইন, খৈলশা, শিং, মাগুর, ফলি, চিতল, কাতল, পোনা মাছ, চেলা, ডানকিনা, গজার, তপসে, মেনি, বাইলা, কালা বাউস, পাবদা, চান্দা ও শুটকি মাছ অন্তর্ভুক্ত ছিল। সনকার সাধভক্ষণের খাবারে এমন কতগুলো মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়-

'বড় বড় সওল মৎস্য রাঙ্গা হইছে কোল।
কত তৈলেত ভাজে কত রান্ধে ঝোল ॥

'''

বড় বড় ইচা মৎস্যের ফেলাইয়া তালু।
তাহা দিয়া রান্ধিলেক সঙ্কচুর আলু ॥

,,,

বড় বড় কই মৎস্যে করিয়া ভাগে ভাগে।
তাহা রান্ধিল লাউ আলু কচুর লগে ॥' -(পৃ-২৯৯)

সবজি

সবজি হিসেবে বাঙালি সমাজে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, আলু, কচু, পটল, ঢেড়স, ফুলকপি, পাতা কপি, বেগুন, করলা, উচ্ছে ছিল প্রধান। বাঙালি সমাজে বিভিন্ন প্রকার ডাল, সবজি, নারকেল, ফলের বিচি, কাঁঠালের মোচা, শিম, মুলা, ধুন্দল, বরবটি, কলার থোর ও ডালের বড়ার মাধ্যমে বিচিত্র নিরামিষ জাতীয় সবজি রান্নার প্রচলন রয়েছে। সনকা তার সাধভক্ষণে এ রকম পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করেন–

'তেতইলের কাষ্ঠে অগ্নি করে ধুক ধুক।
নারিকেল খাড় দুগ্ধে রান্ধে মুগ সুগ ॥
শাক সুকুতা রান্ধে কলইর ভাঙ্গে বড়া।
কটু তৈল দিয়া ভাজে তাল বাইয়ন পোড়া ॥

,,,

খেসারি ডাইল রান্ধে কাঁঠালের মুছি।
দুগ্ধ লাউ দিয়া রান্ধে খাড়লা মুছি ॥' -(পৃ-২৯৮)

শাক

বাঙালি তার প্রতিদিনের খাবারে নানা রকম শাক খেতে ভালোবাসতো। এসব শাকের মধ্যে- নলিতা (পাট), গিমা, পোলতা, লাউশাক, কুমড়া শাক, কমলি শাক, পালং শাক, লাল শাক, সরিষা শাক, কচু শাক, খেসারি শাক, কলই শাক, মটর শাক ও বৈতা শাক ছিল অন্যতম। সনকা তার সাধভক্ষণে এসব শাক রান্না করেছিলেন-

'গিমা গাঙ্গড়াইয়া তোলে আর নলিতা।
মধুলতা খাইয়া আর পোলতা ॥
লাউয়ের ভাঙ্গে আগা কুমরের ভাঙ্গে ডোগা।
বাছিয়া বাছিয়া তোলে শাক ঢোল কমলির আগা ॥' -(পৃ-২৯৭)

পোলাও মাংস

বাঙালি সমাজে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের খাবার হিসেবে পোলাও, দই ও গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ ও পাঠার মাংস পরিবেশন করা হতো। সনকার সাধভক্ষণে এসব খাবারের আয়োজন করা হয়-

'মৎস্যের ব্যঞ্জন রান্ধিয়া করে এক ভিত।
মাংসের ব্যঞ্জন রান্ধে হইয়া হরষিত ॥
ধুম নিধুম রান্দে দিয়া চৈইর ঝাল।
আখিনি পলাও রান্ধে ঘৃতের মিশাল ॥' -(পৃ-৩০০)

মিষ্টান্ন

বাঙালি সমাজে দুধ, চিনি, গুড় ও আতপ চালের গুড়ির সমাহারে ক্ষীর, পায়েস, লুচি, সন্দেস, গজা, খাজি, ছানা, ঘোল, মাঠা, দই ও বিভিন্ন ধরনের পিঠাপুলির ব্যাপক প্রচলন ছিল। সনকার সাধভক্ষণে এসব তৈরি করা হয়-

'খিড় খিড়িয়া রান্ধে দুগ্ধের পঞ্চ মিঠা।
গুড় চিনি দিয়া রান্ধে খাইতে লাগে মিঠা ॥' -(পৃ-৩০০)

খিচুড়ি

বাঙালি সমাজে খিচুড়ির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। মুগ, কলই, মুসুরি, খেসারি, ছোলা, মটর, কালিমটর প্রভৃতি ডালের সঙ্গে চাল মেশায়ে তেল বা ঘি দিয়ে যে খিচুড়ি রান্না করা হয়, তা এ দেশবাসীর প্রিয় খাবার এবং সামাজিক অনুষ্ঠান বা বারোয়ারি আয়োজনে এ খাবার পরিবেশন করা হয়। মাসকলইয়ের খিচুড়ি সম্পর্কে বলা হয়েছে-

'ঘৃত দিয়া খায় যদি রান্ধিয়া খিচড়ি।
ভাজিয়া খাইতে দণ্ডে লয়ে কড়মড়ি ॥' -(বস্তু বদল পালা; পৃ-২৭১)

শুকনো খাবার

শুকনো খাবার হিসেবে চিড়া, খৈ, মুড়ি, বিন্নি, বাতাসা, নাড়ু, লাড্ডু, কদমা, মোয়া প্রভৃতি বাঙালির প্রিয় খাদ্য। এছাড়া কলা, আম, কাঁঠালও মুড়ি-খৈয়ের সঙ্গে খাওয়া যায়। অতিথি আপ্যায়নে বাঙালি এসব খাবার ব্যবহার করে থাকে। অথবা ভাতের বিকল্প খাবার হিসেবেও এর কদর ছিল।

'পৈরেজে মন দোগুনিয়া ছালা।
ভাতের বদলে দেও চিড়াকলা ॥' -(পৃ-৩০৬)

পান্তাভাত

সাধারণত নিম্নশ্রেণি বা গরীব বাঙালি সমাজে পান্তাভাত, বাসীভাত, গম-যব-পায়রার জাউ, ছাতু, খুদের ভাতের প্রচলন ছিল। বেহুলা দেবপুরী থেকে ফিরে ডোমনীর বেশে শ্বশুর বাড়ি গেলে শাশুড়ি সনকা তাকে পান্তাভাত খেতে দেয়-

'আনিয়া মানের পাত বাড়ি দিল পান্তাভাত
বাহের হতে শুনে সদাগর।' -(পৃ-৫২৫)

দুধ-কলা

দুধ কলা দিয়ে ভাত খাওয়া বাঙালির অন্যতম পছন্দের খাবার। সাধারণ বাঙালির প্রশান্তি, পরিতৃপ্তি ও প্রত্যাশিত খাবার এ দুধ কলা-

'সাহের কুমারী বেউলা বুদ্ধিতে আগুলি।
দুগ্ধ আর কলা সমুখে দিল ঢালি ॥ -(পৃ-৪১৪)

মুখ শোধন দ্রব্য

বাঙালি সমাজে খাবার পর মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে কর্পূর ও পানের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল। চাঁদ সওদাগর, জরৎকারু খাবারের পর কর্পূর ও পানের মাধ্যমে মুখ শোধন করেন-

'ভৃঙ্গারের জলে তবে করি আচমন।
কর্পূর তাম্বুলে করে মুখ শোধন ॥' -(পৃ-৩০৬)

খাবারের থালা বা পাত্র

বাঙালি সমাজে খাবার পাত্র হিসেবে সোনার থালা, রূপার থালা, কাসার থালা, টিনের থালা, মাটির থালা ও বাসন এবং কলাপাতার প্রচলন ছিল। ধনীশ্রেণি স্বর্ণ-রৌপ্যের থালায় খাবার খেতো, আর নিম্ন শ্রেণিরা মাটি বা কাঁসার থালা বাসনে খেতো। সামাজিক অনুষ্ঠানে বহুলোকের মাঝে খাবার পরিবেশন করা হতো সাধারণত কলা পাতায়। শিবকেও ডোমনী ছদ্মবেশী চণ্ডী খেতে দিয়েছিলেন কলাপাতায়। আর সনকা বেহুলাকে পান্তাভাত খেতে দিয়েছিলো মানকচু পাতায়। যেমন-

ক. কলাপাতা — 'কদলীর পাত্রে অন্ন দিলেন ভবানী।
ভোজন করিতে বসিলেন শূলপাণি ॥' -(পৃ-৪০)

খ. মানকচু পাতা — 'আনিয়া মানের পাত বাড়ি দিল পান্তাভাত
বাহের হতে শুনে সদাগর।' -(পৃ-৫২৫)

রান্না-বান্না

বাঙালি সমাজে গৃহবধূ বা গৃহকর্ত্রীকেই সাধারণত নিজ হাতে রান্না-বান্না করতে হয়। সমাজের উচুশ্রেণি থেকে শুরু করে নিম্নশ্রেণির সকল গৃহলক্ষ্মী রমণীকেই স্বামী ও আত্মীয়-স্বজনদের জন্য রান্না-বান্না করে পরিবেশন করতে হতো। রান্নার সাফল্যই গৃহবধূ নারীর অন্যতম সাংসারিক গুণ বা কৃতিত্ব বলে বিবেচিত হতো। মনসামঙ্গল কাব্যেও বণিক রাজার স্ত্রী সনকা থেকে শুরু করে একজন পাটনী-ডোমনী নারীকেও স্বামীর জন্য রান্না করতে দেখা যায়। রান্নার পূর্বে সবাই স্নান করে পরিশুদ্ধ হয়ে নিতো।

ক. সনকার রান্না

বণিকরাজা চাঁদ সওদাগরের স্ত্রী সনকা একজন রাজ-রানীর মতো জীবন যাপন করার পরও স্বামীকে নিজ হাতে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্না করে খাওয়াতেন-

'স্নান করিয়া সাধু করে দেবার্চ্চন।
সোনেকা সুন্দরী গিয়া চড়াইল রন্ধন ॥
ভোজন করিতে সাধু বৈসে ততক্ষণ।
একে একে নিয়া দিল পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥' -(পৃ-২৩৫)
স্নান করিয়া চান্দে পরিল বসন ॥' -(পৃ-৩০৪)

খ. নববধূ বেহুলার রান্না

নববধূ বেহুলা বয়সে বালিকা হলেও রান্নায় ছিল সিদ্ধহস্ত। তাই বাসর রাতে স্বামীর ক্ষুধা পেলে সেখানেই খুব কৌশলে রান্নার আয়োজন করে-

'কেমতে করিব রন্ধন নাহি কাষ্ঠজল।
বিধাতা করিল মোরে এত গণ্ডগোল ॥
বরণ ঘটের চাউল লইল পূর্ণ ঘটের জল।
নেতের আচল চিরি জালিল আনল ॥
তিন দিকে দিল বেউলা তিন নারিকেল।
চাউল যুখিয়া বেউলা হাঁড়িতে দিল জল ॥' -(পৃ-৪১৬)

মসলা দ্রব্য

বাঙালি সমাজে রান্নার মসলা হিসেবে সাধারণত তেল, ঘি, লবণ, হলুদ, মরিচ, আদা, লবঙ্গ, এলাচ, জিরা, ধনেপাতা, তেজপাতা, দারুচিনি, গরমমসলা, পুদিনাপাতা, পেয়াজ, রসুন প্রভৃতি ব্যবহৃত হতো। মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব মসলা ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় সনকার সাধভক্ষণের খাবার তৈরিতে-

'শাক সুকুতা রান্ধে কলইর ভাঙ্গে বড়া।
কটু তৈল দিয়া ভাজে বাইয়ন পোড়া ॥

,,,

লতা পাতা সর্ব্ব শাক করে ফেচা ফেচা।
নারিকেল ঘৃত দিল আর আদা ছেচা ॥

,,,

রন্ধন রান্ধিয়া সোনাই করিল ভাগ ভাগ।
হিঙ্গ মরিচে রন্ধিলেক শ্বেত সরিষার শাগ ॥' -(পৃ-২৯৮-২৯৯)

নেশাজাত দ্রব্য

বাঙালি সমাজে ধনী শ্রেণির মানুষ যেমন তাদের ঐশ্বর্য ও বিলাসের বিকারে পড়ে নেশায় নিমজ্জিত হতো তেমনি নিঃস্ব-নির্ধন শ্রেণিও তাদের জীবনের যন্ত্রণা ভুলতে এ নেশার আশ্রয় নিতো। বাঙালির নেশাজাত দ্রব্যের মধ্যে গাজা, ভাঙ, গুল, আফিম, ধুতুরার বিচি, সিদ্ধি, চরস, তাড়ি ও ভাত থেকে পচানো মদ ও আমানী অন্যতম। মনসামঙ্গল কাব্যেও শিব ও হাসন কাজির দুই ছেলেকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়।

ক. শিবের নেশা

শিব সংসারের কাজকর্ম না করে বরং সারাক্ষণ ভাঙ ও ধুতুরার বীজ খেয়ে উদাসীন ভাবে ঘুরে বেড়ান। স্বামীর এ নেশায় আসক্তির কারণে বিরক্ত হয়ে চণ্ডী ভর্ৎসনা করেন-

'বন মধ্যে পুষ্প ফুটে কেহ নাহি কড়া।
এহার লাগি ভাঙে মোরে পাপিষ্ঠ ভাঙ্গড়া ॥' -(পৃ-২৫)

খ. হাসন-হুসনের নেশা

কাজির দুই ছেলে কোন কাজকর্ম না করে সর্বদা আফিম খেয়ে ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে। তাদের অযাচর ও দুরন্তপনায় হাসনাহাটীতে মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে-

'হাসন হুসন দুই কাজির নন্দন।
মহা দুরন্ত তারা কোন ভয় নাই।
ধর্ম কর্ম বেদ নিন্দা করে ঠাই ঠাই ॥
আফিঙ্গ খাইয়া তারা আসমান হাতে পায়ে।' -(পৃ-১২১)

ধর্মীয় আচার ও উৎসব

ধর্মই বাঙালির প্রাণ এবং ধর্মকেই আশ্রয় করে বাঙালির জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুর অর্থাৎ সামগ্রিক জীবন প্রবাহ পরিচালিত হয়। বাঙালি মুসলিমগণ যেমন ইসলামের ৫টি বিষয় (কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত) মেনে চলে তেমনি হিন্দুগণ ৫টি বিষয় যেমন– ক. মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক অুষ্ঠান খ. বেদ-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রে বিশ্বাস, গ. ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পূজার্চনা ঘ. মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ ঙ. ঈশ্বর, পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস। বাঙালি হিন্দুর জীবনে বারো মাসে তেরো পূজা-পার্বণ প্রচলিত। এসবের মধ্যে মাঘে– সরস্বতী পূজা ও শ্রী পঞ্চমী,

ফাগুনে– দোল পূর্ণিমা ও বাসন্তী পূজা, চৈত্রে– চড়ক পূজা, বৈশাখে– বাস্তুপূজা, জ্যৈষ্ঠে– জামাই ষষ্ঠী, আশ্বিনে– দুর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজা, অগ্রহায়ণে– নবান্ন ও পৌষ পার্বণ অন্যতম। এছাড়া অন্যান্য ব্রত উৎসবগুলো হলো- হোলি, ঘেটুপূজা, গাজন, রথযাত্রা, রাসযাত্রা, চণ্ডীপূজা, মনসাপূজা, শিবরাত্রির পূজা, ইতু পূজা, কালীপূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, উপনয়ন, ভাইফোঁটা প্রভৃতি। পূজার অর্ঘ্য হিসেবে সাধারণত পশুবলি, চাল, ধান, কলা, দুধ, নারকেলসহ অন্যান্য ফুল-ফল, দীপ-ধূপ, সিদুর, ঘট, কাসর, বাদ্য ও শঙ্খ ব্যবহৃত হয়। আবার বাঙালি মুসলমান সমাজে ঈদ-উল ফিতর, ঈদ-উল আযহা, মহররম, শব-ই-বরাত, শব-ই-কদর ও বেরা প্রভতি প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে এসব ধর্মীয় পূজা ও উৎসবের চিত্র পরিলক্ষিত হয়-

ক. রাখালদের মনসাপূজা

মনসা দেবীর কৌশলে রাখালগণ মণ্ডপ ঘরে ঘট স্থাপন করে পশুবলি, ধান-দূর্বা, ফুল-ফল গীত বাদ্য ও দীপ ধূপের মাধ্যমে দেবী মনসার পূজা করে-

‘দিব্য মণ্ডপ ঘর করিয়া গঠন।
তাহাতে স্থাপিল ঘট বিচিত্র লিখন ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্য বিধানে করিয়া।
পুষ্প দূর্বা চন্দন গন্ধ ছাগ বলি দিয়া ॥
গীত বাদ্য মহাস্বর করে সর্ব্ব জন।’ -(পৃ-১২০)

খ. চাঁদ সওদাগরের মাঙ্গলিক পূজা

দক্ষিণ পাটন ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশে যাত্রার পূর্বে কল্যাণ-কামনায় চাঁদ শুধু মনসা বাদে অন্যান্য দেবতা যেমন- শিব, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কার্তিক, সূর্য, চণ্ডী, লক্ষ্মী ও সরস্বতী পূজা করেন-

‘কার্ত্তিকে করিলা প্রভু বিষ্ণুর পূজন।
ফাগুন চলিলা সাধু দক্ষিণ পাটন ॥
বাড়াহি যমুনা পোজে গঙ্গা ভাগীরথী।
অষ্টলোক পূজিলেক লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পূজিলেক উমা মহেশ্বর।
অষ্ট লোকপাল পোজে দেব দিবাকর ॥’ -(পৃ-২৪০)

গ. সনকার মনসা পূজা

পুত্র লাভের বাসনায় সনকা, ছয় পুত্রবধূসহ তার আশৈশব আরাধ্য দেবতা মনসার পূজা করেন। ছাগল-মহিষ বলি দিয়ে সোনার থালে দীপ-ধূপের নৈবেদ্য সাজিয়ে মনসার পদ প্রান্তে ভক্তি নিবেদন করেন-

‘পদ্মার দেখিয়া সোনাই বন্দিলা চরণ।
কহিতে লাগিলা সোনাই যত বিবরণ ॥
নানাবিধ নৈবেদ্য দিল ভরি স্বর্ণ থাল।
শ্বেত ধূপ দিয়া সোনাই জালিল পাজাল ॥
ছাগ মৈষ মেষ যত দিল শতে শতে।
নবলক্ষের পূজা সোনাই করিল ভাল মতে ॥’ -(পৃ-১৯১)

ঘ. লখিন্দরের কল্যাণে ষষ্ঠী পূজা

সনকা পুত্র লখিন্দরের জন্মের ষষ্ঠ দিনে কল্যাণ কামনায় ষষ্ঠী পূজার আয়োজন করেন। সোমাই ব্রাহ্মণ এ ষষ্ঠী পূজা সম্পন্ন করনে-

'এক দুই তিন চাইর করিয়া গণন।
ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজি করিল জাগরণ ॥' -(পৃ-৩০২)

ঙ. চাঁদ সওদাগরের নান্দীমুখ যজ্ঞ

চাঁদ তার পিতৃ পুরুষের আত্মার সদগতির উদ্দেশ্যে চাল, কলা, পান, সুপারি, নারকেলের অর্ঘ্য এবং ধুতি বস্ত্র, সোনা ও রূপা দান-দক্ষিণার মাধ্যমে নান্দীমুখ যজ্ঞ করেন-

'চান্দ করে নান্দী মুখ পিতৃলোকের হয় সুখ
বৃদ্ধি করয়ে সদাগর।
রজত কাঞ্চন দান ভাণ্ডারী ঢাকি আন
আজু হইল সফল জীবন।' -(পৃ-৩৬১)

চ. সূর্যব্রত বা বন্দনা

রবিবার যে সূর্যের বন্দনা করে, সে দেবতা সূর্যের রথে করে সূর্যদ্বার লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করবে-

'সূর্য্যব্রত করে যেবা পাইয়া রবিবার।
সূর্য্যরথে যায় সে সূর্য্যের যে দ্বার ॥' -(পৃ-২৩৩)

ছ. একাদশী ব্রত

যে বিধবা একাদশীর দিনে একাহার করে এবং শুদ্ধচারী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়, সে বিষ্ণু রথে করে বিষ্ণুদ্বার লাভ করার সৌভাগ্য লাভ করে-

'একাদশীর দিনে যেবা করে এক আহার।
বিষ্ণু রথে যায় যে বিষ্ণুর যে দ্বার ॥' -(পৃ-২৩৩)

পশুবলি প্রথা

দেবার্চনা ও পূজায় দেব তুষ্টির জন্য প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সমাজে মহিষ, গরু, ছাগল, ভেড়া, কবুতর, মোরগ প্রভৃতি পশু-পাখি বলিদানের প্রচলন রয়েছে। একসময় এদেশে নরবলি ও গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন প্রথা থাকলেও তা এখন বিলুপ্তি ঘটেছে। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ ও সনকা বহু পশুবলি দিয়ে পূজা করেছেন-

ক. 'ছাগ মৈষ মেষ যত দিল শতে শতে।
নব লক্ষের পূজা সোনাই করিল ভাল মতে ॥' -(পৃ-১৯১)

খ. 'খই দধি রচনা সাধু থুইল ঠাই ঠাই।
ছাগ মহিষ দিল বলি লেখা জোখা নাই ॥' -(পৃ-৫৩৯)

জোকার বা উলুধ্বনি

বাঙালি হিন্দু সমাজে পূজা, ব্রত, যজ্ঞ, সন্তান প্রসব, বিয়ের মতো সকল ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যকীয় অঙ্গ হলো রমণীদের জোকার বা উলুধ্বনি। মনসামঙ্গল কাব্যে শিব-চণ্ডীর চেতনা ফেরায়, বেহুলার মরা শৈল মাছ জীবিত করায়, মনসা জরৎকারুর বিয়ে ও বেহুলা-লখিন্দরের বিয়ের সময় রমণীগণ জোকার দেন-

ক. বিবাহে জোকার

'পদ্মাবতীর বরে হউক সভার নিস্তার।
পদ্মা বিবাহ হইল আইয়গণে দেও জয়ে জোকার ॥' -(পৃ-৮২)

খ. কর্ম সাফল্যে জোকার

'যেন মতে জিয়াইল বীর লখিন্দর।
শুনিয়া সকল লোকে হয়ে চমৎকার।
পুরনারী সবে দিল জয়ে জোকার ॥' -(পৃ-৫২১)

লোকাচার-বিশ্বাস ও সংস্কার

বাঙালির জীবন বহুকাল ধরেই লোকাচার-বিশ্বাস ও সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বাঙালি তার প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় চেতন-অবচেতন মনেই ঋতু-মাস-বার-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র-লগ্ন ও যাত্রার শুভাশুভ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ নড়াচড়া, ঝাড়-ফুঁক-জাদু-মন্ত্র-দারু-টোনা-তুকতাক-বাণ-উচাটন-তাবিজ-কবচে বিশ্বাস, তেল পড়া, বাটি চালান, হাত চালান, আয়না পড়ায় আস্থা, বট-তাল-তেঁতুল-গাব-শেওড়া গাছে ভীতি, জীন-ভূত-দেব-দানবে ভীতি ও বিশ্বাস, গৃহনির্মাণ ও গৃহে প্রবেশে নিয়ম-নীতি মানা, রাশিচক্র এবং নিয়তিতে বিশ্বাস করে থাকে। এছাড়া বাঙালি হিন্দু সমাজে আজো বছরের বারো মাসের পাঁচ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। যেমন-জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ সন্তান, সন্তানের জন্ম মাসে, ভাদ্র ও কার্তিক মাসে, আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে বাঙালি সমাজ বিবাহ এড়িয়ে যায়। আবার খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে অরণ্যষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠীর দিন সন্তানবতী নারীগণ মাছ খায় না। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবার ইতু পূজায়ও নারীরা মাছ খায় না। শ্রীপঞ্চমীর দিনও নারী-পুরুষ কেউ মাছ খায়না। দশহরার দিন ফলার খাবার বিধান রয়েছে। আবার ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে তপ্ত খাবার নিষিদ্ধ। এছাড়া জ্যৈষ্ঠ মাসে লাউ খাওয়া, মাঘ মাসে মুলা খাওয়া নিষিদ্ধ। তিথি নক্ষত্রের হিসেবে- প্রতিপদে কুমড়া, দ্বিতীয়ায় ছোট বেগুন, তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মুলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে নিম, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারকেল নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমী শাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুইশাক, ত্রয়োদশীতে মাসকালাই খাওয়া নিষিদ্ধ।[১০৯]

আবার অষ্টমী, নবমী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যাতে স্ত্রী, তৈল, মাছ-মাংসাদি, সম্ভোগও নিষিদ্ধ। এসব এখনো বাঙালি সমাজ পালন করে আসছে। মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব লোকাচার সংস্কার পরিলক্ষিত হয়।

ক. অমঙ্গলের রক্ষাকবচ

সনকা লখিন্দরের বিবাহ যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে পুত্রের অমঙ্গল, বিপদ নাশ করতে লখিন্দরের বাম পায়ে দাঁত দিয়ে কামড়ান, কটিতে পুরাতন জালের কাঠি ও বাম হাতে লোহার আংটি পড়িয়ে দেন-

'যত উপদেশ জানে কহিল লখাইর কানে
দশনে দংশিল বাম পায়ে।
পুরান জালের কাটী বান্দিয়া লখাইর কটী
লোহার অঙ্গুরি বাম হাতে ॥' -(পৃ-৩৬৬)

খ. স্বপ্নের ব্যাখ্যা

সনকা স্বপ্নে চাঁদ সওদাগরের চৌদ্দ নৌকাসহ সাগরে ডুবার দৃশ্য দেখে ভীত হয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। স্বপ্নের বর্ণনা শুনে রতি দাই সনকাকে এই বলে সান্ত্বনা দেয় যে, স্বপ্নে পর দেখলে আপন হয় এবং আপন দেখলে পর হয়-

'ধাই বোলে মা তুমি শোনহ সত্বর।
পর দিয়া ফলিবেক এসব উত্তর ॥
আপন দিয়া দেখে স্বপ্ন পর দিয়া ফলে।
ধনে জনে তোমার সাধু আসিব কুশলে ॥' -(পৃ-৩১০)

গ. সোহাগ পান

স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন ও আদর-সোহাগ সর্বদা বজায় রাখতে বিবাহের সময় বেহুলা একটি পান লখিন্দরের বুকে ও পিঠে চেপে ধরে-

'হাতেত লইয়া পান করিলেক প্রণাম
হস্তলেপ দিল বুকে পৃষ্ঠে।' -(পৃ-৩৯৩)

ঘ. স্ত্রীকে বাম পাশে রাখা

ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, বাঙালি পুরুষ সর্বদা স্ত্রীকে বামপাশে রেখে বসে ও ঘুমায়। আর নারীরাও তাই নাকের বাম পাশে নাকফুল দেয় এবং বাম হাতে এয়োতির চিহ্নস্বরূপ নোয়া দেয়। অনিরুদ্ধও বামপাশে ঊষাকে বসিয়েছিলেন-

'অনিরুদ্ধ ঊষারে ধরিয়া বাম হাতে।
হরষিতে মনসা চড়িল নাগরথে ॥' -(পৃ-২০১)

ঙ. যাত্রার শুভক্ষণ

বাঙালি কোথাও যাত্রা বা গমন করলে তার পূর্বেই লগ্ন বা দিন ক্ষণের শুভ বা অশুভ বিচার করে তবেই রওনা দিতো। চাঁদ সওদাগরও দক্ষিণ পাটনের রাজার কাছে শুভক্ষণ হিসেবে তুলা লগ্নে রওনা দেন-

'তুলা লগ্নে যাত্রা করে চান্দ সদাগর।
দুর্গা দুর্গা বলি গেল রাজার গোচর ॥' -(পৃ- ২৫৭)

চ. বাসর রাতে রমণী সম্ভোগে নিষেধাজ্ঞা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে বাসর রাতে রমণী সম্ভোগ থেকে বিরত থাকার রীতি প্রচলিত ছিল। তাই লখিন্দরকেও বেহুলা নানাভাবে এ রতিলীলা থেকে বিরত রাখে-

'নহে নহে প্রভু নহেত উচিত।
বিবাহের রাত্রে নারী হয়ে গৌরবিত ॥
প্রভু তুমি হও আপনে পণ্ডিত।
বিবাহের রাত্রে কেন বল বিপরীত ॥' -(পৃ-৪১৬)

ছ. জন্মান্তর ও নিয়তিতে বিশ্বাস

বাঙালি সমাজে বরাবরের মতোই জন্মান্তর ও নিয়তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এসেছে। 'দৈবের লিখন, না যায় খণ্ডন'– এমন প্রবাদের প্রচল বাঙালির এ বিশ্বাস থেকেই প্রসার লাভ করেছে। মনসামঙ্গলেও ঊষার কথায়, সনকা ও লখিন্দরের আর্তি-উৎকণ্ঠায় তা ব্যক্ত হয়েছে-

ঊষা : 'পূর্ব্বে জন্মের ফলে মনসা হরিল ছলে
আর না আসিব শিবপুরী।' -(পৃ-১৯৭)

সনকা : 'বিবাহের দিনে নাগে দংশিব লখাই।
এহি কথা কহিয়াছে জগৎ গৌরী আই ॥' -(পৃ-৩১৮)

লখিন্দর : 'বাপে তোলাইল ঘর লোহার বাসর।
নিবন্ধে মৃত্যু মোর তাহার ভিতর ॥' -(পৃ-৪২৮)

জ. রাশি চক্রে বিশ্বাস

তৎকালীন বাঙালি সমাজে মানুষ রাশিচক্রে বিশ্বাস করতো। বারোটি রাশি; যথা- ১. মেষ, ২. বৃষ ৩. মিথুন ৪. কর্কট ৫. সিংহ ৬. কন্যা ৭. তুলা ৮. বৃশ্চিক ৯. ধনু ১০. মকর ১১. কুম্ভ ও ১২. মীন প্রভৃতির ওপর মানুষের

ভাগ্যের ওঠা-নামা হয় এমন বিশ্বাস বাঙালি নর-নারী পোষণ করতো। জন্ম ও বিয়ের উৎসবে রাশি গণনা আবশ্যিক ব্যপার ছিল। তাই মনসামঙ্গল কাব্যে বেহুলার বিয়ে ঠিক করার সময়ে মুকাই গণক বর-কণের রাশি গণনা করে বলেন-

'মেষ রাশি আর নক্ষত্র অশ্বিনী।
নারীর হস্তা কন্যা আমি ভাল জানি ॥' -(পৃ-৩৩৫)

ঝ. যাত্রার অশুভ

তৎকালীন সমাজে মানুষ যাত্রাপথে গর্ভবতী শেয়াল, শকুন, পেঁচা, চিল, দাঁড় কাক, তেলী, গুইসাপ প্রভৃতি দেখাকে অশুভ বা কুলক্ষণ বলে বিবেচনা ও বিশ্বাস করতো। মনসামঙ্গল কাব্যেও জালু-মালু নদীতে মাছ ধরতে যাবার সময় এমন বস্তুর সাক্ষাত পায় । তাই সাত খেও দেবার পরও কোন মাছ জালে না পড়ায় জালু বলেছে-

'জালু বলে মালু দাদা আসিতে পড়িল বাধা
আজুকার জালে ভাস্য নাই।
সাত খেও উঠা উঠি মৎস্য নাহি এক গুটী
জাল লইয়া চলো ঘরে যাই ॥' -(পৃ-১৮৮)

পাপ-পুণ্যের ধারণা

তৎকালীন বাঙালি বর্ণবাদী হিন্দু সমাজে পাপ-পুণ্যের ধারণা ছিল প্রকট। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে শাস্ত্রাচার ও ধর্মাচারের নামে বগুবিধ পাপ-পুণ্যের বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতি প্রচলিত ছিল। সকল পাপের মধ্যে বর্ণবাদী সমাজে অন্নপাপ ছিল সবচেয়ে গর্হিত পাপ। অন্যদিকে বিভিন্ন পূজা, পশুবলি, দানধ্যান ও ব্রত উৎসবকে পুণ্যের প্রতীক বলে গণ্য করা হতো।

অন্নপাপ

বর্ণবাদী বাঙালি হিন্দু সমাজে উচ্চ বর্ণের কেউ অন্ত্যজ নিম্নবর্ণের রান্না করা অন্ন (ভাত) খেলে তাদের অপঘাত মৃত্যু ও পরকালে নির্ঘাত নরক ভোগ- এমন বিশ্বাস ছিল সমাজ মানসে। মনসাঙ্গল কাব্যেও শিবের ডোমনীর হাতে রান্না করা ভাত এবং রতি দাইয়ের হাতের ভাত খেয়ে চাঁদ সওদাগরের এমন অন্নপাপের উপক্রম হয়। তবে চণ্ডী ও মনসার তৎপরতায় শিব ও চাঁদ এ অন্নপাপ থেকে রক্ষা পায়-

'চান্দো বলে রতি তোর এত অহঙ্কার।
তোর ভাত খাইয়া জাতি যাইত আমার ॥' -(পৃ-৩১৪)

পূজা-ব্রত ও যজ্ঞ

বাঙালি হিন্দু সমাজের বিশ্বাস মতে, বিভিন্ন পূজা, একাদশী ব্রত, সূর্যব্রত, নান্দীমুখ যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, অশ্বমেধযজ্ঞ করলে পরলোকগত বংশীয় পিতৃপুরুষের সদগতি হয়। সম্মান-সৌভাগ্য প্রাপ্তি এবং শাশ্বত স্বর্গ লাভ ঘটে। মনসামঙ্গলেও চাঁদ সওদাগরকে পশু বলিসহ দান-ধ্যানের মাধ্যমে নান্দীমুখ যজ্ঞ করতে দেখা যায়। এছাড়া সূর্যব্রত ও একাদশী ব্রতের গুণগান প্রচার-প্রকাশ করা হয়েছে-

'সূর্য্যব্রত করে যেবা পাইয়া রবিবার।
সূর্য্যরথে যায় সে সূর্য্যের যে দ্বার ॥
একাদশী দিনে যেবা করে এক আহার।
বিষ্ণু রথে যায় সে বিষ্ণুর যে দ্বার ॥' -(পৃ-২৩৩)

অভিজ্ঞান প্রথা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে স্বীকৃতির মাধ্যম হিসেবে অভিজ্ঞান বা স্মারক প্রথা প্রচলিত ছিল। এসব অভিজ্ঞানের মধ্যে চিঠি-পত্র, শারীরিক লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য, অলংকার বা উপহার দ্রব্য, দিন-তারিখ-মাস-বছর বা তিথি-লগ্ন, স্মরণীয় ঘটনা এবং বিশেষ শস্যের ক্রমবৃদ্ধি বা অঙ্কুর প্রভৃতি ছিল অন্যতম। প্রবাস জীবন, অজ্ঞাত বাস ও হারানো ব্যক্তি-বস্তু ফিরে পেলে তা এই অভিজ্ঞানের মাধ্যমে নির্ণয় করার রীতি বা প্রথা প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যেও চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যে দক্ষিণ পাটন যাত্রাকালে স্ত্রী সনকাকে পাঁচ মাসের গর্ভপত্র লিখে দিয়ে যান, সামাজিক কুৎসা বা নিন্দার ভয়ে। আবার কুলীবেশী চাঁদকে স্বামী হিসেবে সনকা চিনতে পারেন তার হীরা বিধানো দাঁত ও গজ ইন্দ্রকপাল দেখে। অন্যদিকে সনকার উরুর বামপাশের কালো একটি জটের তথ্য দেয়ায় সনকারও মনের সন্দেহ দূর হয়। এছাড়া বেহুলা শিবপুরীতে যাবার পূর্বে সনকাকে সিদ্ধ ধান, সিদ্ধ হলুদ, সিদ্ধ কলই ও চালের হাড়ি-এরূপ চারটি অভিজ্ঞান দিয়ে যায় কাজের সাফল্যের মাপকাঠি হিসেবে-

ক. গর্ভপত্র

‘সোনাই বলে শোন কথা প্রাণেশ্বর।
পদ্মার বরে পুত্র হইল আমার উদর ৷৷
বৃদ্ধকালে দোচারিণী বলিবে আমারে।
তবে কি বলিব আমি লোকের গোচরে ৷৷

,,,
এত শুনি চান্দো গর্ভ পত্র লিখি দিল।’ -(পৃ-২৪০)

খ. শারীরিক লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য

‘এতে ভাবিয়া সবে নিরক্ষিয়া চায়ে।
সবে মাত্র দুই চিহ্ন দেখিবারে পায়ে ৷৷
গজ ইন্দ্র কপাল হীরা বান্দা দন্ত আর।
দুই চিহ্ন দেখে মাত্র শরীর মাজার ৷৷

,,,
তত্ত্ব কথা কহি আমি মন দিয়া শোন।
তোমার উরুস্থান তাহার নিকট।
বামাধারে আছে কালা একখানি জট ৷৷’ -(পৃ-৩১৪-১৫)

জাদু-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক

বাঙালি সমাজে বগুকাল যাবত জাদু-মন্ত্র, ঝাড়-ফুঁকের প্রভাব রয়েছে। সাপের বিষ ঝাড়া, মৃতকে জীবিত করা, তেলপড়া, বাটিপড়া, আয়নাপড়া, কাজলপড়া, ধূলাপড়া ও মায়া বলে ঘুম আরোপন প্রভৃতি বিষয়ে বাঙালির বিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যে চণ্ডী ও শিবের বিষঝাড়া, চাঁদের গুয়াবাড়ির গাছ পুনরুদ্ধার ও লখিন্দরকে পুনর্জীবিত করার ক্ষেত্রে এমন জাদু-মন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

ক. সাপের বিষ ঝাড়া

মনসার দংশনে দেবী চণ্ডী মূর্ছাহত হলে অনেকে ঝাড়ফুঁক ও সুতা দিয়ে হাত-পা বাঁধে এবং পরে শিবের অনুরোধে মনসা বিষ ঝেড়ে চণ্ডীকে বাঁচিয়ে তোলেন-

'কেহ ঝাড়ে কেহ মন্ত্র পড়ে কেহ ডোর বান্ধে।
দেবী দেবী বলিয়া কেহ উচ্চস্বরে কান্দে ॥

,,,

নানাগুণ জানে পদ্মা গুরুর প্রতাপে।
চণ্ডীর বুকে হাত দিয়া মূল মন্ত্র জপে ॥

,,,

কর্ণে মন্ত্র পড়ে পৃষ্ঠে মারে গাও।
মন্ত্র পাইয়া বিষ চলিল সর্ব্ব গাও ॥
নিদ্রা হইতে উঠেন নিদ্রাগত জন।
পদ্মার প্রতাপে হইল চণ্ডীর চেতন ॥' -(পৃ-৬৪)

আবার সমুদ্র মন্থনের হলাহল পান করে শিব চৈতন্য হারিয়ে ফেললে এবারও মনসা বিষ ঝেড়ে পিতাকে পুনর্জীবিত করেন-

'ধ্যান করি মনসা শিবের বিষ ঝাড়ে।
পদ্মার বিক্রমে সকলের প্রাণ ওড়ে ॥
বিষ ঝাড়ে মনসা কপালে দিয়া চুম।
ভাঙ্গিল শিবের তবে সাপলক্ষের ঘুম ॥' -(পৃ- ১১০)

অন্যদিকে কাজী হাটীর হাসন কাজির তিন বিবির সাপের দংশনে মৃত্যু হলে কাজিও কোরান কিতাব পড়ে বিষ ঝাড়েন-

'কিতাব কোরান এর আপোনে ফু দিয়া ঝাড়
প্রাণ যায় দেখিবারে নাই।
মশারি টানাইয়ারে ফুক দিয়া বিষ ঝাড়ে
কাজির বিবি জিবার আশা নাই ॥' -(পৃ-১৪১)

খ. জাদুর গামছা

চাঁদের মহাজ্ঞান ও মহাতেজের উৎস ছিল একটি গামছা। যা মনসা ছলনা করে হরণ করায় চাঁদ নির্বীর্য ও হীনবল হয়ে পড়েন-

'কামবান্দে চান্দো বানিয়ার পোড়ে মন।
গুণের গামছা চান্দো দিল এতক্ষণ ॥' -(পৃ-১৬২)

গ. মৃত্যু রহস্য ও ক্ষমতার উৎস

সঙ্কুর ধন্বন্তরি অমর অন্ন খেয়ে জরা-মৃত্যুর নাগালের বাইরে চলে যান এবং শিবের তক্ষক ও ব্রাহ্ম তালুর গুপ্ত অন্নে তার মৃত্যু লুকিয়ে আছে। এছাড়া দেওলি বান্দুলি আর ঈশ্বরীর মূলের সমন্বয়ে সঙ্কু মৃত মানুষ জীবিত করেন-

'শিবের তক্ষক যদি আনিবারে পারে।
তক্ষক বিনে মোর প্রাণ অন্যে নিতে নারে ॥

,,,

ঢাকনি পাতিলে দিয়া সিজাইলুম।
সেই অন্ন খাইয়া অমর হইলুম ॥

’’’

শিয়রে আছে মোর ঔষধের ঝুলি।
দেওলি বান্দুলি আর ঈশ্বরের মূলি ॥
বিষবর্ণ ঔষুধ আছে উচলি পর্ব্বতে।
সেই ঔষুধে মরা মানুষ পারি জিয়াইতে ॥’ -(পৃ-১৭৫)

ঘ. ঘুমের মন্ত্র

লখিন্দরকে রক্ষা করতে চাঁদ ও বেহুলা যে সকল সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, তাতে মনসার অভিলাষ বার বার ব্যর্থ হয়ে যায়। পরে নেতাকে পাঠানো হয় ঘুমের মায়া মন্ত্র পড়ে সকলকে সম্মোহনী ঘুমে অচেতন করার জন্য-

‘পদ্মার প্রসাদে নেতা নানা গুণ জানে।
তেপথার ধূলা নেতা ততক্ষণ আনে ॥
হৃদয়ে কালিকামন্ত্র জপে বিপরীত।
অচেতন হইয়া সব পড়িল ভূমিত ॥
তেপথার ধূলা দিয়া চতুর্দিকে বেড়ি।
আপনে শুইলে চান্দো কান্ধে হেতাল করি ॥
মহাজ্ঞান পড়ে নেতা আড়াই অক্ষর।
বেউলার হইল নিদ্রা বাসর ভিতর ॥’ -(পৃ-৪২১-৪২২)

মাতৃস্নেহ, আশঙ্কা ও আহাজারি

বাঙালি সমাজে সন্তানের প্রতি মায়া-মমতা, আদর-যত্ন ও স্নেহ-ভালোবাসা একান্তই অপার্থিব-অকৃত্রিম-অপরিমেয় ও অমূল্য। বাঙালি মা তার সমগ্র জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখে এবং সব কিছুর বিনিময়েও সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। মনসামঙ্গল কাব্যেও সনকা, সৌমিত্রা ও হাসন কাজির মায়ের অপত্য স্নেহ, মায়া-মমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সনকা

সনকা বাঙালি মায়ের আদর্শের প্রতীক বা নমস্য। তিনি স্বামীর স্বেচ্ছাচারীতায় ছয় পুত্রকে হারিয়ে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা ও সাধনার বিনিময়ে লখিন্দরকে লাভ করেন। মনসার বরে পুত্র লখিন্দরকে লাভ করলেও বিয়ের রাতে মৃত্যুর নিয়তি জেনে সনকা পুত্রকে বিয়ে করাতে চাননি। কারণ বিয়ের চেয়ে পুত্রের জীবনই ছিল তার কাছে বেশি মূল্যবান-

‘হেনকালে বলে সোনাই সাধু সম্বোধিয়া।
পাইছি বরের লখাই না করাব বিয়া ॥’ -(পৃ-৩১৮)

কিন্তু স্বামীর জেদের কারণে সনকা অনিচ্ছা সত্ত্বেও লখিন্দরের বিয়ে করানোকে মেনে নেন। এরপরও পুত্রের ভবিষ্যৎ বিপদ নাশ করতে এবং মঙ্গল কামনায় সুরক্ষাকবচ হিসেবে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন-

‘যত উপদেশ জানে　　কহিল লখাইর কানে
　　দশনে দংশিল বাম পায়ে।
পুরান জালে কাটী　　বান্দিয়া লখাইর কটী
　　লোহার অঙ্গুরি বাম হাতে।’ -(পৃ-৩৬৬)

এতসব সুরক্ষার ব্যবস্থা নেবার পরও সনকার মাতৃহৃদয় আশ্বস্ত বা ধীর-স্থির না হয়ে বরং পুত্রের বিদায়কালে নানা বিপদের আশঙ্কায় অস্থির-উতলা হয়ে বলেছেন-

'মায়ে বলে শোন পুত্র বীর লখিন্দর।
উজানিতে যাবা তুমি লাগে মোর ডর ॥

,,,

কি বিদায় করিব বাপু আমি অভাগিনী।
ডোয়র হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী ॥

,,,

দড় হই যাইবা পুত্র নগর উজানি।
পথ নিরক্ষিয়া রইলাম আমি অভাগিনী ॥' -(পৃ-৩৭১-৩৭২)

এমন আদরের ধন, স্নেহের পুত্তলি লখিন্দরের দৈব বিধানে মৃত্যু হলে সনকা পুত্রের ওপর আছড়ে পড়েন এবং তার কান্নার মাতম-আর্তনাদ-আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে-

'বার্ত্তা পাইয়া সোনেকা আসিল লড় দিয়া।
আহা পুত্র বলি পড়ে ভূমে আছাড় খাইয়া ॥

,,,

কান্দে সোনকা রাণী বুকে হানে ঘা।
আর মোরে চন্দ্র মুখে না বলিলা মা ॥

,,,

হেন প্রাণের ধন মোর কে নিল হরিয়া।
কি করিব অভাগিনীর প্রাণ রাখিয়া ॥' -(পৃ-৪৩২-৪৩৪)

মাতৃভক্তি

বাঙালি সমাজে সবার কাছে মা অতি আপনজন, পূজনীয় গুরুজন হিসেবে সর্বোচ্চ ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। বাঙালি সন্তান সর্বাবস্থায় গর্ভধারিণী মাকে স্মরণ রেখেছে, সকল শুভ কর্মই মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আরম্ভ করেছে। মনসামঙ্গল কাব্যেও লখিন্দর মৃত্যুর সময় এবং শিবপুরীতে জীবিত হয়েই মায়ের সন্ধান করে উতলা হয়েছে-

'মা বাপ না দেখিলাম আর বন্ধুজন।
আমার এমত দশা না জানে কোন জন ॥
দারুণ বিষের জালে মোর প্রাণ যায়ে।
কান্দিয়া মরিব মোর অভাগিনী মায়ে ॥
লোহার বাসরে এখন মোর প্রাণ যাবে।
না দেখিয়া মোর মায়ে কিরূপে সহিবে ॥' -(পৃ-৩২৮)

ভ্রাতৃস্নেহ

বাঙালি সমাজে ভাইয়ের স্নেহ-ভালোবাসার মূল্য অপরিসীম। ছোট বোনদের প্রতি ভাইয়ের অপত্য স্নেহ, আদর-সোহাগের বন্ধন ছিল অবিচ্ছেদ্য। বড় ভাইদের সবাই (অন্য সহোদরগণ) পিতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতো এবং বড় বোনকে মায়ের মতো মান্য করতো। ভাই-বোনের মধ্যকার এরূপ প্রগাঢ় ভালোবাসার চিত্র পাওয়া যায় বেহুলা ও হরিসাধুর সম্পর্কের মাধ্যমে। বেগুলাকে শিবপুরীর ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় ভাই হরিসাধু যেভাবে তাকে

আদর মাখা কণ্ঠে বোঝায়েছেন বাড়িতে আসতে, তাতে করে ভ্রাতৃস্নেহের অকৃত্রিম মায়া-মমতারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে-

‘হরি সাধু বলে বেউলা ফিরিয়া ঘরে আয়ে।
তোর লাগিয়া কান্দিয়া বেয়াকুল হইল মায়ে ॥
শঙ্খ বদলে দিমু সুবর্ণের চূড়ি।
সিন্দুর বদলে দিমু খাসা ফাউগের গুঁড়ি ॥’ -(পৃ-৪৫৩)

হাসি-ঠাট্টা রঙ্গ-রস

বাঙালি সমাজে ঠাট্টার সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনের মধ্যে হাসি-তামাশা ও রঙ্গ-রস করার প্রথা প্রচলিত ছিল। অনেক সময় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেও হাসি-ঠাট্টার আশ্রয় নেয়া হতো। মনসামঙ্গল কাব্যেও মনসার পিতা শিবকে চণ্ডীর প্রতি স্ত্রৈণ স্বভাবের কারণে ঠাট্টা করেছেন, আবার চাঁদের কাছে মনসা পূজা দাবি করায় চাঁদ তাকে শালি বলে হাসি-তামাশা করেছেন-

‘পদ্মাবতী বোলে বাপু কান্দ অকারণ।
অগ্নিতে পুড়িয়া গৌরীর হইল মরণ ॥
মরিয়া গেল বাপু তোমার বালাই লইয়া।
আর এক ঋষির কন্যা করাইব বিয়া ॥’ -(পৃ-১১০)

বকা ও গালি

বাঙালি সমাজে বহুকাল থেকেই কিছু বকা ও গালি প্রচলিত রয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্কিত স্বভাবজাত, স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক ও পশু-পাখিবাচক নিন্দার্থক শব্দসমূহকে বাঙালি নর-নারী গালি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। এসব গালির মধ্যে- শালা, শালি, সমুন্দি, কানা, কানী, ভাঙরা, বখিল, চশমখোর, গরু, গাই, বলদ, ষাঁড়, মহিষ, পাঠা, ছাগল, বানর, চোরের মা, কুত্তার বাচ্চা, বাদীর বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা বা ছাও অন্যতম। মনসামঙ্গল কাব্যেও চণ্ডী, চাঁদ সওদাগর, তকাই মোল্লা ও জরৎকারুর কথায় এসব বকা ও গালির ব্যবহার দেখা যায়-

ক. জরৎকারু ‘ব্রাহ্মণের নারী হইয়া নাহি ধর্মজ্ঞান।
ভাঙ্গড়ার ঝি তুই কিসে অপমান ॥’ –(পৃ-৮৫)

খ. রাখালগণ ‘সাত পাঁচ রাখাল একত্র হইয়া মেলা।
হেন বলে কোন সাহসে ঘর ঢোক শালা ॥ –(পৃ-১২৩)

শাস্তি ও নির্যাতন প্রক্রিয়া

বাঙালি সমাজ জীবনে অন্যায় অপরাধের বেশ কিছু শাস্তি প্রচলিত ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব শাস্তি বলবৎ করা হতো। অন্যায় ও অপরাধের প্রকৃতি বা ধরন অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা নির্ধারিত হতো। সাধারণ অন্যায়ের জন্য- চড়, থাপড়, কিল, ঘুষি কানমর্দন, নাকে খত, গলায় গামছা দিয়ে ঘোরানো, কানধরে উঠবস করা, লাঠি-বেত দিয়ে পেটানো, পিঁপড়ার ওপর দাঁড় করানো, শরীরে চুনকালী ও চুতরাপাতা দেয়া, মাথা মুণ্ডন করা, গলায় জুতার মালা দিয়ে ঘোরানোর মতো শাস্তি প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে চুরি, ডাকাতি, হত্যা, ব্যভিচার, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, বিদ্রোহ, অপহরণ, গুম ও খুনের অপরাধের জন্য চাবুক মারা, দোররা মারা, অঙ্গহানি বা অঙ্গচ্ছেদ করা, কয়েদ করা, শিরচ্ছেদ ও ফাঁসি দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যেও এমন সব শাস্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। রাখাল, কাজি, পেয়াদা, কতোয়াল ও মনসার মাধ্যমে ব্রাহ্মণ, তকাই মোল্লা, গোদা ও চাঁদের ওপর শাস্তি দিতে দেখা যায়-

ক. ‘জলে ঝাঁপ দিয়াছিল আমারে দেখিয়া।

চিরকাল রহিছে গোদা বড়সি ফুটিয়া ॥
বেউলার কথা শুনিয়া লখাই গোদারে উঠায়।
নাক চুল কাটিয়া তারে দিলেন বিদায় ॥' -(পৃ-৫২০)

খ. 'যে মুখে দিয়াছি গালি লঘু জাতি কানি।
সেই মুখে ভস্ম যাম শোনগ জননী ॥
যে মুখে দিয়াছি গালি দেও চুন কালি।
আমার করহ কৃপা বিষহরি মায়ে।
গোঁফ দাড়ি কাটিয়া দিব তোমা পায়ে ॥' –(পৃ-৫৩৯)

গ. 'মোল্লা বলে ভাইসব কর অবধান
নাকে খত দিলাম দুই রাখ মোর প্রাণ।' –(পৃ-১২৪)

ঘ. 'আপোন ইচ্ছায় তাহারে যত পাড়ে গালি।
চোপার চাপর মারে দেয়ে চুন কালি ॥
চুলে মুখে পেটে পিষ্টে মারে ঘারকাতা।' -(পৃ-৪৭)

প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি

বাঙালি সমাজে মাথায় বুকে হাত রেখে, বিধাতা, দেবতা, দিক, ধর্মগ্রন্থ, মসজিদ-মন্দির ও ধর্মকে সাক্ষী বা স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। মনসামঙ্গল কাব্যে তকাই মোল্লা খোদার নামে মাথায় হাত দিয়ে এবং বেহুলা ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রতিজ্ঞা করেছে-

ক. তকাই মোল্লা

'খোদা তালার দিব্য কর মাথায় দিয়া হাত।
এসব বাত না কহিবা কাজির সাক্ষাত ॥

,,,

মছাপের দোহাই দেয় সাতবার।
জনে জনে প্রণাম করে হাজারে হাজার ॥' -(পৃ-১২৪-২৫)

খ. বেহুলা

'বেউলা বলেন ভাই বাহিরে কেন বৈস।
দুয়ার মেলিয়া দেই ঘরে মধ্যে আইস ॥
আমাত্য দরশনে যদি পলাইয়া যাও।
দোহাই পদ্মার ধর্মের মাথা খাও ॥' -(পৃ-৪১৩)

বাজিধরা

বাঙালি সমাজে কোন কিছু করার ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে বাজি ধরার রীতি প্রচলিত ছিল। এসব বাজি ধরার কর্ম সাফল্যকে পৌরুষ ও গৌরবের বিষয় বলে বিবেচনা করা হতো। বাজিতে হার-জিত উভয়ই থাকতো। বাজিতে জয়ী হলে টাকা-পয়সা, ধন-সম্পদ, রাজ্য-রাজকন্যা, দান সামগ্রী, সম্মান ও সৌভাগ্য যেমন মেলতো, তেমনি আবার পরাজিত হলে ধন-সম্পদ, অঙ্গহানি, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করতে হতো। মনসামঙ্গল কাব্যেও এ বাজি ধরার চিত্র উল্লিখিত হয়েছে। চাঁদ সওদাগর পুত্র লখিন্দরের বিয়েতে সুপরির গুণগান করতে বলেন হরি সাধুকে। অন্যথায় বাজির শর্ত হিসেবে থাকে-

'যদি সে করিতে পার গুয়ার বাখান।
সুবর্ণের বাটা ভরি দিব গুয়া পান ॥
যদি না করিতে পার গুয়ার বাখান।
হারি সমান করি কাটিব দুই কান ॥' -(পৃ-৩৭৬)

পরাভব স্বীকার

তৎকালীন বাঙালি সমাজে হার মানা বা পরাভব স্বীকার করার ক্ষেত্রে গলায় গামছা বা কাপড় দিয়ে নতজানু বা ক্ষমা প্রার্থনা করার রীতি প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গলে অত্যাচারী হাসন কাজিও শেষ পর্যন্ত গলায় কাপড় দিয়ে মনসার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন-

'মরিছিল রাখালগণ তোলিল জিয়াইয়া।
প্রণাম করিল কাজি গলায়ে কাপড় দিয়া ॥ -(পৃ-১৪৪)

আদব-কায়দা ও কুশল বিনিময়

বাঙালি সমাজে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রাত্যহিক জীবনে কিছু আদব-কায়দা মেনে চলে। সাক্ষাতের প্রথমেই সালাম, নমস্কার, আদাব জানানো, করমর্দন করা, কোলাকুলি করা, গুরুজনকে প্রণাম বা কদমবুছি করা। আবার বিদায়ের সময়ও কিছুদুর এগিয়ে যাওয়া অনুরূপভাবে প্রণাম, কোলাকুলি, সালাম বা নমস্কার জানানো। এছাড়া গুরুজনের সামনে বসে না থাকা, গুরুজনের নাম না বলা, উচ্চশব্দে হাসা বা কথা না বলা, গুরুজনের সামনে না চলা, গুরুজনের সঙ্গে একই বৈঠকে খাবার খেলে আগে খাবার গ্রহণ না করা এবং গুরুজনের সামনে ধূমপান না করা। মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব আদব কায়দা ও কুশলাদি বিনিময়ের চিত্র পাওয়া যায়।

ক. নমস্কার ও প্রণাম

'কান্দিয়া বিকল বেউলা চিত্ত নহে স্থির।
মাতা পিতার পদধূলি লইলেক শির ॥
আর যত গুরুজন করি নমস্কার।' –(পৃ-৫২২)

খ. কোলাকুলি

'দুই বেহাই কোলাকুলি করে কুতূহলে।
মেলানি পাইয়া সাধু নিজ দেশে চলে ॥' -(পৃ-৩৪১)

উপহার বা বখশিশ

তৎকালীন বাঙালি সমাজে শাসক বা রাজার দরবার, আত্মীয় বাড়ি পুরোহিত, মোল্লা, শিক্ষক, বিয়ে, শ্রাদ্ধসহ সামাজিক অনুষ্ঠান এমনকি রাখাল শ্রমিকদেরও উপহারসহ বখশিশ দিতে হতো। এ বখশিশ বা উপহার দ্রব্যের মধ্যে প্রাধান্য পেতো- টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, পান-সুপারি, ধুতি-চাদর, শাড়ি, থালা-বাসন-গেলাস, মাছ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব উপহার দেবার বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়। চাঁদ দক্ষিণ পাটনের রাজাকে, তারাপতি কর্মকারকে এবং বিয়ে ঠিক করার পর বেহুলার বাবা চাঁদকে বিভিন্ন উপহার সামগ্রী প্রদান করেন ––

ক. রাজার জন্য ভেট বা উপহার দ্রব্য

চাঁদ সওদাগর দক্ষিণ পাটনের রাজার জন্য পান, সুপারি, খেজুর, কর্পূর, নারকেল ও পাট বস্ত্রের উপহার নিয়ে যান–

'কর্পূর তাম্বুল আদি লইয়া সকল।
অল্প করিয়া দ্রব্য লয়ে সদাগর ॥

,,,

মিষ্টি নারিকেল দিল আর নাগরঙ্গ।
শুকনা খেজুর দিল দেখিতে সুরঙ্গ॥' -(পৃ- ২৫৭-২৫৯)

খ. তারাপতি কর্মকারকে চাঁদের বখশিশ

চাঁদ সওদাগর তারাপতি কর্মকারকে দিয়ে লোহার বাসর ঘর তৈরি করান। এ কাজ শেষ হলে চাঁদ খুশিমনে সকল মজুরি দেবার পরেও বখশিশ হিসেবে তারাপতিকে পান ও ফুল প্রদান করেন–

‘ লোহার বাসর ঘর দেখি চান্দো হরিষ অপার।
পান ফুল দিয়া বিদায় করিল কামার ॥’ -(পৃ- ৩৫৯)

নর-নারীর নাম

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সমাজে নাম রাখার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। যেমন- দেব- দেবী, পৌরাণিক চরিত্র, আল্লাহর গুণবাচক নাম, নবীর-রাসুল, খলিফা-সাহাবা, নবীদের স্ত্রী-আত্মীয়বর্গ, ফুল-ফল। গ্রহ-নক্ষত্র, শস্য, মশলা, মাছ, মূল্যবান রত্ন, পাথর, অস্ত্র, রোগ, দিন-বার, তৈজসপত্র, অঞ্চল, নদ-নদী, পেশা, বর্ণ, গোষ্ঠী ও কিংবদন্তি প্রভৃতির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখেই বাঙালি তাদের সন্তানাদির নাম রেখে থাকে। এসব নামগুলোর নমুনা হলো– বিষ্ণু, নারায়ণ, শিব, রাম, লক্ষ্মণ, অর্জুন, গণেষ, কার্তিক, দুর্গা, কমলা, সরস্বতী, গঙ্গা, সীতা, সাবিত্রী, সতী, সৌমিত্রা, কৌশল্যা, রহিম, রহমান, রাজ্জাক, মুহাম্মদ, ইউসুফ, ইউনুস, ইব্রাহীম, ঈসা, মুসা, আবু বকর, উমর, আলী, আমেনা, হাজেরা, হালিমা, রহিমা, খাদিজা, রাবেয়া, ফাতেমা, হাসান, হুসেন, শেফালি, গোলাপি, গোপাল, কমলা, আঙ্গুরি, আনারকলি, কিসমিস, হাসনা, আতা, ডালিম হেনা, পলাশ, চাঁদ, সুরুজ, তারা, এলাচি, পেয়ারা, কালোজিরা, বাতাসি, সোনা, রূপা, হীরা, পান্না, দৌলত, ইয়াকুত, পাচি, পাচু, গোদা, মানিক, তরব আলী, দোয়াত আলী, দলিল উদ্দিন, চেরাগ আলী, রবি, মঙ্গল, বিষা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, রেবা, বিপাশা, আব্দুল কাদির জিলানী ও শামছুল হক ফরিদপুরী প্রভৃতি।

মনসামঙ্গল কাব্যেও নর- নারীর নামের ক্ষেত্রে এরূপ প্রভাব ও সাদৃশ্য পাওয়া যায়। চাঁদ সওদাগর, সাহে সওদাগর, হরিসাধু, সোমাই পণ্ডিত, ধনঞ্জয় সাধু, মুকাই গণক, ধনপতি, উজা পুরোহিত, তারাপতি কর্মকার, তালিম নাটোয়া, গঙ্গাধর ব্রাক্ষণ, জগাই মণ্ডল ও সঙ্কু ওঝা এসব নামের সঙ্গে পেশা ও বর্ণ জড়িত। আবার রাখাল, ঝালু-মালু, ধনা-মনা, উষাদ্বারী, গোদা ও টেটন যেমন নিম্ন পেশাদারী শ্রেণির প্রতিনিধি, তেমনি ধনা ও ধামু যথাক্রমে চাঁদ ও মনসার অনুগত অনুচরের প্রতীক। এছাড়া গৌরী, ডোমনি, জোলার স্ত্রী, হাসনের মা, ঝালু-মালুর মা, সনকা, সুমিত্রা, বেহুলা এবং আয়াদের মধ্যে - কমলা, বিমলা, প্রভা, ভানুমতী, তারারতি, রোহিনী, সারদা, বরদা, বামা, চক্ররেখা, সত্যভামা, বল্লভা, নীলাবতী, মনোরমা, ভবানী, শিবানী, রতি, আনন্দা, সোনন্দা, মেধা, মাধবী, মালতী, রাধা, সরলা, রই, নীলা, রূপাই ও চূয়া-র মতো যে নাম পাওয়া যায়, তা সবই এদেশীয় শব্দজাত। পক্ষান্তরে মুসলমান নামের ভেতর– হাসন কাজি, হাসান-হুসন, তকাই মোল্লা, শেখ সাইদ পাঠান, জোলা, হাসন তুজুক ও ফাতেমা বিবি উল্লেখযোগ্য। এসব নামও সর্বাংশের বিদেশি না থেকে বরং অনেকাংশেই দেশীয় রূপ ধারণ করেছে। বেহুলা-লখিন্দরের বিয়েতে যে সকল নারী আয়ার ভূমিকা পালন করেছিলো তাদের নাম দেখলেই বাঙালি হিন্দু নারীর নাম সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়-

‘সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করি যেন স্বর্গ বিদ্যাধরী
আইয়গণ চলে ধীরে ধীরে।
কমলা বিমলা সতী সঙ্গে প্রভা ভানুমতী
তারারতি রোহিনী রুক্সিনী।
সারদা বরদা বামা চন্দ্ররেখা সত্যভামা
চৌদ্দ আইয় চলিল ব্রাক্ষণী।

,,,,

যশদা বরদা জাম্বুবতী ভবানী শিবানী রতি
চন্দ্ররেখা আর ভানুমতী।
আনন্দা সোনন্দা মেধা মাধবী মালতী রাধা
তরলা সরলা চলে আর।’ -(পৃ-৩৮১)

ঘর-বাড়ি

বাঙালি সমাজে আঞ্চল ভেদে বিচিত্র ধরনের ঘর বাড়ি দেখা যায়। ধনী সামন্ত শ্রেণির মানুষেরা শুধু শহর ও গ্রামে পাকা ইটের দালান, প্রাসাদ, মঠ-মন্দির, মসজিদ নির্মাণ করতেন। এসব দালান বা প্রাসাদ বহুতল বিশিষ্ট হতো এবং বিভিন্ন মহলে (পাঁচ মহলা, সাত মহলা) বিভক্ত থাকতো। চার চালা, আটচালা ঘরও নির্মাণ করতো। আবার আনন্দ-বিনোদনের জন্য জলসাঘর, জলটুঙ্গী, বাগান বাড়ি, হাওয়াখানা বা বালাখানা বা বিলাসভবনও খুব ব্যয়বহুল করে তৈরি করা হতো। বৈঠকখানাকে বলা হয় দেউরি বা কাছারি অথবা বাংলা ঘর। অন্যদিকে গ্রামের মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্নশ্রেণির মানুষেরা কদাচিৎ টিনের একচালা, দোচালা ও চারচালা দিতো। এছাড়া বাঁশ-বেত-পাটখড়ি দিয়ে ছনের ঘর, ছাপড়া ও লতা-খড়কুটা-পাতার ডেরা বা পর্ণকুটীরে দরিদ্র লোকেরা বসবাস করতো। উত্তরবঙ্গের গ্রাম-পল্লীতে মাটির ঘরের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব ঘর-বাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। হাসন কাজির কাছারি বা বৈঠকখানা, চাঁদ সওদাগরের বাড়ির অন্দরমহল, বাহির মহল (অর্থাৎ দেউড়ি ও খিড়কি) ও বাগান বাড়ি এবং সাহে সওদাগরের চারচালার বৈঠকখানা ঘরের পরিচয় পাওয়া যায়-

ক. কাছারি বা বৈঠকখানা

‘বসিয়াছে কাজি আপন কাচারিতে।
আপনার চাকর সব রহিছে জোড় হাতে ॥’-(পৃ-১২৫)

খ. চারচালা ঘর

‘বাহির চতুঃশালাতে বসিল দুইজন।
রাজযোগ্য সম্ভাসা করিলা ততক্ষণ ॥’-(পৃ-৩৩০)

গ. রাজপুরী বা রাজপ্রাসাদ

‘নপুংসক লোক রাজা আনে ডাক দিয়া।
পুরীর ভিতরে মুলা দিল পাঠাইয়া ॥’ –(পৃ-২৭০)

ঘ. নৃত্যশালা

মোর পুত্র ধনপতি গুণের তরঙ্গ।
নৃত্যশালে আছে তার চারিটা মৃদঙ্গ ॥’-(পৃ-৪৭৯)

তৈজসপত্র

বাঙালি নর-নারী তার সংসার জীবনে নানা রকম তৈজসপত্র ব্যবহার করে থাকে। ধনী-গরীব, শহুরে-গ্রাম্য সকল মানুষই তামা-কাসা-লোহা-বাঁশ-বেত-কাঠ ও মাটির বহু বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র দিয়ে ঘর-সংসার ভরে রাখে। কৃষি, কুটির, শিল্প, রান্নাবান্না, খাবার-দাবার, পূজা-পার্বন ও অনুষ্ঠানে যেসব তৈজসপত্র ব্যবহৃত হয়; তা হলো- পাত্র (ভাণ্ড, ঘট), পাতিল, কড়াই, থালা, গেলাস, বাটি, বাসন, খোরা, সাজি, ঝুড়ি বা ঝুপড়ি, থলে, সরা, ঢাকনা, হাড়ি, কলস, খেজুরপাটি, শীতলপাটি, দড়ি বা রশি, মশারি, খাট, চৌকি, জল চৌকি, পিড়ি, হাত পাখা বা চামর, পানের ডাবর, সড়তা, লোটা, বদনা, ঘটি, ঢেকি, কুলা, ধামা, কাঠা, ডালা, চাঙারি, বাখারি, দোলনা, শিকা, হামান দিস্তা, পাটা, জাতা, সিন্ধুক, রেকাবি, কুপি বা প্রদীপ, দীপাধার, বালতি, খুন্তি, কাজল দানি, সুরমা দানি, লাঙ্গল, জোয়াল, মই, টোনা ও ডোল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

মনসামঙ্গল কাব্যেও বাঙালির সাংসারিক জীবনে ব্যবহৃত এসব তৈজসপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। সনকার ও বেহুলার রান্নায়, শিব ও চাঁদের ভোজন এবং চাঁদ-সনকা-বেহুলার পূজা-ব্রতে এসব তৈজসপত্র ব্যবহার হতে দেখা যায়-

ক. সাজি বা ঝুড়ি

‘আবদ্ধি দিয়া পুষ্পের সাজি ঢাকিল।
হস্তে সাজি করিয়া বৃষের পিষ্টেতে চড়িল ॥’ –(পৃ-৩৩)

খ. পাতিল বা ঢাকনি

‘ঢাকনি পাতিল দিয়া সিজাইলুম।
সেই অন্ন খাইয়া অমর হইলুম ॥’ –(পৃ-১৭৫)

গ. কলস

‘বানের কুমারী ঊষা বড়হি সাহস।
অগ্নি মধ্যে ঘৃত ঢালে কলসে কলস ॥’ –(পৃ-২০৩)

ঘ. থালা বা বাসন

‘রন্ধন করিয়া কলই ঢালিলেক থালে।
দেখি হরষিত হইল সকলে ॥’ -(পৃ-৩৪০)

ঙ. হাড়ি

‘তিন দিকে দিলে বেউলা তিন নারিকেল।
চাউল যুখিয়া বেউলা হাঁড়িতে দিল জল ॥’ (পৃ- ৪১৬)

চ. মশারি

‘মশারি টানাইয়ারে ফুক দিয়া বিষ ঝাড়ে
কাজির বিবি জিবার আশা নাই ॥’ (পৃ- ১৪১)

ছ. হাত পাখা বা চামর

‘চামরে বাতাস করে মউরে পেখম ধরে
আনন্দে বসিয়ে জালুর মায়।’ –(পৃ- ১৮৯)

জ. বদনা বা লোটা

‘সমুখে তামার বদনা হাতে ছড়িখান।
কাগজের বস্তাহাতে কাগজ কোরান ॥’ –(পৃ- ১২৫)

ঝ. কুলা

‘বরণ কুলাএ আছে চাউল বরণ ঘটে জল।
নখেতে তিয়ার খুলি রন্ধন গিয়া কর ॥’ –(পৃ-৪১৬)

ঘর লেপা

বাঙালি গ্রামীণ সমাজে বাড়ি-ঘর ও উঠান মাটি ও গোবর দিয়ে লেপা হতো। এ মাটি গোবরের সঙ্গে দেয়া হতো ধানের কুড়া ও তুষ। আবার ঘরের মেঝেতে বিভিন্ন উৎস উপলক্ষ্যে অঙ্কন করা হতো বিচিত্র ধরনের আল্পনা। মনসামঙ্গল কাব্যেও গোদার বউয়ের ঘর লেপার কথা জানা যায়-

'তাহা দিয়া গোদার বউ লেপে চারি বেড়া।
ঘর লেপে দ্বার লেপে আর লেপে চাল।
উবুড়া মৃত্তিকা দিয়া পাতিল সাজাল ॥' –(পৃ-৪৫৫)

যানবাহন

তৎকালীন বাংলায় জল ও স্থলপথেই মানুষজন যাতায়াত করতো। জলপথের বাহনরূপে ছিল বিভিন্ন ধরনের– নৌকা, জাহাজ, ডিঙি ও ভেলা। আর স্থল পথের বাহন ছিল- পালকি, দোলা, রথ, হাতি, ঘোড়া, উট, গাধা, বলদ, গরু ও মহিষ প্রভৃতি। এছাড়া মানুষ পায়ে হেঁটেই আয়ত্তের মধ্যে যাতায়াত করতো। মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর চৌদ্দ নৌকা নিয়ে বাণিজ্যে দক্ষিণ পাটন ও বেগুলা কলা গাছের ভেলায় চেপে জলপথে শিবপুরীতে গেছেন। আবার লখিন্দরের বিয়ের সময় বর যাত্রীরা হাতি, ঘোড়া, দোলা, রথে চেপে উজানি নগরে পৌছায়। অন্যদিকে শিব ষাঁড়ের পিঠে চড়ে পুষ্প বনে যান-

ক. নৌকা

'তার পাছে চলে ডিঙ্গা নামে মধুকর।
এই ডিঙ্গায়ে চড়িয়াছে চান্দো সদাগর ॥
দেখিতে না দেখি ডিঙ্গা পবনগতি চলে।' –(পৃ-২৪৪)

খ. পালকি-দোলা-হাতি-ঘোড়া-উট

'পবনের বেগে ঘোড়া চলে শীঘ্রগতি।
তিনশত চলিয়াছে মত্ত গজহাতি ॥
তিনশত গর্দভ চলে লেজের আগে থোপ।
সফরিয়া বলদ চলে বড় বড় পেট।
সাত হাজার কৃষ্ণষাড় নয় হাজার উট।

,,,

আশীখান চলিয়াছে সোনার চৌদল।

,,,

সাতখান চলিয়াছে সোনার পালঙ্ক।' -(পৃ-৩৬৮-৩৭০)

গ. কলাগাছের ভেলা

'মাজুষে (ভেলায়) চড়িল বেউলা নাহি কিছু ভয়ে।
লখিন্দরের পাও বেউলা কোলে তুলি লয়ে ॥
বেউলা বলে আমি যদি হই বড় সতী।
ভাসিয়া চলিয় মাজুষ যথা পদ্মাবতী ॥
বেউলার বচনে মাজুস বায়ু-গতি যায়ে।' -(পৃ-৪৪৪-৪৪৫)

খেলাধুলা

বাঙালি সমাজে বহুকাল থেকেই বিচিত্র ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত ছিল। নর-নারী উভয়েই অবসর-বিনোদন, শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্তির জন্য- পাশা, দাবা, চৌগান বা পলো, কুস্তী বা মল্ল, কাবাডি, দাড়িয়াবান্দা, কানামাছি, বুড়িছোয়া, গোল্লাছুট, নৌকা বাইচ, সর্দারবারি, হাতির লড়াই, ষাঁড়ে লড়াই, মোরগের লড়াই, বুলবুলির লড়াই, মহিষের লড়াই, ঘোড় দৌড়, গরু দৌড়, পায়রা উড়ানো, ঘুড়ি উড়ানো, লাটিম খেলা, বানরের খেলা, সাপের খেলা, খঞ্জনের নাচ, বিশ-পঁচিশ, বাঘবন্দি, তাস ও জুয়াখেলায় অংশ নিতো। সামান্ত রাজারা পশু শিকারে অংশ নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতেন। বাংলায় পর্তুগিজ ওলন্দাজদের আগমনের পর হতেই এদেশে তাস ও জুয়াখেলার সূত্রপাত ঘটে। মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব খেলার পরিচয় মেলে। টেটন জাতে মালাকার এবং ধনী বণিক বাবার পুত্র হয়েও শুধু জুয়াখেলেই সমস্ত ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি নষ্ট করেছে। আবার টাকার অভাবে জুয়ার বাজি হিসেবে চার স্ত্রীকে হারিয়ে পথের ভিখারী সেজেছে এবং ক্ষুধার জ্বালায় গলায় কলসি বেঁধে নদীর জলে আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়-

> 'বাপের ধন হারাইলাম করি অবহেলা।
> সকল ধন হারাইলাম খেলাইয়া খেলা ॥
> কাইল খেলায় হারাইয়াছি ঘরের নারী।
> সেই খেলা অভাগিয়া পাসরিতে নারি ॥' –(পৃ-৪৬২-৪৬৩)

গান-বাজনা ও নৃত্য

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই গান-বাজনার কদর ছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান তথা উৎসব-পার্বণে নাচ-গানের আয়োজন থাকতো। বাঙালির লোকপ্রিয় গানের মধ্যে মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালী, বাউল, মরমী, পল্লীগীতি, ঝুমুর নাচ, ঘেটু যাত্রা, যাত্রাভিনয়, বিচার-গান, কীর্তন, কথকতা, গজল, হামদ-নাত, খেয়াল, কাওয়ালী ও বিভিন্ন রাগ-তাল উল্লেখযোগ্য। পূজা, ব্রত, বিয়ে ও বিভিন্ন জলসা উৎসবে পেশাদারী শিল্পী, বেশ্যা ও নর্তকীরা নাচ-গান পরিবেশন করতো। বাঙালির নৃত্য-গীতে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে– একতারা, দোতরা, সেতার, বীণা, বেণু, ডমরু, শঙ্খ, সানাই, সিঙ্গা, পিনাক, পাখোরাজ, দোহরা, মোহরা, ভেরী, মৃদঙ্গ, ঝাঁঝড়া, করতাল, তবলা, মুরলী, রবাব, বেহালা, ভেউল, কাঁসা, তাম্বুরা, কবিলাস, মন্দিরা, ভাঙ্গরি, ভুষঙ্গ, ঢাক, ঢোল, খঞ্জলি, ঘুন্টি ও ঘুঙুর বেশ জনপ্রিয় ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব বাদ্যযন্ত্রের সমন্বয়ে স্বর্গপুরীতে উষা-অনিরুদ্ধ এবং বেহুলা-ধনপতি নাচ-গান করেছে। আবার মনসার পূজায় রাখালগণও গান বাজনা ও নৃত্য-গীতের পরিবেশন হয়েছে–

ক. রাখালদের মনসা পূজায় গান-বাজনা

> 'ঘরখানি বেড়িয়া রাখালে খেলায়ে।
> জয়ে জয়ে বলিয়া সানন্দে গীত গায়ে ॥
> কেহ ঢাক ঢোল বাজায়ে মৃদঙ্গ ঘন ঘন।
> মধ্যে মধ্যে ঘণ্টা বাজায়ে বিচিত্র লিখন ॥' –(পৃ-১২৩)

খ. লখিন্দরের বর যাত্রায় বাজনা

> 'নানা শব্দে বাদ্য বাজে শুনিতে বড় রঙ্গ।
> দুইশত ঢাক চলে শতেক মৃদঙ্গ ॥
> কর্ণে কিছু নহে শোনে কেবল বাদ্যের রোল।' –(পৃ-৩৭০)

গ. বেহুলা-ধনপতির নৃত্য-গীত

‘বুঝিয়া শিবের মন বেউলার কৌতুক।
আরম্ভিল নৃত্যগীত শিবের সমুখ ॥
কোকিলের বর যেন বলে মধুর স্বরে।
মধুর স্বরে গায়ে গীত পায়ে নাটপুরে ॥
হাতে বাজায়ে বাদ্য বেউলা মুখে গায়ে গীত।
নানা বিধি গাহে গীত শুনি সুললিত ॥
মহাদেব বলে শোন নন্দী মহাকাল।
দেবতা হতে গীত মনিষ্যে গাহে ভাল ॥
আড় আঁখি চাহে বেউলা ঘন চালায়ে হাত।
নৃত্যে মোহিত হইল ত্রিলোকের নাথ ॥’ –(পৃ-৪৮১-৪৮২)

হাতিয়ার বা অস্ত্র

মধ্যযুগে বাংলায় সর্বদা যুদ্ধ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। যুদ্ধে জয়ী ও জীবন সুরক্ষায় তৎকালে বাঙালি সমাজে বণ্ডধরনের আয়ধু বা অস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এসব অস্ত্রের মধ্যে- তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম, কামান, বন্দুক, তরবারি, কিরিচ, ছোরা, চাকু, ভূষণ্ডী, পাশ, চক্র, টঙ্কার, খঞ্জর, বাণ, কুঠার ও লাঠি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধের পোশাক হিসেবে- লোহার জিরাই, কাবাই, পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্দ, ইজার, টুপি, মোজা, ঢাল ও বর্ম ব্যবহৃত হতো। যুদ্ধে চতুরঙ্গ বাহিনীর (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক) মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধের প্রচলন থাকলেও মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, চৈরথযুদ্ধ ও বাণযুদ্ধ হতো। আর রণবাদ্য হিসেবে- ঢাক-ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, দামামা, ভেউর ও বিউগলের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব হাতিয়ার, যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধ এবং কাজির সঙ্গে মনসার বিবাদ, মনসার গুয়াবাড়ি কাটা ও বেগুলার শরীর কেটে যজ্ঞ করার সময় এসব আয়ুধ বা অস্ত্রের ব্যবহার পাওয়া যায়-

ক. যুদ্ধাস্ত্র

‘ছেল মুদগর ঝাটী ধনুক কামান লাটী
ফৈজে ফৈজে দেখে অদভূত।
ধনুক টঙ্কার শুনি চমৎকার চক্রপাণি
কিসেরে সাজিল যমরায়ে। –(পৃ-২১৭)

খ. যুদ্ধ সাজ

‘চলে দূত বজ্রকাল তার কান্দে লোহার সাল
তাহারে দেখিতে বাসি ডর।
,,,
লোচাহারি নামখোড়া বিমুখতি দন্ত মোড়া
গলে সব দিয়া লোহার মালা ॥’ –(পৃ-২১৫)

গ. যুদ্ধ বাদ্য

‘সাজ সাজ করি শিঙ্গাতে দিল ফুক।
,,,
সাজন জয়ে ঢোল বাজে ঘন ঘন।
,,,
দুইশত ঢাক চলে শতেক মৃদঙ্গ।’ –(পৃ-৩৬৯-৩৭০)

ঘ. লাঠি

'শুনিয়া কুপীল চান্দো মনে নাহি শঙ্কা।
হেতালের বাড়ি দিয়া কাকাইল করে বেকা ॥' –(পৃ-৪৯৮)

রোগ বালাই

মধ্যযুগের বাঙালি সমাজে বেশ কিছু রোগের প্রকোপ ও প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান ছিল। এসব রোগের মধ্যে স্বর্দি, চোখের ছানি, অন্ধত্ব, বধিরত্ব, জ্বর, অতিসার, শূল, ব্যথা, কাশ, গলগণ্ড, কফ, খুজলি, পাচরা, দাউদ, বাত, পিত্ত, কলেরা, বাউসি (পাইলস), যক্ষা, গুটি বসন্ত, গোদ (Elephantiasis), কুষ্ঠ ও সিফিলিস বা উপদংশন ছিল উল্লেখযোগ্য। মনসামঙ্গল কাব্যেও এরূপ রোগ বালাইয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। বেগুলার বিয়েতে আসা আইয়দের পতিনিন্দার সময় এসব রোগের নাম পাওয়া যায়। এছাড়া মাছ শিকারি, কৈবর্ত, গোদার দুই পায়ে গোদ (Elephantiasis), রোগের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়। এ গোদ রোগের কারণেই তার নামও হয়েছে গোদা। এ গোদ রোগ ছাড়াও গোদা দাউদ চর্ম রোগেও আক্রান্ত ছিল। আর এ গোদ রোগ ছিল গোদার বংশগত। তার বাবা (অচল গোদা), দাদা (ডুমরিয়া গোদা), ভাই (চুঙ্গরিয়া গোদা), স্ত্রী ও সন্তানও এ রোগে আক্রান্ত ছিল-

'তাল গাছের গোড়া হেন গোদ দুই গোটা।
সর্ব্ব গায়ে দাউদ যেন সিমলির কাটা ॥

,,,

সাজারে পড়িলে গোদা তেজে অন্নপানি ॥
চটঘটী মাথায়ে দিয়া চিত্তর হইয়া থাকে।
অতিকম্প হইলে মাউগেরে মা ডাকে ॥
চৈত্র বৈশাখ মাস হইতে এবে-ভাল আছি।
তাহাতে পাকিলে গোদ ভেন ভেন করে মাছি ॥'

,,,

জে মোর ঘরের নারী সে বড় রসিক।
মোর গোদ হতে তাহার গোদ ডাঙ্গর খানিক ॥
জে আছে পুত্র মোর তাহার নাহি বোধ।
ঘরের বাহির না হয়ে তাহার চাইর গোটা গোদ ॥' –(পৃ-৪৫৬-৪৫৭)

মাছ ধরা

এ বাংলার অধিবাসীগণ প্রকৃত অর্থেই ছিল মাছে-ভাতে বাঙালি। এদেশের নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবায় বহু প্রজাতির মাছে পরিপূর্ণ হয়ে থাকতো। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে সাধারণ মানুষ পলো বাইচের মতো উৎসব করে খাল-বিলের মাছ ধরতো। জেলে-মালো-কৈবর্ত সম্প্রদায় ছাড়াও সাধারণ মানুষজন বিভিন্ন প্রকারের জাল– রাক্ষস জাল, বেড় জাল, রাক্ষস জাল, ঝাকি জাল, দোল্লাজাল, ঠেলা জাল, ভেসাল, ফালা, পলো, ওচা, চ্যাওড়া, পুনপুনি, জুতি, কোচ, বড়শি ও হাত দিয়ে মাছ ধরতো। শুধু পুরুষ নয় বাঙালি গ্রামের নারীরাও হাত দিয়ে হাতিয়ে মাছ ধরতে পারতো। আর এ মাছ রাখতো খালইতে। মনসামঙ্গল কাব্যেও মাছ ধরার এমন চিত্র পাওয়া যায়। ঝালু-মালু যমুনা নদীতে জাল দিয়ে এবং গোদা ছিপ বড়শি দিয়ে গাঙুর নদীতে পাঙ্গাস মাছ ধরেছে-

ক. বড়শি

'জাতে কৈবর্ত বেটা দিঘল মাথার চুল।
নিরবধি বড়শি বায়ে এই নদীর কুল ॥

,,,

এক মোণ লোহার বড়শি বড়োয়া বাঁশের ছিপ।
সোন দড়ি লাগাইয়া ঘন মারে টিপ ॥

,,,

বড়শি বাহিয়া দিব বড় পাঙ্গাস। –(পৃ-৪৫৫)

খ. জাল

'দুই পুত্রের তরে তখন করিয়া স্বপন।
ভাঙ্গা জাল লইয়া তখন করিল গমন ॥
জাল লইয়া তখন দুই ভাই চলে।
সুবর্ণের ঘট হইয়া পদ্মা নামে জলে ॥' –(পৃ-১৮৭)

,,,

জালু বলে মালু দাদা আসিতে পড়িল বাধা
আজুকার জালে ভাস্য নাই।
সাত খেও উঠা উঠি মৎস্য নাহি এক গুটী।
জাল লইয়া চলো ঘরে যাই ॥' –(পৃ-১৮৮)

গ. মাছ রাখার খালই

'ক্ষীর নদী সাগরে পড়িল সার ভাটা।
পদ্মাবতী বড়শি বায়ে খালই ধরে নেতা।' –(পৃ-৫০৬)

ফুল-ফল, লতা-গুল্ম ও গাছপালা

বাঙালি সমাজে পূজা-ব্রত, বিবাহ ও সামাজিক উৎসবে ফুলের ব্যবহার একান্ত জরুরি। তাছাড়া নারীদের প্রসাধনী-রূপচর্চায়, গোলাপ জল ও সুগন্ধি তেল ও সৌন্দর্য বিধানে ফুলের চাহিদা অপরিসীম। তাই বাঙালি নর-নারী, ঘর-বাড়ির আঙিনায়, মসজিদ-মন্দিরে, তীর্থ-বিদ্যাপীঠে, নগরে ও গ্রামে- চাপা, মালতী, যুথি, কেয়া, কেতকী, টগর, বকুল, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, জুই, পদ্ম, করবী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা, গাদা, বেলী, পলাশ, কদম, শেফালি, শিউলি, সূর্যমুখী ও কৃষ্ণচূড়ার মতো ফুলের বাগান তৈরি করে। মনসামঙ্গল কাব্যেও সরযূ নদীর তীরে চণ্ডীর নন্দনকাননে এমন সব ফুলের চিত্র পাওয়া যায়-

'চাপা নাগেশ্বর জাতী লবঙ্গ মালতী যুতী
কেওয়া কেতকী বক ফুল।
টগর মাধবী লতা অশোক অপরাজিতা
বান্দুলি তিল দ্রোবন বকুল ॥

,,,

শ্যামলতা শ্রীফল করবী পুষ্প কমল
ভূমিচাপা আর গন্ধরাজ।
কুসন্ত কুঞ্জ গুলাচি অতসী গেন্দা এলাচী
কৃষ্ণচূড়া পদ্মা গোলরাজ ॥' –(পৃ-১৬-১৭)

ফল-ফলাদি

এ বৃহৎ বাংলায় বিভিন্ন প্রজাতির ফল প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। এসব ফলের মধ্যে রয়েছে- আম, জাম, কাঁঠাল, পেঁপে, পেয়ারা, আতা, তরমুজ, বাঙ্গি, নারিকেল, সুপারি, কমলা, ডালিম, লেবু, বেল, জাম্বুরা, আমলকী, আমড়া, কামরাঙ্গা, জলপাই, করমজা, জামরুল, কুলবরই, তাল, খেজুর, তেঁতুল, আখ ও কলা প্রভৃতি।

মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগরের গুয়াবাড়িতে এরকম অনেক ফলের উল্লেখ পাওয়া যায়–

'নন্দনবাড়ী কাটি পদ্মা হরষিত মতি।
গুয়া নারিকেলের তবে কাটিলেন মাথি ॥
আম কাঁঠাল কাটিল নারেঙ্গ কালা।
দক্ষিণে কাটিল পদ্মা জলফাই পায়েলা ॥
পূর্ব্বে কাটিল দেবী শ্রীফল কমলা।
পশ্চিমে কাটিল যত ছিল রামফল ॥' –(পৃ-১৫২-১৫৩)

লতা-গুল্ম

বাঙালি সমাজে লতা-গুল্মের ভেতর- পান, পিপ্পলি, মরিচ, আদা, হরিদ্রা, মুলা, পেয়াজ, রসুন, ধনেপাতা, দেওলি, বান্দুলি, ঘৃতকুমারী, থানকুনি ও ঈশ্বরীর মূল (ভেষজ ঔষধি) প্রভৃতি। এসব লতা-গুল্ম জাতীয় গাছপালার উল্লেখ মনসামঙ্গল কাব্যে বিদ্যমান রয়েছে।

'শিয়রে আছে মোর ঔষধের ঝুলি।
দেওলি বান্দুলি আর ঈশ্বরের মুলি ॥' –(পৃ- ১৭৫)

জীব-জন্তু-পশু-পাখি

বাঙালি সমাজে জলে-স্থলে, বাড়ি ও বন জঙ্গলে বিচিত্র জীব-জন্তু ও পশু-পাখির আনাগোনা দেখা যায়। যেমন-

পশু বা প্রাণি

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, পাঠা, হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভালুক, শিয়াল, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ, বিড়াল, বেজি, ইদুর, কুকুর, খরগোস, উট, গাধা ও শূকর প্রভৃতি।

পাখি -

হাস, মুরগি, কোয়েল, তিতির, কোকিল, কাক, ময়ূর, শকুন, ঈগল, চিল, পেঁচা, ফেঁচা, ঘুঘু, কবুতর, ময়না, টিয়া, দোয়েল, শালিক, শামকল, পানকৌড়ি, বাবুই, চড়ুই, বক, কানকুয়া, ডাগুক, মাছরাঙ্গা ও গৃধিনী প্রভৃতি।

জলজ জীবজন্তু

শুশুক, কুমির, ঘড়িয়াল, হাঙ্গর, ভোদর, উদ, কাঁকড়া, শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক, জোঁক ও অন্যান্য প্রাণি।

কীটপতঙ্গ

টিকটিকি, মশা, মাছি, ডাশ, ছারপোকা, ভ্রমর, ফড়িং, প্রজাপতি, ঝিঁঝিপোকা, গোবরে পোকা, তেলাপোকা, বিচ্ছু, পিপড়া, মৌমাছি, মাজড়া পোকা ও সিন্দুরিয়া কীট প্রভৃতি।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এমন জীবজন্তু, পশু-পাখি ও কীট পতঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। শিব বাহনরূপে ষাঁড় ও বলদ ব্যবহার করেন, আবার লখিন্দরের বর যাত্রার সময় হাতি-ঘোড়া-উট-গাধা-মহিষ ব্যবহৃত হয়েছে এবং চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যের পথে শুশুক, জোকের সম্মুখীন হয়েছেন। অন্যদিকে মনসার চক্রান্তে চাঁদ ভেঞুর মৌমাছির দংশনের শিকার হয়েছেন। তাছাড়া পূজা ও যজ্ঞে গরু-ছাগল ও মহিষ বলিদান করা হয়েছে এবং বাণিজ্য পণ্য হিসেবে কবুতর, ছাগল দক্ষিণ পাটনে চাঁদ সঙ্গে করে নিয়েছেন-

ক. পশু

'সাতশত চলিয়াছে পর্ব্বতিয়া ঘোড়া।
তিনশত গর্দভ চলে লেজের আগে থোপ।

,,,

সফরিয়া বলদ বড় বড় পেট।
সাত হাজার কৃষ্ণ সাড় নয় হাজার উট ॥' -(পৃ-২৭৫)

খ. পাখি

'কবুতর বদলে সাড়াব ভাল দেখি।
চড়া (চড়ুই) বদলে লইল ময়না হেন পাখি ॥' -(পৃ-২৭৫)

গ. কীট-পতঙ্গ

'শিব পূজা করি চান্দো কাঁঠাল খাইতে চায়।
নাকে মুখে চৌক্ষে তারে ভিঙ্গুলে কামড়ায় ॥' -(পৃ-২৯১)

ঘ. জলজ প্রাণি

'লবাণাম্বু এড়াইয়া গেল জমদ্বিপ সাগর।
পর্ব্বত সমান জোক জলের ভিতর ॥

,,,

পর্ব্বত প্রমাণ সঙ্ক (শুশুক) গম্ভীর সাগর।
ডিঙ্গার শব্দ পাইয়া সঙ্ক উঠিল সত্বর ॥' -(পৃ-২৪৭-২৪৮)

সাপ

বাংলার আবহাওয়া, জলবায়ু ও নদ-নদী, খাল-বিল ও হাওর-বাওর, পাহাড়-পর্বত, বন, জঙ্গল অধিক পরিমাণে থাকায় এ দেশে বিচিত্র ধরনের সাপ দেখা যায়। বর্ষা অঞ্চলে সাপের প্রকোপ বেড়ে যায়। বেদে, সাপুড়ে ও ওঝা সম্প্রদায় সাপের খেলা ও বিষ নামাতে ঝাড়-ফুঁক করে থাকে। বাংলা অঞ্চলে যে সব সাপ বেশি দেখা যায়, তা হলো- ধোড়া, তক্ষক, অনন্ত, ধনঞ্জয়, ধন্বন্তরি, উদয়কাল, উদয়গিরি, পাণ্ডু, কর্কট, পদ্ম, মহাপদ্ম, গুহিয়া, শঙ্খ, গোখরা, দারাস, মৃগ নাগ, কালনাগ, অশ্বমুখ নাগ, বাঘমুখ নাগ, ভয়জিৎ, ভয়কাল, অগ্নিজাল, ভার্গব, সিংহ মুখ নাগ, কেউটিয়া, শাঁখিনী, মেঘকাল নাগ, চিতুয়া, সুমুখী, ঘুঙ্গুরিয়া, সিন্দুরিয়া, সোহাগ নাগিনী, অঙ্কুর নাগ, বিদ্যুৎ নাগ, দুমুখো সাপ, অষ্টনাগ, শঙ্কুর নাগ, করুবক নাগ, উনকোটী, ধামুনাগ, অগ্নিমুখ নাগ, সুতানলি সাপ, মুখরা ও প্রখরা নাগ প্রভৃতি।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এমন সাপের সাক্ষাত পাওয়া যায়। মনসার অনুগত হিসেবে এসব সাপ কাজি ও যমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং লখিন্দরকে মারতে মনসা এদের ওপরেই নির্ভর করেছেন-

'তাহারা চৌদ্দ জন আমার নাগ উনকোটী।
বিষে পুরিয়া তার না রাখিব এক গুটী ॥

,,,

আইরাজ নাগ আর মঞ্জরি।
সিংহমুখ নাগ আইল বরহি প্রচারি ॥
উরসা সাপিনী আইল পদ্মার বোনঝি।
শতযোজন মুখ খান ষাইট যোজন জি ॥
কলি পর্ব্বত হইতে আইল মহাকালী।' -(পৃ-২২০-২২২)

নদ-নদী

সমগ্র বাংলার বুকে জালের মতো জড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। নদীই বাংলার জন্য আশীর্বাদ বয়ে এনেছে। বাংলার নদ-নদীগুলোর মধ্যে– গঙ্গা, ভাগীরথী, সুরেশ্বরী, সরস্বতী, দামোদর, চন্দ্রভাগা, কালিন্দী, নর্মদা, গোদাবরী, বিপাশা, সরযূ, মন্দাকিনী, ইরাবতী, রেবা, পদ্মা, যমুনা, করতোয়া, মেঘনা, ব্রহ্মপুত্র, ভৈরব, গোমতী, তিস্তা, কপোতাক্ষ, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, কালিগঙ্গা, নবগঙ্গা, শ্বেত গঙ্গা, গড়াই, কর্ণফুলী, রূপসা, চিত্রা, ভালুকা, লৌহজং, কুমার, আত্রাই, মহানন্দা, ইছামতি প্রভৃতি। আর সমুদ্র বলতে বঙ্গোপসাগরকেই বোঝাতো। আবার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্বাস মতে, পবিত্র নদী হিসেবে কয়েকটি আজো পূজিত হয়ে আসছে।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এমন অনেক নদীর কথা উল্লেখ রয়েছে। সরযূ নদীর তীরেই চণ্ডীর নন্দনকানন, চাঁদ বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দক্ষিণ পাটন গমনকালে অনেক নদীর সাক্ষাত মেলে এবং বেহুলা শিবপুরীতে যেতে গাঙুরের জলে ভেলা ভাসায়-

নদী

'দেখিতে দেখিতে ডিঙ্গা এড়াইল গাঙ্গুরি ॥
ধবল নদী এড়াইয়া মাণিক্যপুরী যায়ে।

,,,

শ্বেত গঙ্গা এড়াইল নামে কর্ণফুলী।
নর্ম্মদা এড়াইল নামে গোদাবরী ॥
শ্বেত গঙ্গা এড়াই নামে মন্দাকিনী।

,,,

দেখিতে না দেখে ডিঙ্গা বায়ুগতি চলে।
শীঘ্রগতি গেল ডিঙ্গা সুর নদীর তীরে ॥' –(পৃ-২৪৪)

প্রকৃতির প্রভাব

বাঙালির জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবিকার ওপর প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বাংলার ষড় ঋতুর বৈচিত্র্য, নদ-নদীর আশীর্বাদ ও আগ্রাসন, খরা-দুর্ভিক্ষ, মেঘ-বৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বান ও বন্যার খেয়ালী মূর্তি বাঙালি নর-নারীর অন্তঃকরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মনসামঙ্গল কাব্যেও মেঘ, ঝড়-বৃষ্টি, ষড় ঋতুর বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। মনসা অসময়ে সমুদ্রে ঝড়-বৃষ্টি দিয়ে চাঁদের ১৪ ডিঙ্গা ডুবিয়ে দিয়েছেন এবং দুঃখের বারোমাস্যার মধ্য দিয়ে ষড় ঋতুর বৈচিত্র্য ও প্রভাব উন্মোচিত হয়েছে-

ক. মেঘ মালা

'পারুয়া মেঘ সকল মেঘের ঝরা।
এক দিকে বৃষ্টি করে আর দিক খরা ॥
হাড়িয়া মেঘ বলে বিজুলিয়া ভাই।
তোমরা যাইয়া মেঘ পাত আমি খাইয়া আই ॥' –(পৃ-২৮১)

খ. ঝড়বৃষ্টি

'হাড়িয়া মেঘে পড়ি ডাকে ঘন ঘন।
বিজলির ছটা দেখি কাপে ত্রিভুবন ॥

,,,

বিপরীত মেঘের ডাকে পবন চলিল বেগে
দুই প্রহরে হইল অন্ধকার।
দড় মুষ্টে ধর বৈঠা বিষম মেঘের ঘটা
শীতে তনু হইল কম্পমান।

,,,

ছিঁড়িল পাটের সরই ভাঙ্গিল নায়েব গলই
উড়াইল নায়েব যত চাল।' –(পৃ-২৮৩-২৮৪)

গ. ষড়ঋতুর প্রভাব

'এইত বৈশাখ মাসে সরস রাত দিবা।

,,,

এইত জ্যৈষ্ঠ মাসে কোকিলে গাছে সারি।

,,,

এইত আষাঢ় মাসে জগত হরষিত।

,,,

এইত শ্রাবণ মাসে মনসা পঞ্চমী।

,,,

ভাদ্র মাসেতে বেউলা বিষ ফুটী ফুটী।

,,,

আশ্বিন মাসেতে সবে পূজে দশভুজা।

,,,

কার্ত্তিক মাসেতে শুকায়ে কাদা পানি।

,,,

অগ্রহায়ণ মাসে পৃথিবী নবীন শস্য ধরে।

,,,

পৌষ মাসে বেউলা সোনাই না লয়ে ঘর ॥

,,,

মাঘ মাসেতে বেউলা উত্তর আলি বাও।

,,,

ফাগুন মাসেতে বেউলা দক্ষিণ আলি বাও।

,,,

চৈত্র মাসেতে বেউলা হারিয়া কোণের বাও।' –(পৃ-৪৯৭-৫০১)

বাক চাতুর্য ও রসালাপ

বাঙালির সকল শ্রেণির নারী-পুরুষ তাঁদের প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে বাক চাতুর্য ও রসালাপে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। জীবন অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান, আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে নব দম্পতি, বেহাই-বেহান, দাদা-নাতি, নানী-নাতিন, বন্ধু-বান্ধব, রাখাল-চাকর, দেবর-ভাবী বা ননদ-ভাবীর কথায় ও কুশল বিনিময়ের

মাধ্যমে রসবোধের পরিচয় মেলে। মনসামঙ্গল কাব্যেও বেহুলা লখিন্দরের বাসর ঘরের প্রেমালাপ, বেহুলার উদ্দেশ্যে গোদার প্রলোভনের বাণীতে এমন বাকচাতুর্যের উল্লেখ পাওয়া যায়-

লখিন্দর ও বেহুলার বাকচাতুর্য

লখিন্দর :

'আগরে চন্দনে বেউলা অঙ্গেতে ভূষিত।
তাহা দেখি লখিন্দরের কাম উপস্থিত ॥
শোন শোন আগ বেউলা সাহের কুমারী।
আলিঙ্গন দেও মোরে বানিয়া সুন্দরী ॥
সাহের কুমারী বেউলা রূপের সীমা নাই।
হস্তে ধরি বসাইল সুন্দর লখাই ॥' -(পৃ-৪১৭)

বেহুলা :

'নহে নহে প্রভু নহেও উচিত।
বিবাহের রাত্রে নারী হয়ে গৌরবিত ॥
প্রভু তুমি হও আপনে পণ্ডিত।
বিবাহের রাত্রে কেন বল বিপরীত ॥
বাড়ির কাছে বাপ ভাই বলিবে ডাকিয়া।
হেন ভাঙ্গরার ঠাই বেউলারে দিছে বিয়া ॥
অখণ্ড কলিকা প্রভু নহেত প্রকাশ।
বিকশিত কমলে ভ্রমরে করে আশ ॥
আধবার বৎসরে বেউলা তের নাহি পোরে।
শিশুমতি বেউলা সুরতি নাহি জানে ॥
অহে প্রভু সুজন কাণ্ডারী।
তোমার যতেক ধন আমি যে ভাণ্ডারী ॥
তপ্ত দুগ্ধ প্রভু খাওন না জাএ।
জুড়াইয়া খাইলে অধিক সাদ পাএ ॥
আজুকা থাকহ প্রভু চিত্তে ক্ষমা দিয়া।
পরসু ভুঞ্জিয় রতি পালঙ্কে বসিয়া ॥' -(পৃ-৪১৬-৪১৮)

সম্ভোগচিত্র

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম নর-নারী দাম্পত্য জীবনের সম্ভোগ প্রক্রিয়াটিও শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। দিন-ক্ষণ, তিথি-নক্ষত্র, ঋতুবতী অবস্থা, শারীরিক সংকট ও কিছু সংস্কার মেনেই দম্পতিগণ রতিলীলা সম্পন্ন করতো। রাতলীলার ক্ষেত্রে রুচিবান নর-নারী পরিবেশ ও প্রস্তুতির ওপর বিশেষ জোর দিতো। উত্তম খাবার, উপযোগী পোশাক, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার ও মুখশুদ্ধির বিষয়গুলো এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেতো।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এর পরিচয় মেলে। চাঁদ সওদাগর ও সনকার শারীরিক সম্পর্ক এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই সম্পন্ন হয়েছিল-

স্নান করিয়া সাধু করে দেবার্চ্চন।
সোনেকা সুন্দরী গিয়া চড়াইল রন্ধন ॥
ভোজন করিতে সাধু বৈসে ততক্ষণ।

একে একে দিল নিয়া পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
ভোজন করিয়া সাধু করে আচমন।
কর্পূর তাম্বুল খাইয়া করিল শয়ন ॥
ভেয (সেজে) করি সোনেকা সুন্দরী তথা গেল।
সাধুর সাক্ষাতে গিয়া উপস্থিত হইল ॥
সোনাইরে দেখিয়া সাধু হরিষ অন্তর ।
হস্তে ধরি বসাইল শয্যার উপর ॥ –(পৃ-২৩৬)

ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ

ধর্মই বাঙালির প্রাণ। কারণ প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি ধর্মের জন্যে বাঁচে, আবার ধর্মের জন্যে মরে। হিন্দু-মুসলিম উভয়ের জীবন-জীবিকা নিয়ন্ত্রণ করে তাদের নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থসমূহ। হিন্দুদের জন্য যেমন- রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, গীতা, উপনিষদ, পুরাণ ও সংহিতা, তেমনি মুসলমানদের জন্য রয়েছে কুরান ও হাদিস।

মনসামঙ্গল কাব্যেও এসব ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। লখিন্দরের বিয়ের আসরে এবং হাসন কাজির দরবারের এসব ধর্মীয় গ্রন্থের গুরুত্ব ও উপযোগিতার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে-

ক. বেদ

'মঙ্গল ঘট অরোপণ বেদ পড়ে ব্রাহ্মণ
বসিল লখাই কনক আসনে।' –(পৃ-৪১০)

খ. কুরান-কিতাব

'সমুখে তামার বদনা হাতে ছড়িখান।
কাগজের বস্তা হাতে কিতাব কোরান ॥' –(পৃ-১২৫)

দেশি শব্দ ও ভাষা বুলি

এক সময় বাঙালির ছিল গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, আথাল ভরা গরু আর বুক ভরা গান। এ ভাবপ্রবণ বাঙালির ভাষা ও বুলির মাধ্যমে প্রকাশ পেতো তার প্রাণের আকুতি-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বিলাস। প্রাত্যহিক জীবনের উচ্চারিত ভাষাবুলি এ শব্দমালাই ছিল বাঙালির চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার পরিচায়ক।

মনসামঙ্গল কাব্যেও বহু দেশি শব্দ ও ভাষাবুলির প্রয়োগ ঘটেছে। এসব শব্দ বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে সুন্দর ও সার্থকভাবে উন্মোচিত করেছে। এসব দেশি শব্দগুলো হলো-

ভাঙ্গড়া, বিচারিয়া (খোঁজা), দোসর (আপনজন), সাজি (ঝুড়ি), সালিয়ানা (সেয়ানা), লড়ি (লাঠি বা বাঁশ দণ্ড), ঘাত (জখম), ডোর (সুতা), পাছাড় (জড়িয়ে ধরা), গাও মোড়া (শরীর উত্তোলন), ব্যাজে (পরে), সাচা-মিছা, খিদা (ক্ষুধা), সোগা (নিতম্ব), খেদানো (তাড়ানো), দড়ি (রশি), ফেতা ফেতা (নাজেহাল), মৈলুম (মারা গেলুম), খিলানো (খাওয়ানো), ভাণ্ড (পাত্র), আমাঘরে (আমাদের), খেও (জাল নিক্ষেপ), বেচা (বিক্রি), লর (দৌড়), আখন (এখন), মুই (আমি/নিজে), সিজাইলুম, জিয়াইলুম, মাজুষ (ভেলা), চোকা (সুচালো), খোটা (ভর্ৎসনা, অপমান), ভাও (সুযোগ, কৌশল), বাইগন (বেগুন), ঝোর (জঙ্গল), টেকা (টাকা), ছোভা (উচ্ছিষ্ট/বাকল), ছায়নি (শুভদৃষ্টি), লেংটা (নগ্ন), সেয়ানা (চতুর), চোচা (বাকল), কুটুম্ব (আত্মীয়), খেনে (ক্ষণে), মাজা (কোমর), বেভার (উপহার), ডৈয়া (ফল বিশেষ), বরই (কুল), বুড়াইয়া (ডুবায়ে), আছুক (হঠাৎ), গছাইয়া (জামানত স্বরূপ), কাছার তলে (নিতম্বের কাপড়ে), ভেঙ্গুর/ভিঙ্গুল (ভীমরুল), কেলা (কলা), ইচা (চিংড়ি), চেঙ্গ (মাছ

বিশেষ), শাগ (শাক-সবজি), খাটাল (ঘরের মেঝে), বাজন (বাদ্যযন্ত্র), উনা (শূন্য), ভাণ্ড (পাত্র), আমাঘরে (আমাদের), খেও (জাল নিক্ষেপ), এড়িল (প্রবেশ করলো), অখন (এখন), ধান্দা (দৃষ্টিভ্রম), বেহানে (সকালে), ভাঙ্গিয়া (পাশ কাটিয়ে/প্রতারণা করে), ইকি (একি), ফাফর (অস্বস্থি), কুপিত (ক্রোধ), কাচারি (বাইরের ঘর), খাদ (ছোট পুকুর/ডোবা), ছালি (পুত্র), কলার বাগুরি, নাইয়া (স্নান), আছাড় (পদস্থলন), মেসত ভাই (মামাতো ভাই), টোয়া (দরজার কাঠ), ঢসমস (থরথর কাঁপন), রাঁড়ি (বিধবা), কাচুলি (বক্ষবন্ধনী), বিয়ানি (হাতপাখা), বাসাত (বাতাস), কোয়র (পুত্র), রা/রাও (শব্দ/সাড়া), পাসরিব (ঘুচাবো, দূর করব), নিরাহার (অভুক্ত থেকে), ডাঙ্গর (বড়), আথালি-পাথালি (এলোমেলো), সিজান (সিদ্ধ), মাউগ/মাগ (স্ত্রী), কানিয়া আঙ্গুল (ছোট/কনিষ্ঠ), কোঁতে (নাজেহাল), হরপি (ঝুড়ি), খাবলা (কামড়), পাখালা (ধোয়া), খাড় (সাবান বিশেষ) বহিন ঝি (বোনের মেয়ে), বাও (বাতাস), কুইয়া (নরম), জালে (জা), পাজাল (খরকুটার স্তুপ) প্রভৃতি।

ক. ‘পাটনে আসিয়া যদি থাকে সদাগর।
নায়ে নায়ে আর রাখ ঝোরের ভিতর ॥’ –(পৃ-২৫৪)

খ. ‘এতেক কহিলা পদ্মা গঙ্গা দেবীর তরে।
আছুক মনুষের কার্য্য জীবজন্তু মরে ॥’ –(পৃ-২৮১)

গ. ‘যে মোর ঘরের নারী সে বড় রসিক।
মোর গোদ হতে তাহার গোদ ডাঙ্গর খানিক ॥ –(পৃ-৪৫৭)

ঘ. ফাগুন মাসেতে বেউলা উত্তর আলি বাও।
দেশেতে যাইতে চান্দো ডিঙ্গা করে ভাও ॥ –(পৃ-৫০০)

বিদেশি শব্দ

সমকালী রাজনীতি ও ধর্মীয় প্রভাবে বাঙালি সমাজে দেশি শব্দের সঙ্গে বহু বিদেশি (আরবি, ফারসি, তুর্কি), শব্দের মিশ্রণ ঘটে যায় অনিবার্য ভাবে। কারণ রাজ ক্ষমতায় মুসলমানগণ থাকায় এদেশের প্রশাসন, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আরবি-ফারসি ও তুর্কি শব্দের প্রবেশ ঘটে দুর্বার তথা অপ্রতিরোধ্য গতিতে। তবে বিদেশি এ শব্দসমূহকে বাঙালি অবজ্ঞার চোখে না দেখে, দূরে সরিয়ে না রেখে বরং আপন করে নিয়েছে। কালক্রমে এ শব্দগুলো হয়ে ওঠেছে বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব সম্পদ।

এ শব্দ গুলো হচ্ছে- আসমান, ইজার, মুছাপের (মুসাফির), কিতাব, কোরান, বদনা, পেরন (জামা), গোস্ত, চাকর, বেসাতি (পণ্য), সওদাগর, বিবি, বান্দি (বাদী/কাজের মেয়ে), ফৌজ, ওজির, নাজির, চৌকিদার, শমন (নোটিশ), কোতোয়াল, কাজি, নফর, ইনাম, সফর, তরকারি, কালি, শেখ, সৈয়দ প্রভৃতি।

‘তকাই নামে মোল্লা বেটা কাজির সাক্ষাতে।
ইজার পৈরনে তার কালা তক্যা মাথে ॥

,,,

সমুখে তামার বদনা হাতে ছড়িখান।
কাগজের বস্তা হাতে কিতাব কোরান ॥

,,,

শেক সাইদ চলে বড় বড় পাঠান।
সাচান সিচান চলে কাজির জোগান ॥’ –(পৃ-১২২-১২৭)

প্রবাদ-প্রবচন-বাগধারা

প্রবাদ-প্রবচন হচ্ছে বাঙালি নর-নারীর কথা বলার ভূষণ। জীবনের নানা অভিজ্ঞতাজাত এসব প্রবাদ-প্রবচন হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, আবহাওয়া, জলবায়ু, কৃষি ও লোকাচারসমূহ। বাঙালি নর-নারী তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে, ভাব-ভঙ্গিতে, চেতনে-অবচেতনে ও হাসি-কান্নায় প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করে থাকে। মনসামঙ্গল কাব্যেও প্রবাদ-প্রবচনের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এ কাব্যের প্রায় সকল নর-নারীর মুখে এসব প্রবাদ-প্রবচন বাণীমূর্তি লাভ করেছে-

১. ‘যাহার নমক খাই তাহার কর্ম করি।
তোমার কোপে ভয় নাই যমের কোপে মরি ॥’ –(পৃ-২০৭)

২. ‘স্ত্রী হইয়া তোমার কত বা বড়াই।
শৃগাল হইয়া কেন সিংহের লড়াই ॥’ –(পৃ-২১৯)

৩. কামারের কাছে যাও মোর যুক্তি আসে।
যেই মুখে কন্টক বৈসে সেই মুখে খসে ॥’ –(পৃ-৩৫৩)

৪. ‘তারাপতি বলে শোন জগৎ গৌরী আই।
তুমি মার চান্দে মারুক মোর এড়ান নাই ॥’ –(পৃ-৩৫৭)

৫. ‘পণ্ডিতের বুদ্ধি টোটে আপদ সময়ে।
তারাপতি যত কহে চান্দের মনে লয়ে ॥’ –(পৃ-৩৫৮)

৬. ‘তুমি ছার শিয়াল বেটা সিংহ সনে কর ছটা
আমারে রাখিতে আইলা পাজি।’ –(পৃ-৩৭৫)

৭. ‘চান্দো হতে সাহে বানিয়া ধনে নাহি টোটে।
পিপীলিকার ফৈজ যেন সাহের কটক উঠে ॥’ –(পৃ-৩৭৮)

৮. ‘অশুভ নিকটে আইলে নানা দৈব লাগে।
পদ্মার দৃষ্টে লখিন্দরের মাথা ছত্রয়ে ভাগে ॥’ –(পৃ-৩৯৪)

৯. ‘বিধাতা পাষণ্ড হইলে কার্য্যে নাহি ভাস্য।
বিহার রাত্রে স্বামী মরে লোকে করে উপহাস্য ॥’ –(পৃ-৪৩৯)

১০. ‘সাত পাঁচ ভাবে কন্যা স্থির করে মন।
জল মধ্যে ডুব দিয়া চলিল তখন ॥’ –(পৃ-৪৭০)

এ মনসামঙ্গল কাব্যের প্রশংসা করে ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর ‘প্রাচীনকাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন’ গ্রন্থে বলেছেন- ‘অজস্র মঙ্গলকাব্যের এবং তার মূখ্য তিনটি ধারার মধ্যে মনসামঙ্গলই কাব্যমূল্যে শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস বিচার থেকে কাব্য সৌন্দর্য আলোচনার প্রশ্নে এই ধারাকেই তাই প্রাধান্য দিতে হবে; কী আখ্যান-নির্মাণে, কী চিত্র চিত্রণে মনসামঙ্গলের কিছু কাজ যুগোত্তীর্ণ এবং ধর্ম প্রভাব নিরপেক্ষভাবেই আস্বাদ্য। ,,, এদিক দিয়ে মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে মনসামঙ্গল তুলনাহীন। মনসামঙ্গলই একমাত্র কাব্য যার অন্তর বাহির ব্যাপ্তি করে একটা তীব্র সংগ্রাম আদ্যন্ত প্রসারিত। যে সংগ্রাম কেবল ঘটনাগত দ্বন্দ্ব বা রাজায় রাজায় যুদ্ধের পর্যায়ভুক্ত নয়, ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের, নীতির সঙ্গে শক্তির, বলা যেতে পারে মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে যুগসঞ্চিত অন্ধভক্তির। এই দ্বন্দ্ব বীজে কাহিনীর প্রাণ, এরই আকর্ষণে ঘটনার মালা কেন্দ্রবিদ্ধ, আর প্রতিটি খণ্ডই অখণ্ডের দিকে প্রসারিত ও গভীর তাৎপর্যবহ। এমন একটি কেন্দ্রীয় দ্বন্দ্বের কল্পনা সেকালে কবিদের শিল্পবোধে ধরা পড়েছে দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

তথ্য-নির্দেশ

১.	অরবিন্দ পোদ্দার	:	মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ ১৯৯৯, পৃ- ৪৯
২.	পূর্বোক্ত	:	পৃ-৫১
৩.	জয়া সেনগুপ্তা	:	মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী; বড়াল প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯০, পৃ- ১
৪.	গোপাল হালদার	:	বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড); মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ-৩৮
৫.	জয়া সেনগুপ্তা	:	পূর্বোক্ত; পৃ-২
৬.	দীনেশচন্দ্র সেন	:	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খণ্ড); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ-১০৯-১১০
৭.	বাসুদেব রায়	:	মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ; পাঠক বন্ধু লাইব্রেরী, ঢাকা-২০০৪, পৃ- ১-২
৮.	মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া	:	শ্রীরায় বিনোদঃ কবি ও কাব্য; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ-৬
৯.	আহমদ শরীফ	:	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড); বর্ণ মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮; পৃ- ২৯
১০.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং লি., কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ- ২৪৭
১১.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ-২
১২.	ভূদেব চৌধুরী	:	বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ-১৮৭
১৩.	জয়া সেনগুপ্তা	:	পূর্বোক্ত; ভূমিকা (শুভেচ্ছাবাণী)
১৪.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; পৃ- ১৪
১৫.	চিত্তরঞ্জন মাইতি	:	বাংলা কাব্য প্রবাহ; ডি.মেহরা রূপা এণ্ড কোং, কলকাতা, ১৯৬৪, পৃ-৯৫
১৬.	ব্রজেন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য	:	জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম; হাউস অব বকুস, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ-৪-৫
১৭.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; পূর্বোক্ত, পৃ-১১৭
১৮.	পূর্বোক্ত	:	পৃ-৪৪
১৯.	Srinivas	:	Religion and Society Among the coorgs of south India (oxford, 1952), P. 70-710.
২০.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৪৮-৪৯
২১.	R.C. Hazra	:	The Brihad dharma purana, A thirteenth Century work of-Bengala; vol. VI (1955) p. 258
২২.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ১৩৮-১৩৯
২৩.	বাসুদেব রায়	:	চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ; উৎস প্রকাশন, ঢাকা-২০০৫, পৃ- ২২

২৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ- ১৪০
২৫. বাসুদেব ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ- ২৩-২৪
২৬. দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খণ্ড); পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ- ২৯৩
২৭. পূর্বোক্ত : পৃ- ৩০৬
২৮. আহমদ শরীফ : বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড); নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা,২০০৩, পৃ- ২৮
২৯. আহমদ শরীফ : বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ- ৩-৪
৩০. পূর্বোক্ত : পৃ- ১৮০
৩১. পূর্বোক্ত : পৃ- ৩-৪
৩২. ভীষ্মদেব চৌধুরী : বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য; নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪, পৃ- ১৯৪
৩৩. গোপাল হালদার : পূর্বোক্ত; পৃ- ১০১-১০২
৩৪. পূর্বোক্ত : পৃ- ১০২
৩৫. বৃন্দাবন দাস : চৈতন্য ভাগবত, হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা, মুর্শিদাবাদ, ১৩২০, পৃ- ৩৬
৩৬. শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (১ম খণ্ড); ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা, ১৯৬৭, পৃ- ১৯৬
৩৭. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড); আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা, ১৯৯৫, পৃ- ১৯৬
৩৮. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ- ২৬৮
৩৯. সুকুমার সেন : পূর্বোক্ত; পৃ- ২২৯
৪০. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ- ২৫০
৪১. পূর্বোক্ত : পৃ- ২৫১
৪২. সুকুমার সেন : পূর্বোক্ত; পৃ-২২৬
৪৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ-২৭৯
৪৪. সুকুমার সেন : পূর্বোক্ত; পৃ-২২৮
৪৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ-২৮০-২৮১
৪৬. মোহাম্মদ হাননান : বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০১, পৃ- ১৩৩
৪৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাইশ কবির মনসা মঙ্গল বা বাইশা; ভূমিকা পৃ- ৯০
৪৮. বাসদেব রায় : মনসামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ; পূর্বোক্ত; পৃ-১৪
৪৯. আবদুল মান্নান সৈয়দ (সম্পা.) : জীবনানন্দের কবিতা সমগ্র; অবসর, ঢাকা,১৯৯৪, পৃ- ২০
৫০. ক্ষেত্র গুপ্ত : প্রাচীন কাব্য সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন; জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা-২০০০, পৃ- ১১২
৫১. বাসুদেব রায় : পূর্বোক্ত; পৃ- ১৪
৫২. বিষ্ণুপদ পাণ্ডা (সম্পা.) : উড়িষ্যার সাধক কবি দ্বারিকা দাসের মনসামঙ্গল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯, অসিতকুমার বন্দ্যো. লিখিত প্রাক কথন; পৃ- ৩

৫৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ- ২৮৮

৫৪. সাঈদ-উর-রহমান : সামন্তযুগে বাঙালী সংস্কৃতি: কয়েকটি প্রসঙ্গ; মৌলিক প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০১, পৃ- ৮৩

৫৫. বাসুদেব রায় : পূর্বোক্ত; পৃ- ১৬-১৭

৫৬. দীনেশচন্দ্র সেন : পূর্বোক্ত; পৃ- ১৯২

৫৭. পূর্বোক্ত : পৃ- ২৬৯

৫৮. আহমদ শরীফ : পূর্বোক্ত; পৃ- ২৬৯

৫৯. দীনেশচন্দ্র সেন : পূর্বোক্ত; পৃ- ২৬৯

৬০. পূর্বোক্ত : পৃ- ১৯৩

৬১. আহমদ শরীফ : পূর্বোক্ত; পৃ- ২৭০

৬২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; মর্ডাণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ- ৫৬

৬৩. দীনেশচন্দ্র সেন : পূর্বোক্ত; পৃ-১৯৬-১৯৭

৬৪. জয়ন্তকুমার দাসগুপ্ত : বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ (সম্পা.), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬২, ভূমিকা, পৃ- ৮।।০

৬৫. পূর্বোক্ত : ভূমিকা পৃ- ৩।।০

৬৬. জয়া সেনগুপ্তা : পূর্বোক্ত; পৃ-২৪

৬৭. K.R Qanungo : History of Bengal; Vol- II (Second impression) July-1972, p-62

৬৮. গোপাল হালদার : পূর্বোক্ত; পৃ-৪১-৪২

৬৯. T.B. Bottomore : Sociology, A guide to problems and literature; Fist published in 1962. p-111-112

৭০. রামচরণ শর্মা : ভারতের সামন্ততন্ত্র; কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ-২২৪

৭১. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৫৯, পৃ-৯৭

৭২. A.B.M. Habibulllah : History of Bengal, (vol-ii) Dhaka university, p.-100

৭৩. নীহাররঞ্জন রায় : পূর্বোক্ত; পৃ-৯১

৭৪. পূর্বোক্ত : পৃ-৯১-৯২

৭৫. অতুল সুর : বাঙলা ও বাঙালির বিবর্তন; সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ-৩৭

৭৬. জয়া সেনগুপ্তা : পূর্বোক্ত; পৃ-১২৭

৭৭. বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য (সংকলিত) : বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ-১২০

৭৮. জয়া সেনগুপ্তা : পূর্বোক্ত; পৃ-১২৭

৭৯. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ-১৯২

৮০. আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহে : আলবেরুনীর ভারততত্ত্ব; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ-৪৩৭

৮১. নীহাররঞ্জন রায় : পূর্বোক্ত; পৃ-১৭৩

৮২. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ-১৯৫

৮৩. D.D. Kosambi : Culture and civilization, p.100

৮৪. জয়া সেনগুপ্তা : পূর্বোক্ত; পৃ-৩৮

৮৫. নারায়ণ ভট্টাচার্য : অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৭০,পৃ-৬

৮৬. গৌতম ভদ্র : মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ; সুবর্ণরেখা, কলকাতা, ১৯৮৩,পৃ-৪৩

৮৭. পূর্বোক্ত : পৃ-৪০

৮৮. Karl Marx : Capital (Vol-iii), progress publishers, Moscow, 1971,p.593

৮৯. Irfan Habib : Usury in Medieval India; (Vol-Vii) 1964-65, p.393-419

৯০. নীহাররঞ্জন রায় : পূর্বোক্ত; পৃ-৯২

৯১. পূর্বোক্ত : পৃ-১৬০-১৬১

৯২. যতীন সরকার : বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য; ইউ.পি,এল ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ-১৬১

৯৩. S.A Dange : India form primitive communism to slavery; New Delhi, 1972, P-XI-XII

৯৪. মোহাম্মদ হাননান : পূর্বোক্ত; পৃ- ১৭৪-১৭৫

৯৫. S.A Dange : Ibid; P. xii-xiv

৯৬. সিমোন দ্য বোভোয়ার : দি সেকেন্ড সেক্স (ফরাসি গ্রন্থের অনুবাদ), ১৯৪৯;পৃ-২৯৫

৯৭. রামশরণ শর্মা : পূর্বোক্ত; পৃ-৫৫-৫৮

৯৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সঞ্চয়িতা;বিশ্বভারতী, কলিকাতা, পৃ-৬৩১

৯৯. কাজী নজরুল ইসলাম : নজরুলের কবিতা সমগ্র; নজরুল ইন্সটিটিউট, ঢাকা-২০০১,পৃ-২৭৫

১০০. জয়া সেনগুপ্তা : পূর্বোক্ত; পৃ-২৫৮

১০১. দীনেশচন্দ্র সেন : বাঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খণ্ড); পৃ-১৮৫-১৮৮

১০২. রামগতি ন্যায়রত্ন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব; প্রথম সংস্করণ, পৃ-১১৮।

১০৩. অরবিন্দ পোদ্দার : পূর্বোক্ত; পৃ-৪১

১০৪. আহমদ শরীফ : পূর্বোক্ত; পৃ-১১

১০৫. Clyde Kluchom : The policy sciences; Stanford university press, 1961, p-86

১০৬. William Graham Sumner: (Quoted by Broom and Selznick), Sociology; A Tex with Adapted Readings.

১০৭. Ibid

১০৮. আহমদ শরীফ : পূর্বোক্ত; পৃ-১১-১২

১০৯. অতুল সুর : পূর্বোক্ত; পৃ-৮৫-৮৭

চতুর্থ অধ্যায়
মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট

চণ্ডী দেবীর পরিচয়

বাংলাদেশের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের আচার-আচরণ যদিও বাহ্যত উত্তর ভারতীয় কিন্তু বাঙালীর চেতনার গভীরে রয়েছে অস্ট্রিক-মোঙ্গলের সাংখ্যের, যোগের ও তন্ত্রের প্রভাব। তাই তার ধর্মীয় তথা শাস্ত্রীয় ও আধ্যাত্মিক ভাব-ভাবনা সর্বভারতীয় আদর্শে বিকাশ-বিবর্তন পায়নি, স্বতন্ত্র পথে হয়েছে বিবর্তিত। এক দিকে যেমন কায়াসাধন প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনি পার্থিব জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার লক্ষ্যে অরি ও মিত্র দেবতার তোয়াজ-স্তুতিই হয়েছে মুখ্য। এটি অবশ্য বাঙালীর ঐতিহ্য ও জীবন প্রীতিরই প্রমাণ। তাই অস্ট্রিক- মোঙ্গল বাঙালী অনেক দেবতা সৃষ্টি করেছে ঐহিক জীবনের প্রয়োজনে। মনসা, চণ্ডী, বাসুলী, ধর্ম, যক্ষ, শীতলা, ওলা, শনি, পীর-নারায়ণ, সত্য প্রভৃতি অনেক দেবতা-অপদেবতা ও উপদেবতার তোয়াজ-স্তুতি করেই আত্ম প্রত্যয়হীন বাঙালী সংসার সমুদ্রে জীবনের ভেলা ভাসিয়ে রাখে।[১]

বাংলার লৌকিক শক্তি দেবতাদিগের মধ্যে চণ্ডীর প্রকৃতিই সর্বপেক্ষা জটিল। এর কারণ, বিভিন্ন সময়ে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থা হতে অনেক সময় পরস্পর স্বতন্ত্র প্রকৃতির যে সকল স্ত্রী দেবতার পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তাই কালক্রমে এক সাধারণ চণ্ডী নামের মধ্যে এসে স্থান লাভ করেছে। পুরাণের মধ্যেও দেখা যার, সকল শক্তি দেবতাই কালক্রমে শিবের একমাত্র পত্নীরূপে পরিণতি লাভ করলেও এদের উদ্ভবের ইতিহাস পরস্পর স্বতন্ত্রই ছিল। বহ্মবৈবর্তপুরাণে (প্রকৃতি খণ্ড, ৫৭ অধ্যায়) শক্তি দেবতাদের এই বিভিন্ন নামগুলি পাওয়া যায়। যেমন - দুর্গা, নারায়ণী, ঈশানী, বিষ্ণুমায়া, শিবা, সতী, সত্যা, ভগবতী, সর্বানী, সর্বমঙ্গলা, অম্বিকা, বৈষ্ণবী, গৌরী, পার্বতী ও সনাতনী।[২] এ সকল শক্তি দেবতারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে-

'The critical eye will see that they are not merely names, but indicate different goddesses who owed their conception to different historical conditions but who were a afterwards identified with the one goddess by the usual mental habit of the Hindus.'[৩]

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এ বিভিন্ন প্রকৃতির লৌকিক চণ্ডীর পূজা হয়ে থাকে। যেমন- নাটাইচণ্ডী, ঘোরচণ্ডী, উড়নচণ্ডী, কুলুইচণ্ডী, শুভচণ্ডী, রখাইচণ্ডী, উদ্ধারচণ্ডী, রণচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, বসনচণ্ডী, কলাইচণ্ডী, কানাইচণ্ডী, ঢেলাইচণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি।

চণ্ডীকে 'মঙ্গল' বলার কারণ এই যে, চণ্ডী ভীষণা প্রকৃতির (malignant) দেবী, তার নিকট থেকে অমঙ্গলের আশঙ্কাই বেশি। এ জন্য তাঁকে প্রসন্ন বা খুশি রাখার উদ্দেশ্যে কিংবা তাঁর অপ্রিয় নামটি এড়াবার জন্যই সম্পূর্ণ একটি বিপরীতার্থক শব্দ তাঁর নামের সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে। এ প্রক্রিয়াকে ইংরেজিতে 'euphemism' বলে। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে শীতলা বলে উল্লেখ করার এটিই কারণ। বস্তুত লৌকিক স্ত্রী দেবতাসমূহ এক চণ্ডী নামের অন্তর্ভুক্ত হলেও এদের প্রকৃতি যে পরস্পর স্বতন্ত্র এবং বিভিন্ন জনশ্রুতি ও ঐতিহাসিক পটভূমিকা হতে যে এদের উদ্ভব ঘটেছে, তা সহজেই অনুমনেয়।

মহাদেব বা শিবের স্ত্রী মর্যাদায় চণ্ডীর পরিচিতি ব্যাপক হলেও বৈদিক সংহিতায়, রামায়ণ, মহাভারতে কিংবা প্রাচীন কোন পুরাণেও চণ্ডীর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং অর্বাচীন কয়েকটি সংস্কৃত উপপুরাণে যথা- ব্রাহ্মবৈবর্তপুরাণ, দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থে চণ্ডীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়।

এ থেকে মনে হয়, আর্যতের কোন সমাজ থেকে এ নামটি কালক্রমে পূর্ব ভারতীয় পৌরাণিক সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।[৪]

চণ্ডী শব্দটি অর্বাচীন সংস্কৃত অর্থাৎ কোন অনার্য ভাষা হতে পরবর্তীকালে সংস্কৃত শব্দকোষে স্থান লাভ করেছে। চণ্ডী শব্দটি সম্ভবত অস্ট্রিক কিংবা দ্রাবিড় ভাষা হতে আগত। দ্রাবিড় ভাষা-ভাষী দৃশ্যত আদি অস্ত্রাল (Proto-Australoid) জাতীয় ছোট নাগপুরের অধিবাসী ওরাওঁ নামক উপজাতির মধ্যে 'চাণ্ডী' নামে এক শক্তিদেবীর পরিচয় পাওয়া যায়। পশু শিকারে সাফল্য ও যুদ্ধ জয়ের দেবী হিসেবে এ চাণ্ডী দেবীকে ওরাওঁ যুবকেরা পূজা করে থাকে। ওরাওঁ সমাজে মাঘী পূর্ণিমার দিনে এর বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ছাগল বলির মাংস, ধেনো মদ ও নৃত্য-গীতের মাধ্যমে এ দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়।[৫]

এছাড়া ব্যাধ, নিষাদ ও অন্যান্য শিকারী-মৃগয়াজীবী সম্প্রদায়ও এ চাণ্ডী দেবীর পূজা করে থাকে মূলত শিকারের সাফল্য কামনা করেই। কারণ তাদের বিশ্বাস মতে, চাণ্ডী পশুকুলকে রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ। দেবীকে খুশি রেখেই, তার অনুগ্রহেই কেবল শিকার মেলা সম্ভব। তাই এ দেবীর স্বভাব বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

'Some of the spirits, how ever, suchas Chiandi, the goddess of hunting and war, are remarkable for shape-shifting which is indeed a characteristic of the spirits and deities of the Oroan pantheon.'[৬]

এ চণ্ডী দেবীই যে বনের পশু-পাখির অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন, তা মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে প্রমাণ মেলে।

আবার মধ্যযুগের বাংলায়, বিশেষত রাঢ় সমাজে বাসুলী দেবীর বিশেষ প্রভাব বর্তমান ছিল। প্রাক চৈতন্যযুগের অনন্ত বড়ু, চণ্ডীদাস এ বাসুলীরই সেবক ছিলেন এবং তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' গ্রন্থে বার বার উল্লেখ করেছেন। কোন কোন তন্ত্রে বাসুলীকে মহাবিদ্যাসমূহের অন্যতম বলে বিবেচনা করা হয়। বস্তুত মনে হয়, বাসুলী লৌকিক গ্রাম্যদেবতা; পরবর্তীকালে এর উপর পৌরাণিক প্রভাববশত হিন্দু ও বৌদ্ধরা তাঁকে পূজা করে থাকে।

প্রাচীন অনার্য নারী দেবতা চণ্ডী। ইনি শক্তিরূপিণী শতাধিক নামে চণ্ডী অনার্য সমাজে পূজিতা হতেন। ক্রমে আর্য সমাজে তিনি শিব বা হর গৃহিণীরূপে শিবানী, উমা, গৌরী, তারা প্রভৃতি নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পৌরাণিক যুগে এঁর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অসামান্যরূপে বেড়ে যায়। দশপ্রকার শক্তির আধাররূপে তার দশম মহাবিদ্যার দশ মূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে, যথা- কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। শিব–শিবানী অর্থে চণ্ড-চণ্ডী নামের মধ্যেই তাঁদেরকে প্রচণ্ড শক্তির আধার রূপে স্বীকার করা হয়েছে। এক সময় ব্রাহ্মণ্য দর্শনে শিব আশুতোষ ও ভোলানাথ নামে যোগী-তপস্বী হিসেবে নির্গুণ শক্তি স্বয়ম্ভূরূপে বিশেষ প্রতিষ্ঠা পান। আর চণ্ডী কালো বলে কালিকা, কালী বা শ্যামা নামে শক্তি দেবতা রূপে পূজিতা হতে থাকেন।

স্বম্ভবত, বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবে তাঁর উগ্র -রৌদ্ররূপ ক্রমশ কোমল, কমনীয় ও করুণাময়ী রূপে পরিণত হয়। তখন তিনি অন্নপূর্ণা, কমলা ও দুর্গারূপে বাঙালাদেশে পূজিতা হতে থাকেন। দুর্গারূপে দশ দিক রক্ষার প্রতীক দশ প্রহরণধারিণী হিসেবে তাঁর দশভুজা মূর্তি পরিকল্পিত হয়। দুর্গারূপে তিনি শ্যামা বা চণ্ডী নন বরং গৌরী বা উমা। অনার্য প্রভাবে এককালে তিনি অনার্য দেবতা- বিষ্ণু, শিব ও চণ্ডী (কালী) সর্বভারতিক দেবতারূপে পূজিত হন। ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৭]

চণ্ডী এমনি এক আদি সৃষ্টি শক্তিদেবতা। কোল, মুণ্ডা, ওরাওঁ সমাজে ইনি চণ্ডী, প্রচণ্ড শক্তি পূজাধিকারী এ নারীর স্বামীর নামও চণ্ড। নামগুলো যেমন অনার্য, তেমনি দেবকল্পনাও স্থূল। চণ্ডীর গায়ের রঙ শ্যামলা। উভয়েই দৈত্য দানব হন্তা, প্রলয়ঙ্করী ভয়ঙ্কর শক্তির আধার। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় এ রক্ত খেকো দানবদলনী

নৃমুণ্ডুমালিনী দেবী দশমহাবিদ্যার রূপ লাভ করেন। বাঙালীর মন- মনন ও রুচির উৎকর্ষের অনুপাতে রক্তখেকো এ চণ্ডীর রূপ-গুণের রূপান্তর ঘটেছে। এক সময় তিনি সৃষ্টির উৎস পরমাকৃতি আদ্যাশক্তি রূপে মহিমান্বিতা হন। ,,, বৌদ্ধ বজ্রতারার, নীলতারার, শ্যামতারার প্রভাবে তাঁর নাম হয় তারা। সন্তান বৎসলা বলে অথবা বিশালাক্ষী বলে অথবা বাগীশ্বরী রূপে তাঁকে বাসুলীর সঙ্গেও অভিন্ন কল্পনা করা হয়। দুর্গারূপে শরৎকালে পূজিতা হন বলে তাঁর আরেক নাম সারদা। এভাবে চৌদ্দ শতক থেকে বাঙলাদেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। আবার বৈষ্ণব প্রভাবে রক্তখেকো কালীই আবার ভক্ত বৎসলা জগজ্জননীরূপে প্রতিষ্ঠা পান বাংলাদেশে সতেরো আঠারো শতকে। এভাবে চণ্ডী মাহাত্ম্যজ্ঞাপককে– চণ্ডীমঙ্গল, গৌরীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপককে– গৌরীমঙ্গল, সারদার মাহাত্ম্যজ্ঞাপককে– সারদামঙ্গল, কালির মাহাত্ম্যজ্ঞাপককে– কালিকামঙ্গল এবং অন্নদার মাহাত্ম্যজ্ঞাপককে– অন্নদামঙ্গল বলা হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, যেহেতু মঙ্গল পাঁচালীর লৌকিক দেবতারা ঐহিক জীবনের লাভ-ক্ষতির দেবতা, সেহেতু এখানে দেবতায় ও মানুষে গুণগত কোন পার্থক্য নেই। সবাই এখানে প্রকৃতি পরবশ। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলার ও বাঙালীর ধর্ম জীবনের ইতিহাস হচ্ছে; এই পার্থিব জীবনে সুখ ও নিরাপত্তাকামী আত্মপ্রত্যয়হীন দুর্বল মানুষের অরি ও মিত্র, উপ ও অপ-দেবতা সৃষ্টির ও পূজার কাহিনী। এর ভেতরে কোন অপার্থিব সুমহৎ আদর্শ লক্ষ্য নেই; আছে এ মাটিকে এ ঐহিক জীবনকে আঁকড়ে থাকার ও ভালোবাসার সাক্ষ্য। তাই দেবলীলার আচরণে বর্ণিত হয়েছে সমকালীন বাঙলার ও বাঙালীর জীবনের অন্তরঙ্গ ইতিকথা। খুল্লনা-ফুল্লরা-লহনা-বেহুলা-রঞ্জাবতী-লখাই-গৌরী কিংবা দুর্বলা-হীরা-মনসা-চণ্ডী-দুর্গা-পার্বতী-শিব-ধর্ম-চাঁদ-ধনপতি-শ্রীমন্ত-কালকেতু-লাউসেন-কর্ণসেন-কালুডোম-ইছাই ঘোষ-মহামদ-মুরারিশীল-ভাড়ুদত্ত প্রমুখ দেব-মানবই ভালয়-মন্দয়, দোষে-গুণে নামভেদে আমাদেরই চিরকালীন প্রতিবেশি, আমাদেরই ঘরের লোক বা আমরাই। তাই মঙ্গল পাঁচালিতে দেবকথার আবরণে আমরা বাঙালাকে ও বাঙালীকেই দেখি। চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীই ক্রমে দুর্গামঙ্গলে দুর্গা, গৌরীমঙ্গলে গৌরী, সারদামঙ্গলে সারদা, কালিকামঙ্গলে কালিকা, অন্নদামঙ্গলে অন্নপূর্না এমনকি বাসুলী মঙ্গলে বাসুলী হয়েছেন এবং সে সঙ্গে বক্তব্য আর কাহিনীও পরিবর্তিত হয়েছে।[৮]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিগণ

দেবী চণ্ডীর মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রচার-প্রকাশ করতে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের মঙ্গল কামনা করে যে কাব্য রচিত হয়েছিল, তাই চণ্ডীমঙ্গল নামে সমধিক পরিচিত। এ চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কোন একজন কবির হাতে বিকাশ লাভ করেনি। বরং বহুকাল ধরে, বহু কবি, কথক, কবিয়াল ও গায়েনের হাতফেরি হয়ে সুস্থির আঙ্গিক-অবয়ব পেয়েছে। বর্তমানে যে কয়জন কবিদের নাম পাওয়া যায়, তারা হলেন- মানিক দত্ত, দ্বিজ মাধব, মাধবানন্দ, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, দ্বিজ রামদেব, রামানন্দ যতি, মুক্তারাম সেন, কৃষ্ণরাম দাস, দ্বিজ জনার্দন, দ্বিজ হরিরাম, জয়নারায়ণ সেন, ভবানীশঙ্কর দাস, কবীন্দ্র অকিঞ্চন চক্রবর্তী, কবিচন্দ্র মুকুন্দ মিশ্র ও জনার্দন প্রমুখ। এ সকল কবিদের মধ্যে সর্বদিক থেকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী শ্রেষ্ঠতম। এ গবেষণার পরিধি ও পরিকল্পনা মোতাবেক মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর জীবনী আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হল।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী

ব্রাহ্মণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মঙ্গল কাব্য ধারার অন্যতম প্রধান কবি। ড. আহমদ শরীফের ভাষায়– মুকুন্দরাম মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। ষোল- সতেরো শতকের সন্ধিলগ্নের মুকুন্দরাম, সতেরো শতকের তৃতীয় পাদের আলাওল এবং আঠারো শতকের মধ্যকালের ভারতচন্দ্র– এ যুগের পাঠকের প্রিয় কবি।[৯] তবে দুঃখের বিষয় এই যে, মধ্যযুগের অন্যান্য কবির মতো মুকুন্দরামের জীবন সম্পর্কে তেমন সুস্পষ্ট

তথ্য পাওয়া যায়নি, বরং যা কিছু পাওয়া গেছে, তাও আবার ভণিতা ও অনুমান নির্ভর। অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাপ্ত পুথি ও কবির লিখিত ভণিতায় দেয়া তথ্যের মাধ্যমে তার পিতামহ, পিতা, ভাই, ছেলে-মেয়ে, গ্রামবাসী, আশ্রয়দাতা ও অপরাপর আত্মীয়-বর্গ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়।

মুকুন্দরামের পৈতৃক নিবাস বর্তমান ভারতের পশ্চিশবঙ্গের বর্ধমান জেলার রায়না থানার দামুন্যা গ্রামে। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র ওরফে গুণাজ মিশ্র এবং মাতার নাম দৈবকী। এদের তিন পুত্র– নিধিরাম ওরফে কবিচন্দ্র (উপাধি বিশেষ), রামনাথ বা রামানন্দ ও মুকুন্দরাম। ধারণা করা হয় মুকুন্দরামের দুই স্ত্রী ছিল। এছাড়া আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, তাঁর একমাত্র পুত্রের নাম শিবরাম, কন্যার নাম যশোদা, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা ও জামাতার নাম মহেশ।[১০] এ মতের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের মিল রয়েছে। কিন্তু ড. সুকুমার সেন ও ড. আহমদ শরীফ শিবরাম ও যশোদাকে মুকুন্দরামের ছেলে ও মেয়ে বলার সঙ্গে সঙ্গে জামাতা মহেশ ও পত্রবধূ চিত্রলেখাকেও ছেলে-মেয়ে হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। তাঁদের মতে- মুকুন্দরামের সন্তান সংখ্যা চার– শিবরাম, চিত্রলেখা, যশোদা ও মহেশ; দুইপুত্র, দুই কন্যা।

বংশধারায় মুকুন্দরামের প্রপ্রপিতামহ তপন ওঝা, প্রপিতামহ উমাপতি, পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র ওরফে গুণরাজ মিশ্র এবং গোত্র সাবর্ণ। দামুন্যার চক্রাদিত্য শিবের ধামাধিকারী ছিলেন পিতামহ জগন্নাথ মিশ্রের জ্যেষ্ঠভ্রাতা মাধব ওঝা।[১২] সুকুমার সেনের মতে, কোন এক রাজ মহিষীর বড় অনুষ্ঠানে পুরোহিত ছিলেন মুকুন্দরামের পূর্বপরুষ রঘুপতি। তারই বংশধর মাধব ওঝা বাস করতেন কর্ণপুরে। তাঁর সদগুণে (শতগুণে) মোহিত হয়ে বীর দিগর দত্ত মাধব ওঝাকে সপরিবারে নিয়ে এসে দামুন্যায় অধিকার দিয়ে বসতি গড়ে দেন এবং নিজ বাড়িতে পুরোহিত মনোনীত করেন।[১৩] সেই থেকে মুকুন্দরামের বংশধরগণ দামুন্যায় কিছু জমি ভোগ করে আসছিলেন। তারা ছিলেন সূর্যোপাসক ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের সেবিত গৃহদেবতার নাম ‘চক্রাদিত্য’ ও ‘রামাদিত্য’ বলে উল্লেখ রয়েছে। গৌড়ের রাজসভার সঙ্গে মুকুন্দের পিতার কাল পর্যন্ত যোগাযোগ অক্ষুণ্ন ছিল। সম্ভবত তিনি আলাউদ্দিন হুসেন শাহ্ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) বা তার পূর্ব বা পরবর্তী সুলতানদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। এ সূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন ‘গুণরাজ মিশ্র’ উপাধি যা গৌড়ের সুলতান দিয়েছিলেন।[১৪] এর ফলেই মুকুন্দরামের পরিবার সংস্কৃত বাংলা ভাষার পাশাপাশি ফারসিতেও সুশিক্ষিত হয়ে ওঠেছিল।

সেলিমবাদ বা সোলায়মানবাদের গোপীনাথ নন্দী নিয়োগীর তালুকে দামুন্যা গ্রামের প্রজারূপে মুকুন্দরামেরা সুখেই বসবাস করে আসছিলেন এবং তালুকদার গোপীনাথের প্রদত্ত ভূমিবৃত্তি ভোগ করে আসছিলেন। কিন্তু ১৫১৩ খ্রি. শের শাহ্ বাংলার গৌড় দখল করায় রাজনীতিতে ক্ষমতার পালাবদল ঘটে এবং খাজনার দায়ে গোপীনাথ কয়েদ হলে অন্যদের সঙ্গে মুকুন্দরামের পরিবারেও বিপর্যয় নেমে আসে। এতে করে তাদের লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি চলে যায় এমনকি জেলজুলুমের আশাঙ্কা দেখা দেয়। ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারে প্রজাগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কারণ সরকারগণ খিলভূমি (নিষ্কর ভূমি) আবাদী বলে লিখে নেয়, খাজনায় দায়ে ধান গরু-বাছুর বিক্রির ক্ষেত্রে ১ টাকার জিনিস ১০ আনায় বিক্রি হতে থাকে, এতে পোদ্দারগণ আবার টাকায় আড়াই আনা কম দিতে থাকে, আমিনগণ এক কড়ার (কড়ির) মাপ খর্ব করে ১৫ কাঠার বিঘার বন্দোবস্ত করতে থাকে এবং প্রজারা যাতে পালিয়ে না যায়, তার জন্য কোটাল ও জমাদারগণ চৌকিদারসহকারে ঘর-বাড়ি পাহারা দিতে শুরু করে।

এমতবস্থায় মুকুন্দরাম নিকট স্বজনদের পরামর্শে সাত পুরুষের ভিটে বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে পালিয়ে মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু পথিমধ্যে (ভালিয়া বা ভেলো গ্রামের নিকটে) রূপরায় নামক দস্যু মুকুন্দরামের সর্বস্ব হরণ করে নেয়। কবির এমন ভয়াবহ বিপদের দিনে যদু কুণ্ডু নামক এক তেলী তাকে ৩ দিন আশ্রয় ও খাবার দিয়ে সাহায্য করেন। এভাবে বহুকষ্ট করে তিনি মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার আরড়া গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার

বাকুড়া রায়ের আশ্রয়-প্রশ্রয় লাভ করেন। বাকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথ রায়ের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন মুকুন্দরাম। এ সূত্রে তিনি রাজদরবারে গৃহীত হন এবং আরড়ায় ভূসম্পত্তির বৃত্তি লাভ করে স্বস্তি পান। এ বাকুড়া রায়ের পিতা ছিলেন বীর মাধব, স্ত্রী দনাদেবী ও শ্বশুরের নাম ছিল দুলাল সিংহ, পুত্র- রঘুনাথ ও পৌত্র চক্রধরের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়।[১৫]

মুকুন্দরামের পৈতৃক নিবাস বা স্বদেশ ত্যাগের সময় কালকে অনেকে ১৫৭৫ খ্রি. বলে সাব্যস্ত করেছেন।

ক. সুকুমার সেন

মুকুন্দরামের পিতামহ জগন্নাথ মিশ্র চৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিরামিষ ভোজন ও দশাক্ষর মন্ত্র জপের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ সময়কালকে ১৫৪৪ খ্রি. বলে রায় দেয়া যায়।[১৬]

খ. ড. আহমদ শরীফ–

১৫৯৬ খ্রি. মুকুন্দরাম পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে চলে যান।[১৭]

গ. আবার ড. দীনেশচন্দ্র সেন-

যখন কবি দামুন্যা হতে পালিয়ে আাসেন, তখন গৌড় বাংলার শাসনভার ছিল মুঘল সুবদার হুসেন কুলী খাঁর (১৫৭৫-১৫৭৮) অথবা মুজাফফর খাঁর (১৫৭৮-১৫৮০ খ্রি.) হাতে। অর্থাৎ মুকুন্দরাম ১৫৭৫ খ্রি. থেকে ১৫৮০ খ্রি. মধ্যবর্তী যে কোন সময়ে দামুন্যা থেকে পালিয়ে আসেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ১৫৭৭ খ্রিষ্টাব্দকেই ইঙ্গিত করে।[১৮]

যদি রঘুনাথ রায়ের জমিদারির শাসনকাল (১৬০৩-১৬২৩ খ্রি.) ঠিক থাকে, তাহলে মুকুন্দরামের স্বদেশ ত্যাগের ঘটনা ১৫৭৫-১৫৯৬ খ্রি. মধ্যবর্তী ১৯ বছরের কোন এক সময়ে ঘটেছে। কারণ মুকুন্দরাম আরড়ায় এসে রঘুনাথ রায়কে গৃহ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষাদান করেছেন। এতে ৮-১০ বছর লাগতে পারে এবং বাকুড়া রায়ের মৃত্যু পর্যন্ত আরো ৫-৭ বছর সময় চলে যেতে পারে।

এবার মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনার কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। এ কাব্যের শেষের দুটি চরণে রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়–

> ‘শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
> কত দিনে গীত হরের বণিতা ॥

অর্থাৎ রস (=৬), রস (=৬), বেদ (=৪), শশাঙ্ক (=১)= ১৪৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রি. বলে ধারণা পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম গ্রন্থের শুরুতেই বাংলার সুবেদার রাজা মানসিংহের নাম উল্লেখ করেছেন। মানসিংহের শাসনামলেই (৪ মে, ১৫৯৪– ১ সেপ্টেম্বর ১৬২৬ খ্রি.) আফগান সেনাপতি ওসমান ১৬০০ খ্রি. উড়িষ্যা মুঘলদের হাত থেকে পুনরায় দখল করে নেন। এ হিসেবে কাব্যের রচনাকাল ১৫৯৪ খ্রি. থেকে ১৬০০ খ্রি. মধ্যবর্তী সময় বলা যায়। কিন্তু আমরা গ্রন্থ রচনার কারণ-সূত্রেই অবগত হয়েছি যে, মুকুন্দরাম স্বদেশ পালানোর পথেই ‘ভালিয়া’ গ্রামের পুকুর পাড়ে নিদ্রিত অবস্থায় তিনি দেবীর কাছ থেকে কাব্য রচনার স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। এরপর তিনি আরড়ায় বসতি স্থাপন করেন এবং রঘুনাথের জমিদারির শাসনামলে (আনু. ১৬০৩-১৬২৩ খ্রি.) তার আগ্রহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় এ কাব্য রচনায় হাত দেন এবং তা সম্পন্ন করেন। মুকুন্দরামের কাব্য রচনার সময়কাল সম্পর্কিত ঐতিহাসিক সমালোচকদের মতামত এরূপ–

ক. আহমদ শরীফ

মুকুন্দরামের কাব্য রচনার শুরু ১৬০৩ খ্রি. পূর্বে নয় এবং এর শেষ ১৬২৩ খ্রি. অনেক আগেই হয়েছিল। অর্থাৎ ১৬০৩ খ্রি থেকে ১৬১২ খ্রি মধ্যবর্তীকালে এ কাব্য রচিত হয়েছে।[১৯]

খ. দীনেশচন্দ্র সেন

মুকুন্দরামের কাব্য রচনার কাল ১৫৭৭ খ্রি. থেকে ১৫৮৭/১৫৮৮ খ্রি. মধ্যবর্তী সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। অর্থাৎ মুকুন্দরামের গৃহত্যাগের পরবর্তী ১০ বছরের মধ্যে।[২০]

গ. আশুতোষ ভট্টাচার্য

মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’ ১৫৯৫ খ্রি. থেকে ১৬০০ খ্রি. মধ্যবর্তী কোন এক সময় সম্পন্ন হয়েছিল।[২১]

ঘ. ক্ষুদিরাম দাস

মুকুন্দরামের দেশত্যাগের সময়কে ১৫৯৬ খ্রি. এবং কাব্য রচনার সময়কালকে ১৬০৩ থেকে ১৬১২ খ্রি. বলে ধারণা করা হয়।[২২]

ঙ. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মুকুন্দরামের গৃহত্যাগের সময়কাল ১৫৫৪ খ্রি. এবং কাব্যরচনা শেষ করেন ১৬০৫ খ্রি.।[২৩]

চ. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্য রচিত হয়েছে ১৫৯৫ খ্রি. থেকে ১৬০৩ খ্রি. মধ্যবর্তী সময়ে।[২৪]

ছ. সুকুমার সেন

মুকুন্দরামের দামুন্যা ছেড়ে আরড়া গমনকে দেশত্যাগ বলিব না। মনে হয়, দামিন্যায় ছিল তাহার নিবাস সাকিন, আরড়া ছিল তাহার কর্মস্থল মোকাম। এ বিবেচনায় তাহার দেশত্যাগের কাল হিসেবে ১৫৪৪ খ্রি. সমর্থিত হয়। রঘুনাথের রাজ্য প্রাপ্তির (জমিদারি প্রাপ্তি) কাল ১৫৭৩-১৫৭৪ খ্রি. ধরা হলে এ কথা বলা যায়- ১৫৭৩-১৫৭৪ খ্রি. আগে কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন নাই।[২৫]

জ. P.N. Ojha

Mukundaram Who is generally known by his latest of ‘Kavikankan’ finished his celebrated work on chandi cult in 1589 A.D. When Man Singh was the Governor of Bengal to whom he refers to in the introduction . (P.N. Ojnha : Aspects of Medieval indian society and culture, Delhi, 1978, P-182)

সুতরাং সকল মতের সমন্বয় করে বলা যায়, মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্য’ ১৫৭৭ খ্রি. থেকে ১৬০৬ খ্রি. মধ্যবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে।[২৬] মুকুন্দরামের কাব্য রচনার সময়কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও তার লেখার মান রস-রুচি-মেধা-মন-মানস এবং প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য নিয়ে কারো মনে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ বা সংশয় নেই। তাই মুকুন্দরামের প্রশস্তি করে বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছেন-

‘কবিতা— পঙ্কজ রবি শ্রীকবি কঙ্কণ
ধন্য তুমি বঙ্গভূমে! যশঃ সুধাদানে
অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী! ভোগিলা দুখ জীবনে ব্রাহ্মণ,
এবে কে না পূজে তোমা, মজি তব গানে?’ -(কমলে কামিনী; চতুর্দশপদী কবিতাবলী)

মুকুন্দরামের কাব্য গুণাগুণের প্রশংসা করে ড. সুনীতি কুমার বলেছেন- কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্য তাবৎ প্রাচীন পাঞ্চালী রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং আধুনিক পূর্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে সবচেয়ে মূল্যবান রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের আগ পর্যন্ত যা কিছু লেখা হইয়াছে তাহার মধ্যে সাহিত্যের ও শিল্পের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যদি কোন একটি রচনার নাম করিতে হয়, তবে তাহা মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল।[২৭]

ড. সুকুমার সেন মুকুন্দরামের কাব্যে চরিত্র নির্মাণের দক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে বলেছেন- ‘দেশ ও দেশের ভালো তাবৎ বস্তু মানুষ পশু গাছপালা নদ-নদী সব— তিনি গভীর অনুভূতির সূত্রে গাঁথিয়া যেন শ্রোতা-পাঠকের প্রত্যক্ষ গোচরে সাজাইয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার কাব্যপটে চিত্র ও চরিত্র মিলিয়া গিয়াছে। তাহার রচনায় সেই সবই জীবন্ত এবং সে

সজীবতা মানবীয়। দেব-উপদেবতা পশুপক্ষী এমনকি নদনদী তাহারাও যেন মানুষ। কাব্যটি চণ্ডীমঙ্গল, দেবতার ক্রীড়াকাণ্ড মানুষের মতো এবং মানুষকে লইয়া। তাই দেবতাকেও মানুষ সাজিতে হইয়াছে। তাই কাব্যের সব চরিত্রই মানুষ, ভিন্ন ভিন্ন সাজ পরা।'[২৮]

মুকুন্দরামের কল্পনা শক্তির প্রশংসা করে রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেছেন-'বাঙ্গালি কবির মধ্যে কবিকঙ্কণকে অবশ্যই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানিতে হইবে। যেহেতু কবির যে প্রধান ক্ষমতা কল্পনা শক্তি তাহাতে যে প্রকার তাহার প্রাচুর্য্য ছিল সে প্রকার অন্যত্র লক্ষ্য হয় না।[২৯]

তবে মুকুন্দরামের কবিকৃতীর সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে– 'দেবতা মানুষের অধীন হইয়াছেন দেবকীর্তি বর্ণনা উজ্জ্বল বাস্তবচিত্রের নিকট নিস্প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। এই শ্রেণীর প্রধান কাব্য মুকুন্দরামের কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে, স্ফুটোজ্জ্বল বাস্তবচিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কনে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে সর্বোপরি আখ্যায়িকা ও চরিত্রের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ও জীবন্ত সম্বন্ধ স্থাপনে আমরা ভবিষ্যৎকালের উপন্যাসের বেশ সুস্পষ্ট পূর্বাভাস পাইয়া থাকি। দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।'[৩০]

মুকুন্দরামের কাব্যে মানবতা ও মানব মহিমার প্রথম জয়যাত্রা শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে গোপাল হালদার বলেছেন- 'তাঁর এ মানুষ সহজিয়া সাধনার সহজ মানুষ নয়, সমাজ বন্ধনাতীত পরমাত্মার বিগ্রহ নয়, সমাজের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ, কামনা-বাসনা মাখা বাস্তব মানুষ। দেবী মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বসেও তাই মুকুন্দরাম মানব মাহাত্ম্যই কীর্তন করেছেন। বাঙলা সাহিত্যে তিনি তাই স্ফুটনোন্মুখ মানবতার প্রথম কবি, প্রথম আধুনিক কবি– যখন আধুনিককাল অনাগত যখন মানুষ হিসাবে মানুষের মর্যাদা অনাবিষ্কৃত।'[৩১]

মুকুন্দরামের কবি প্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন করেছেন ড. আহমদ শরীফ। তিনি নির্মোহ-নিরাসক্ত ও নিরাবেগ দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে মুকুন্দ মানস গভীরভাবে উপলব্ধি করে বলেছেন-'কবিকঙ্কণের অনন্যতা তার বাস্তব জীবন ও প্রতিবেশ চেতনায়, ব্যক্তির ভাব-চিন্তা-কর্ম-আচরণের বাস্তবনিষ্ঠ বাক্‌চিত্রাঙ্কণে, গৃহগত জীবনে নারীর সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-অসূয়া, কাম-প্রেম প্রভৃতির সূক্ষ্ম রূপায়ণে, নিম্নবর্ণের ও মধ্যবিত্তের মানুষের জীবিকার গরজে অবলম্বিত ছল-চাতুরীর ও ধূর্ততার বিচিত্র রূপ অঙ্কনে।'[৩২]

মুকুন্দরামের চরিত্র নির্মাণের শাশ্বত সাফল্য স্বীকার করে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন-'সাহিত্যের আসরে এইরূপ সৃষ্টির আসন ধ্রুব। কবিকঙ্কণের সমস্ত বাক্যরাশি কালে কালে অনাদৃত হতে পারে। কিন্তু রইল তাঁর ভাড়ুদত্ত।'[৩৩]

বাঙালি ঘরের নারী চরিত্র নির্মাণেও ছিল মুকুন্দরামের প্রশ্নাতীত দক্ষতা। তাই এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন বলেছেন- 'খুল্লনার বয়স অল্প, সেও বিশ্বাসী। তবে নির্বোধ নয়। ধনপতির চিঠি যে জাল, তা সে পড়িয়াই বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহার প্রধান গুণ সহিষ্ণুতা। এই গুণেই সে তরিয়া গিয়াছে। সতীনের জ্বালা আর তনয়ের তাপ দুই-ই খুল্লনা ভোগ করিয়াছিল। তাহাই তাহার তপস্যা।'[৩৪]

এবার গবেষক ড. আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতামতের ভিত্তিতে মুকুন্দরামের কবিকৃতীর দুঃখবাদী চেতনার রূপটি দেখা যাক। মানব জীবনের অনিবার্য ও অভিশপ্ত এ দিকটিও মুকুন্দরাম অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে অঙ্কন করেছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্যের ভাষায়- কবির ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ-বেদনা সাহিত্যের মধ্য দিয়া যথার্থ রূপ লাভ করিয়াও তাহা যে সর্বজনীন হইয়া উঠিতে পারে, বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দরামই তাহা সর্বপ্রথম দেখাইয়াছেন।

এই হিসেবে মুকুন্দরাম আধুনিক যুগের সাহিত্যিকদিগের অগ্রদূত।'[৩৫] আরো ভালোভাবে বলতে গেলে বলা যায়– বাংলা সাহিত্যের প্রথম দুঃখবাদী কবি ও ঔপন্যাসিকদের অগ্রদূত।

এই মুকুন্দরাম প্রসঙ্গে তাই রমেশচন্দ্র দত্ত লিখেছেন– Its most remarkable feature is its intense reality. Many of the incidents are superhuman and miraculous, but the thoughts and feelings and sayings of his men and women are perfectly natural, recorded with a fidelity which has no parallel in the whole range of Bengali Literature.'[৩৬]

মুকুন্দরামের এ কবি প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে জমিদার রঘুনাথ রায় তাঁকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধিতে ভূষিত করে যে সম্মান দেখিয়াছিলেন, কতৃজ্ঞ কবিও তাঁর প্রতিভার জাদুকরী স্পর্শে এ রাজপরিবারকে কাব্যের সঙ্গে স্মরণীয় করে রেখেছেন। সুতরাং বলা যায়, মুকুন্দরামের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। মঙ্গল কাব্যের প্রথাগত সীমার মধ্যে থেকেও তিনি এ কাব্যে বাস্তব জীবন, সমকালীন সমাজ ও পারিপার্শ্বিকতা, মানব চরিত্র চিত্রণ, প্রকৃতি ও পরিবেশের বস্তুনিষ্ঠ বর্ণনায় যুগান্তকারী সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি সহজাত প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্বের সহযোগে তার কাব্যে একাধারে নাটক ও উপন্যাসের ও সমাজ তাত্ত্বিকের গুণাগুণ সমন্বিত বহু প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব প্রকৃত অর্থেই সমকালে ছিলেন দুর্লভ। তাই তিনি যুগন্ধর এবং যুগের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্য ধারার অন্যতম শাখা চণ্ডীমঙ্গল। দেবী চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার-প্রকাশ ও প্রসার ঘটাতেই মূলত পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে বেশ কয়েকজন কবি এ মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। তবে সকলের চেয়ে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীই ছিলেন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কারণ- তার মতো এত বড় বাস্তববাদী ও জীবনমুখী সাহিত্যশিল্পী কেউ আর তৎকালে জন্মগ্রহণ করেননি। তিনি তার অমিত প্রতিভা, সহজাত অনুসন্ধিৎসা ও প্রখর পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে সমকালীন আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সর্বোপরি গণমানবের যে জীবন চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা একান্তই বিচিত্র রঙে রঙিন। সামন্তশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় বঞ্চিত বৃহৎ দরিদ্রগোষ্ঠীর জীবন-জিজ্ঞাসা, চাওয়া-পাওয়া, ব্যথা-বেদনা, সুখ-স্বপ্ন, বিশ্বাস ও সংস্কারকে যে ভাবে তিনি রূপদান করেছেন; সমকালীন বাংলা সাহিত্যে তা বিরল। কারণ- 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে প্রকৃত কবি বলতে মাত্র দুই জন- এক মুকুন্দরাম ও দ্বিতীয় ভারতচন্দ্র। মুকুন্দরাম বাঙ্গালীর ঘরের কবি ,,, তাঁর দৃষ্টি অন্তর্মুখী, অন্তরের বিচিত্র সৌন্দর্য উদ্ধার করিয়া লইয়া তাহা দিয়া তিনি কয়েকটি পূর্ণাঙ্গ জীবনালেখ্য রচনা করিয়াছেন।'[৩৭]

জীবনের কল্পনা, ভাব-বিলাসকে নয়, বরং রূঢ় নির্মম বাস্তবতাকেই অঙ্গীকার করে মুকুন্দরামের কাব্য ভুবন গড়ে ওঠেছে। সেখানে অতীন্দ্রিয় ভাব-বিহ্বলতা নেই, আছে শুধু আঁকাড়া জীবন সংগ্রামের জয়গান। তার জীবনাভিজ্ঞতার রসে জারিত বলেই কাব্যের প্রতিটি মানুষ, জীবজন্তু ও প্রাণিই হয়ে ওঠেছে মানবিক এবং মাটি সংলগ্ন মানুষেরই প্রতিবেশি। তাই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধায় তাঁর- 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন– মুকুন্দরাম রোমান্টিক কবি ছিলেন না। জীবনের সূক্ষ্ম, প্রত্যক্ষ ভাব-ব্যঞ্জনা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। তিনি প্রত্যক্ষ বাস্তবের কবি এবং এক সুপ্রতিষ্ঠিত ধারার বাহন। কাজেই বৈষ্ণব কবির অতীন্দ্রিয়, ভাব-বিভোর কল্পনা তাঁহার মধ্যে প্রত্যাশা করা যায় না। কারণ মুকুন্দরাম সমাজের অভিজ্ঞতার আলোকে জীবন ও জগৎকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই- 'মুকুন্দরাম গৃহধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া গার্হস্থ্য জীবনের অভাব-অভিযোগ, আশা-আকাঙ্ক্ষা সকল দিক হইতে লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সর্বদা সচেতন ছিলেন; তাহার কাব্যে তাহার নিজস্ব ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়'।[৩৮]

সুবৃহৎ (কবিতা সংখ্যা প্রায় ৫ শত এবং ছত্র সংখ্যা আনুমানিক ২০ হাজার) এ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর খণ্ড বিভাজন সম্পর্কে ড. সুকুমার সেন বলেছেন- কবিকঙ্কণের কাব্যে চারটি ভাগ-বন্দনা, সতী-পার্বতীর উপাখ্যান (বা

দেব খণ্ড), কালকেতু-ফুল্লরার উপাখ্যান (বা আক্ষটিক খণ্ড) ও ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির উপাখ্যান (বা বণিক খণ্ড)।[৩৯]

বন্দনা অংশের সঙ্গে এ কাব্যকাহিনীর কোন যোগ বা সাযুজ্য নেই। আনুষ্ঠানিকভাবে গীত গাওয়ার জন্য দেবতা বন্দনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আব্যশ্যক; তাই এ অংশ স্থাপনা পালা। দেব খণ্ড আরম্ভ হয়েছে সৃষ্টির বর্ণনা করে। আবার এ দেব খণ্ডেই আছে শিবের দুটি কাহিনী। প্রথমটি অর্থাৎ পূর্বাভাস; দক্ষকন্যা সতীর সহিত শিবের বিবাহ; সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষনাশ যজ্ঞ। এই কাহিনীটি বৈদিক রুদ্র-প্রজাপতি কাহিনীর এক পরবর্তী রূপান্তর। আর দ্বিতীয়টি অর্থাৎ উত্তর ভাগ; হিমালয়-মেনকার কন্যা উমার জন্ম ও শিবের সঙ্গে বিবাহ, শিবের শ্বশুরালয়ে ঘরজামাই থাকা ও শ্বশুরালয় পরিত্যাগের কাহিনী।[৪০] এ ছাড়া মর্ত্যখণ্ডে রয়েছে দুটি উপাখ্যান যথা-কালকেত-ফুল্লরার উপাখ্যান বা আক্ষেটিক খণ্ড এবং ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতির উপাখ্যান বা বণিকখণ্ড।

এবার এ কাব্য বিভাজনকে সুসমন্বয় করে প্রধানত তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা-

১. দেবখণ্ড

২. আক্ষেটিক খণ্ড বা কালকেতু- ফুল্লরা উপাখ্যান

৩. বণিক খণ্ড বা ধনপতি খুল্লনা- শ্রীমন্ত উপাখ্যান

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালির আর্থ-সামজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চালচিত্র আলোচনা করার পূর্বে এ তিন খণ্ডের চুম্বক অংশ উপস্থাপন করা হলো–

১. দেবখণ্ড

দেবখণ্ডের প্রথমেই রয়েছে সিদ্ধিদাতা গণেশের বন্দনা। এরপর রয়েছে মহাদেব, সরস্বতী, লক্ষ্মী, শ্রীরাম, চণ্ডী, শুকদেব, চৈতন্যদেব, আদি দেব-দেবীর বন্দনা। তারপর আছে সৃষ্টি তত্ত্ব বা প্রজাপতির সৃষ্টি লীলার প্রকাশ। সৃষ্টি ধারার শুরুতেই দেখা যায় শিবের সঙ্গে শ্বশুর দক্ষের মনোমালিন্য। কারণ দক্ষ তার যজ্ঞে সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেও কন্যা সতীর জামাতা শিবকে নিমন্ত্রণ করা থেকে বিরত থাকেন। এতে অপমানিতা সতী অনাহুত হয়েই পিত্রালয়ে উপস্থিত হলে যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সবার সামনেই দক্ষ শিবের বদনাম করতে শুরু করেন। স্বামীর অপমান সইতে না পেরে সতী আত্মবিসর্জন করেন। এতে শিব ক্রোধান্বিত হয়ে বীরভদ্রের মাধ্যমে দক্ষের যজ্ঞ ও দক্ষকে বিনাশ করেন। পরবর্তীকালে কৃষ্ণের মায়ায় দক্ষকে পুনর্জীবিত করা হয় কিন্তু স্ত্রী সতীর মৃত্যুতে শিবের সাত বছরের দাম্পত্য জীবনের অবসান ঘটে।

তবে সতীই আবার হিমালয় ও মেনকার ঘরে কন্যা চণ্ডী রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। চণ্ডী একাধারে পার্বতী, দুর্গা, কালী, গৌরী, শিবানী ও উমা নামে পরিচিতি লাভ করেন। এ চণ্ডীই বয়ঃপ্রাপ্তা হয়ে আবার শিবকেই পতিরূপে পেতে তপস্যা শুরু করেন। কিন্তু শিব তখন তপস্যায় মগ্ন ছিলেন। অন্যদিকে তারকাসুর বধের জন্য কুমার কার্তিকের জন্ম আবশ্যিক হয়ে পড়ে। দেবতাদের পরামর্শে শিবের তপস্যা ভঙ্গের জন্য পাঠানো হয় মদন দেবতাকে। কিন্তু শিবের তৃতীয় নয়নের বিচ্ছুরিত অগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হয়ে যান। এতে স্বামী হারিয়ে রতি দেবী বিলাপ শুরু করেন। কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর গর্ভে আবার মদন দেবতার জন্মের ব্যবস্থা করা হয়। উমার তপস্যার মুগ্ধ হয়ে এবং নারদের ঘটকালীতে শিব হিমালয় কন্যা চণ্ডীকে বিয়ে করেন এবং ঘর জামাই হিসেবে শ্বশুরালয়েই বসবাস করতে থাকেন।

শিব চণ্ডীর ঘরে জন্ম নেয় গণেশ ও কার্তিক। এদিকে চালচুলোহীন শিব নিষ্কর্মা মাতাল শুয়ে-বসে খেতে থাকায় শাশুড়ি মেনকা অসন্তুষ্ট হতে থাকেন। কারণ চারজন মানুষের ভরণ-পোষণ করতে গিয়ে মেনকা হিমশিম খেয়ে যান। তাই চিরাচরিতভাবে ঘরজামাই শিবের লাঞ্ছনা শুরু হয়। মা মেনকার খোটা-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে চণ্ডীও তেলে-

বেগুনে জ্বলে ওঠায় শুরু হয় মায়ে-ঝিয়ে ঝগড়া। মায়ের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় অগত্যা চণ্ডী স্বামী-সন্তানসহ পিত্রালয় ছেড়ে কৈলাসে গিয়ে বসবাস শুরু করেন।

কৈলাসে এসে শিব-চণ্ডীর দুঃখের ঘরকন্না শুরু হয়। কারণ শিব কোন কাজ না করে বরং নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে থাকেন এবং চণ্ডীর বকাঝকায় ভিক্ষায় বের হন। এ অভাবের সংসারে অন্নাভাব ছাড়া রয়েছে স্বামী ও সন্তানের পশু-পাখি বাহিনীর উৎপাত। চণ্ডীর এ দুঃখের দিনে প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী রূপে সহানুভূতি ও সমবেদনা নিয়ে আসেন পদ্মাবতী। এ পদ্মাবতীর পরামর্শেই চণ্ডী অন্য দেবতাদের মতো পৃথিবীতে পূজা পেতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। তিনি মর্ত্যের পূজা পেলেন ঠিকই; কিন্তু শুধু কলিঙ্গরাজা ও বনের পশুদের কাছ থেকে। সবার কাছ থেকে নয়। দেবীর কামনা হলো পৃথিবীতে সার্বজনীন পূজা পেতে।

চণ্ডীর সাহায্যে পদ্মাবতী নিয়ে এলেন পরামর্শ। এ জন্য কোন দেবতাকে অভিশাপ দিয়ে মর্ত্যে পাঠাতে পারলেই তার (চণ্ডীর) পূজা সর্বস্তরে প্রচলিত হবে। চণ্ডী পদ্মার পরামর্শ মোতাবেক ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বরকেই বাছাই করে শিবের অনুমতি চাইলেন কিন্তু শিব বিনা অপরাধে এমন কাজ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। এবার দেবী চণ্ডী ছলনা করে কীটরূপ ধারণ করে পূজার জন্যে তুলে আনা নীলাম্বরের ফুলের ভেতর প্রবেশ করে লুকিয়ে রইলেন। নীলাম্বর সে ফুল শিবের পূজায় নিবেদন করলে চণ্ডী শিবকে দংশন করেন। এ ব্যথার যন্ত্রণা ও কীটযুক্ত ফুল দিয়ে পূজা দেবার অপরাধে শিব নীলাম্বরকে ঘৃণ্য ব্যাধ হয়ে পৃথিবীতে মানবজন্ম গ্রহণের অভিশাপ দেন। এর ফলে শচী ইন্দ্রপুত্র নীলাম্বর পৃথিবীতে ব্যাধ দম্পতি ধর্মকেতু ও নিদয়ার ঘরে কালকেতু নাম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। অন্যদিকে নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াবতীও স্বামী সঙ্গ পেতে স্বর্গ ত্যাগ করে অপর ব্যাধ দম্পতি সঞ্জয়কেতু ও হীরাবতীর ঘরে ফুল্লরা নাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই দেবখণ্ডের পরিসমাপ্তি।

২. আক্ষেটিক খণ্ডঃ কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যান

কালকেতু ব্যাধ দম্পতি ধর্মকেতু ও নিদয়ার একমাত্র সন্তান। শৈশবকাল থেকেই কালকেতু ছিল দুরন্ত প্রকৃতির। সে বীর, বলিষ্ঠ, শক্তি সাহসে অপরাজেয় তথা অদম্য। শিশুকালেই সে খরগোস তাড়িয়ে বেড়াতো, বাটুল ছুঁড়ে বনের পাখি শিকার করতো এবং বাঘ-ভালুক নিয়ে খেলা করতো। শিকারে কালকতু ছিল সুদক্ষ। তাই গণক ডেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কালকেতুর হাতে তুলে দেয়া হয় ধনুক তথা শিকারের হাতিয়ার। এ আনুষ্ঠানিকতার সঙ্গে কালকেতুর বংশজাত বৃত্তির অভিষেক ঘটে। বনের পশু শিকারই ছিল ব্যাধ সন্তান কালকেতুর একমাত্র সমাজ স্বীকৃত জীবিকা উপার্জনের উপায় বা পদ্ধতি। প্রতিদিন বনে পশু শিকার করে তা বাজারে বিক্রি করে যা জুটতো, তাই দিয়ে চাল-ডাল কিনে কোন রকমে চলতো কালকেতুর দুঃখের সংসার। দশ বছর বয়সে পুত্র কালকেতুকে নিদয়া তার সখী হীরাবতী-সঞ্জয়কেতুর কন্যা ফুল্লরার সঙ্গে বিয়ে করায়। এ বিয়েতে ঘটকের দায়িত্ব পালন করেন সোমাই পণ্ডিত ওঝা। যৌতুক ও পান-ভোজনের মাধ্যমে সকল লোকাচার মেনে ব্যাধ নব-দম্পতি কালাকেতুর ফুল্লরার সংসার জীবন শুরু হয়।

পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে সংসার সমর্পণ করে কালকেতুর বাবা-মা বারণাসীর তীর্থে চলে যায়। কালকেতু বনের পশু শিকার করে সংসার চালায় ও মাসে মাসে বাবা-মাকে টাকা পাঠায়। এভাবে সুখ-দুঃখ মিলিয়ে কালকেতু-ফুল্লরার সংসার মোটামুটি ভাবে চলছিল। কিন্তু বিপত্তি ঘটে দেবী চণ্ডীর হস্তক্ষেপের মাধ্যমে। কারণ দেবী চণ্ডী হলেন বনের পশু-পাখির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। তিনি গুজরাট নগরের বনে রাজ্য স্থাপন করেন। এ বনের রাজা সিংহ। এ সিংহরাজ আমোদ-ফূর্তিতে দিন কাটায় অথচ কালকেতু বনের পশুকে হত্যা করে চলছে নির্বিকারভাবে। বনের পশুপাখির অভিযোগ ও প্রতিবাদের কারণে সিংহরাজ যুদ্ধ করেও পরাস্ত হলে তারা দেবী চণ্ডীর কাছে কালকেতুর বিরুদ্ধে নালিশ করে। দেবী পশুদের অভয় দিলে তারা বনে ফিরে আসে। পরের দিন কালকেতু বনে আসলে চণ্ডীর

মায়ায় কোন পশুর নাগাল পায়না। চণ্ডী সমস্ত পশু-পাখিকে বনে লুকিয়ে রাখেন। সেদিন কোন শিকার না মেলায় কালকেতু-ফুল্লরা অভুক্ত থেকেই রাত কাটায়। পরদিন কালকেতু আবার বনে যাত্রা করে এবং পথে কিছু শুভ লক্ষণ দেখে সে আশান্বিত হয়। কিন্তু বনে ঢুকেই একটি স্বর্ণ গোধিকা দেখে সে বিমর্ষ হয়ে পড়ে। কেননা সামাজিক বিশ্বাস মতে, যাত্রা পথে স্বর্ণ গোধিকা পড়লে অমঙ্গল হয়। এ গোধিকাকে কালকেতু বেঁধে ফেলে এবং মনে মনে সিদ্ধান্ত নেয়- কোন শিকার যদি না মেলে, তবে এটিকেই পুড়ে খাবে। এদিনও কোন শিকার না মেলাতে সন্ধ্যার সময় কালকেতু শূন্যহাতে গোধিকা নিয়ে বাড়ি ফিরে। শিকারবিহীন স্বামীকে দেখে ফুল্লরা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। কালকেতু স্ত্রীকে এ গোধিকাকে শিকপোড়া করতে বলে এবং সই বিমলার কাছ থেকে খুদ বা চাল আনতে বলে বাসী মাংস নিয়ে গোলাহাটে চলে যায়।

কালকেতু-ফুল্লরার অনুপস্থিতিতে গোধিকারূপী চণ্ডী দেবী এক অপরূপ ষোড়শী রূপসীর বেশে ঘরে বসে থাকেন। ফুল্লরা সই বিমলার বাড়ি গিয়ে খই-মুড়ি খেয়ে, সইয়ের মাথায় উকুন মেরে এবং চাল ধার করে বাড়ি ফিরে যুবতী নারীকে দেখে যেন বজ্রাহত হয়ে পড়ে। ফুল্লরা যুবতীর পরিচয় জানতে গেলে সে জানায় -কালকেতুই তাকে নিয়ে এসেছে এবং সে কালকেতুর ঘরেই থাকবে। এ কথা শোনা মাত্রই ফুল্লরার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সতীন ভেবে ফুল্লরা তাকে প্রথমে নানাভাবে বোঝাতে থাকে। কাজ না হওয়াতে ধর্মীয় ও সামাজিক শাসন ও অপবাদের ভয় দেখায়। এতেও লাভ না হওয়াতে এবার দুঃখে ফুল্লরা কেঁদে ফেলে। কারণ এ দুঃখের সংসারে এতদিন তার কিছু না থাকলেও একনিষ্ঠ পতিপ্রেম ছিল। যা আজ থেকে অবলুপ্ত হবার পথে। ফুল্লরা পৌরাণিক বহু দৃষ্টান্ত শোনালো এবং তার সংসারের বারোমাসের দুঃখ গাথা বললো, তাতেও যুবতী প্রবোধ না মানায় ফুল্লরা কাঁদতে কাঁদতে গোলাহাটে গিয়ে স্বামীকে ধরে আনলো।

কালকেতু নিজ বাড়িতে এসে যুবতী নারীকে দেখে বিস্মিত হলো এবং নানাভাবে বোঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। পরে কালকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে তীর ধনুক দিয়ে আক্রমণ করতে গেলে দেবী নিজ মূর্তি ধারণ করলে ব্যাধ দম্পতি ভয় পায়। দেবী তাদের অভয় দিয়ে ভাগ্য ফেরাতে ৭ ঘড়া ধন ও ১টি বহুমূল্যের আংটি দান করেন। দেবী কালকেতুকে এসব ধন সম্পদের মাধ্যেমে গুজরাটের বন-জঙ্গল কেটে সেখানে নগর পত্তন করে তার পূজা প্রচার করতে বলে বিদায় হন।

দেবীর কথা মতো কালকেতু বণিক মহাজন মুরারি শীলের কাছ থেকে আংটি ভাঙিয়ে ৭ কোটি টাকা লাভ করে এবং তা দিয়ে বন কেটে গুজরাট নগরের পত্তন করে। হিন্দু-মুসলমানদের জন্য আলাদাভাবে অথচ সদ্ভাব বজায় রেখে সুখে-শান্তিতে বসবাস করার উপযোগী নগর তৈরি করলেও প্রথমে কোন প্রজা পাওয়া গেল না। দেবী কিছুটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেও পরে কলিঙ্গনগরে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করায় মানুষ নিরুপায় হয়ে কালকেতুর গুজরাট নগরে ভিড় জমায়। কালকেতু সব প্রজাকে সহজ শর্তে ঘর-বাড়ি , বিনা খাজনায় হালের গরু-লাঙল ও শস্য প্রদান করে। প্রজাগণ সুখে-শান্তিতেই দিন-পাত করতে থাকে। কিন্তু ধূর্ত ভাড়ু দত্ত কপটভাবে গুজরাটের হাটে তোলা আদায় করে এবং প্রজাদের ওপর নির্যাতন চালায়। এতে করে কালকেতু ভাড়ু দত্তকে দরবারে ডেকে এনে অপদস্থ করলে ভাড়ু এর প্রতিশোধ নিতে কলিঙ্গনগরে গমন করে। কলিঙ্গরাজাকে নানা কথায় ফুসলিয়ে গুজরাট নগরী আক্রমণ করায়। ভাড়ুর চক্রান্তে কালকেতু কলিঙ্গনগরের কারাগারে বন্দী হয়ে দেবী চণ্ডীর কৃপায় মুক্ত হন এবং গুজরাটে ফিরে আসেন। এবারও ভাড়ু দত্ত সুযোগ বুঝে প্রতারণা করতে যাওয়াতে কালকেতু তাকে নানা ভাবে শাস্তি দিয়ে লাঞ্ছিত করে এবং পরবর্তীকালে ক্ষমা করে দেয়। অতঃপর দেবী চণ্ডীর কৃপায় কালকেতুর গুজরাট নগরে সুখ-সমৃদ্ধির জোয়ার বয়ে যায়। কালকেতু-ফুল্লরার ঘরে জন্ম নেয় পুত্র পুষ্পকেতু। এদিকে কালকেতু ও ফুল্লরার অভিশাপের সময় সীমাও শেষ হয়ে আসে। তাই কালকেতু রাজ্যভার পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে সমর্পণ করে।

তারপর একদিন শুভলগ্নে কালকেতু ও ফুল্লরা যথাক্রমে নীলাম্বর ও ছায়াবতী রূপ ধারণ করে স্বর্গে পাড়ি জমায় এবং মর্ত্যের পৃথিবীতে চণ্ডী পূজার প্রসার সম্পন্ন হয়। আর এখানেই সমাপ্তি ঘটে আক্ষেটিক খণ্ড বা কালকেতু-ফুল্লরা উপাখ্যানের।

৩. বণিক খণ্ড : ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীপতি উপাখ্যান

দেবী চণ্ডী মর্ত্যের পৃথিবীতে স্ত্রীলোকের পূজা পেতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। স্বর্গের নৃত্যশিল্পী রত্নমালাকে অভিশাপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠাবার চণ্ডীকে পরামর্শ দেয় পদ্মাবতী। যথারীতি স্বর্গে নৃত্যের সময় তাল ভঙ্গের অপরাধে রত্নমালাকে পৃথিবীতে গিয়ে মানব জন্মের অভিশাপ দেন। তার ফলে রত্নমালা খুল্লনা নাম নিয়ে ইছানিনগরের বণিক লক্ষপতি ও রম্ভাবতীর ঘরে জন্মলাভ করে।

অন্যদিকে উজানিনগরের বিখ্যাত বণিক জয়পতি দত্ত ও চন্দ্রমুখীর ঘরে বেড়ে ওঠেন ধনপতি যুবক। যুবক বয়সে ধনপতি বিলাসী বাবুদের মতো পায়রা উড়িয়ে দিন কাটাতেন। এভাবে একদিন ধনপতি বন্ধু জনার্দন ওঝার সঙ্গে পায়রা উড়িয়ে খেলা করছিলেন। দেখা গেল শ্যেনপাখির ধাওয়া খেয়ে ধনপতির পায়রাটি দূরবর্তী ক্রীড়ারত কিশোরী খুল্লনার বস্ত্রাঞ্চলে গিয়ে পড়ে। ধনপতি গিয়ে পাখিটি ফেরত চায়। কিন্তু খুল্লনা পায়রাটি দেয় না বরং নিজ খুড়তুতো ভগ্নিপতিকে নিয়ে নানা রকম হাসি-ঠাট্টা-রঙ্গ-রস করে।

খুল্লনা রূপসী নারী হওয়াতে ধনপতি তাকে বিয়ে করতে জনার্দন ওঝার মাধ্যমে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। ইছানিনগরের বণিক লক্ষপতি ছিলেন খুল্লনার বাবা। ধনপতির রূপ ও অর্থবিত্ত থাকাতে সহজেই বিয়ের সম্মতি পাওয়া যায়। কিন্তু গোল বাধে ধনপতির প্রথমা স্ত্রী লহনাকে নিয়ে। এ লহনাই খুল্লনার খুড়তুতো বোন। স্বামী ধনপতির দ্বিতীয় বিয়ের খবর শুনে লহনা নারীর স্বভাবজাতভাবে অভিমান করে। কিন্তু বিত্তশালী ধনপতি এর প্রতিষেধকও জানতেন। তিনি লহনার জন্য ১টি পাটের শাড়ি ও ৫ পল স্বর্ণ দিয়ে চুড়ি বরাদ্দ দিয়ে সহজেই বিয়ের অনুমতি পেলেন। এরপর মহা ধূমধাম করে শাস্ত্রাচার ও লোকাচার মেনে ধনপতি-খুল্লনার শুভ বিয়ে সম্পন্ন হয়।

এ বিয়ের পরপরই উজানিনগরের রাজা বিক্রমভূপতির জন্য সোনার খাচা আনতে ধনপতিকে গৌড়ে যেতে হয়। যাবার সময় খুল্লনাকে ধনপতি বড় স্ত্রী লহনার হাতে অর্পণ করে যান এবং তার প্রতি যত্ন করতে বলে যান। প্রথম দিকে দুই সতিন খুল্লনা-লহনার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু বাড়ির কাজের দাসী দুর্বলার কুপরামর্শে লহনার মন বিগড়ে যায়। দুর্বলার মাধ্যমে নানা রকম মন্ত্রপূত ওষুধ খুল্লনাকে খাওয়ানো হয়। কিন্তুখুল্লনা এতেও বিপদাপন্ন না হওয়াতে লহনা তার সই লীলাবতীর কাছ থেকে একটি জাল চিঠি আনে এবং এতে খুল্লনার প্রতি স্বামী ধনপতির আদেশ ছিল এরূপ– 'আজ থেকে তুমি বনে বনে ছাগল চড়াবে, ঢেঁকিশালে শয়ন করবে, একবেলা আধপেটা আহার করবে এবং খুয়া বস্ত্র পরবে'। খুল্লনা সহজেই বুঝতে পারলো যে, চিঠিটি জাল। তাই সে এ আদেশ মানতে রাজি হলো না। কিন্তু ঝগড়ায় শারীরিক শক্তিতে লহনার কাছে পরাজিত হয়ে বাধ্য হলো এ দুঃখের জীবন বরণ করে নিতে। এত করে খুল্লনার স্বাস্থ্যহানি হয়ে পড়ে। এরিমধ্যে একদিন বসন্ত ঋতুর দখিনা হাওয়া ও ভ্রমর গুঞ্জনময় পুষ্পিত সৌরভে খুল্লনা ঘুমিয়ে পড়ে। স্বপ্নে দেবী চণ্ডী তাকে তার সর্বশী ছাগল হারানোর কথা বলেন। স্বপ্ন থেকে ওঠে খুল্লনা সর্বশী ছাগল খুঁজে না পেয়ে লহনার ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে বনে ছাগল খুঁজতে থাকে। এভাবে বনের মধ্যে সে পঞ্চদেবকন্যাকে চণ্ডীপূজা করতে দেখে। তারা খুল্লনাকে ছাগল ফিরে পেতে চণ্ডীপূজা করার পরামর্শ দেয়। কিন্তু এ পূজা পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত না থাকায় খুল্লনাকে পঞ্চদেবকন্যাই পূজার বিধি ব্যবস্থা শিখিয়ে দেয়।

চণ্ডীর পূজা খুল্লনা বনের মধ্যেই সম্পন্ন করে এবং দেবী সন্তুষ্ট হয়ে তার সর্বশী ছাগল ফিরিয়ে দেন এবং পুত্রলাভ ও স্বামী দর্শনের বর প্রদান করেন। এরপর দেবী স্বপ্নের মাধ্যমে লহনাকে হুঁশিয়ার করে দেন খুল্লনার প্রতি যত্ন

নিতে এবং গৌড়ে ভোগ-বিলাসে মগ্ন ধনপতি সওদাগরকেও স্বপ্নাদেশ করেন উজানিনগরে স্ত্রীর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে। খুল্লনার অবস্থার কথা দেবী স্বপ্নেই ধনপতিকে জানিয়ে দেন। দেবী চণ্ডীর উদ্‌যোগেই লহনার সুমতি ফিরে আসে এবং সে পূর্বের মতোই খুল্লনাকে আদর যত্ন করতে শুরু করে। আর গৌড়ে থেকেও ধনপতি স্বর্ণপিঞ্জর নিয়ে নিজের দেশে ফিরে আসেন। ধনপতির দেশে ফেরার পর খুল্লনা-লহনার সুখের সংসার শুরু হয়। নিজের কৃতকর্মের জন্য লহনা অনুতপ্ত হয়। ধনপতির বাড়ি প্রত্যাবর্তন উপলক্ষ্যে বহু মানুষকে নিমন্ত্রণ করা হয়। এ নিমন্ত্রণের রান্নার সমস্ত ভার পড়ে খুল্লনার ওপর। রান্না সুস্বাদু ও মুখরোচক হওয়ায় আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ খুল্লনার রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হন।

এভাবে সুখ-শান্তিতে বেশ কিছু কাল কাটানোর পর ধনপতির পিতা জয়পতি দত্তের মৃত্যু হয়। পিতৃ শ্রাদ্ধে দূর-দূরান্ত থেকে আত্মীয়-স্বজনেরা আসেন। অনুষ্ঠানে কে আগে মালা চন্দন দিবে- এ নিয়ে কলহ দেখা দেয়। স্বজাতিরা ধনপতিকে অপদস্থ করতে সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তারা এ সময় সুযোগও পেয়ে গেলেন। রাম রায়, রাম দত্ত, শঙ্খ দত্ত ও নীলাম্বর দাস এরা খুল্লনার বনে বনে একাকী ছাগল চড়ানোর বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং সতীত্বের পরীক্ষা দাবি করেন। অন্যথায় তারা শ্রাদ্ধের খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। আবার সতীত্ব পরীক্ষা না দিতে চাইলে অর্থদণ্ড স্বরূপ ১ লক্ষ টাকা দাবি করে। এবার ধনপতি যথার্থই বিপদে পড়লেন। লহনাকে এ কাজের জন্য ভর্ৎসনা করলেন এবং ১ লক্ষ টাকা দিয়ে তিনি সবার মুখ বন্ধ করতে সম্মত হলেন। কিন্তু খুল্লনা সমাজ বাস্তবতা অনুধাবন করে এবং ভয়ানক সতীত্ব পরীক্ষা দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। কারণ এ পরীক্ষা না দেয়া পর্যন্ত তার কলঙ্ক দূর হবে না বরং স্বামীর অর্থের অপচয় হবে মাত্র। তাই খুল্লনা চণ্ডীর পূজা করে সবাইকে আশ্বস্ত করে সতীত্ব পরীক্ষায় অংশ নেয়। এ সতীত্বের পরীক্ষা হিসেবে জল পরীক্ষা, সাপ পরীক্ষা, লৌহদণ্ড পরীক্ষা ও জতুগৃহ পরীক্ষা নেয়া হয় এবং প্রতিটি পরীক্ষায় খুল্লনা সফল হয়। সকল আত্মীয়-স্বজন খুল্লনা সতীত্বে মুগ্ধ হন এবং তার সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

এরপর কিছুকাল ধনপতি-খুল্লনার সুখের ঘরকন্না চলে। এ সময় চণ্ডী দেবীর ছলনা ও ইচ্ছায় ইন্দ্রপুত্র মালাধরকে অভিশাপ দিয়ে খুল্লনার গর্ভে এবং শশীকলাকে লঙ্কারানী জয়াবতীর গর্ভে জন্মানোর ব্যবস্থা করা হয়। উজানিনগরের রাজা বিক্রমভূপতির রাজভাণ্ডারের চন্দন কাঠের অভাব হেতু ধনপতিকে সিংহল যাত্রা করতে হয়। শিবভক্ত স্বামী ধনপতির যাত্রাপথের কল্যাণ কামনায় খুল্লনা চণ্ডীপূজা করে। এ পূজার কথা লহনা ধনপতির কাছে জানিয়ে দিলে, সে ক্রুদ্ধ হয়ে চণ্ডীর ঘটে পদাঘাত করেন এবং চণ্ডীকে ডাকিনী বলে সিংহল যাত্রা করেন। সাত নৌকা সাজিয়ে সমুদ্রে যাত্রা করেন এবং পথিমধ্যে চণ্ডীর চক্রান্তে ধনপতির ৬ নৌকা ডুবে যায়। কেবল একটি নৌকা কোন মতে রক্ষা করে ধনপতি সিংহলের পথে অগ্রসর হন। চণ্ডীর মায়ায় কালিদহ নামক স্থানে ধনপতি 'কমলে কামিনী'-র মূর্তি দেখেন। সিংহল পৌছালে রাজা সালবান (সালবাহন) ধনাপতিকে যথাযোগ্য খাতির যত্ন করেন। এ সময় কথা প্রসঙ্গে ধনপতি রাজা সালবানকে 'কমলে কামিনী'-র কথা বলেন কিন্তু সালবান কিছুতেই বিশ্বাস করেন না। অথচ ধনপতির কথার দৃঢ়তায় তিনি শর্ত দিলেন– 'ধনপতি কমলে কামিনীর দৃশ্য দেখাতে পারলে সিংহলের অর্ধেক রাজত্ব পাবেন। অন্যথায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।' ধনপতি রাজাকে কমলে কামিনী দেখাতে ব্যর্থ হন এবং শর্তানুসারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এদিকে উজানিনগরে খুল্লনাকে যখন ধনপতি রেখে চলে আসেন, তখন সে ছিল গর্ভবতী। যথাসময়ে খুল্লনার গর্ভে শ্রীমন্ত নামক পুত্রের জন্ম হয়। জেলখানায় থাকার জন্য এ খবর ধনপতি পাননি। এভাবে দিন যেতে থাকে এবং দেখতে দেখতে শ্রীমন্ত বাল্য থেকে কৈশোরে উপনীত হয়। তাকে পড়াশোনার জন্য দনাই পণ্ডিতের কাছে দেয়া হয়। একদিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীমন্ত পণ্ডিতকে পরিহাস ছলে মনে ব্যথা দিলে, পণ্ডিত তার জন্মের ব্যাপারে খারাপ

মন্তব্য করেন। এতে শ্রীমন্ত তার বাবার পরিচয় জানতে চায় মা খুল্লনার কাছে। পুত্রের জেদের কাছে সব খুলে বলে খুল্লনা। পিতাকে উদ্ধার করতে শ্রীমন্ত মা, স্বজন, রাজা বিক্রমভূপতির কথা অগ্রাহ্য করেই চণ্ডী পূজা করে ৭ নৌকা নিয়ে সিংহলের উদ্দেশ্যে সমুদ্র যাত্রা করে। পিতার মতো শ্রীমন্তও ৬ নৌকা হারিয়ে এক নৌকা নিয়ে এবং কালিদহে 'কমলে কামিনী'-র মূর্তি দেখে সিংহলে উপনীত হয়। শ্রীমন্তও রাজার কাছে এ 'কমলে কামিনী' মূর্তির গল্প করলে রাজা সালবান তা অবিশ্বাস করেন। কিন্তু শ্রীমন্তের জেদের কারণে তিনি শর্ত জুড়ে দেন– 'কমলে কামিনীর মূর্তি দেখাতে পারলে অর্ধেক রাজত্বসহ তার সঙ্গে রাজকন্যা সুশীলার বিয়ে দেয়া হবে। অন্যথায় শিরশ্ছেদ করা হবে।' এমন শর্ত মেনেই শ্রীমন্ত বাবা ধনপতির মতোই ব্যর্থ হয়। এতে শ্রীমন্তের শিরশ্ছেদের হুকুম হয়।

মৃত্যুর পূর্বে অর্থাৎ মশানে নেবার পূর্বে শ্রীমন্ত একমনে চণ্ডীর ধ্যান-আরাধনা করায় চণ্ডী তার বাহিনী দিয়ে সিংহল বাহিনীকে তাড়িয়ে দেন এবং শ্রীমন্ত প্রাণে বেঁচে যায়। চণ্ডীর কৃপায় শ্রীমন্ত রাজাকে কমলে কামিনী'-র মূর্তি দেখাতে সক্ষম হয় এবং শর্তানুযায়ী রাজকন্যা সুশীলাকে বিয়ে করে ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ করে। শ্রীমন্তের প্রচেষ্টায় পিতা ধনপতিও জেলবন্দীর জীবন থেকে মুক্তি পায়। সিংহলে কিছুকাল থাকার পর পিতা-পুত্র ও পুত্রবধূ মিলে উজানিনগরে ফিরে আসে। চণ্ডীর কৃপায় পিতা-পুত্র তাদের ডুবন্ত নৌকাগুলো ফিরে পায়। উজানিনগরের রাজা বিক্রমভূপিতকেও শ্রীমন্ত 'কমলে কামিনীর' মূর্তি দেখিয়ে মুগ্ধ করে। রাজা খুশি হয়ে শ্রীমন্তের সঙ্গে রাজকন্যা জয়াবতীর বিয়ে দেন। এরপর ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীমন্তের সংসার সুখ-শান্তিতে ভরে ওঠে। আর এ ভাবেই দেবী চণ্ডীর পূজাও খুল্লনার মাধ্যমে প্রচার-প্রসার ঘটে। অবশেষে খুল্লনা ও শ্রীমন্তের অভিশাপের পালা শেষ হলে তারা স্বর্গে চলে যায়। পরিশেষে দেবী চণ্ডীর বন্দনা প্রশংসা-প্রশস্তি কামনা করে গ্রন্থের সমাপ্তি টানা হয়েছে।

এ 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের দেবখণ্ড, আক্ষেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ড তিনটি আখ্যানেরই মর্মবাণী বিবাহিত নারীর বেদনা।[৪১] দেবখণ্ডের প্রায় ত্রিশটি চরিত্রের মধ্যে চারটি চরিত্রই প্রধান হয়েছে ওঠেছে- একটি পুরুষ চরিত্র শিব; আর তিনটি নারী চরিত্র- সতী, চণ্ডী ও মেনকা।

আবার আক্ষেটিক খণ্ডেরও প্রায় ত্রিশটি চরিত্রের মধ্যে পাঁটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য। তিনটি পুরুষ চরিত্র– কালকেতু, মুরারি শীল ও ভাড়ু দত্ত; আর দুটি নারী চরিত্র– দেবী চণ্ডী ও ফুল্লরা। অন্যদিকে বণিক খণ্ডেও প্রায় পঞ্চাশটি চরিত্রের মধ্যে পাঁচটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য।' যথা- তিনটি নারি চরিত্র- দেবী চণ্ডী, খুল্লনা ও লহনা এবং দুটি পুরুষ চরিত্র– ধনপতি ও শ্রীমন্ত। এছাড়াও দাসী দুর্বলা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এ তিনটি খণ্ডের কাহিনীই বৃহৎ বাংলা ও গৌড়ের গঙ্গা, ভাগীরথী, দামোদর, অজয়, যমুনা, গোমতী, কালিন্দী, মন্দাকিনী, ত্রিবেণী, করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্র নদ-নদীর কুল ঘেষে গড়ে ওঠেছে। এ কাহিনীর বিস্তৃতি রাঢ়-বাংলা ও গৌড়ের গুজরাট, বারণাসী, বর্ধমান, মেদিনীপুর, নদীয়া, ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের মতো অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়। জম্বুদ্বীপ ও সিংহলকে বাদ দিলে আর বাদ বাকি অঞ্চলকে রাঢ় বাংলা ও গৌড়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এসব অঞ্চলের জলবায়ু, আবহাওয়া, মাটি ও মানুষকে আশ্রয় করেই গড়ে ওঠেছে এ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনী। এতে বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের চিত্র বিশ্বস্তার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে।

তবে এ চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীর গুরুত্ব বা অনন্যতা নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে। অরবিন্দ পোদ্দারের মতে, 'চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী দু'ভাগে বিভক্ত; প্রথম ভাগে কালকেতু উপাখ্যান। প্রথম উপাখ্যানে পাওয়া যায়- চণ্ডী মাহাত্ম্য প্রচারের প্রথম পর্বের পরিচয়; বিধি বিধান ও সমস্ত নিয়ম-কানুনের বন্ধন মুক্ত অনার্য দেতা চণ্ডী নিজের প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতির জন্য যে কোন ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে যে কোন কর্মে প্রবৃত্ত হচ্ছেন, পরিশেষে স্বীকৃতিও খানিকটা লাভ করেছেন, কিন্তু এই স্বীকৃতির জোর তখন পর্যন্তও তিনি ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সম্মত সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ

করেননি। এই সমাজের বাইরে গুজরাটের বনে তাঁর অধিষ্ঠান। দ্বিতীয় ভাগে দেখতে পাই, তিনি ব্রাহ্মণ্য সমাজ সংস্থায় প্রবেশ লাভ করেছেন এবং সেখানে প্রচলিত সমৃদ্ধ প্রতিষ্ঠিত দেবতা শিবকে বিতাড়িত করে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রথম পর্বে যার আরম্ভ, দ্বিতীয়ে তার পরিণতি।' –(মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ; পৃ-৬১)

'আবার রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, স্থায়ী সংহতি, জীবন বিন্যাসের অভাব ও সামাজিক অসঙ্গতির চাপে বৃহত্তর জনসমষ্টির জীবন নানা দিক থেকে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবনের স্থিরতা নেই, সুখ অচিন্ত্যনীয়, শান্তি সুদূর পরাহত। ,,, এরূপ পরিবেশ পরিস্থিতিতে মানুষ তাই শক্তির কল্পনা ও আশ্রয় নিয়েছে। তার এ শক্তির আধার হলো নারী দেবতা। এ মাতৃরূপা শক্তি কল্পনার মধ্যে মানুষের দুটো সহজাত প্রবৃত্তি পরিশোধিত রূপে প্রকাশ লাভ করেছে। একদিকে তার বাঁচার আকুতি, আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় সংগ্রামের প্রেরণা; অন্যদিকে সৃষ্টি ও পালনের আকুতি। ,,, কারণ তখন সমস্ত সৃষ্টিশীল কাজে শিব উদ্যম ও প্রেরণা না যুগিয়ে বরং দেখিয়েছে চরম অবহেলা ও ঔদাসীন্য। তাই সৃষ্টি অক্ষম পুরুষ দেবতা শিবের বিপরীতে মানুষ সহজেই সৃষ্টি সমর্থ মেয়ে দেবতাকেই স্থাপন করে; বিশেষ করে মাতৃমূর্তিই যখন রক্ষণাবেক্ষণ এবং সৃষ্টি উভয়েরই প্রতীক। শিবের স্থানে শক্তির প্রতিষ্ঠা তাই স্বাভাবিক। চণ্ডীর শক্তির ও ক্ষমতার প্রচণ্ডতা আমাদের বিস্ময়াবিভূত করে, অসম্ভব-সম্ভবের প্রতিশ্রুতিতে আমরা অভিভূত হই। ,,, এ পটভূমিতেই সূচনা হয় শিবের চলে যাওয়ার এবং চণ্ডীর আগমনের কাহিনী। ব্রাহ্মণ-মানসের ঔদাসীন্যের ঊর্ধ্বে প্রতিষ্ঠা পায় প্রাণধর্মী লৌকিক জীবনাদর্শের বিজয় কাহিনী। আর এমনি ধরনের আদর্শ চরিত্র এঁকেই মানুষ প্রতিদিনকার খণ্ডতাকে পূর্ণতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং এমনি ধরনের পূর্ণ ও সার্থক জীবনের আবির্ভাবের আশা করেছে।' –(অরবিন্দ পোদ্দার : মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ; পৃ- ৬৩-৭০)

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন

মুকুন্দরাম চক্রবর্তী 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' যে শাসন ব্যবস্থা ও জমিদারী শোষণের চিত্র এঁকেছেন সে হল, সুলতানী তথা তুর্ক-আফগান রাজত্বের অবসান ও আকবরের অধিকার বিস্তারের প্রথমাবস্থার ছবি।[৪২] মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৫৯৪ খ্রি. বাংলায় রাজা মানসিংহ সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত এ অঞ্চলে (বাংলাসহ বিহার ও উড়িষ্যা) কোন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি বা কার্যকর হয়নি। বরং মুঘল-আফগান দ্বন্দ্বে এ গোটা অঞ্চল বিদ্রোহ-বিক্ষোভে অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। এ অস্থির, অশান্ত, অনিশ্চিত ও বিপদ-সঙ্কুল পরিবেশ-পরিস্থিতি সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন- 'বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলার সঙ্গে মিশেছে সমাজের আভ্যন্তরীণ গলদ, শ্রেণীগত বৈষম্য বর্তমান, সুতরাং উৎপীড়নও ; সুদ বাট্টা ভোগী মহাজনরা রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, এবং দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে আরম্ভ করে। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়, স্থানীয় সংহত জীবন বিন্যাসের অভাব ও সামাজিক অসঙ্গতির চাপে বৃহত্তর জনসমষ্টির জীবন নানা দিক থেকে অসহনীয় হয়ে উঠেছে। জীবনের স্থিরতা নেই, সুখ অচিন্ত্যনীয়, শান্তি সুদূরপরাহত।[৪৩]

বাংলায় দিল্লীর শাসন ব্যবস্থা শিথিল হবার কারণে কৃষক প্রজা কেন্দ্রীয় শাসন ও স্থানীয় প্রশাসনের অর্থাৎ উভয়ের হাতেই নিগৃহীত-নিষ্পেষিত হতো। এ বিষয় সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকারের মন্তব্যটি স্মর্তব্য-

'The history of the years 1575-1594, is a sickening monotonous tale of local offensives with varying results but no final decision and the temporary expansion

and retreat of the imperial power, while the weak and innocent suffered at the hands of both the parties.'[৪৪]

মুঘল আমলে প্রশাসনের অন্যান্য বিষয়ের মতো ভূমি ব্যবস্থায়তেও শের শাহের শাসনামলের প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসরণ করা হয়। ভূমি রাজস্ব আদায়কল্পে যে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হতো, তারাই পরবর্তীকালে ভূস্বামীতে পরিণত হয়। এ আমলারাই রাজস্ব সংগ্রহের নামে কৃষক প্রজার ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিতো, লুট করতো গরু-বাছুর, শস্য এমনকি স্ত্রী-কন্যাদেরও। এ রাজস্ব আদায়কারীদের শোষণ-নির্যাতনের চিত্র বিধৃত হয়েছে নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিকদের লেখায়-

ক. রামশরণ শর্মা

মধ্যযুগীয় ভারতীয় কৃষকদের অবনতির কারণের অনেক ব্যাখ্যা হতে পারে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হল গ্রাম-কর্মীদের উপর করভার বৃদ্ধি। ,,, শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকগণ কর্তৃক গ্রাম পরিত্যাগই ছিল একমাত্র প্রতিক্রিয়া। কিন্তু মধ্যযুগের স্বনির্ভর অর্থব্যবস্থায় কৃষকগণ জমির সঙ্গে আবদ্ধ থাকায়, গ্রাম পরিত্যাগও সকল ক্ষেত্রে সম্ভব ছিল না।[৪৫]

খ. কে. এস শেলভানকর

ভারতীয় সামন্তবাদে একটি ক্ষুদ্র রাজস্ব সংগ্রহকারী শ্রেণী বৃহত্তম ভূমি কর্ষণকারী শ্রেণীকে শোষণ করতো।[৪৬]

গ. গীতা মুখোপাধ্যায়

নতুন ভূমি ব্যবস্থার ফলে সরকারি তহবিলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব জমা দেবার দায়িত্ব ছিল জমিদার, ডিহিদার বা তালুকদারের ওপর এবং এই রাজস্ব আদায়ের তাগিদ দেবার জন্য আরও এক শ্রেণির কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। নির্দিষ্ট অর্থ জমা না দিতে পারলে জমিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্বভোগীদের ওপর পীড়ন হতো। এই কারণে তারা প্রজাদের ওপর ইচ্ছামতো শোষণ করে মোটা রকম টাকার অঙ্ক নিজেদের জন্য আদায় করে রাখতো। অর্থাৎ সকল উচ্চ শ্রেণীর অত্যাচারই শেষ পর্যন্ত পড়ত ভূমিজীবী প্রজাসাধারণের ওপর।[৪৭]

ঘ. অতুল সুর

এই প্রতুলতার মধ্যেও নিম্নকোটির লোকদের দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণ ছিল সরকারী কর্মচারীদের অত্যাচার ও জুলুম। কবিকঙ্কণ চণ্ডীর রচয়িতা মুকুন্দরাম বলেছেন যে, যদিও ছয়-সাত পুরুষ ধরে তাঁরা দামুন্যা গ্রামে বাস করে এসেছিলেন, তথাপি ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারে তাঁরা ভিটাচ্যুত হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ,,, একজন সমসাময়িক বৈদেশিক পর্যটক (মানরিক) লিখে গিয়েছেন যে, রাজস্ব দিতে না পারলে যে কোন হিন্দুর স্ত্রী ও ছেলে পুলেদের নিলাম করে বেচা হতো। এছাড়া সরকারি কর্মচারীরা যখন তখন কৃষক রমণীদের ধর্ষণ করতো। এর কোন প্রতিকার ছিল না।[৪৮]

মুঘল আমলে রাজস্ব আদায়ের জন্য ডিহিদার নিযুক্ত করা হতো। এ ডিহিদারগণ ছিলেন ক্ষুদ্র জমিদার শ্রেণিভুক্ত। কতগুলো গ্রাম নিয়ে গঠিত হতো একটি মৌজা। আর কতগুলো মৌজা নিয়ে গঠিত হতো এক একটি ডিহি। এ ডিহির (বা ভূখণ্ডের) অধিকারীদের বলা হতো ডিহিদার। এ ভূমাধিকার এরা সরকারিভাবে পেতো। এরা রাজস্ব আদায় করতো এবং নির্দিষ্ট অংশ সরকারি কোষাগারে জমা দিয়ে বাকি অংশ নিজেরাই ভোগ করতো। এ ডিহিদারদের প্রসঙ্গে ইতিহাসবিদ M.A Rahim এর উক্তিটি স্মরণীয়

'The Dihidars originally entered into contract with the government and they were given the right to collect revenues of some specified territories or there promise to pay stipulated sums of money to the state.'[৪৯]

এ রাজস্ব আদায়ের নামে ডিহিদাররা কৃষক প্রজার ওপর নির্মম নির্যাতন চালাতো। এমন একজন ডিহিদার মাহমুদ শরীফের অত্যাচারে বর্ধমানের দামুন্যার মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর পৈতৃক নিবাস ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন।

মুঘল আমলে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা নতুনরূপ লাভ করে। কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ভূমিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় যথাঃ ১. জায়গীর জমি ও ২. খালিশা জমি। এ দ্বিবিধ ব্যবস্থাপনায় ক্রমে গড়ে ওঠে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি, যাদের বলা হয় 'রাজস্ব কৃষক বা রেভিনিউ ফার্মার'।[৫০] মুঘল আমলে বাংলার সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোতে পাঁচটি প্রধান শ্রেণি পরিলক্ষিত হয়। সমাজ বিজ্ঞানী ড. রংগলাল সেনের মতে ১. রাজা বা রাষ্ট্র ২. জায়গীদার ৩. চৌধুরী, লম্বরদার, মণ্ডল, মাতাব্বর ও সরপঞ্চ পদবীধারী ব্যক্তিবর্গ ৪. খোদকাস্ত কৃষক ও ৫. পাইকাস্ত কৃষক।[৫১] এ পাইকাস্ত কৃষকরা শোষণ ও জনসংখ্যার চাপে কালক্রমে পরিণত হয় ভূমিদাসে। আবার সামন্ততন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সমাজে উদ্ভব ঘটে মহাজন বা লগ্নিপুজিপতি শ্রেণির। এ বিবেচনায় তৎকালীন বাংলার অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থাপনা ও লগ্নিপুজির ওপর নির্ভরশীল সমাজকে পাঁচটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করা যায়; যথাঃ ১. জায়গীরদার, জমিদার, রাজস্ব সংগ্রহকায়ী, মহাজন ও বণিক ২. ধনী কৃষক ৩. মধ্যস্তরের কৃষক ৪. নিম্নস্তরের কৃষক ও ৫ ভূমিহীন কৃষক। এ শ্রেণিসমূহকে আবার মোটা দাগে দুটি বৃহৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত করা যায়; যথাঃ ১. উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কহীন সংখ্যা লঘিষ্ঠ শোষক শ্রেণি এবং ২. উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত (কৃষক, প্রজা বা রায়ত) শ্রেণি।[৫২]

মঘুল আমলে জমির ওপর সর্বাংশে স্বত্ব বা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং শর্ত সাপেক্ষে কৃষক প্রজা জায়গীরদার বা জমিদারদের কাছ থেকে জমির অধিকার পেতো। এ অধিকার পেতে দলিল দস্তাবেজের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হতো। তবে জমিদার ইচ্ছা করলে কোন কারণ ছাড়াই কৃষকের কাছ থেকে জমি ফিরিয়ে নিতে পারতো। উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য ছিল। ফসল বা নগদ অর্থে তা পরিশোধের ব্যবস্থা ছিল। তবে সম্রাট নগদ অর্থেই রাজস্ব প্রদান বেশি পছন্দ করতেন। মুঘল আমলে বাংলার অর্থনীতি প্রধানত তিনটি কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল; যথাঃ ১. কৃষি, ২. শিল্প ও ৩. ব্যবসায়-বাণিজ্য। এ সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নে করা হল-

কৃষি

মুঘল আমলেও বাংলার অর্থনীতির প্রাণ ছিল কৃষি। কারণ সম্রাটের আয়ের প্রধান উৎস ছিল এ কৃষি রাজস্ব। বিদ্যমান সামাজিক সম্পর্কগুলো ছিল মূলত কৃষির ওপরই নির্ভরশীল। এ কৃষি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত ব্যক্তি বর্গের পর্যায়ক্রমিক শ্রেণিকাঠমো দাঁড় করালে দেখা যায় এর সর্বোচ্চ পর্যায় রয়েছেন সম্রাট এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ে রয়েছে- কৃষক প্রজা। আর মধ্যবর্তী পর্যায়ে রয়েছে বিভিন্ন রাজস্ব সংগ্রহকারী গোষ্ঠী; যেমনঃ জায়গীরদার, জমিদার, ডিহিদার, চৌধুরী, কানুনগো, তালুকদার, নিয়োগী, শিকদার, সরকার, আমিন, মণ্ডল, পোদ্দার, পাইক, পাটোয়ারি ও মাতব্বর প্রমুখ।

ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা

তৎকালীন সময়ে ভূমির উর্বরা শক্তির ওপর ভিত্তি করে ভূমিকে মোট চার ভাগে বিভক্ত করা হতো, যথা, ১. পোলাজ বা বাৎসরিক উপযুক্ত ২. পারাওটি বা স্বল্প অনাবাদি, ৩. চাষার বা ৩-৪ বছর অনাবাদি এবং ৪. বানজার বা ৫ বছরের বেশি অনাবাদি ভূমি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির ভূমির সমন্বয়ে ভূমিকে আবার উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট; এ তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হতো। এ নিকৃষ্ট ভূমিকেই বলা হতো খিল ভূমি (অনুর্বর ভূমি)। এ ভূমিসমূহকে ডিহিদার, সরকার, পোদ্দার ও চৌধুরীরা নল বা লোহার আংটাযুক্ত রাঁশের দণ্ড দ্বারা মেপে ভাগ করতো। সাধারণত ২০ কাঠায় ১ বিঘা ধরা হতো। অর্থাৎ ৬০ গজের সমতুল্য, ৩৩০০ বর্গগজের একখণ্ড জমি ১ বিঘায় পরিগণিত

হতো। কিন্তু ডিহিদারগণ অনেক সময় দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ১৫ কাঠায় (২৭০০ বর্গগজে) ১ বিঘার বন্দোবস্ত করতো এবং অনুবর্বর ভূমিকে (খিল ভূমিকে) উর্বর ভূমি বলে চালিয়ে দিত।

এ প্রসঙ্গে ড. দীনেশচন্দ্র সেনের বক্তব্য স্মরণীয়– 'বঙ্গদেশের রাজনৈতিক বিপ্লব দূরপল্লীর কৃষক কবিকেও গৃহসুখে বঞ্চিত করিল। মামুদ শরীফ নামক ডিহিদারকে কবি মুকুন্দরাম দুরপনেয় কালির বর্ণে অঙ্কিত করিয়া তাহার অমর কাব্যের এক পার্শ্বে রাখিয়া দিয়াছেন। এই ব্যক্তির অত্যাচারে প্রজাগণের দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল, সরকারগণ খিলভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল। ,,, আমলাগণ এক কুড়ার মাপ খর্ব্ব করিয়া ১৫ কাঠায় বিঘা করিতে লাগিল।'[৫৩]

তাই কবি মুকুন্দরাম তৎকালীন ভূমিবণ্টন ব্যবস্থায় অনিয়ম প্রসঙ্গে বলেছেন–

কাঠা

'অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ।
,,,
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাঞি মানে প্রজার গোহাড়ি।
সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল
বিনি উবগায়ে যায় ধুতি।' –(পৃ- ০৩)

রাজস্ব সংগ্রাহক কর্মচারী

সমকালীন সামান্তবাদী সমাজে কৃষক প্রজার কাছ থেকে জমির উর্বরতা ও ফসলের ধরন অনুযায়ী নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো। সাধারণ উৎপন্ন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য ছিল। এ রাজস্ব ফসলে বা নগদ টাকায় সংগ্রহ করতে ডিহিদার, সরকার, পোদ্দার, তালুকদার, চৌধুরী, কানুনগো, আমিন, শিকদার, মণ্ডল, পাটোয়ারি ও মাতাব্বরকে নিয়োগ দেয়া হতো। এরা রাজস্ব সংগ্রহের নামে কৃষক প্রজাদের ওপর নানা ভাবে জুলুম নির্যাতন চালাতো। এদের দুঃশাসন ও অপকর্ম সম্পর্কে ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

'এই ব্যক্তির (ডিহিদার মাহমুদ শরীফ) অত্যাচারে প্রজাদের দুঃখ অসহ্য হইয়া উঠিল। সরকারগণ খিলভূমি আবাদী বলিয়া লিখিয়া লইল, তাহারা খাজনা শোধ করিতে না পারিয়া ধান, গরু বিক্রয় করিল; বাজারে জিনিসের মূল্য হ্রাস হওয়ায় টাকার দ্রব্য দশ আনায় বিক্রয় হইতে লাগিল। পোদ্দারগণ প্রত্যেক টাকায় আড়াই আনা কম দিতে আরম্ভ করিল এবং আমলাগণ এক কুড়ার মাপ খর্ব্ব করিয়া ১৫ কাঠায় বিঘা ধরিতে লাগিল। এ দিকে প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পাছে প্রাণটি লইয়া পালাইয়া যায়, এই জন্য কোটাল ও জমাদারগণ পথ অবরোধ করিয়া পাহারা দিতে লাগিল।'[৫৪]

এভাবে এ রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কৃষক প্রজাদের ওপর জেল-জুলুম চালাতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' উল্লিখিত এসব কর্মচারীরা হলো-

ক. ডিহিদার

'ডিহিদার আবুদ খোজে টাকা দিলে নাঞি রোজে
ধান্য গরু কেহ নাহি কেনে।' –(পৃ- ০৩)

খ. সরকার

'সরকার হইল কাল খিল ভূমি লিখে নাল
বিনি উবগায় খায় ধুতি।' –(পৃ- ০৩)

গ. পোদ্দার

'পোতদার হইল যম   টাকা আড়াই আনি কম'
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।' –(পৃ- ০৩)

ঘ. 'জমাদার

জানদার সভার আছে   প্রজাগণ পলায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দিল থানা।' –(পৃ- ০৩)

ঙ. মণ্ডল

'বুলন মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই।
হাজিল বিলের শস্য তারে না ডরাই।' –(পৃ- ৭৬)

চাষাবাদ ও ফসলাদি

কৃষিই ছিল বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি। কারণ এদেশের নদ-নদীর অববাহিকা, আবহাওয়া, ও জলবায়ুর আনুকূল্যে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য শস্য ও অর্থকরী ফসলাদি উৎপন্ন হতো। এসব শস্য বা ফসলের মধ্যে অন্যতম হলো- ধান, গম, আখ, পাট, নীল, আফিম, লাক্ষা, রেশম, তুলা, সরিষা, তিল, মটরশুটি, মুগ, মসুর, সবজি ও ফলমূল প্রভৃতি।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ও শিবের চাষাবাদ ও কালকেতুর গুজরাট নগরে কৃষক প্রজাদের সুবিধা প্রদানের সূত্রে এসব ফসলাদি ও চাষাবাদের চিত্র পরিলক্ষিত হয়-

'জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান
তায় ফলে মাষ সরিষা তিল কাবাস ধান।' –(পৃ- ২৫)

রাজস্ব, খাজনা বা কর

সমকালীন সামন্তবাদী সমাজে ভূমির উর্বরতা ও শস্যের ধরন অনুযায়ী রাজস্ব বা কর নির্ধারণ করা হতো। সাধারণত উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্ব হিসেবে ধার্য করা ছিল। এ রাজস্ব ফসলে বা নগদ অর্থে পরিশোধ করা যেতো। শাসক শ্রেণির কাছে নগদ অর্থই অধিক পছন্দনীয় ছিল। এছাড়া রাজস্ব বা ফসলী কর ছাড়াও রাষ্ট্রীয় জীবনে নানা রকম কর যেমন- বসত কর, লবণ কর (ওড়া লোন), পাইকদের ব্যয় নির্বাহ বাবদ প্রদেয় কর (সানাভাত), ধান কাটার কর (ধানকাটী) হিসাব ভুল হবার আশংকায় অগ্রিম প্রদেয় কর (কলম কসুরে) উৎসব কর (পার্বণী) সেলামী কর, পণ্য শুল্ক, হাটের তোলা, জিজিয়া (অমুসলিমদের নিরাপত্তা স্বরূপ), পাঁচ শতাংশ কর (পঞ্চক জাত) প্রচলিত ছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব রাজস্ব বা করের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। কালকেতু তার গুজরাট নগরে কৃষকদের বসবাসে উৎসাহিত করতে সাত সন পর্যন্ত ভূমি কর মওকুফ করার ঘোষণা দেয়। আবার ভাড়ুদত্তকে নগরমণ্ডল সেজে জোর করে হাটের তোলা আদায় করতে দেখা যায়–

ক.   আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিবে হেমকুণ্ডল।
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বই দিয় কর।

,,,

সেলামী বাঁসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজরাট দেশে।

পার্বণি পঞ্চক জাত ওড়া লোন সানা ভাত

ধান কাটী কলম কসুরে

জত বৈয়ে দ্বিজবর তার নাহি নিব কর

চাষ ভূমি বাড়ি দিব দান।' –(পৃ- ৭৬-৭৭)

শিল্প

বিভিন্ন শিল্পে বিশেষত গ্রামীণ শিল্পে বাংলা ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। লোহা, লবণ ও কেরোসিন বাদে আর সবই প্রায় গ্রাম বাংলায় উৎপাদিত হতো। প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশে কর্মে নয়, বরং বর্ণের ওপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন পেশাজীবী বা বর্ণজীবী সম্প্রদায়ের বিকাশ ঘটেছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য এ বৃত্তিজীবী বা বর্ণজীবী গোষ্ঠীই মূলত বাংলার বস্ত্র, লৌহ, মৃৎ, তামা, কাঁসা, কাঠ, শঙ্খ, কাগজ, কার্পেট, ইস্পাত, কামান, নৌকা, স্বর্ণ ও রৌপ্য শিল্পের বিকাশ ঘটে। গ্রামে যেমন কুটির শিল্প, তেমনি রাজধানী বা নগরে অস্ত্রকারখানা, টাকশাল, সোনা-রূপা শোধনাগারসহ নানা ধরনের কারখানা গড়ে ওঠে। 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে' এরূপ বস্ত্রশিল্প, লৌহশিল্প, কাষ্ঠ শিল্পসহ নানা শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়।

খ. লৌহশিল্প

'সাধুর বচন শুনি আনন্দিত নৃপমুনি

ডাকিআ আনাইলা কারিকর।

নিবন্ধ করিআ কয় সুবর্ণ জুখিয়া লয়

কামিলা পাতিল কারখানা।

কেহ কাটে কেহ পোড়ে কেহ কেহ ফুল গড়ে

সুবন্ধনে কেহ টানে গুনা। –(পৃ- ১৩০)

ব্যবসায়-বাণিজ্য

তৎকালীন সময়ে বাংলা ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভ করে এবং সমৃদ্ধিশালী দেশে পরিণত হয়। কারণ কৃষি ও শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাচুর্যের কারণে এবং অসংখ্য নদী-নালার ও সাগরের সহজ পরিবহন সুবিধা থাকায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে এ বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। স্থল ও জল পথেই পণ্যদ্রব্য বহন করা হতো। ' চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এ ব্যবসায়ের চিত্র অত্যন্ত চমৎকারভাবে চিত্রায়িত হয়েছে ।

হাট-বাজার-গঞ্জ-বন্দর

বাণিজ্য পণ্য বেচা-কেনার জন্য তৎকালীন সময়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সোনারগাঁও, সাতগাঁও, হুগলি, গৌড়, ও কলকাতায় বড় বড় বাণিজ্য বন্দর গড়ে ওঠে । বড় বড় পাল তোলা নৌকা ও জাহাজে করে এসব বন্দরে পণ্য আনা নেয়া করা হতো । 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' গোলাহাট, গুজরাট নগরের হাট, গৌড় বন্দর, সিংহল বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. 'এমন শুনিঞা ফুল্লরা গমন
গোলাহাটে বীরের ঠাঞি দিল দরশন।' –(পৃ- ৬২)

খ. 'সিংহল জাইতে সাধু পাইল আরতি
লহনা দুবলা মুখে পাইল সাণাতি।'

,,,

সিংহল চলিবে নাথ দীর্ঘ পরবাস
লাজ খণ্ড্যা কহি মোর গর্ভ ছয় মাস।' –(পৃ- ১১২-১৯৪)

বাণিজ্যে শাসক শ্রেণির হস্তক্ষেপ

তৎকালীন সময়ে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক সময় বণিকদের ওপর সামন্ত শাসকগণ কঠোর নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ করতেন। শাসকদের প্রয়োজন বা ইচ্ছার মূল্য দিতে গিয়ে বাণিজ্য বিকাশ ব্যাহত হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতিকে চন্দন কাঠের জন্য অসময়ে সিংহল এবং সোনার খাঁচার জন্য গৌড়ে যেতে বলা হয়–

'কৃতাঞ্জলি বলে সাধু রাজার চরণে
দক্ষিণ পাটনে পাঠাও অন্যজনে।
তোমার চরণে রায় করি নিবেদন
শিশু-গারি মধ্যে মোর নাহী অপেক্ষণ।
এ সাত পুরুষ মোর গেল বুহিতালে
সেই সব ডিঙ্গা আছে ভ্রমরার জলে।
কেমনে যাইব রাজা দক্ষিণ পাটন
পানি ভেদা হইআ ডিঙ্গা হইল পুরাতন।' –(পৃ- ১৯২)

বাণিজ্যপথে ডাকাত-দস্যুদের উৎপাত

তৎকালীন বাংলায় পর্তুগিজ-ফিরিঙ্গি, মগ জলদস্যুদের উৎপাতে জলপথের বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার উপক্রম হয়ে যায়। এছাড়া ডাকাত, লুটেরা ও জলদস্যুদের ভয়ও বর্তমান ছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতির সিংহল যাত্রার সময় এমন ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের উল্লেখ পাওয়া যায়–

'ফিরাঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমদের ডরে।' –(পৃ- ২৩৯)

রপ্তানি পণ্য

তৎকালীন বাংলা হতে বিচিত্র ধরনের অর্থকরী ফসল, শিল্পজাত দ্রব্য ও মসলাদ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। এসব পণ্য দ্রব্যের মধ্যে সুতিবস্ত্র, রেশমি কাপড়, মসলিন, যবক্ষার, লাক্ষা, আফিম, পাটজাত দ্রব্য, চাল, চিনি, মরিচ, তেল, ঘি, মাখন, শুটকি মাছ, পান, সুপারি, গন্ধদ্রব্য, মোম, আম, আদা, লবঙ্গ, দারুচিনি, কার্পাস তুলা, কবুতর, ছাগল, মহুয়া, ও হরতকির মতো প্রভৃতি দ্রব্য এশিয়া, আরব, ইউরোপ ও আফ্রিকায় রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতি সওদাগরের সিংহল যাত্রার সময়েও রপ্তানি পণ্য হিসেবে এসব সঙ্গে নিতে দেখা যায়–

' কান্দি কান্দি লইল বায়ন-নারিকল
ঘড়ায় পুরিআ চিনি লাড় গঙ্গাজল।
জোড়ে জোড়ে নিল খাসী জঝারিয়া ভেড়া
,,,
ভার দশ দধি কলা চাঁপা মর্তমান
দোখণ্ড সরস গুয়া বিড়াবিন্ধ্যা পান।
,,,
গছে বান্ধ্যা ফেটে নিল ঘৃত দশ ঘড়া
খান দশ সগল্লাথ খান দশ গড়া। –(পৃ- ২৫৩)

বস্তুবিনিময় পদ্ধতি

তৎকালীন সময়ে ব্যবসায়-বাণিজ্যে নগদ অর্থের পাশাপাশি বিনিময় প্রথার (Burter system) মাধ্যমেও পণ্য কেনা বেচা যেতো। সিংহল যাত্রার পূর্বে ধনপতি এরূপ দ্রব্য সঙ্গে নিয়েছিলেন-

'বদল আশে নানা ধন আন্যাছি সিংহলে

'জে দিলে জে বদল শুন কুতূহলে।
কুরঙ্গ বদলে তুরঙ্গ দিবে নারিকেল বদলে শঙ্খ
বিড়ঙ্গ বদলে লবঙ্গ দিবে সুণ্ঠের বদলে টঙ্ক।
কুরঙ্গ বদলে মাতঙ্গ দিবে পায়রা বদলে শুয়া
গাছফল বদলে জায়ফল দিবে বয়ড়ার বদলে গুয়া।
সিন্ধুর বদলে হিঙ্গুল দিবে গুঞ্জার বদলে পলা
পাট শোণ বদলে ধবল চামর কাঁচের বদলে নীলা।' -(পৃ- ২৫৪)

আমদানি পণ্য

তৎকালীন বাংলার বণিকগণ চীন, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল, মালয়, জাভা, আরব, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে চীনামাটির তৈজসপত্র, চন্দন কাঠ, হাঁতির দাঁত, ঘোড়া, ক্রীতদাস, চীনা বাদাম, স্বর্ণ-হীরা-মুক্তা প্রবালসহ নানা মূল্যবান পাথর আমদানি করতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতি গৌড় থেকে সোনার খাচা এবং সিংহল থেকে চন্দন কাঠ, লবঙ্গ, জয়ফল, হীরা, পুতি, কুমকুম, কস্তুরির মতো দ্রব্যাদি নিয়ে আসেন। রাজা বিক্রমকেশরীও ধনপতিকে সিংহল থেকে এরূপ দ্রব্য আনাতে গিয়ে বলেন-

'অবধান কর রায় নিবেদি তোমার পায়
চন্দন নাহিক এক তোলা।

,,,

গজশালে গজ মরে হাত্যারা আঙ্গাম করে
লবঙ্গ নাহিক জায়ফলে
সৈন্ধব বিহনে ঘোড়া শানে মরে জোড়া জোড়া
শঙ্খ নাহি বাজে পূজাকালে।
শঙ্খ পরিবারে তরে রামাগণ সাদ করে
পিত্তল ভূষণ ঘরে ঘরে।
ভাণ্ডার নাহিক নীলা মসার নিকষ শিলা
মানিক বিদ্রুম মুতিপলা।' –(পৃ- ১৯১-১৯২)

পরিবহন ব্যবস্থা

তৎকালীন বাংলারব্যবসায়-বানিজ্য চলতো স্থল ও জলপথে। স্থল পথে ঘোড়া-গাধা, উট, ষাঁড়, বলদে করে পণ্য বহন করা হতো। এছাড়া গরুর গাড়িও ব্যবহার করা হতো। তবে স্থল পথের তুলোনায় জলপথে পণ্য পরিবহন ছিল অধিকতর সহজ ও নিরাপদ। নদী ও সাগরে পালতোলা বৈঠা-দাঁড় সহযোগে বড় বড় নৌকা ও জাহাজে করে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে দূর-দূরান্তের দেশে পণ্য আনা নেয়া করা হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'- ধনপতি ও শ্রীমন্ত সাত নৌকা বোঝাই করে মালামাল নিয়ে সুদূর সিংহল যেতে সমুদ্র পথে পাড়ি জমায়–

ক. গরুর গাড়ি

'রাজার প্রধান দেখে ভাণ্ডার কাএস্থ লিখে
বলদে শকটে বহে ধন।' –(পৃ- ২০১৩)

খ. নৌকা

'নৌকায় দিআ ভরা গমনে করি তরা
শ্রীমন্ত চলিল সিংহলে ॥' –(পৃ- ২৩৪)

মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থা

তৎকালীন বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্য ও দ্রব্যাদি কেনা কাটায় সাধারণত স্বর্ণ, রূপা, তামার মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। এছাড়া কড়ির প্রচলনও ছিল। মুদ্রার মান হিসেবে টাকা, তঙ্কা, কড়ি, সিকি, আনি প্রচলিত ছিল। আবার 'দ্রব্য বিনিময়' বা 'Burter system'-র ব্যাপক প্রচলন ছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' মুদ্রা অর্থনীতি ব্যবস্থা ও বিনিময় অর্থনীতি ব্যবস্থার লেনদেন পরিলক্ষিত হয়। মুরারি শীলের আংটি কেনার ক্ষেত্রে এবং দুর্বলা দাসীর বাজার করতে গিয়ে-

ক. টাকা

'খন্যে হইতে হারে মাপ্যা দিল তাঁরে টাকা
অপকটে দিল ধন মুনা কৈল বাঁকা।' –(পৃ- ৬৭)

খ. তঙ্কা

'হাল পীছে এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা
পাটায় নিসান মোর ধর।' –(পৃ- ৭৬)

গ. কড়ি

'পসার লুটিআ ভাডু ভরয়ে চুপড়ি
জত দ্রব্য লয় ভাডু নাঞি দেয় কড়ি।' –(পৃ- ৮৪)

ঘ. কাহন

'মোর শিরে দায় জদি হয় ডাকাচুরি
পঞ্চাশ কাহন গণ আমার দিগারি।' –(পৃ- ২০৮)

ঙ. একই সঙ্গে মুদ্রা ও বিনিময় অর্থনীতি

'কেহ হলে পক্ষমূল্য (পাখি) দিব চারি পণ
কেহ বলে একখানি লহরে বসন।' –(পৃ- ১২৭)

গণনা-ওজন বা পরিমাপ পদ্ধতি

তৎকালীন সময়ে বাংলার গণনা পদ্ধতি হিসেবে– কুড়ি, গণ্ডা, বুড়ি, পণ, কাহন, আড়াই, তেহাই, শত, সহস্র, লক্ষ ও কোটি প্রভৃতির প্রচলন ছিল। অন্যদিকে পরিমাপ বা ওজনের মানদণ্ড হিসেবে- বিঘা, কাঠা, গজ, মণ, পোয়া, সের, রতির ব্যবহার ছিল। নল, বাঁশ বা এলাহি গজ, বাটখাড়া ও তুলাদণ্ডের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এছাড়া বেত বা বাঁশের তৈরি সের, ধামা ও কাঠার ব্যবহার আজো গ্রাম-বাংলায় অব্যাহত রয়েছে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব গণনা ও ওজনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. গণ্ডা

'করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি
দশ গণ্ডা পায় কড়ি।' –(পৃ- ৭৮)

খ. বুড়ি

'বকরি জবাই জথা মোল্লাকে দেই মাথা
দরে পায় কড়ি ছয় বুড়ি। –(পৃ- ৭৮)

গ. পণ

'অষ্টপণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরির কড়ি
মাংসের পিছিলা কড়ি ধরি দেয় বুড়ি।' –(পৃ- ৬৭)

ঘ. রতি

'রতি প্রতি হইল বীর দশ গণ্ডা দর
দুই ধানের কড়ি তাহে পাঁচ গণ্ডা কর।' –(পৃ-৬৬)

ঙ. তোলা

'অবধান কর রায় নিবেদি তোমার পায়
চন্দন নাহিক এক তোলা।' –(পৃ-১৯১)

চ. গজ

'প্রথমে করিল সজ দিঘে ডিঙ্গা শত গজ
আড়ে গজ বিংশতি প্রমাণ।' –(পৃ-২৩০)

ছ. কুড়ি

'জুড়ি দরে নারিকল কুলি করঞ্জা পানিফল
কাঁঠাল কিনিল দুই কুড়ি।' –(পৃ-১৫৮)

জ. বাটখারার ব্যবহার

'পঞ্জরের তরে সোনা দিলেন জুখিয়া
চলিল সাধুর সুত বিদায় হইআ।' –(পৃ-১২৯)

ঝ. কাঠার পরিমাপ

'ফুল্লরা দুকাঠা চালু মাগিল উধার
কালি দিহ বল্যা সই কৈল অঙ্গিকার।' –(পৃ-৫৫)

ঞ. সেরের পরিমাপ

'সই গৃহে চালু সের করিআ উধার
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আইসে কুড়িআর দুয়ার।' –(পৃ-৫৮)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালির সামাজিক জীবন

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' সমকালীন বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দর্পণ স্বরূপ। তাঁর এ কাব্য মূলত ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালি জাতির শৈল্পিক সামাজিক দলিলে পরিণত হয়েছে। কারণ তৎকালীন বাঙালি সমাজের এমন কোন বিষয় নেই, যার ওপর মুকুন্দরামের অর্ন্তভেদী দৃষ্টিপাত পড়েনি এবং যা তিনি বাস্তবসম্মত করে অঙ্কন করেননি। তাই সমাজ সচেতন মুকুন্দরামের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি সমকালীন কোন বিপ্লব-বিক্ষোভ, শোষণ-বঞ্চনা, দুঃখ-দৈন্য, আনন্দ-বেদনা, পঙ্ক ও পঙ্কজময় দিকসমূহ। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের' সামাজিক মূল্য ও উপযোগিতা মূল্যায়নকল্পে কয়েকজন সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

ক. A.K.Nazmul Karim

'The description of how the different functional groups within the village maintained a hierarchical relationship, is to be found in the writing of the Bengali poet Mukundaram, Who composed his epic probably in the sixteenth century (between 1578-1589 A.D) at Bardwan (in West Bengal). The picture drawn by Mukundaram is unique, because there is no other contemporary account giving the details of village life, as it existed before it was substantially affected by the impact of the Muslim rule.'[৫৫]

খ. P.N.Ojha

A great improvement came to be made made in this work by one of the greatest Bengali poet named Mukundaram, whose 'Chandimangal' is by far the most popular in its class and it touches almost all the important features of the chandi cult. Mukundaram was a realist and his poems depicted the various aspects of the social life of contemporary Bengal. One who reads his poems minutely; will find the Bengal home of the sixteenth century mirrored in his pages.[৫৬]

গ. J.N. Das Gupta

Let us remember ,,, Mukumdaram's account of the foundation of a new town in India, and the description which follows of the various quarters of that town, affording as it does valuable materials for the reconstruction of the social and economic history of Bengal.[৫৭]

সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, সমকালীন বাংলা ও বাঙালির সমাজ জীবনের নাড়ি-নক্ষত্র মুকুন্দরাম অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ও বস্তুনিষ্ঠভাবে উপস্থাপন করেছেন। সমকালীন সমাজ জীবনের বিভিন্ন প্রান্ত সমূহের আলোচনা নিম্নরূপ-

সামন্তবাদী শাসন ও শোষণ

সমকালীন বাঙালি সমাজ ছিল মূলত সামন্তবাদী শাসন ও শোষণ দ্বারা পুষ্ট ও পিষ্ট। রাজা বা সুলতান ছিলেন এ শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ ক্ষমতার ব্যক্তি। তিনি রাজ্যের শুধু ভূমির মালিক নন, বরং সকল প্রজার দণ্ডমুণ্ডের

অধিকারী। তাই ভূমি ও ভূমির সঙ্গে সম্পৃক্ত কৃষক প্রজার ওপর নির্যাতন অব্যাহত রাখতেই সামন্ত শাসকগণ গড়ে তোলেন তাদের অনুগত আমলা শ্রেনি। এ আমলারাই (জায়গীরদার, জমিদার, ডিহিদার, সরকার, পোদ্দার, তালুকদার, নিয়োগী, চৌধুরী, আমিন, মণ্ডল প্রমুখ) ছিলেন মূলত সামন্ত শাসকের প্রতিনিধি। এ প্রতিনিধিগণের লক্ষ্যই ছিল- যে ভাবেই হোক সামন্তরাজকে সন্তুষ্ট রেখে, তার দাবি-দাওয়া পূরণ করে চলা। এ জন্য একমাত্র পথ ছিল, কৃষক প্রজার ওপর রাজস্ব, নানা রকম কর বা খাজনা আরোপ করে তা আদায় করা। যেহেতু ভূমিই ছিল সামন্তবাদের শক্তি ও সমবৃদ্ধির প্রধান উৎস, সেহেতু এ সম্পদকে (কৃষককে নয়) রক্ষা করাই ছিল আমলাদের মৌল কর্ম। কারণ এ ভূমির ওপর শুধু বাংলার অর্থনীতি (কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য) নির্ভর করতো না, বরং একাধারে নির্ভর করতো সামন্তশাসকের ভোগ-বিলাস, এবং আমলা শ্রেণির প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা। তাই দেখা যায়, নির্ধারিত রাজস্ব বা করের তুলোনায় জুলুম করে বেশি আদায় করা হতো এবং নানা রকম ঘুষ-দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে আমলা শ্রেণি ফুলে ফেঁপে ওঠেছিল। কৃষক প্রজার এ প্রতিকারহীন দুঃখ দুর্দশা ও গগন বিদারী আর্তনাদের ধ্বনি পৌছাতো না সামন্ত রাজার কানে। আবার কৃষক প্রজা যাতে ঘর বাড়ি, খেত-খামার ছেড়ে পালিয়ে যেতে না পারে, তার জন্য রাখা হতো পর্যাপ্ত প্রহরামূলক ব্যবস্থা।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও' এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আফগান শাসনের অবসান ও মুঘল শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যবর্তীকালীন সময়ে বাংলার সামাজিক গোলযোগের কারণে রাজস্ব আদায়কারী ডিহিদার, পোদ্দাররাই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতায় এরা এতো বেশি ক্ষমতাধর, দুর্নীতিপরায়ণ ও অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠে যে, যাদের কাছে তালুকদার-নিয়োগীরা পর্যন্ত অসহায় হয়ে পড়ে। সিলিমবাজ তালুকের নিয়োগী গোপীনাথ নন্দীও ডিহিদার মাহমুদ শরীফের কূটকৌশলে বন্দী হন। এতে করে এ তালুকের প্রজাদের ওপর ঘোর দুর্যোগ নেমে আসে। এমন দুর্দশার ভুক্তভোগী স্বয়ং মুকুন্দরাম তাই লিখেছেন।

'সহর সেলিমবাজ তাহতে সুজনরাজ
নিবসে নিউগি গোপীনাথ
তাহার তালুকে বসি   দামিন্যায় চাষ চষি
মিরাস পুরুষ ছয়-সাত ।

,,,

প্রভু গোপীনাথ নন্দী   বিপাকে হইল বন্দি
হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে।
জানদার সভার আছে   প্রজাগণ পালায় পাছে
দুয়ার চাপিয়া দিল থানা ।
প্রজা হইল বিকলিত   বেচে ধান্য গোরু নিত্য
টাকা দ্রব্য দশ দশ আনা ।
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ   চণ্ডিবাটি জার গাঁ
যুক্তি কইল গাম্ভারির সনে
দামিন্যা ছাড়িয়া জাই   সঙ্গে রামা নন্দী ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে ।'-(পৃ-০৩)

এভাবে ডিহিদার, সরকার, পোদ্দার ও জমাদারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে মুকুন্দরামকে পিতৃপুরুষের ভিটা-বাড়ি পরিত্যাগ করে রাতের আঁধারে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। এরা প্রজাদের জমি বণ্টন করার সময় ২০ কাঠার স্থলে

১৫ কাঠায় ১ বিঘার বন্দোবস্ত করতো। আবার অনুর্বর খিল ভূমিকে আবাদী বলে চালিয়ে দিতো এবং ১ টাকার জিনিস ১০ আনায় কেনার সময়ও টাকাপ্রতি আড়াই আনা কম দিতো। এদের শোষণ-নির্যাতন ও দুর্নীতির মতো অপকর্মের কথা বলতে গিয়ে মুকুন্দরাম বলেছেন-

'অধর্মী রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে
খিলাত পাইল মামুদ সরিপ
উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরী
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাঞি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হইল কাল খিলভূমি নিয়ে লিখে নাল
বিনি উবগায়ে খায় ধুতি
পোতদার হইল যম টাকা আড়াই আনি কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।
ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাঞি কেনে। -(পৃ- ০৩)

এ আমলা শ্রেণির মতো সামন্ত শাসকগণও স্বভাবে ছিলেন স্বৈরাচারী, অত্যাচারী ও পরপীড়ক। এ সামন্ত শাসকগণ শাসনকাজে মনোযোগ না দিয়ে, বরং ভোগ বিলাসে মত্ত থাকতো এবং নিজ খেয়াল খুশি চরিতার্থ করতে গিয়ে কৃষক প্রজার ও অধীনস্ত কর্মচারীর ওপর নির্যাতন-জেল-জুলুম চালাতো। এমন দৃশ্য দেখা যায় কলিঙ্গরাজের ক্ষেত্রেও। এ কলিঙ্গরাজের দুঃশাসন প্রসঙ্গে কালকেতু বলেছে-

'হিত উপদেশ বলি শুনহ বেভার
নিকটে কলিঙ্গ রাজা বড়ই দুর্বার।
আমার বচনে চল বড় পাবে সুখ
রাজার গোচর হইলে পাবে বড় দুঃখ। -(পৃ- ৬৩)

এরূপ হঠকারী, অত্যাচারী স্বভাব পরিলক্ষিত হয় সিংহল রাজা সালবাহনের চরিত্রেও। তিনি ধনপতি ও শ্রীমন্তকে কমলে কামিনী দেখাতে না পারার অপরাধে তাৎক্ষণিকভাবে বন্দী করে অত্যাচার করেন এবং সৈন্য বাহিনী দিয়ে পণ্যবাহী সাত নৌকা লুণ্ঠন করান-

'আনিঞা নায়ের দড়া বান্ধে সাধে পদমোড়া
কোটালে গছায় বীরবর
তেজি দণ্ড কেরয়ালে ঝাঁপ দিআ পড়ে জলে
নাইআ পাইক পরানে কাতর।
,,,
রাজার প্রধানে দেখে ভাণ্ডারি কায়েস্ত লিখে
বলদ শকটে লয় ধন।
জে জন পলাইআ জায় তাড়াতাড়ি ধরে তায়
বলে লয় বসন ভূষণ
ধরিয়া সাধুর সঙ্গী লবণ নাকানি চিঙ্গি
দিয়ে কেড়ে লয় সর্বধন।' -(পৃ- ২৫৮)

আবার চণ্ডী দেবীর বরে ব্যাধ কালকেতু গুজরাট নগরের রাজা হবার পরে সেও ভোগ-বিলাসী হয়ে পাশা খেলে সময় কাটাতে শুরু করে। নগর ও প্রজার নিরাপত্তা বিধানে তাঁকে সক্রিয় বা তৎপর হতে দেখা যায় না, বরং সে-

'সভা মাঝে বসিআ দশ দশ বলিআ'
মহাবীর পাশা খেলে।' –(পৃ- ৮৯)

অন্যদিকে গুজরাট বনের পশু রাজ্যের বিষয়টিও মুকুন্দরামের শিল্প শৈলীর বিশ্বস্ততায় পশু না থেকে মানবে পরিণত হয়েছে। এ পশু রাজ্যের বিশৃঙ্খলা মূলত সামন্ত শাসিত মানব রাজ্যের বিপর্যয়ের প্রতীকী চিত্র বা ইঙ্গিত। ব্যাধের আক্রমণে পশু রাজ্যে বিপর্যয় নেমে আসলেও পশুরাজ সিংহের কোন মাথা ব্যথা নেই। বরং সে রমণী সুখলীলায় মগ্ন ও মত্ত। তাই নির্যাতিত পশুরা প্রতিবাদ করে রাজার উদ্দেশ্যে বলেছে-

'পাত্র অধিকারী না সুনে গোহারি'
বিপাকে তেজি জীবন।
রাণীগণ সঙ্গে থাক নানা রঙ্গে
না কর দেশের বিচার।' –(পৃ- ৪৬)

সৈন্য-সামন্ত

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থাপনায় সামন্ত শাসকরা তাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি বজায় রাখতে বিভিন্ন শ্রেণির সৈন্য-সামন্ত লালন পালন করতেন। এসব স্থল ও নৌবাহিনীর মধ্যে আবার বিভিন্ন বিভাজন ও পদাধিকারী সৈন্য থাকতো। প্রধান সেনাপতির অধীনে প্রাদেশিক গভর্নর, অশ্ব বাহিনীর প্রধান, হস্তী বাহিনীর প্রধান, কতোয়াল, পাইক, তীরন্দাজ, বরকন্দাজ, গোলন্দাজ ও লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তোলা হয়। রাজস্ব ও প্রশাসনিক দফতর ব্যতীতও যুদ্ধ মোকাবেলা ও শান্তি প্রতিষ্ঠায় এসব সৈন্য সামন্ত প্রতিপালন করা হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' উজানিরাজা বিক্রমকেশরী, সিংহলরাজ সালবাহন, কলিঙ্গরাজ, গুজরাট প্রধান কালকেতু, বণিক ধনপতি ও লক্ষাপতি এরূপ সৈন্যবাহিনী লালন-পালন করতে দেখা যায়-

কলিঙ্গ রাজার সৈন্য সামন্ত

'পাত্রের বচনে রহে কলিঙ্গন পতি
আগুদলে যুবরাজ ধায় লঘুগতি।
ডানি দিগে ধায় কোটাল ভীমরথ
রাজার জামাতা ধায় সেনা শতশত।

,,,

পাইক প্রধান তিন ভাই আগু রণ
বাণ বৃষ্টি করে জেন জল বরিষণ।
কামানিঞা কামান পাতিল থরথরে
তাল ফল সম গোলা পেলিল ভিতরে। –(পৃ- ৮৮-৮৯)

কৃষক প্রজার দুরবস্থা

ভক্ত কালকেতুকে রক্ষার জন্য দেবী চণ্ডী কলিঙ্গনগরে অসময়ে বন্যা-প্লাবনের দুর্যোগ ডেকে আনলে কৃষক প্রজার দুঃখ-দুর্দশা বহুগুণে বেড়ে যায়। কারণ কৃষকের ফসল হোক বা না হোক এ বিষয়টি জমিদার বা রাজার দেখার বিষয় নয়, বরং তিনি কড়ায় গণ্ডায় তা কৃষকের কাছ থেকে তুলে নেবেন। গরীব কৃষক বাধ্য হয়ে ঘর-বাড়ি, গরু-বাছুর ও বীজ ধান বিক্রি করে জমিদার বা রাজার রাজস্ব শোধ করে। অন্যথায় জেল-জুলুম এমনকি স্ত্রী-

কন্যার ওপর নির্যাতন এড়ানো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। এ রাজস্ব প্রদানের দুশ্চিন্তায় দুর্দশাগ্রস্ত বুলান মণ্ডল তাই বলেছেন-

'বুলন মণ্ডল বলে শুন মোর ভাই
হাজিল বিলের শস্য তারে না ডরাই।
মসহাত করিল রাজা দিআ খাটদড়ি
প্রথম আঘনে চাহি তিন তেহাই কড়ি।' –(পৃ- ৭৬)

সামন্ত শাসকের উদারতা

যদিও সামন্ত শাসকেরা স্বভাবে ছিলেন স্বৈরাচারী ও পর-পীড়ক, তথাপি কতিপয় শাসকের মাঝে মায়া-মমতা, প্রজাবাৎসল্য বিদ্যমান ছিল। চণ্ডীভক্ত কালকেতু গুজরাট নগর নির্মাণ করে শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় কৃষক প্রজার বহু সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। সমকালের মাপকাঠিতে এটি অনেকটা ব্যতিক্রমী ঘটনা। তবে নতুন রাজ্যে প্রজাদেরকে বসবাসে উৎসাহ দানে অথবা লেখকের জীবন বঞ্চনাজাত আশাবাদের অভিব্যক্তি হয়তো কালকেতুর এ নীতির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তারপরও বলা যায়, ন্যায় পরায়ণ ও প্রজাবৎসল উদার সামন্ত রাজা তৎকালেও অবশিষ্ট ছিল; যারা প্রজার কল্যাণ-মঙ্গল-জনসেবায় তৎপর থাকতেন। এ উদারতা-পরার্থপরতা ছিল সামন্ত রাজাদের চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও মহানুভবতারই বহিঃপ্রকাশ। তাই কালকেতু প্রজাদের উদ্দেশ্যে বলেছে-

শুন ভাই বুলন মণ্ডল
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
কানে দিব হেম কুণ্ডল।
আমার নগরে বৈস জত ভূমি চাষ চষ
সাত সন বই দিয় কর।
হাল পীছে এক তঙ্কা না করিহ কারে শঙ্কা
পাটায় নিসান মোর ধর।
নাঞি দিহ বাউড়ি রয়্যা বস্যা দিহ কড়ি
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।
সেলামী বাঁসগাড়ি নানা বাবে জত কড়ি
নাহি দিহ গুজরাট দেশে ॥ –(পৃ- ৭৬)

যুদ্ধ ও সামাজিক বিপর্যয়

যুদ্ধ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা সবযুগের সমাজ জীবনেই অভিশাপ, অশান্তি ও বিপর্যয় থেকে এনেছে। যেহেতু সামন্তবাদী শাসকেরা ছিলেন স্বৈরাচারী ও পরপীড়ক, সেহেতু এ সামন্তবাদী সমাজে যুদ্ধ ছিল অবশ্যম্ভাবী। কারণ, সামন্ত শাসক নিজ প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠা রক্ষা করতে প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীকে দমন করতে সর্বদা সজাগ-তৎপর থাকতেন। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও' গুজরাট নগরে কালকেতুর উত্থানে কলিঙ্গরাজ শঙ্কিত ও ক্রোধান্বিত হয়ে কালকেতুকে দমন করতে যুদ্ধের আয়োজন করেন। আবার বনের শান্তি, শৃঙ্খলা, জীবন ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষায় কালকেতুর বিরুদ্ধে পশুরাজের যুদ্ধে যে সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসে, তা ছিল অকল্পনীয়। এ যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি, ধ্বংসযজ্ঞ ও মৃত্যু সমাজ জীবনে বয়ে আনে বিপর্যয়, বিভীষিকা, কান্না ও আর্তনাদ। এ যুদ্ধের অভিশাপে বিপর্যস্ত পশু-পাখির যে আর্ত হাহাকার তা ছিল মূলত সামন্তশাসিত গণমানবের প্রতিকারহীন বিপর্যয়ের প্রতীকী চিত্র। সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় যুদ্ধ ছিল অনিবার্য অভিশাপ; যা মুহূর্তের মধ্যেই সামাজিক বিপর্যয় ডেকে আনতো। সামন্ত প্রভুর ভুলের

মাশুল ও খেয়াল খুশির মূল্য— জীবন দিয়ে অশ্রু দিয়ে জনগণকে প্রকৃত অর্থে নারীকেই পরিশোধ করতে হতো। তাই বিভিন্ন পশু-পাখি আর্তনাদ করে দেবী চণ্ডীর কাছে বলেছে-

'প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক।

,,,

উইচারা খাই পশু নাম ভল্লুক
নিউগি চউধরি নহি না করি তালুক।
সাতপুত্র মারিলেক বান্ধি জালাপাশে
সবংশে মজিলাঙ মাতা তোমার আশ্বাসে।

,,,

হস্তী বলে অতি বড় মোর কলেবর
লুকাইতে স্থল নাহি বীরের গোচর।
কি করি কোথাএ জাই কোথা গেলে তরি
আপনার দন্ত দুটা আপনার অরি।
কেনি হেন জর্ম বিধি দিল পাপ বংশে
হরিণ ভুবন বৈরি আপনার মাঁসে।' –(পৃ- ৪৯-৫০)

বন্যা বিপর্যয়

তৎকালীন বাঙালি সমাজে যুদ্ধের মতো বন্যাও বিপর্যয় ডেকে আনতো। কারণ এ বাংলা অঞ্চল নদ-নদী বেষ্টিত ও জল প্লাবিত এলাকা হবার দরুণ বন্যায় সহজেই আক্রান্ত হয়ে শস্য, ঘর-বাড়ি ও জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি ও বিনষ্টি ঘটাতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' কলিঙ্গরাজ্যে হঠাৎ বন্যা দেখা দিলে কৃষক প্রজার দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না। তাই কলিঙ্গরাজ, বুলন মণ্ডল ও ভাড়ুদত্তসহ অনেকেই দুঃখ ও আক্ষেপ করে বলেছে-

ক. 'দুঃখিত কলিঙ্গরায় হাথি ঘোড়া ভ্যাস্যা যায়
অট্টলায় উঠে রামাগণ
মহলে প্রবেশে জল রহিতে নাহিক স্থল
খাট পালঙ্গ ভাসে নানা ধন।' –(পৃ- ৭৬)

খ. 'বিষাদ ভাবিআ প্রজা করয়ে ক্রন্দন
দুই চক্ষু হইল সভার ধারা শ্রাবণ।

,,,

কেহো কেহো বলে ধন থুইয়াছিলাঙ চালে
চালের সহিত ধন ভাস্যা গেল জলে।
দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল
সভে ভাস্যা গেল মোর কাপাস সাত ডোল।' –(পৃ- ৭৬)

বৃত্তিজীবী ও বর্ণজীবী শ্রেণি

সমকালীন সামান্তবাদী বাঙালি সমাজ ছিল মূলত চতুর্বর্ণীয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) ও চতুর্বর্গীয় (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) আদর্শ দ্বারা লালিত ও প্রতিষ্ঠিত। সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের বর্ণজীবী বা বৃত্তিজীবীরাই মূলত ছিল সামাজিক শ্রেণি স্তরের প্রতিনিধি। এ প্রসঙ্গে ডি.ডি. কোশাম্বী বলেছেন–

‘Caste is class on a primitive level of production.’[৬০]

এ জাত বা বর্ণ প্রথা হচ্ছে বাঙালির সবচেয়ে আদি ও স্বতন্ত্র সামাজিক গোষ্ঠী পরিচিতি; যা জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয়। জাত বর্ণভুক্ত মানুষেরা ঐতিহ্যগত বৃত্তি বা পেশার সঙ্গেই জড়িত থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় বর্ণবিন্যাস ও শ্রেণিবিন্যাস প্রায় সমার্থক হয়ে পড়েছিল। বংশগত পরিচয় ও বর্ণের ওপরই সমাজে বৃত্তি বা পেশা নির্বাচন এবং নিয়ন্ত্রিত হতো। এ বর্ণ ও বৃত্তিই ছিল এ বাংলার সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের প্রধান ভিত্তি। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণ নির্ভর আর বর্ণ ছিল জন্মনির্ভর। বৃত্তি যেখানে বর্ণ অনুযায়ী, সেখানে বর্ণ ও শ্রেণি একে অন্যের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিবে এবং শ্রেণির মর্যাদাও সেই সমাজের বর্ণ ও বৃত্তি অনুযায়ী হইবে তাহা বিচিত্র নয়।[৬১]

এ বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথায় সমাজের শ্রেণি কাঠামোতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অবস্থান ছিল সর্বোচ্চে। ব্রাহ্মণরা সামাজিক কাঠামোর সকল ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। ব্যবসায়ী বৈশ্যরা ছিল যোদ্ধা ক্ষত্রিয়দের নীচে। আর শূদ্র ও অন্ত্যজ-অস্পৃশ্যরা শুধু বর্ণ হিসেবেই নয়, অর্থনৈতিক কর্মানুযায়ী বা বৃত্তি হিসেবেও ছিল সমাজের পতিত বা ব্রাত্য শ্রেণির পর্যায়ে। এদের প্রায় সকলেই ছিল দিনমজুর, ভূমিহীন ও অন্যান্য পেশার সমাজ শ্রমিক বা সেবক। মধ্যযুগীয় বাংলায় সমাজ কাঠামোর বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়ায় এরূপ–

একপক্ষে ব্রাহ্মণ ও তাদের সমর্থক উচ্চশ্রেণি, অপর পক্ষে শূদ্র-অন্ত্যজ তথা নিম্নশ্রেণি ব্যাপক অর্থে সমাজ কাঠামো শোষক ও শোষিত শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। বর্ণ বিন্যাসে বণিকরা ব্রাহ্মণ্য সমাজের বাইরে থাকলেও শ্রেণি অবস্থানে তারা উচ্চ স্তরেই স্থান পেত।[৬২]

‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী অত্যন্ত দক্ষতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে মধ্যযুগের বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সমাজের সর্বস্তরের বৃত্তি ও বর্ণজীবী মানুষের চিত্র উপস্থাপন করেছেন। এদের মধ্যে– ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, বণিক, মোল্লা, কাজি, পীর, জোলা পুরোহিত, জ্যোতিষী, পণ্ডিত, সন্নাসী, ভিক্ষুক, মহাজন, বৈদ্য, গোপ, তেলি, চাষী, কামার, কুমার তাম্বুলি, তাঁতী, মালী, বারুই, নাপিত, মোদক, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক, মণিবণিক, কাঁসারি, সুবর্ণ বনিক, কলু, জেলে, ধোপা, দরজি, শিউলি, ছুতার, পাটনি, পসারী, জাতিজীবী (জায়াজীবী), চামার, ডোম, ময়রা, চালুয়াতি, রঙরেজিনী, পিঠারি, কাবাড়ি, হাজাম, গয়সাল, ঘটক, দাই, দাসী ব্যাধ, ওঝা, গোয়ালিনী, কামলা, চাকর, চোর, ডাকাত, বাটপার, সাপুড়ে, নর্তকী, বাইজি, বারাঙ্গনা, কচুয়ান, সহিস, মাহুত, উজির, রায়জাদা, তালুকদার, সরকার, ডিহিদার, পোতদার, জমাদার, কতোয়াল, পাইক, সেনাপতি, মাঝি, ও অন্যান্য সৈনিক অন্যতম।

হিন্দু বৃত্তিজীবী শ্রেণি

মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ চতুর্বর্ণীয় হিন্দু সমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছাড়াও বহু বৃত্তিজীবী শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালকেতুর গুজরাট নগর নির্মাণ ও আগত অধিবাসী সূত্রে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের পরিচয় মেলে।

ব্রাহ্মণ

'পাইয়া বীরের পান বৈসে জত কুলস্থান
বীরের নগরে বিপ্রগণ
শাস্ত্র বিচার করে আশিষ করিআ বীরে
নিত্য পায় ভূষণ চন্দন।' –(পৃ- ৭৯)

পুরোহিত

'ব্রাহ্মণ বসিল পীঠে বেদমন্ত্র পড়ি ঘটে
গণেশ করিল আবাহন
পূজি পঞ্চ উপচারে পূজে অন্য দেবতারে
শুভক্ষণে গন্ধাধিবসান।' –(পৃ- ৪৩)

পণ্ডিত বা অধ্যাপক

'আসিষ করিতে আইলা দনাই পণ্ডিত
প্রণাম করিআ সাধু করিল ইঙ্গিত।' –(পৃ- ১২১)

জ্যোতিষী বা গণক

'গৃহ ওঝা করে মীন রাশ্যের কল্যাণ
সভাবিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাজিখান।
সূর্য নমস্কার শাস্ত্রে কর অবগতি
অদ্য রবিবার ছয় দণ্ড ষষ্ঠী তিথি।' –(পৃ- ১২১)

ঘটক ব্রাহ্মণ

'সাধুর আদেশ পায় ইছানি নগর জায়
ঘটক পণ্ডিত জনার্দন
অধিবাসের লইআ সাজ চলিল ঘটক রাজ
কুলীন পণ্ডিত পুরোহিত।' –(পৃ- ১২১)

অগ্রদানী ব্রাহ্মণ

'বৈদ্যক জনের পাশে অগ্রদানিগণ বৈসে
নিত্য করে রোগীর সন্ধান
রাজকর নাই দেই বৈতরণী ধেনু নেই
হেমগর্ভ তিলে লয় দান।' –(পৃ- ৮১)

ক্ষত্রিয়

'ক্ষেত্রি বৈসে ভানুবংশ সর্বলোক অবতংস
চন্দ্রবংশ বৈসে মহাজন'-(পৃ-৮০)

কায়স্থ

'ভেট লইআ দধি মাছ ঘৃত কুম্ভে বান্ধি গাছ
কায়েস্থ আইলা মহাজন
প্রণাম করিআ বীরে নিজ নিবেদন করে
সুখী হইলা ব্যাধের নন্দন।' –(পৃ- ৮১)

বৈশ্য

'বৈসে বৈশ্য মহাজন কৃষ্ণ সেবে অনুক্ষণ
কৃষি কর্ম করে গোরক্ষণ
কেহ কলন্তর লয় কেহ বৃষে ধান্য বয়
পালয়ানী বেচে কোন জন।'-(পৃ-৮০)

শূদ্র

'তুমি শিশুমতি আমি বৃদ্ধ শূদ্রজাতি
এই হেতু রায় তোমায় না কৈল প্রণতি।'-(পৃ-২৮৫)

বণিক

'জত সাধু ছিল রিনী ইবে তারা হইল ধনী
সম্পদে মাতিআ হৈল ভোলা।
বিংশতি বৎসর হইল জয়পতি দত্ত মইল
ডিঙ্গা ভর্য্যা আনিত চন্দন
আর জত সদাগর তিলেক না ছাড়ে ঘর
না পাই চন্দন অন্বেষণ।'-(পৃ-১৯১)

বৈদ্য বা চিকিৎসক

'পরিআ উজ্জ্বল ধুতি কাখে করি লইআ পুথি
গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে।
জার দেখে সাধ্য রোগ ঔষধ করএ যোগ
বুকে ঘা মারিআ আগে ধায়।'-(পৃ-৮১)

মহাজন

'বান্যা বড় দুঃশীল নাম মুরারি শীল
লেখা-জোখা করে টাকা কড়ি
পাইআ বীরের সাড়া প্রবেশে ভিতর বাড়া
মাংসের ধারী ডের বুড়ি।'-(পৃ-৬৬)

তেলি

'তেলি বৈসে কত জনা কেহ চাষী কেহ ঘনা
কিনিঞা বেচয়ে কেহ তেল।'-(পৃ-৮১)

কামার

'কামার পাতিয়া শাল কুঠারি কোদাল ফাল
গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরাখি সেল'-(পৃ-৮০)

তাম্বুলি

লইআ গুবাক পান বৈসে তাম্বুলিগণ
মহাবীরে নিত্য দেই বিড়া।'-(পৃ-৮১)

কুমার

‘কুম্ভকার গুজরাটে হাড়ি কুড়ি গড়ে পিটে
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া।’-(পৃ-৮২)

তাতি

‘শত শত এক জায় গজুরাটে তন্তুবায়
ভুনি খুনি ধুঁতি বোনে গড়া।’ -(পৃ-৮২)’

মালী

‘মালী বৈসে গজুরাটে মালঞ্চে সদাই খাটে
মালা মউর গড়ে ফুলঘর।’-(পৃ-৮২)

বাড়ুই

বারুই নিবসে পুরে বোরজ নির্মাণ করে
মহাবীরে নিত্য দেই পান।’-(পৃ-৮২)

নাপিত

‘নাপিত বইসে তথা কক্ষতলে করি কাতা
করে ধরি রসান দর্পণ।’-(পৃ-৮২)

মোদক

‘মোদক প্রধান রানা করে চিনি কারখানা
খণ্ড নাড়ু করয়ে নির্মাণ।’-(পৃ-৮২)

গন্ধবণিক

বৈসে জত গন্ধবান্যা গন্ধ বেচে ধূপধুনা
পসরা করিআ চলে হাটে।-(পৃ-৮২)

শঙ্খবণিক

‘শঙ্খ বান্যা কাটে শঙ্খ কেহ তার করে রঙ্গ
মণিবান্যা বসে গুজরাটে।’-(পৃ-৮২)

কাঁসারি

‘কাঁসারি পাতিআ শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
বাটী ঘটী বটলই শিপ।’-(পৃ-৮২)

সাপুড়ে

‘সাপুড়া চুনাতি বাটা উরমাল ঘাঘর ঘাটা
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ।’ -(পৃ-৮২)

সুবর্ণ বণিক

‘সুবর্ণ বণিক বৈসে রজত কাঞ্চন কষে
পোড়ে ফোড়ে দেখিআ সংশয়’-(পৃ-৮২)

গোয়াল

‘পল্লব গোপ বৈসে পুরে কান্ধে ভার বিকী করে
বন ভাঙ্গ্যা বসায় বাথান।’-(পৃ-৮২)

বাইতি

‘বাইতি নিবসে পুরে নানাবিধি বাদ্য করে
পুরে ভ্রমে মজুরি বিকনি।’ –(পৃ-৮২)

বাগদি

‘বাগদি নিবসে পুরে নানা অস্ত্র লইয়া করে
দশ বিশ পাইক করি সঙ্গে।’ –(পৃ-৮২)

ধোপা

‘নগরে করিআ শোভা নিবসে অনেক ধোবা
দড়ায় শুখায় নানা বাসে।’ –(পৃ-৮৩)

দরজি

‘দরজি কাপড় শিঞে বেতন করিআ জিঞে
গুজরাটে বৈসে এক পাশে।’ –(পৃ-৮৩)

শিউলি

‘শিউলি নিবসে পুরে খাজুর কাটিআ ফিরে
গুড় করে বিবিধ বিধানে।’ –(পৃ-৮৩)

ছুতার বা কাঠ মিস্ত্রি

‘ছুথার নগর মাঝে ছিড়া কুটে মুড়ি ভাজে
কেহ করে চিত্র নির্মাণে।’(পৃ-৮৩)

পাটনি

‘পাটনি নগরে বৈসে রাত্রি দিন জলে ভাসে
পার করি লয় রাজকরে।’ –(পৃ-৮৩)

ব্যাধ বা শিকারী

‘দুরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজার ঢোল
জাতিজীব বসিল কেয়লা।’ –(পৃ-৮৩)

ডোম

‘বিঅনি চালুনী ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা
কির্তি করে হরষিত চিতে।’–(পৃ- ৮৩)

চামার

‘মোজা পানঞি জিন নিরমায়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে।’ –(পৃ-৮৩)

চণ্ডাল

'চণ্ডাল নিবসে পুরে লবণ বিক্রয় করে
পানিফল কেশুর পসারে।' –(পৃ-৮৩)

মাঝি

'সঙ্গে শত শত নায়্যা আইনু অজয় বায়্যা
উপনীত ইন্দ্রানির ঘাটে।' –(পৃ-২১০)

মুসলিম বৃত্তিজীবী শ্রেণি

সমকালীন মুসলিম সমাজেও হিন্দুদের মতো বর্ণ বৈষম্য ছিল। আশরাফ ও আতরাফ শ্রেণিতে সমাজ বিন্যস্ত ছিল। শেখ, সৈয়দ, মুঘল, পাঠান, খন্দকার- এসব উপাধিধারী ব্যক্তিগণ বংশগত আভিজাত্য-আত্মঅহংকার বোধ করতেন। যদিও ইসলামে সাম্যের কথা বলা হয়েছে; তথাপি এ বাংলায়ও আভিজাত্যবোধ, বংশ কৌলিন্য তৎকালে বিদ্যমান ছিল। এর জন্য হিন্দু সমাজের বর্ণ প্রথা, কৌলিন্য প্রথা কিছুটা হলেও দায়ী । 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' মুসলিম সমাজের কিছু পেশাজীবী শ্রেণির পরিচয় মেলে যারা কালকেতুর গুজরাট নগরে গিয়ে বসতি স্থাপন করে–

কাজী

আইসে চড়িআ তাজি সৈয়দ মোল্লা কাজী
খইরত দেয় বীর বাড়ী
পুবের পশ্চিম পাটি বলায় হাসন হাটী
এক মুদনিয়া ঘর- বাড়ী ।-(পৃ-৭৮)

মোল্লা

মোল্লা পড়াইআ নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িআ।
করে ধরি করা ছুরি মুরগী জবাই করি
দশগণ্ডা দরে পায় কড়ি ।-(পৃ-৭৮)

জোলা

'রোজা নামাজ না জানিঞা বোলাইল গোলা
তাসন করিআ কেহো নাম ধরে জোলা।'-(পৃ-৭৮)

পিঠারি

'বলদে বহিয়া ধান বলাইল মুগরি
পিঠা বেচিয়া নাম বলাইল পিঠাহারি ।'-(পৃ-৭৮)

কাবাড়ি

'মৎস্য বেচিয়া নাম বলাইল কাবাড়ি
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখে দাড়ি ।'-(পৃ-৭৮)

কাগজি

'কাগজ কুটিআ নাম বলায় কাগতি
কলন্দর হইআ কেহো ফিরে দিবারতি ।'-(পৃ-৭৯)

হাজাম

'সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম
সুন্নৎ করিয়া নাম ধরয়ে হাজাম ॥' –(আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা. পৃ-৯৪)

রঙরেজিনী

'রঙ্গরেজ নাম ধরে রঙ্গন করিয়া ।
ধরিয়া হালান নাম কুদ্দুর ধরিয়া ॥ -(পূর্বোক্ত; পৃ-৯৪)

কসাই

'গো মাংস বেচিয়া নাম ধরয়ে কসাই
এই হেতু যমপুরে তার নাই ঠাঁই ॥' -(পূর্বোক্ত;পৃ-৯৪)

গোলা

'রোজা নামাজ না করিয়া কেহ হৈল গোলা ।'-(পূর্বোক্ত;পৃ-৯৪)

মুকেরি

'বলদে বাহিয়া নাম ধরাল্য মুকেরি ।'-(পূর্বোক্ত;পৃ-৯৪)

গরসাল

'হিন্দু হইয়া মুছলমান হৈল গরসাল।' -(পূর্বোক্ত;পৃ-৯৪)

কলন্দর

'নানা স্থানে বুলে কেহ কলন্দর হৈয়া ।'-(পূর্বোক্ত;পৃ-৯৪)

দরজি

'কাটিয়া কাপড় সিয়ে দরজির ঘটা ।'-(পূর্বোক্ত;পৃ-৯৪)

তীরকর

'তীরকর হয়্যা কেহ নির্ম্মাণয়ে শর ।'-(পূর্বোক্ত;পৃ-৯৪)

সানাকার

'সানা বান্ধিয়া ধরে সানাকার নাম ।'-(পূর্বোক্ত;পৃ-৯৪)

দাস-দাসী-ভৃত্য

সমকালীন সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সমাজে দাস-দাসী ও গৃহ ভৃত্যের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় । তবে ভারতবর্ষে তথা বাংলা অঞ্চলের দাস-দাসীর প্রকৃতি গ্রিক ও রোমান বা ইউরোপ দেশের মতো এতটা অমানবিক ও ভয়াবহ ছিল না । বাংলার সামন্ত শাসক, জমিদার, অভিজাত আমলা ও বণিক মহাজনগণ যুদ্ধবন্দী বা ক্রয়সূত্রে দাস-দাসী সংগ্রহ করতেন । এদেরকে মূলত গৃহভৃত্য, রাজপ্রাসাদের প্রহরী বা কখনো সৈনিক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হতো। বাংলা অঞ্চলে যে মানুষ বা দাস-দাসী কেনা বেচা হতো, তার ঐতিহাসিকভাবে সত্যতা মেলেছে ইবনে বতুতা ও ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ারসহ অন্যান্য পর্যটক-ঐতিহাসিকদের লেখায়। বাঙ্গালি সমাজে দাস-দাসীরা মূলত গৃহভৃত্য বা ব্যক্তিগত অনুচর হিসাবে কাজ করতো, সামাজিক মর্যাদা পেতো, বিয়ে ও ঘর সংসার করতে পারতো । অনেক সময় এরা আবার শাসক, অভিজাত আমলা ও মর্যাদাপূর্ণ সৈনিকে পরিণত হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতির গৃহে দুর্বলা দাসীর অবাধ বিচরণ এবং কালকেতুর গুজরাট নগরের দাসী-বাদী চাকর-নফরের উপস্থিতি লক্ষনীয়–

ক. কালকেতুর ক্রীতদাস

'শকট বিমান রথ কিনে বীর শত শত
খাট পালঙ্ক কিনে দাসী ।'-(পৃ-৬৮)

খ. গৃহ বাদী-দাসী

'সুধন্য কৌসলকালা তুলিল রন্ধনশালা
বিবি চাখে বান্দি যথা রান্ধে ।'-(পৃ-৭২)

গ. কালকেতুর গৃহ ভৃত্য

পুরের নির্মাণ দেখি চিন্তেন অন্তর
চারিদিগে রহে জত নফর চাকর ।'-(পৃ-৮৭)

নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা

তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সামন্তবাদী বাঙালি সমাজে নারীর মর্যাদা ও অবস্থান মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। কারণ সামন্ত প্রভুদের চোখে নারী ছিল ভোগ্যবস্তু । নারী ও ভূমিই ছিল সামন্ত শাসকগণের বিনোদনের উৎস। কেননা নারী যোগাতো রঙ্গ-রস-লীলা আর ভূমি যোগাতো অর্থ বিত্ত । আবার এ নারী ও ভূমি উভয়েই উর্বরতা-উৎপাদনশীলতার প্রতীক। ভূমির মতো নারীকেও সামন্ত শাসকগণ হাতফেরি করতে পছন্দ করতেন । এ ছাড়া পুরুষের চোখে নারী শুধু পুত্র সন্তানের জননী বলেই কিছুটা সম্মান পেতো, এর বাইরে নারী সামাজিক ও ধর্মীয় কোন অধিকার ছিল না, মান-মর্যাদা দাবি করতে পারতো না। কারণ সমাজকর্তা পুরুষ ও পুরুষ পুরোহিত, ব্রাহ্মণ ও মোল্লারা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে সমাজ ও ধর্মের দোহাই দিয়ে নারীকে করেছে পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, গৃহবন্দী, পুরবাসিনী, মহলবন্দী, অবলা, অসূর্যম্পশ্যা ও অবরোধবাসিনী । এমনকি নারীকে তার পিতা ও স্বামীর সম্পত্তি থেকেও বঞ্চিত করা হয়েছে। যদিও ইসলাম ও হিন্দু আইনে একটি নির্দিষ্ট অংশ (পিতৃধন ও পতিধন) পাবার বিধান রয়েছে। তথাপি সমাজপতি ও ধর্মবেত্তাগণের কারসাজিতে তা ভুলণ্ঠিত হয়েছে।

পুরুষসমাজ তাদের রিরংসা চরিতার্থ করতে ধর্মের বাতাবরণে তৎকালীন সমাজে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও যৌতুক প্রথার প্রচলন ঘটায়। আবার নারীকে চারিত্রিকভাবে পরিশুদ্ধ রাখতে, পতি-পিতার কুল মর্যাদা রক্ষার্থে অমানবিক একাদশী ব্রত, সহমরণ, সতীত্ব পরীক্ষা, বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ, পতিতাবৃত্তি ও কন্যা সন্তান হত্যার মতো বিধানগুলো চালু করেছিল। এসব প্রথা নারীর ব্যক্তিসত্তার প্রতি ছিল অবমাননাকর। যদিও তৎকালে ব্যাধ ও ডোম জাতীয় নিম্নবর্গের কিছু নারী– শিকার, পাটুনি, পসার বিক্রি ও তৈজসপত্র তৈরির কাজে সম্পৃক্ত ছিল; অর্থ উপার্জন করে সাবলম্বী ছিল, তথাপি সমাজের সামগ্রিক চিত্র ছিল নাজুক। কারণ এ সকল নারীরা ছিল সমাজের মূল স্রোতের বাইরের সংখ্যালঘিষ্ঠ ব্রাত্য শ্রেণি। এমন চিত্র মুকুদরামের 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও' পরিলক্ষিত হয়।

বাল্যবিবাহ

তৎকালীন বাঙালী সমাজে ধর্মীয়ভাবে বাল্যবিবাহকে উৎসাহ প্রদান করা হতো। ৮ বছর বয়সী কন্যা সম্প্রদানকে 'গৌরী' , ৯ বছর বয়সী কন্যাকে 'রোহিণী' ও ১০ বছর বয়সী কন্যাকে 'কুমারী' বলা হতো এবং এর বিনিময়ে কন্যার পিতৃপুরুষের অশেষ পুণ্যের কথা ফলাও করে প্রচার-প্রসার করা হতো। আবার শাস্ত্রাচারের দোহাই দিয়ে প্রচার করা হয়- যে কন্যার রজঃস্বলা হবার পরও বিবাহ হয় না, তার পিতা ও ভ্রাত্রাকে অশেষ নরক ভোগ করতে হবে। এসব কন্যাকে তৎকালে 'অরক্ষণীয়া' বলা হতো। অন্যদিকে সমকালীন মগ-পর্তুগিজ-মারাঠা-হার্মাদ জলদস্যুদের অপহরণ ও বলাৎকারের ভয়েও এদেশবাসী কন্যা সন্তানকে বাল্যকালে বিবাহদানে উৎসাহী হয়ে ওঠে । এরূপ চিত্র 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' পরিলক্ষিত হয় উমা-শিব, কালকেতু- ফুল্লরা ও ধনপতি- খুল্লনার বিবাহে–

ক. কালকেতু-ফুল্লরার বাল্য বিবাহ

‘চন্দ্রকেতু পিতামহ পিতা ধর্মকেতু
তারপুত্র কালকেতু গুণযশ হেতু।
দশম বৎসর জুঝে জেন মত্ত হাথি
অর্জুন সমান জার ধনুকের খ্যাতি।
সেই বর জুগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা
খুঁজিয়া পাইল জেন হাড়ির মুঞের সরা।’-(পৃ- ৪২)

গ. খুল্লনার বাল্যবিবাহ

‘শুন হে অবুধ লক্ষাপতি
বার বৎসরের সুতা তোর ঘরে অস্থিতা
কেমনে আছহ শুদ্ধমতি ।
সাধু বলে মোর বোলে হৃদি কর এই কালে
অবধানে কর অবগতি
আমার বচন শুন যদি নাহী নেহ পণ
তবে কন্যা করাব মুকতি ।’-(পৃ-১১৫)

ব্রাহ্মণ দনাই পণ্ডিত **১২** বছরের খুল্লনাকে বিয়ে না দেয়ায় পিতা লক্ষপতিকে ভর্ৎসনা করেন এবং বাল্যবিবাহ দানের শাস্ত্রীয় মাহাত্ম্য ও গৌরব ব্যাখ্যা করে বলেন—

‘সপ্ত বৎসরের কন্যা বিভা দিলে হয় ধন্যা
তার পুত্র কুলের পাবন
’’’
নবম বৎসর যদি বর পাই যথাবিধি
তনয়া করিয়ে সম্প্রদান
তার পুত্র দিলে জল সুরলোকে পাই স্থল
পিতৃলোকে হয় বহুমান।
না বুঝায় কেহ তোমা গত হইল দশ সনা
তথাপি না হৈল কন্যাদান
পরবেশে একাদশে হৃদয়ে মদন বৈসে
নবরস হয় এক স্থান।
না করি সে কর্ম ভাল এগার বৎসর গেল
অপযশ করিলে সঞ্চয়
দ্বাদশ বৎসর বেলা রজস্বলা হয় বালা
পুরুষকে নাঞি করে ভয়।
পুষ্পক জাবদ নয় তাবদ পুরুষে ভয়
নাঞিত রহে তাহার কামনা
বর দেখি অভিরাম জদি করে কন্যাকাম
পায় পিতৃ নরকে যন্ত্রণা।’- (পৃ-১১৫-১১৬)

বহুবিবাহ

সমকালীন সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী অবমাননার আরেকটি পদ্ধতি ছিল, তা হলো– বহুবিবাহ । পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সমাজপতি ব্রাহ্মণ ও মোল্লাদের সহযোগিতায় ধর্মের নামে সামন্ত জমিদার ও ধনী ব্যক্তিরা (হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে) বহুবিবাহ করতো । একাধিক স্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার দাস-দাসী বা রক্ষিতাদের হেরেমে রেখে উপপত্নী হিসেবে ভোগ বা ব্যাবহার করার প্রথা প্রচলিত ছিল। যৌতুক বা পণের লোভেও অনেকে বহুবিবাহে উৎসাহ পেতো। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্মের দোহাই ও উত্তরাধিকারের বিশুদ্ধতার অজুহাতে কৌশলে পুরুষদের ভোগ-বিলাস-রিরংসা মেটানোর পথ বা সুযোগ করে দিয়েছে। অথচ নারীর জন্য সকল বাসনা ও কামনার দুয়ারে রেখেছে অর্গল দিয়ে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' শিবের, ধনপতির, শ্রীমন্তের, ভাড়ুদত্তের, লহনার বান্ধবী লীলাবতীর স্বামী ৬ বিয়ের মাধ্যমে এ বহুবিবাহের চিত্রটি বিশ্বস্ততার সঙ্গে উন্মোচিত হয়েছে–

ক. ভাড়ুদত্তের বহুবিবাহ

'ঘোষ- বউষের কন্যা দুই নারী মোর ধন্যা
মিত্রে কৈল কন্যা বিতরণ।'-(পৃ-৭৭)

খ. লীলাবতীর স্বামীর বহুবিবাহ

' কেন গো লহনা হয়্যাছ বিমনা
দেখিআ এক সতিনী
এ ছয় সতিনী মনে নাহি গণি
সামর্থ মোর পরানি।

,,,

নাহি করি দয়া বাপ দিল বিহা
দারুণ ছয় সতিনে ।' –(পৃ-১৩৪)

গ. ধনপতির বহুবিবাহ

'লহনা খুল্লনা জদি দুজনে থাকে এক মেলি
পাটী করি মরিব দুজনে দিব গালি ।
জেই ঘরে দু সতিনে না বাজে কন্দল
সেই ঘরে রহে দসী সে বড় পাগল।' -(পৃ-১৩১-১৩২)

ঘ. শ্রীমন্তের বহুবিবাহ

'দুই জায়া দুই পাশে শ্রীমন্ত বসিল বাসে
যৌতুক দেই পাশে ।'-(পৃ-৩০৫)

যৌতুক বা পণ-প্রথা

সমকালীন বাঙালি সমাজে বিবাহ অনুষ্ঠানের অন্যতম অঙ্গ ছিল যৌতুক বা পণ প্রথা। বাঙালি সমাজে বরপণ ও কন্যাপণ উভয়েরই প্রচলন ছিল । সাধারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কন্যাপণই বেশি চলতো । আবার কৌলিন্য প্রথার কারণে কুলীন ব্রাহ্মনগণ যৌতুক বা পণের বা দানসামগ্রীর লোভে বহুবিবাহ তথা বিবাহ ব্যবসায় মত্ত হয়ে ওঠে। এ যৌতুক হিসেবে– টাকা-পয়সা-গাভী, দাস-দাসী, গহনা-অলংকার, ফসলী জমি, গ্রাম, আসবাবপত্র, ঘর-বাড়িসহ বিভিন্ন দানসামগ্রী প্রদান করা হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' বরপণ হিসাবে কালকেতু-ফুল্লরার, শিব-চণ্ডী, ধনপতি-খুল্লনা, শ্রীমন্ত-সুশীলা ও জয়াবতীর বিবাহে এরূপ যৌতুকের উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. কালাকেতুর বিবাহের যৌতুক

বাপের পুণ্যের হেতু আনন্দে সঞ্জমকেতু
করে কুশে করে কন্যাদান
যৌতুক ধনুকখান খরতিন গোটাবাণ
মগার্গুণ অঙ্গুলির তান।' –(পৃ-৪৩)

খ. ধনপতির বিবাহের যৌতুক

' অভয়ার প্রীত ফলে করে কুশ গঙ্গাজলে
সাধু করে কন্যা সম্প্রদান
শয্যা ঝারি ধেনু থালা দাসী গজ দোলা ঘোড়া
দিআ জামাতার কৈল মান।' –(পৃ-১২৫)

বৈধব্য যন্ত্রণা

তৎকালীন বাঙালি সমাজ নারীর সামাজিক ও ধর্মীয় দায়-ভারের শেষ বা অন্ত ছিল না। স্বামী-সংসার-সন্তান ও সমাজের ক্ষেত্রে নারীকে ত্যাগ-তিতিক্ষা স্বীকার করতে হতো। আবার স্বামীর মৃত্যু হলে নারীকে পুনর্বিবাহের সুযোগ সমাজ কোনভাবেই দিতে চাইতো না, বরং কঠোর একাদশীর ব্রত পালনের নামে নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাকে জোর করে অবদমন করে রাখা হতো। অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই একজন নারীর জীবন থেকে সকল মান-মর্যাদা, অধিকার, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-বাসনাও নির্বাসিত বা লুপ্ত হয়ে যেতো চিরতরে। এ বিধবা নারীদের সীমাহীন দুঃখ- দুর্দশা ও লাঞ্ছনার জীবন দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহস করে এগিয়ে আসেন। তার সংগ্রামের ফলে ১৮৫৬ খ্রি. ভারতবর্ষে বিধবা বিবাহ চালু হয় ।'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতি- খুল্লনার বিয়েতে আসা আয়াদের জবানিতে, স্বামী মদনের মৃত্যুতে রতি এবং যুদ্ধে স্বামীর মৃত্যুতে হরিণী ও ভাল্লুকীর আর্তিতে এ যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–

ক. রতির বৈধব্য যন্ত্রণা

'কুল শীল রূপগুণ জীবন যৌবন ধন
বিধবার সকলি বিফল
বসন্ত স্বামীর সখা মোরে আসি দেহ দেখা
কুণ্ড কুড়ি জ্বালিব আনল ।'-(পৃ-১৭)

খ. ভাল্লুকীর বৈধব্য যন্ত্রণা

'সশুর সাশুরি মৈল দেওর ভাসুর
পতি মৈল রতি সুখ বিধি কৈল দূর ।'-(পৃ-৫০)

সহমরণ বা সতীদাহ

তৎকলীন বা বাঙালি হিন্দু সমাজে নারী নিপীড়নের আরেকটি বিভীষিকাময় ও অমানবিক প্রথা ছিল সহমরণ বা সতীদাহ প্রথা। অর্থাৎ তৎকালে স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা এক বা একাধিক স্ত্রীকে স্বামীর চিতায় আত্মবির্সজন করতে হতো । তৎকালীন সমাজে পুরুষের বহু বিবাহের ফলে নানা বয়সী নারী যখন বিধবা হয়ে পড়তো, তখন অনেকে বয়সের দোষে বা পুরুষের লালসার ফাঁদে পড়ে পিতা ও পতির বংশে কলঙ্ক লেপন করতো। সমাজপতিগণ শুধু এ কলঙ্ক মোচন করতেই এমন অমানবিক সহমরণ প্রথার প্রবর্তন করেন । এ ভয়াবহ বিভীষিকাময় প্রথাটি প্রাচীন ও মধ্যযুগে বলবৎ থাকলেও রাজা রামমোহন রায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খ্রি.

আইনীভাবে নিষিদ্ব করা হয় । 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' শিবের স্ত্রী সতীর দেহত্যাগ, নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়াবতী এবং মালাধরের দুই স্ত্রীরও স্বামীর মৃত্যুতে সহমরণ বা সতীদাহ পালন করতে দেখা যায়–

ক. মালাধরের দুই স্ত্রীর সহমরণ

' তার দুই পতিব্রতা সঙ্গে হইল অনুমৃতা
তেজিল আপন নিজপুরী
শোকেতে উন্মমত্ত বেশ উদাম মাথার কেশ
অম্রপল্লব করে ধরি ।
অভিষেকে পূত কায় আগোর চন্দন গায়
দু সতিনে করে চারুবেশ
স্বর্গ গঙ্গার তীরে স্নান করিআ নীরে
অনলে করিল পরবেশ ।'-(পৃ-১৭৭)

সতীত্ব পরীক্ষা

তৎকালে পুরুষতান্ত্রিক বাঙালি সমাজে নারী অবমাননার সবচেয়ে ঘৃণ্য পথ বা পদ্ধতি ছিল সতীত্ব পরীক্ষা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের চরিত্রস্খলন, অপকর্ম, অযাচার ও নৈতিকতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলতো না বা মাথা ব্যথা ছিল না । কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে গোটা সমাজ ও ধর্ম খড়গ হস্তে আক্রমণ করতো । নারীর ক্ষেত্রে সামান্য পান থেকে চুন খসার মত অবস্থা হলেই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপট ও রক্তচক্ষুর সামনে টিকে থাকা বা দাঁড়িয়ে থাকাটাই কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'- ধনপতির গৌড়ে অবস্থানকালীন ভোগ-বিলাস ও ব্যভিচার নিয়ে সমাজের কেউ প্রশ্ন করেনি, কিন্তু খুল্লনার বনে ছাগল চরানোর বিষয়টি নিয়ে গোটা সমাজ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। যদিও খুল্লনা ছিল নিষ্পাপ-নিষ্কলঙ্ক, তারপরও শ্বশুরের শ্রাদ্ধের ও স্বামীর বংশ মর্যাদা রক্ষার্থেই খুল্লনাকে এ চরম অবমাননাকর সতীত্ব পরীক্ষায় অংশ নিতে হয়। এ পরীক্ষার অংশ হিসাবে পাঁচটি পদ্ধতি, যথা– ১. জল পরীক্ষা ২. সর্প পরীক্ষা ৩. অগ্নী পরীক্ষা ৪. তুলা পরীক্ষা ও ৫. জতুগৃহ পরীক্ষা প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। যেমন–

'আনিঞা পথিক দুই তারশিরে পত্র থুই
ডুবাইল সরোবর জলে।
খুল্লনা পরীক্ষা নেয় কোন বান্যা কিছু কয়
উজানি করএ ধন্য ধ্বনি

,,,

সাধুর আদেশে মাল আনে সর্প জেন কাল
দুই আঁখি করঞ্জা সমান
করিআ কপট ধন্দ সাপে দিলে মুখবন্ধ
সর্প জেনে হয় মহীলতা ।

,,,

পাতে রামা দুইপাণি কামার সাবল আনি
আরোপিল তার পাণিপুটে
করি রামা প্রণিপাত লজ্ঘিয়া মণ্ডলী সাত
পেলাইল লৈয়া তৃণকুটে ।

,,,

রোষজুত ধনপতি পুন দিল অনুমতি
তুলা পরীক্ষার বিধানে

খুল্লনা করিল তুলা   হারিল বণিকগুলা
শ্রীকবিকঙ্কণ রসভনে

,,,

জৌঘর করিল সীতা   সভে কহে সেই কথা
তথি সভাকার লয় মন ।

,,,

খুল্লনা চণ্ডীর পদ করিআ ভাবনা
সম্মুখ দুয়ারে বহ্নি দিলেন খুল্লনা।

,,,

বার‍্যাল সুন্দরী রামা জয় জয় দিআ
মস্তকে কুন্তলে পানি পড়িছে খসিয়া।
সেই মতে ছিল শঙ্খ শ্রীরাম লক্ষ্মণ
মল নাহী পড়ে অঙ্গে পাটের বসন।'-(পৃ-১৮৫-১৮৯)

নারী নির্যাতন ও অবমাননা

সমকালের বাঙালি সামন্তবাদী ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর ওপর নির্মম নির্যাতন করা হতো। নারীকে তার ব্যক্তিসত্তার মর্যাদা মূল্যায়ন করাতো হতোই না, বরং মানসিক ও দৈহিকভাবে লাঞ্ছনা অবমাননার শিকার হতে হতো । 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' খুল্লনাকে এরূপ নির্যাতনের শিকার হতে হয়। চণ্ডী পূজার অপরাধে স্বামী ধনপতি তাকে প্রহার করেন, সপত্নী লহনা লাঞ্ছিত করেন, দনাই পণ্ডিত অপমান করেন এবং সমাজপতিদের দাবির মুখে সতীত্ব পরীক্ষায় ঠেলে দিয়ে চরম অবমাননা সম্পন্ন করে। সমাজ, স্বামী ও সপত্নীদের কাছে নারী কখনোই নিরাপদ ছিল না–

খুল্লনার লাঞ্ছনা

'দেখি ধনপতি দত্ত জ্বলে কোপানলে
লজ্ঘিয়া চণ্ডীর বারি ধরে তার চুলে ।

,,,

কোপ জুত ভাষে কিছু বলে ধনপতি
অদেষ্টে আছিল মোর পাপিনী যুবতি ।
কার কুলে নাহী দেখী হেন পাপ বধূ
এমন কোথায় কিবা কুলযশবিধূ ।'-(পৃ-১৯৮)

কর্মজীবী নারী

তৎকালীন বাঙালি সমাজের ব্যাধ, ডোম, গোপ বংশের নারীরা পুরুষের মতো শিকার, পসার বিক্রি, ঝুড়ি-চাটাই তৈরি ও খেয়া ঘাটের পাটুনির কর্মে আত্মনিয়োগ করে অর্থ উপার্জন করতো। আবার নর্তকী, বাইজি ও বারাঙ্গনা পেশার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা হলেও স্বাধীনতা ভোগ করতো। তবে এসব নারীদের কর্মক্ষেত্র ও স্বাধীনতা লাভ অবশিষ্ট বৃহৎ নারী সমাজের ভাগ্যকে সুপ্রসন্ন করতে পারেনি। কারণ এসব নিম্নবর্ণের নারীদের অবস্থান ছিল সমাজের মূল স্রোতধারার বাইরে। তারপরও এসব কর্মজীবী নারীরা তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নিজেদের অবস্থান, মর্যাদা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল- এটাই বিবেচ্য বিষয়। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ফুল্লরা-নিদয়া-হীরাবতীর মাংস বিক্রি, দুর্বলার হাট বাজার করা, খুল্লনার ছাগল চড়ানো এবং নর্তকী-বাইজি-বারঙ্গনাদের কর্মচাঞ্চল্য এ বিষয়কেই ইঙ্গিত দান করে—

ক. হীরা ও নিদয়ার মাংস বিক্রি

'দৈবযোগে একবার পিতাপুত্রে লইআ ভার
হাট গেলা নিদআর সনে।
হিরা নিদআর কাছে মাশের পশার বেচে
ফুল্লরা বস্যাছে সন্নিধানে ।'-(পৃ-৪২)

খ. ফুল্লরার মাংস বিক্রি

' ফুল্লরা পসার করে নগরে চাতরে
হাণ্ডিয়া চামর বেচে চারি পণ দরে ।

,,,

মাংস বেচে আনয়ে কড়ি চালু লয়ে ডালি বড়ি
তৈল লোন আনয়ে বেসাতি ।'-(পৃ-৪৪-৪৫)

গ. গোয়ালিনী

'চৌদিকে হলুই ধ্বনি কেহ জালে গৃহ মনি
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী ।'-(পৃ-৫২)

ঘ. বারাঙ্গনা

'লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
একভিতে তার অধিষ্ঠান।'-(পৃ-৮৩)

সমাজ শাসন ও পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি

তৎকালীন বাঙালি সমাজ একচ্ছত্রভাবে সামন্ততন্ত্র ও পুরুষতন্ত্রের মাধ্যমে শাসিত-শোষিত হয়েছে। শাস্ত্রাচার ও ধর্মাচারের বিধান মোতাবেক ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-মোল্লা-সামন্ত শাসক ও সমাজপতিগণ অত্যন্ত কঠোরভাবে সমাজকে বিশেষত নারী সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতো। সমাজপতিদের শাসনের ভয়ে সাধারণ মানুষ সর্বদা আতঙ্ক-উৎকণ্ঠায় অস্থির থাকতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এ সমাজশাসনের চিত্রটি অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে উন্মোচিত হয়েছে। কালকেতুর বাড়িতে চণ্ডীরূপী শোড়ষী যুবতীর একাকী আগমন ও অবস্থান এবং যুবতী খুল্লনার একাকী বনে ছাগল চড়ানোর ঘটনায় সতীত্ব পরীক্ষার বিষয়টি সমাজ শাসনের দাপট ও পুরুষতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে । আবার শিবভক্ত ধনপতি শুধু নারী বলেই দেবী চণ্ডীর পূজা করতে চাননি–

ক. কুৎসা বা অপবাদের ভয়

ছাড়িআ ব্যাধের বাস চল বন্ধু জনপাশ
থাকিতে থাকিতে দিননাথে
যদি হয় পাপ নিশা লোকে গাব দুর্ভাষা
রজনি বঞ্চিবে কারে সাথে। –(পৃ- ৬৩)

খ. সমাজপতির ভয়

'মাতা ছাড় এই স্থান মাতা ছাড় এই স্থান
আগুনি সে রক্ষা করি আপনার মান ।
একাকিনী যুবতি ছাড়িলে নিজ ঘর
উচিত বলিতে কেনি না দেহ উত্তর ।

’’’

হিত উপদেশ বলি শুনহ বেভার
নিকটে কলিঙ্গরাজা বড়ই দুর্বার।
আমার বচনে চল বড় পাবে সুখ
রাজার গোচর হইলে পাবে বড় দুঃখ।’-(পৃ-৬৩)

গ. পুত্র সন্তানের গুরুত্ব

বিভা কৈল পুত্র হেতু   স্বর্গ-জাইতে ধর্মসেতু
পরলোক জলপিণ্ড দাতা
আর জত উপচার   পুত্র বিনু অন্ধকার
নরকে নাহিক পরিত্রাণ।’-(পৃ-১৮৩)

ঘ. পুরুষকে বিধাতায় রূপদান

স্বামী বনিতার পতি   স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা
স্বামী পরম ধন   বিনে স্বামী অন্য জন
কেহ নহে সুখ মোক্ষ দাতা ।’-(পৃ-৬০)

কৌলিন্য প্রথা

সেন রাজা বল্লাল সেনের প্রবর্তিত কৌলিন্য প্রথা বাংলার সমাজ জীবন জুড়ে বিপার্যয় ডেকে আনে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজপতিদের ধর্মীয় ও সামাজিক শোষণের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণির জীবনে নেমে আসে মহানিশা। বংশীয় তথা কুল গৌরবে ব্রাহ্মণগণ নিম্নবর্ণের মানুষদের অবজ্ঞা, অবহেলা, ঘৃনা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে শুরু করে। যা সমাজ জীবনের স্থিতিশীলতা ব্যাহত হয় এবং বিদ্বেষের বিষবাষ্প ধূমায়িত হতে শুরু করে। এ কৌলিন্য প্রথার কুফল হিসেবেই বাঙালি সমাজে বহুবিবাহের সূত্রপাত ঘটে এবং উচু বর্ণের ব্রাহ্মণদের দাপটে-পীড়নে সাধারণ মানুষের জীবন অসহনীয় হয়ে ওঠে ।‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ এ কৌলিন্য প্রথার দাপট ও রক্তচক্ষুর আস্ফালনের চিত্রও পরিলক্ষিত হয় ব্রাহ্মণ দনাই পণ্ডিত ও ভাড়ুদত্তের আভিজাত্য ও বংশ গৌরবের মধ্যেমে–

ক. কুলের মর্যাদা

মেলি জত বন্ধুজন   দশ দিকে দেহ মন
কোথা পাব অমলীন কুল
ত্রিভুবনে এক ধন্যা   সমর্পিয়া জথা কন্যা
তবে আমি হব নিরাকুল ।’-(পৃ-১৫)

খ. বংশীয় আভিজাত্য

‘হরিদত্তের বেটা হঙ জয় দত্তের নাতি
হাটে বদি বেচাঙ বীরের ঘোড়া হাথি ।’-(পৃ-৮৫)

গ. ব্রাহ্মণের মর্যাদা

‘জত বৈসে দ্বিজবর   তার নাহি নিব কর
চাষভূমি বাড়ি দেব দান
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস   পূরিব সভার আশ
জনে জনে সাধিব স্থান।’-(পৃ-৭৭)

ঘ. অস্পৃশ্যতা

'আমি ব্যাধ নিচ জাতি তুমি রামা কুলবতী
পরিচয় মাগে কালকেতু
ত্রিভুবনে এক ধন্যা কিবা দেব দ্বিজ কন্যা
ব্যাধের কুটিরে কিবা হেতু
ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
এই ঘর সসান সমান
কহি আমি হিতবাণী এই ঘরে ঠাকুরাণী
ছুঞিলে উচিত হয় স্নান।' –(পৃ-৬২)

সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ

তৎকালীন বাঙালি সমাজে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিপর্যয় ঘটলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে সততা ও নীতি-নৈতিকতা তখনো অবশিষ্ট ছিল। সামন্ত শাসক, অভিজাত, বণিক-মহাজন শ্রেণি অর্থ-বিত্তের বিকার ও ভোগ-লালসায় মত্ত হয়ে পড়লেও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষজন তখনো তাদের চারিত্রিক সততাকে ও নৈতিক বলকে অক্ষুণ্ন রেখেছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতির মাঝিরা প্রভুর বিপদের সময়ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়নি। আবার ফুল্লরাও সরলভাবে ভাড়ুদত্তের কাছে স্বামীর গুপ্ত অবস্থানের কথা অকপটে বলে দিয়েছে। অন্যদিকে ছদ্মরূপী দেবী চণ্ডীর মিথ্যাভাষণে ও সামাজিকভাবে আপত্তিকর মন্তব্যে কালকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে আক্রমণ করতে গিয়েছে। আবার তৎকালে বণিক সওদাগরদের চারিত্রিক সততা ও নৈতিকতার জন্যই মূলত তাদেরকে 'সাধু' বলে অভিহিত করা হতো-

ক. মাঝিদের সততা

'কহ কর্ণধার সত্য বল রে আমারে
তুমি কী দেখ্যাচ কন্যা-কামিনী-কুঞ্জরে।
,,,
রাজার বচন শুনিঞা কহে কর্ণধার
আমি নাহি দেখি কন্যা-কামিনী-কুঞ্জর।
সভাসাক্ষী করি রাজা বান্ধে সদাগর।' –(পৃ-২৫৭)

খ. বণিকদের বংশানুক্রমিক 'সাধু' খেতাব

'গৌড় পাটনে হয় পঞ্জর উৎপতি
তথায়ে পাঠাও রায় সাধু ধনপতি।
পঞ্জরের তরে সোনা দিলেন জুখিয়া
চলিল সাধুর সুত বিদায় হইআ।' –(পৃ-১২৯)

ঘুষ-দুর্নীতি

সমকালীন সামন্তবাদী শাসনের দুর্বলতার সুযোগে প্রশাসনের আমলা, সৈন্য-সামন্ত, কর্মচারী ও সমাজপতিদের মাঝে ঘুষ-দুর্নীতি মারাত্মকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার অবক্ষয়ের ফলে সমাজের প্রায় সর্বস্তরেই এমন ঘৃণ্য ঘুষ-দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ভূমি বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে ডিহিদার, সরকার, পোতদার, জামাদার, কতোয়ালদের ঘুষ গ্রহণ করতে দেখা যায়। আবার হিন্দু

সমাজপতিগণ খুল্লনার সতীত্ব পরীক্ষার বদলে ১ লক্ষ টাকার আপসরফা দাবি করে, যা মূলত ঘুষের পর্যায়ে পড়ে। অন্যদিকে পুরোহিত ও মোল্লার ধর্মীয় পূজা-পার্বণ-যজ্ঞ, মিলাদ-কুরবানি বাবদ প্রাপ্ত দান-দক্ষিণাও তাদের পেশা ও আদর্শকে কলুষিত করে তোলে

ক. রাজস্ব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দুর্নীতি

'উজির হইল রায়জাদা বেপারি বৈশ্যের খদা
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হইল ঐরি
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাঞি মানে প্রজার গোহারি।
সরকার হইল কাল খিলভূমি লিখে নাল
বিনি উবগায়ে খায় ধুতি
পোতদার হইল যম টাকা আড়াই আনি কম
পাই লভ্য খায় দিন প্রতি।
ডিহিদার আবুদ খোজ টাকা দিলে নাঞি রোজ
ধান্য গরু কেহ নাঞি কেনে।' –(পৃ-০৩)

খ. কতোয়ালের দুর্নীতি

সিংহলে রহিবে জদি জাহ রাজধাম
জল মাঝে জাবে জদি আমার ইনাম।
মোর শিরে দায় জদি হয় ডাকাচুরি
পঞ্চাশ কাহন গণ আমার দিগারি।' (পৃ-২০৮)

প্রতারণা ও ভণ্ডামি

তৎকালীন সামন্তবাদী বাঙালি সমাজে প্রশাসনের আমলা, সৈন্য-সামন্ত, পেশাজীবী, বণিক-মহাজন ও সাধারণ শ্রমিক, দাস-দাসীদের মধ্যে চারিত্রিক কলুষতা হিসেবে প্রতারণা ও ভণ্ডামি বহুমাত্রায় বেড়ে যায়। সামান্য স্বার্থ উদ্ধার ও সুযোগ-সুবিধা আদায়ের লক্ষ্যে মানুষ চরম অকৃতজ্ঞের মতো আচরণ করতো এবং প্রতারণা কপটতার আশ্রয় নিতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' মহাজন মুরারি শীল কালকেতুর আংটি কিনতে গিয়ে প্রথমে নানা প্রতারণার আশ্রয় নেয় এবং পূর্বের ক্রয়কৃত মাংসের বকেয়া টাকাও পরিশোধ না করতে নানা রকম ফন্দি-ফিকির করতে শুরু করে। অন্যদিকে ভাড়ুদত্ত কালকেতুর গুজরাট নগরের বহু সুযোগ-সুবিধা পাবার পরেও ভুয়া নগরমণ্ডল সেজে হাটে-বাজারে তোলা তুলতে ও জুলুম-নির্যাতন চালালে ভর্ৎসনার শিকার হয়। এ সামান্য স্বার্থের আঘাতে ভাড়ুদত্ত কলিঙ্গরাজাকে দিয়ে গুজরাট নগর আক্রমণ করায়, প্রতারণার মাধ্যমে কালকেতুকে বন্দী করে, এমনকি মুক্ত কালকেতুর সামনে এসে আবার কপটভাবে মায়াকান্না শুরু করে। এছাড়া দুর্বলা দাসী খুল্লনার বাজার করতে গিয়ে টাকা আত্মসাৎ করে এবং লহনাও সখী লীলাবতীর সাহায্যে জাল চিঠির মাধ্যমে সতীন খুল্লনাকে অপদস্থ করে। এছাড়া বৈদ্য চিকিৎসকগণও রোগ নিরাময়ে অসমর্থ হয়ে নানা কলা-কৌশলে পলায়ন করে রোগীকে প্রতারণা করেছে-

ক. মুরারি শীলের প্রতারণা

'সোনা-রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপু করিছ উজ্জল।।
রতি প্রতি হৈল বীর দশ গণ্ডা দর।
দুই যে ধানের কড়ি পাঁচ গণ্ডা ধর।।

,,,

বন্যা বলে দরে নাহি যাড়ে এক বট।
আমার সনে সওদা কৈলে না পাবে কপট ৷৷

–(আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা. পৃ-৬৯)

খ. ভাড়ুদত্তের প্রতারণা

'মনে পায়্যা পরিতোষ খেমিআ সকল দোষ
বীরকে কবির সেনাপতি
গুজরাট জায়গিরী আর দিব মধুপুরি
তবে তুমি বড় ভাগ্যবতী।
আমার বচন শুন খুড়াকে ডাকিআ আন
মনে কিছু না করিহ শঙ্কা

, , ,

খুড়া তুমি জে হইতে বন্দি আমি অনুক্ষণ কান্দি
বহু তোমার নাহি খায় ভাত
দেখিআ তোমার মুখ পাসরিল সর্ব দুখ
দশ দিক হইল অবদাত।' –(পৃ-৯৫-১০৫)

ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য

তৎকালীন বাংলা ধন-সম্পদ, বিত্ত-বৈভব ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে 'সোনার বাংলা' নামক কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিল। কৃষি, শিল্প ও ব্যবসায়–বাণিজ্যে তৎকালীন বাংলা সারা বিশ্বে যশ-খ্যাতিতে সুপরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়। আবার এর বিপরীতে অর্থাৎ এত প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও এ বাংলায় অভাব দারিদ্র্য ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যপার । সামন্তবাদী অর্থ ব্যবস্থায় বিত্ত ও সম্পদ ছিল মূলত সামন্ত শাসক, অভিজাত শ্রেণি ও বণিকদের হাতে কুক্ষিগত আর বৃহত্তর জনসাধারণের অভাব- দারিদ্র্য ছিল নিত্য সঙ্গী। কারণ সংখ্যালঘু ও ধনী-বিত্তবান শোষক শ্রেণির অন্তহীন শোষণের ফলে দরিদ্র গোষ্ঠী দিনে দিনে আরো দরিদ্রে পরিণত হতে থাকে। রাজার পরিবর্তন হতো, কিন্তু দরিদ্র প্রজার ভাগ্যের কোন পরিবর্তন আসতো না ।

এমন চিত্র ' চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' পরিলক্ষিত হয়- বণিক ধনপতি, শ্রীমন্ত, রাজা সালবাহন ও বিক্রমকেশরীর বিত্ত বিলাস এবং কালকেতু-ফুল্লরার ব্যাধ জীবনে, শিব-পার্বতীর দাম্পত্য জীবনের সীমাহীন অভাব-অনটন, দুঃখ -দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে–

ক. মুরারি শীলের ধন-ঐশ্বর্য

'দশদণ্ডে হেমথালে করিআ ভোজন
খট্টায় নিদ্রা জায় বান্যা করিআ শয়ন ।'-(পৃ-৬৫)

খ. ধনপতির বংশীয় ধন-ঐশ্বর্য

'সসুরা আছিলা রঙ্ক আনিতা চন্দন শঙ্খ
সাজন করিআ সাত নায়
বেচা কিন্যা হইল ধনী ইহা ভালে আমি জানি
কি বুঝাব অবলা তোমায় ।'-(পৃ-১৯৪)

গ. কালকেতু-ফুল্লরার দারিদ্র্য

দুঃখিনী ফুল্লরা মোর আছে প্রতিয়াসে
কি বলিব গিয়া আমি ফুল্লরার পাশে ।
তৈল লবণের কড়ি ধারি দেড় বুড়ি
সশুর ঘরের ধান্য ধারি দুই আড়ি ।
কিরাত-পাড়ায় বসি না মিলে উধার
হেন বন্ধুজন নাহি কেহ সত্র ভার ।
বিষম উদরের জ্বালা মহাবীরে লাগে
এক চক্ষে নিদ্রা যায়ে আর চক্ষে জাগে ।

, , ,

বিধাতা করিল মোরে দারিদ্র্যের কান্তা
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা ।

,,,

কপালে আঘাত হানি কান্দে ব্যাধ নন্দিনী
নিশ্বাসে মলিন মুখ চান্দে
অন্ন বস্ত্র নাহি ঘরে ভিবা দিল হেন বরে
কর্ণবেদ জাত্যের বেভারে ।'-(পৃ-৫৩)

ঘ. ভাড়ুদত্তের ভাই শিবার দারিদ্র্য

'ভাড়ুদত্তের ছোট ভাই নাম তার শিবা
পঞ্চাশ বৎসরে তার নাহী হয় বিভা ।

, , ,

ভাড়ু বলে ভাই দৃঢ় কর হিয়া
এবার মণ্ডলি পাইলে আগে তোমার বিভা ।'-(পৃ-৮৫)

সুতরাং দেখা যায়, বাংলার বৃহত্তম গণজীবন প্রাচুর্যের দেশও ছিল বঞ্চনার বেদনায় পাণ্ডুর। অমানবিক বিধিবিধান ও পরিবেশের শাসনে বিষণ্ন।'- [অরবিন্দ পোদ্দার : মানব ধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, পৃ-৪১]

চোর-ডাকাত-লুটেরা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে সামন্ত শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চোর-ডাকাতের উৎপাত বেড়ে যায়। নাগরিক ও গ্রামীণ জীবনে চোর-ডাকাত ও লুটেরার ভয়ে জনগণ আতঙ্কিত, উৎকণ্ঠিত ও অস্বস্তিতে ভুগতো । বণিক, ধনী ও বিত্তশালী লোকজন এদের দ্বারা আক্রমণ ও ক্ষয়-ক্ষতির শিকার হতো । 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' গুজরাট নগরে এবং বাণিজ্য পথে এ চোর-ডাকাত, লুটেরা ও জলদস্যুদের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়—

ক. ডাকাত

'ভেলিঞাতে উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা ।'-(পৃ-০৪)

খ. চোর

'শতেক রাজার ধন আভরণ অঙ্গে
মোহিনী হইআ ভ্রম কেহ নাহি সঙ্গে ।
চোর খণ্ডা হইতে কিবা নাঞি কর ভয় ।'-(পৃ-৬৩)

গ. জলদস্যু

'ফিরাঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণ ধারে ।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমদের ডরে।'-(পৃ-২৩৯)

ভোগ-বিলাস

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজে সাধারণত সামন্ত শাসক, বণিক, অভিজাত শ্রেণি, উর্ধ্বতন আমলা ও রাজ-কর্মচারীগণ নারী, মদ, জুয়া, পাশা ও পায়রা উড়াবার মতো ভোগ-লীলা-পানাহার ও খেলায় মত্ত থাকতো। বিত্তবানদের ভোগ-বিলাসের চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায়-ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কলিকতা কমলালয়' (১৮২৩ খ্রি.) 'নববাবু বিলাস' (১৮২৫ খ্রি.) 'দূতি বিলাস' (১৮২৫ খ্রি.) 'নববিবি বিলাস' (১৮৩১ খ্রি.) 'প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮ খ্রি.) ও মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬১ খ্রি.) গ্রন্থে। এরূপ চিত্র দেখা যায় 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সিংহরাজের (বনের) শাসন কর্ম ও রাজ্য ফেলে নারী-মদে আসক্ত থাকা, ধনপতি বণিকের স্ত্রী-সংসার ফেলে গৌড়ে গিয়ে পাশা ও বেশ্যাসক্ত হওয়া, বণিক পুত্র শ্রীমন্ত যুবক থাকাবস্থায় পায়রা ওড়ানো ও পাশা খেলায় দিনপাত করায়, ধনপতির পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে আগত বণিক নীলাম্বর দাসের বেশ্যাসক্তির উল্লেখে, লহনা-খুল্লনার বিবিয়ানায়, কালাকেতুর গুজরাট নগর প্রধান হয়ে পাশা ও আমোদে মগ্ন থাকার মাধ্যমে–

ক. বিত্তবান কালকেতুর বিলাস

'ভিক্ষা ছলে ফিরে চেলা পুরে অষ্ট আশা
কেহ বলে বীর জথা খেলিছেন পাশা।
মিষ্ট অন্ন পানেতে পুরিয়া দিল থাল
কর্পুর তাম্বুল দিল ঘৃত পুষ্পমাল।' –(পৃ-৮৭)

খ. যুবক ধনপতির পায়রা ওড়ানো

'সখা সঙ্গে ধনপতি অনন্দে পূর্ণিত মতি
পায়রা উড়ায় সদাগর
ছাড়িআ পাটের দোলা একে একে করে খেলা
পাড়ি থুয়্যা ভূষণ অম্বর।' –(পৃ-১১৪)

গ. বণিক ধনপতির বেশ্যাসক্তি

'পরস্ত্রী লব্ধ হইআ পাসুরিলে নিজ জায়া
সুখে আছ গউড় নগরে।
পাশায় গঙাইলে দিন মর্যাদা করাইলে হীন
হইলে নিজ কুলের কলঙ্ক
আইলে নৃপতির কাজে রহিলে পঞ্জর ব্যাজে
বেউশা জনের পাইআ সঙ্গ।' –(পৃ-১৫২)

ঘ. পশুরাজ সিংহের ভোগ বিলাস

'রাণীগণ সঙ্গে থাক নানা রঙ্গে
না কর দেশের বিচার
একা কালেকেতু পশুবধ হেতু
নিত্য পাড়ে মহামার।' (পৃ-৪৬)

পরিবার কাঠামো

তৎকালীন সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় বাঙালি সমাজে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো গড়ে উঠছিল। হিন্দু- মুসলিম ধর্মাবলম্বী সমাজে পুরুষরাই ছিল পরিবারের যথার্থ অভিভাবক। পুরুষ বা পিতার পরিচয়েই বংশীয় পারিবারিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো। পুরুষরা ছিলো একাধারে রাষ্ট্র-সমাজ-পরিবার-ধর্মীয় প্রধান ও নিয়ন্ত্রক। এমন চিত্র 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ভাড়ুদত্তের কৃষিভিত্তিকে যৌথ পরিবার ব্যবস্থায়, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনা, লক্ষপতি-রম্ভাবতী, সালবাহন-লীলাবতীর পরিবার কাঠামোতে যৌথ ও একক পরিবার ব্যবস্থার পরিচয় মেলে–

ক. ভাড়ুদত্তের যৌথ পরিবার

যহু পরিবার মেলা দুই মাগু চারি শালা
চারিপুত্র বহিনি সাসুরি
ছয় মাতা আট চেড়ি এই হেতু ছয় বাড়ি
ধান্য দিলে নাহী দিব বাড়ি।' –(পৃ-৭৭)

খ. কালকেতুর একক পরিবার

পুত্র হইতে ধর্মকেতু নিচিন্ত সম্বল হেতু
আনন্দিত হৃদয়ে নিদয়া।
নিদয়া বসিল ঘাটে মাংস লইয়া জায় হাটে।
অনুদিন বেচয়ে ফুল্লরা
,,,
ছায়া সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিলেন মুক্তি হেতু
বারাণাসী করিল পয়ান
দাম্পত্যে লোটায়্যা কান্দে কেশপাশ নাহি বান্ধে
মাসে মাসে পাঠান সম্বল।' (পৃ-৪৪)

ব্যাধ ও ব্রাত্য সমাজ

তৎকালীন বাঙালি সমাজের বর্ণ প্রথাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা চতুর্বর্ণীয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র) সমাজের বাইরেও কিছু অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য-ব্রাত্য শ্রেণির অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। যারা ছিল উচু বর্ণের চোখে ঘৃণিত, দলিত ও অস্পৃশ্য। এ ব্যাধ, ডোম, চামার-চণ্ডালরা সমাজের প্রান্তে বসবাস করতো এবং সমাজের মূল স্রোতধারার সঙ্গে এরা কোন ওঠাবসা বা সম্পৃক্ততা রাখতো না। ন্যূনতম সামাজিক কোন মান-মর্যাদা ও সম্মান এদের ছিল না বললেই চলে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এমন ব্যাধ ও ব্রাত্য শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালকেতু-ফুল্লরাকে ব্যাধ জাতি বলে ভাড়ুদত্ত ও কলিঙ্গ রাজা অবজ্ঞা করে। এমনকি ব্যাধ কালকেতুর মনেও এমন হীনমন্যতাবোধ (inferiority complex) সক্রিয় ছিল। এছাড়া কালকেতুর গুজরাট নগরে আসা ডোম, চণ্ডাল, বারাঙ্গনাদের বসবাসের জন্য নগরের প্রান্তসীমায় স্থান নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়–

ক. ব্যাধ বা শিকারী

আমি ব্যাধ নিচ জাতি তুমি রামা কুলবতী
পরিচয় মাগে কালকেতু
ব্যাধ হিংসক রাড় চৌদিকে পশুর হাড়
এই ঘর সসান সমান
কহি আমি হিতবাণী এ ঘরে ঠাকুরাণী
ছুঞিলে উঠিত হয় স্নান।' –(পৃ-৬২)

খ. চামার-ডোম-বারাঙ্গনা

দুরন্ত কিরাত কোল হাটেতে বাজায় ঢোল
জাতিজীবী বয়িল কেয়ালা
কেওরা বসিল হাড়ি ঘাস কাট্যা লয় কড়ি
ঘুড়ির ঘরেতে জার মেলা।
মোজা পানঞি জিন নিরাময়ে অনুদিন
চামার বসিল এক ভিতে
ঝিঅনি চালুনি ঝাঁটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা
কির্তি করে হরষিত চিতে
লম্পট পুরুষ আশে বারবধূগণ বৈসে
এক ভিতে তার অধিষ্ঠান।' (পৃ-৮৩)

নগরায়ণ ও নাগরিক সমাজ

মধ্যযুগের সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সামন্ত শাসক ও জমিদারদের রাজধানী তথা রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠতো শহর, নগর, দুর্গ, সেনা ছাউনীর মতো আবাসন এলাকা। তৎকালীন সময়ে ভারতবর্ষের স্বয়ংস্পূর্ণ গ্রামীণ অর্থনৈতিক অবকাঠমোতে কোন জমিদারও যদি কোন গ্রামে পাকা দালান-কোঠা, সুরক্ষার জন্য দুর্গ-গড় নির্মাণ করতেন তাহলে সে গ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার গ্রামগুলোর সমন্বয়ে উপনগর গড়ে ওঠতো। সুতরাং দেখা যায়, সামন্ত শাসক জমিদারদের আবাসিক এলাকাকে কেন্দ্র করেই মূলত নগর বা শহরের পত্তন ঘটতো এবং শাসকের অবর্তমানে বা পরাজয়ে সে নগরের পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পরতো।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' মধ্যযুগের নগরায়ণ এবং নাগরিক জীবনের বহুমাত্রিক পরিচয় ফুটে উঠেছে। বস্তুত, মুকুন্দরামের কাব্যে নগরজীবনের যে ছবি চিত্রিত হয়েছে অন্য কোন মঙ্গলকাব্যে তা এত বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় না।[৬৩] চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের বাংলা অঞ্চলের নগরায়ণ ও নাগরিক জীবনের একটি নির্ভরযোগ্য চিত্র পাওয়া যায়। যদিও কবি তাঁর বাস্তব জীবনের বঞ্চনা-নির্মমতা থেকে মুক্তি এবং প্রত্যাশিত স্বপের বাস্তবায়নের বিকল্প হিসেবে এ গুজরাট নগরের পত্তন ঘটিয়েছেন। তথাপি এ নগরের মাধ্যমে সমকালীন মুঘল স্থাপত্য শৈলী বা নগর পরিকল্পনার পরিচয় মেলে। কবির এ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র-নগরের স্থপতি ব্যাধ কালকেতু। দৈব উৎস থেকে প্রাপ্ত ধনে ধনী হয়ে কালকেতু এ নগর নির্মাণে উদ্যোগী হয়। কেননা– দৈব উৎস ব্যতীত যেমন দরিদ্র কালকেতুর পক্ষে নগর প্রতিষ্ঠা অসম্ভব, দরিদ্র অচরিতার্থ কবির পক্ষেও তেমনি স্বপ্ন কল্পনার মধ্যেই মাত্র স্বস্তি সন্ধান ও প্রত্যাশিত স্বদেশ–রূপের বাস্তবায়ন স্বম্ভব।'[৬৪]

ধনের উৎস দৈব র্নিধারিত হলেও অর্থের কার্যকারিতা ও গুণাগুণ বিষয়ে কালকেতু ও ফুল্লরার বাস্তবজ্ঞান সুতীক্ষ্ণ। জীবনে অর্থের ভূমিকা বিষয়ে সর্তক ছিলেন মুকুন্দরাম; তাঁর কাব্যের পাত্র-পাত্রীর উচ্চারিত সংলাপে অর্থের ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয়েছে। কালকেতুর সন্দিগ্ধ দৃষ্টি খুঁজেছে দানের ধন ঘড়া নিয়ে হয়তো দেবী পলায়ন করবে, আর ফুল্লরার উচ্চারণে অল্প অর্থ প্রাপ্তির দারিদ্র্যের দুর্নাম লাঘব না হবার কথা ব্যক্ত হয়েছে। তাই কালকেতুর উদ্দেশ্যে দেবী চণ্ডীর বলা আপ্তবাক্যে অর্থের সম্মোহনী, সর্বকালিত ও সার্বত্রিক ধর্মবৈশিষ্ট্য অভিব্যক্ত হয়েছে। কালকেতু-ফুল্লরা ও দেবী চণ্ডীর বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির সারসত্য সহজেই অনুমেয়-

ক. ফুল্লরার দৃষ্টিভঙ্গি

বীর হস্তে দেন চণ্ডী মানিক অঙ্গুরি
লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী।
একটি অঙ্গুরি হইতে হব কোন কাম।
সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম।
এই অঙ্গুরির মূল্য সাত কোটি টাকা
ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ কৈল বাঁকা।' –(পৃ- ৬৪)

খ. কালকেতুর দৃষ্টিভঙ্গি

'লোহার সীকলে ছিল সাত ঘড়া ধন
চণ্ডী স্মঙরিয়া বীর তোলে ততক্ষণ।
,,,
যদি মোরে ধন দিলে সেবক বৎসল।
এক ঘড়া ধন গো আপনি কাখে কর।
আগে আগে মহাবীর করিল গমন
পশ্চাতে পার্বতী জান লইআ তার ধন।
মনে মনে মহাবীর করেন জুগতি
ধন ঘড়া লইআ পাছে পালায় পার্বতী। –(পৃ-৬৫)

এরপর কালকেতু দেবী প্রদত্ত টাকা দিয়ে বেরুনিয়া বা দিন মজুরদের সহায়তায় গুজরাট নগর নির্মাণের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে বনের গাছপালা কেটেছে। তবে বন কাটার ক্ষেত্রে সে নির্বিচারী হয়নি বরং নগরে সৌন্দর্য সংরক্ষণ, প্রাত্যহিক উপযোগী ভেষজ উদ্ভিদ লতা-গুল্ম এবং পূজা-পার্বণে- গৃহস্থালির প্রয়োজনীয় গাছ রক্ষা করেছে। কালকেতুর মাধ্যমে মূলত মুকুন্দরামের অভিপ্রায় ঔচিত্যবোধ ও সৌন্দর্যপ্রিয় মানসতার পরিচয় বিধৃত

হয়েছে। স্বর্গভ্রষ্ট দেবশিশু কালকেতুর পরিবেশ বিজ্ঞান ও সৌন্দর্য শাস্ত্রের সমন্বয়ে গুজরাট নগর হয়ে ওঠেছে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্র। পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বজায় রাখতেই-

‘পলাষ পাকড়ি খদিবের বন
মহাকড়া কাল্যাকড়া উলু বেনা বন
ভাঁটি সাঁটি কাটিল আদাড়ে
মাণ্ডুরি পাণ্ডুরি কাটে শতমূলী
ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি।
নাদন চারুকুল কাটিয়া উপাড়ে
ঘাঁটফুল ঘাঁটুকাল কাটিলা কেয়া
উকন্যা বিরুন্যা ববাই লআ
হড়কচ কড়কচ কাটে কামরাঙ্গা
কাঁটাল কদলি রাখিল গুয়া
অশ্বথ রাখিল মূল বান্ধিয়া।
রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গ
মালতী মল্লিকা নেহালী চাঁপা
ভুজঙ্গ কেসর রাখিল জবা
টকর তুলসী রাখিল রাঙ্গন
করুণা কমলা ছোলঙ্গ টাবা
তাল নারীকেল নগরে শোভা
শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেলবন
বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম
মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম। –(পৃ-৭০)

কালকেতুর এ নগর নির্মাণ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের মন্তব্যটি এখানে প্রণিধানযোগ্য- “এই নগর পত্তন বর্ণনায় সেকালের টাউন- প্ল্যানিঙের একটা আদর্শ পাই।”[৫৬]

মুকুন্দরামের ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ যেসব নগরের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়, সেগুলো হলো– বারণাসী, মথুরা, দ্বারকা, গুজরাট, উজ্জয়িনী, কলিঙ্গ, ইছানিনগর, উজানীনগর, চম্পকনগর, গৌড়, কাশী, আগ্রা, দিল্লী, বর্ধমান ও সিংহল। এ নগর নির্মাণের ক্ষেত্রে মুকুন্দরামের ওপর উল্লিখিত নগরসমূহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অথবা স্মৃতি–শ্রুতি–অধ্যয়নজাত জ্ঞানের সফল প্রয়োগ ঘটেছে। তৎকালীন সময়ে রাজনেতিক অস্থিরতা, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক কারণেও রাজধানীর স্থানান্তর প্রায়শই ঘটতো। তাই অধিকাংশ নগর রাজধানীর স্থায়িত্ব ছিল স্বল্পকালীন। কালকেতু নির্মিত গুজরাটনগর ছিল দেখতে এরূপ–

চারি চৌরি চতুঃশালা   মাঝে পিড়া খো ঢালা
পাষাণে রচিত নাছবাট
,,,
বাম ভাগে দুর্গ মেলা   তার পাছে পাটশালা
সিংহদ্বার পূর্বে জলাশয়

খড়গী উত্তরভাগে   জলহরি তার আগে

প্রতিবাড়ি কুপের সঞ্চয়।

নগর চত্বর মাঝে   শিবের মন্দির সাজে

অনাথ মণ্ডপ অন্নশালা

বাসাড়ি জনের তরে   দিঘল মন্দির করে

প্রবাসীগণের জথা মেলা।

পশ্চিমে যবনালয়   তুলিলেন সঞ সঞ

দলিজ মসিদ নানা ছান্দে

সুধন্যা কৌসলকালা   তুলিল রন্ধন শালা

বিবি চাখে বান্দি জথা রান্ধে।' –(পৃ-৭২)

কবির প্রত্যাশানুযারী কালকেতু নির্মাণ করে তার গুজরাটনগর। বনের গাছ পালা কাটার পরই নির্মিত হয় রাজ প্রাসাদ। তালবৃক্ষ আকৃতির উচু প্রাচীর ঘেরা এ প্রাসাদটি চতুঃশালায় বিন্যস্ত, শানবাঁধানো সরোবর, উত্তরে গবাক্ষ, পূর্বে সিংহদ্বার, কারাগার, চণ্ডীকার দেউল বা মন্দির, সদর রাস্তা, পাঠশালা, জলাশয়, পাতকুয়া বা কূপ, অনাথমণ্ডপ, অন্নশালা বা লঙ্গরখানা, পরিখা, দুর্গ বা মঠ, হাট এবং শিবমন্দির-বিষ্ণুমন্দির নাটমন্দির সমাহারে হিন্দু পল্লী গড়ে ওঠেছে।

মুকুন্দরামের সময় ভারতবর্ষ তথা বাংলায় রাজধর্ম ও রাজভাষা ছিল ইসলাম ও ফারসি। বিষয়টি মাথায় রেখেই কালকেতু গুজরাট নগরের পশ্চিম পাশে মুসলমান পল্লীর জন্য গড়ে তোলে আবাস গৃহ, বৈঠকখানা (দলিজ), মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ ও রন্ধনশালা। আবাসন গৃহ, প্রার্থনালয়, শিক্ষালয়, বিপণি বিতান, কৃষি বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষায় যুগোপযোগী এমন প্রাকৃতিক শোভামণ্ডিত গুজরাট নগরটির নির্মাণের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছিল কার্তিক মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথির শুভলগ্নে। এ নগর পরিকল্পনায় যে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান নগরের প্রভাব পড়েছে তা নিশ্চিত। এ বিষয়ে সমাজতাত্ত্বিক হামিদা খাতুন নাক্‌ভীর মন্তব্যটি স্মরণীয়–

'Town planning on a large scale is a modern idea, but on a limited scale it was not entirely unfamiliar in the medieval times. Some pattern seems to have been then followed in the location of forts, mansions, mosques, hammams, gardens, bazars and other public buildingsand the principal wards of the city generally occupying sites according to their importance ,,, cities were protected by walls built around them, while the forts were constructed to provide against the contingency of an invasion or a surprise attack. They usually possessed effective offence measures, had paved roads within convenient location of offices, karkhanas, kitchen, quarters for the staff, adequate water supply and accommodation for long term storage of other human needs.'[৬৬]

হামিদা খাতুন নাক্‌ভীর নগর বর্ণনার সঙ্গে কালকেতুর গুজরাট নগরের অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য ধরা পড়ে। আবার এর সঙ্গে বিখ্যাত পর্যটক ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ার বর্ণিত তাঁর দিল্লী নগরের বর্ণনার সঙ্গে চমৎকার সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়–

‘অন্তর্দুর্গের মধ্যে রাজপ্রাসাদ আছে, জেনানা মহল আছে এবং আরও অন্যান্য সব রাজকীয় বিভাগাদি আছে ,,, পরিখা সংলগ্ন বিরাট উদ্যান, নানারকমের ফুল ও গাছপালায় সাজানো ,,, কাছেই একটি বাজার আছে। যেখানে এমন কোন জিনিসি নেই যা পাওয়া যায় না। জিনিসের মতন যত রকেমর ভণ্ড, বুজরুক, হাতুড়, বৈদ্য, জাদুকর এসে জমা হয় বাজারে ,,, তোরণের পিছনের দিকে গুদাম ঘরের উপর বণিকদের বসতবাড়ি। রাস্তা থেকে বেশ সুন্দর দেখায় এবং মনে হয় বেশ বড় বড় কামরাওয়ালা বাড়ি ,,, অবস্থাপন্ন ধনিক ব্যবসায়ী যারা তারা অন্য মহল্লায় বাস করেন এবং দিনের বেলা কাজের সময় এখানে আসেন।’[৬৭]

কালকেতুর নির্মিত এ নগরে আধুনিক সমাজ বিজ্ঞানীদের মতাদর্শপুষ্ট উচ্চশ্রেণি, মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও শ্রমিক শ্রেণি অথবা অভিন্ন অর্থনীতি অবস্থানভুক্ত কপিতয় ব্যক্তির গোষ্ঠী (Class in itself) এবং অভিন্ন স্বার্থ চেতনা ও রাজনেতিক লক্ষ্য সমন্বিত শ্রেণির (Class for itself) অস্তিত্ব হয়তো সেই অর্থে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবে মোটাদাগে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়।

এ নগরের উচ্চবিত্তের তালিকায়– শাসক, বণিক, ধনী ব্রাক্ষণ, কায়স্থ ও অভিজাত আমলা শ্রেণি রয়েছে। মধ্যবিত্তের তালিকায় রয়েছে– মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষক, ছোট ব্যবসায়ী, রাজস্ব আদায়কারী ও রাজ-কর্মচারীবৃন্দ। আর নিম্নশ্রেণির তালিকায় পাওয়া যায়- কৃষক, শ্রমিক, বারাঙ্গনাসহ বহুবিধ পেশাজীবী দরিদ্র গোষ্ঠীকে। এছাড়া অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য ব্রাত্য শ্রেণির মধ্যে ব্যাধ, ডোম, চামার, চণ্ডাল, হাড়ি, বাগদি, কসাই ও শুড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়। কালকেতুর এ গুজরাট নগরের ঐশ্বর্য-বিলাস, কর্মচাঞ্চল্য মুখরতার চিত্র কলিঙ্গনগরের কতোয়ালের চোখে এভাবে ধরা পড়েছে–

‘কেহ গেল বীর জথা খেলিছেন পাশা।
মিষ্ট অন্ন পানেতে পুরিয়া দিল থাল
কর্পূর তাম্বুল দিল ঘৃত পুষ্পমাল।
চারদিগে রহে জত নফর চাকর
ভ্রমিআ বুলিল তারা সহরে সহর
সুধাময় দেখি পুরী নেতের পতাকা
রাকাপতি বেড়ি জেন ফিরয়ে বলাকা।
হাথি ঘোড়া দেখে বীরের সৈন্য সেনাপতি
,,,
জত বৈসে লোক তার নাহি শোক
সভার কৌশল বাসে
সুগন্ধি চন্দন অঙ্গে বিলেপন
মাল্যশোভে কেশপাশে।
শঙ্খ বেনি বীণা ভেরি ভরে নানা।
বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে
হএ নাটগীতে দেখি ঘর ভিতে
মঙ্গল প্রতিবাসরে। –(পৃ-৮৭)

গুজরাট নগর প্রকৃত অর্থেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ, সর্ব ধর্ম-বর্ণের পেশাজীবীর জন্যে কল্যাণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে ওঠেছিল কালকেতুর গৃহীত প্রজাহিতৈষী জনকল্যাণমূলক সর্বোপরি মানবতাবাদী পদক্ষেপের কারণে।

ডিহিদার পদের বিলোপ, উৎসব বা পার্বণি কর, লবণ কর, সানা ভাত কর, ধানকাটী কর, কলম কসুরে কর, পঞ্চক-জাত কর ও বসত কর বিলোপ এবং কৃষক প্রজার সাত বছরের রাজস্ব মওকুফসহ বিনামূল্যে লাঙল-জোয়াল, হালের গরু ও বীজ ধান সরবরাহের মাধ্যমে সর্বমাঙ্গলিক নগরের পত্তন সম্ভব হয়েছিল।

কালকেতুর নির্মিত এ গুজরাট নগর প্রকৃত অর্থে আধুনিক নগর হিসেবে গড়ে উঠেনি। কারণ এসব নগর ছিল কয়েকটি উন্নত গ্রামের সমষ্টি মাত্র। ফ্রাসোয়াঁ বার্নিয়ার দিল্লী নগর সম্পর্কে বলেছেন- 'আমার সব সময় মনে হয়, দিল্লী আধুনিক অর্থে শহর ও নগর নয়, কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি মাত্র। অথবা মনে হয় দিল্লী একটি বিরাট সামরিক শিবির, তা ছাড়া কিছু নয়।'[৬৮]

কালকেতুর মাধ্যমে নির্মিত মুকুন্দরামের এ গুজরাটনগরে প্রকৃত নাগিরক জীবন-যাপন প্রণালীর বহু সীমাবদ্ধতা থাকলেও তাঁর শান্তি-সম্প্রীতিপূর্ণ কল্যাণময় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস ও প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিল না। বরং সমকালে এমন স্বপ্ন বা উদ্‌যোগ যে কোন কবির কাছেই ছিল অকল্পনীয়-অপ্রত্যাশিত ও ব্যতিক্রমী বিষয়। কিন্তু সমাজ সচেতন মুকুন্দরামের ক্ষেত্রে এটি প্রাসঙ্গিক ও সহজাত ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। আর এখানেই তাঁর শাশ্বত সাফল্য এবং এ জন্যই তিনি যুগন্ধর, এ যুগাতিক্রমী সমাজতাত্ত্বিক ও মানবহিতৈষী মুকুন্দরামের এ শিল্পীমানসতার স্বরূপ উন্মোচন করতে গিয়ে অরবিন্দ পোদ্দার বলেছেন–

'সেখানে সমাজের অন্তর্গত কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়েরই কোন অমর্যাদা হবে না, কোন অকল্যাণ বুদ্ধিই সেখানে জয়যুক্ত হবে না; সেখানে চাওয়া বৃথা আশায় কেঁদে কুটে মরবে না, সার্থক পাওয়ায় পরিণত হবে। ,,, সুতরাং কোন সম্প্রদায় বা কোন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে নয়, সবাইকে নিয়েই এই আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে।'[৬৯]

এ সমাজে কালকেতু যেমন মুকুন্দরামের কল্যাণকামী আদর্শের বাহক, ভাড়ুদত্ত তেমনি কল্যাণবিরোধী অপশক্তির প্রতীক।[৭০] আর এভাবেই গুজরাটনগর রাষ্ট্রে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অর্থনৈতিক সাম্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্বদেশ উন্মুলিত কবির অন্তর্গত প্রত্যাশা পেয়েছে বাস্তব রূপ। ব্যাধ কালকেতুর সামন্ত শাসকে পরিণত হয়ে সামাজিক সম্মান-সৌভাগ্য লাভ এবং গুজরাটনগর পত্তনের মাধ্যমে মূলত সমাজের ক্ষমতার পালাবদলকে ইঙ্গিত দান করে। কেননা কলিঙ্গদেশের চণ্ডীর আশীর্বাদ না পাওয়া জীবনের দেবতা শিব যেহেতু কর্মবিমুখ-উদাসীন, সেহেতু চণ্ডীর আশীর্বাদ পাওয়া নবজীবনের সম্ভাবনা সূচিত হয়েছে যে গুজরাট নগরে, সে নগরে নবজীবন প্রত্যাশী মানুষের আগমন স্বাভাবিক।[৭২] এ জন্যই ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে ব্যাধ কালকেতুর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও অঘোষিত শ্রেণি সংগ্রামের পরিচয়বাহী নায়ক কালকেতুর মানস জাগরণের মাধ্যম অবনমিত অন্ত্যজ, বঞ্চিত ও শোষিত মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠার ইতিহাস রূপকার্থে এ কাব্যে অভিব্যঞ্জিত হয়েছে। বর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে টিকে থাকার জন্য কালকেতুকে শক্তি অর্জন করতে হয়েছিল, নির্মাণ করতে হয়েছিল নিজস্ব রাজ্য। বিরোধীদের সে শুধু মোকাবেলাই করেনি, তার বশ্যতা স্বীকার করতেও বাধ্য করেছিল।[৭৩] কালকেতুর আত্মপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে মূলত- অবনমিত সম্প্রদায়ের উপরে ওঠার ইতিহাস। '[৭৪]

সুতরাং শোষণমুক্ত সমাজ, অন্ত্যজ শ্রেণির সম্মান সৌভাগ্যে লাভ, শান্তি-সম্প্রীতিপূর্ণ ও সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল মুকুন্দরামের মৌল অভীপ্সা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সাংস্কৃতিক জীবন

জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বগুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি।[৭৫] অর্থাৎ জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনাচরণ তথা ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণে জীবনের যে অভিব্যক্তি প্রকাশ ঘটে তাই সংস্কৃতি। অন্যভাবে বলা যায়, মনুষ্য জীবনের অর্জিত স্বভাবের সার্বিক অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। তবু সূক্ষ্ম পরিস্রুত ও সুন্দর শোভন অভিব্যক্তিকেই আমরা বিশেষভাবে সংস্কৃতি বলি। কাজেই সংস্কৃতি হলো ভাব-চিন্তা-কর্ম ও আচরণে প্রকটিত জীবনেরই লাবণ্য। অতএব জীবন ধারণের ও উপভোগের প্রয়াসপ্রসূত মানব ক্রিয়া মাত্রই সংস্কৃতি।[৭৬]

আবার মানুষের সৃষ্টিশক্তির মোট পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। এই সৃষ্টি শক্তির জন্যই মানুষ-মানুষ; অন্য জীব থেকে স্বতন্ত্র। অন্য জীব প্রকৃতির বশ, কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকেও বশ করে। কারণ মানুষ গড়তে পারে, সৃষ্টি করতে পারে। যে কৃতি বা সৃষ্টি সহায়ে মানুষ-মানুষ, প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী- তাই সংস্কৃতি। সংস্কৃতি বলতে তাই বোঝায়- সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (sciences) ও সমস্ত সৃষ্টি সম্পদ (arts), অর্থাৎ যা আমরা জেনেছি (প্রকৃতির নিয়ম নীতি প্রভৃতি), যা আমরা করেছি (যন্ত্র-শিল্প, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, নৃত্যগীত, কাব্যকলা প্রভৃতি)। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই একটি এলাকা। আর শিল্প বলতে বোঝায় বাস্তব সৃষ্টি আর মানস সৃষ্টি দুই-ই। কারণ দুই-ই সৃষ্টি; কারুকলা (crafts) ও চারুকলা (arts) দুই-ই তাই সংস্কৃতির পরিচয় দেয়।[৭৭]

সুতরাং মোটা দাগে সংস্কৃতি বলতে কোন জাতি বা গোষ্ঠীর জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কেন্দ্রিক কর্ম অর্থাৎ সমাজ জীবনের আচার-ব্যবহার, রীতি-রেওয়াজ, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, নীতি-আদর্শ, সংস্কার-বিশ্বাস, উৎসব-পার্বণ, ঘর-ঘাট-হাট-বাট, তৈজস-আসবাব, অশন-বসন-আসন, কিংবা মানয জীবনের চারু-কারুশিল্প, শিক্ষা-সাহিত্য-সঙ্গীত-নৃত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য, ইতিহাস-দর্শন-গণিত-বিজ্ঞান এসব কিছুতেই বোঝায়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্যময়-চালচিত্রের রূপায়ণ ঘটেছে বিশ্বস্ততার সঙ্গে। মুকুন্দরাম অত্যন্ত নিপুণ ও দক্ষতার সঙ্গে বাঙালি জীবনের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে তাঁর কাব্যে জীবন্ত রূপ দান করেছেন। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্য' তাই বাঙালির সাংস্কৃতিক দলিলে পরিণত হয়েছে। বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবনের বিচিত্র দিক ও মাত্রাসমূহ সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নরূপ —

বিবাহ

মধ্যযুগীয় বাংলায় হিন্দু সমাজে সমবেদীয় দশ সংস্কার বিশেষভাবে অনুসৃত হতো। এ দশ সংস্কার হলো- গর্ভধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন ও বিবাহ।[৭৮] আর বাঙালি জীবনে বিবাহই হলো সবচেয়ে বড় আনুষ্ঠানিক সংস্কার। এ বিবাহ প্রক্রিয়াটি আবার বিভিন্ন ধাপে ধাপে অর্থাৎ পাত্র-পাত্রী দেখা, সুলক্ষণযুক্ত পাত্র-পাত্রী নির্বাচন ও বিবাহের দিনক্ষণ ধার্য করার মধ্যে প্রাথমিক পর্ব সম্পন্ন হতো। এরপর বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে গায়ে হলুদ, বর বরণ, বরকনের যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে দণ্ডায়ন, লাজ হোম, সপ্তপদীগমন, মধুপার্ক বা অর্ঘ্যদান, পানি গ্রহণ, কন্যাস্নান, বৃষচর্মের ওপর উপবেশন, পানচিনি, সপ্তর্ষিদর্শন, কন্যা সম্প্রদান, বধূবরণ, বাসর উপরতি বা পরিহার উদ্‌যাপন ও বউভাত আড়ম্বরের সঙ্গে পালন করা হতো।

বাঙালি সমাজে আবার বিভিন্ন প্রকারের বিবাহের রীতি প্রচলিত ছিল। যাজ্ঞবাল্ক্য স্মৃতি ও মনুসংহিতায় আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা- ১. ব্রাহ্ম, ২. দৈব, ৩. আর্য, ৪. প্রজাপত্য, ৫. আসুর, ৬. গান্ধর্ব, ৭. রাক্ষস ও ৮. পৈশাচ।[৭৯]

এছাড়াও সমাজে অনুলোম বিবাহ, প্রতিলোম বিবাহ, গোত্রে বিবাহ, অগোত্রীয় বিবাহ, অসমবর্ণ বিবাহ, বিধবা বিবাহ, বগু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, দেবরণ বা দেবর বরণ, শালিবরণ ও নিয়োগ প্রথার প্রচলন ছিল। আবার নর-

নারীর বিবাহের বয়সও মনুসংহিতায় নির্দিষ্ট করা ছিল। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে– মেয়ের ৮ বছর হলে, 'ছেলের হবে ২৪, আবার মেয়ের ১০ হলে ছেলের ৩০ এবং মেয়ের ১২ হলে ছেলের ৩৬ বছর হবার বিধান রয়েছে। আবার বিয়ের বয়স ভেদে স্মৃতিকারগণ মেয়েদের ৫ ভাগে বিভক্ত করেছেন; যথা- ১. নগ্নিকা ২. গৌরী (৮বছরের) ৩. রোহিনী (৯ বছরের) ৪. কুমারী বা কন্যা (১০ বছরের) ৫. রজস্বলা (১০ বছরের উপরের) প্রভৃতি।[৮০] এছাড়া বাঙালি বিয়েতে ঘটক বা ঘটকালী প্রথার ব্যাপক প্রভাব প্রচলিত ছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও' বাঙালির বিবাহ বিষয়ের সামগ্রিক চিত্র পরিলক্ষিত হয়—

এখানে সমগোত্রীয় বিয়ের চিত্র অর্থাৎ দুই ব্যাধ পরিবারের মধ্যে কালকেতু-ফুল্লরা দুই বণিক পরিবারের মধ্যে ধনপতি-খুল্লনা এবং বণিক-সামন্ত পরিবারের মধ্যে শ্রীমন্ত-সুশীলা-জয়াবতীর বিবাহ সম্পন্ন হতে দেখা যায় —

পাত্র নির্বাচন

বাঙালি সমাজে বিবাহের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত বংশ কৌলিন্য, অর্থবিত্ত, বিদ্যাবুদ্ধি ও কর্ম বা পেশাকে গুরুত্ব দেয়া হতো। এছাড়া পুরুষের শ্রেণিবিভাগ হিসেবে শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব প্রকৃতির স্বভাব- বৈশিষ্ট্যও নির্ণয় করা হতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' শিবের, কালকেতুর ও ধনপতি সওদাগরের বিবাহের সময়ও এরূপ গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর গুরুত্ব দিতে দেখা যায় —

ক. খুল্লনার বিবাহের পাত্র নির্বাচন (ধনপতি)

'গঙ্গার দুকূল পাশে জতেক বণিক বৈসে
খুল্লনার জুগ্য নাহী বর।
তোমার কন্যার মত বর ধনপতি দত্ত
কুলেশীলে রূপে গুণবাণ।

,,,

আমার বচনে সাধু কর অবগতি
তোমার কন্যার জুগ্য বর ধনপতি।
গৌড়ে বিখ্যাত জার স্নান উজবানি
সাধু বেক্তি ভূপতি-সভায় আগমনি
জেনরূপ তেনগুণ উত্তম বেবহার
দেব দ্বিজ গুরু ভক্ত শুদ্ধ সদাচার।' –(পৃ-১১৩)

খ. ফুল্লরার বিবাহের পাত্র বাছাই (কালকেতু)

'চন্দ্রকেতু পিতামহ পিতা ধর্মকেতু
তারপুত্র কালকেতু গুণযশ হেতু।
দশম বৎসর জুঝে জেন মত্ত হাথি
অর্জুন সমান জার ধনুকের খ্যাতি।
সেই বর জুগ্য কন্যা তোমার ফুল্লরা
খুজিয়া পাইল জেন হাড়ির মুঞের সরা।' –(পৃ-৪২)

পাত্রের দারিদ্র্য ও সমাজ বাস্তবতা

তৎকালীন বাঙালি সমাজেও দারিদ্র্য ছিল জীবনের অভিশাপ স্বরূপ। তাই বিবাহের পাত্র নির্বাচনের সময় দরিদ্র-অভাবগ্রস্ত পাত্রকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হতো। কুলগৌরবের সঙ্গে সঙ্গে তাই আর্থিক স্বচ্ছলতার দিকেও গুরুত্ব দেয়া হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' গৌরীর বিয়েতে গরীব পাত্র-শিব সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে ব্রাহ্মণরূপী শিব গৌরীকে বলেছেন —

'শুন গো গুণময়ী তোমারে হিত কহি
দরিদ্রে কেহ না আদরে।
দরিদ্র পতি জার বিফল জন্ম তার
দারিদ্র্যে গুণ রাশি নাশে
গৃহিণী হইবে ভিক্ষে জর্ম জাইবে দুঃখে
দরিদ্রে কেহ না সম্ভাষে।
,,,
সে বোলে করি ভর তপস্যা নিরন্তর
সুনারী ভজে সুপুরুষে।' –(পৃ-১৯)

পাত্রী নির্বাচন

বাঙালি সমাজে বিবাহের পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কন্যার বংশ, রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক সুগঠনকে গুরুত্ব দেয়া হতো। এছাড়া নারীকে স্বভাব-সুলক্ষণ হিসেবে পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী, হস্তিনী পর্যায়ে বিভাজন করা হতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, 'গৌরী, ফুল্লরা ও খুল্লনার বিবাহের সময়ও এসব বিষয়ের উপর যথেষ্ঠ গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল —

ক. ফুল্লরার রূপ-গুণ (কালকেতুর বিবাহের পাত্রী)

'ব্যাধ বলে এই কন্যা নামেতে ফুল্লরা।
কিনিতে বেচিতে ভাল জানএ পশরা ॥
রন্ধন করিতে ভাল এই কন্যা জানে।
বন্ধু মিলি রূপ গুণ ইহার বাখানে ॥' -(আব্দুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা. পৃ-১৪)

খ. খুল্লনার রূপ (ধনপতির বিবাহের পাত্রী)

'খুলনার রূপ দেখি বলে রম্ভাবতী
আমার খুলনা কন্যা আন্ধারের বাতি।
খুলনার রূপে কারে দিবগ তুলনা
ডাকিয়া রবির রথ রাখয়ে খুলনা।' –(পৃ-১১২)

ঘটকালী প্রথা

বাঙালি সমাজে বিবাহের অনুঘটক হিসেবে কাজ করে ঘটক। এদেশে এক শ্রেণির ব্রাহ্মণগণ ঘটকালীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। পরবর্তীকালে এ ঘটকালী বংশগত পেশায় পরিণত হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই বিবাহের ক্ষেত্রে ঘটকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' শিব-গৌরী, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-লহনার বিবাহে নারদ, সোমাই পণ্ডিত ও দনাই পণ্ডিত ঘটকালীর দায়িত্ব পালন করেন এবং দান-দক্ষিণা লাভ করেন —

ক. সোমাই ঘটক

'সোমাই পণ্ডিত সনে বসি এক স্থলে
চরণে ধরিয়া ধর্মকেতু কিছু বলে।

,,,

সুতের বিভার হেতু করি অভিলাষ
কিরাত নগরে কর কন্যার তপাষ।
এত যদি বৈল ব্যাধ দ্বিজের বরণে
ফুল্লরা সঞ্জম সুতা পড়ে তার মনে।

,,,

পণের নিয়ম কৈল দ্বাদশ কাহন
ঘটকালী পাবে ওঝা দ্বাদশ পণ
পাঁচগণ্ডা গুবাক দিব গুড় তিন সের।' −(পৃ-৪২)

বর সজ্জা

বাঙালি সমাজে বিবাহের সময় বরকে গায়ে হলুদ দিয়ে স্নান করানো হয় এবং বিভিন্ন শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের মধ্য দিয়ে সাজ-সজ্জা করিয়ে বর যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়। বর মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে বিবাহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' শিব, কালকেতু ও ধনপতির বিবাহের সময় বর হিসেবে তাদেরকেও এভাবে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে দেখা যায়−

ধনপতির সাজ-সজ্জা

'শুভক্ষণে ছান্দলা টানায় সদাগর।
আঙ্গিনা সমাজে চন্দন চৌক পুরে
কুসুম চন্দন বিভেষিত কলেবরে।' −(পৃ-১২৩)

কনের অধিবাস ও সাজ-সজ্জা

বাঙালি হিন্দু সমাজে বিবাহের কন্যা বিবাহের পূর্বদিন অধিবাস পালন করে এবং গায়ে হলুদ, স্নান, অলংকার সহযোগে সাজ-সজ্জা করে থাকে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' গৌরী, ফুল্লরা ও খুল্লনাকে বিবাহের সময় এমন আনুষ্ঠানিকতা করতে দেখা যায়। এছাড়া শ্রীমন্ত সুশীলাকে বিবাহের পূর্বদিন নিরামিষ ভোজন করে−

খুল্লনা

'সকল দোষহীন হইল শুভ দিন
ধরে কন্যা মনোহর বেশ
হরিদ্রারঞ্জিত ধুতি পরাই রম্ভাবতী
বৈসে রমা জনক সকাশে।
খুল্লনার গন্ধ অধিবাস
জতপুর নিতস্বিনী বদনেতে জয়ধ্বনি
রম্ভাবতী হৃদএ উল্লাস।' −(পৃ-১২২)

বিবাহের আলোক সজ্জা

বাঙালি সমাজে বিবাহ উপলক্ষে কনের বাড়িতে আলোক সজ্জায় সজ্জিত করা হয়। ঘর-দুয়ার লেপা-পোছা করে আল্পনা আঁকা হয়। বিবাহ পড়ানোর মণ্ডপ স্থাপন, কলাগাছ রোপন, সামিয়ানা-চান্দা টানানো এবং আতশ-বাজি,

নৃত্য-গীত, ঢাক-ঢোলের সহযোগে কনের বাড়ি সরব হয়ে ওঠে। ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ শিব-গৌরী, কালীকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনার বিবাহ উপলক্ষ্যে এভাবে কনের বাড়ি সজ্জিত করা হয় ––

গৌরীর পিত্রালয়ের আলোক সজ্জা

‘আসিঞা মুনিগণ করিল শুভক্ষণ
বান্ধিল বিচিত্র ছান্দলা
মুকুতার মনি বান্দা টানাইল পাট চান্দা
চৌদিকে জালেন দীপমালা।
সকল দোষহীন আর্জি শুভদিন
গৌরীর বিবাহ মঙ্গল
শঙ্খ বেণু বীণা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে হইল কোলাহল।’ –(পৃ-২০)

বর-বরণ

বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবাহে বর কন্যার পিত্রালয়ে পৌছালে কন্যার মাতা জামাতাকে বিভিন্ন শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের বিধান মোতাবেক ধান-দূর্বার আশীর্বাদ সমতে বরণ করে নেয়ার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ শিবকে মেনকা, কালকেতুকে হীরাবতী ও ধনপতিকে রম্ভাবতী বরণ করে নিয়েছেন ––

‘প্রেম লোচন জলে সাধু হইল অন্ধ
কোলে করি জামাতার শিরে দিল গন্ধ।
বসাইল জামাতারে লোহিত কম্বলে
কেহ জল দেই কেহ চরণ পাখালে।
অঙ্গুরি অঙ্গদ হার ভূষণ চন্দন
দিয়া লক্ষপতি করে বরের বরণ।
তবে রম্ভাবতী স্ত্রী-আচার করে যথাবিধি
বরের চরণে পাদ্য ঢাল্যা দিল দধি।
রম্ভা সুতা দিয়া জোঁখে বরের অধর
তেনমত জোঁখে পুন দুইখানি কর।
সেই সুতা বাঁধ্যা রাখে খুল্লনার বসনে
সাধু রাহিবে জেন নিগুঢ় বন্ধনে।
আনিল আইবড়ার সুতা লাটাই সহিত
সাতকের ফেরা দিয়া করিল বেষ্টিত।
সেই সুতা বান্ধ্যা থুইল খুল্লনার অঞ্চলে
গালাগালি দিতে যেন মুখনাঞ চলে। –(পৃ-১২৪)

বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা ও আচারসমূহ

বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবাহে বর কন্যার জাতকর্ম বা ক্ষৌরকর্ম, নান্দীমুখ, অগ্নিকে সাক্ষী রেখে পাহি গ্রহণ, গাটছাড়া বেঁধে সাতপাক, অরুন্ধতী বা সপ্তর্ষি দর্শন, শুভদৃষ্টি, পানচিনি প্রভৃতি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়। ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ শিব-গৌরী, কালকেতু-ফুল্লরা, ধনপতি-খুল্লনার বিবাহতেও এমন আনুষ্ঠানিকতার পরিচয় মেলে–

ধনপতিকে রম্ভাবতীর বরণ

'সকল দোষহীন হইল শুভ দিন
ধরে কন্যা মনোহর বেশ।
হরিদ্রারঞ্জিত ধুতি পরাইল রম্ভাবতী
বৈসে রমা জনক সকাশে।
খুল্লনার গন্ধ অধিবাস
জতপুর নিতম্বিনী বদনেতে জয়ধ্বনি
রম্ভাবতী হৃদত উল্লাস।

,,,

ঘৃত দিআ সাত ডোরা কাঁথে দিল বসুধারা
কৈল নান্দিমুখের বিধান

,,,

সাধু করে কন্যাদান বিপ্রগণে বেদ গান
নাচে গায় রঙ্গে বিদ্যাধরী
সপ্তস্বরা শঙ্খধ্বনি পট্টই দুন্দুভি বেনি
আনন্দিত ইছানী নগরী।
পাট চড়ি রূপবতী প্রদক্ষিণ করে পতি
শুভমুখে দুইজনে ছামনি
দিলেন পতির গলে আপনার কণ্ঠমানে
রামাগণ দিল জয়ধ্বনি।

,,,

শয্যা ঝারি ধেনু থালা দাসী গজ দোলা ঘোড়া
দিয়া জামাতার কৈল মান।
বাজএ মঙ্গল পড়া দ্বিজে বান্ধে গ্রন্থচূড়া
বরকন্যা দেখি অরুন্ধতী
বন্দিয়া রোহিণী সোম লাজগুনি কৈল হোম
দুহে কৈল অনলে প্রণতি।
দাম্পত্যে প্রবেশে ঘরে খিরখণ্ড ভোগ করে
কুসুম শয়নে গেল রাতি।' –(পৃ-১২২-১২৫)

বিবাহ ভোজ ও উপহার

বাঙালি সমাজে বিবাহের ভোজ হিসেবে কন্যা পক্ষ বর যাত্রীদের সাধ্যমতো উত্তম খাবার পরিবেশন দ্বারা সন্তুষ্টি বিধান করতে চেষ্টা করে। আবার জামাতাকে ছাড়াও পুরোহিত, ঘটক ও পাত্রের পিতাসহ আত্মীয়দের বিভিন্ন দানসামগ্রী-দক্ষিণাও উপহার দ্রব্য প্রদান করা হয়। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপিত-খুল্লনার বিবাহে এ চিত্রটি চমৎকারভাবে উন্মোচিত হয়েছে–

কালকেতুর বিবাহের ভোজ ও উপহার

‘দুহে প্রবেশিয়া ঘরে　　মীনমাংস ভোগ করে
রাত্রি গেল কুসুম শয্যায়
সচিন্তিত ধর্মকেতু　　কুটুম্ব জিজ্ঞাসা হেতু
বেহাইকে মাগিল বিদায়।
বৈবাহিক চরণে পড়ি　　বেবহার কৈল বাড়ি
সাতনলা জাল আঠা ফান্দে
পাথরে আমানি ভরি　　দিল সঞ্জমের নারী
ফুল্লরারে কোলে করি কান্দে
ইষ্টকুটুম্ব জাতি　　সঞ্জমের জত জ্ঞাতি
অভিলাষ পুরিল জৌতুকে।’ –(পৃ-৪৪)

বধূ বরণ

বাঙালি সমাজে সাধারণত বর কন্যাকে বিবাহ করে পিত্রালয়ে নিয়ে যায়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোতে কনেকে স্বামীর গৃহে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়িতেই সারা জীবন কাটাতে হয়। নববধূকে শাশুড়ি ধান-দুর্বা, সোনার গহনা, টাকা-পয়সা দিয়ে আশীর্বাদ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নেয়। ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ পুত্রবধূ ফুল্লরাকে নিদয়া আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করে নিয়েছে —

ক. ফুল্লরাকে বরণ

‘শ্বশুরে বিদায় করি　　আইল বীর নিজ পুরী
ফুল্লরা সহিত সবিনয়
শিরে দিয়া দুর্বা ধান　　নিছিয়া পেলিল ধান
নিদয়া দিলেন জয়।’ –(পৃ-৪৪)

আশীর্বাদ

বাঙালি হিন্দু সমাজে নব দম্পতিকে শ্বশুর-শাশুড়ি সহ অভিভাবক শ্রেণি গহনা টাকা-পয়সা ও দান-দক্ষিণা, সহকারে আশীর্বাদ করার রীতি প্রচলিত আছে। ছেলেদের ক্ষেত্রে রাম-লক্ষ্মণ ও অর্জুনের মতো ধার্মিক-শক্তিশালী-পাণ্ডিত্বের ও শতায়ুর আশীর্বাদ করা হতো। অন্যদিকে মেয়েদের ক্ষেত্রে সতী-সীতা-সাবিত্রীর পতিপ্রাণা, নিষ্কলঙ্ক, সংসারী, শত　সন্তানের জননী, পাকা চুলে সিদুর পাড়া ও শতায়ুর আশীর্বাদ করা হতো। ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ কন্যা সতীকে দক্ষপ্রজাপতি ও পুত্র শ্রীমন্তকে মা খুল্লনা আশীর্বাদ করে বলেছেন —

ক. সতীকে দক্ষপ্রজাপতি

‘দক্ষের চরণে চণ্ডী করিলা প্রণতি
হেটমুখে আশিষ করেন প্রজাপতি।
আয়্যাতে জাউক কাল ঘুচুক দুর্গতি
চিরজীবী হৌক স্বামী সুস্থির সুমতি।’ –(পৃ-১১)

খ. শ্রীমন্তকে ধনপতির আশীর্বাদ (অপরিচিত অবস্থায়)

‘তোমা হইতে দূর হইল আমার বিষাদ
মহাদেব পূজিয়া করিব আশীর্বাদ।
নিশ্ছিদ্রে করিহ রাজ্য দীর্ঘ পরমাই
পিতা-মাতা সুখে থাকুক হইয় সাত ভাই। –(পৃ-২৮৫)

বাসর ও ফুল সজ্জা

বাঙালি সমাজে সাধারণত বরের বাড়িতেই বাসর বা ফুল সজ্জা হয়ে থাকে। তবে কিছু আদিবাসী সমাজ বা মাতৃতান্ত্রিক সমাজে কনের বাড়িতেই নব দম্পতির বাসর হবার প্রথা চালু রয়েছে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' তাই কালকেতু ও নিঃস্ব শিবের বাসর কন্যার পিত্রালয়ে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। কিন্তু বণিক ধনপতির বাসর হয়েছে তার নিজের বাড়িতেই। তৎকালে বাসর বা ফুল সজ্জার রাতে নব দম্পতিকে পাশা খেলা, ধাধা-প্রহেলিকা সমাধান, রতিলীলা পরিহার, আয়াদের সঙ্গে ঠাট্টা-রসিকতা করতে দেখা যায়। ধনপতি খুল্লনাকেও বাসর রাতে পাশা ও জুয়া খেলতে দেখা যায় —

'দম্পত্যে প্রবেশে ঘরে খিরখণ্ড ভোগ করে
কুসুম শয়নে গেল রাতি।
,,,
জুয়া খেলা কৈল সাধু খুল্লনার সনে
খুল্লনার জয় দেখি হাসে রামাগণে।' –(পৃ-১২৫)

দাম্পত্য ধারণা ও পতিভক্তি

তৎকালীন হিন্দু সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের প্রতি নর-নারীর বিশেষত নারীর উচু ধারণা বিদ্যমান ছিল। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ও ধর্মের প্রভাবে স্বামীকে বাঙালি রমণীগণ দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো এবং স্বামী-সংসার ও সন্তানের কল্যাণে সকল জুলুম নির্যাতন সহ্য করতো মুখ বুজে। তাই স্বামীর অপমান বাঙালি নারীরা সহ্য করতো না, এবং স্বামী প্রেমে উজ্জীবিত হয়ে অনেক সময় সহমরণে আত্মাহুতি পর্যন্ত দিয়েছে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' সতী স্বামী শিবের অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মাহুতি দিয়েছেন, গৌরী স্বামীর মর্যাদা রক্ষার্থে পিত্রালয় ত্যাগ করেছেন, ফুল্লরা স্বামীর বিপদে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে কালকেতুকে মুক্ত করতে চেয়েছে এবং খুল্লনা স্বামীর দীর্ঘ প্রবাস জীবনেও নিজেকে স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠ ও সতী সাধবী রেখেছে —

ক. ফুল্লরার দৃষ্টিভঙ্গি

'স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার বিধাতা
স্বামী পরম ধন বিনে স্বামী অন্য জন
কেহ নহে মুখ মোক্ষ দাতা।
সন্তোষে বসায় খাটে দোষ দেখি নাক কাটে
দণ্ডে রাজা বনিতার পতি।'–(পৃ-৬১)

খ. সতীত্ব রক্ষার প্রতি জোর

'পুরান বসন ভাতি অবলা জনের জাতি
রক্ষা পায় অনেক জতনে
জথা তথা উপস্থিত দুহাকার অনুচিত
হিত বিচরিয়া দেখ মনে।
শৈশবে রক্ষিতা তাত যৌবনে পরান নাথ
বৃদ্ধকালে তনয় রক্ষিতা।' –(পৃ-১৮০)

দাম্পত্য কলহ ও মানভঞ্জন

যে বাঙালি নারী স্বামী-সংসার-সন্তানের মঙ্গলের জন্য সব কিছু অকাতরে বিলিয়ে দিতে পারে, সেই নারীই আবার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ ও অপমানের প্রতিবাদে সরব হয়ে ওঠে। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' উদাসীন নিষ্কর্মা শিবের আচরণে গৌরী স্বামীর সঙ্গে কলহ করেছেন, ফুল্লরা ও চণ্ডী রূপী ঘোষ বধূকে সতীন ভেবে স্বামী কালকেতুকে বকা-ঝকা করেছে, তার লহনা স্বামী ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহ উপলক্ষ্যে প্রথম দিকে প্রতিবাদ, কলহ ও অভিমান করেছে। তবে এ কলহের পেছনে আর্থ সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্বার্থ, স্বপ্ন ভঙ্গের যৌক্তিক কারণও বিদ্যমান রয়েছে —

ক. গৌরী-শিবের কলহ

'আমি ছাড়িব ঘর জাইব দেশান্তর
কি মোর ঘর করণে
হইয়া সতন্তর তুমি করহ ঘর
লইআ গুহ গজাননে।
কতেক ঘরে আনি লেখা নাঞি জানি
ডেড়ি অন্ন নাহি থাকে
কতেক ইন্দুর করয়ে দরদুর
গুনারি মুষার পাকে।' –(পৃ-২৭)

খ. লহনা-ধনপতির কলহ

'খুড়া হইয়া দেই সতা কারে কব দুঃখ কথা
কারে বা করিব অভিমান
বরঞ্চ মরণ ভাল হৃদয়ে রহিল সাল
সে এরে করহ সাবধান।
পায়রা উড়াবার ব্যাজে গেলা প্রভু নিজ কাজে
জানিল এসব বারতা
সম্বন্ধ নির্ণয় হইল ইবে সে লহনা মৈল
হরি হরি বিমুখ বিধাতা।' –(পৃ-১১৯)

লহনার মানভঞ্জন

ধনপতির দ্বিতীয় বিবাহের খবর শুনে প্রথমা স্ত্রী লহনা স্বাভাবিক ভাবেই স্বামীর প্রতি অভিমানে ফেটে পড়ে। কিন্তু ধনপতির বাকচাতুর্যে এবং একটি পাটের শাড়ি ও পাঁচ পল সোনার চুড়ি উপহার পেয়ে স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েতে সম্মতি দিয়েছে। কারণ তৎকালীন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাবির মুখে লহনাকে অনুমতি দান না করে টিকে থাকার উপায় ছিল না —

'লহনা লহনা বলি ডাকে সদাগর
অভিমানে সাধে রামা না দেই উত্তর।
ইঙ্গিতে বুঝিয়া লহনার অভিমান
কপট প্রবন্ধে সাধু লহনা বুঝান।
রূপ নাশ কৈলে প্রিয়ে রন্ধনের শালে
চিন্তামণি নঠ কৈলে কাঁচের বদলে।

,,,

মাসি-পিসি মাতুলী বহিনী সতিনী
নাহি কেহ রহে ঘরে হইয়া রান্ধনি।
যুক্তি যদি লয় মনে কহিবে প্রকাশি
রন্ধনের তরে আমি আন্যা দিব দাসী।
সদাগর বলে জত কপট প্রকাশ
উত্তর না দেই রামা ছাড়এ নিঃশ্বাস।

,,,

পরিতেষে লহনারে দিল পাট সাড়ি
পাঁচ পল সোনা দিল পরিবারে চুড়ি।
সাধু বলে প্রিয় তুমি আছ মোর মনে
পূর্বে আছিলে জেন বিবাহের দিনে।' –(পৃ-১১৯-১২০)

নারীর ঝগড়া ও কলহ

বাঙালি সমাজে নারী যেমন শান্ত, কোমল ও সর্বংসহা, তেমনি স্বামী ও সপত্নী বা সতীন প্রশ্নে কঠোর, অবিচল, নির্মম ও নিষ্ঠুর। স্বামীর দ্বিতীয় বিয়েকে বাঙালি নারী সমাজ কখনোই মন থেকে মেনে নেয়নি, আবার স্বামীকে কেউ অপমান করুক এটাও সহ্য করেনি। অন্যদিকে নিজ সংসারে সতীনের আগমন ঘটলে স্বামীর সোহাগে ভাগিদার ও সংসারের কর্তৃত্বের প্রশ্নে সতীনকে শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী বিবেচনা করে ঝগড়া ও মারামারি পর্যন্ত করেছে। তৎকালীন সমাজে প্রচলিত প্রবাদ ছিল- 'সতীন কেটে পায়ে আলতা পড়া।' মোট কথা সতীনের সংসারে ঝগড়া-বিবাদ ছিল স্বাভাবিক তথা অনিবার্য ঘটনা। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'- স্বামীর অপমানে গৌরী ও মেনকার মায়ে-ঝিয়ের ঝগড়া, সতী ও দক্ষের ঝগড়া, অন্যদিকে লহনা-খুল্লনার মধ্যকার সতীনের ঝগড়া-মারামারির চিত্র পরিলক্ষিত হয়–

ক. লহনা-খুল্লনার ঝগড়া

খুল্লনা - 'তুমি আমি দুহে সাধুর নারী
সাধু বিনে হয় দুহার গারি।
ধন লোভে তুমি সাধুর দারা
তোমার আমি চেড়ি বটী পারা।' –(পৃ-১৩৮)

লহনা- অধিক ধিক বলে ছোট হয়্যা
শুনিস দুবলা রয়্যাছি সয়্যা।
কালি আইল বেটী মাথামউড়ি
আমা সনে আজি করে গুড়াগুড়ি।

,,,

হাথ খুল্লনার দৈব-বিপাকে
বাজিল বড় সতিনের নাকে।
কোপেতে লহনা আগুন জ্বলে
সভা সাক্ষি করি ধরিল চুলে।

কেশাকেশি দুহে অঙ্গনে ফিরে
প্রবোধিতে দুয়া দুহারে নারে।

,,,

কে বলে সতিনী ছোট নহে কাঁটা
এই মুখে চাহ গারির বাঁটা।

,,,

চুলে ধরি কিল লাথি মারে তার পিঠে
জৈ্যষ্ঠ মাসে গোহালা গোহালি জেন পিটে।' -(পৃ-১৩৮)

খ. স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া

খুল্লনা- 'শ্রীরাম রাবণে রণ সভয় দেবতাগণ
বিধি কৈল অকালে বোধন
চণ্ডী পূজা করি রাম রাবণে বিধাতা বাম
করিল সীতার উদ্ধারণ।'

ধনপতি- 'খুল্লনার কথাশুনি ধনপতি বলে বাণী
তুহুল আমার সহচরী।
মোর ব্রতভঙ্গ করি হইলী কুলের কালী
মায়্যা পূজা হইলী মোর ঐরি।' -(পৃ-১৯৯)

নাইয়র প্রথা

তৎকালীন বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই নারীর পিত্রালয়ে নাইয়র যাবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বছরের বিশেষ বিশেষ উৎসব, পূজা-পার্বন ও শস্যের বতর পরবর্তী অবসর সময়ে বাঙালি নারীরা শ্বশুর বাড়ি থেকে বাবার বাড়িতে আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর কাটাতে বা বেড়াতে নাইয়রে যেতো। বাবা-মা-আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাত, শ্বশুর বাড়ির লোকজনকে নিমন্ত্রণ করা ও নকশী কাথা সেলাই করতেই মূলত বাঙালি নারীরা নাইয়রে যেতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' সতীর ও লহনার বাবার বাড়িতে নাইয়র যাবার আকাঙ্ক্ষার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ——

সতীর নাইয়র

'চরণে ধরিয়া সাধি কৃপা করে কৃপানিধি
জাব পঞ্চ দিবসের তরে
চিরদিন আছে আশ জাইব বাপার পাশ
নিবেদন নাঞি করি ডরে।
সুমঙ্গল সূত্র করে আইলাঙ তোমার ঘরে
পূর্ণ হইল বৎসর সাত
দূর করে বিবাদ পুরহ আমার সাধ
মাতর রন্ধনে খাব ভাত।' -(পৃ-১১)

ঘর জামাই প্রথা

বাঙালি সমাজে সাধারণত ঘর জামাই প্রথাকে ঘৃণা, অবজ্ঞার চোখে দেখা হতো। কারণ- পিতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামোতে প্রায় সকল পুরুষেরাই নিজ পিত্রালয়ে বসবাস করাকেই সম্মানজনক বলে মনে করতো। তাই পারতপক্ষে যত কষ্টই হোক শুধু পুরুষ নয়, বরং নারীরাও আত্মসম্মান মর্যাদা রক্ষায় ঘর জামাই হওয়া থেকে এড়িয়ে চলতো। তবে কিছু আদিবাসী তথা নিম্নবর্ণের মাতৃতান্ত্রিক সমাজে ও নিষ্কর্মা অলস ও ব্যক্তিত্বহীন পুরুষেরা ঘর জামাই হতে দ্বিধা করতো না। এর পরিণাম চিরাচরিতভাবে অপমান, লাঞ্ছনা ও দুঃখ-যন্ত্রণা বয়ে আনতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' নিষ্কর্মা নেশাখোর শিবকেও গৌরীকে বিয়ে করে শ্বশুরালয়ে ঘর জামাই হয়ে থাকতো। শাশুড়ি মেনকার গঞ্জনায় গৌরীর তৎপরতায় শিবকেও স্ত্রী সন্তান নিয়ে কৈলাসে যেতে হয় —

'তোমায় ঝি হইতে মোর মজিল গার্য্যাল
ঘরে জাওভাঞি রাখিয়া পুষিব কতকাল।
প্রভাতে ভাতেরে কান্দে কার্তিক গণাই
চারি কড়ার সম্ভাবনা তোমার ঘরে নাঞি।
মিথ্যা কাজে ফিরে পাত নাঞি চাষবাস
ভাত কাপড় কত না জোগাব বার মাস।

,,,

অনুদিন কতেক সহিব উৎপাত
রাঁধিয়া বাড়িয়া মোর কাকালে হৈল বাত।

,,,

রাঁধ্যা বাড়িয়া মাতা কত দেহ খোঁটা
আজি হইতে তোমার দ্বারে দিল কাঁটা।
মৈনাক তনয় লইয়া সুখে কর ঘর
কত না সহিব খোঁটা জাই অন্যত্তর।
এত বলি জান গৌরী ছাড়িয়া মায়া মোহ
ঝলকে ঝলকে নয়নে পড়ে লোহ।' –(পৃ-২৫)

মাতৃস্নেহ ও মাতম

বাঙালি সমাজে সন্তানের প্রতি মায়ের মায়া-মমতা, আদর-যত্ন, স্নেহ-ভালোবাসা একান্তই অপার্থিব, অকৃত্রিম ও অপরিমেয়। বাঙালি মা তার সমগ্র জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখে এবং সবকিছুর বিনিময়েও সন্তানের মঙ্গলকামনা করে। এছাড়া সন্তানের অমঙ্গল ও দুর্ঘটনায় তার মাতমে পাষাণও বিদীর্ণ হয়ে যায়- 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' খুল্লনার প্রতি রম্ভাবতীর, শ্রীমন্তের প্রতি খুল্লনার ও সুশীলার প্রতি লীলাবতীর মাতৃস্নেহ ও সন্তান বাৎসল্যের পরিচয় মেলে —

ক. রম্ভাবতীর মাতৃস্নেহ

'প্রাণ নাথ কেনি হেন দিলে অনুমতি
হিতাহিত মনে গণ		নাঞি লব কন্যা পন
কেনি ঝিয়ে করাবে দুর্গতি।
পাড়্যা সুন্যা হইলে শিশু		ব্যয় করি নিজ বসু

কন্যা দিবে দারুণ সতিনে

,,,

খুল্লনা বাঁন্ধিয়া গলে ঝাঁপ দিব গঙ্গাজলে

নাঞি দিব দারুণ সতিনে

দুরন্ত ঝিয়ের মোহ নয়নে গলয়ে লোহ

লক্ষপতির ধরিয়া চরণে।' –(পৃ-১১৭)

খ. খুল্লনার মাতৃস্নেহ

'আরে বাছা আয় আয় আয়
কি নাগি কান্দে মোর শ্রীমন্ত রায়।
আনিব তুলিয়া গগন ফুল
একেক ফুলের গাঁথিয়া পরাব হার
সোনার বাছা মো না কান্দে আর।
গগণমণ্ডলে আড়িব ফাঁদ
বান্ধিয়া দিব তোরে শরদ চাঁন্দ।

,,,

যাওয়াব খিরখণ্ড পরাব চুয়া
কর্পূর পাকা পান সরস গুয়া।
রথ তরঙ্গ দণ্ডী জৌতুক দিয়া
রাজার দুই কন্যা করাব বিয়া।' –(পৃ-২১৮)

মাতৃভক্তি

বাঙালি সমাজে সবার কাছে মা অতি আপনজন, পরম পূজনীয় গুরুজন হিসেবে ভক্তি শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। বাঙালি সন্তান সর্বাবস্থায় গর্ভধারিণী মাকে স্মরণ রাখে এবং সকল শুভ কাজের শুরুতেই মায়ের আশীর্বাদ মাথায় করে নিয়েছে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' শ্রীমন্তের মাঝে মা খুল্লনার প্রতি অকৃত্রিম মাতৃভক্তি ও শ্রদ্ধার পরিচয় মেলে —

'কান্দে সাধু শ্রীয়পতি জননীর মোহে
বসন ভিজিল তার লোচনের লোহে।

,,,

দেখিল সপন জত সকল স্বরূপ
আমার বিলম্বে ঘরে নুটী কৈল ভূপ।

,,,

সুশীলার বিনয় শুনিঞা সদাগর
হেটমুখে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর।
সর্ব উপভোগ মোর মায়ের চরণ।' –(পৃ-২৯১-২৯৪)

পিতৃস্নেহ

বাঙালি সমাজে সন্তানের কাছে যুগ যুগ ধরে পিতা পরম দেবতা হিসেবে ভক্তি-শ্রদ্ধায় পূজিত হয়ে এসেছে। বাঙালি সন্তানগণ পিতার কথা, আদেশ-নিষেধকে বেদ বাক্য হিসেবে মান্য করতো। সকল কাজ ও প্রয়োজনে পারতপক্ষে কোন সন্তানই পিতার অবাধ্য হতো না এবং পিতাও তার সন্তানকে তাদর স্নেহ মায়া মমতায় যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখে সকল বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে এসেছে। সন্তানের মঙ্গলে সকল আয়োজনও সম্পন্ন করতে দেখা যায়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' শ্রীমন্তের প্রতি ধনপতির এবং সুশীলার প্রতি রাজা সালবাহনের পিতৃস্নেহের ফল্গুধারার বাহিঃপ্রকাশ ঘটেছে–

'কান্দে রাজা সালবান মোহে হয়্যা অজ্ঞান
বেহাইর ধরিয়া চরণ
জুড়িয়া উবয় পানি বলে সবিনয় বানী
সুশীলা করিয়া সমর্পন।

পিতৃভক্তি

বাঙালি সন্তানের কাছে পিতা আবহমানকাল থেকেই দেবতা জ্ঞানে পূজিত হয়ে আসছে। সন্তানেরা পিতার কথা, আদেশ নিষেধ বেদ বাক্য হিসেবে অক্ষরে অক্ষরে মান্য করতো। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ও প্রয়োজনে পিতাই হতো সন্তানের বল-ভরসা-শক্তি-সাহসের আশ্রয় স্থল এবং কেউ পিতার অবাধ্য হতো না।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' পিতা ধনপতির প্রতি পুত্র শ্রীমন্তের অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাত সমুদ্র তেরো নদী পাড়ি দিয়ে সুদূর সিংহলে গিয়ে পিতাকে উদ্ধার করেছে —

সিংহলে গেলেন বাপ সাজিয়া তরনি
জীবন মরণ কথা একুই না জানি।
মায়ের আয়্যত হাতে আমিষ্য ভোজন
কত না সহিব জ্ঞাতি বন্ধুর গঞ্জন।
চলিব পাটন রায় চলিব পাটন
দেখিব লোচন ভর্যা বাপের চরণ।

,,,

পিতার উদ্দিশ হেতু চলিব পাটন
ইথে যদি হয় মৃত্যু পাব নারায়ণ।
পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ তপজপ পিতা
পিতা মহাগুরু পিতা পরম দেবতা।' –(পৃ-২৩২)

সাধভক্ষণ ও সাধের ব্যঞ্জন

সাধারণত বাঙালি সমাজে গর্ভবতী নারীকে চার মাসে সীমন্তোন্নয়ন, পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত, ছয় মাসে পরমান্ন ভোজন, সাত মাসে সাধভক্ষণ, নয় মাসে নববস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত রয়েছে। ধনী-গরীব নির্বিশেষে সাধ্যানুযায়ী পছন্দের খাবার ও নতুন বস্ত্রের মধ্যদিয়ে ধূমধামের সঙ্গে এ অনুষ্ঠান করা হয়। আর সাধভক্ষণের খাবার হিসেবে সাধারণত টক, ঝাল, পিঠা-পুলি, মাছ, শাক-সবজি, ফলমূলসহ পঞ্চাশ ব্যঞ্জনের ব্যবস্থা করা হতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' নিদয়ার ৯ মাসে রম্ভাবতীর ৭ মাসে ও খুল্লনার ৭ মাসে সাধভক্ষণের পরিচয় মেলে। এদের মধ্যে ব্যাধ নারী নিদয়ার সাধভক্ষণের চমৎকার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে —

'প্রাণনাথ কাল গর্ভ হইল কোন ফলে
আরুচা করিল বল উদন বেঞ্জন জল
পেটে ভোক মুখে নাহি চলে।
নিধানী করিয়া খই তথি মহিষের দই
কুলি করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি
যদি পাই মিঠা ঘোল পাকা চালিতার ঝোল
প্রাণ পাই পাইলে আমসি।
আমার সাধের সীমা ইঙ্গিচা পলতা গিম
বোআলি ঘাটিয়া কর পাক
ঘন কাঠি খর জ্বালে শান্তলিবে কুট তৈলে
দিবে তায় পলতার শাক।
পুই ডগি থুপি কচু ফুলবড়ি দিবে কিছু
দিবে তায় মরিচের ঝাল
হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জি উদর পুরিয়া ভুঞ্জি
প্রাণ পাই পাইলে পাকা তাল।
লোন কিছু দিবে বড়া নেউল গোধিকা পোড়া
হাঁসডিম্বে কিছু তোল বড়া
কিছু ভাজ বালিকড়া চিঙ্গড়ির তোল বড়া
সসারু কর শিকপোড়া।

,,,

মুলাতে বার্তাকু সিম তাহে দিয়া রান্ধ নিম
আর দেহ ডম্বুরের ফল।
নিদয়ার সাধ হেতু ঘরে জায় ধর্মকেতু
চাহিয়া আনিল আয়োজন।' –(পৃ-৩৯-৪০)

গর্ভ ধারণ ও গর্ভকালীন আচরণ

গর্ভধারণের প্রথম মাস থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ দশম মাস অবধি নারীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পট পরিবর্তন সাধিত হয়। চতুর্থ মাস থেকেই মূলত গর্ভের লক্ষণ প্রবল-প্রকট রূপে পরিলক্ষিত হয়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' নিদয়া, রম্ভাবতী ও খুল্লনার সন্তান গর্ভে ধারণ ও গর্ভকালীন আচরণ তথা বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রায়িত করা হয়েছে। এর মধ্যে রম্ভাবতীর গর্ভকালীন আচরণের চিত্র জীবন্ত রূপ লাভ করেছে–

'রিতুবতী হইয়াছে রম্ভা বাইনানি
বৈ জদি হইল তার অষ্টম যামিনী।
নবম দিবসে রিতু হইল অবশেষ

তার গর্ভে রত্নমালা করিল প্রবেশ।
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি
দুই মাসে জত লোক করে কানাকানি
ত্রিতিয় মাসের বেলা ভুতলে শয়ন
চারি মাসে করে রামা মৃত্তিকা ভক্ষণ।
পাঁচ মাসে রম্ভাবতীর না রুচে ওদন
ছয় মাসে কাজি করঞ্জায় গেল মন।
সাত মাসে বন্ধুগণ দেই তারে সাদ
নয় মাসে প্রসব বেদনা অবসাদ।
সাধুর কিঙ্কর ডাক্যা আনিল পারথি
শুভক্ষণে হইল তার কন্যা রূপবতী।' –(পৃ-১১১)

আতুড় ঘরের আচার

বাঙালি সমাজে সন্তানের ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই কতগুলো কর্মকাণ্ড লোকাচার হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এসবের মধ্যে আতুড় ঘরে চাল থেকে খড় পেড়ে অগ্নি প্রজ্জ্বলন, নাড়ী ছেদন, জোকার, ছয় দিনে ষষ্ঠী পূজা, সাত দিনে উঠানি, ছয়মাসে অন্নপ্রাশন, নাম রাখা, নান্দীমুখ যজ্ঞ, জাতকর্ম, এবং পাঁচ বছরে হাতেখড়ি ও কর্ণভেদ অনুষ্ঠান করা হয়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' নবজাতক কালকেতু, ফুল্লরা ও শ্রীমন্তের জন্মের সময়ও সন্তানের কল্যাণে ও লোকাচার হিসেবে এসব পালন করা হয়। এর মধ্যে ফুল্লরার আতুড় ঘরের লোকাচারসমূহ চোখে পড়ার মতো —

'সাধুর কিঙ্কর ডাক্যা আনিল পারথি
শুভক্ষণে হইল তার কন্যা রূপবতী।
ফেড়িয়া চালের খড় জালিল আতুড়ি
গোমুণ্ড স্থাপিআ দ্বারে পুজে ষষ্টি বুড়ি।
গুলাগুলি দিয়া কইল নাড়ির ছেদন
তিন দিনে কইল রামা সুপথ্য পাঁচন।
ছয়দিনে ষষ্টি পূজা কইল জাগরণে
আট কলাইআ তার কইল আট দিনে।
নত্বা কৈল নয় দিনে মনের হরিষে
একুষিয়া কৈল তার একইষ দিবসে।
খুলনা বলিআ নাম থুইল পূর্ণমাসে।' –(পৃ-১১১)

অন্ন প্রাশন

বাঙালি সমাজে সন্তানের মঙ্গলকামনায় সাধারণত পাঁচ বা ছয় মাসে অন্ন প্রাশনের আয়োজন করা হয়। ব্রাহ্মণ পুরোহিত আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্তানের মুখে খাবার তুলে দেন। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এর পরিচয় মেলে —

'চারি পাঁচ মাস গেল ছয় পরবেশ
অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।
গণক আইয়া নাম থুইল কালকেতু
গণকে দক্ষিণা দিল পরমাই হেতু।' –(পৃ-৪১)

কর্ণভেদ ও হাতেখড়ি

বাঙালি সমাজে শিশু সন্তানের পাঁচ বছর বয়সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে হাতেখড়ি ও কর্ণভেদ করানো হয়। বিদ্যা-শিক্ষায় সাফল্য কামানো করতেই মূলত আনুষ্ঠানিক এ পড়ালেখার যাত্রা শুরু হয়। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এর পরিচয় মেলে —

'লহনা খুল্লনা মেলি করেন জুগতি
শ্রীমন্তের কর্ণভেদ দুহে একমতি।
দুবলা ডাকিয়া আনে দনাই পণ্ডিত
প্রণাম করিয়া দ্বিজে করিল ইঙ্গিত।

,,,

করিল শ্রবণভেদ পঞ্চম বরিসে
মনোহার বেশ বালা দিবসে দিবসে।

,,,

শুনি বাক্য খুল্লনার দ্বিজ কৈল অঙ্গীকার
হাতেখড়ি দিল শুভক্ষণে।' −(পৃ-২২১-২২২)

জাওয়াতি বা জন্ম পঞ্জিকা

বাঙালি সমাজে শিশু সন্তানের ভবিষ্যৎ জানতে ব্রাহ্মণ চিত্রগুপ্তকে দিয়ে জাওয়াতি বা জন্ম পঞ্জিকা আনুষ্ঠানিক ভাবে লেখানো হতো। এর পরিচয় 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' পাওয়া যায় —

'দুবলা গণকগণে সম্ভ্রমে ডাকিআ আনে
দেখে তারা দীপিকা ভাস্বতী
পুরোধা পণ্ডিতগণে সর্বশাস্ত্রে বিক্ষেণে
লিখে তারা শিশুর জাওয়াতি।' −(পৃ-২১৭)

নাম রাখা বা নামকরণ

বাঙালি হিন্দু মুসলিম সমাজে শিশু সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়া হতো। যেমন- দেব-দেবী, পৌরাণিক চরিত্র, আল্লাহর গুণাবাচক নামসমূহ, নবী-রাসুল ও তাদের স্ত্রী-পুত্র, বিখ্যাত তাপস-তাপসী, ফুল, ফল, গ্রহ-নক্ষত্র, শস্য, মসলা, মাছ, মূল্যবান পাথর-রত্ন, অস্ত্র, রোগ, তৈজসপত্র, অঞ্চল বা জন্মস্থান, নদী, পেশা, বর্ণ গোষ্ঠী ও বিভিন্ন কিংবদন্তির সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে বাঙালি তাদের সন্তানাদির নাম রেখে আসছে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' নর-নারীর নামকরণ বা নাম রাখার ক্ষেত্রেও উপর্যুক্ত প্রভাব পরিলক্ষিত হয় —

ক. গৌরীর 'অপর্ণা' নামকরণ

'শিবপদ ধ্যান দেবী করেন অনুক্ষণ
বৃক্ষের গলিতপত্র করেন ভক্ষণ।
তেজিলা বৃক্ষের পত্র ছাড়ি অন্নপান
এই হেতু অপর্ণা ধরিলা অভিধান।' −(পৃ-১৮)

খ. বাঙালি মেয়েদের নামকরণের নমুনা

'সম্বন্ধ প্রসঙ্গে সায় দিল রম্ভাবতী
নিমন্ত্রিয়া জামাতারে আনে লক্ষপতি।

,,,

আইয় সুইয় আনিতে বিজয়া দাসী চলে

,,,

সৈ সাঙ্গাতিন ডাক্যা জয়া আনে বাড়ি বাড়ি।
অমলা বিমলা চাঁপা কমলা ভারথি
স্বর্ণরেখা পদ্মাবতী রতি কলাবতী।
বল্লভা দুর্লভা রম্ভা সুভদ্রা যমুনা
ভবানী তুলসী রানী শচী সুলোচনা।
হিরা তারা সরস্বতী মদনমঞ্জরী
কৌশল্যা বিজয়া গৌরী সুমিত্রা সুন্দরী।
যশোদা রোহিণী রাধা রুচী কাদম্বরী
চিত্রলেখা সুধা চন্দ্রা সীতা মন্দোদরী।' –(পৃ-১১৭)

শ্রাদ্ধ

বাঙালি হিন্দু সমাজে মৃত ব্যক্তির সদগতি ও স্বর্গ লাভ কামনা করে সাধারণ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রে মৃত্যুর ১০ দিনে, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিনে, বৈশ্যের ১৫ দিনে এবং শূদ্রের ৩০ দিনে শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করা হয়। অন্যদিকে মুসলিম সমাজে মৃত্যুর ৩য় দিনে মিলাদ, ৪০ দিনে চল্লিশা ও ১ বছরে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা হয়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতি সওদাগরকে তার পিতা জয়পতি দত্তের শ্রাদ্ধ পালন প্রসঙ্গে ব্রাহ্মণ দনাই পণ্ডিত বলেছেন–

'এই পুরী উজবনি তোমা জানে ধনে মানি
ধনপতি খ্যাত সদাগর

,,,

তুমি লোকে খ্যাত দাতা শুনিয়া শ্রাদ্ধের কথা
তোমার পিতার খ্যাত তিথি
আসিব ব্রাহ্মণ ভাট কড়ি চাহি পাটে পাট
জোড়া জোড়া কত শত ধুতি।
আমি তব পুরোহিত তবে হিতে মোর চিত
পিতৃকার্যে দেহ ভায়্যা মন
সেবক পাঠাও হাট বান্ধব আনিতে ভাট
করহ পিতার প্রয়োজন।' –(পৃ-১৭৭)

খাদ্য দ্রব্য

আবহমান কাল থেকেই বাংলার অধিবাসীদের বলা হতো 'মাছে ভাতে বাঙালি'। ভাত আর মাছই ছিল বাঙালির প্রধান ও প্রিয় খাবার। তবে হিন্দু-মুসলিম সমাজ খাবারের ক্ষেত্রে কিছু ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলতো। বৌদ্ধ ও নমঃ শূদ্ররা খাবারের ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীন ছিল। হিন্দু মুসলমানের প্রাত্যহিক খাবার হিসেবে ভাত, মাছ, ডাল, শাক-সবজি, নিরামিষ, খিচুড়ি, দুধ ও কলা ছিল প্রধান।

অভিজাত মুসলিম সমাজে মাংস-রুটি, বিরিয়ানী, খিচুড়ি, কোর্মা, পোলাও, কালিয়া, কাবাব, কোপ্তা, রেজালা, মোগলাই, আচার-চাটনি, সালাদ, কাসুন্দি, আমসি, টক-ঝাল ও খাটনার প্রচলন ছিল। মাংস প্রিয় মুসলমানগণ

গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া, হাস, মুরগির মাংস পছন্দ করতো। হিন্দু সমাজে মাংসের চেয়ে মাছ পছন্দনীয় ছিল। তবে মাংস হিসেবে ছাগল, কচ্ছপ প্রচলিত ছিল। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাবারের তালিকায় ছিল- পান্তাভাত, বাসীভাত, খুদের ভাত, জাউ, ছাতু, খাটনা, আলু পোড়া ওলপোড়া, চাল ভাজা, ডাল ভাজা, মরিচ বাটা ও বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা প্রভৃতি।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে'- খুল্লনার সাধভক্ষণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত রান্না থেকে বাঙালি নারীর পছন্দনীয় খাবারের তালিক পাওয়া যায়–

ক. খুল্লনার পছন্দের খাবার

'আপনার জায় মন যদি পাই সে বেঞ্জন
তবে খাই দুইচারি গ্রাস।
লতা পাতা বন শাক খরজালে কর‍্যা পাক
সান্তলিবে জোয়ানি ফোড়ায়্যা
সন্তলন বলি তথি হিঙ্গ জিরা দিয়া মেথি
বলি বলি যদি কর দয়া।
নিধানি করিয়া খই তথি দিয়া মস্যা দই
কুলি করঞ্জা প্রাণহেন বাসি
যদি কিছু পাই সুখ আম্রে মসুরের সুপ
প্রাণ পাই পাইলে আমসী।
দেখি জেমন সোনা শকুল মৎসের পোনা
গোটা কাসন্দি দিবে তথি
হরিদ্রা রজিত কাজি উদর পুরিআ ভুজি
বন-সাকে বড় সুখ তথি।
ঘোলে মিসাইআ লাউ দুগ্ধ তিলে গুড়ে জাউ
পিঠা কর খির নারিকেলে।' –(পৃ-২১৫)

মাছ

বাঙালির খাবারের তালিকায় যে সকল মাছের নাম পাওয়া যেতো তা হলো- ইলিশ, বোয়াল, রুই, পাঙ্গাস, শৈল, কৈ, পুটি, টেংরা, চিংড়ি, বাইন, খৈলসা, শিং, মাগুর, ফলি, চিতল, কাতল, ভেটকা, বাতাসি, মেনি, বাইলা, পাবদা, চান্দা, গুজি, পোনা মাছ, চ্যাং, গজার ও শুটকি প্রভৃতি।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, লহনার পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্নার সময় এমন মাছে উল্লেখ পাওয়া যায় —

'কটু তৈলে রান্ধে রামা চিথলের কোল
রুহিতে কুমুড়া বড়ি আলু দিআ ঝোল।

,,,

কটু তৈলে কই মৎস্য ভাজে গণ্ডাদশ

,,,

বদরি শকুল মীন রসাল মসুরি
পণ চারি ভাজে রামা সরল শফরি।

কথোগুলি তোলে রামা চিঙ্গড়ির বড়া

,,,

কিরা দিয়া রুইমুড়া দিল খুল্লনারে।' –(পৃ-১৫০)

শাক

বাঙালি তার প্রাত্যহিক খাবারে বিচিত্র ধরনের শাক খেতে পছন্দ করতো। এসব শাকের মধ্যে রয়েছে নলিতা (পাট), গিমা, পোলতা, লাউশাক, কুমড়া শাক, কলমি শাক, পালংশাক, লালশাক, সরিষা শাক, মটর শাক, শেচি শাক, খেসারি শাক ও বৈতা শাক প্রভৃতি।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' খুল্লনার সাধ ভক্ষণের ব্যঞ্জন রান্নার উদ্দেশ্যে দুর্বলা দাসী যে সকল শাক তুলে, তা অধিকাংশ বাঙালির প্রাত্যহিক খাবারের অংশ হিসেবে পরিচিত ––

'সাক তুলিতে রুয়া ফিরে বাড়ি বাড়ি
কাখে কর্‌য়া নিল দুয়া রঙ্গিন চুপড়ি।
নট্যা রাঙ্গা তোলে পাট পালঙ্গ নালিতা
তিত পলতার ডগা তুলিল পলতা।
সাজ্যাতা সাজ্যাতা বন পুই তুলে বালা
হিনচা কলমী শাক তোলে ডানিকলা।
কড়্যা সাক তোলে দুয়া ফিরে খেতি খেত
মহরি সোলপা ধন্যা খিরপাই বেত।
বাড়ি বাড়ি ফিরে দুয়া দিআ বাহু নাড়া
ডগী ডগী তোলে পুই পুনকা কাঁড়ো।
কোমল কাঁকুড়ি ডগা তুলিল করেলা
লাউডগা তোলে কিছু কচি কচি বলা।
বাছা ধুয়্যা শাক দুয়া করিল সাঁচনা
লতা পাতা শাক আগে রান্ধিল লহনা।' –(পৃ-২১৫)

সবজি ও ডাল

বাঙালি সমাজে সবজি হিসেবে- আলু, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, কচু, পটল, ঢেরস, ফুলকপি, পাতাকপি, বেগুন, করলা, উচ্ছে, ডাটা, মিষ্টি কুমড়া, মিষ্টি আলু ছিল প্রধান। আর ডালের মধ্যে অন্যতম ছিল - মুসুরি, খেসারি, মুগ, কলই, মটর, ছোলা, ডাবরি ও কালি মটর প্রভৃতি।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতির বাড়ির দুর্বলা দাসী বাজার থেকে যে সকল সবজি ও ডাল কেনে, তা বাঙালির প্রতিদেনের খাবারের তালিকায় পাওয়া যায় ––

'লাউ কিনে কচি কুমড়া বিশা দরে পলাকড়া
পাকা আম্র কিনে শয় মূলে

,,,

সাক বাগ্যান সারি কচু খাম আলু কিনে কিছু
বিশা শত আট কিনে লোন।

,,,

মুগ মাষ বরবটী কিনিল সরল পুঠি
সের জুখ্যা লয় ফুলবড়ি।' –(পৃ-১৫৮)

ফল-ফলাদি

বাঙালি সমাজে ফল হিসেবে আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, জাম্বুরা, জলপাই, আমড়া, আমলকি, কুলবরই, করঞ্জা, কামরাঙ্গা, কলা, পেয়ারা, পেঁপে, আনারস, লিচু, জামরুল, আপেল, কমলা, ডালিম, আতা, নাসপাতির প্রচলন ছিল।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' দুর্বলা দাসীকেও হাট থেকে এসব ফল-ফলাদি ক্রয় করতে দেখা যায় —

'পাকা আম্র কিনে শয় মূলে

,,,

কামরাঙ্গা কিনে পণ দুই।

কলা চাঁপা মর্তমান সরস গুয়া মিঠা পান

কর্পুর কিনিল শঙ্খ চুন

,,,

জুড়ি দরে নারিকল কুলি করঞ্জা পানিফল

কাঁঠাল কিনিল দুই কুড়ি

কিছু কিনে ফুলগাভা করুনা কমলা টাবা

সের দরে ঘৃতে ঘড়া ভরি।' –(পৃ-১৫৭-১৫৮)

শুকনো খাবার

শুকনো খাবার হিসেবে বাঙালি চিড়া, মুড়ি, খৈ, বিন্নি, বাতাসা, নাড়ু, লাড্ডু, কদমা, মোয়া ও গুড় খেতে পছন্দ করতো। অতিথি আপ্যায়নে এবং ভাতের বিকল্প হিসেবে এসব খাবারের কদর ছিল।

ক. 'ময়রা মুড়কি দেই সূত্রধরে দেই খই
তামুলিতে দেই গুয়া পান।' –(পৃ-২৬)

খ. 'আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি
চাপিয়া বসিল দোহে চৌখণ্ডি পিড়ি।' –(পৃ-৫৫)

পিঠা পুলি ও মিষ্টান্ন দ্রব্য

বাঙালি বিভিন্ন উৎসব পার্বণ ও ঋতু উপলক্ষ্যে দুধ, গুড় ও আতপ চালের গুড়ি দিয়ে বিভিন্ন ধরনের পিঠা-পুলি তৈরি করতো। এসব পিঠার মধ্যে- চিতই, ভাঁপা, পাটি সাপটা, পাকোয়ান, তালপিঠা, বড়া পিঠা, তিলকুলি, দুধকুলি, জলপিঠা, ভিজানো পিঠা, মোরগ সংসার, তেল চিতই অন্যতম। এছাড়া মিষ্টান্ন দ্রব্য হিসেবে গুড় (তাল, খেজুর, আখ), দই, ঘোল, ছানা, মাখন, পনির, ঘি, সন্দেশ, ছানাবড়া, লুচি, ক্ষীর, পায়েস, ফিরনি, রসগোল্লা, চমচম, অমৃতী অন্যতম।

১. 'দধি পিঠা খান সভে মধুর পায়স
ভোজন করিআ সভে লাজে হৈল বশ।' –(পৃ-১৯১)

২. 'খির তিল পিঠালিতে করিআ মণ্ডলী
তথি পরে থুয়্যা জায় সাতটি পুত্তলি।' –(পৃ-১৭৪)

মসলা

বাঙালি রান্নাবান্নায় মসলা হিসেবে- আদা, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, দারু চিনি, গরম মসলা, মরিচ, হলুদ, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, তেজপাতা, কালো জিরা, পেয়াজ, রসুন, ঘি ও তেল (সরিষা, তিল, সয়াবিন, তিশি) ব্যবহার করতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' দুর্বলা দাসী হাট থেকে বাজার করার সময় অন্যান্য দ্রব্যের সঙ্গে প্রয়োজনীয় মসলাও ক্রয় করেছিল, যা বাঙালির খাদ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত —

'নরম কিনে তালশাঁস হিঙ্গ জিরা রসবাস
চঞি মেথি জোহানি মহরি

,,,
তৈল সের দরে দেড় বুড়ি
তোলা মূলে তেজপাতা খির নিল বিশা শত
আদা বিশা দরে দেড় বুড়ি।

,,,
সেড় দরে ঘৃতে ঘড়া ভরি।' –(পৃ-১৫৮)

রান্না-বান্না

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই অভিজাত থেকে দরিদ্র দরিদ্র বাড়ির রান্না বান্না করতো গিন্নী ও বউ ঝিগণ। সকাল, দুপুর ও বিকাল বা রাত্রিকালীন রান্নার সময় সাধারণত পাক-পবিত্র হয়ে রান্না করার নিয়ম ছিল।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ব্যাধ গৃহিণী নিদয়া, বণিক স্ত্রী লহনা, খুল্লনা, রম্ভাবতী ও দেবী চণ্ডীকেও নিজ হাতে রান্না করে স্বামীকে ভোজন করাতে হয়েছে —

পতির আদেশ ধরি রান্ধেন খুল্লনা নারী
স্মঙরিয়া সর্বমঙ্গলা
লোন ঘৃত তৈল ঝাল আনি নানা বস্তুর হার
অনুচরী জোগায় দুবলা।
বাগ্যন কুমড়া কচা কাঁচকলা তাহে মোচা
বেসারি পিঠালি ঘনকাঠি
ঘৃতে সন্তলন তধি দিআ হিঙ্গু জিরা মেথি
শুক্তার রন্ধন পরিপাটি।

,,,
কিছু ভাজে বালিকড়া চিঙ্গিড়ার তোলে বড়া
খরুসালা পুঞ্জি দশ তোলে।
করিআ কণ্টকহীন আম্রেতে শকুল মীন
খর লোন দিআ ঘন কাঠি
রান্ধএ পাকান বাষ দিআ তেঁতুলের রস
খিরী রান্ধে জাল করি ভাটি।
কলাবড়া মুগ সাঙলি থিরোসা খিরের পুলি
নানা পিঠা রান্ধে অবশেষে।' –(পৃ-১৬০)

ভোজন

তৎকালীন বাঙালি সমাজে সামন্ত শাসক, বণিক তথা অভিজাত শ্রেণি পঞ্চাশ পদের ব্যঞ্জন দিয়ে সোনা-রূপার থালায় খাবার খেতো। এ সোনা-রূপার থালা-গেলাস আভিজাত্যের প্রতীক বলে গণ্য হতো। পক্ষান্তরে দরিদ্র শ্রেণি খুদ-জাউ-খাটনার মতো খাবার মাটির বাসনে করে খেতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ধনপতি ও কালকেতুর ভোজনে এরূপ দৃশ্যের পরিচয় মেলে ––

কালকেতুর ভোজন

'ঘরে হৈতে ফল্লরা বীরের পাইল সাড়া
সম্ভ্রমে বসিতে দিল হরিণের ছড়া।
মোকা নারিকেলেতে পুরিয়া দিল জল
ঝাট জল দিয়া কৈল ভোজনের স্থল।
পাখালিল মহাবীর পদ-পাণি মুখ
ভোজন করিতে বৈসে মনের কৌতুক।
সম্ভ্রমে ফুল্লরা পাতে মাটিয়া পাথরা
বেঞ্জনের তরে দিল নৌতুন খাপরা।
মুচড়িয়া গোফ দুটা বান্ধে নিয়া ঘাড়ে
এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে।
চারি হাঁড়ি মহাবীর খায় খুদ জাউ
সুপ ছয় হাঁড়ি তায় মিসাইয়া লাউ।
বুড়ি দুই তিন খায় আলু ওল পোড়া
সারি কচু ঘণ্টে মিশা করঞ্জা আমড়া।

,,,

শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিট্‌কাল
ছোট গ্রাম তোলে বীর জেন হাড়িয়া তাল।
ভোজন সময়ে গলা করে ঘড়ঘড়
কাপড় উষাষ করে জেন ময়াই বড়।
ভোজন করিআ সাঙ্গ কৈল আচমনে
নিশাকাল হৈল বীর রহিল শয়নে।' –(পৃ-৪৫-৪৬)

নেশাজাত দ্রব্য

বাঙালি সমাজে নেশাজাত দ্রব্যের মধ্যে ছিল- গাজা, ভাঙ, গুল, আফিম, ধুতুরার বিচি, চরস, তাড়ি ও ভাত থেকে পচানো মদ, আমানী ও সিদ্ধি প্রভৃতি। এছাড়া হালকা নেশা ও ধূমপান হিসেবে তামাক, পান, সুপারি ও জর্দার প্রচলন ছিল। ধনীরা বিত্তের বিকারে এবং গরীবেরা দুঃখ ভুলে থাকতে এসব নেশায় আসক্ত হতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' দেবতা শিবকে ভাঙ, ধুতুরা ফল ও সিদ্ধি সেবনে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। এছাড়া ব্যাধ কালকেতুকেও আমানী (দেশীয় মদ) পান করতে দেখা যায় ––

ক. 'আরোহণ বৃষবরে সিঙ্গা ডম্বুর করে
ভক্ষণ ধুতরার ফল।' –(পৃ-১২)

খ. ‘মুচুড়িয়া গোফ দুটা বান্ধে নিঞা ঘাড়ে
এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানী উজাড়ে।’ −(পৃ-৪৫)

অতিথি আপ্যায়ন

বাঙালি সমাজে অতিথি আপ্যায়ন হিসেবে সাধারণত হালকা খাবার যেমন- শরবত, চিড়া, খৈ, মুড়ি, গুড়, বিন্নি, বাতাসা, নাড়ু, লাড্ডু, কদমা, মোয়া, দুধ, কলা, সন্দেশ, প্রভৃতি খেতে দিতো। এছাড়া পান-সুপারি খাওয়া ও তামাক সেবন ছিল এরই অপরিহার্য অঙ্গ। অতিথিকে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী উপহার দেবার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

‘আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি
চাপিয়া বসিল দোহে চৌখণ্ডি পিড়ি।’ −(পৃ-৫৫)

মুখ শুদ্ধিকরণ

তৎকালীন বাঙালি সমাজে নর-নারীগণ খাবারের পর পান, কর্পূর খেয়ে মুখ শুদ্ধ করতো। ‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ ধনপতিকে এই খাবার গ্রহণের পরে পান ও কর্পূর খেতে দেখা যায় —

‘ভোজন সঙ্কলে সাধু স্মরহত মন।
ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন
কর্পুরে তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।’ −(পৃ-১২০)

পানের ব্যবহার

বাঙালি সমাজে পানো বহু বিচিত্র কাজে-কর্মে ব্যবহার করার প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রসাধনী হিসেবে অর্থাৎ ঠোঁট রাঙাতে, খাবার পর মুখ শুদ্ধিকরণ করতে, উপহার সামগ্রী হিসেবে, কোন কাজের শুরুতে বা সম্মতি দানের প্রতীক রূপে এবং আপ্যায়ন হিসেবে এর বহুল ব্যবহার ছিল।

ক. প্রসাধনী হিসেবে

‘দিনেক উপবাস মাতা দিনেক ভোজন
তেজিল তাম্বুল তৈল ভূষণ চন্দন।’ −(পৃ-১৮)

খ. বিবাহের উপহার সামগ্রী হিসেবে

‘তৈল সিন্দুর পান গুয়া বাটি ভর্য্যা গন্ধ চুয়া
বিদ দাড়িম্ব পাঁচ কাঠা।’ −(পৃ-১২১)

গ. কাজের সম্মতি, শুরু ও সম্পন্নের পুরস্কার হিসেবে

‘সাধুর বচন শুনি আনন্দিত নৃপমুনি
ডাকিআ আনাইলা কারিকর
পান ফুল দিআ হাথে বসন বান্ধাল্য মাথে
গড়িবারে সুবর্ণ পিঞ্জর।’ −(পৃ-১৩০)

ঘ. মুখশুদ্ধির উপকরণ হিসেবে

‘ভোজন করিয়া সাঙ্গ কৈল আচমন
কর্পুর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন।’ −(পৃ-১৯১)

প্রসাধনী ও রূপচর্চা

বাঙালি সমাজে বিয়ে, উৎসব পার্বণ এবং স্বামী সান্নিধ্যে যাবার পূর্বে নর-নারী উভয়েই রূপচর্চা ও সাজসজ্জা করতো। প্রসাধনী হিসেবে- সিদূর, কাজল, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুমকুম, কর্পূর, হলুদ, সুগন্ধি তেল, আমলকি,

সাবান, আতর, গোলাপজল ও ফাউগের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। এছাড়া পান ও আলতা ঠোঁট এবং পা রাঙাতে ব্যবহৃত হতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' গৌরী ফুল্লরা, লহনা, খুল্লনা, সুশীলা ও জয়াবতীর সাজ-সজ্জার অংশ হিসেবে এসব প্রসাধনী ও রূপচর্চার পরিচয় মেলে —

ক. 'সারিকা সিন্ধু পেড়ি পিছে লৈয়া ধায় চেড়ি
কেহ লইল চিরনি দর্পণ
পুরিয়া সুগন্ধ বারি কেহ লয়া জায় ঝারি
শ্বেতছত্র ধরে কোন জন।' –(পৃ-১১)

খ. 'দুবলা বুঝিয়া কাজ আনিল বেশের সাজ
মৃগমদ কুমকুম চন্দনে।

,,,

সুরঙ্গ পাটের জাদে বিচিত্র কবরী বান্ধে
মালতী মল্লিকা চাঁপা গাভা
প্রভাতে ভানুর ছটা কপালে সিন্দুর ফোটা
চৌদিকে চন্দন বিন্দু শোভা।' –(পৃ-১৬২)

পুরুষের দীর্ঘ কেশ বা বাবরি

'লহনার বচন শুনিআ ধনপতি
কেশ নাহি-বান্ধে সাধু-ধায় লঘু গতি।'–(পৃ-১৯৮)

পুরুষের দাড়ি রাখা

'দেখিআ ভাডুর প্রাণ করে দুরদুর।
দূরে হইতে শুনে খুরের চড়চড়ি
নাক মোচলায় তার উপাড়িল দাড়ি।' –(পৃ-১১৬)

অলংকার

বাঙালি সমাজে নর-নারী উভয়ই হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রূপা, তামা, শঙ্খ ও ফুলের তৈরি বহুবিধ অলংকার ব্যবহর করতো। সাধারণত মেয়েরা মাথায়- টোপর, সিথিপাট, টিকলি, টায়রা পড়তো, গলায় পড়তো- হাসুলি, হার, চেইন, টাকার ছড়া, তাবিজ- কবজের ছড়া, হাতে পড়তো- কঙ্কণ, বালা, বলয়, চুড়ি, তাড়, খাড়ু, তাগা, অঙ্গদ ও বাউটি; কানে পড়তো- কানফুল, করমফুল, কুণ্ডল ঝুমকা, বালি, কানবালা, মদনকড়ি, দুল, রিং, পাশা; নাকে পড়তো- নাকফুল, বেসর, নাকসাবি, নথ ও ডালবোলক; বাহুতে পড়তো- বাজুবন্দ, কেয়র, জসম, কোমড়ে পড়তো- কিঙ্কণী, চন্দ্রহার ও বিছা, আর পায়ে পড়তো- পাসুলি নূপুর, উছটি, ঘুঙুর, মল ও খাড়ু প্রভৃতি। অর্থাৎ বাঙালি নারীগণ মাথা থেকে পা পর্যন্ত বিভিন্ন অলংকারে ব্যবহার অভ্যস্ত ছিল। হাতের আঙুলে পরতো আংটি বা অঙ্গুরীয়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ফুল্লরা, খুল্লনা, লহনা, সুশীলা, রত্নমালা, জয়াবতী, নিদয়া, রম্ভাবতী, লীলাবতী ও গৌরীর পরিধেয় অলংকারগুলো ছিল বিচিত্র ধরনের। এছাড়া তৎকালে নারীদের মতো শ্রীমন্তকে কিশোর অবস্থায় অলংকার ব্যবহার করতে দেখা যায় —

ক. নারীর অলংকার

‘বলে নিল শিরোমতি কানের কনক
ললাটিকা নিল সিঁথি গলার পদক।
বাজুবন্দ নিল হেম পায়ের পাসুলি
অঙ্গদ কঙ্কণ নিল দিআ গালা- গালি।
খুঞা পরাইআ পাট সাড়ি কৈল দূর
কিঙিকনী লইল তার বাজন নূপুর।
শঙ্খ ভাঙ্গ্যা লয় হেম মানিকের গড়ি
শতেশ্বরী হার নিল কলধৌত চুড়ি।
সকল ভূষণ শূন্য কৈলে দুই হাথ
বাম হাতে লোহা মাত্র রাখিল আইয়াত। - (পৃ- ১৩৮)

খ. পুরুষের অলংকার

‘এক বৎসরের হইল সাধুর নন্দনে
করতালি দিয়া ফিরে নাচ এ অঙ্গনে।
কাটিতে লম্বমান কনশিকলী
মলবাকি পদযুগে করে ঝলমলী।
শার্দুলনথর শোভে গলে মনিহার
চলিতে চরণযুগে নূপুর সঞ্চার।
দিনে দিনে অনাবেশ সাধুর নন্দন
কৌতুকে খুল্লনা দেই ভূষণ চন্দন।’ –(পৃ- ২১৯)

পোশাক

বাঙালি হিন্দু সমাজে সাধারণত– ধুতি, চাদর, শাড়ি, কাপড়, কৌপীন, গামছার ব্যবহার ছিল। উচু বর্ণের লোকজন কাঠের খরম ও পৈতা ধারণ করতো। পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজে তহবন বা লুঙ্গি, কুর্তা, টুপি, পাগড়ি, ইজার বা পাজামা, পাঞ্জাবি, আলখেল্লা বা জোব্বা, চাপকান, শাড়ি কাপড়, কামিজ, সালোয়ার, ব্লাউজ, ছায়া, বক্ষবন্ধনী, শেমিজ, নিমা, ঘাঘরা, ওড়না, বোরকা, মোজা ও নাগরা, জুতার প্রচলন ছিল। তবে দরিদ্র জনগোষ্ঠী লুঙ্গি, কাপড় ও গামছা ব্যবহারেই সন্তুষ্ট থাকতো। গ্রীষ্ম ও শীতকালে পোশাকের পরিবর্তন ঘটতো।

‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ পাটাম্বর, পাটশাড়ি, তসর, নেত, দোপাট্টা, ধুতি, ইজার, বক্ষবন্ধনী ও মেঘডুমুর শাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় -

ক. ‘পরিতোষে লহনারে দিল পাট সাড়ি
পাঁচ পল সোনা দিল পরিবার চুড়ি।’- –(পৃ-১২০)

খ. ‘কেহ নেত কেহ খেত পাট সাড়ি
চন্দন কুসুম কেহ বাটা ভরা কড়ি।’ –(পৃ-১২৫)

গ. ‘মাছ্যাতা দেখিয়া মুখে দর্পণে- চাপড়
বাছিয়া পরএ মেঘডম্বুর কাপড়।’ –(পৃ-১৫৫)

ঘ. ‘আসিব ব্রাহ্মণ ভাট কড়ি চাহে পাটে পাট
জোড় গড়া কত শত ধুতি।’ –(পৃ-১৭৭)

শিক্ষা ব্যবস্থা

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে শিক্ষাকেন্দ্র বা বিদ্যাপীঠ হিসেবে টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মঠ, গুরুগৃহ, আশ্রম, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকাহ ও মসজিদ ব্যবহৃত হতো। আর পঠিত বিষয়ের মধ্যে ছিল– ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীত, স্মৃতিশাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, অভিধান, গণিত, দর্শন, ভূগোল, পদার্থ, ইতিহাস, রসায়ন, জ্যামিতি, বীজগণিত, কারিগরি, নীতিশাস্ত্র, রতিশাস্ত্র ও চিকিৎসা বিদ্যা প্রভাত। তালপাতা, কলাপাতা, গাছের বাকল ও তুলোট কাগজে পালক বা কাঠির কলম দিয়ে তৈরি করা কালির মাধ্যমে লেখা হতো। আর ভাষা হিসেবে আরবি, ফারসি, বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দির প্রচলন ছিল।

পাঠশালা

'বাম ভাগে দুর্গা মেলা   তারপিছে পাঠশালা
সিংহদ্বার পূর্বে জলাশয়।' –(পৃ-৭২)

মক্তব-মাদ্রাসা

'জত শিশু মুসলমান   করিয়া দলিজখান
মখদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।' –(পৃ-৭৮)

পঠিত বিষয়

শুনি বাক্য খুল্লনার   দ্বিজকৈল অঙ্গীকার
হাথে খড়ি দিল শুভক্ষণে

,,,

আচার বিনয় দীক্ষা   জতনে করাই শিক্ষা
জাকু হিরা তোমার নিলয়ে।

,,,

পড়এ সাধুর বালা   ক খ আঠার ফলা
অঙ্ক আস্ক সিদ্ধ বানান
গুরুবাক্যে দিআ কর্ণ   চিনিল অনেক বর্ণ
অষ্টশব্দি সুবন্ত পানিন।

,,,

ক্ষুদ্র কাব্য পড়ি দ্রুত   মাঘ পড়ে মেঘদূত
নৈসধ কুমারসম্ভবে
দিবানিশি নাহী জানি   পড়ে রঘু স্বেতবেনি
ভারবি উদ্ভট জয়দেব।

,,,

অব্যাহত বুদ্ধিগতি   পড়ে বালা সপ্তশতী
পুড়ে মুদ্রা মুরাবি মালতী
হিতউপদেশ কথা   পড়িল বাসবদত্তা
কর্মশাস্ত্র দীপিকা ভাস্বতী।' –(পৃ- ২২২-২২৩)

নারী শিক্ষা

তৎকালীন সমাজের সাধারণত উচুশ্রেণির মানুষজন গৃহ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে নারীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতো। এছাড়া গরীব পণ্ডিত বা গুরুদেব কন্যা অথবা উৎসাহী নারীগণও লেখাপড়ার সুযোগ পেতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' খুল্লনা, লহনা ও লীলাবতীর বিদ্যাশিক্ষার পরিচয় মেলে —

'দুই জনে একত্রে বস্যা করেন জুগতি
কপটে প্রবন্ধে পত্র লিখে লীলাবতী।' –(পৃ-১৩৬)

লেখার উপকরণ

তৎকালীন সময়ে কাগজ হিসেবে তালপাতা, কলাপাতা, গাছের বাকল, পশুর চামড়া ও তুলোট কাগজ ব্যবহৃত হতো। আর লেখার কালি তৈরি করা হতো রান্নার পাতিলের, পুইশাকের গুটি, বাবলা, অর্জুন, আমলকি, হরতকি ও গাবসহ বিভিন্ন গাছ-পালা ও ফল থেকে। এছাড়া লেখনী হিসেবে পাখির পালক, বাঁশের কঞ্চি বা কাঠি ব্যবহার করা হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এর উল্লেখ পাওয়া যায়-

এমন বিচার সাধু করি মনে মনে
মসীপত্র সদাগর করিল লিখনে।' –(পৃ-২০৭)

নাট্যাভিনয়

তৎকালীন বাঙালি সমাজে ধর্মীয় পূজা-পার্বণ, বিয়েসহ নানা রকম অনুষ্ঠানে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করা হতো। সাধারণত ও পৌরাণিক ঘটনা ও কিংবদন্তিকে আশ্রয় করেই এসব নাটক রচনা করা হতো। অভিজাত শ্রেণির অবসর বিনোদন হিসেবে এর সমাদর ছিল।

'শঙ্খ বেণি বীণা ভেরি ভরে নানা
বাদ্য বাজে ঘরে ঘরে
হত নাট্যগীতি দেখি ঘর ভিতে
মঙ্গল প্রতি বাসরে।' –(পৃ-৮৭)

চিঠি-পত্র

তৎকালীন বাংলায় যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে চিঠি-পত্রের ব্যাপক ব্যবহার ছিল। শিক্ষিত নর-নারী উভয়েই চিঠি-পত্র লিখতে পারতো। পত্র বাহক হিসেবে দূত, দাসী, কবুতর, ঘুঘু ও পোষা পাখির ব্যবহার করা হতো।
'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এরূপ চিঠিপত্র লিখন ও বহনের চিত্র পাওয়া যায় —

'হেনকালে শ্রীয়পতি দিলেন উত্তর
পড়িতে জানহ কিছু বাঙ্গলা অক্ষর।
সাধুর আদেশে বন্দি পত্র লৈয়া করে
ছাব দূর করি পত্র পড়ে ধীরে ধীরে।' –(পৃ-২৮৭)

চিকিৎসা ব্যবস্থা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে হিন্দু বৈদ্যরা আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে হতো বৈদ্য বা কবিরাজ। আর মুসলমানগণ তিব্বতীয় শাস্ত্র বা ইউনানী অধ্যয়ন করে হেকিম বা তবির হতো। গোয়ালগণ পশুর চিকিৎসা করতো। অন্যদিকে

নাপিতরা ফোঁড়া কাটার কাজে নিযুক্ত ছিল। এ বৈদ্য কবিরাজ ও হেকিমের চিকিৎসা ছাড়াও মানুষ ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ, কবচ, পানি পাড়ায় আস্থা রাখতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব চিকিৎসা পদ্ধতির পরিচয় মেলে —

'পরিআ উজ্জ্বল ধুতি   কাখে করি লয়া পুথি
গুজুরাটে বৈদ্যজন ফিরে।
জার দেখে সাধ্য রোগ   ঔষধ করএ যোগ
বুকে ঘা মারিয়া আগে ধায়
অসাধ্য দেখিয়া রোগ   পলাইতে করে যোগ
নানা ছলে করএ বিদায়।
কর্পুর পাচন করি   তবে জিয়াইতে পারি
কর্পুরের করহ সন্ধান
রোগী সবিনয় বলে   কর্পূর আনিতে চলে
সেই পথে বৈদ্যের পালান।' -(পৃ-৮০-৮১)

সখী বা সই পাতানো

বাঙালি সমাজে সাধারণত আনুষ্ঠানিকভাবে ও নামের মিল থাকার কারণে নারীদের মধ্যে সখী বা সই পাতানো এবং পুরুষের মধ্যে মিতা বা দোস্ত পাতানো হতো। হাতে নীল-লাল সুতা বেঁধে, নতুন বস্ত্র পরিধান, খাবার-দাবাড়ের আয়োজনের মধ্যে দিয়ে এ প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতো। এ সই বা মিতাগণ নিকট আত্মীয় হিসেবে পরিগণিত হতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' হীরাবতী-নিদয়া, ফুল্লরা-বিমলা ও লহনা-লীলাবতীর মধ্যে সইয়ের সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় —

ক. নিদয়া-হীরাবতী

'হিরা-নিদয়ার কাছে   মাশের পসার বেচে
ফুল্লরা বস্যাছে সন্নিধানে।
হিরা নিদয়ারে বলে   কি হয়াছে পুত্র কোলে
তারে কিছু বলেন নিদয়া
অই জিয়া থাকুগ সই   হউক বহুত পরমাই
বর গেত ঋট হউক বিভা।' -(পৃ-৪২)

ধর্মীয় ব্রত উৎসব ও পূজা-পার্বণ

ধর্মই বাঙালির প্রাণ। এ ধর্মকে আশ্রয় করেই বাঙালির জন্ম মৃত্যু ও বিবাহের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। বাঙালি হিন্দু সমাজে বারো মাসে তেরো পার্বণ প্রচলিত। এর মধ্যে মাঘে– শ্রীমঞ্চমী ও সরস্বতীপূজা, ফাগুনে- দোলাপূর্ণিমা ও বাসন্তী পূজা, চৈত্রে- চড়ক পূজা, বৈশাখে- বাস্তুপূজা, জ্যৈষ্ঠে- জামাইষষ্ঠী, আশ্বিনে- দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, অগ্রহায়ণে- নবান্ন ও পৌষপার্বণ অন্যতম। এছাড়া অন্যান্য ব্রত উৎসবের মধ্যে — হোলি, ঘেটুপূজা, শিবরাত্রি পূজা, ইতুপূজা, কালী পূজা, রাসযাত্রা, রথযাত্রা, চণ্ডীপূজা, মনসা পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, উপনয়ন ও ভাইফোঁটা অন্যতম। এসব পূজার উপচার বা অর্ঘ্য হিসেবে পশুবলি, বিভিন্ন প্রকারের ফুল-ফল, দুধ-কলা, নারকেল, ধান, দুর্বা, তুলসীপাতা, দীপ-ধূপ, কাসর-ঘণ্টা, সিদূর, বাদ্য-শঙ্খের ব্যবহার প্রচলিত। মুসলিম

সমাজে ঈদ-উল-আজহা, ঈদ-উল-ফিতর, মহরম, শব-ই-বরাত, শব-ই-মেরাজ, শব-ই-কদর, বেরা, হালখাতা ও পুণ্যাহ অনুষ্ঠান প্রচলিত রয়েছে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব পূজা পার্বণের উল্লেখ পাওয়া যায় —

শিব পূজা

'চৈত্র মাসে পূজে হর নানা উপহারে
ঢাকঢোল বাদ্য বাজে শিবের মন্দিরে।' –(পৃ-৩২)

দুর্গা পূজা

'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা প্রতি ঘরে ঘরে
মহিষ ছাগল মেষ দিয়া উপচারে।' –(পৃ-৬১)

চণ্ডী পূজা

'খুল্লনা গঙ্গার জলে করি্লান দান
চণ্ডিকা পূজেন রামা হয়্যা সাবধান।
ফলমূল উপহার নৈবিদ্য পাঁজলা
করিআ পূজেন ঘটে সর্ব মঙ্গলা।' –(পৃ-১৫৯)

সন্ধ্যাকালীন ব্রত

'প্রতিঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপ জ্বলে
শঙ্খ ঘণ্টা বাজে বীণা বেনি
কাসর দুন্দুভি পড়া জগঝম্প বাজে জোড়া
মৃদঙ্গ বল্লকি বাজে ঘানি।' –(পৃ-৮৭)

চতুরাশ্রমে বিশ্বাস

বাঙালি হিন্দু সমাজে চতুরাশ্রমে (ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) বিশ্বাস বলবৎ ছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে তাই ধর্মকেতু সংসার ছেড়ে স্ত্রীসহ তীর্থে গমন করে–

'মুক্তিপদে দিয়া মন শিব ভাবে অনুক্ষণ
শুনে প্রভঞ্জন উপাখ্যান।
ছায়া সঙ্গে ধর্মকেতু ভাবিলেন মুক্তি হেতু
বারণাসী করিল পয়ান ॥' –(পৃ- ৪৪)

জোকার বা জয়ধ্বনি

বাঙালি হিন্দু সমাজে বিভিন্ন পূজা-পার্বণ, বিয়ের মতো মাঙ্গলিক উৎসবে জোকার বা জয় ধ্বনির বগুল ব্যবহার রয়েছে। বিয়ের সময়, শুভাগমনের সময়, হরিসংকীর্তনের সময় এবং ব্রত উৎসবে এ জোকারের ব্যবহার করা হয়।

কালকেতুর বিবাহের জোকার

'দ্বিজ সুতা বান্ধে হাথে মুড়্যালা বাধিল মাথে
আইয় দেই জয় চারিভিতে।' –(পৃ-৪৩)

বাণিজ্য যাত্রার পূর্বে জোকার

'শিব স্মঙরিয়া বৈসে নায়ের উপর।
জ্ঞাতি বন্ধুজনে সাধু করিআ মেলানি
হরি হরি উচ্চ স্বরে সভে করে ধ্বনি।–(পৃ-২০১)

পশুবলি প্রথা

বাঙালি হিন্দু সমাজের পূজায়, ব্রত উৎসবে, যাগ-যজ্ঞে পশুপাখি বলি দেবার প্রচলন রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পূজায়, অন্নপ্রাশন, পুত্রেষ্টিযজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং মঙ্গল কামনার্থে পশুপাখি বলিদানের রীতি বাঙালি সমাজে আজো প্রচলিত আছে। পশু হিসেবে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, কবতুর ও মোরগের বলি দেয়া হয়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এরকম পশুবলির উল্লেখ পাওয়া যায় —

ক. কালকেতুর অন্নপ্রাশনে পশুবলি

'চারি পাঁচ মাস গেল ছয় পরবেশ
অন্নপ্রাশন কৈল দিআ ছাগ মেষ।' –(পৃ-৪১)

খ. খুল্লনার চণ্ডীপূজায় পশুবলি

'অঞ্জলি সরসিজে   চণ্ডিকা রামা পূজে
নাচে গায় বিদ্যাধরী
পূজার অবসানে   ছাগল মেষ আনে
শতেক দিল বলিদান।' –(পৃ-১৪৭)

লোকাচার-বিশ্বাস- সংস্কার

বাঙালির জীবন বগুকাল ধরেই লোকাচার- বিশ্বাস ও সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বাঙালি তার প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় চেতন- অবচেতন মনেই ঋতু, বার, মাস, ক্ষণ, তিথি, রাশিচক্র, নক্ষত্র, লগ্ন, যাত্রা পথের শুভ- অশুভ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, শরীরের বিশেষ অঙ্গ- প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া, ঝাড়-ফুঁক, জাদু- মন্ত্র, দারু- টোনা, তুক- তাক, বাণ- উচাটন, তাবিজ- কবচ, পাতাপড়া, তেলপড়া, পানিপড়া, পানপড়া, আয়নাপড়া, বাটি চালান, হাতচালান, বট- অশ্বত্থ- গাব- তাল-তেতুল, গাব ও শ্যাওড়া গাছে ভীতি, জীন- ভূত- দেব- দানব প্রেত- ডাইনীতে ভীতি ও বিশ্বাস, গৃহ নির্মাণ, গৃহ প্রবেশে নিয়ম- নীতি এবং নিয়তিতে বিশ্বাস করে থাকে।

ক. যাত্রাপথের শুভ-অশুভ

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' কালকেতু বনে প্রবেশ করার পূর্বে রাস্তায় শুভ লক্ষণের- গোয়ালিনী, বাছুরসহ গাভী, ব্রাহ্মণ, পূর্ণঘটসহ জল আর অশুভ লক্ষণের গোধিকা সাপ দেখে বিষণ্ন হয়ে যায়। আবার ধনপতির সিংহল যাত্রার পূর্বে অশুভ লগ্ন থাকায় গণক মনোক্ষুণ্ন হন —

কালকেতুর বন যাত্রা

'দেখে কালকেতু সুমঙ্গল
শুভ গণিকা দ্বিজ   বিকশিত সরসিজ
বায়ে শিবা পূর্ণ ঘটেজল।
চৌদিকে গুলুই ধ্বনি   কেহ জালে গৃহমনি
দধি দধি ডাকে গোয়ালিনী
দেখিয়া রুচির তনু   বৎস সহিত ধেনু
পুরাঙ্গনা দেই জয়ধ্বনি।

অশুভ লক্ষণ —   প্রবেশ করিল বন- আগে
সুবর্ণ গোধিকা বাম ভাগে
সুবর্ণ গোধিকা দেখি   চিত্তে বীর হইলা দুখী
অযাত্রিক পাপ দরশন
দেখিল মঙ্গল জত   সকলি হইল হত
বিধি মোরে কৈল বিড়ম্বন।
গোধিকা যাত্রিক নয়   সকল পুরাণে কয়
কুম গণ্ড শশক।' –(পৃ- ৫২)

খ. অশুভ লক্ষণ দর্শনে কালকেতুর মনোভাব

'গোধিকা দেখিআ বীর করছি তর্জন
তোমারে পোড়্যা আজি করিব ভক্ষণ।
যাত্রার সময় দেখিআছি তোর মুখ
বনে বনে বেড়াইআ পাইআছি বড় দুখ।' –(পৃ-৫৪)

গ. অঙ্গ - প্রত্যঙ্গের নড়াচড়া

বাঙালি সমাজে সাধারণত নারীর বাম চোখ, বাম হাত এবং ডান চোখ ও ডান হাত নড়াচড়া করলে স্বামীর ভবিষ্যৎ বিপদ ও সৌভাগ্যে অত্যাসন্ন বলে বিশ্বাস রয়েছে। এছাড়া মুখও হাত থেকে কোন কিছু খসে পড়া, জিহ্বার কামড় লাগা ও হোচট লাগায় ভবিষ্যৎ অমঙ্গলের বিশ্বাস রয়েছে —

*** ফুল্লরার অমঙ্গল চিন্তা**

'সম্ভ্রমে ফুল্লরা আইসে কুড়িআর দুয়ার।
বামবাণ্ড নাচে তার ঘোরে বাম আঁখি
কুড়্যার দুয়ারে দেখে রাকা চন্দ্র মুখী।' –(পৃ-৫৮)

রম্ভাবতীর অমঙ্গল আশঙ্কা

'স্ফন্দন করএ মোর ডানি ভুজ আঁখি
কুৎসিত সপন আমি দিন কথো দেখি।' –(পৃ-১৪১)

স্ত্রীকে সর্বদা স্বামীর বাম পাশে বসা

বাঙালি- হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজেই স্ত্রীকে সর্বদা স্বামীর বাম পাশে বসা ও ঘুমানোর নিয়ম বলে অনেকের প্রথাবদ্ধ বিশ্বাস রয়েছে —

'হয় জুড়ি মাতুলি জুগায় পুষ্প যান
তাহে চড়ি নীলাম্বর দ্বিজে দেই দান।
বামভিতে রথে বৈসে ফুল্লরা সুন্দরী।' –(পৃ-১০৮)

স্ত্রীকে সর্বক্ষণ বামহাতে সধবার চিহ্ন বহন করা

বাঙালি হিন্দু সমাজে সধবা নারীদের হাতে শাখা-চুড়ি পড়ার পরও বাম হাতে অতিরিক্ত নোয়া (লোহার বালা) পড়তে হয়। স্বামীর জীবিত অবস্থায় বাম হাতের নোয়া, নাকের বাম পাশের নাকপফুল এবং সিথির সিদর কখনো খুলতে ও মুছে ফেলতে হয় না — হিন্দুদের বিশ্বাস মতে, এতে স্বামীর অকল্যাণ হয়।

'শঙ্খ ভাঙ্গ্যা লয় হেম মানিকের গড়ি
শতেশ্বরী হার নিল কলধৌত চুড়ি।
সকল ভূষণ শূন্য কৈলে দুই হাত
বাম হাতে লোহামাএ রাখিল আইয়াত।' –(পৃ-১৩৮)

নদী যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

তৎকালীন বাঙালি হিন্দু সমাজে কালা পানি পাড় হওয়া বা সমুদ্র পাড়ি দেয়া ছিল মহাপাপের ব্যাপার। আবার বিয়ের এক মাসের মধ্যেও নদী পারাপার অনেক স্থানে নিষিদ্ধ ছিল।

'পরস্পর আছে মোর কুলের নিয়ম
ভানু দরশন বিনু না করি ভোজন।
আছএ নিয়ম যদি ভানু দরশন
সাসুড়ি তোমার কিছু করে নিবেদন।
মোর কুলে পরস্পর আছএ আচার
বিভা কর্য়া এক মাস নহে নদী পার।' –(পৃ-২৯৪)

অশুচি অবস্থায় কন্যা দান নিষিদ্ধ

'নেব কোটালিআ মোর জাতের প্রধান
অশুচে কেমনে আমি দিব কন্যা দান।' –(পৃ-২৮০)

জাদু- মন্ত্র-ঝাড় ফুঁক

বাঙালি সমাজে বগুকাল ধরেই বিভিন্ন ধরনের জাদু-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের আস্থা ও আশঙ্কা বিদ্যমান রয়েছে। সাপের বিষ ঝাড়া, মৃত ব্যক্তিকে জীবিতকরণ, মায়াবলে ঘুমপাড়ানো, বাণ মেরে মানুষ, পশু পাখি, গাছ- পালা-শস্যাদি বিনষ্ট করা, তেলপড়া, পানি পড়া, বাটিচালান, আয়নাপড়া, চালপড়া, পাতাপড়া, কাজলপড়া, ধূলাপড়া প্রভৃতিতে বাঙালি সমাজের ভয়-ভীতি-বিশ্বাস রয়েছে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, এসব চিত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় ––

মন্ত্রে বিশ্বাস

বাঙালি সমাজে জাদু-মন্ত্রের মাধ্যমে অসাধ্যকে সাধ্য করা, শত্রুকে বশ করা, খেলা বা মামলায় জয়ী হবার বিশ্বাস রয়েছে–

ক. ধনপতির মন্ত্রে আস্থা

'পাশাতে জিনলি সাধু মন্ত্রের বলে
পণ দাআ চাহে সাধু ধরিআ অঞ্চলে।' –(পৃ-১৭০)

খ. শ্রীমন্ত্রের মন্ত্রে আস্থা ও ভূতে প্রেতে বিশ্বাস

'একা ইপদ্বীপ সাত ভমিয়া খুজিব তা
অবশেষে প্রবেশিব লঙ্কা
বিচারিয়া নানা তন্ত্র লইব রামের মন্ত্র
নিশাচরে না করি শঙ্কা।' –(পৃ–২৩৩)

বশীকরণ ওষুধ

বাঙালি সমাজে সাধারণত স্বামী বা জামাতা বশীকরণ ওষুধ হিসেবে তেলপাড়া, কাজলপড়া, পানপড়া, বিশেষ খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করানো ও ভেষজ ওষুধের ব্যবহার বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। এভাবে স্বামীকে স্ত্রীর প্রতি, স্ত্রীকে স্বামীর প্রতি এবং প্রেমিক বা প্রেমিককে এমনকি শত্রুকে বশে আনতে বাঙালি সমাজ এসব ওষুধ ব্যবহার করে থাকে।

'চণ্ডীমঙ্গলে কাব্যে' এ বশীকরণ ওষুধের প্রমাণ মেলে ––

ক. মেনকার জামাই বশীকরণ ওষুধ

‘মেনকার দাসী আনে ঔষধের ডালি
আছিল ইসর মূল তথি এক ফালি।’ –(পৃ–২১)

খ. রম্ভাবতীর জামাইবশীকরণ ওষুধ

‘ঔষধ করিআ রম্ভা ফিরে বাড়ি বাড়ি
কাটা মহিষের আনে নাসিকার দড়ি
দুর্গা প্রদীপ পুত্যা রাখিআছে বেড়ি।
সাধুর কপালে জবে দিব পনর্বসু
খুল্লনার হব সাধু নাক বিন্ধা পশু।
সাপের আটুল্বি আনে খুজ্যা বাদ্যাঘরে
রহিত মৎস্যের পিত্ত আনে মঙ্গল বাসরে।
কাপাসের ক্ষেত হইতে আনিল গোমুন্ত
দাণ্ডাইআ সাধু তায় রব দুই দণ্ড।
নিশা মধ্যে আনিহ দেউলের পাটিকাল
পুজিবে ধোবার পাটে জালি দিব জ্বাল।

,,,

ঔষুধ করএ রম্ভা খুল্লনার হিত
লহনার তরে সেই হইল বিপরীত।’ –(পৃ-১২৩)

রাশি-চক্র ও তিথি-নক্ষত্রে বিশ্বাস

তৎকালীন বাঙালি সমাজে বারোটি রাশির (১. মেষ, ২. বৃষ, ৩. মিথুন, ৪. কর্কট, ৫. সিংহ, ৬. কন্যা, ৭. তুলা, ৮. বৃশ্চিক, ৯. ধনু, ১০. মকর, ১১. কুম্ভ, ১২. মীন) উপর আস্থা ও বিশ্বাস ছিল। এসব রাশিচক্রের উপর মানুষের ভাগ্য ওঠা- নামা করে বলে বাঙালি বিশ্বাস করতো। তাই জন্ম ও বিয়ের অনুষ্ঠানে এবং যাত্রাকালে তিথি- রাশির গণনা আবশ্যিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

‘চণ্ডীমঙ্গলে কাব্যে’ এ রূপ তিথি-রাশির প্রভাবের চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

গৃহ ওঝা করে মীনরাশ্যের কল্যাণ
সভা বিদ্যমানে ওঝা পড়ে পাজিখান।

,,,

মৃগশিরা নয় দণ্ড বাণিজ্যকরণ
শুভযোগ দশা দণ্ড দশম ফাগুন।
পুনরপি পড়ি পাজি শুন সাবধানে
আগামী বৎসর কথা গণক বুঝানে।
সঙ্কায়ন কপালে বৎসর জাবে ভালে
বড়ই সম্পদ তোমার দেখি এই কালে।
বৈশাখে হইতে হইল লুপ্ত সম্বৎসর
শুভকর্ম নাস্তি আগে বৎসর ভিতর।’ –(পৃ-১২১

কর্মের অভিষেক

তৎকালীন বাঙালি সমাজে শুধু পড়া-লেখার ক্ষেত্রেই 'হাতেখড়ির' মতো অনুষ্ঠান হতো না, বরং যে কোন নতুন কাজ (ঘর, ব্যবসা, জমি চাষ, গমন) এবং জীবনের প্রথম বংশীয় বৃত্তি বা কর্মেরও অভিষেক ঘটতো আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' ব্যাধ কালকেতুরও শিকারের অভিষেক ঘটানো হয়েছিল লোকাচারের মধ্য দিয়ে ––

'গণক আসিয়া ঘরে শুভদিন শুভকরে
ধনু দিল ব্যাধসুত করে
ফোঁটা দিয়া বিন্ধে বেজা ছুড়িতে শিখতে নেজা
চামের চৌতুলা শোভে শিরে।' –(পৃ-৫০)

নিয়তিতে বিশ্বাস

তৎকালীন বাঙালি সমাজে দৈবের ওপর বিশ্বাস ছিল প্রবল। এছাড়া কবি মুকুন্দরামও দৈবের প্রতি ছিলেন আস্থাশীল। আর এ কারণেই তিনি মাহমুদ শরীফের ডিহিদার পদ প্রাপ্তি ও মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের ওপর জুলুম নির্যাতনকে পাপের ফল বা দৈব ঘটনা বলে বিশ্বাস করেছেন। অন্যদিকে কালকেতু ও ফুল্লরা তাদের দারিদ্র্যকে, ভাড়ু দত্ত বন্যার বিপর্যয়কে, লক্ষপতি কন্যা খুল্লনার দোজবরে পাত্রের সঙ্গে বিবাহকে, রাণী লীলাবতী কন্যা সুশীলার সিংহল ত্যাগকে, এবং পশু বরাহ তার পতি-দেবর-ভাসুর-শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যুজনিত দুঃখকেও দৈব লিখন বলে মেনে নিয়েছে।

ক. কালকেতু

'এথাই নরক স্বর্গ সুনি ভাগবতে
নরক ভুঞ্জিতে কালু আইল মরতে।
সুকৃতি পুরুষ জিএ সুখভোগ হেতু
দুঃখ ভোগ করিবারে জিএ কালকেতু।' –(পৃ-৫৪)

খ. ফুল্লরা

'বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা
চারি প্রহর করি সই উদরের চিন্তা।' –(পৃ-৫৫)

গ. ভাড়ুদত্ত

'ভাড়ু দত্ত বলে মোর কর্মের ফল
আমার দুয়ারে জল হইল অথল।' –(পৃ-৭৬)

ঘ. লীলাবতী (লহনার সখী)

'ভাগ্য থাকে জার স্বামী বনিতার
তারই হয় সতিনি
পরান কারিআ করে দুই বিভা
হেন কভু নাঞি শুনি।' –(পৃ-১৩৪)

পাপ- পুণ্যের ধারণা

তৎকালীন বাঙালি বর্ণবাদী হিন্দু সমাজে পাপ- পুণ্যের ধারণা ছিল প্রকট। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে শাস্ত্রাচার ও ধর্মাচারের নামে বহু বিধি-বিধান প্রচলিত ছিল। পাপের মধ্যে- অন্নপাপ, ব্রাহ্মণবধের পাপ, মানুষ হত্যার পাপ,

গরু প্রাণি হত্যার পাপ, জীব হত্যার পাপ, মিথ্যা বলার পাপ ও রজস্বলা কন্যাকে বিবাহ না দেবার পাপ প্রভৃতি অন্যতম। অন্যদিকে পুণ্যের মধ্যে গৌরীদানের পুণ্য এবং ধর্মশাস্ত্র পাঠ বা শ্রবণের পুণ্য প্রভৃতি অন্যতম।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব পাপ- পুণ্যের চিত্র পরিলক্ষিত হয়–

ক. কালকেতুর পশুবধের পাপ

'শুন পুত কালকেতু পশুগণ-বধহেতু
আছিলা তোমার অতিপাপ
নাশ গেল এইকালে রাজার বন্ধন শালে
মনে না করিহ অনুতাপ।' –(পৃ- ১০১)

খ. রজস্বলা কন্যার বিবাহ না হবার পাপ

'দ্বাদশ বৎসরের বালা রজস্বলা হয় বালা
পুরুষের নাঞি করে ভয়।
পুষ্পক জাবদ নয় তাবদ পুরুষে ভয়
নাঞি রহে তাহার কামনা
বর দেখি অভিরাম যদি করে কন্যা কাম
পায় পিতৃ নরকে যন্ত্রণা।' –(পৃ-১১৬)

ধর্মকর্ম পদ্ধতি

বাঙালি মুসলমান যেমন ইসলামের ৫টি বিষয় (কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত) মেনে চলে, তেমনি নিষ্ঠাবান হিন্দুরাও এরূপ ৫টি বিষয় যেমন- ক. মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান, খ. বেদ-পুরাণ-স্মৃতিশাস্ত্রে বিশ্বাস, গ. ব্রাহ্মণ-পুরোহিতদের পূজার্চনা ঘ. মৃত্যুর পর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ ঙ. ঈশ্বর-পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস।

এছাড়া হিন্দু সমাজে ধর্মকর্ম হিসেবে বিভিন্ন পূজা, একাদশী ব্রত, সূর্য ব্রত রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, ভাগবত, উপনিষদ পাঠ, নান্দীমুখ যজ্ঞ, পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, অশ্বমেধ যজ্ঞসহ নানা আচার ও আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে মুসলিম সমাজে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ (ফজর, যোহর, আছর, মাগরিব ও এশা), রোজা, কুরবানি, তজবি জপাহ, কুরআন পাঠ, খৎনা করানো ও বিবাহ পড়ানো প্রভৃতি ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' হিন্দু ও মুসলিম সমাজের এসব ধর্মকর্মের পরিচয় পাওয়া যায় —

ক. মুসলমানের ধর্মকর্ম

ফজর সময় উঠি বিছাই লোহিত পাটী
পাঁচ বেরি করয়ে নমাজ
সোলেমানী মালা ধরে জপে পীর পেগম্বরে
পিরের মোকামে দেই সাজ।
দশ- বিশ বিরাদরে বসিআ বিচার করে
অনুক্ষণ পড়এ কোরান
,,,
বড়ই দানীষবন্দ কেহোনা করএ দ্বন্দ্ব
প্রাণ গেলে রোজা নাহী ছাড়ি
ধরয়ে কম্বুজ বেশ শিরে নাহী রাখে কেশ
বুক আচ্ছাদিআ রাখে দাড়ি।

না ছাড়ে আপন পথে সদাই টুপি দেই মাথে
ইজার পরএ দড় নাড়ি
জার দেখে খালি মাথা তা সনে না কহে কথা
সারিআ দণ্ডের মারে বাড়ি।
,,,
মোল্লা পড়াইআ নিকা দান পায় সিকা সিকা
দোয়া করে কলিমা পড়িআ
,,,
জত শিশু মুসলমান করিআ দলিজ খান
মখদ্দম পড়ায়ে পড়ানা।' -(পৃ-৭৮)

খ. হিন্দু ধর্মকর্ম

বীরের নগরে বিপ্রগণ
শাস্ত্র বিচার করে আশিষ করিআ বীরে
নিত্য পায় ভূষণ চন্দন।
,,,
ব্যবহারে বড় রিজু নিত্য পড়য়ে যজু
বেদ বিদ্যা মুখে অবিরত।
দেখিতে সুসারি সারি ব্রাহ্মণের আওয়ারি
সারি সারি বিষ্ণুর সদন
,,,
কেহ হয় অধিষ্টাতা কোন দ্বিজে কহে কথা
কেহো পড়ে আগম পুরাণ
,,,
গুজুরাট নগরে ঘরে ঘরে শ্রাদ্ধ করে
গ্রামযাজী করে অধিষ্ঠান
সাঙ্গ করি দ্বিজ কয় কাহন হাতে কুশে দক্ষিণা ফুরান।
গালি দিয়া লণ্ডে ভণ্ডে ঘটক ব্রাহ্মণ দণ্ডে
কুলপাজি করিআ বিচার
,,,
গুজুরাট এক পাশে গ্রহবিপ্রগণ বৈসে
বর্ণদ্বিজগণ মঠপতি
দীপিকা ভাস্বতী ধরে জৌতিষ বিচার করে
বালকের লিখয়ে জাওয়াতি।
,,,
সদা লয় হরিনাম ভূমি পায় ইনাম
বৈষ্ণব বসিল গুজুরাটে।' -(পৃ-৭৯-৮০)

ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ

ধর্মই বাঙালির প্রাণস্বরূপ। বাঙালির সমস্ত জীবন জীবিকার বিষয়সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে তাদের নিজ নিজ ধর্মসমূহ। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থের মধ্যে রয়েছে- রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, গীতা, উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা ও স্মৃতিশাস্ত্র অন্যতম। আর মসুলমানদের মধ্যে রয়েছে- কুরআন, হাদিস ও জীবনী গ্রন্থের সর্বব্যাপী প্রভাব। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব গ্রন্থের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়-

ক. মুসলিম ধর্মগ্রন্থ

‘দশ বিশ বিরাদরে বসিআ বিচার করে
অনুক্ষণ পড়য়ে কোরান।’ –(পৃ৭৮)

খ. হিন্দু ধর্মগ্রন্থ

‘ব্যবহারে বড় রিজু নিত্য পড়য়ে যজু
বেদ বিদ্যা মুখে অবিরত।
’’’
কেহ হয় অধিষ্টাতা কোন দ্বিজে কহে কথা
কেহো পড়ে আগম পুরাণ।’ –(পৃ-৭৯)

অভিজ্ঞান বা স্মারক

সামন্তবাদী বাঙালি সমাজে স্বীকৃতির মাধ্যম হিসেবে অভিজ্ঞান বা স্মরক প্রথা প্রচলিত ছিল। এসব গোপন অভিজ্ঞান সংকেত বা চিহ্নের মধ্যে রয়েছে- চিঠি-পত্র, অলংকার বা উপহার দ্রব্য, শারীরিক লক্ষণ-বৈশিষ্ট্য বা দোষ ত্র“টি, দিন-তারিখ-মাস-বছর বা তিথি-লগ্ন, স্মরণীয় ঘটনা এবং বিশেষ শস্য বা ফসলাদির ক্রমবৃদ্ধি বা অঙ্কুর প্রভৃতি। নারীর গর্ভের স্বীকৃতি, প্রবাস জীবন, অজ্ঞাত বাস ও হারানো ব্যক্তি-বস্তুকে ফিরে পেতে এসব অভিজ্ঞানের প্রচলন ছিল।

ক. ধনপতির গর্ভপত্র দান

‘স্বস্তি আগে লিখিআ ধনপতি
অশেষ মঙ্গলধাম খুল্লনা যুবতি।
তোরে আশির্বাদ প্রিয়ে পরম পিরিতি
সন্দেহ ভঞ্জন পত্র করিল লিখিতী।
জখন তোমার গর্ভ হইল ছয় মাস
সেই কালে নপাদেশে করিল প্রবাস।
জদি কন্যা হয় শশিকলা নাম থুয়্যা
উত্তম বংসজ দেখি ঝিএ বিভা দিহ।
জদি পুত্র হয় নাম থুইয় শ্রীমতি
পড়াইআ শুনাইআ পুত্র করিহ সুমতি।
এবার বৎসরে জদি নহে আগমন
আমার উর্দিশে জাবে দক্ষিণ পাটন।
তিন নিদর্শন দিল বানিয়ার বালা
শ্রীমন্ত অঙ্গুরি দিল গায়ের আঁচলা।’ –(পৃ-১৯৪)

অভিশাপ

তৎকালীন বাঙালি সমাজে মঙ্গল কামনায় যেমন আশীর্বাদ করা হতো, তেমনি শত্রুতা করে, ক্রুদ্ধ হয়ে ও অমঙ্গল কামনায় অভিশাপ দেয়া হতো। দেব-দেবী, মুণি-ঋষি, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, শিক্ষাগুরু, পিতা-মাতা, মান্যজন, নিপীড়িত ব্যক্তি ও সতীন সৎমাগণ উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অভিশাপ দিতো। সাধারণত স্বর্গ সন্তানদের পৃথিবীতে নিম্ন বংশে

জন্মগ্রহণ, পশু-পাখিতে রূপান্তর, মৃত্যু, বিপদ, অঙ্গহানি ও অসুখ-বিসুখের কামনা করা হতো। এসব অভিশাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লঘুপাপের গুরু দণ্ড হিসেবে কার্যকর করা হতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এর পরিচয় মেলে —

বৈদ অভিশাপ

স্বর্গবাসী সাধারণ নর্তক-নর্তকী, দেব-দেবীর সন্তান এবং মর্ত্যবাসী মানুষের ধর্মকর্মে অবহেলা, অবজ্ঞা ও পাপকর্মের জন্য দেবতা ও মুণি-ঋষিগণ অভিশাপ দিয়ে শাস্তি বিধান করতেন —

নীলাম্বরের প্রতি শিবের অভিশাপ

'দারুণ পিপীলিকা তার প্রবেশে কুন্তলে
মরমে দংশিলা হর হইলা আকুলে।
অনল সমান পোড়ে পিপীলিকার বিষ
অভিমানে করে হর মন বিমরিষ।

,,,

মোর সেবা তেজি ইচ্ছে কর অন্য সাধ
বসুমতী চল ঝাট হও গিয়া ব্যাধ।' –(পৃ-৩৭)

মানব অভিশাপ

মর্ত্যের পৃথিবীতে সাধারণত পিতা-মাতা, শিক্ষাগুরু, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, মান্যজন, সতীন-সৎমা ও নিপীড়িত ব্যক্তি অবাধ্য, পরপীড়ক ও পাপীকে শাস্তি স্বরূপ এসব অভিশাপ প্রদান করতো —

শ্রীমন্তের প্রতি বিমাতা লহনার অভিশাপ

'বিমাতার পাত্র ছিরা হইল নমস্কার
বাহুড়িআ দেশে পুনু না আইস আর।
গেলে তোর পিতাপুত্রে নৈহ দরশন
পুনরপি দেশে পুনু না কর গমন।' –(পৃ-২৩৬)

ঘর-বাড়ি ও স্থাপনা

বসত ভিটায় ঘর তোলা ও গাছ কাটার ক্ষেত্রে সামন্ত জমিদারদের পূর্ব অনুমতি নিতে হতো। এমন চিত্র 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬ খ্রি.) উপন্যা ও 'অভাগীর স্বর্গ' ছোটগল্পে পরিলক্ষিত হয়।

বাঙালি সমাজের ধর্ম-বর্ণ ও অঞ্চলভেদে ঘর বাড়ির বৈচিত্র্য দেখা যায়। ধনী সামন্ত শাসক, জমিদার, বণিক, মহাজন ও অভিজাত ব্যক্তিরাই কেবল পাকা ইটের দালান, প্রাসাদ, মঠ-মন্দির, মসজিদ, খানকাহ, নির্মাণ করতেন। এসব প্রাসাদ বাড়ি বগুতল বিশিষ্ট ও বিভিন্ন মহলে (তিন মহলা, পাঁচ মহলা ও সাত মহালা) বিভক্ত থাকতো। আবার আনন্দ বিনোদনের জন্য তৈরি করা হতো- জলসাঘর, জলটুঙ্গী, রঙমহল, বাগান বাড়ি, হাওয়াখানা, প্রমোদ তরী, বৈঠকখানা, বাংলো ও দরবারের মতো স্থাপনা। এছাড়া টিনের চারচালা, আটচালা ও ষোল চালায় বিভক্ত ঘরও নির্মাণ করা হতো যা দেউড়ি ও খিড়কিতে বিভক্ত থাকতো। এছাড়া গ্রামের মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণির মানুষেরা টিন, বাঁশ-বেত, মাটি ও লতা-পাতা দিয়ে একচালা, দুচালা, চারচালা, গোলাঘর, কুড়েঘর, মাটির ঘর ও পর্ণকুটির নির্মাণ করতো। এছাড়া পশু-পাখির জন্য গোশালা (গোহাল ঘর, আওলা ঘর), অশ্বশালা, হস্তিশালা, অজ শালা, জন্তুশালা বা ঘর নির্মাণ করা হতো।

ক. কুড়ে ঘর

'সই গৃহে চালু সের করিআ উধার
সম্ভ্রমে ফুল্লরা আইসে কুড়িআর দুয়ার।' –(পৃ-৫৮)

খ. চার চালা ঘর

'চারি চৌরি চতু:শালা মাজে পিড়া খো ঢালা
পাষাণে রচিত নাছ বাট।' –(পৃ-৭২)

গ. পুরী বা রাজপ্রাসাদ

'অযোধ্যা সমান পুরী বিশাই নির্মাণ করি
পূর্বে দ্বারে রচিল কপাট।' –(পৃ-৭২)

ঘ. গোলাঘর

'ফুল্লরার কথা শুনি হিতাহিত মনে গুণি
লুকাইল বীর ধান ঘরে।' –(পৃ-৯৪)

ঙ. লঙ্গরখানা

'নগর চত্বর মাঝে শিবের মন্দির সাজে
অনাথ মণ্ডপ অন্নশালা। –(পৃ-৭২)

চ. পাঠশালা

'বামভাগে দুর্গা মেলা তার পিছে পাটশালা
সিংহদ্বার পূর্বে জলাশয়।' –(পৃ-৭২)

ছ. পশুর ঘর

'অজা লয়্যা আইল রামা দিন অবশেষ
অজাশালে অজাগণ করিল প্রবেশ।' –(পৃ-১৪১)

তৈজসপত্র

বাঙালির প্রাত্যহিক সংসার জীবনে সাধারণত তামা, কাসা, লোহা, বাঁশ, বেত, কাঠ ও মাটির তৈরি বিভিন্ন তৈজসপত্র ব্যবহৃত হয়। এসবের মধ্যে পাত্র (ভাণ্ড, ঘট), পাতিল, হাড়ি, কড়াই, থালা, গেলাস, কলস, বাটি, বাসন, খোরা, ঝুড়ি, থলে, সরা, ঢাকনা, মাদুর বা পাটি (খেজুরপাতা, নারকেল পাতা ও বেতের), দড়ি বা রশি, মশারি, খাট, চৌকি, পালং, পিঁড়ি, হাত পাখা, পানের ডাবর, সরতা, জাতা, লোটা, বদনা, কুলা, কাঠা, ঢেকি, ডোল, বালতি, গামলা, রেকাবি, কুপি বা বাতি, কাঁথা, বালিশ, দা, কুড়াল, ছ্যান, কাচি, খুন্তি, শাবল, লাঙ্গল, জোয়াল, মই, টোনা, লাঠি, কাজলদানি, সুরমাদানির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় —

ক. মাদুর

‘হাথে পাটী করি গৌরী ডাকেন দশ দশ
হেন কালে মেনকার বাড়িল বিরস।’ –(পৃ-২৫)

খ. ঝুড়ি

‘চুবড়ি মুলাইয়া হাটে বেচয়ে ফুল্লরা
কৃষাণ জেন হাটে দেই মুলার পশারা।’ –(পৃ-৪৫)

গ. পিড়ি

‘আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি
চাপিয়া বসিল দোহে চৌখণ্ডি পিঁড়ি।’ –(পৃ-৫৫)

ঘ. থালা ও খাট পালং

‘দশ দণ্ডে হেমথালে করিয়া ভোজন
খট্টায় নিদ্রা জায় বান্যা করিয়া শয়ন।’ –(পৃ-৬৫)

ঙ. ডোল

‘দেশমুখ বলে ভাই শুন মোর বোল
সভে ভাস্যা গেল মোর কাপাস সাত ডোল।’ –(পৃ-৭৬)

চ. ঢেকি-কুলা

‘হাল বলদ দিবে খুড়া দিবেহে বিছন পুড়া
ভান্যা খাইতে ঢেকি কুলা দিবে।’ –(পৃ-৭৭)

ছ. অন্যান্য তৈজসপত্র

‘কামার পাত্রিয়া শাল কুঠারি কোদাল ফাল
গড়ে টাঙ্গি অঙ্গরখি সেল।

’’’

কুম্ভকার গুজরাটে হাড়ি কুড়ি গড়ে পিটে
মৃদঙ্গ দগড় কাড়া পড়া

’’’

কাঁসারি পাতিয়া শাল ঝারি খুরি গড়ে থাল
বাটী ঘটী বট লই শিপ।

’’’

বিঅনি চালুনী ঝাটা ডোম গড়ে ছাতা নাটা
কির্তি করে হরষিত চিতে।’ –(পৃ-৮১-৮৩)

যানবাহন

তৎকালীন বাংলায় জল ও স্থল পথেই সাধারণত মানুষ যাতায়াত করতো। এ যাতায়াত পথের যানবাহন হিসেবে রাস্তাঘাটে চলতো- পালকি, দোলা, রথ, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, হাতি, ঘোড়া, উট, মহিষ, গাধা ও বলদ। এসব জন্তুর ওপর চড়ে ও মালামাল চাপিয়ে মানুষ স্থল পথে যাতায়াত করতো। আর নদী-খাল-বিল ও সমুদ্র পথের যানবাহন হিসেবে- পালতোলা জাহাজ, নৌকা, ডিঙ্গা ও ভেলার ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব যানবাহনের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় —

ক. দোলা

'গমনের শুভ বেলা বাউরি জোগায় দোলা
তথি বীর কৈল আরোহণ।' –(পৃ-৪৩)

খ. হাতি ও ঘোড়া

'সাজ সাজ বলিআ পড়িআ গেল সাড়া
আগুদল জায় গজ পাখরিয়া ঘোড়া।' –(পৃ-৮৮)

গ. নৌকা

'নৌকায় দিআ ভরা গমনে করি তরা
শ্রীমন্ত চলিল সিংহলে।' –(পৃ-২৩৪)

ঘ. যুদ্ধ যান

'গজ পিঠে বাজে দামা সাজিল রাজার মামা
আড়ম্বরে পুরিল গমন

,,,

করি পিঠে নরপতি মাথায় ধবল ছাতি
চারিদিকে ভূ:যার পয়ান

,,,

রথ সনে সাজে রথি বীরবর সেনাপতি
রথ আগে গাউল বম্বল

,,,

লইয়া আপন বল সাজিয়া তরঙ্গদল
ভু:যা রাজা করিল পয়ান।' –(পৃ-২১১-২১২)

ঙ. বলদ

'পাছু ধনপতি দত্ত লয়্যা সিংহলের বিত্ত
বলদে শকটে আনে ঘর।' –(পৃ-৩০০)

অস্ত্র বা হাতিয়ার

মধ্যযুগে বাংলায় সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। আর এ যুদ্ধ বিগ্রহের জন্য প্রয়োজন পড়তো নানা রকম অস্ত্র বা হাতিয়ারের। এসব অস্ত্রের মধ্যে- তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম, কামান-বন্দুক, তরবারি, কিরিচ, ছোড়া চাকু, খড়গ, নারাচ, গদা, শল্য, শূল, মুষল, মুদগর, ভূষণ্ডী, পাশা, চক্র, টঙ্কার, খঞ্জর, বাণ, কুঠার, লাঠি, সড়কি, রামদা, বল্লম, বর্শা, ভূজালি ও টাঙ্গির ব্যবহার ছিল। যুদ্ধের পোশাক হিসেবে– লোহার জিরাই, কাবাই,

পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্দ, ইজার, টুপি, মোজা, ঢাল, বর্ম ব্যবহৃত হতো। যুদ্ধে চতুরঙ্গ (হস্তী, ঘোড়া রথ ও পদাতিক) বাহিনীর মধ্যে সম্মুখ যুদ্ধ, দ্বৈত বা দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, মল্লযুদ্ধ, গদাযুদ্ধ, বাণযুদ্ধ প্রচলিত ছিল। আর রণবাদ্য হিসেবে- ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, দামামা, ভেউর ও বিউগলের বঙুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসবের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়-

ক. 'জৌতুক ধনুকখান খর তিন গোটা বাণ
মুর্গাগুণ অঙ্গুলির তান।' -(পৃ-৪৩)

খ. 'একা মহাবীর লই তিন তির
কুটিলা কাঠের ধনু
পশুগণে কাল নিত্য পাতে জাল
ধায় রথে জেন ভানু।' -(পৃ-৪৬)

খেলাধুলা

বাঙালি সমাজে বঙুকাল থেকেই বিচিত্র ধরনের খেলাধুলার প্রচলন ছিল। নর-নারী উভয়েই অবসর বিনোদন, শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্তির জন্য দাবা, পাশা, চৌগান বা পলো, কুস্তি বা মল্ল, লাঠিখেলা, সর্দারবারি, কাবাডি, দাড়িয়াবান্দা, পায়রা উড়ানো, ঘুড়ি উড়ানো, লাটিম খেলা, সাতচাড়া, কানামাছি, বুড়িছোঁয়া, গোল্লাছুট, নৌকা বাইচ, হাতির লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, নেত্রবন্ধ, ডুবকাজি, বুলবুলির লড়াই, মহিষের লড়াই, ঘোড় দৌড়, গরুদৌড়, খঞ্জনার নাচ, বাদর নাচ, বানরের খেলা, সাপের খেলা, বিশ-পচিশ বাঘবন্দি, ডাঙগুটি, হা-ডু-ডু প্রভৃতি। সামন্ত শাসক ও ধনী শ্রেণির মানুষগণ শিকারে অংশ নিয়ে আনন্দ উপভোগ করতো। আবার বাংলায় পর্তুগিজ বণিক ও জলদস্যুদের আগমের পর থেকে এদেশে তাস ও জুয়াখেলার প্রচলন ঘটতে দেয়া যায়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব খেলার দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়—

ক. পাশা খেলা

'দুগ্ধ উত্তলিয়া পড়ে নাহি দেহ পানি
সখি সঙ্গে খেল পাশা দিবস রজনী।' -(পৃ-২৫)

খ. পায়রা উড়ানো

'লইয়া নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত
উড়াই নগরিয়া সাথে।
করি শুভক্ষণ বেলা চড়িয়া পাটের দোলা
কিঙ্কর পঞ্জর লইয়া সাথে।' -(পৃ-১১৩)

গ. জুয়া খেলা

'জুয়া খেলা কৈল সাধু খুল্লনার মনে
খুল্লনার জয় দেখি হাসে রামাগণে।' -(পৃ-১২৫)

ঘ. শিশুদের খেলাধুলা

'নগর্যা বালক সঙ্গে সদাই খেলে কড়া ডাঙ্গে
খেলে সদা টিকা কৌড় ভেটা
হইআ পাশার বশ পেলে বির্তি বিদু দশ
গঞ্জিফা খেলায় সকটা।

তেপাত্যা বাঘচালি খেলে সাধু সাতা ধূলি
সামরু সবই তিনাতা
কোনাকোনি নেত্রবন্ধ খেলায় সদাই দ্বন্দ্ব
না জানি দিবসে থাকে কোথা।
গৃহকাজে নাহি চিত্ত ডুবা বাজি খেলে নিত্য
,,,
নিরবধি সাতচারি খেলা।
টিক নাটিম পাতকালি কনক সুন্দর সালি
নিত্য ফিরে নগচর নগরে
খেলায় ময়না গুড়ি ফিরে বণিকের বাড়ি
একদণ্ড নাহি বৈসে ঘরে।
ঝলি খেলে চাপ্যা গাছ জলে খেলে মাছ মাছ
জীবন মরণ নাহি গণে।' –(পৃ-২২২)

গান-বাজনা ও নৃত্য

বাঙালি হিন্দু মুসলিম উভয় সমাজেই গান-বাজনা ও নৃত্য-গীতের কদর ছিল। ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান, বিবাহ-শাদি, উৎসব, পূজা-পার্বণে নাচ গানের আয়োজন করা হতো। বাঙালির লোকপ্রিয় গানের মধ্যে ছিল- মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালী, বাউল, মরমী, পল্লীগীতি, ঝুমুর নাচ, ঘেটু যাত্রা, যাত্রাভিনয়, বিচারগান, কীর্তন, কথকতা, গজল, হামদ, নাত, খেয়াল, কাওয়ালী ও বিভিন্ন রাগসঙ্গীত ও তাল-তান অন্যতম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পেশাদার নর্তক-নর্তকী, বাইজি, বেশ্যা ও শিল্পীদের দিয়ে নাচ-গান পরিবেশন করা হতো।

বাঙালির নৃত্যগীতের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে- একতারা, দোতারা, সেতার, বীণা, বেণু, ডমরু, শঙ্খ, সানাই, সিঙ্গা, পিণাক, পাখোয়াজ, দোহরা, মোহরা, ভেরী, মৃদঙ্গ, করতাল, তবলা, মুরলী, রবাব, বেহালা, ভেউল, কাঁসা, তাম্বুরা, কবিলাস, মন্দিরা, ঢাক, ঢোল, খঞ্জনি ও ঘুঙুরের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

১. 'সকল দোষহীন আজি শুভ দিন
গৌরীর বিবাহ মঙ্গল
শঙ্খ বেনু বীনা মৃদঙ্গ ভেরি নানা
বাজনে হইল কোলাহল।' –(পৃ-২০)

২. 'প্রতি ঘরে সন্ধ্যাকালে মণিময় দীপজ্বলে
শঙ্খ ঘন্টা বাজে বীনা বেনি
কাসর দুন্দুভি পড়া জগঝপ বাজে জোড়া
মৃদঙ্গ বল্লকি বাজে সানি।' –(পৃ-৮৭)

৩. 'আটদিকে বাজনায় হৈল গণ্ডলোগ
ঘন বাজে বীরকালি শিঙ্গা কাড়া ঢোল।' –(পৃ-১০৮)

অবসর অবকাশ যাপন

বাঙালি সমাজে ফসল তোলা, বৃষ্টি বাদল ও কাজের অবসর সময়ে নারীরা সাধারণত কাঁথা সেলাই, ছিকা-ঝুড়ি নির্মাণ, উকুন মারা, মাথায় তেল দিয়ে বেনি বা খোঁপা বাধা, পান খাওয়া ও খোশ-গল্প করে থাকে। অন্যদিকে

পুরুষেরা তামাক-হুকা খাওয়া, পান খাওয়া , তাসখেলা, দড়ি বা রশি পাকানো, টোনা ঝুড়ি-পলো-জাল নির্মাণ, পুথি পাঠ ও শ্রবণ, খোশগল্প করে অবসর সময় পাড় করে থাকে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির এ অবসরকালীন ক্রিয়া কর্মের প্রচলন পরিলক্ষিত হয় —

ক. উকুন মারা

'আইস প্রাণের সই বৈস গো বহিনি
মোর মাথে গোটা কথো দেখহ উকিনি।' –(পৃ-৫৫)

খ. চুল বাধা ও তেল দেয়া

'শিরে তৈল দিআ তার বান্ধিল কবরী
সরস সিন্দুর ভালে দিল সহচরী।' –(পৃ-৫৫)

৩. খোশ-গল্প

'দুই সয়ে কথায় মজিয়া গেল চিত
ভগবতী লইআ কিছু শুনিব সঙ্গীত।' –(পৃ-৫৫)

বকা ও গালি

ক্ষমতাধরের প্রতাপ খাটাতে এবং অক্ষম-অসহায় শ্রেণির মনের আক্রোশ প্রকাশার্থে মূলত গালির ব্যবহার হয়ে থাকে। বাঙালি সমাজে বহুকাল ধরেই আত্মীয়তার সম্পর্কিত বাচক; স্বভাব-বাচক, স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক, পশু-পাখিবাচক, নিন্দার্থক বকা ও গালির প্রচলন রয়েছে- শালা, শালি, সমুন্দি, কানা, কানী, ভাঙরা, বখিল, চশমখোর, ঢেমনা, বাড়া, গরু, গাই, বলদ, ষাঁড়, পাঠা, ছাগল, বানর চোরের মা, কুত্তার বাচ্চা, বাদীর বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা, ঢাটী, মাগী, নটী, বেশ্যা অন্যতম।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব বকা ও গালির বগুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় —

ক. 'নগরে বার্য়াতে নারি সত্যে মরি লাজে
খাট ভাতার ঢেঙ্গা মাগু দেখ্যা লোক গঞ্জে।' –(পৃ-২২)

খ. 'বিধাতা আমারে দণ্ডী জয়ন্তে ভাতারে রাণ্ডী
কৈলে দেবে দু:খের ভাজন।' –(পৃ-৫৪)

গ. 'লণ্ডে ভণ্ডে দেয় গালি বলে শালাশালা
আমি মহামণ্ডল আমার আগে তোলা।' –(পৃ-৮৪)

শাস্তি ও নির্যাতন প্রক্রিয়া

সামন্তবাদী বাঙালি সমাজে অন্যায় অপরাধের জন্য বেশ কিছু শাস্তির প্রচলন ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্রীয়ভাবে এসব শাস্তি বলবৎ করা হতো। সাধারণ শাস্তির ভেতরে- চড়, থাপড়, কিল, ঘুষি, কানমর্দন, নাকে খত, গলায় গামছা দিয়ে ঘোরানো, চাবুক মারা, পিপঁড়ার ওপর দাঁড় করানো, শীতে জলমগ্ন করা, গরমে গোলাঘরে বন্দী করা, শরীরে চুনকালি মাখানো, শরীরে চুতরা পাতা দলন, মাথা মুণ্ডানো ও গলায় জুতার মালা দেয়া, নাকে- মুখে চোখে গরম পানি ঢালা ও মরিচের ধোঁয়া দেয়া, হাতির পায়ে পিষ্ট করা, উত্তপ্ত তেলে ডোবানো, গাত্র চর্ম উত্তোলন প্রভৃতি। অপর দিকে চুরি-ডাকাতি, লুণ্ঠন, হত্যা, ব্যভিচার, ধর্ষণ, বিদ্রোহ, অপহরণ, খুন ও গুমের শাস্তি হিসেবে অঙ্গহানি বা অঙ্গচ্ছেদ, শিরশ্ছেদ, ফাঁসি, শূলে দেয়া ও জেল জুলুমের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল —

ক. 'বেক্তার্থ করিয়া রামা কহ সত্যভাষা
মিথ্যা বাক্য হইলে কাটিব তোর নাসা।' –(পৃ-৬২)

খ. ‘টানাটানি করে ভাণ্ডু হাটুআ নাহি ছাড়ে
কেশে ধরি কিল লাথি মারে তার ঘাড়ে।
পিঠে চুন মাখিয়া হাটুআ চলিল আর্দাসে
ভাই বন্ধু পসার লইআ চলে বাসে।’ –(পৃ-৮৪)

গ. ‘গজের শিকল দিআ বান্ধি মহাবীরে
বাঘহাথা হাথে দিল গলায় জিঞ্জিরে।
,,,
অবিলম্বে এই ব্যাধে দেহ গজতলে।
জটে দড়ি দিআ চালে বান্ধে মহাবীরে।
বুকে তুল্যা দিল পাঁচ সাঙ্গের পাথর
পাথর চাপানে বীর করে থরথর।’ –(পৃ-৯৬-৯৮)

ঘ. ‘অবশেষে প্রবেশিল ধূলিয়া কোঠর
সওয়া কোশ ঘর খানি একটী দুয়ার।
আহল বিহল খোজে আন্ধারিয়া কোন
কিচিকিচি করে তথা ছুছা পনে পন।
খুজিতে খুজিতে বন্ধির বুকে পড়ে পা
অন্নকষ্টে ছাড়ে বন্দি বিপরীত রা।
বন্দি পাইক সব ধরে তার চুলি
কিল লাথি মার্যা তারে দেহ গালাগালি।
দারুণ প্রহার তথি উদরের জ্বালা
খরশ্বাস বহে তার কর্ণে লাগে তালা।’ –(পৃ-২৮৫)

উপহার-বখশিশ

তৎকালীন বাঙালি সামন্তবাদী সমাজে শাসকের দরবার, আত্মীয় বাড়ি, বিয়ে, শ্রাদ্ধ, খৎনা, মিলাদ-মাহফিলের উৎসবে, পুরোহিত, মোল্লা, শিক্ষক এমনকি রাখাল শ্রমিকদেরও নানা রকম উপহার বখশিশ দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এসব উপহারের মধ্যে ছিল- টাকা-পয়সা, সোনা-দানা-অলংকার, পান-সুপারি, ধুতি-চাদর বস্ত্র, থালা-বাসন, গোলাম বা দাস-দাসী, মাছ, পশু-পাখিসহ মূল্যবান বস্তু সামগ্রী।

‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ এসব উপহার ও বখশিশের প্রচলন দেখা যায় —

ক. সইকে উপহার

‘আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি
চাপিয়া বসিল দোহে চৌখণ্ডি পিড়ি।’ –(পৃ-৫৫)

খ. শ্রমিকের বকশিশ

‘সাধুর বচন শুনি আনন্দিত নৃপমুনি
ডাকিয়া আনাইলা কারিকর
পান ফুল দিয়া হাতে বসন বান্ধালা মাথে
গড়িবারে সুবর্ণ পিঞ্জর।’ –(পৃ-১৩০)

গ. নবদম্পতির উপহার

'মাথায় মুকুট দিআ বসিল দম্পতি
কৌতুক জৌতুক দেই জাতেক জুবতি।
গড়িয়্যা আনিআছে কেহ রজত কাঞ্চন
,,,
কেহ সেত কেহ নেত কেহ দেই পাট শাড়ি
চন্দন কুসুম দুর্বা বাটা ভর‍্যা কড়ি।' –(পৃ-১২৫)

ঘ. ব্রাহ্মণের দক্ষিণা

'দক্ষিণা শতেক ধেনু দিলা সদাগর
হোমের তিলক ভালে দিল দ্বিজবর।
বেদমন্ত্রে আশিষ করিল দ্বিজগণ।' –(পৃ-১৭৪)

আদব কায়দা ও কুশল বিনিময়

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে প্রাত্যহিক জীবনে কিছু আদব-কায়দা মেনে চলার প্রথা প্রচলিত ছিল। যেমন- সাক্ষাতের প্রথমেই সালাম, আদাব, নমস্কার করা, করমর্দন করা, আলীঙ্গন বা কোলাকুলি করা, গুরুজনকে সেলাম, কদমবুছি বা প্রণাম করা। আবার বিদায় বেলা কিছু দূর পর্যন্ত এগিয়ে যাওয়া এবং অনুরূপ ভাবে সালাম-আদাব-প্রণাম করা। এছাড়া গুরুজনের সামনে বসে না থাকা, গুরুজনের সামনে নাম না বলা, উচ্চ শব্দে কথা বা হাসাহাসি না করা, গুরুজনের সামনে বা আগে না চলা, গুরুজনের সামনে ধূমপান না করা, একই বৈঠকে খাওয়া-দাওয়া করলে গুরুজনের পূর্বেই না খাওয়া এবং বড় বড় গ্রাসে খাবার না খাওয়ার প্রচলন ছিল।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব আদব কায়দার বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয় —

ক. নমস্কার

সম্ভ্রমে ফুল্লরা গেল সইয়ের দুয়ার
সেআরি ভেট দিয়া সয়ে কৈল নমস্কার।' –(পৃ-৫৫)

খ. প্রণাম

'প্রণমিঞা গুরুজন সাধু আইল নিকেতন
মাতা আইল সম্ভ্রমে উলর্থিতে।' –(পৃ-৩০০)

প্রতিশ্রুতি ও বাজিধরা

বাঙালি সমাজে কোন দু:সাধ্য কাজ করার ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে কিরাকাটা বা বাজি ধরার রীতি বা প্রথা প্রচলিত ছিল। এসব কর্মের সাফল্যকে গৌরব ও পৌরুষ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। বাজিতে হার-জিত উভয়ই থাকতো। বাজিতে বিজয়ী হলে- টাকা পয়সা, ধন-সম্পদ, রাজ্য-রাজকন্যা, দান সামগ্রী, সম্মান, সৌভাগ্য যেমন মেলতো, তেমনি পরাজিত হলে ধন-সম্পদ হরণ, অঙ্গহানি, অপমান, লাঞ্ছনা, কারাভোগ ও শিরশ্ছেদের মতো শাস্তি পেতে হতো। এসব বাজি বা প্রতিশ্রুতি অনেক সময় কাগজে কলমে চুক্তিবদ্ধ করা হতো, অথবা দেবতা, ধর্ম, মসজিদ, মন্দির ও ধর্মগ্রন্থকে সাক্ষী মেনে করা হতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব বাজির চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

ক. 'অল্প খায় লজ্জা করি জদি বা খুল্লনা নারী
লহনা মাথার দেই কিরা।' –(পৃ-১৩১)

খ. ‘সাধু বলে ভণ্ড বল ঠাকুরালি বলে
প্রতিজ্ঞা করিয়া চল কালিদহ জলে।
জদি মিথ্যা হয় তবে নুটি করিহ ধন
মসানে কোটাল দিআ বধিব জীবন।
রাজা বলে সত্য জদি তোমার বচন
অর্ধরাজ্য দিব তোরে অর্ধ সিংহাসন।
সুশীলা করিব দান ইথে নাহি আন
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা সালবাহন।
রাজা সাধু কৈল জদি প্রতিজ্ঞা পূরণ
মসীপত্রে লিখন করিল সভা জন।’ –(পৃ-২৫৬)

রোগ-বালাই

মধ্যযুদের বাঙালি সমাজে বেশ কিছু রোগের প্রকোপ ও প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান ছিল। এসব রোগের মধ্যে- সর্দি, জ্বর, অতিসার, শূল, ব্যথা, বাত, কাশি, গলগণ্ড, কফ, খুজলি বা চুলকানি বা চর্মরোগ, ঘা-পাচড়া, দাউদ, পিত্ত, কলেরা, বাউশি, বা পাইল্‌স, গুটি বসন্ত, কুষ্ঠ, সিফিলিস বা উপদংশন, চোখের ছানি, অন্ধত্ব, বধিরতা, যক্ষ্মা ও গোদ (elephantiasis) রোগ অন্যতম।

‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ এসব রোগ বালাইয়ের প্রকোপ পরিলক্ষিত হয় —

ক. গোদ রোগ ও জ্বর

‘এক আইয় বলে হেদে গোদা মোর পতি
কোয়া জ্বরের ওষুধ সদাই পাব কতি।’ –(পৃ-২২)

খ. বাত

‘অনুদিন কতেক সহিব উৎপাত
রাধিয়া বাড়িয়া মোর কাঁকালে হৈল বাত।’ –(পৃ-২৫)

গ. ছানি ও গুটি বসন্ত

‘ক্রোধ হইল নারায়ণী বাম চক্ষে হইল ছানি
বসন্তের চিহ্ন আছে মুখে।’ –(পৃ-২৮৫)

ঘ. কুজ ও দাদ

‘হাসিয়া অভয়া চাহিলেন কৃপাদৃষ্টে
সেইক্ষণে কুজ তার ঘুচাইল পৃষ্টে।
চণ্ডিকার পদধূলি দায়ে মাখে সাধু
ততক্ষণে ঘুচিল গায়ের হাথ্যা দাদু। –(পৃ-৩০৬)

ফুল-ফল-লতাগুল্ম-গাছপালা

বাঙালি সমাজে পূজা, যাগ-যজ্ঞ, ব্রত, বিবাহসহ সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ফুল-ফলের ব্যাপক ব্যবহার হয়ে থাকে। ফুল- চাপা, মালতী, যুথি, কেয়া, কদম, কেতকী, টগর, বকুল, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, জুই, পদ্ম, কবরী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, গোলাপ, হাসনাহেনা, গাদা, বেলী, পলাশ, শেফালি, শিউলি, কৃষ্ণচূড়া ও সূর্যমুখী প্রভৃতি। ফল ও ফলগাছ– আম, জাম, কাঁঠাল, নারিকেল, লিচু, কমলা, ডালিম, আতা, জলপাই, চালতা, জাম্বুরা, লেবু,

বেল, আমলকী, তাল, আমড়া, করঞ্জা, কামরাঙ্গা, কুল বা বরই, খেজুর, তেঁতুল, কলা, আখ, আনারস গাছপালা– বট, অশ্বত্থ, শিমুল, দেবদারু, মান্দার, ডেফল, শাল, মহুয়া, জারুল, কড়ই, জামরুল, তমাল, পিয়ালা, হিজল, বকুল, বাবলা, ছাতিম, নিম, নারকেল, সুপারি। লতা-গুল্ম– পান, পিপ্পল, মরিচ, আদা, হলুদ, পেয়াজ, রসুন, ধনে পাতা, পুদিনা পাতা, দেওলী বান্দুলি, ঈশ্বরীর মূল প্রভৃতি।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব ফুল-ফল, লতাপাতা, গল্ম ও গাছপালার পরিলক্ষিত হয় —

ফুল

'কহলার কৈরব কালা পানিসিউলি পানিকলা
কমল কন্দর ইন্দীবর
অশোক কিংশুক ঝাটি জাতী জুতি দুইবটী
রঙ্গন তুলিল নাগেশ্বর।
কুরবুক কুরুস্টক কুন্দ তুলে মরুবকে
কদম্ব কনক করবীর
লবঙ্গ তুলসী দনা ঘলঘষি বাকসনা
প্রত্যঙ্গিরা তুলিল ধুস্তুর।
শ্বেত রক্ত তোলে ওড় তুলিল মল্লিকা জোড়
কুন্দকুসুম তুলিল টগর।
নেহালী বান্ধুলী দুর্বা বনকরবীর মুর্বা
অতসী সিউলি পারিজাত।' –(পৃ-৩৪-৩৫)

ফল

'পাকা আম্র কিনে শয় মূলে
কিনিয়া নবাত ফেলি বিশা দরে কিনে চিনি
পান কিনে সহস্রের দরে।
,,,
কামরঙ্গ কিনে পণ দুই
কলা চাঁপা মর্তমান সরস গুয়া মিঠা পান
চারি কাহনের নিল কলা।
,,,
জুড়ি দরে নারিকল কুলি করঞ্জা পানি ফল
কাঁঠাল কিনিল দুই কুড়ি
কিছু কিনে ফুলগাভা করুনা কমলা টাবা
সের দরে ঘৃতে ঘরা ভরি। –(পৃ-১৫৭-১৫৮)

গাছপালা

'আমড়া বয়ড়া হরিড়া ধব
সুখান কাননে মেটাইল দব।
ডেফল কাফল করন্দার বন

,,,

সিরিষ করকট বনচালিতা

,,,

ফলহীন আম জাম কাটিল কুলি

,,,

কাঁটাল কদলি রাখিল গুয়া

অশ্বত্থ রাখিল মূল বান্ধিয়া

রাখিল রুদ্রাক্ষ জায়ফল লবঙ্গা।

,,,

তাল নারিকেল নগরে শোভা

শঙ্কর পূজিতে রাখিল বেলবন

বটতরু রাখিল ষষ্ঠীর ধাম

মহাতরু রাখিল জনবিশ্রাম।' –(পৃ-৬৯-৭০)

লতা-গুল্ম

'শরনল খাকড়া ইকড়ি টাঙ্গ

ওকড়া ধুথুরা কাটে অপাঙ্গ

আকড় কাটে সিঅলি নেহালী

আটিসার কাটসর কাটিল নাটা

ভাদালী ভাষনা চোর পলীটা

ঝোকড়া ঝাউ কাটে আদাড়মালী।

,,,

কেতুকি ঘেতুকি কাটিল বামনহাটী

সিআকুল ডামাকুল সিঙ্গারবেত

কোদালিয়া কাটিয়া করিল খেত।' –(পৃ-৬৯)

জীবজন্তু-পশু-পাখি ও কীটপতঙ্গ

বাঙালি সমাজে জলে-স্থলে, বন-জঙ্গলে, বাড়ি ও ঝোপ-ঝাড়ে বিচিত্র ধরনের পশু পাখি, জীব-জন্তু ও কীটপতঙ্গের আনাগোনা দেখা যায়। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসবের সরব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়–

গৃপালিত পশু-পাখি– গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, পাঠা, কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগি, কবুতর প্রভৃতি।

বন্য পশু– হাতি, ঘোড়া, গাধা, বাঘ, ভালুক, সিংহ, হরিণ, গণ্ডার, শিয়াল, বেজি, ইঁদুর, খরগোস, জিরাফ, জেব্রা ও শূকর।

পাখি– কোকিল, কাক, ময়ূর, তিতির, কোয়েল, ময়না, টিয়া, শকুন, চিল, পেঁচা, ফিঙ্গে, ঘুঘু, দোয়েল, শালিক, শামকল, পানকৌড়ি, বাবুই, চড়ুই, কানকুয়া, মাছরাঙা, ডাহুক প্রভৃতি।

জলজ জন্তু– শুশুক, কুমির, ঘড়িয়াল, হাঙ্গর, ভোদর, উদ, কাঁকড়া, শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক জোক প্রভৃতি।

কীটপতঙ্গ– ভ্রমর, ফড়িং, প্রজাপতি, মশা, মাছি, ডাশ, ঝিঝিপোকা, গোবরে পোকা, তেলাপোকা, বিচ্ছু, পিপঁড়া, মৌমাছি, সিন্দুরিয়া পোকা প্রভৃতি।

ক. বন্যপশু

'কান্দে সিংহ আদি পশু সঙ্গরি অভয়া
অপরাধ বিনে মাতা দূর কৈলে দয়া।

,,,
উইচারা খাই পশু নাম ভল্লুক

,,,
ধূলায় ধূসর হইয়া কান্দ এ বাঘিনী

,,,
হস্তী বলে অতি বড় আমার কলেবর

,,,
গুক গুক রবে কান্দে বনের মর্কট

,,,
বারসিঙ্গা তুলারু ঘোড়ায়ু ঢোলকান

,,,
হরিণ ভুবনবৈরি আপনার মাঁসে।
হেকুচি করিয়া কান্দে সজারু সসারু

,,,
কান্দে নকুল সুত দারার হাব্যাসে
সবংশে মজিলাঙ্ মাতা তোমার আশ্বাসে।' –(পৃ-৪৯-৫০)

খ. গৃহ পালিত পশু

'রাজভেট নিল সাধু সফরিয়া ভেড়া
পর্বত্যা টাঙ্গন তাজি নিল দিব্য ঘোড়া।

,,,
অজা লয়্যা আইল রামা দিন অবশেষ
অজাশানে অজাগণ করিল প্রবেশ। –(পৃ-১২৯-১৪১)

গ. পাখি

জটাউ সম্পাতী লিখে সুপর্ণ তিতির
জলে তাম্রচূড় লেখে চকোর-চকোরী
পেখম ধরিয়া নাচে মউর-মউরী।
নাবক সাবক লিখি লিখে চক্রবাক
দেবরূপি বিহঙ্গম লিখে শ্বেতকাক।
পায়রা কপোত লিখি লিখে গাঙ্গচিল
কুলিঙ্গ সালিকা ভেঠা টেঠারি কোকিল।
উড়িয়া পড়িয়া মৎস্য ধরে মৎস্য রাঙ্গা
ভুজঙ্গে ধরিয়া খায় ধুকুড়িয়া কাকা।
উড়িয়া কমলে বৈসে খঞ্জনী-খঞ্জন
চাতকা-চাতকী জল মাগে ঘনে ঘন।
চটক কর্কট টিয়া বায়স পেচক
গুগুর ভারই ভাউক লিখিল বক।' –(পৃ-৫৭)

জলজ জন্তু

‘জল জন্তু মুকর লিখিল চারিদিক।
কুম্ভীর হাঙ্গর লিখে ঘড়িয়াল সুশুক।

,,,

লহলহ করে জোক জেন করিকর
চুনজল পেল্যা তথি দিল সদাগর।’
বণ্ড তিমিঙ্গিল আছে প্রাণ পীড়াশীল মাছে। –(পৃ-৫৭)

কীটপতঙ্গ

‘উড়ুষ নিদ্রায় হইল কাল
দৈবগতি বিপরীত কানে মশা গায় গীত
চৌদিকে ছুছার হইল জাল। –(পৃ-২১৩)

সাপ

বাংলার আবহাওয়া, জলবায়ু, নদ-নদী ও ভৌগোলিক কারণে এদেশে বিচিত্র ধরনের সাপ দেখা যায়। এসবের মধ্যে- ধোড়া, তক্ষক, উদয়কাল, উদয়গিরি, কর্কট, শঙ্খ, গোখরা, দারাস, কালনাগ, সুতানলি, পঙ্খিরাজ, ভার্গব, অজগর, কেউটিয়া, বিদ্যুৎনাগ, দুমুখো সাপ প্রভৃতি অন্যতম।

‘দেখিল রুচির তনু রূপে জিনি হেমভানু
সুবর্ণ গোধিকা বাম ভাগে।’ –(পৃ-৫২)

নদ-নদী

বাংলার বুক জুড়ে জালের মতো জড়িয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। এসব নদীর মধ্যে- গঙ্গা, ভাগীরথী, কালিন্দী, সরস্বতী, গোদাবরী, বিপাশা, সরযূ, মন্দাকিনী, দামোদর, ইরাবতী, রেবা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, ভৈরব, গোমতী, তিস্তা, কপোতাক্ষ, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, কালীগঙ্গা, শ্বেতগঙ্গা, গড়াই, রূপসা, চিত্রা, ভালুকা, লৌহজং, কুমার, আত্রাই, মহানন্দা, ইছামতি, বংশী প্রভৃতি। আর সাগর বলতে মূলত বঙ্গোপসাগরকেই বোঝোতো।

‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ এসব নদ-নদীর উল্লেখ পাওয়া যায় —

ক. নদী

‘মগরা নদীর সঙ্গে করিতে মিলন
আজ্ঞা দিল ভবানী চলিল মন্দাকিনী
ছাড়িআ গগণস্থিতি
মকর জাল ছাড়িআ পাতাল
চলিলা ভোগবতী।
আমুদর দামুদর ধাইল দারুকেশ্বর
ধাইল বাহুদা বিপাশা।

,,,

গঙ্গা যমুনা ধাইল বরুণা
অজয় সরস্বতী
ধাইল কুন্তী বাঁকা ধায় গোমতী
সরযূ কংশাবতী।

ইরাবতী নরাবতী ধাইল লঘু
কানা ধায় দামোদর
,,,
ধাইল কাসাই মহানদী বিড়াই
খরস্রোত বামনের খানা
চারিদিকে জল হইল ধবল
মগরা জুড়্যা বয় ফেনা।' –(পৃ-২৩৯)

প্রকৃতির প্রভাব

বাঙালির জীবন জিজ্ঞাসা জীবিকা ও ভাব-ভাবনার ওপর প্রকৃতির প্রভাব ছিল অত্যন্ত গভীর। বাংলার ষড় ঋতুর বৈচিত্র্য, নদ-নদীর আশীর্বাদও আগ্রাসন, খরা-দুর্ভিক্ষ-মঙ্গা, মেঘ-বৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, বান ও বন্যার খেয়ালী মূর্তি বাঙালি নর-নারীর অন্তঃকরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' মানব মনের ওপর প্রকৃতির এ অনিবার্য প্রভাবের চিত্র পাওয়া যায় —

ক. মেঘ-ঝড় বৃষ্টি

'ঈশানে উরিল মেঘ সয়নে চিকুর
উত্তর পবনে মেঘ ডাকে দুরদুর।
নিমিষেকে জোড়ে মেঘ গগণমণ্ডল
চারি মেঘে বরিষে মুষল ধারে জল।
,,,
করিকর সমান বরিষে জল ধারা
জলে একাকার মহী পুখুর হইল হারা।
ঘন বাজ ধ্বনি চারি মেঘের গর্জন
কার কথা শুনিতে না পায় কোন জন।
,,,
সাতদিন জলবৃষ্টি হয় নিরন্তর
আছুক শস্যের কাজ হাজ্যা গেল শর।' –(পৃ-৭৪-৭৫)

খ. মানব মনে ষড় ঋতুর প্রভাব

'বৈশাখে দুরন্ত রিতু সুখের সময়
প্রচণ্ড তপন তাপ তনু নাহি শয়।
,,,
নিদারুণ জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচণ্ড তপন
পথ পোড়ে খরতর রবির কিরণ।
,,,
আষাড়ে গর্জএ ঘন নাচএ মউর
নবজল মদ-মত্ত ডাকএ দাদুর।
,,,
সঙ্কট সময় বড় ধারা শ্রাবণ
সাধ লাগে অঙ্গে দিতে রবির কিরণ।
,,,

ভাদ্রপদ মাসে বড় দুরন্ত বাদল
নদনদী একাকার আট দিকে জল।

,,,

আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করিবে হরিষে
শোলো উপচারে ছাগ মাষ মহিষে।

,,,

বিষ্টি টুটাইআ আইল কার্তিক মাসে
দিবসে দিবসে হয়ে হিমের প্রকাশে।

,,,

সকল নূতন শস্য অগ্রহায়ণ মাস
ধান চালু সরিসাতে পুরিবে আও বাস।

,,,

পৌষে গোঙাইব নাথ অষ্ট প্রকারে
মৎস্য মাংস মধু মুলা নানা উপহারে।

,,,

মাঘ মাসে প্রভাতে করিয়া স্নানদান
সুপাঠক আন্যা দিব সুনিবে পুরাণ।

,,,

ফাগুনে ফুটিল নাথ মম উপবনে
তথি দোলমঞ্চ নাথ করিব নির্মাণে।

,,,

মধু মাসে মলয় মরুত মন্দ মন্দ
মালতীএ মধুকর পীয়ে মকরন্দ

,,,

মোহন মধুমাসে মোহন মধু মাসে
মদন মন্দিরে বেশ মদন আওয়াসে।' –(পৃ-২৯২-২৯৪)

হাসি-ঠাট্টা ও রঙ্গ-রস

বাঙালি সমাজে ঠাট্টার সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হাসি-তামাশা, রঙ্গ-রসালাপ প্রচলিত রয়েছে। অনেক সময় ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করতেও হাসি ঠাট্টার আশ্রয় নেয়া হতো। দাদা-নাতি, নানা-নাতি, নানা-নাতিন, দাদী- নাতিন, বা দাদা-নাতিন, বেহাই-বেহান, বন্ধু-বান্ধব, সই-সখী, ভাবি-দেবর, স্বামী-স্ত্রী, দুলাভাই-শালিকা-শ্যালকদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হাসি-ঠাট্টা, মশকরা ও রঙ্গ-রসের প্রচলন বণ্ডকাল থেকেই এদেশে প্রচলিত রয়েছে।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এরূপ রঙ্গ-রস ও হাসি ঠাট্টার পরিচয় পাওয়া যায় —

ক. স্বামী স্ত্রীর মধ্যেকার রঙ্গ-রস

ধনপতি —

'জেই দিন প্রিয়ে তুমি না কর রন্ধন
সেই দিন নহে মোর উদর পূরণ।

লহনা —

লহনা বলিল নাথ তেজ পরিহাস
সুয় জায়া রান্ধ্যা দেকু বেঞ্চন পঞ্চাশ

জীবনে অধিক গুরু নবীন অঙ্গনা
বাসি ফুলে মধুকর না করে বাসনা।' –(পৃ-১৭২)

খ. চাচা-ভাতিজা পর্যায়ে হাসি-ঠাট্টা

রাজা বিক্রম কেশরী

'আইস দত্তের পো বৈস বা কম্বলে
খুড়া ভাইপো সম্বন্ধে নৃপতি কিছু বলে।
বিরহে তোমার মাতা হইয়া গেল বুড়ি
যবুক দেখিয়া তোমার করাইব সাসুড়ি।' –(পৃ-২৩২)

ধাঁধা বা প্রহেলিকা

বাঙালি সমাজে বুদ্ধির প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করতে রাজ দরবারে, বৈঠকখানায়, মজলিশ বা মঞ্চে আনুষ্ঠনিকভাবে ধাঁধা প্রহেলিকা বা হেঁয়ালি ধরা হতো। এতে বিজয়ী ব্যক্তির পুরস্কার-সম্মান-সৌভাগ্য যেমন লাভ হতো, তেমনি পরাজিত ব্যক্তির লাঞ্ছনা, অপমান, কারাভোগ বা জীবন বিপন্ন হতো।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' উজবানির রাজা বিক্রম কেশরীর পণ্ডিত সারি-সুয়া পাখিটিও এমন **১৩**টি প্রহেলিকা বা হেঁয়ালি বলেছিল রাজ দরবারে। এসবের অন্যতম —

১. প্রশ্ন– 'বিধাতা নির্মাণ ঘর না:কি দুয়ার
জুগি পুরুষ তাহে আছে অনাহার
জখন পুরষ তাহে হয় বলবান
বিধাতার ঘর ভাঙ্গ্যা করে খান খান।' –(পৃ-১২৭)

উত্তর– রেশম কীট

২. প্রশ্ন– 'পাষাণ জিনিয়া দৃঢ়তর তার কায়
তুষার জিনিয়া শীতল লাগে বায়।
জখন প্বার্থিব সঙ্গে হয় দরশন
সেই ক্ষণে হয় তার অবশ্য মরণ। ' –(পৃ-১২৭)

উত্তর– আগুন

বাকচাতুর্য ও বাহাস

বাঙালি সকল শ্রেণির নারী পুরুষ তাদের প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে বাকচাতুর্য ও রসালাপে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। জীবন অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে সকল মানুষই দেখা-সাক্ষাতে, কুশলাদি বিনিময়ের সময়, ঝগড়ার সময় বাকচাতুর্য ও বাহাসের পরিচয় দেয়। আবার অনেক সময় কোন বিষয়ের বৈধতা বা গ্রহণ যোগ্যতার বির্তক নিয়ে ধর্মীয়ভাবে আনুষ্ঠানিক বাহাসের আয়োজন করা হয়।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এরূপ বাকচাতুর্য ও বাহাসের পরিচয় পাওয়া যায় —

লহনা ও খুল্লনার বাকচাতুর্য

খুল্লনা– 'তোমার নাহিক ইথে দোষ
শৃঙ্গার ভুঁজিতে পরিতোষ।
বড় দু:খ শৃঙ্গার সাগরে
জেন শশকে বারণে রণ করে।
ভেক জেন ধরে বিষধর

মৃগপতি জেন করিকর।
জেন ধরে মর্কটি মক্ষিকা।
বর্জি জেন ধরএ মুষিকা।
চিলে যেন ছুঞা লয় মীন
তেন তোর রতি সতীন।

,,,

লাজ ভয় নাহি তোর ঢাঁটি
কেন বা বলিলু খায়্যা মাটি।' –(পৃ১৬৩)

খুল্লনা– 'শুনগো লহনা দিদি প্রাণের বহিনি
রমণী রমণে মরে কোথাহ না শুনি।
আগে দেখ স্বর্গে মঘ মহাবলবান
কেমনে কামিনী শচী দিল রতিদান।
তবে দেখ রঘুনাথ মহাশক্তিধরে
কেমনে কামিনী সীতা তার ঘর করে।
সদাই মাদক দ্রব্য হরের ভক্ষণ
ভবানী কেমনে সহে তাঁর আলিঙ্গন।
ভীম সম বলবান নাহী ত্রিভুবনে
কেমনে দ্রৌপদী সহে তাহার রমণে।
না বল না বল দিদি নিষেধ বচন
আপনার প্রাণনাথ অঙ্গের ভূষণ।

,,,

দশমুখের চুম্বন সহেন মন্দোদরী
ভিন্ন নাহি কৈল বিধি কুমারীর পুরী।
ডাস মসা নিবারণে পাটের মসারী
অঙ্গরখী বলে কান্ত নিবারণ করি।
ভোজনের কালে আমি কর‍্যাছি ইঙ্গিত
ভাঙ্গিতে তাহার সত্য না হয় উচিত।' –(পৃ-১৬৪)

সম্ভোগ

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের সম্ভোগ প্রক্রিয়াটিও শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে। দিন-ক্ষণ, তিথি, নক্ষত্র, ঋতুবতী অবস্থা, শারীরিক শুচিতা ও কতিপয় সংস্কার মেনেই দম্পতিগণ রতিলীলা সম্পন্ন করতো। ধনী ও রুচিবান দম্পতি বা নারীগণ পরিবেশ ও প্রস্তুতির ওপর বিশেষ জোর দিতো। উত্তম খাবার, উপযোগী পোশাক, শারীরিক পরিশুদ্ধি, সুগন্ধি ব্যবহার, মুখশুদ্ধি ও গৃহ সজ্জার বিয়ষসমূহ এক্ষেত্রে গুরুত্ব পেতো। 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় ––

পরিবেশ ও প্রস্তুতি

সাধারণত গভীর রাত ও নিরিবিলি পরিবেশে, উত্তম তথা উত্তেজক খাবার, মুখশুদ্ধি, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার ও গৃহ সজ্জার বিষয়সমূহ এর অপরিহার্য অঙ্গরূপে বিবেচিত হতো।

ক. শারীরিক পরিশুদ্ধি ও প্রসাধন

'হাস্যা হাস্যা দিল রামা নিজ অঙ্গ তোলা
ভূমে গড়াগড়ি দিয়া হাসএ দুবলা
হেট মুখে ধনপতি রহিল বিমনা

হরিদ্রা গুলিয়া অঙ্গে দিলেন খুল্লনা।
হরিদ্রা পাইয়া সাধু করে অনুমান
হেনকালে মনে পড়ে পুথি অভিধান।

,,,

ভোজন সঙ্কলি আচমন কুতূহলে
কর্পুর তাম্বুল খায় হাসে খল খলে।

,,,

চরণে পাউড়ি সাধু করিল গমন
বিনোদ মন্দিরে গিআ দিল দরশন।
কর্পুর তাম্বুলে কৈল মুখের শোধন
অঙ্গে আরোপিত সাধু কুমকুম চন্দন।
পদ্মনাভ সঙরিআ করিল শয়ন।' –(পৃ-১৬১-১৬২)

খ. শয়ন কক্ষের সাজসজ্জা

'সাধুর ইঙ্গিত ধরে প্রবেশিআ বাসঘরে
খাট করে চন্দনে ভূষিত
সুগন্ধি ধূপের ধূমে আমোদিত কৈল ধামে
বাসঘরে বিছায় শয়ন
চৌদিকে উচ্ছ্রিত স্থলে মণিময় দীপ জ্বলে
জেন দেখি ইন্দ্রের ভবন।
নেয়াল করিআ আট প্রথম বিছায়খাট
তুলি মুসরি সেজি ঝাঁপা
ফিতা কথুবার বান্ধ্যা উপরে টানায় চান্দা
বিছায় মালতি জুতি চাঁপা

,,,

দুই দিকে আলবাটী জলে পুর‍্যা গাডু ঘটী
দুই দিকে এড়ে দুই পাখা
বাটায়্যা পান গুয়া সুগন্ধি চন্দন চুয়া
কর্পুর লবঙ্গ তোলা লেখা।
সুগন্ধি ফুলের মালা ভরিআ এড়িল থালা
অমৃত পুরিআ গঙ্গাজল।' –(পৃ-১৬১)

গ. রতিলীলা

'আলিঙ্গন প্রেমরসে দুহে দুহো ভুজপাশে
দুই তনু নিবিড় বন্ধন
তরলবলয় তুজে অনঙ্গ সঙ্গম জুঝে
অভিনব রতি এ মদন।
শোভে অতি অনুপাম বিন্দু বিন্দু শোভে ঘাম
উতোরোল সঙ্গম কৌতুকে
স্থির সৌদামিনী জেন আলিঙ্গন ঘনে ঘন
দুই তনু নিবিড় পুলকে।
ধৌত বসন বাস ঘামে পত্রাবলি নাশ
চলাচল মুখর নূপুর
বিচলিত হইল বাস মুখে মন্দ মন্দ ভাস

করবিবন্ধন গেল দূর।
সাধু সদনের সখা অধরে কজ্জলরেখা
কপালে সিন্দুর বিভূষণ
প্রমদার অঙ্গরোগ দুই অঙ্গে অপভাগ
দুই তনু এক অপঘন।
আয়াস অলস ঘুমে প্রেমালাপে বাসধামে
কুতূহলে গেল এক মাস
সাধু সঙ্গে সহবাসে পুরুষ পরশরসে
স্বয়ম্ভু কুসুম পরকাশ।' –(পৃ-১৭০)

দেশি শব্দ ও ভাষাবুলি

একসময় বাঙালির ছিল গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, আথাল ভরা গরু ও আর বুকভরা গান। এ ভাবপ্রবণ বাঙালির ভাষা ও বুলির মাধ্যমে প্রকাশ পেতো তার প্রাণের আকুতি-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নবিলাস। প্রাত্যহিক জীবনে উচ্চারিত ও ভাষাবুলি ও শব্দমালাই ছিল বাঙালির চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার পরিচায়ক।

'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে' এসব দেশি ভাষা ও শব্দের প্রভাব পরিলক্ষিত হয় —

আইলাঙ (আসা), বার্যাতে (বেরুতে), ভাতার (স্বামী), ঢেঙ্গা (চঞ্চল), মাগ (স্ত্রী), স্মঙরিয়া (স্মরণ করে), কাঁকাল (কোমর), কুপি (প্রদীপ), ডেড়ি (বাড়তি), ইন্দুর (ইঁদুর), সাজী (ঝুড়ি), কোঙর (পুত্র), নিধানী (ধান ছাড়া বা বিহীন), লোন (লবণ), বাড়া (বেশি), বেভার (উপহার), বেসাতি (পণ্য), বেঞ্জন (তরকারি), খাপরা (মৃৎপাত্র), আমানী (মদ বিশেষ), বিটকাল (অসুন্দর), রাণ্ডী (বিধবা), দেওর (দেবর), গোহারি (অনুযোগ), খুদ (চাল বিশেষ), জাউ (খাবার বিশেষ), বহিনি (বোন), উকিনি (উকুন), পিড়ি (আসন বিশেষ), কাচুলি (বক্ষবন্ধনী), ঝি (মেয়ে), বগুড়ি (বউ), সোলস্যা (ষোড়শী), ফাফর (অস্বস্থি), খণ্ডা (কপটলোক), পুখুর (পুকুর), সেয়ানা (চতুর), পাজা (বোঝা), আছুক (হঠাৎ), ঢেঁকি, কুলা, মস্করা, ঠেঠা (তর্ককারী), ডিমিডিমি (মৃদুমন্দ), মোচলায় (দলন), মুত (প্রস্রাব), বিহান (সকাল), খাটাল (ঘরের মেঝে), দড়া (রশি), জাঙ্গাল (জমির আল), ব্যাজে (অজুহাতে বা ছলনায়), জোখে (ওজন/হিসাব) ছামনি (শুভদর্শন), কামলা, পল, কাহন, বুড়ি (পরিমাণ), পণ, তোলা, রতি, গণ্ডা, সের, সিকা, ধুতি (ঘুষ বিশেষ), কড়ি ও দন (ভাত), কিরা (প্রতিশ্রুতি), নিয়ড়ে (নিকটে), জিউ (জিহ্বা), রা (শব্দ), ভেট (উপহার), সদাই (কেনাকাটা), রসই ঘর (রান্নাঘর), ঢাটী (নির্লজ্জ), সরা (ঢাকনা), অবধান (শোনা), নাইয়র, নিছনি (বৈশিষ্ট্য), বেপার (ব্যবসা), বাও (বাতাস), তরাস (ভয়), মইল (মৃত্যু), বায়্যা (বেয়ে যাওয়া), নায়্যা (মাঝি), সসুরা (শ্বশুর), জাকু (যাক), মসী (কলম), উড়ুষ (ছারপোকা), ডাগর (বড়), বেউস্যা (বেশ্যা), জারুয়া (জারজ), গাই (গাভী), জমক (জমজ), নেত (বস্ত্র বিশেষ), আহড়ে (আড়ালে), নাএ (নৌকায়), খাঁখার (কলঙ্ক),গাবর (যুবক মাঝি), হাগলাইনু ডাইল (সবজি ডাল), নান্দিআ (রান্না করে), ঢঙ্গাতি (ছলনা), বাটপাড়, নড়ি (লাঠি), টিটকারি (ঠাট্টা), ক্ষেআতি (খ্যাতি), কানি (কাপড়েরের খণ্ডাংশ), আঘন (অগ্রহায়ণ), আড়ানি (ঘরের বাঁশ বিশেষ), ইচা (চিংড়ি), ওম (তাপ), ছা (বাচ্চা), জাবক (আলতা), ঝুপড়ি (পর্ণকুটীর), ঢেমনা (জারজ), দাদুর (ব্যাঙ), পলো (মাছ ধরার যন্ত্র), পাউড়ি (খড়ম), বাখান (প্রশংসা), রাউড়ি (দাদন), বারা (জলপূর্ণ ঘট), বাঁজা (বন্ধ্যা), বিছন পুড়া (বীজ ধানের গোলা), হলিক (চাষা) প্রভৃতি।

বিদেশি শব্দ

সমকালীন রাজনীতি ও ধর্মীয় প্রভাবে বাঙালি সমাজে দেশি শব্দের সঙ্গে বিদেশি (আরবি, ফারসি, তুর্কি) শব্দের মিশ্রণ ঘটে যায় অনিবার্যভাবে। এ শব্দগুলো বর্তমানে বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়েছে।

খিলাত, উজির, সরকার, ডিহিদার, তালুক, পোতদার, দলিজ, বিবি, বান্দি (বাদি), খয়রাত, মোকাম, কোরান, পির, রোজা, ইজার, মি:া, নিকা, কাজি, সিরনি, মখতব, নামাজ, ইনাম, চাকর-নফর, শেখ, সৈয়দ, মওলানা, তাজি, কোটাল (কতোয়াল), জিঞ্জির, খারিজ, শামিয়ানা, তঙ্কা, সওদাগর (বণিক), সওদা (কেনাকাটা), ইনছাফ, খাসা, কলিমা (কালেমা), কামান, কৈফিতের (কৈফিয়ত), গঞ্জিফা, জভেই (জবাই), জানদার (গোয়েন্দা), জায়গীর, তবলা, তাবু, দরে, দাগা, দিগারি, নারেঙ্গা, নিশান, ফজর, ফরমান, বকরি, বাজেমহল (বাজেয়াপ্ত), বিরাদর (ভাই), বেগার, মসহাত (জরিপ), সওয়ার, সদর, সফর, সানাকার, সেলামী, হানু (খাবার দোকান), হালবাকি (বকেয়া), গুদুরা (অনাথাশ্রম) প্রভৃতি।

দার্শনিক উক্তি ও তত্ত্ব কথা

বাঙালি সমাজে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞতা, পুরাণ কথা, নীতি কথা, ধর্মীয় শাস্ত্রকথা, ঐতিহাসিক কাহিনী ও চরিত্রের ওপর এমনকি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাবে কিছু দার্শনিক উক্তি ও তাত্ত্বিক বচনের উদ্ভব-বিকাশ ঘটেছে। এসব উক্তি ও কথার মাধ্যমে মূলত বাঙালি জাতির নীতি-নৈতিকা, জীবন জিজ্ঞাসা ও ভাব-ভাবনার বিষয়টি উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ এসব দার্শনিক উক্তি ও তাত্ত্বিক বচনের প্রমাণ পাওয়া যায় ––

ক. ‘বিশেষ কহিব কত শুন ধনপতি
খিতিতলে উৎপতি খিতিতলে মৃতি।
বাদিয়া নাচায় জেন কাষ্ঠের পুত্তলি
সেইরূপ সংসার নাচে কৃষ্ণ করে কেলী।
মনেতে ভাবিয়া দেখ কেহ কার নয়
পথিকে পথিকে জেন পথে পরিচয়।
স্ত্রী পুত্র ভাই আপনা কেবা বলে
আপুনি থাকিতে কেন তারা সব চলে। –(পৃ-৩১০)

খ. ‘জেই ধর্ম হয় সত্যে দ্বাদশ বৎসরে
ত্রেতা যুগে সেই ধর্ম এক সম্বৎসরে।
দ্বাপরেতে সেই ধর্ম হয় এক মাসে
সেই ধর্ম হয় কল্যে (কলি যুগে) রজনীদিবসে।–(পৃ-৩০৯)

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা

প্রবাদ-প্রবচন ও বাগধারা হলো বাঙালি নর-নারীর কথা বলার ভূষণ। জীবনের নানা অভিজ্ঞতাজাত এসব প্রবাদ-প্রবচন হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালি জাতির নৃতাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, আবহাওয়া, জলবায়ু, কৃষি ও লোকাচারসমূহ। বাঙালি নর-নারী তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে, ভাব-ভঙ্গিতে, চেতন-অবচেতনে এবং হাসি কান্নায় এসব প্রবাদ-প্রাবচনিক বাক্য, ডাক ও খনার বচন ব্যবহার করে আসছে।

‘চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে’ এসব প্রবাদ প্রবচনের বহুল প্রভাব দেখা যায় ––

১. ‘পরপর দুই জনে হইলা প্রতিকূল
শ্বশুর জামাতা হইল ভুজঙ্গ-নকুল।’ –(পৃ-১০)

২. ‘কি করি কোথাএ জাই কোথা গলে তরি

আপনার (হাতি) দন্তদুটা আপনার অরি।' –(পৃ-৫০)

৩. 'কেনি হেন জর্ম বিধি দিল পাপবংশে
হরিণ ভুবন বৈরি আপনার মাঁসে।' –(পৃ-৫০)

৪. 'পিপিড়ায় পাক (পাখা) উঠে মরিবার তরে
কাহার সোলস্যা কন্যা আনিআছ ঘরে।' –(পৃ-৬২)

৫. 'অবধান কর রায় করি নিবেদন
জনম হইলে হয় অবশ্য মরণ।' –(পৃ-৯৭)

৬. 'কহিতে জানিস ঠকা কপট প্রবন্ধ
হৃদয় পুরিতে বিষ মুখে মকরন্দ' –(পৃ-১০৬)

৭. 'জীবনে যৌবন বড়ই প্রীত
আদ্যের অক্ষরে দুইজনে মিত।' –(পৃ-১৩৫)

৮. 'নারীর যৌবন জলের ফোঁটা
হারাইয়া যৌবন রাখিল খোঁটা।' –(পৃ-১৩৫)

৯. 'জার সনে বারমাস এক ঘরে করি বাস
অবশ্য কন্দল তার মনে।' –(পৃ-১৫০)

১০. 'এক বলিতে দশ বলিবে না করিবে তরাস
উনু বুকে নাঞি করি সতিনের বাস।' –(পৃ-১৫৩)

পরিশেষে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় 'চণ্ডীমঙ্গল' এক অনন্য অদ্বিতীয়-ব্যতিক্রমী কাব্য, এবং যে কাব্যের সমাজচেতনা ও শ্রেণিদ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক মূল্য সমকালে ছিল তুলোনারাহিত। কারণ এ কাব্য শুধু সামাজিক দ্বন্দ্ব বিদ্রোহ বিক্ষোভ ও বিরোধেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এখানে আছে একটি আত্মপ্রতিষ্ঠার জোর প্রয়াস। ফলে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো এর সবটাই সংঘর্ষ বিরোধে নিবদ্ধ নয়, আছে নতুন সমাজে পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠার প্রতীকী ইঙ্গিত।

কারণ পুরোনো মূল্যবোধ, সংস্কার ও সমাজ মানুষকে মুক্তি দিতে পারে না- মুক্তির জন্য চাই সমাজ কাঠামোর বৈপ্লবিক রূপান্তর বা পালাবদল। যা কালকেতুর কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতীক-পুরোধা শিবের ওপর ব্রাত্য শ্রেণির অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডীর বিজয়- সে ইঙ্গিতেরই প্রতিধ্বনি।

তথ্য-নির্দেশ

১.	আহমদ শরীফ	:	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য; (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমি, ১৯৮৩, পৃ-৩৮৬
২.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি. দ্বাদশ সংস্করণ ২০০৯, কলকাতা, পৃ-৩৪৫
৩.	R.G.Bhandarkar	:	Vaisnavism, saivism and Minor Religious Sys:em, 1913, p-143-144.
৪.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	পূর্বোক্ত; পৃ-৩৪৬
৫.	পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৩৪৭
৬.	S.C. Roy	:	Oraon Religion and Customs (Ranchi,1928),p-3
৭.	আহমদ শরীফ (সম্পা.)	:	মধ্যযুগের বাঙলা গীতি কবিতা; মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, ঢাকা, পৃ-ভূমিকা অংশ
৮.	আহমদ শরীফ	:	বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য; পূর্বোক্ত; পৃ-৩৮৭-৩৮৮
৯.	পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৩৯১
১০.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	পূর্বোক্ত; পৃ-৪০৫
১১.	আহমদ শরীফ	:	পূর্বোক্ত; পৃ-৩৯৪
১২.	পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৩৯৪
১৩.	সুকুমার সেন (সম্পা)	:	চণ্ডীমঙ্গল; সাহিত্য আকাদেমি, নতুন দিল্লী, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০১, পৃ-৩৬
১৪.	পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৩৭
১৫.	পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৩৩
১৬.	পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৪১
১৭.	আহমদ শরীফ	:	পূর্বোক্ত ; পৃ- ৩৯৪
১৮.	দীনেশচন্দ্র সেন	:	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্যপুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৫, কলকাতা, পৃ-৪৩০
১৯.	আহমদ শরীফ	:	পূর্বোক্ত; পৃ-৩৯৪
২০.	দীনেশচন্দ্র সেন	:	পূর্বোক্ত; পৃ-৪৩০
২১.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	পূর্বোক্ত; পৃ-৪০৬
২২.	ক্ষুদিরাম দাস	:	কবিকঙ্কণ চণ্ডী (কালকেতু উপাখ্যান), ভূমিকা, পৃষ্ঠা-ীররর, ীর, ীরর
২৩.	অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	:	বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, কলকাতা, পৃ-১৬১-১৬৩
২৪.	মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	:	বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ- ৩৯৫
২৫.	সুকুমার সেন	:	পূর্বোক্ত; পৃ-৩৭-৪১

২৬. ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য : জীবনরসিক কবি মুকুন্দরাম, হাউস অব বুকস্, কলকাতা, ১৯৬৩, পৃ-২৫
২৭. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮, পৃ-৪১৬
২৮. সুকুমার সেন (সম্পা.) : চণ্ডীমঙ্গল, পূর্বোক্ত; পৃ-৪৩
২৯. রাজেন্দ্রলাল মিত্র : বিবিধার্থ সংগ্রহ (১৮৫৮-৫৯)
৩০. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা, পুণর্মুদ্রণ, ১৯৯৬, পৃ-১১-১২
৩১. গোপাল হালদার : বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা; মুক্তধারা, ১৯৭৪, ঢাকা- পৃ-১০৯
৩২. আহমদ শরীফ : পূর্বোক্ত; পৃ-৩৯৪
৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্যের স্বরূপ (১৩৫০), আশিতম জন্ম দিনের ভাষণে পঠিত
৩৪. সুকুমার সেন (সম্পা.) : চণ্ডীমঙ্গল, পূর্বোক্ত; পৃ-৪৪
৩৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ-৪১৩
৩৬. R.C Dutta : Literature of Bengal (Calcutta, 1895), p-116
৩৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ-৪১৩
৩৮. পূর্বোক্ত : পৃ- ৪১২
৩৯. সুকুমার সেন : পূর্বোক্ত; পৃ-১৮
৪০. পূর্বোক্ত : পৃ- ২২
৪১. পূর্বোক্ত : পৃ- ৪৩
৪২. গীতা মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা; কে.পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ-১
৪৩. অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ, উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ-৮৫
৪৪. JadunaTh Sarkar (ed.) : The History Bengal, Vol. II (Dacca, The University of Dacca, 1972) p.193
৪৫. রামশরণ শর্মা : ভারতের সামন্ততন্ত্র; কে. পি. বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৭৭, কলকাতা, পৃ-২২৪-২২৭
৪৬. রংগলাল সেন : বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস; বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৮৫, পৃ-৫৭
৪৭. গীতা মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; পৃ-৪
৪৮. অতুল সুর : বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন; সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ-২৪৩
৪৯. M.A. Rahim : Social and cultural History of Bengal, Vol. II (Karachi, Pakistan publishing House) 1967, p-113

৫০. রংগলাল সেন : পূর্বোক্ত; পৃ-৫৩
৫১. পূর্বোক্ত : পৃ- ৫৩
৫২. পূর্বোক্ত : পৃ- ৫৪
৫৩. দীনেশচন্দ্র সেন : পূর্বোক্ত; পৃ-৪২৮
৫৪. পূর্বোক্ত : পৃ- ৪২৮
৫৫. A.K. Nazrul Karim : Changing society in India, Pakistan and Bangladesh; Nowroze Kitabistan, Dacca, 1976, p-16
৫৬. P.N. Ojha : Aspects of Medieval Indian society and culture, R.B. publishing corporation,Delhi, 1978, p.181-182
৫৭. A.K Nazmul Karim : Ibid, p-17
৫৮. গীতা মুখোপাধ্যায় : পূর্বোক্ত; পৃ-১৬
৫৯. ভীষ্মদেব চৌধুরী : বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য; নবযুগ, ঢাকা,২০০৪, পৃ-১৯০
৬০. D.D. Kosambi : Culture and Civilization of Ancien: India in Historical Outline, Vikas publishing House Pvt. Ltd, New Delhi, 1981, p-50
৬১. নীহাররঞ্জন রায় : বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ-১৬০-১৬১
৬২. মোহাম্মদ হাননান : মনসামঙ্গল কাব্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ-২৩
৬৩. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ-৩৮
৬৪. ভীষ্মদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত; পৃ-১৭৮
৬৫. সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড), পূর্বোক্ত; পৃ-৪৩২
৬৬. Hameeda Khatun Naqvi : Urban Centres and Industries in Upper India (1556-1803), Asia Publishing House, Bombay, 1963, p-87
৬৭. বিনয় ঘোষ : বাদশাহী আমল (ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের 'ট্রাভেলস ইন দ্যা মুঘল এ্যাম্পয়ার' এর বঙ্গানুবাদ), অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ-১১২-১১৬
৬৮. পূর্বোক্ত : পৃ- ১১৭
৬৯. অরবিন্দ পোদ্দার : পূর্বোক্ত; পৃ-৯০
৭০. পূর্বোক্ত : পৃ- ৯১
৭১. ভীষ্মদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত; পৃ-১৯১

৭২. ভীষ্মদেব চৌধুরী : পূর্বোক্ত; পৃ-১৯০

৭৩. শিপ্রা সরকার : সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব; প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য; আজকাল প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭, পৃ-১০২

৭৪. অরবিন্দ পোদ্দার : পূর্বোক্ত; পৃ-৭৭

৭৫. আহমদ শরীফ : বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড); নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা,১৯৯৮,পৃ-১১

৭৬. আহমদ শরীফ : মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা, ঢাকা-১৯৭৭, পৃ-২৩

৭৭. গোপাল হালদার : বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ-১০

৭৮. বাসুদেব রায় : চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ, উৎস প্রকাশন, ঢাকা-২০০৫, পৃ-৯৫

৭৯. অতুল সুর : ভারতের বিবাহের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৮০,পৃ-২৮

৮০. পূর্বোক্ত : পৃ-২০

পঞ্চম অধ্যায়

ঘনরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট

পুরুষ দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার-প্রসার ঘটায় ‘ধর্মমঙ্গল কাব্য’ বাংলা সাহিত্যের মঙ্গলকাব্যের ধারায় এক ব্যতিক্রমী ও বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করেছে। কারণ এ ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহ্যের বিপরীতে অর্থাৎ নারী দেবতার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে পুরুষ ধর্মঠাকুরের অন্ত্যজ ডোম সম্প্রদায়ের নিকট পূজিত ও প্রতিষ্ঠা পাবার বিষয়টি ঐতিহাসিকভাবেই একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা। এ ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যের’ শাখাটি একান্তভাবেই বাংলার রাঢ় অঞ্চলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে। বাংলা সাহিত্যে মঙ্গল কাব্যের ধারায় এ ধর্মমঙ্গলের কাহিনী নানা কারণে বিশিষ্ট ও ব্যঞ্জনাদীপ্ত।

ড. আহমদ শরীফের বরাত দিয়ে বলা যায়–

প্রথমত; এখানে প্রতিষ্ঠিত তথা স্বীকৃত দেবতার মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। **দ্বিতীয়ত;** গ্রন্থি শিথিল বলে এ পাঁচালীতে সামাজের সর্বশ্রেণির ও সর্বস্তরের মানুষের কথা আছে।এখানে রাজসভার ও সরকারের রাজনীতি, কূটনীতি , ষড়যন্ত্র, যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা-আনুগত্য, খলতা-শঠতা, ধৈর্য-অধ্যবসায়, ভীরুতা-বীরত্ব, সংগ্রাম-সাধনা, হিংসা-প্রীতি এবং ভক্তি-ঔদ্ধত্যের প্রভৃতি গুণাগুণ বিশিষ্ট চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। **তৃতীয়ত;** এক বিশেষ কালের বিস্তৃত পটে জীবন-জীবিকা, সমাজ ও সংস্কৃতির একটি সামগ্রিক ও সামষ্টিক চিত্র বিধৃত হয়েছে ধর্মমঙ্গলে।[১]

এ জন্যেই ড.সুকুমার সেন- ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যকে’ রাঢ় অঞ্চলের ‘জাতীয় মহাকাব্য’[২] (National Epic) বলে অভিহিত কারেছেন। লোভে-ক্ষোভে, স্নেহে-অসূয়ায়, বীরত্বে-ভীরুতায়, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-যন্ত্রণায়, জয়ে-পরাজয়ে, ত্যাগে-তিতিক্ষায় এখানে মাটির মানুষ প্রায় স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। আর এ কারণেই সুকুমার সেন ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যের’ বীররস, বিশালতা ও চরিত্র বৈচিত্র্যের জন্য একে **‘একরকম এপিক কাব্য’**[৩] হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

এতকাল যাবত মঙ্গলকাব্যে দেখা গেছে– অনার্য ও নিম্নশ্রেণির মানুষের একান্ত দেব-দেবীর স্বীকৃতির লড়াই, আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগাম। ‘ধর্মমঙ্গলে’ এসে আর অধিকারের প্রশ্ন নয়, সরাসরি নিজেদের মতো করে, নিজেদের ভূমে স্বশ্রেণির সংস্কৃতির অধিকারকে সাধারণ মানুষ প্রতিষ্ঠা করেছে। উপর তলার মানুষকে অনুনয় করে আর ধরতে হয়নি, সংগ্রাম করে আদায় করতে হয়নি স্বীকৃতি। বরং উচ্চ শ্রেণির লোকেরা নিজেরাই এসেছে, এসে পাশাপাশি পুজো করেছে। ‘ধর্মমঙ্গলের’ সবচেয়ে বিদ্রোহাত্মক ঘটনাটি হলো- এখানে অনার্য নিম্নশ্রেণির মানুষ নিজেরাই পুরোহিত সেজে বসে আছে। উচ্চ শ্রেণির কেউ এসে এই অধিকার চর্চার স্পর্ধাকে চ্যালেঞ্জ করার সাহসও দেখায়নি। এমনকি নিম্নশ্রেণির মানুষকে বা তার দেবতাকে এসে ঘটা করে বলতেও হয়নি- ‘এই যে আমাদের দেবতার মূর্তি বা প্রতীক, একে তোমরা পূজার মাধ্যমে সমাজে স্বীকার করে নাও।’[৪]

এদিক থেকে ধর্মমঙ্গল কাব্যধারার সামাজিক তাৎপর্য ভিন্ন। কারণ এ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আরাধ্য দেবতা হলেন পুরুষ দেবতা ধর্মঠাকুর। তিনি শিব অথবা বুদ্ধ কিংবা অনার্য সমাজের কোন বিশেষ দেবতা– এ নিয়ে বিতর্কের কমতি নেই। তবে একটি বিষয়ে ধর্মঠাকুর সকল বিতর্ক-সন্দেহের উর্ধ্বে, তা হলো মঙ্গলকাব্যের সংশ্লিষ্ট দেবতাদের ছলে-বলে-কলে-কৌশলে পূজা আদায়ের ব্যাপারে যে উন্মুখ-অস্থির হতে দেখা যায়, তা তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আবার বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে ধর্মমঙ্গল প্রাচীনতম কিন্তু কাব্য নিদর্শনসমূহের দিক দিয়ে নবীনতম। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই মনসা ও চণ্ডী উভয় দেবীই অনার্য অস্পৃশ্য সমাজে স্বীকৃতি লাভ করে বৃহত্তর হিন্দু সমাজে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাচ্ছিলেন– এ কথা জোর দিয়েই বলা যায়। অথচ বৌদ্ধ যুগের

ধর্মঠাকুরের পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা ষষ্ঠদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। এ ধর্মঠাকুর সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি সর্বপ্রথম আকর্ষণ করেছিলেন পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। এ ধর্মঠাকুর সম্পর্কিত বিভিন্ন পণ্ডিত ও সমালোচকদের অভিমত নিম্নরূপ–

ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ধর্মঠাকুর হচ্ছেন প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ দেবতা এবং ধর্মঠাকুরের পূজা বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্মের শেষ পরিণতি।[৫]

খ. অতুল সুর

'দান পারমিতা'- পূর্ণকারী পুণ্যশ্লোকে শিবিরাজ বাংলার জনসমাজে 'ধর্মরাজ' নামে আখ্যাত হন এবং তার পূজাও প্রচলিত হয়। বর্তমান ধর্মরাজার পূজা তারই নিদর্শন। তবে এর সঙ্গে মিশে গেছে বৌদ্ধ ধর্মের অনেক উপাদান ও পূর্বকল্পের বোধিসত্ত্ব কশ্যপের প্রতীক হিসেবে কল্পিত।[৬]

গ. সুকুমার সেন

ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের বর্ণনার সঙ্গে ধর্মমঙ্গলের সৃষ্টি পত্তন কাহিনীর যোগাযোগ আছে। প্রাচীন মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এই ঋগ্বেদীয় সৃষ্টি পত্তন কাহিনীর ভাবই অনুবৃত্ত।[৭]

দীনেশচন্দ্র সেন

বৌদ্ধ ধর্ম্ম এদেশের নিম্নশ্রেণীর হাতে পড়িয়া যে বিকৃতভাব ধারণ করে ধর্ম্মমঙ্গল তাহার হিন্দু সংস্করণ। রামাই পণ্ডিতের পূজা পদ্ধতিতে বৌদ্ধভাবের যে স্পষ্ট পরিচয় আছে, পরবর্তী ধর্ম্ম কাব্যগুলিতে তাহা ক্রমেই তেত্রিশ কোটি হিন্দু দেবতার উঠন্ত প্রভাবের নিচে চাপা পড়িয়াছে। তথাপি স্বীকার্য্য যে, ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধ রাজা ও সাধুগণের মহিমা কীর্ত্তন করিতেই প্রথম রচিত হইয়াছিল।[৮]

নীচ জাতীয় লোকজনই সকল দেবতার আদি পূজক। মনসা দেবীর আদি পূজক- কৈবর্ত ও চণ্ডালরা, চণ্ডীদেবীর আদি পূজক- ব্যাধ সম্প্রদায় এবং ধর্ম ঠাকুরের আদি পূজক হিসেবে ডোমদের দেখা যায়। আঞ্চলিক কাব্যধারা ধর্মমঙ্গলের কাহিনী– মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের তুলোনায় স্বতন্ত্র। ধর্মমঙ্গল কাব্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বীরত্ব প্রভৃতি বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। যুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে অরবিন্দ পোদ্দারের বক্তব্য স্মরণীয়–

'ধর্মমঙ্গল কাব্যের' উৎসভূমি রাঢ় চিরকালই বীরের আবাসভূমি। এ অঞ্চলের অনার্য অধিবাসীরা অপার্থিব অলৌকিক শক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, মনস্কাম সিদ্ধির জন্য তারা চিরকালই নির্ভর করেছে আত্মশক্তির উপর। এই আত্মশক্তি বা পুরুষকারই দৈবের উপর জয়ী হয়েছে। ,,, ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যেও সেই প্রবাহেরই লীলা। সেই প্রেরণারই অভিব্যক্তি।'[৯]

অবশ্য এ যুদ্ধের প্রভাব ও বর্ণনা 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যেও রয়েছে। কিন্তু সেসব স্থানের যুদ্ধ অনেকটা ঘরোয়া পর্যায়ের কিংবা দেবতাদের অলৌকিক শক্তি প্রকাশের প্রেক্ষাপটে কল্পিত। পক্ষান্তরে 'ধর্মমঙ্গল কাব্যের' যুদ্ধ মূলত রাজনৈতিক কারণে সংঘটিত এবং অনেকটা দৈব প্রভাবমুক্ত। 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবতারা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেও 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' দেবতারা কখনোও প্রধান ভূমিকায় অবতীর্ণ হননি।[১০]

ধর্মপূজার ইতিহাস ও পরিচয়

দেবতা ধর্মঠাকুরের উদ্ভব ও ধর্মপূজার বিকাশ সম্পর্কে বিখ্যাত মঙ্গলকাব্য গবেষক আশুতোষ ভট্টাচার্য তারঁ 'বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে এর বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। ১৮৯৪ খ্রি. কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির এক সভায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রবন্ধ পাঠের মাধ্যমে সর্বপ্রথম ধর্মঠাকুরের বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি ধর্মঠাকুর বলতে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধদেবতাকেই ইঙ্গিত করেছেন। আর এ ধর্মঠাকুর বাংলার রাঢ় অঞ্চলেই পরিচিতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

প্রাচীনকালে পূর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি– এই সীমানাবেষ্টিত বিস্তৃত ভূ-ভাগ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। এ রাঢ় আবার উত্তর রাঢ় ও দক্ষিণ রাঢ় নামে বিভক্ত ছিল। এই রাঢ় ভূমির দক্ষিণে দণ্ডভুক্তি ও উত্তর-পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধন নামক অঞ্চল অবস্থিত ছিল। এই বিস্তৃত অঞ্চল বর্তমানে হুগলি, বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায় বিভক্ত হয়েছে। এক প্রবল অনার্যজাতি এই অঞ্চলে বসবাস করতো, এরা আদি অস্ত্রাল বা প্রোটো-অস্ট্রালয়েড জাতির এক বা একাধিক শাখাভুক্ত ছিল বলে মনে হয়। যদিও পরে এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রতি অনুরাগী-অনুসারী হয়েছিল, তথাপি খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত লিখিত বৌদ্ধ বা জৈন ধর্ম গ্রন্থের প্রামাণিক কোন নিদর্শন মেলে না।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে (৭৫০ খ্রি.) পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর পৌণ্ড্রবর্ধন হতে বৌদ্ধধর্ম ক্রমে রাঢ় অঞ্চলে গিয়ে প্রবেশ করে । যদিও রাঢ় অঞ্চল কোনদিনই পাল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়নি, তথাপি পাল রাজাগণ বার বার এ অঞ্চল আক্রমণ করে নিজেদের আধিপাত্য স্থাপন করতে প্রয়াস চালিয়েছেন। পাল রাজত্বের অবসানের সময়ে এ রাঢ় অঞ্চলেই সেন রাজাগণ এক স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে ক্রমে বাংলাদেশ অধিকার করেন। পাল রাজাদের সময় হতেই রাঢ় অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার আরম্ভ হলেও সেন আমলেই এ অঞ্চলের সঙ্গে বাঙলা ও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের যোগসূত্র নিবিড় হয়। এর পূর্ব থেকে ভারতীয় কেন্দ্রীয় আর্য সভ্যতার ধারা বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে এ রাঢ় অঞ্চলই আর্যতের সংস্কারের পরিপোষক ছিল। প্রাক আর্য এমনকি প্রাক দ্রাবিড় নামের এক প্রবল জাতি এ অঞ্চলে বসবাস করতো, তাদের ধর্ম ও আচারগত জীবনে বহুকাল পর্যন্ত বহিরাগত কোন প্রভাব কার্যকর হতে পারেনি। ধর্মপূজা মূলত এদের মধ্যেই উদ্ভূত হয়ে কালক্রমে বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রভাবের সম্মুখীন হয়।

ধর্মঠাকুর, ধর্মরাজঠাকুর বা ধর্ম নামক এক দেবতা এ রাঢ় অঞ্চলে সকল শ্রেনির অধিবাসীদের মধ্যে আজও মহা আড়ম্বরে পূজিত হয়ে আসছে। ধর্মদেবতার নামের উদ্ভব প্রসঙ্গে কয়েকজন পণ্ডিতের অভিমত স্মরণীয়–

ক. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ধর্ম শব্দের অর্থ - 'বুদ্ধ'। অমর কোষে বুদ্ধদেবের এক নাম '-ধর্মরাজ' বলে উল্লিখিত হয়েছে।[১১]

খ. শরৎচন্দ্র রায়

প্রাচীন হিন্দু সাহিত্যে- সূর্যের এক নাম ধর্ম।[১২]

গ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ধর্ম শব্দটি কুর্মবাচক প্রাচীন অস্ট্রিক শব্দের সংস্কৃত রূপ।[১৩]

ঘ. ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ধর্মঠাকুর বৈদিক দেবতা বরুণের আধুনিক সংস্করণ মাত্র।[১৪]

ঙ. ড. নীহাররঞ্জন রায়–'ধর্মঠাকুর ছিলেন মূলত ছিলেন প্রাক আর্য-আদিবাসী কোমের দেবতা; পরে বৈদিক ও পৌরাণিক দেশি ও বিদেশি নানা দেবতা তাহার সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া ধর্ম ঠাকুরের উদ্ভব হইয়াছে –(বাঙ্গালীর ইতিহাস-পৃ. ৫৮৫)।

ধর্মঠাকুর হিন্দু পৌরাণিক প্রভাবে আসার পর কুর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হন, মূলত এর সঙ্গে কুর্মের কোন সংস্রব ছিল না। আবার বরুণের উদ্দেশ্যে যে নরবলি দেয়া হতো ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে ছাগবলি– তা বর্তমানে নরবলির স্থান গ্রহণ করেছে। কিন্তু মতের বিরুদ্ধ যুক্তি হলো– ধর্মঠাকুরের পূজা যদি বৈদিক দেবতা বরুণেরই পূজা হবে, তবে তা কেবল রাঢ় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ কেন এবং মাত্র ডোম সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূজারী নিয়োগ হয় কেন? তবে ধর্মঠাকুর যিনিই হন না কেন, তার উদ্দেশ্য যে নরবলি দেয়া হতো এ বিষয়ে তেমন কোন সন্দেহ নেই। এ

দেবতার পূজারীগণের নিকট তাই তার পরিচয় এক নয়। বরং পূজারীগণ তাকে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব, কোথাও যম, আবার কোথাও সূর্য বলে ধ্যান করে থাকেন।

ধর্মঠাকুরের কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। বরং একখণ্ড পাথরকেই ধর্মনামে পূজা করা হতো। তবে পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মের প্রভাবে (বিষ্ণুর) এ পাথর কচ্ছপাকৃতি, সুগোল কিংবা ডিম্বাকৃতি রূপ লাভ করে। আবার কখনো চক্ষুরোগ থেকে আরোগ্য হতে সে প্রস্তরখণ্ডের গায়ে চাঁচ বা পিতলের পেরেক পরিয়ে দেয়া হয়। ধর্মঠাকুরের নির্দিষ্ট কোন রূপ বা আকার-অবয়ব স্বীকৃত না থাকায় তাকে শূন্যময় দেবতাও বলা হয়। তবে তিনি ভক্তের নিকট সাধারণত যাযাবর, সন্ন্যাসী ও ফকিরের ছদ্মবেশে হাজির হন।

পশুবলি ধর্মপূজার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গে এখনো ছাগ ও কবুতর বলি দেয়া হয়। সাদা রঙের অভাবে কালো রঙের ছাগ বলি দেয়া সিদ্ধ। মানভূম অঞ্চলে শূকর ও মুরগি বলি দেয়। আবার কোথাও সাদা রঙের পশু ও পাখি বলি দেবার রীতি প্রচলিত। সূর্য বৃষ্টির নিয়ামক (Regulator) জেনে গ্রীষ্মকালে স্বস্তি ও ফসল ফলাতে মানুষেরা পশুবলি দিয়ে ধর্মঠাকুরকে প্রসন্ন করে বৃষ্টি প্রার্থনা জানায়। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য নৃতাত্ত্বিক বলেছেন— In the primitive stage of agriculture, the power's suposed to be concerned in sending rain earth received the largest share of worship.[১৫] অভীষ্ট সিদ্ধ হলে দেবতাকে মাটির ঘোড়া উপহার দেবার প্রথা রয়েছে। সাধারণের বিশ্বাস– ধর্মঠাকুর সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ান এবং ডাকে সাড়া দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসেন।

ধর্মঠাকুরের পূজায় পুরোহিত সাধারণত ব্রাহ্মণগণ হন না, বরং ডোম সম্প্রদায়ের লোকেরাই নিয়োগপ্রাপ্ত হন। এ ডোম পূজারীদের উপাধি–পণ্ডিত, দেয়াসী বা দেবাংশী প্রভৃতি। যে গ্রামে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য সেখানেই মূলত বাৎসরিক পূজার সময় একজন ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিয়োগ দেয়া হয় সাময়িকভাবে। তবে এ ব্রাহ্মণরা তেমন প্রভাব বা কর্তৃত্ব দেয়াসীদের ওপর খাটাতে পারেন না। কারণ পূজা করা ব্যতীত দেবতার ওপর ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের আর কোন অধিকার থাকে না। বরং ডোম দেয়াসীগণই দেবতার সাংবাৎসরিক সেবক ও তত্ত্বাবধায়ক রূপেই কাজ সম্পন্ন করে থাকেন। পূজার সময় এরা তামার পৈতা, আংটি ও বালা ধারণ করেন।

বর্ধমানের ধর্মরাজ ঠাকুরের মন্দিরে তিনটি ডিম্বাকৃতির পাথর দেখা যায়। এ তিন পাথরের নাম যথাক্রমে- বাকুড়া য়ায়, বুড়া রায় ও কালা রায়। এ ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণত বাৎসরিক ও মানসিক- এ দুই ভাবে উদ্‌যাপন করা হয়। বারোয়ারি বাৎসরিক ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণত চৈত্র পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজা পদ্ধতিতে বিভিন্ন আচার পালন করা হয়। এর মধ্যে- পশুবলি, উপবাস, ঘরভরা, লুয়ের হাড়ি ধরা, হাড়ি বিসর্জন, কন্টকগুল্মের ওপর গড়াগড়ি, অঙ্গারের ওপর হাঁটা, লৌহশলাকা দ্বারা জিহ্বা ছিদ্র করা, চড়ক এবং নবখণ্ড সেবার অভিনয় অন্যতম। এসব পূজাচারের মাধ্যমে ভক্তবৃন্দ দেবতার কাছে বর প্রার্থণা করে থাকে।

ধর্মঠাকুরের বৈশিষ্ট্য

ধর্মঠাকুরের দশ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কারণে সূর্যদেবতার সঙ্গে তার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন—১. সূর্য তাঁর অনুগত ২.বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দান তাঁর কৃপা ৩. জলবর্ষণ তাঁর কাজ ৪. পাপীকে কুষ্ঠ রোগ দিয়ে শাস্তিদান তাঁর কাজ ৫. চক্ষুরোগ নিরাময় তাঁর কৃপা ৬. ধবল রূপ তাঁর প্রিয় ৭. ঘোড়া তাঁর বাহন ৮. বারো (মাস) তাঁর প্রিয় সংখ্যা ৯. চৈত্র ও আষাঢ়ের মধ্যবর্তী সময়ই তাঁর পূজার কাল ১০. তিনি শূন্যমূর্তি অর্থাৎ অদৃশ্য শ্বেত রশ্মিবাচক ও গোলাকার। উক্ত দশটি গুণই প্রাচীন সূর্যদেবতার লক্ষণ।[১৬] এ ধর্মঠাকুরের স্বরূপ ও পূজা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে

পীযূষ কান্তি মহাপাত্র 'ধর্মমঙ্গল কাব্যের' ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, লাউসেন যে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচার-প্রসারের জন্য মর্ত্যভূমে আগমন করেন, তার বহুপূর্ব থেকেই পৃথিবীতে ধর্মপূজার প্রচলন ছিল।

ধর্মঠাকুরই সৃষ্টির পরম কারণ। তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব হতে ভিন্ন । কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায়– ধর্মঠাকুরের রূপ পরিকল্পনায় এ তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব) এবং অন্যান্য অনেক বৈদিক দেবতা একাত্ম হয়ে গিয়েছে। ধর্মঠাকুরের যে মৌলিক রূপ, তাতে তিনি নিরাকার, নিরঞ্জন ও শূন্যমূর্তি। নিরাকার এ ধর্মঠাকুরের সঙ্গে অন্যান্য দেবতা একাত্ম হওয়ায় তাদের রূপ ও গুণ ধর্মঠাকুরের ওপর অনিবার্যভাবে আরোপিত হয়ে পড়েছে।

তাই দেখা যায়– ধর্মঠাকুরের সঙ্গে যমের যোগসূত্র আছে। যমকে মহাভারতে বলা হয়েছে ধর্মরাজ; ধর্মঠাকুরও যমরাজ। আবার, ধর্মঠাকুরের সঙ্গে বরুণের সম্পর্ক রয়েছে। দেবতাদের মধ্যে- যম ও বরুণকে রাজা বলা হয়েছে। ধর্মঠাকুর ধর্মরাজ; তার উপাধি 'রায়'। বরুণও বেদে অধিরাজ অর্থাৎ সম্রাট। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের বরাত দিয়ে **বলা যায়– বরুণের মতো ধর্মেরও ঘর।** এ দু দেবতাই ধৃতব্রত এবং তাঁদের ব্রত অলঙ্ঘ্য। বরুণের নামান্তর 'ধবল', ধর্মঠাকুর নিরঞ্জন। বরুণ মায়াবী, ধর্মঠাকুরও তদ্রূপ। ঘরভরা অথবা গৃহভরণ অনুষ্ঠান পুত্রেষ্টি যজ্ঞ বিশেষ। বরুণ যেমন পুত্র দান করেন। ধর্ম ঠাকুরর নিকট মানসিক (মানত) করলে তদ্রূপ পুত্রবর পাওয়া যায়।

বিষ্ণু ও কৃষ্ণের সঙ্গেও ধর্মঠাকুরের সম্পর্ক রয়েছে। ধর্মমঙ্গল কাহিনীতে ধর্মঠাকুর এবং বিষ্ণু ও কৃষ্ণের অনেক সময় অভিন্নতার উল্লেখ পাওয়া যায়। রঞ্জাবতী শালে ভর দিয়ে আত্মবিসর্জন দিলে ধর্মঠাকুর তাকে পুনরুজ্জীবিত করেন। সন্ন্যাসীরূপী ধর্মঠাকুরকে রঞ্জাবতী বলেন—

দেখি যদি চতুর্ভুজে তবে প্রভু পদাম্বুজে
মজে চিত্ত মেগে লব বর।
শুনি স্নেহে মায়াধারী হল ভক্ত মনোহরী
শঙ্খচক্রে গদা পদ্মধর ॥

পশ্চিম উদয় পালায় লাউসেন ধর্মঠাকুরকে বলেছেন-

বৈকুণ্ঠ নিবাসী বিষ্ণু চতুর্ভুজ দেহে।
দেখা দিলে দীনবন্ধু ভকতের স্নেহে ॥

রামচন্দ্রের সঙ্গেও ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য দেখা যায়। রামচন্দ্র ধর্মঠাকুরেরই অবতার। ধর্মমঙ্গলে উলুক এবং হনুমান অভিন্ন। ধর্মঠাকুর লাউসেনকে উদ্ধার করতে হনুমানকে আদেশ দিয়ে বলেছেন—

তোমা বই বিপদে বান্ধব নাই আন।
রাম অবতারে তার পেয়েছি প্রমাণ ॥

মহাদেবের সঙ্গেও ধর্মঠাকুরের সাদৃশ্য মেলে। ধর্মের গাজনের নামান্তর দেউলপূজা বা দেহারা পূজা। কোথাও কোথাও শিবের চড়ক অনুষ্ঠানে দোল বা দেহারা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মের গাজন অনুষ্ঠান এবং শিবের গাজন অনুষ্ঠানের মধ্যে মিল আছে।

ধর্মঠাকুর সূর্যদেবতার সঙ্গে অভিন্ন এবং কুর্মের সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। ধর্মঠাকুর পক্ষিবাহন এবং ধবল অশ্বযুক্ত রথারূঢ়। কুর্ম সূর্য দেবতার প্রতীক এবং পাদপীঠ। তিনি উজ্জ্বল, নিষ্কলঙ্ক ও শুভ্রবর্ণ। প্রতীক শ্বেত বর্ণ। তিনি রুষ্ট

হলে ধবল রোগ হয়। আবার তাকে আরাধনা করলে ধবল রোগ থেকে আরোগ্য মেলে। ধর্মপূজায় শ্বেত ছাগ বলি দিতে হয়। শ্বেতবর্ণ চূর্ণ দিয়ে অনেক সময় ধর্মশিলা আবৃত থাকে।

ধর্মঠাকুরের মূল পরিকল্পনা এই যে, তিনি বিশ্ববীজ, বিশ্বের কারণ এবং সৃষ্টির পূর্বেকার এক চেতনাময় সত্তা। তিনি নির্বিকার, শূন্যময়, নির্গুণ, অনাদি-অনন্ত এবং অসীম চেতনাময় সত্তা– কোন বিশেষ গুণ বা বস্তুর দ্বারা আবদ্ধ বা সীমিত নন। তার তিনটি গুণ– সত্ত্ব, রজ ও তমগুণের বিকাশ; তিন দেবতা- ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব। যখন তিনি গুণের দ্বারা সীমিত হয়ে পড়লেন, তখন তিনি পৃথক সত্তায় আবির্ভূত হন। পরবর্তী যাবতীয় সৃষ্টি সকলই হয়েছে তার লীলার প্রকাশ মাত্র। আলোকের দেবতা সূর্য, বৃষ্টির দেবতা বরুণ এবং মৃত্যুর দেবতা যম প্রমুখ দেবতাই তার সীমিত গুণের প্রকাশ। এই সীমিত গুণের জন্য তিনি সেই গুণময় সত্তা হতে পৃথক, আবার তারই গুণের প্রকাশ বলে তিনি সে গুণময় সত্তা হতে অভিন্ন।

ধর্মঠাকুরের যে রূপ ধর্মমঙ্গল কাব্য এবং ধর্মপূজার পুথিতে পাওয়া যায়, সে রূপ পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির দেবতা-পরিমণ্ডলের ঐতিহ্যের সঙ্গে বহিরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার মিশে গিয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে ভারতীয় ও ইরানীয় সূর্য পূজার ধারা এবং পলেনেশীয় আদি দেবতায় বিশ্বাস ধর্মঠাকুরের পরিকল্পনায় সংহত হয়েছে। এই অধ্যাত্ম অুষ্ঠানের সঙ্গে অবৈদিক ও লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা মিশ্রিত হয়েছে। বাংলাদেশে গুপ্তযুগেই (আনু.৩২০-৬০০খ্রি.) ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এর পূর্ব থেকেই বাংলাদেশে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। অনাবৃষ্টিতে বৃষ্টিদানের ক্ষমতা, রোগ নিরাময়ের ক্ষমতা, বন্ধ্যা নারীকে সন্তান দানের ক্ষমতা, কৃষিকার্যে সহায়তা করা ক্ষমতা-এসব বিশ্বাস ও সংস্কার আদিম কৌম সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কারের ঐতিহ্যবাহী। বিভিন্ন বিশ্বাস ও বিচিত্র সংস্কার এক ক্রমিক মানস বিবর্তনের ধারায় অভিব্যক্ত হয়ে সংহত সংস্কৃতিতে রূপ লাভ করেছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা

ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রচার–প্রসারের কতিপয় ঐতিহাসিক কারণ বিদ্যমান ছিল। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে, যে সময়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলো রচিত হতে আরম্ভ করে, সে সময় রাঢ় বাংলার ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, তা ছিল অশান্ত অরাজকতার যুগ। ষোড়শ শতাব্দীতে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপ রুদ্রের সঙ্গে বাংলার সুলতান হুসেন শাহের (১৪৯৩–১৫১৯ খি.) যুদ্ধ হতে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর বর্গী আক্রমণ পর্যন্ত রাঢ় দেশ নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহের ভেতর দিয়েই অতিবাহিত করে। এতে করে দেশের শান্তি–সুখ–শৃঙ্খলা প্রায় লোপ পাবার উপক্রম হয়েছিল। তখন স্বভাবতই দেশের লোকজন লাউসেনের মতো বীরের যুদ্ধ বৃত্তান্ত শুনতে আগ্রহী হয়ে ওঠেছিল। এ সকল কারণেও এ বিশেষ লৌকিক দেবতাটির নাম রাঢ়ের তিন-চারটি জেলার মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে। জাতীয় কাব্যরস পিপাসার নিবৃত্তিই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, ধর্মঠাকুরের নাম ছিল উপলক্ষ মাত্র।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ঐতিহাসিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে তা কবির কল্পনায় কিছুটা পল্লবিত হয়েছে মাত্র। একই ভূখণ্ডে এর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটায় কাহিনীগত ঐক্য মোটামুটি সর্বত্রই রক্ষা পেয়েছে। এবার এ কাব্যের চরিত্রগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণে আসা যাক।

ধর্মমঙ্গলের কাহিনীতে উল্লিখিত আছে যে, পাল রাজা ধর্মপালের (৭৭০-৮১০খ্রি.) পুত্র দেব পাল (৮১০-৮৫০খ্রি.) যখন গৌড়ের অধিপতি, তখনকার সামন্ত রাজ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ বিদ্রোহী হয়। কিন্তু কোন ধর্মমঙ্গল কাব্যেই রাজা ধর্মপালের পুত্র দেব পালের উল্লেখ নেই। ঘনরাম চক্রবর্তী লিখেছেন-

‘ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর।
প্রসঙ্গে প্রসবে পুণ্য পাপ যায় দূর ॥

পৃথিবী পালিয়ে স্বর্গ ভুঞ্জে নৃপবর।
বীর্যবন্ত পুত্র তার গৌড়ের ঈশ্বর ॥’

প্রায় প্রত্যেক ধর্মমঙ্গল কাব্যেই বর্ণিত একটি ঘটনা হতে জানতে পারা যায় যে, ধর্মপালের পুত্র এ গৌড়েশ্বর সিন্ধু বা সমুদ্রের ঔরসে রানী বল্লভার গর্ভজাত জারজ সন্তান— এ কাহিনী যে পালরাজদের উৎপত্তিমূলক কিংবদন্তি হতে জাত— এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সন্ধ্যাকর নন্দীর ‘রাম চরিত’ গ্রন্থে ধর্মপালকে ‘সমুদ্র-কুল-দ্বীপ’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। রামদাস আদকের ধর্মমঙ্গলে- ধর্মপালের রাণী বল্লভাকে মান্ধাতা বংশের কন্যা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং দেখা যায়-ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি পালরাজগণ সম্পর্কিত জনশ্রুতিসমূহ অবলম্বন করেই রচিত হয়েছে। এ সকল জনশ্রুতি বহুলাংশেই ঐতিহাসিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয়।

ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায়-ধর্মপালের পুত্র ‘দ্বিতীয় ধর্মপাল’ বলে কোন পুত্র ছিল না বরং দেবপালই ছিলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র যিনি ৮১০ খ্রি. থেকে ৮৫০খ্রি. পর্যন্ত গৌড়ে প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করেন। তিনি তাঁর খুল্লতাত জয়পালের সাহায্যে উৎকল বা কলিঙ্গ ও কামরূপ জয় করেন। পালরাজাদের ভাগলপুর তাম্রশাসনে উল্লেখ আছে যে, দেবপালের সেনাপতি জয়পাল উৎকলের রাজাকে বিতাড়িত করেন এবং প্রাগজ্যোতিষের রাজাকেও পরাজিত করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিতে গৌড়েশ্বরের একজন সামন্ত রাজপুত্র কর্তৃক এ দুটি উল্লেখযোগ্য যুদ্ধ অভিযানের কথাই বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয। এ জয়পালই সম্ভবত ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লবসেন বা লাউসেন (Lausena)-র নামভেদ মাত্র। এখানে লাউসেন কর্তৃক কলিঙ্গ ও কামরূপ বিজয়ের দুটি স্বতন্ত্র কাহিনী একত্রে মিশে গেছে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ‘রামচরিত’ গ্রন্থের সম্পাদনায় এর ভূমিকা অংশে ধর্মমঙ্গল কাব্যের ধর্মপালের পুত্র গৌড়েশ্বরকে দেবপাল বলেই স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, লাউসেন ও ইছাই ঘোষ দেবপালের দুই জন সামন্ত রাজা ছিলেন। ইতিহাসে দেবপালের সঙ্গে কামরূপ ও কলিঙ্গ রাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলোতেও তদ্রূপ কাহিনীর সমাবেশ হতে অনেকে এ মতকেই যুক্তিযুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন।

তবে তাম্রশাসন ও কাব্যের নামের কিছুটা তারতম্য দেখা যায়। যেমন তাম্রশাসনে পাওয়া যায়-ঈশ্বর ঘোষ পিতার নাম ধবল ঘোষ ও নিবাসস্থল ঢেক্করী। এখানে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, এ ঈশ্বর ঘোষই মূলত ইছাই ঘোষ, ধবল ঘোষ ছিলেন সোম ঘোষ এবং ঢেক্করী মূলত হবে ঢেকুর। এখানে বানান বিভ্রাট বা বিকৃতির সম্ভাবনাই বেশি অথবা মানুষের একাধিক নামের জটিলতাও থাকা অসম্ভব কিছু না।

অন্যদিকে প্রখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক অতুল সুর তাঁর ‘বাঙালা ও বাঙালীর বিবর্তন’ গ্রন্থে বলেছেন– মৌর্য শাসনামলে যেমন রাঢ়দেশে বাগদি সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, তেমনি পাল রাজত্বের সময় কৈবর্ত জাতির শক্তির প্রবল উত্থান ঘটে। পাল রাজাদের এক সামন্তরাজ দিব্যোক বিদ্রোহ করে প্রভু দ্বিতীয় মহীপালকে (১০৭০/১০৭১ খ্রি.) নিহত করে বরেন্দ্রভূমি অধিকার করে নেন। দিব্যোকের উত্তরাধিকারী হিসেবে রুদ্যোক ও ভীম বরেন্দ্র দেশ শাসন করেন।

কৈবর্ত সম্প্রদায়ের পাশাপাশি এ সময় রাঢ় বঙ্গে আর একটি শ্রেণি শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারা হলো-সদগোপজাতি। গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবস্থান ছিল। মনে হয়, দক্ষিণ রাঢ়ে যেমন কৈবর্তদের তেমনি উত্তর রাঢ়ে সদগোপদের প্রাধান্য ছিল। এরা ছিলেন শিব ও শক্তির উপাসক। সদগোপদের বিভিন্ন শাখা বালকী, অমরাগড়, কাঁকশা দিনগর, ঢেক্করী, মঙ্গলকোট ও নীলপুর প্রভৃতি স্থানে বহু সদগোপ রাজ্য স্থাপন করেছিল। পাল রাজাদের আধিপাত্যের সময় তারা পালরাজাদের সামন্ত রাজা হিসেব রাজত্ব করতো। এই সকল সদগোপ রাজাদের অন্যতম ছিলেন ঈশ্বর বা ইছাই ঘোষ। একাদশ খ্রি. তার আবির্ভাব

ঘটেছিল পালরাজা মহীপালের (৯৭৭-১০২৭খ্রি.) সমকালে। রামগঞ্জের তাম্রশাসন হতে ইছাই ঘোষের যে বংশ তালিকা মেলে, তাতে দেখা যায়–মহামাণ্ডলিক ইছাই (ঈশ্বর) ঘোষের পিতা ধবল (সোম) ঘোষ, পিতামহ বল ঘোষ এবং প্রপিতামহ ছিলেন ধূর্তঘোষ। এ থেকে মনে হয়, ধূর্তঘোষ খুব সম্ভবত রাজ্যপাল বা দ্বিতীয় গোপালের সমসাময়িক ছিলেন। অমরগড়ের ইছাই ঘোষের সমসাময়িক সদগোপ রাজা ছিলেন হরিশ্চন্দ্র। ইছাই ঘোষ ছিলেন ধর্মঠাকুরের উপাসক আর হরিশ্চন্দ্র ছিলেন ভবানীর উপাসক। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় এর বিপরীত। অর্থাৎ ইছাই ঘোষই ভবানী উপাসক আর রাজা হরিশ্চন্দ্রই ধর্মঠাকুর ভক্ত। এছাড়া ইছাই ঘোষকে মহীপালের (৯৭৭-১০২৭ খ্রি.) সমসাময়িক ধরলে রাজা দেবপালের (৮১০-৮৫০ খ্রি.) সঙ্গে প্রায় দেড়শত বছরের ব্যবধান দেখা যায়। এক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অভিমতই যুক্তিযুক্ত মনে হয়।

আশুতোষ ভট্টাচার্য ধর্মমঙ্গল কাব্যের নায়ক লাউসেনকেও ঐতিহাসিক চরিত্র বলে সায় দিয়েছেন। কারণ লাউসেন গৌড়ের এক সামন্ত রাজা কর্ণসেনের পুত্র। এখনো রাঢ় বাংলায় ধর্মদেবতার কাছে মানসিক করে কোন পুত্র লাভ করলে তার নাম রাখা হয়—লুইধর বা লাউসেন। আবার ধর্মমঙ্গল কাব্য ছাড়াও বাংলা পঞ্জিকায় কলিকালের রাজ চক্রবর্তীদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরদের সঙ্গে লাউসেনের নামও পাওয়া যায়। এ সকল দিক বিবেচনায় নিয়ে বলা যায়—লাউসেন নিতান্তই অনৈতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন না।

অনেকের মতে রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐতিহাসিক ব্যক্তি। নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে, হরিশ্চন্দ্র ঢাকা জেলার সাভার অঞ্চলের রাজা ছিলেন। তার দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে ত্রিপুরার রাজা গোপীচন্দ্র বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু নানাবিধ কারণে এ মত গ্রহণ করা যায় না।

আবার যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে, হরিশ্চন্দ্র বর্ধমান জেলার অন্তর্ভুক্ত অমরার রাজা ছিলেন। তিনি একাদশ খ্রিষ্টাব্দের শেষপাদে বর্তমান ছিলেন। এ অমরা দামোদরের উত্তরে এবং বর্ধমানের দিকেই হবে। কিন্তু এ অমরার গড়কে আবার স্থানীয়রা মহেন্দ্রের গড়ও বলে থাকে। মহেন্দ্রের পাটরানী অমরাবতীর নামেই নাকি এর নাম অমরা বা অমরাগড়। এ অমরা রাজবংশের আদি পুরুষ রাঘব সিংহ ১০৩৫ খ্রি. রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু এ রাজবংশের তালিকায় কোথাও রাজা হরিশ্চন্দ্রের নাম খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাই মনে হয় প্রাচীনতম ধর্মসাহিত্যের নায়ক ছিলেন কোন এক পৌরাণিক রাজা হরিশ্চন্দ্র। সম্ভবত ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্টই লাউসেনের কাহিনী সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন। হরিশ্চন্দ্রের পরে অর্থাৎ ধর্মসাহিত্যের উদ্ভবেরও কিছু কাল পরে লাউসেনের আবির্ভাব ঘটে। লাউসেনের পিতার নাম কর্ণসেন। তিনি গৌড়েশ্বরের অধীন ত্রিষষ্ঠীর গড় বা ঢেকুরের সামন্ত রাজা ছিলেন। বর্ধমান জেলার পশ্চিম সীমান্তে সেন পাহাড়ী পরগনায় বর্তমান গৌরাণ্ডি গ্রামের নিকট কর্ণগড় নামক স্থানটি প্রাচীন মানচিত্রে দেখা যায়। অনেকের ধারণা- এ কর্ণগড়েই কর্ণসেন বাস করতেন। অতঃপর তিনি ইছাই ঘোষ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণে ময়নাগড়ে চলে যান এবং এখানেই তার মৃত্যুর পর পুত্র লাউসেন গৌড়েশ্বরের অধীনস্থ সামন্ত রাজা হন।

ইতিহাসে পাওয়া যায়, দেবপাল(৮১০-৮৫০ খ্রি.)উৎকল বা কলিঙ্গও প্রাগ্‌জ্যোতিষ বা কামরূপ জয় করেছিলেন। বর্তমান মেদিনীপুরের দক্ষিন-পশ্চিম অংশ প্রাচীন উৎকলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবত দেবপাল লাউসেনকে তার এ বিজিত রাজ্যের সামন্ত রাজা নিযুক্ত করেছিলেন। ময়নাগড় ছিল লাউসেনের রাজধানী। এ ময়নামতী বা ‘ময়নাগড়’ সম্পর্কে ড. অতুল সুর তাঁর ‘বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন’ গ্রন্থে বলেছেন- ত্রিপুরার ধার্মিক রাজা মানিকচন্দ্রের রানী ছিলেন ময়নামতী। রাজার দুরাত্মা দেওয়ানের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ প্রজারা মানিকচন্দ্রের মৃত্যু কামনা করে ধর্মঠাকুরের পূজা করে। এতে রাজার মৃত্যু ঘটে। যমদূতেরা তার প্রাণ নিয়ে যমপুরী রওনা দিলে রানী ময়নামতী স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পশ্চাৎধাবন করলে সবাই বিচলিত হয়ে পড়ে। অবশেষে গুরু

গোরক্ষনাথের মধ্যস্থতায় পুত্রবরের মাধ্যমে ময়নামতীকে শান্ত করা হয়। সহমরণে গিয়েও রানীর দেহ দাহ হল না, বরং তিনি গোপীচন্দ্র নামে পুত্র লাভ করেন। বড় হয়ে রাজা গোপীচন্দ্র হরিশচন্দ্র রাজার জ্যেষ্ঠা কন্যা অদুনাকে বিয়ে করেন এবং অনুজা পদুনাকে অর্থাৎ শ্যালিকাকে যৌতুক হিসেবে লাভ করেন।

ময়নামতী দিব্যজ্ঞানে জানতে পারলেন যে, হাড়ি সিদ্ধার শিষ্য হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ না করলে ১৮ বছর বয়সে গোপীচন্দ্রের মৃত্যু হবে। গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণে প্রথমে অস্বীকার করলেন এবং রানীরাও বাধা দিলেন। পরে অবশ্য গোপীচন্দ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং ১২ বছর পর স্বগৃহে ফিরে এসে সুখে কালাতিপাত করেন। এ সতীসাধ্বী রানী ময়নামতীর নামানুসারেই এ গড়ের নামকরণ করা হয় ময়নামতী। এ ময়নামতী বা ময়নাগড়ের অবস্থান নিয়েও জটিলতা রয়েছে। কারণ- ত্রিপুরা, মেদিনীপুর, বাকুড়া জেলায় এর অবস্থান বলে অনেকে মতামত ব্যক্ত করেছেন। ঘনরাম চক্রবর্তী মেদিনীপুর এবং বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বাকুড়া জেলার প্রতি অভিমত পেশ করেছেন। তবে সঠিক সিদ্ধান্তে কেউ পৌছাতে পারেননি।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচনাকালীন পটভূমি

মঙ্গলকাব্যের সাধারণ পরিস্থিতি নানা দিক থেকেই অরাজক ও জীবনের পরিপন্থী। এই অরাজক পরিস্থিতির স্বাক্ষর ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যেও বর্তমান। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অনেক কবি ব্যক্তিগত জীবনের অশেষ দুঃখ-যন্ত্রণায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে গৃহত্যাগী হয়েছিলেন; কিন্তু তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও দেশের সাধারণ অবস্থার পরিচয় তাঁদের কাব্যে রয়েছে। ,,, এই পরিবেশকেই সে কালের মানুষ জয় করতে চেয়েছিল, আর সে জন্যেই ধর্মঠাকুরের পূজা ও তপস্যা। অর্থাৎ জীবনে যত কিছু দুঃখ-বঞ্চনা, না পাওয়ার বেদনা, তা দূর করে পূর্ণতায় আপ্লুত হতে হলে যে শক্তি-সামর্থ্যের ও গুণের প্রয়োজন, সেকালের মানুষ সেই সমস্ত গুণ ধর্মঠাকুরের মধ্যে আরোপ করে তাঁর আরাধনা করেছে। ,,, সব কিছুকে পরিপূর্ণভাবে পাওয়া একমাত্র ধর্মঠাকুরের প্রীতি উৎপাদনেই সম্ভব; কেননা ভক্তের দৃষ্টিতে তিনি শুধু আদি বেদতা নন, তিনি সব কিছুর মূলে, তারই ইচ্ছায় সমস্ত ঘটনা-দুর্ঘটনা, কল্যাণ-অকল্যাণ সাধিত হয়।[১৭]

সমকালীন বাংলার আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের যে চিত্র কাব্য সাহিত্যে পাওয়া যায়, তাতে করে প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় বা অনুমান করতে জট-ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ- 'কাব্যে সুখের বা দুঃখের বর্ণনাকে নির্বিচারে সম-সাময়িক ইতিহাস বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় না। কারণ কবির সুখের বর্ণনা যেমন কল্পিত, দুঃখের বর্ণনাও তেমনি কল্পিত। ,,, সদুক্তি কর্ণামৃতে দারিদ্র্যের এবং সামাজিক অত্যাচারের যে চিত্র আছে, তাহাতে দুঃখ থাকিলেও দুঃখের বিলাসই অধিক। কবি দারিদ্র্যের চিত্র আঁকিতে গিয়া তাঁহার কবি কুশলতা দেখাইয়াছেন। তবে বাস্তব রস প্রধান কাব্যে সম-সাময়িক সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থার কিছুটা প্রতিফলন কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেমনটা ধরা পড়েছে ঘনরাম চক্রবর্তীর- ধর্মমঙ্গলে, রামাই পণ্ডিতের- শূণ্যপুরাণে ও সহদেব চক্রবর্তীর- নিরঞ্জনের রুস্মা বা উস্মা নামক গ্রন্থে আসিয়া যায়।'[১৮]

ঘনরাম চক্রবর্তী যখন তাঁর 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' রচনা (১৭১১খ্রি.) করেন, তখন মুর্শিদকুলী খান (১৭০৪-১৭২৭খ্রি.) বাংলার দেওয়ান। তাঁর পূর্বে শায়েস্তা খানের (১৬৬৪-১৬৭৮ ও ১৬৭৯-১৬৮৮খ্রি.) প্রায় ২৫ বছরের শাসনামলে বাংলা সম্পদের প্রাচুর্যে, অর্থ-বিত্ত-বৈভবে কিংবদন্তির স্তরে পৌছায়। এ শায়েস্তা খানের আমলেই এক টাকায় ৮ মণ চাল পাওয়া যেতো। শায়েস্তা খান তাঁর সুদক্ষ নেতৃত্বে পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি, মগ জলদস্যু, হার্মাদ ও ইংরেজ বণিকদের বিতাড়িত ও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তবে শায়েস্তা খানের আমলের এ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কিছু অংশ অবশ্য ভোগ বিলাসিতায় ব্যয় হয়েছিল। তারপরও মোটের ওপর বাংলার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা ভালোই ছিল বলা যায়।

এরকম রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় মুশির্দকুলী খান (১৭০৪-১৭২৭খ্রি.) বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ১৭০৪ খ্রি. এ বৃহৎ বাংলার দেওয়ান হিসেবে নিযুক্ত হয়েই রাজস্ব সংস্কারে নজর দেন এবং বেশ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হন। তাঁর এ দক্ষতার প্রমাণ বহন করে ১৭১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিল্লীর রাজকোষাগারে বার্ষিক ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বাংলার রাজস্ব হিসেবে প্রেরণের মধ্য দিয়ে। এছাড়া সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) শাসনামলের শেষ দিকে যুদ্ধ ব্যয় হিসেবে বৃহৎ অঙ্কের টাকা তিনি বাংলা থেকে সরবরাহ করে অশীতিপর সম্রাটের প্রিয়পাত্রে পরিণত হতে পেরেছিলেন এবং সম্রাটকেও কিছুটা স্বস্তি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে ১৭০৭ খ্রি. সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং দিলীর কেন্দ্রীয় রাজশক্তির দুর্বলতার সুযোগ মুশির্দকুলী খান ১৭১৭ খ্রি. বাংলায় স্বাধীন নবাবী আমলের (১৭০৭-১৭৫৭খ্রি.) সূচনা করেন। বাংলার নবাবী আমলে মুশির্দকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭খ্রি.) সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯খ্রি.) সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০খ্রি.) আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬খ্রি.) ও সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭খ্রি.) পর্যন্ত ছিলেন স্বাধীন নবাব। এর পরবর্তীকালে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭খ্রি.) পরবর্তীকালের নবাবগণ ছিলেন পরাধীন ও ইংরেজ বণিকদের আজ্ঞাবহ মাত্র। এরা হলেন- মীর জাফর আলী খান (১৭৫৭-১৭৬০ ও ১৭৬৩-১৭৬৫খ্রি.) মীর কাসিম (১৭৬০-১৭৬৩খ্রি.) নাজিমউদ্দৌলা (১৭৬৫-১৭৬৬খ্রি.) ও সইফুদ্দৌলা (১৭৬৬-১৭৭০খ্রি.) প্রমুখ।

এসব নবাবদের মধ্যে মুশির্দকুলী খান ও আলীবর্দী খান বিষেশভাবে ছিলেন যোগ্য ও সুদক্ষ শাসক। নবাব মুশির্দকুলী খান তাঁর ১০ বছরের (১৭১৭-১৭২৭খ্রি.) নবাবী আমলে বৃহৎ বাংলার ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থায় জরিপ করে আমূল সংস্কার করেন। এ সংস্কারের পদক্ষেপ হিসেবে- ভূমি জরিপ, জায়গীরদারীর পরিবর্তে ইজারাদারী প্রথা চালু, সরকারি আয় নিশ্চিতকরণ, কৃষকদের তাকভী ঋণ বিতরণ, নানকর প্রবর্তন, প্রশাসনিক ব্যয় সংকোচন, বাণিজ্যে উৎসাহ দান এবং রাজস্ব সংগ্রাহক হিসেবে হিন্দুদেরকে অধিক সংখ্যায় ইজারাদার পদে নিয়োগ দান করেন। তখন বাংলা ছিল ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০ মহাল বা পরগণায় বিভক্ত এবং বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৩১,১৫,৭০৭ টাকা।

রাজস্বের এ নীতি মুশির্দকুলী থেকে আলীবর্দী পর্যন্ত রাজ্যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখে। এর সত্যতা স্বীকার করে স্যার যদুনাথ সরকার বলেন — 'For over half a century Murshid Quli and Alivardi Khan between them maintained peace, increased the wealth and trade of the century.'[১৯]

কিন্তু দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বৃহৎ বঙ্গ' গ্রন্থে মুশির্দকুলী খান সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করে বলেছেন- 'মুরসিদ কুলি খাঁ হিন্দুদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়া রাজভাণ্ডার বৃদ্ধি করিয়া ছিলেন, এজন্য রাজসভায় তাঁহার এত প্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি হিন্দুদের প্রতি এরূপ ব্যবহার করিতে পারিতেন বলিয়াই বোধ হয় আওরঙ্গজেবে তিনি এত প্রিয় হইয়াছিলেন। তাঁহার শাসন যে খুব কড়া ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; যেহেতু তাঁহার নিয়ম লঙ্ঘন করিবার দরুণ তিনি স্বীয় পুত্রকে হত্যা করিয়াছিলেন।'[২০]

দীনেশচন্দ্রের এ বক্তব্য পুরোপুরি সত্য ও নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ মুশির্দকুলী খানের কৃষক প্রজার কাছে একমাত্র চাহিদা ছিল নির্দিষ্ট রাজস্ব। যদিও ইজাদারগণ কোথাও কোথাও কিছুটা জুলুম অত্যাচারের ঘটনা ঘটিয়েছেন, তা সার্বিক অবস্থা নয়, বরং বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র। বিশৃঙ্খলা ও জুলুম ঘটার কোন সুযোগ ছিল না, যার স্বীকৃতি দীনেশ চন্দ্রের বক্তব্যেই ধরা পড়েছে- কারণ তিনি নিজ পুত্রকেও অন্যায়-অপরাধের জন্য ক্ষমা করেননি। তাঁর সুশাসন প্রসঙ্গে স্যার যদুনাথ সরকার বলেছেন- 'Thus under his rule as well as Alivardis

(1716-1756AD) the Bengal people gained a breathing time and a chance of prosperity.'[২১]

তবে মুর্শির্দকুলী খান প্রবর্তিত এ রাজস্ব ব্যবস্থা পরবর্তীকালে বাংলার জন্য বিপদ ডেকে আনে। কারণ যোগ্য নবাবদের সুশাসনের অভাবে হিন্দু ইজাদারগণ শক্তিশালী জমিদারে পরিণত হন এবং এজেন্টদের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করতে গিয়ে প্রজার ওপর জুলুম-অত্যাচার শুরু করে ও বিলাস-ভোগে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এরাই পরবর্তীকালে ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে মুসলিমদের হাত থেকে রাজক্ষমতা ইংরেজদের হাতে সমর্পণ করে দেয়। আর ইংরেজ বণিক শাসকগণ মুর্শির্দকুলী প্রবর্তিত এ রাজস্ব ব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে ধরে ১৭৯৩খ্রি. বাংলার অভিশপ্ত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ব্যবস্থা (Permanent Settlement System) প্রবর্তন করে।

এভাবে বাংলায় সাড়ে পাঁচশত বছরের (১২০৪-১৭৫৭খ্রি.) মুসলিম শাসন-শোষণ এবং ইংরেজ বণিকদের একশত বছরের (১৭৫৭-১৮৫৭খ্রি.) দুঃশাসনকে এদেশের হিন্দু সম্প্রদায় পাপের ফল ও ললাট লিখন বা নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিল। এ যবনরূপী শাসকই ছিলেন ধর্ম ঠাকুর- এমন বদ্ধমূল বিশ্বাস হিন্দুদের ছিল মজ্জাগত। 'নিরঞ্জনের উষ্মা বা রুষ্মা' ও 'জালালি কলিমা' গ্রন্থের ভূমিকা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সুকুমার সেন বলেছেন —

'প্রথম অংশে পাই প্রজার পাপের ফলে ধর্মঠাকুরের যবন বেশ ধরিয়া ও হিন্দুর উপর অত্যাচারের কথা। শাসকের পীড়নকে ঈশ্বরের বিধান বলিয়া মানিয়া লওয়া অদৃষ্টবাদী আমাদের ধর্ম বুদ্ধিতে মোটেই অনপেক্ষিত নয়। একদা যে মনোবৃত্তি জাগ্রত হইয়া 'যবন রূপী' - ধর্মঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিল, সেই মনোবৃত্তিই কয়েকশত বৎসর পরে ইংরেজ রাজত্বকে বিধির বিধান ভাবিয়া মানিয়া লইয়াছিল।'[২২]

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কবি পরিচিতি

সপ্তদশ শতাব্দীর তুলোনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ পর্যন্ত ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় আগ্রহ অনেক বেশি দেখা গিয়েছিল। এ ধর্মমঙ্গল কাব্যের আদি কবি বা রচয়িতা হিসেবে ময়ূর ভট্টকেই ইতিহাস সাব্যস্ত করে। রাঢ় বাংলার অনেক কবিই নামে-বেনামে এ কাব্য রচনা করেছেন। এসব কবিদের নাম কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, আর কত কালের গর্ভে হারিয়ে গিয়েছে। উদ্ধারকৃত বা টিকে থাকা কবিগণ হলেন — ১. ময়ূরভট্ট, ২. খেলারাম চক্রবর্তী, ৩. রূপরাম চক্রবর্তী, ৪. রামদাস আদক, ৫. সীতারাম দাস, ৬. যদুনাথ, ৭. ঘনরাম চক্রবর্তী, ৮. নরসিংহ বসু, ৯. দ্বিজ রামচন্দ্র, ১০. প্রভুরাম মুখোপাধ্যায়, ১১. গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১২. হৃদয়রাম সাউ (সাহু), ১৩. কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, ১৫. নিধিরাম গাঙ্গুলী, ১৬. রামনারায়ণ, ১৭. মানিকরাম গাঙ্গুলী, ১৮. রামকান্ত রায়, ১৯. শ্রী শ্যাম পণ্ডিত, ২০. রাজারাম দাস, ২১. বিশ্বনাথ দাস, ২২. ধর্মদাস বৈদ্য ও ২৩. রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। এসব কবিদের মধ্যে ঘনরাম চক্রবর্তী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঘনরাম চক্রবর্তী

ঘনরাম চক্রবর্তীর কবিকৃতী সম্পর্কে সুকুমার সেন বলেছেন- 'ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে সবচেয়ে শিক্ষিত ও দক্ষ ছিলেন ঘনরাম চক্রবর্তী। ঘনরাম সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা সর্বাধিক পরিচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য'।[২৩]

প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিদের জীবনী সম্পর্কে খুব বেশি জানার উপায় ছিল না। শুধু কবিগণ তাদের রচনায় যেটুকু ভণিতা সংযুক্ত করতেন, তা থেকেই মূলত কিছু তথ্য জানা যেতো। ঘনরামের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এ ভণিতা থেকেই ঘনরামের জীবনের কিছু তথ্য জানা যায়। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে, ঘনরাম চক্রবর্তী ১৬৬৯খ্রি. বর্ধমান জেলার কইয়র পরগনার কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।[২৪]

এ কৃষ্ণপুর গ্রাম বর্ধমানের দামোদর নদীর দক্ষিণ হতে চারক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। কবির পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সতী বা সীতা। পিতামহের নাম ধনঞ্জয় এবং মাতামহ রায়না নিবাসী গঙ্গাহরি। কবির শিক্ষা গুরুর নাম ছিল শ্রীরাম দাস। এর তত্ত্বাবধানে তিনি বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, আরবি ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

শৈশবে ঘনরাম দুরন্ত ও কলহপ্রিয় ছিলেন। শারীরিক কসরত তাঁর আয়ত্তে ছিল। দুশ্চিন্তাগ্রস্থ পিতা গৌরীকান্ত বাধ্য হয়ে পুত্রের সুমতির আশায় তৎকালীন প্রসিদ্ধ রামপুরের টোলে তাঁকে পাঠিয়ে দেন। এখানেই তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে যায় এবং গুরুর কাছে থেকে পান 'কবিরত্ন' উপাধি।[২৫]

বিবাহিত জীবনে তিনি চার পুত্র সন্তানের জনক ছিলেন; যথা — রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। কবির নামের শেষ অংশ 'রাম' এবং চার পুত্রের নামেও এর সাদৃশ্য থাকায় এমনিক শিক্ষাগুরুর নামেও এর উল্লেখ থাকায় মনে হয় তিনি রামভক্ত ছিলেন। পীযূষ কান্তি মহাপাত্রের মতে, রামবাটী টোলের গুরু- ঘনরামকে 'রামায়ণ পাঁচালী' লিখতে বললে তিনি তা শুরু করেন, কিন্তু দৈবভাবে তা 'ধর্ম ঠাকুর পাঁচালীতে' রূপলাভ করে। এছাড়া ঘনরামের 'ধর্মমঙ্গল' গ্রন্থে বহুবার রামায়ণের উল্লেখ রয়েছে।

ঘনরাম ছিলেন বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায়ের রাজ দরবারের সভাকবি। এ কীর্তিচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা ও ঔদার্যের কারণেই কবি এ 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' রচনা করেন এবং এ কাব্যের বহু স্থানে রাজা কীর্তিচন্দ্রের বীরত্ব ও মহত্ত্বের কথা উল্লেখ করেছেন। কীর্তিচন্দ্র রায়ের পূর্ব পুরুষ ছিলেন রামকৃষ্ণ রায়। তার পুত্র ছিলেন জগৎরাম রায়। এ জগৎরাম রায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭খ্রি.) কাছ থেকে শাহী ফরমান লাভ করেছিলেন। ১৭০২ খ্রি. এক বিশ্বাসঘাতকের হাতে জগৎরামের মৃত্যু হয়। এ জগৎরামের দুই পুত্র- কীর্তিচন্দ্র রায় ও মিত্রসেন রায়। পিতার মৃত্যুর পর কীর্তিচন্দ্র রাজ সিংহাসনে বসেন এবং যোগ্যতাবলে চিতোয়া, ভুরশুট, বরদা ও মনোহরশাহী পরগনা নিজ জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। কীর্তিচন্দ্র রায় সম্পর্কে উইলিয়াম হান্টার বলেন– 'Kirtti Chandra was a bold and adventurous spitit.[২৬]' এ বীরপুরুষ কীর্তিচন্দ্রের ১৭৪০ খ্রি. মৃত্যু হয়।

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' লিখে শেষ করেন ১৬৩৩ শতাব্দ বা ১৭১১ খ্রি. শুক্রবার, শুক্লা তৃতীয়ার এক প্রহর বেলায়। কাব্যের শেষে কবি লিখেছেন —

> 'শক লিখে রামগুণ রস সুধাকর
> মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর।
> সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি
> যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥'

'ধর্মমঙ্গল' কাব্য ছাড়াও ঘনরাম রচনা করেন 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী' বা 'সত্যনারায়ণ-রসসিন্ধু' নামক কাব্য। ঘনরামের উপাধি ছিল- 'কবিরত্ন'। এছাড়াও ঘনরাম ছিলেন ছান্দসিক ও পণ্ডিত কবি।

ঘনরামের সর্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্ব চরিত্র চিত্রনে। কবির প্রখর বাস্তববোধ, গভীর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি এবং পরিবেশ রচনায় দক্ষতা চরিত্র চিত্রনে স্বাভাবিকতার সৃষ্টি করিয়াছে। ,,, ধর্মমঙ্গলে যতগুলি চরিত্র আছে আর কোন মঙ্গলকাব্যে এতগুলি চরিত্র নাই। এতগুলি চরিত্রকে নিজ নিজ পরিবেশ অনুযায়ী চিত্রিত করিতে কবির দক্ষতা অনস্বীকার্য। ঘনরামের কৃতিত্ব কেবল মূল চরিত্রগুলি সৃষ্টিতে নহে, প্রত্যেকটি চরিত্র তাঁহার কাব্যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।[২৭]

ঘনরামের কবিকৃতীর মূল্যায়ন করতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন- 'চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি যেমন ভাতরচন্দ্র, ঘনরামও তেমনিই ধর্মমঙ্গল কাব্যের ঐশ্বর্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ভারত চন্দ্রও অনেকাংশে তাঁহার নিকট ঋণী।[২৮] সুতরাং বলা যায়, ঘনরাম শুধু চরিত্র চিত্রনেই কৃতিত্বের পরিচয় দেননি, বরং ভাষা-শব্দ

যোজনার দক্ষতায়, বীর রসের আবাহনে এবং কাহিনীর বিশালতা ও ভাব-বিলাস-গাম্ভীর্যে সমকালে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী

ঘনরাম তাঁর এ কাব্যকে 'ধর্মমঙ্গল' ছাড়াও 'নূতনমঙ্গল', 'অনাদি মঙ্গল', 'মধুরমঙ্গল', 'মধুরভারতী', 'ধর্মসঙ্গীত', 'ধর্মকীর্তন' ও 'ধর্মইতিহাস' বলে অভিহিত করেছেন। এ 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' মোট চব্বিশটি পালায় বিভক্ত এবং যার শ্লোক সংখ্যা ৯১৪৭। এত বড় কলেবর বিশিষ্ট মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। এ পালাগুলির মধ্য দিয়ে কাহিনীর গতি অনিবার্য বেগে পরিণতির দিকে ধাবিত হয়েছে। মূল কাহিনীর সঙ্গে কিছু শাখা কাহিনীও সংযুক্ত হয়েছে। কাব্যের নায়ক লাউসেনের জন্ম থেকে শুরু করে স্বর্গারোহন পর্যন্ত সকল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারিত হয়েছে। অপরাপর মঙ্গলকাব্যের ঐতিহ্য মেনেই এ ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচার-প্রসার ঘটাতেই স্বর্গ থেকে অভিশাপ দিয়ে রঞ্জাবতী ও লাউসেনকে মর্ত্যভূমিতে পাঠানো হয়েছে।

সাধারণভাবে 'ধর্মমঙ্গল কাব্যের' দুটি কাহিনী রাঢ় বাংলায় প্রচলিত; যথা-

১. রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী এবং
২. লাউসেনের কাহিনী।

তবে ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর এ 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রাজা হরিশ্চন্দ্রের পালাকে স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপন করেননি, বরং মূল কাহিনীর প্রয়োজনে অর্থাৎ রঞ্জাবতী পুত্রেষ্টি যজ্ঞের অনুমতি লাভের জন্য স্বামী কর্ণসেনের কাছে অতীতের এ কাহিনীকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছেন। মূল কাহিনীর সঙ্গে এর কোন যোগসূত্রও নেই বরং কাহিনীর প্রয়োজনে গড়ে ওঠেছে। ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর এ কাব্যের ২৪ পালার মধ্যে ৪র্থ পালা হিসেবে রাজা হরিশ্চন্দ্র পালা সংযোজন করেছেন। কিন্তু লাউসেনের কাহিনীর তুলোনায় হরিশ্চন্দ্র পালার কাহিনী পূর্ববর্তীকালের হওয়ায় এর আলোচনা প্রথমেই করে নেয়াই যুক্তিযুক্ত।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী

রাজা হরিশ্চন্দ্র ও রানী মদনাবতী নিঃসন্তান থাকায় লোকলজ্জায় ও বিদ্রূপে মুখ দেখাতে পারছিলেন না। মনের দুঃখে তারা ঘুরতে ঘুরতে বলুকা নদীর তীরে এসে দেখলেন যে ভক্তেরা সেখানে ধর্মঠাকুরের পূজা করছে। রাজা-রানীও ধর্মের পূজা করে পুত্রবর প্রার্থনা করেন এবং শর্তসাপেক্ষে (১২ বছর হলে পুত্রকে বলি দিতে হবে) পুত্রবর প্রদান করেন। পুত্রের প্রত্যাশায় তারা তাতেই রাজি হলেন।

যথাসময়ে রানী মদনাবতী পুত্র প্রসব করেন এবং পুত্রের নাম রাখা হয় লুহিশ্চন্দ্র। কিন্তু পুত্রের ১২ বছর বয়সে যে প্রতিজ্ঞা পালন করতে হবে, সে প্রতিশ্রুতি ভুলে গেলেন। একদিন ধর্মঠাকুর ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে রাজার অতিথি হন এবং রাজপুত্রের মাংস ভক্ষণ করতে চাইলে রাজা-রানীর প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণে আসে এবং তারা পুত্রের বলির মাংস রান্না করে খেতে দেন। এতে ধর্মঠাকুর সন্তুষ্ট হয়ে পুত্র লুহিশ্চন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন এবং নিজ মূর্তি ধারণ করে রাজা-রানীকে আশীর্বাদ করে বিদায় নেন। রাজা-রানী মহাসমারোহে ধর্মঠাকুরের পূজা করেন। এখানেই এ পালার সমাপ্তি।

লাউসেনের কাহিনী

লাউসেন কাহিনীর প্রথমেই আছে স্থাপনা পালা। এ স্থাপনা পালা আবার দুই অংশে ভিক্ত, যথা-

ক. বন্দনা অংশ ও

খ. সৃষ্টি পত্তন ও শাপভ্রষ্ট অপ্সরার মর্ত্যে গমন

এ স্থাপনা পালা মূলত ধর্মমঙ্গল কাব্যের ভূমিকা অংশ। এ বন্দনা অংশের প্রথমেই আছে গণেশ বন্দনা, ধর্ম-বন্দনা, শক্তি বন্দনা, সরস্বতী বন্দনা, লক্ষ্মী বন্দনা ও যোগাদ্যার বর্ণনা।

সৃষ্টি পত্তন অংশে আদিকালে ব্রহ্ম সনাতন ছিলেন নিরাকার। চতুর্দিকে অন্ধকার থাকায় তার সৃষ্টির বাসনা হওয়ায় তিনি দেহ ধারণ করেন এবং প্রথমেই বাহন উলুকের সৃষ্টি হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে জল, বিশ্বপ্রকৃতি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, ভূত, প্রেত, দেব-দানব, মানব, স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল, নদ-নদী, সাগর, পবর্ত, দিন-ক্ষণ-রাত, মাস-ঋতু-বছর সৃষ্টি করেন। এভাবেই সৃষ্টির পত্তন হয়।

পৃথিবীতে যুগ যুগ ধরে ধর্ম ঠাকুরের পূজা হতো, কিন্তু কলিযুগ মানুষের অনাচার-পাপাচারের ফলে এ পূজা ব্যাহত হবে- এমন কথা হনুমানের কাছে শোনে ধর্ম ঠাকুর মর্মাহত ও চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু রঞ্জাবতীর পুত্র কামনায় ধর্ম ঠাকুরের পূজা করার বিষয়টি জানতে পেরে দেবতা স্বর্গ অপ্সরা অম্বুবতীকে মর্ত্যে পাঠাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। ভবানীর মাধ্যমে নৃত্যের সময় নর্তকী অম্বুবতীর তাল ভঙ্গের অভিশাপে তাকে মর্ত্যে পাঠানো হয়। ধর্মের পূজা প্রচার প্রসার করতে নর্তকী অম্বুবতী রঞ্জাবতী নাম ধারণ করে রমতিনগরের রাজা-রানী বেনুরায় ও মন্থরার ঘরে জন্মগ্রহণ করে। রঞ্জাবতীর বোন ভানুমতী, ভাই মহামদ এবং ভগ্নিপতি গৌড়েশ্বর।

ঢেকুর পালায় আছে ইছাই ঘোষের কাহিনী। ধর্মপালের মৃত্যুর পর তার পুত্র গৌড়ের রাজা হন। তিনি একদিন শিকারে যাবার পথে সামন্ত রাজা সোম ঘোষকে (ইছাই ঘোষের পিতা) বন্দী অবস্থায় দেখেন। রাজকর পরিশোধ না করার অপরাধে মন্ত্রী মহামদ তাকে বন্দী করেছেন। গৌড়েশ্বর দয়া করে সোম ঘোষকে মুক্তি দিয়ে ত্রিষষ্ঠীর গড়ের অধিপতি করে পাঠান এবং কর্ণসেনকে তাঁর অনুগত করেন। এ সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ ভবানীর বরে অপ্রতিরোধ্য প্রতাপের অধিকারী হয়ে ঢেকুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, রাজকর পাঠানো বন্ধ করে দেন এবং কর্ণসেনের সম্পত্তি গ্রাস করেন। রাজদূতকে ইছাই লাঞ্ছিত করলে গৌড়েশ্বর তাকে শায়েস্তা করতে কর্ণসেনকে সৈন্যসহ প্রেরণ করেন। এ যুদ্ধে কর্ণসেনের পরাজয়, ৬ পুত্রের মৃত্যুতে ৬ পুত্রবধূর সহমরণ, স্ত্রী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। স্ত্রী-পুত্র-পরিজন হারিয়ে কর্ণসেন সংসার বিবাগীতে পরিণত হন।

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালায় কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে সংসারী করতে আপন শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে বিবাহ দেন। তিনি কৌশলে শ্যালক মহামদকে কামরূপ রাজাকে দমনের ছলে দূরে পাঠিয়ে তার অজান্তে বোন রঞ্জাবতীর বিবাহ দেন এবং কর্ণসেনকে ময়নাগড়ে সামন্ত রাজা করে পাঠান। পরে ঘটনা শুনে মহামদ ক্রুদ্ধ হন এবং যে কোন প্রকারে কর্ণসেনের ক্ষতিসাধন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। দীর্ঘদিন স্বামীগৃহে থাকার পর কর্ণসেনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রঞ্জাবতী গৌড়ে এলে ভাই মহামদ তাকে বন্ধ্যা ও কর্ণসেনকে আঁটকুড়ে অপবাদ দেন। এতে করে রঞ্জাবতী পুত্র কামনায় ব্যাকুল হয়ে ঔষুধপত্র, মানসিক ও দেবার্চনা করেও ব্যর্থ হন। এরপর তিনি ধর্মঠাকুরের গাজন দেখে পুত্রের জন্য শালে ভর দিয়ে পুত্র ব্রত পালন করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কর্ণসেন এতে অনুমতি দান করা থেকে বিরত হন।

হরিশ্চন্দ্র পালায় মূলত রঞ্জাবতী স্বামী কর্ণসেনকে হরিশ্চন্দ্র-মদনার পুত্র লাভের ঘটনা বা কাহিনী শুনিয়ে তার শালে ভর দেবার অনুমতি আদায় করে নিয়েছেন।

শালে ভর পালায় রঞ্জাবতী চাঁপায়ের ঘাটে গিয়ে ধর্ম ঠাকুরের উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞ করেও পুত্র বর লাভে ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে ভয়ংকর সাধনা হিসেবে শালে ভর দিয়ে রঞ্জাবতী আত্মবিসর্জন দিলে ধর্ম ঠাকুরের আসন টলে ওঠে। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে রঞ্জাবতীকে পুত্র বর দেন এবং রঞ্জাবতীর স্বপ্ন ও তপস্যা সফল হয়।

লাউসেন জন্ম পালায় রঞ্জাবতীর কোল জুড়ে পুত্র আসে এবং দেবতা ধর্মের নির্দেশে নাম রাখা হয় লাউসেন। লাউসেনের খরব শোনে মন্ত্রী মহামদ ভাগ্নে শিশু লাউসেনকে হত্যা করতে কৌশলে চুরি করে আনে, তবে ধর্ম

ঠাকুর হনুমানের মাধ্যমে তাকে রক্ষা করেন। পুত্রকে না পেয়ে রঞ্জাবতী ব্যাকুল হলে ধর্ম ঠাকুর হনুমানের মাধ্যমে আরেকপুত্র কর্পূরকেসহ লাউসেনকে ফিরিয়ে দেন। এতে ময়নাগড়বাসী সকলেই খুশি হন এবং লাউসেনের জন্য ৪ জন দেবকন্যা- বিমলা, অমলা, কলিঙ্গা ও কানড়ার মর্ত্যে জন্ম হয় এবং ঘোড়া আণ্ডীর পাখরের সৃষ্টি হয়। লাউসেন ও কর্পূর নানা শাস্ত্র ও অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী হতে শিক্ষা শুরু করে।

আখড়া পালাতে লাউসেন ও কর্পূরকে মল্ল, অসি ও অন্যান্য বিদ্যায় পারদর্শী করতে হনুমানকে গুরু হিসেবে ধর্ম ঠাকুর পাঠান। মল্লবিদ্যা ছাড়াও কাব্য, অলংকার ও অপরাপর বিদ্যায় লাউসেন অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠেন। এ সময় আশ্বিন মাসে পৃথিবীর সর্বত্র দুর্গাপূজা হলেও ময়নাগড়ে ধর্মপূজা হয়। দেবী দুর্গাকে সহচরী পদ্মা মূল ঘটনা ভেঙ্গে বললে তিনি লাউসেনকে পরীক্ষা করতে রূপসী গণিকার ছদ্মবেশে আখড়ায় প্রবেশ করেন। লাউসেনকে দুর্গা নানা প্রলোভনে ছলনা করেও ব্যর্থ হন এবং তার সংযমের পুরস্কার স্বরূপ বর প্রার্থনা করতে বললে লাউসেন দুর্জয় অসি লাভ করে।

ফলা নির্মাণ পালায় লাউসেনের দুর্গা দেবী প্রদত্ত অসিতে ফলা তৈরির জন্য হনুমান দেববৃক্ষের ডাল আনেন এবং দেব শিল্পী বিশ্বকর্মা এ ফলা নির্মাণ করে দেন বিচিত্র কারুকার্যের মাধ্যমে। এরপর লাউসেন ও কর্পূর গৌড়ে যেতে চাইলে রঞ্জাবতী প্রথমে বাধা দেন কিন্তু পুত্রদের প্রত্যয় দেখে তিনি চিন্তিত হয়ে রমতির মল্লবীর সারঙ্গধলকে ডেকে আনেন। মল্ল পরীক্ষার ছলে পুত্রদের আহত করে ঘরে রেখে তিনি ভবিষ্যৎ বিপদ থেকে রক্ষা করতে চান। কিন্তু লাউসেনের হাতে মল্লবীরদের পরাজয় ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত রঞ্জাবতী অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও পুত্রদের গৌড় যাত্রার অনুমতি দেন।

গৌড়যাত্রা পালায় লাউসেন ও কর্পূর অনেক গ্রাম-নদী-পথ ও পর্বত পেড়িয়ে মঙ্গলকোটে পৌছান এবং হরিদাস তামুলীর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। এরপর গৌড়ের অভিমুখে যাত্রা করেন এবং কর্পূরের মুখে অভিশপ্ত স্বর্গ নর্তক শ্রীধরের কামদল বাঘে রূপান্তরের কাহিনী শুনেন। কামদল বাঘের মনিব জাল্লাল শিখরকে বিতাড়ন ও অজেয় অপ্রতিরোধ্য হবার ঘটনায় ত্রাসের সৃষ্টি হয়।

কামদল বধ পালায় লাউসেন ভীতু কর্পূরকে রেখে একাই জলন্দায় গেলেন কামদলকে বধ করতে। ঘুমন্ত কামদলকে জাগিয়ে লাউসেন তাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কামদল দুর্গার বরে অজেয় হবার কারণে প্রথমে লাউসেন পরাস্ত হলেও হনুমানের সহায়তায় কামদলকে হত্যা করতে সমর্থ হন, এতে করে সে অভিশাপ মুক্ত হয় এবং জল খেতে গিয়ে কুমীর দেখে লাউসেন তাকেও হত্যা করেন।

জামতি পালায় লাউসেন জামতিনগরে পৌছে সরোবরের কাছে বিশ্রাম নিতে গেলে শিবাই দত্তের স্ত্রী নয়ানী লাউসেনের রূপে মজে যায়। সে প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হলে প্রতিশোধ নিতে আপন পুত্রকে কুয়ায় ফেলে হত্যা করে লাউসেনকে বিপদে ফেলে। কিন্তু ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় লাউসেন মৃত পুত্রকে জীবিত করে নয়ানীকে যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে গোলাহাটের দিকে যাত্রা করেন।

গোলাহাট পালায় লাউসেন প্রথমে মালিনীর, তারপর গণিকা শ্রেষ্ঠা সুরিক্ষার কবলে পড়েন। সুরিক্ষা নানা ছলাকলায় লাউসেনকে প্রলুব্ধ করেও ব্যর্থ হয়। অবশেষে ৮টি প্রহেলিকার কবলে পরেও লাউসেন ধর্মের কৃপায় তা খণ্ডন করতে সমর্থ হন এবং সুরিক্ষা চরমভাবে জব্দ হয়। এরপর লাউসেন রমতি নগরে প্রবেশ করেন এবং লাউদত্ত কর্মকারের আতিথ্য গ্রহণ করেন।

হস্তীবধ পালায় লাউসেন লাউদত্তের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করার পর মহামদ কূটকৌশলে সরকারি ফরমান জারি করেন এবং লাউসেনকে শায়েস্তা করতে হাতি চুরির অপবাদে কোটাল দিয়ে বন্দি করিয়ে লাঞ্ছিত করেন। তবে ধর্মঠাকুর হনুমানকে দিয়ে লাউসেনকে উদ্ধার করান এবং রাজার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। এতে করে মহামদ

আরো ক্রুদ্ধ হয়ে লাউসেনকে হাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে মহিমা প্রকাশ করতে বলেন। লাউসেন হাতিকে হত্যা করলে, কপট মহামদ তাকে দিয়ে আবার হাতিকে পুনর্জীবিত করান। মহামদ কিছুটা জব্দ হন এবং লাউসেন কালুডোমদের সঙ্গে করে ময়নায় প্রত্যাবর্তন করেন।

কাঙুর যাত্রা পালায় কামরূপ রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে মহামদ চক্রান্ত করে লাউসেনকে পাঠান। মহামদের অত্যাচারে গৌড়ের জন-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে এবং গৌড়েশ্বর মহামদকে বন্দী করলে, মহামদ কামরূপ রাজা কর্পূরধলকে গৌড় আক্রমণ করতে পত্র পাঠান। বাধ্য হয়ে গৌড়েশ্বর মহামদকে মুক্তি দেন এবং যুদ্ধ করতে কূটকৌশলে লাউসেনকে পাঠান শাস্তি পেতে বা নিহত হতে।

কামরূপ যুদ্ধ পালায় লাউসেনের পক্ষে কালুডোম কামরূপ কোটালের সঙ্গে যুদ্ধ হয়, এতে কোটাল পরাজিত হলে রাজা কর্পূরধল সসৈন্যে এসেও কালু ডোমের হাতে বন্দি হন। লাউসেন ও কামরূপ রাজার সন্ধি হয় এবং রাজকন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে লাউসেনের বিয়ে হয়। প্রত্যাবর্তনের পথে লাউসেন মঙ্গলকোট রাজা গজপতির কন্যা অমলা ও বর্ধমান রাজা কালিদাসের কন্যা বিমলাকে বিয়ে করেন।

কানড়ার স্বয়ম্বর পালায় সিমুলা রাজা হরিপালের কন্যা কানড়ার বিয়ে উপলক্ষ্যে স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে মহামদের চক্রান্তে গৌড়েশ্বর নিজেই বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠান। এতে দুর্গাভক্ত কানড়া রাজদূতকে অপমান করে ফেরত পাঠিয়ে দেয় এবং দুর্গা একটি লোহার গণ্ডার দেন পরীক্ষা নিতে। যে এ লোহার গণ্ডারকে এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে, তাকেই কানড়া বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

কানড়ার বিবাহ পালায় শর্ত মতে লোহার গণ্ডার কাটতে গৌড়েশ্বর ও মহামদ ব্যর্থ হলে, লাউসেন ধর্ম ঠাকুরের কৃপায় তা সক্ষম হন। কানড়ার দাসী ধুমসী লাউসেনের গলায় বরমাল্য দিলে মহামদ সিমুলা আক্রমণ করেন কিন্তু দেবী দুর্গার হস্তক্ষেপে মহামদ পরাজিত হন। কানড়াকে প্রথমে বিয়ে করতে লাউসেন অনিচ্ছা প্রকাশ করলে, কানড়া তার সঙ্গে যুদ্ধ করার আহবান জানান। লাউসেন যুদ্ধে হারলে কানড়াকে বিয়ে করতে হবে- এ শর্তে যুদ্ধে গিয়ে দেবী দুর্গার মায়ায় লাউসেন পরাস্ত হন এবং চতুর্থ স্ত্রী হিসেবে কানড়াকে বিয়ে করেন।

মায়ামুণ্ড পালায় কপট মহামদ লাউসেনকে শায়েস্তা করতে ইছাই ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযান করতে ঢেকুরে পাঠাতে গৌড়েশ্বরকে রাজি করান। বাধ্য হয়ে লাউসেন কালু ডোমকে সঙ্গে করে ঢেকুর গমন করেন। কালুর হাতে ইছায়ের সেনাপতি লোহাটাবজ্জরের মৃত্যু ঘটলে, মহামদ কূটচাল হিসেবে লাউসেনের মায়ামুণ্ড ময়নাগড়ে পাঠিয়ে দেন। যাতে করে কর্ণসেন-রঞ্জাবতী ও চার স্ত্রীর শোকে-দুঃখে মৃত্যু হয়। লাউসেনের চার স্ত্রী সহমৃতা হবার আয়োজন করলে ধর্ম ঠাকুরের হস্তক্ষেপে সবাই রক্ষা পায় এবং প্রকৃত ঘটনা জানতে পারে।

ইছাই বধ পালায় লাউসেন ও ইছাইয়ের যুদ্ধের বর্ণনা দেখা হয়েছে। ইছাই দুর্গার আরাধনা করে তিনটি বাণ এবং অমর হবার বর লাভ করে। যুদ্ধে লাউসেন ইছাইয়ের মাথা কেটে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেও দেবীর বরে তা আবার জোড়া লাগে। হনুমান সিদ্ধান্ত নিলেন তিনি ইছায়ের কাটা মুণ্ড পাতালে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু দুর্গা ভক্ত ইছাইকে বাঁচাতে নিজেই লাউসেনকে হত্যা করার ঘোষণা দেন। এতে দেবতারা মিলে পরামর্শ করে লাউসেনের মায়া মূর্তি নির্মাণ করেন এবং এ মায়ামূর্তিকে হত্যা করে দেবী কৈলাসে ফিরে গেলেন। এ অবসরে লাউসেন ইছাইকে হত্যা করেন এবং মাথামুণ্ড হনুমান ধর্ম ঠাকুরের পদপ্রান্তে নিয়ে ফেলেন। ইছাই ঘোষের মৃত্যুর পর লাউসেন গৌড়ে ফিরে আসেন।

অঘোর বাদল পালায় কপট মহামদ ধর্ম ঠাকুরের পূজা করে লাউসেনকে হত্যার বর লাভে গৌড়েশ্বরকে রাজি করান। এ কুমতলব বুঝতে পেরে ধর্ম ঠাকুর গৌড়ে প্রবল বর্ষণ শুরু করান ইন্দ্রকে দিয়ে। তখন মহামদ লাউসেনকে বলেন পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটাতে। কিন্তু লাউসেন এতে সম্মত না হলে তাকে বন্দী করা হয়। তবে

কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী এসে প্রতিশ্রুতি দিলে লাউসেন সম্মত হন এবং হাকন্দ অভিমুখে কুকুরসহ (শাপভ্রষ্ট) গমন করেন।

পশ্চিম উদয় আরম্ভপালায় লাউসেন পূজা করার জন্য মাসী সামুলাকে সঙ্গে করে নৌকা সহযোগে হাকন্দে গমন করেন। হাকন্দে পৌছে সেখানে আদ্যের দেহারা দেখলেন এবং বন কেটে ধর্মপূজার স্থান তৈরি করেন। এ দিকে লাউসেনের অনুপস্থিতিতে ময়নাগড় লুণ্ঠন করতে মহামদ সসৈন্যে যাত্রা করেন।

জাগরণ পালায় মহামদ ইন্দ্রজাল কোটাল দিয়ে মায়ামন্ত্রে ময়নাগড়বাসীকে ঘুমঘোরে অচেতন করে রাখেন। এ সুযোগে মহামদ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হলে, ধর্ম ঠাকুর হনুমানের মাধ্যমে কালু ডোমকে সতর্ক হবার নির্দেশ দেন। কালু দুর্গা পূজা করেই মদ পান করায় দেবীর অভিশাপে মাতাল হয়ে পড়ে রইল। অবস্থা বেগতিক দেখে কালুর স্ত্রী লখাই নিজ পুত্র শাকা ও শুকাকে যুদ্ধে পাঠায় এবং সাধ্যমতো প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু ২ পুত্রের মৃত্যুতে কালু ডোম যুদ্ধে গেলে তারই অকৃতজ্ঞ ছোট ভাই পুরস্কারের লোভে কথার ফাঁদে ফেলে কালুকে হত্যা করে। কিন্তু লখাইর হাতে তারও মৃত্যু হয়। পরে লখাই ও কলিঙ্গা যুদ্ধে গিয়ে কলিঙ্গার মৃত্যু হয়। অবশেষে কানড়া দুর্গা পূজা করে যুদ্ধে নামাতে দেবীর সহায়তায় ময়নাগড় রক্ষা পায় এবং পরাজিত হয়ে মহামদ পালিয়ে নিজ বাড়িতে গিয়ে চোর সন্দেহে দারুণভাবে লাঞ্ছিত হন।

পশ্চিম উদয় পালায় লাউসেন সামুলার সহায়তায় ধর্মপূজা করেও পশ্চিমে সূর্যোদয় করতে ব্যর্থ হন। পরে সামুলার পরামর্শে নিজ দেহকে নয়খণ্ড করে দুশ্চর সাধনা করায় ধর্ম ঠাকুরের আসন টলে ওঠে এবং সূর্যসহ অন্যান্য দেবতাগণ হাকন্দে চলে আসেন। বাটুয়া কুকুরকে বর দিয়ে লাউসেনকে জীবিত করেন এবং তার প্রার্থনা অনুযায়ী ১২ বৈশাখ রাত ১২ দণ্ডে পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটানো হয়। এর সাক্ষী হন হরিহর বাইতি। লাউসেন গৌড়ে ফিরে আসেন।

স্বর্গারোহণ পালায় সমগ্র কাহিনীর পরিণতি। লাউসেন গৌড়ে এসে পিতা-মাতাকে মুক্ত করেন এবং রাজ দরবারে গিয়ে পশ্চিমে সূর্যোদয়ের কথা বলেন। কিন্তু কপট মহামদ বিশ্বাস করলেন না। তখন হরিহর বাইতিকে লাউসেন সাক্ষী মানলেন। কিন্তু মহামদ অর্থ ও ভয় দেখিয়ে হাত করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বলেন। কিন্তু দেবী সরস্বতী তার জিহ্বায় ভর করাতে হরিহর সত্য ঘটনা বলেন। মহামদ তাকে অর্থ চুরির অপবাদ দিয়ে তাকে শূলে দেবার ব্যবস্থা করে। কিন্তু হনুমানের হস্তক্ষেপে সে মুক্তি লাভ করে। কিছুটা মতিভ্রমে মহামদ মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় একে একে তার ছয় পুত্রকে শূলে দন। লাউসেনকে ৬ বার বিপদে ঠেলে দিয়ে নির্যাতন করার পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ মহামদের ছয় পুত্রের মৃত্যু ঘটে। মহামদের কুষ্ঠ রোগ দেখা দেয়। রঞ্জাবতীর অনুরোধে শুধু বংশ রক্ষার জন্য মহামদের ৬ষ্ঠ শিশু পুত্র সন্তানকে লাউসেন পুনর্জীবিত করে দেন। এছাড়া মহামদের কুষ্ঠরোগও দূর করে দেন লাউসেন। কিন্তু মুখে শ্বেতকুষ্ঠের দাগ রয়েই গেল তার কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ। ধর্ম দেবতার কৃপায় কলিঙ্গাসহ ময়নাগড়ের মৃত মানুষজন জীবিত হয়ে ওঠেন। লাউসেন-রঞ্জাবতীর মাধ্যম মর্ত্যে ধর্মপূজা প্রতিষ্ঠা পায়। লাউসেনের অভিশাপ কাল শেষ হলে পুত্র চিত্রসেনের হাতে রাজ্য ভার দিয়ে হনুমানের সঙ্গে তিনি স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন। এখানে কাহিনীর সমাপ্তি।

নায়ক লাউসেনের ১১টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার শক্তি-সাহস-বীর্যবত্তা সম্পর্কে সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য —

'এমনিভাবে লাউসেনের অলৌকিক শৌর্যবীর্য ও অসম্ভব সাধন, ধর্ম ঠাকুরের অপরিমিত কৃপা ও মনোবাঞ্ছা পূরণ এবং তার মধ্যে সমস্ত কল্যাণ-ন্যায় ও পবিত্রতার আবাসস্থল কল্পনা করে সেকালের মানুষ তাদের মানসজগতের একটি সুসংহত চিত্ররূপে অঙ্কন করেছে, বাস্তব জীবনের অকল্যাণ-অশান্তি-অপূর্ণতাকে অধ্যাসের কল্যাণ, শান্তি ও পূর্ণতা দ্বারা পূরণ করেছে। ,,, এইসব সৃষ্টিকর্মের মাধ্যমেই বাংলার আর্যতের জনসমষ্টির প্রাণধর্মী জীবনাদর্শনই অভিব্যক্ত হয়েছে। ,,, আর এমনি করেই রাঢ় অঞ্চলে ধর্মমঙ্গল কাহিনী অর্জন করেছিল জাতীয় সাহিত্যের মর্যাদা।'[২৯]

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন

কৃষি,শিল্প ও বাণিজ্য—এ তিনটির ওপরই মূলত প্রতিষ্ঠিত ছিল বাঙালির অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। এ অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য-সুলভতা ও ঋদ্ধির জন্যই বাংলাকে বিদেশিরা 'সোনার বাংলা' ও 'পৃথিবীর ভূ-স্বর্গ' বলে অভিহিত করেছিল। কৃষিই ছিল বাংলার গণমানুষের জীবন-জীবিকার মূল অবলম্বন। নদীমাতৃক এ বাংলায় উৎপাদিত হতো প্রচুর পরিমাণে কৃষিজাত পণ্য। এ কৃষিজাত পণ্যের মধ্যে ছিল—চাল, আখ, তেলবীজ, পাট, তুলা,তামাক, নীল, পান, সুপারি, আদা, মরিচ, ও নানাবিধ শাকসবজি-ফলমূল প্রভৃতি। দেশের চাহিদা মিটিয়ে এসব কৃষিপণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হতো। রাজস্ব হিসেবে জমি ও ফসলের ধরন অনুযায়ী শতকরা এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-পঞ্চমাংশ নির্ধারিত ছিল। দেশের প্রায় ৯০ ভাগ লোকই এ কৃষি কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকতো। কৃষিকে কেউই হীনকর্ম-বলে মনে করতো না। এমনকি ব্রাহ্মণরাও কৃষি কাজ করতে লজ্জাবোধ করতো না। 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর বংশের পূর্ববতী ছয়-সাত পুরুষগণ এ কৃষির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাংলার শিল্পজাত পণ্যের মধ্যে ছিল প্রধানত কার্পাস ও রেশমজাত পণ্য। এর মধ্যে 'মসলিন' ছিল তৎকালীন বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বাঙালির উৎপাদিত বিখ্যাত বিলাসী পণ্য। এ বস্ত্রশিল্প ছাড়াও শঙ্খ,লৌহ, ইস্পাত, তাম্র, কাঁসা, কাগজ, লাক্ষা, বরফ, চিনি, গুড়, নৌকা, বাঁশ ও বেতশিল্প বেশ উৎকর্ষ লাভ করে।

ব্যবসায়-বাণিজ্য এ বাংলার জন্য যুগপৎভাবে আশীর্বাদ ও অভিশাপ বয়ে আনে। এক সময় বাংলার গৌড়, সপ্তগ্রাম, হুগলী, সোনারগাঁও ও চট্টগ্রাম ছিল সবচেয়ে বড় বন্দর (Porte Grande)। শুধু গৌড় বন্দরই ছিল ৯ মাইল লম্বা এবং ২০ লক্ষ লোক অধ্যুষিত বন্দরনগরী। এছাড়া সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত ৭টি গ্রামের (বংশবাটি বা বাঁশবেড়িয়া, কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, নিত্যানন্দপুর, শিবপুর, সম্বোকায়া, ও বলদঘাটি) সমন্বয়ে যে সপ্তগ্রাম নামক বাণিজ্যিক বন্দর নগরের পত্তন ঘটে, তৎকালে এর সুনাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। শেরশাহ (১৫৪০-১৫৪৫খ্রি.) এ সপ্তগ্রাম থেকে দিল্লী পর্যন্ত প্রশস্ত রাজপথ (গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড) নির্মাণ করায় এর গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সব বাণিজ্যিক বন্দর ছাড়াও হস্তিনাপুর, কর্ণাট, কলিঙ্গ, গুজরাট, বারণাসী, মাহারাষ্ট্র, কাশ্মীর, ভোজ, পাঞ্চাল, কম্বোজ, মগধ, জয়ন্তী, কাঞ্চী, বর্ধমান, অযোধ্যা ও ঢাকা থেকে দেশ-বিদেশের বণিকরা বস্ত্র, চিনি, চামড়া, নীল, তামাক, লবণ, মসলা, ফলমূল, লৌহশিল্প, শঙ্খশিল্প, বাঁশ-বেতের তৈরি নানা রকম পণ্যসামগ্রী এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা ও আরব দেশসমূহে রপ্তানি করতো। অর্থাৎ নেপাল, ভুটান, তিব্বত, চীন, সিংহল, মালদ্বীপ, কোরিয়া, জাভা, জাপান, পারস্য, ইরাক, তুরস্ক, মিশর, ইথিউপিয়া, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মান, পর্তুগাল, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ড ও রোম দেশ পর্যন্ত বাংলার বাণিজ্য পণ্যের বেশ কদর ছিল।

কিন্তু বাংলার এ বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি এক সময় এ দেশের জন্য অভিশাপে রূপ নেয়। কারণ মুঘল-পাঠান দ্বন্দ্ব, বারো ভূঁইঞাদের বিরোধিতা ও মারাঠাদের উত্থান, পর্তুগিজ-ওলন্দাজ-ফরাসি ও ইংরেজ বণিকদের ব্যবসায়িক স্বার্থসিদ্ধিজনিত অপকর্ম তথা দুঃশাসন বাংলার বাণিজ্যকে বিনষ্ট করে করে দেয়। যার ফলে বাংলার বাণিজ্য বন্দরগুলো আভ্যন্তরীণ হাটে পরিণত হয়। বিশেষ করে সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.) শাসনামলে এ ভারতবর্ষের হুগলী ও বৃহৎ বাংলায় পর্তুগিজ বণিক-জলদস্যুদের অপহরণ, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নি-সংযোগ ও লাম্পট্যের মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। মহাত্রাস সৃষ্টিকারী এ বর্বর পর্তুগিজরা বাংলার মানুষের কাছে 'ফিরিঙ্গি' (Frank শব্দের অপভ্রংশ) বা হার্মাদ (Armada শব্দের অপভ্রংশ) নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। বাংলার নদী অঞ্চলগুলো এদের নির্মম অত্যাচারে জনশূন্য শ্মশানে পরিণত হয় এবং এদের লালসার শিকার হয়ে বাঙলার নারীরা যে অভিশপ্ত সন্তানের জন্ম দিতো, তারাই মূলত 'ফিরিঙ্গি বা দো-আঁশলা '[৩০] নামে পরিচিতি লাভ করে।

আবার নবাব আলীবর্দীখানের শাসনামলে (১৭৫০-১৭৫৬ খ্রি.) মারাঠা বর্গীর হাঙ্গামা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। রেবারের মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে তার ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ সৈন্যকে ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে বাংলায় প্রেরণ করেন (১৭৪২ খ্রি.) চৌথ আদায়ের জন্য। এরাও বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মুর্শিদাবাদসহ নদী অঞ্চলগুলো হত্যা-লুণ্ঠন চালিয়ে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এর ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যসহ মানুষের স্বাভাবিক জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। এরূপ হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ ও ধর্ষণের রাজত্ব প্রায় ৮-৯ বছর ধরে (১৭৪২-১৭৫২০ খ্রি.) চলে। আলীবর্দীখান প্রাণপণ চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি। অবশেষে তাকেও মারাঠাদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হয়। এ বর্গীর হাঙ্গামার কথা ভারত চন্দ্র (১৭১২-১৭৬০ খ্রি.) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে (১৭৫২-৫৩ খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

আবার বাংলায় বারো ভূঁইঞাদের উত্থান এবং মুঘলদের সঙ্গে সংঘর্ষও বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১৫৭৬ খ্রি. আকবরের হাতে দাউদ খান কররানীর পতনের পর মূলত বাংলা মুঘল শাসনাধীনে চলে যায়। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বছর অর্থাৎ ঈসা খানের মৃত্যুর (১৫৯৯ খ্রি.) পরও মুঘলরা একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। সুবাদার ইসলাম খানের মাধ্যমে ঢাকায় বাংলার রাজধানী (১৬১০ বা ১৬১২ খ্রি.) স্থাপনের মাধ্যমেই মূলত বারো ভূঁইঞাদের প্রভাব কমে আসে। এ বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন—ঈসা খান ও মুসা খান (সোনার গাঁ), প্রজাপাদিত্য (যশোর), চাঁদ রায় ও কেদার রায় (বিক্রমপুর), ফজল গাজি (ভাওয়াল), বীর হাম্বির (বাকুড়া), কংশ নারায়ণ (নাটোর), গণেশ রায় ও প্রমোদ রায় (দিনাজপুর), মুকুন্দ রায় (খুলনা-ফরিদপুর), কন্দর্পনারায়ণ ও রায়চন্দ্র (বরিশাল), লক্ষণ মাণিক্য (নোয়াখালি), পীতাম্বর রায় (রাজশাহী) ও বিনোদ রায় (মানিকগঞ্জ) প্রমুখ। এরা তাদের সৈন্য বাহিনীতে বহু পর্তুগিজ, ওলন্দাজ ও ইংরেজকে নিয়োগ দিয়ে কামান ও গোলন্দাজ বাহিনীকে শক্তিশালী করে তোলেন। এ মুঘল ও বারো ভূঁইঞাদের ৪০ বছরের অরাজকতা-যুদ্ধ-বিগ্রহ বাংলায় পর্তুগিজদের আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করে এবং এদেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ধস নামে। এ বারো ভূঁইঞাদের প্রসঙ্গটিও ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁর 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' (১৭১১খ্রি.) বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

ভারতবর্ষে এ পর্তুগিজ হার্মাদ, মারাঠা বর্গী, বারো ভূঁইয়াদের বিরোধিতা ও আক্রমণে মুঘল শাসন দুর্বল হয়ে পড়ে। এছাড়া বাংলার দেশীয় হিন্দু বণিক ও সামন্ত রাজাদের ষড়যন্ত্র-সহযোগিতায় ইংরেজ বণিকগণ বাংলার রাজক্ষমতা (১৭৫৭ খ্রি.) পেয়ে যায়। এর পূর্বে তারা যে কলকাতা নগরীর পত্তন করে (১৬৯৮ খ্রি.), তার মাধ্যমেই মূলত বাংলার হুগলি, চট্টগ্রাম ও সোনার গাঁ-এর বন্দর নগরীর পতন ঘটে এবং বাংলা ইংল্যান্ডের কাঁচামালের বাজারে পরিণত হয়। ইংরেজদের কূটকৌশলে ও ষড়যন্ত্রে দেশীয় বাণিজ্য ও বণিক সমাজের পতন চূড়ান্ত রূপ নেয়।

পর্যটক ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের মতে, সমগ্র বাংলাদেশে পর্তুগিজদের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ হাজারের মতো। হুগলি ও চব্বিশ পরগণার বহু কৃষি ভূমি তাদের অধিকারভুক্ত ছিল এবং তারা খুব জাকজমকপূর্ণ ও বিলাসী জীবন-যাপন করতো। এসকল জমিতে তারা বিদেশি ফসল ও সবজি হিসেবে—আলু, তামাক, বজরা, সাগু, কাজু বাদাম, আনারস, আতা, আমড়া,পেঁপে, পেয়ারা, ও লেবুর চাষ করতো। প্রথম দিকে নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ এসব গ্রহণ করেনি। কিন্তু পরবর্তীকালে এসব বাঙালির প্রাত্যহিক খাবারে পরিণত হয়। এছাড়া তামাকের প্রচলন এরাই এ বঙ্গভূমিতে ঘটায়। জরদা, সরতি, নস্য, গুণ্ডি এসব তামাকেরই সহোদর ভাই হিসেবে গণ্য।

কৃষি, বাণিজ্য ও রক্তের সম্পর্কে জড়িয়ে পর্তুগিজগণ বাঙালি সমাজে বহুবিধ শব্দের প্রচলন ঘটায়। যেমন- আচার আলমিরা, আমড়া, আনারস, আরক, বালতি, ভাঙ, বাট্টা, বৃঞ্জল, বুটিক, কাজু , কামরা, কামিজ, চা, চাবি, কোকো, গুদাম, গির্জা, ঝিলমিলি, লস্কর, নিলাম, মিস্ত্রি, পাদ্রি, পালকি, পমফ্রেট, পেঁপে, পিওন, রসিদ, সাগু,

বারান্দা, কাবাব, আলকাতরা, আতা, বাসন, ভাপ, বজরা, বিস্কুট, বোতাম, বোতল, কেদারা, কফি, কাফ্রি, কাকাতুয়া, কামান, ছাপ, কৌচ, কম্পাস, খ্রিষ্টান, ইস্পাত, ইস্ত্রি, ফিতা, ফর্মা, গারদ, জোলাপ, জানালা, লেবু, মাস্তুল, পেয়ারা, পিপা, পিরিজ, পিস্তল, পেরেক, সাবান, তামাক, টোকা, তুফান, তোয়ালে, বরগা, বেহালা প্রভৃতি। বলা বাহুল্য এসব শব্দকে বাঙালি আর বিদেশি পর্তুগিজ শব্দ না ভেবে বরং আপন করে নিয়েছে। এসব শব্দের ব্যবহার 'মনসামঙ্গল' 'চণ্ডীমঙ্গল' 'ধর্মমঙ্গল' ও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে বহুল পরিমাণে ঘটেছে।

সুতরাং দেখা যায়, বঙ্গ-ভারতে ইংরেজ বণিকদের উত্থানের পূর্ব পর্যন্ত (১৬৯৮খ্রি. কলকাতার পত্তন) ব্যবসায়-বাণিজ্য মোটের ওপর ভালোই ছিল। এরপর থেকেই বিপর্যয়ের কাল শুরু হয়। আর এ কারণেই আমরা 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে চাঁদ সওদাগর, ধনপতি দত্ত ও শ্রীপতি দত্তের মতো আরো অনেক বাঙালি বণিকের পরিচয় পাই, যারা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে পাড়ি জমিয়েছে। পক্ষান্তরে 'ধর্মমঙ্গল' (১৭১১খ্রি.) ও 'অন্নদামঙ্গল' (১৭৫২-১৭৫৩খ্রি.) কাব্যে দেশের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ-বিগ্রহ, ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, ভোগ-বিলাস ও প্রতিকারহীন অসহায়ত্বে সিদ্ধি লাভের উপায় হিসেবে দৈবশক্তি কামনায় যাগ-যজ্ঞে উৎসাহী হতে দেখা যায়। 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে সমাজের আর্থিক সমৃদ্ধি যেখানে অনেকাংশে বাণিজ্যের ওপর নির্ভরশীল, সেখানে 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' অর্থ উপার্জনের উৎস হিসেবে সামন্ত শাসকেরা কর খাজনা আদায়ে নিপীড়ন এবং প্রতিবেশি রাজ্য আক্রমণে যুদ্ধকে বেছে নিয়েছে। শুধু তাই নয় এ কাব্যে সমাজ ও প্রশাসনের প্রতিটি পর্যায়ে ঘুষ-দুর্নীতি, প্রতারণা-ভণ্ডামি, ভোগ-বিলাস ও রিরংসাজনিত যে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের চিত্র দেখা যায়, তা পূর্ববর্তী কাব্যসমূহে এতটা পরিলক্ষিত হয় না। বরং এ পর্যায়ে তা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়। বাঙালির এ নৈতিক বিপর্যয়ের চরম প্রকাশ ঘটে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭ খ্রি.) সময়।

মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে বণিক ধনপতি দত্তের বাবা বণিক জয়পতি দত্তের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে অতিথি হয়ে আসেন বিভিন্ন অঞ্চলের বহু ধনাঢ্য-বিত্তবান বণিকগণ। এদের মধ্যে-সপ্ত গ্রামের শ্রীধর হাজরা ও রামদা হাজরা, বর্ধমানের ধুস দত্ত, চম্পাইনগরের চাঁদ সওদাগর ও লক্ষ্মী সওদাগর, কর্জনার সাত ভাইসহ নীলাম্বর, গণেশপুরের তিন ভাই সনাতনচন্দ্র, গোপালচন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র, দশঘরার বাশুলা, সাকোরার বিষ্ণু দত্ত, শঙ্খদত্ত, কয়েতির যাদবেন্দ্র দাস, ঝাড় গ্রামের রঘু দত্ত, তেখরার গোপাল দত্ত, ত্রিবেণীর রাম রায়সহ দশ ভাই, লাউগাঁয়ের রামদত্ত, পাঁচড়ার দণ্ডীদাস খাঁ, বিষ্ণুপুরের ভগবন্ত খাঁ, খণ্ডঘোষের বাসুদত্ত এবং গোতনের মধুদত্তসহ পাঁচ ভাই প্রমুখ। এ বণিকগণ সবাই ছিলেন অর্থ-বিত্ত, সম্মান- সৌভগ্য, প্রতাপ ও প্রতিষ্ঠায় সমাজের শীর্ষে।

কিন্তু এমন বণিকদের কোন সরব উপস্থিতি ধর্মমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায় না। এছাড়া কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রেরও উৎকর্ষের আভাস-ইঙ্গিত মেলে না। বরং সামন্তশাসক, মন্ত্রী ও আমলাদের শোষণকারী, পরপীড়ক, কূটকৌশলী, প্রতারক, বিলাসী হয়ে প্রজাদের ওপর করের বোঝা আরোপণ, বেগার শ্রম আদায়ে নির্মম-নিষ্ঠুর হতে দেখা যায়। এছাড়া যুদ্ধের ঘন ঘন আয়োজন-আক্রমণে সাধারণ প্রজার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে যা কোনভাবেই সমকালীন সমাজের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে না। এ পর্যায়ে ঘনরাম চক্রবতীর্র 'ধর্মমঙ্গল কাব্যের' অর্থনৈতিক ব্যবস্থার চিত্র উপস্থাপন করা হল—

কৃষি ব্যবস্থা

তৎকালীন বাংলায় অসংখ্য নদ-নদীর পলিমাটি ও অনুকূল জলবায়ুর কারণে জমিতে প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ও অর্থকরী শস্য উৎপাদিত হতো। এসব শস্য বা ফসলের মধ্যে রয়েছে– ধান, পাট, তামাক, মুগ, মসুরি, কলাই,

খেসারি, তিল, তিশি, সরিষা, মটর, আদা, মরিচ, পান, সুপারি, আম, জাম, নারকেল, কলা, লাউ, কুমড়া, আলু, শিম, পটল প্রভৃতি। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' কৃষির ব্যাপক চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় না। তদুপরি লখাইয়ের জবানিতে বাংলায় কৃষি ব্যবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—

ফসলাদি

'কখন চিনিতে তৈল তামাক তাম্বুল।
লখে কোন না জানে নাথের আদ্যমূল ॥' (পৃ-৬১৯)

ভূমি পরিমাপ পদ্ধতি

তৎকালীন বাংলায় ভূমি পরিমাপের একক হিসেবে একর, বিঘা, শতক বা শতাংশ, পাখি, ডিসিমল বা আড়া, আড়বাপ, ও কূলবাপ ব্যবহৃত হতো। আর জমি মাপা হতো বাশেঁর দণ্ড ও নল দ্বারা 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এ চিত্র পাওয়া যায়–

বিঘা

'দেশে নাই অনাবৃষ্টি বিঘা প্রতি আনা।
কোন জের জঞ্জালে ভাঙ্গিল গৌড় খানা ॥ –(পৃ-৩৫১)

ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা

তৎকালীন বাংলায় সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় কৃষক প্রজাকে দলিলের মাধ্যমে ভূমি বিলি–বণ্টন করে দেয়া হতো। আর এ কাজগুলো ভূমি অধিদপ্তরের পুস্তপালের ওপর অর্পিত ছিল। এছাড়া ভূমি ক্রয় বা বিক্রয়ের অথবা মালিকানা পরিবর্তন করতে হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করতে হতো।

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে মন্ত্রী মহামদের শোষণ-জুলুমে কৃষক প্রজা রাজস্ব ও কর দিতে না পারায় অনেকে দেশান্তরি হয় আবার অনেকে গৌড়েশ্বরের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। প্রজার কথা শুনে রাজা মহামদের কাছে ভূমি বন্টনের কাগজ বা দলিল চাওয়াতে সে বেকায়দায় পড়ে বন্দী হয়। মহামদের ভাষায়—

'তিন সন কাগজ বুজহ কালে কালে।
পাত্র হোলো ইন্দ্রজাল কোটাল হাওলে ॥
পাত্র বলে প্রমাদে পালালো যত প্রজা।
কালে কালে কতেক কাগজ চায় রাজা ॥
এতদূর নাহি পড়ি কে জানে কাগজ।' –(পৃ-৩৫৩-৩৫৪)

জায়গীর প্রদান প্রথা

তৎকালীন সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় রাজা বা সম্রাট রাজ্যের বেশির ভাগ ভূমি (ফসলি জমি, গ্রাম, বিল) সামন্ত জমিদার বা রাজা ও সৈনিকদের বেতন হিসেবে জায়গীর প্রদান করতেন। এতে রাজা শুধু বার্ষিক আনুগত্য কর বা রাজস্ব হিসেবে একটি নির্দিষ্ট অংশ পেতেন। 'ধর্মঙ্গল কাব্যে' মহামদ লাউসেনকে ভবিষ্যতে বিপদে ফেলতে রাজার কাছে সুপারিশ করে দক্ষিণ ময়না জায়গীর হিসেবে বন্দোবস্ত করে দেন—

'এতবলি নিজ হস্তে লিখিয়া পরয়ানা।
জায়গরি করি দিল দক্ষিণ ময়না ॥
পুরট জড়িত জোড়া জরি পট্টশাল।
সেনে দিয়া সম্মান বাড়াল ঠাকুরাল ॥' -(পৃ-৩৪৫-৩৪৬)

কর ও রাজস্ব ব্যবস্থা

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় রাজাকে কৃষক প্রজা তথা রাজ্যের জনগণকে নানা রকম কর প্রদান করতে হতো। ভূমির রাজস্ব কর ছাড়াও উৎসব কর, আনুগত্য কর, ফসলী কর, যুদ্ধ কর, দুর্যোগ কর, জনকল্যাণ কর, সেলামী কর, জান-মালের নিরাপত্তা বা জিজিয়া কর (অমুসলিমদের প্রদেয়) প্রভৃতি জনগণকে প্রদান করতে হতো—

ক. সামন্ত শাসকের বার্ষিক কর

সামন্ত শাসকগণ বার্ষিক একটি নির্দিষ্ট হারে কেন্দ্রীয় সরকার বা রাজাকে কর প্রদানের মাধ্যমে কোন প্রদেশ বা পরগণা বা মহালের শাসক হিসেবে নিয়োগ পেতেন। অনেকে নিয়মিত পরিশোধ করতেন, আবার অনেকে তা পরিশোধ না করে বরং বিদ্রোহ করতেন। 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে ত্রিষষ্টি গড়ের সামন্ত রাজা সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষও এ কর পরিশোধ করেনি, বরং বিদ্রোহ করে গৌড়রাজ্যের প্রেরিত দূতকে লাঞ্ছিত করেছে—

'ত্রিষষ্টি কর লয়ে এনো সোমঘোষে।
আজ্ঞা পেয়ে ধেয়ে ভাট চলিল সন্তোষে ॥

,,,

বকেয়া বেবাক লয়ে সঙ্গে চল মোর।
কি কব কালের ধর্ম্ম সাধু বাঁকে চোর ॥

,,,

ইছাই প্রবেশে পুরী বেষ্টিত লস্কর।
মাথায় ধবল ছাতি হাতীর উপর ॥
ঘোর নাদে নাগরা নিশান উড়ে যায়।
শুনিল রাজার লোক রাজকর চায় ॥
কোপে কেঁপে কোটালে হুকুম দিল ধর।
কোন বেটা নিতে চায় ঢেকুরের কর ॥' -(পৃ-৩৮-৩৯)

খ. লাখেরাজ ভূমি বা নিষ্কর ভূমি ব্যবস্থা

বিশেষ বিবেচনা, অবদান, বীরত্ব ও আত্মীয়তার সূত্রে তৎকালীন সময় অনেক ভূমি নিষ্কর বন্দোবস্ত দেয়া হতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লাউসেনও গৌড়ে গিয়ে মেসো গৌড়েশ্বর ও মামা মন্ত্রী মহামদকে দিয়ে ময়নাগড়ের পরগনাটি নিষ্কর বন্দোবস্ত করতে চেয়েছে—

'লাউসেন বলেন কর্পূর প্রিয় ভাই।
অতঃপর দুভেয়্যাতে গৌড়ে চল যাই ॥
মেসো সঙ্গে চল যেয়্যা করিব আলাপ।
কতকাল কুলাব কেবল বৃদ্ধ বাপ ॥
বিনা করে অবশ্য আনিব এই দেশ।
সভা মনে পরিচয় পরম সন্দেশ ॥' -(পৃ-১৭৮)

ঘ. আনুগত্য কর

সামন্তবাদী সমাজে অনেক সময় নামে মাত্র কর দিয়ে স্বাধীনভাবেও সামন্ত শাসকগণ শাসনকার্য চালাতে পারতেন। বিনিময়ে রাজার প্রয়োজনে অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহয্য করতে হতো।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' গৌড়েশ্বর কলিঙ্গার পিতা কামরূপ রাজা কর্পূরধলকে বেহাই হিসেবে এ করের বন্দোবস্ত করে দিয়ে বলেন—

'গৌড়পতি কন ভাই স্মরণ সবার।
তুমি বৈবাহিক বন্ধু কুটুম্ব আমার ॥
কালে কালে কিছু কিছু করি কর দিবে।

বিপত্তে বারতা পেলে তত্ত্ব মোর নিবে ॥' -(পৃ-৪০৫)

শিল্প

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলায় বিভিন্ন ধরনের শিল্পের বিকাশ ঘটে। এসব শিল্পের মধ্যে– বস্ত্রশিল্প বা তাঁত শিল্প, লৌহশিল্প, স্বর্ণ-রৌপ্যশিল্প, তামা-কাঁসাশিল্প, শঙ্খ শিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠ-বাঁশ-বেতশিল্প, পট বা কারুশিল্প ও স্থাপত্যশিল্প অন্যতম।

ক. কুটির শিল্প

তৎকালীন বাঙালি সমাজে কুটির শিল্প হিসেবে– তাঁত, রেশম, শঙ্খ, কাঠ, বাঁশ-বেত, মৃৎ শিল্পের ব্যপক প্রচলন ছিল। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' ডোম সম্প্রদায় বাঁশ-বেত দিয়ে– কুলা, ডালা, ধুচুনি, চুপড়ি, ঝুড়ি, পাখা প্রভৃতি তৈজসপত্র বানাতে বেশ দক্ষ ছিল। লাউসেনের সঙ্গে কালু ডোমের গমনের সময় দেখা যায়—

'আসিয়া কালুকে দিল লিখন পরয়না।
সাজিল সকল ডোম দক্ষিণ ময়না ॥
কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পোয়া ছাতাছাতি ॥' –(পৃ-৩৪৭)

খ. কারখানা ও কারিগর

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজে বস্ত্র, লোহা, তামা, ইস্পাত, সোনা, রূপা, কাঁসাশিল্প গড়ে ওঠেছিল। এ সকল কারখানায় অসংখ্য কারিগর অস্ত্র, তৈজসপত্র ও অলংকার তৈরি করতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লাউসেনের দুর্গা দেবী প্রদত্ত তরবারির ফলা নির্মাণ করতে গৌড়ের বিখ্যাত কর্মকার ধর্মদাসকে ডেকে পাঠানো হয়—

'গৌড়েতে আছিল কর্ম্মী বিশ্বকর্ম্মা দাস।
অনেক গুণের গুণী আছিল্য বিশ্বাস ॥

,,,

মণ্ডল বলেন আজ্ঞা হল যে তোমার।
তিন দিনে তেরো ফলা করাব তয়্যার ॥
এতবলি ধর্ম্মদাস কর্ম্মী কর্ম্মকারে।
আনায়্যা রাজার কাছে ভার দিল তারে ॥' —(পৃ-১৬৮)

মুদ্রা ব্যবস্থা

তৎকালীন বাংলায় পণ্য কেনা-বেচার জন্য অর্থ বা মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ব্যবস্থার (Burter system) প্রচলন ছিল। এসব মুদ্রার মধ্যে স্বর্ণ, রূপা, তামা, ব্রোঞ্জের প্রচলন ছিল। এসবকে টাকা বা তঙ্কা, দাম, দিনার, সিকি, আধুলিতে বিভাজন করা হতো। এছাড়া কড়িরও প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব মুদ্রা ব্যবস্থার চিত্র পরিলক্ষিত হয়—

ক. কড়ি

'হাতাহাতি হুকুমে হইল গড় বাড়ী।
প্রজাগণে প্রণামী দিলেক বহু কড়ি ॥' –(পৃ-৫৬)

খ. সিকি ও আধুলি

'কেহ বা সোনার সিকি কেহ আধ টাকা।
মহাপাত্র কেবল করিল মুখ বাঁকা ॥' –(পৃ-১২১)

গণনা পদ্ধতি

তৎকালীন বাংলায় গণনা পদ্ধতিতে বুড়ি, গণ্ডা, পণ ও কাহনের প্রচলন ছিল। সাধারণ মানুষ এ পদ্ধতিতেই হিসাব বা গণনা করতে অভ্যস্ত ছিল। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব গণনা পদ্ধতির চিত্র পাওয়া যায়—

ক. গণ্ডা

'ষোল গণ্ডা ফলা আছে ঘর কর্য়া আলো।
বেছ্যা লও বাছারে যেখান হয় ভালো ॥' −(পৃ-১৬৭)

খ. কাহন

'বাসার খরচ দিল দ্বাদশ কাহন।
পান ফুল দিয়ে বলে সাধু প্রয়োজন ॥' −(পৃ-১৮৫)

গ. পণ

'দশ পণের তৈল লাগে মোর
খরচ কি এক গোদে।' −(পৃ-২৫৯)

ঘ. বুড়ি

'মালিনী বলেন যদি মোরে দিলে ভার।
দশ বুড়ি পেলে করি দিব অলংকার ॥' −(পৃ-২৮৩)

ওজন পদ্ধতি

তৎকালীন সময়ে পণ্যদ্রব্য ওজন বা পরিমাপের ক্ষেত্রে মণ, সের, তোলা, রতি, আনা ও ভড়ি ব্যবহৃত হতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব ওজন বা পরিমাপের উল্লেখ পাওয়া যায়—

ক. তোলা

'আট তোলা বিষে যে বাসুকী বলধর।
দংশিলে অবশ্য মৃত্যু নতুবা অমর ॥' −(পৃ-৫০৯)

খ. মণ

'দিন প্রতি তিন লক্ষ তুলসী যোগায়।
একমনে একমণ ধুনা পুড়ে গায় ॥' −(পৃ-৫৭৮)

ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতি

তৎকালীন বাজার ব্যবস্থায় পণ্য দ্রব্য কেনা-বেচার ক্ষেত্রে মুদ্রা ও বিনিময় পদ্ধতি ছাড়াও বন্ধকী ব্যবস্থা, রোজ করা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল। সাধারণ গ্রামীণ জনগণ এ দুটি ব্যবস্থায় লেন দেনে অভ্যস্ত ছিল। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এ পদ্ধতিসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়—

ক. বন্ধক বা মহাজনী প্রথা

'ঘটি বাটি থালা বন্ধকে বিকিলা
কলুর কড়ির শোধে।' −(পৃ−২৫৯)

খ. রোজ করা প্রথা

' করুণা লাবণ্য দেখি রাজা হল্যা মুগ্ধ।
রোজ কর্য়া দিল সাত মহিষের দুগ্ধ ॥' −(পৃ−২১৪)

হাট-বাজার ও বন্দর

তৎকালীন বাংলায় দেশি-বিদেশি পণ্য-দ্রব্য কেনা-বেচার জন্য যে সমস্ত বাণিজিক বন্দর গড়ে ওঠেছিল তাদের মধ্যে–সপ্তগাঁও, সোনারগাঁও, চাটগাঁও ও হুগলি বন্দর অন্যতম। এছাড়া আরো হাট–বাজার ও গঞ্জ গড়ে ওঠেছিল। বণিক, মহাজনগণ সাধারণত জলপথে ও স্থলপথে এসব বন্দর–গঞ্জ ও হাট-বাজারে পণ্য নিয়ে যাতায়াত করেতেন।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব হাট-বাজার ও বন্দরের চিত্র পাওয়া যায়—

ক. হাট

'পাঁচ পাড়া প্রবেশে প্রদোষে গোলা হাটে।
জামতি জলন্দা রাখি চলে রাজবাটে ॥' –(পৃ–১২৪)

খ. বন্দর–গঞ্জ (সপ্তগ্রাম)

'বেগবতী বাণ গঙ্গা বামে সরস্বতী ॥
সপ্তগ্রাম রাখি বামে অম্বিকার ঘাট। –(পৃ-৫৭৩)

শ্রমবাজার

তৎকালীন বাংলার সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় শ্রম বাজারে দাসপ্রথা ছাড়াও বেতনভুক্ত শ্রমিক, দিনমজুর ও বেগার শ্রমের প্রচলন ছিল। সাধারণত যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা আপদকালে রাজা বা সামন্ত শাসকগণ প্রজাদের বাধ্য করতেন বেগার শ্রম দিতে। 'ধর্মমঙ্গণ কাব্যে' এ শ্রম ব্যবস্থার চিত্র পাওয়া যায়—

ক. বেগার শ্রম

'তবে পাত্র (মন্ত্রী) কোটালে হুকুম দিল দড়।
বেগাড়ি কোদাল ঝুড়ি এনে কর জড় ॥

,,,

দ্বাদশ কোটাল ঝুড়ি ইন্দ্রজাল ধায়।
সহরে বেগার ধরে লাগি যার পায় ॥
তাঁতি তেলি তামলি তৈলঙ্গ তৈলকর।
কৈবর্ত্ত কুজুড়া কানু কামার কুমার ॥' –(পৃ-৫৫২)

খ. দিন মজুর (চুক্তি ভিত্তিক)

'এত বলি ধর্ম্মদাস কর্ম্মী কর্ম্মকারে।
আনায়্যা রাজার কাছে ভার দিল তারে ॥
রায় রাণী আপনি বলেন বারে বার।
আন লঘুগুরু ফলা পাবে পুরস্কার ॥
সম্প্রতি সুবর্ণ-তিন দিলা তার হাতে।
নত হয়্যা কয় কর্ম্মী দিব দিন সাতে ॥' –(পৃ-১৬৮)

গ. বেতনভুক্ত শ্রমিক

'হাসিয়া কহেন সেন দূরে ত্যজ সব।
ইনাম মাহিনা দিব বাড়াব বিভব ॥' –(পৃ- ৩৪৭)

পরিবহন ব্যবস্থা

তৎকালীন বাংলায় জলপথ ও স্থলপথের পণ্য পরিবহন ব্যবস্থায় সাধারণত পাল তোলা জাহাজ, নৌকা, ডিঙা, গরুর গাড়ি, মহিষের গাড়ি, ঘোড়া, মহিষ, গাধা, খচ্চর, উট, ও গরু (বলদ, ষাঁড়) ব্যবহৃত হতো। এছাড়া স্বল্প দূরত্বে মালামাল আনা-নেয়ার ক্ষেত্রে কুলি, মুটে, মিস্তি ও খালাসিদের ব্যবহার করা হতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এ সব চিত্র পরিলক্ষিত হয়—

ক. নৌকা

'লাসবেশ পানফুলে সাজায়ে পসরা।
সহচরী সঙ্গে বসে ভিতর বাজরা ॥' –(পৃ-২৮৬)

খ. গরু ও ঘোড়া

'সদা সুখ সম্পদ সভায় সুসম্মন।
রথাদি গো গজ বাজী নর নৌকাযান ॥' –(প্র- ০৮)

বাণিজ্য পথের নিরাপত্তা

তৎকালীন বাংলায় বাণিজ্য পথের নিরাপত্তার প্রধান হুমকি ছিল পুর্তগিজ ফিরিঙ্গি হার্মাদ জলদস্যু, মগ জলদস্যু, মারাঠা বর্গি, ডাকাত, লুটেরা ও চোর। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসবের উল্লেখ পাওয়া যায়—

চোর-ডাকাতের আতঙ্ক

'এক দণ্ড সুখ নাই রাজার দরবারে।
চুরি ডাকাতি পূর্ণাবধি রাজার সহরে ॥
মহামদ পাত্রের দয়ার নাহি লেশ।
অবিচারে সকল প্রজাকে দেয় ক্লেশ ॥
নৃপতির দয়া নাই শুন মহাময়।
সরা যেতে চোর ডাকাতের বড় ভয় ॥ –(পৃ- ৭১৮)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালির সামাজিক জীবন

মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ব্যবস্থার একদিকে ছিল ধর্ম তথা শাস্ত্র এবং অন্যদিকে ছিল সামন্ত শাসক। এ দুইয়ের সমন্বয়েই বাংলার সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠেছে। অর্থাৎ ধর্মই ছিল বাংলার ও বাঙালির প্রাণ স্বরূপ। তাই বাঙালি হিন্দু সমাজকে চুতুর্বর্ণীয় প্রথা (ধর্ম, অর্থ, কাম, ও মোক্ষ) চূড়ান্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করতো। এছাড়া বৌদ্ধ পালগণ, ব্রাহ্মণ সেনগণ ও মুসলমান পাঠান-মুঘলগণের শাসন ব্যবস্থায়- বাংলার সমাজ কাঠামোতে এসেছে নানামাত্রিক রূপান্তর তথা পালাবদল। তবে শাস্ত্রের প্রভাব ও সামন্ত শাসকের দৌরাত্ম্য সব শাসনামলেই বিদ্যমান ছিল।

সামন্ত শাসন ব্যবস্থা

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় রাজা বা সম্রাট, সামন্ত রাজা ও জমিদারগণই ছিলেন কৃষক প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক। তাদের মন-মর্জি-ইচ্ছা ও অভিরুচিই ছিল আইন। সামন্ত শাসককে কেন্দ্র করেই জনগণের জীব-যাত্রার মান নির্ভর করতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' গৌড়েশ্বর, রাজা গজপতি (মঙ্গলকোটের), রাজা কালিদাস (বর্ধমানের), রাজা কর্পূরধল (কামরূপের), রাজা হরিপাল (সিমুলার), রাজা বেনু রায় (রমতি নগরের), সামন্তরাজ সোম ঘোষ ও ইছাই ঘোষ (ঢেকুর গড়ের), সামন্তরাজ কর্ণসেন ও লাউসেন (ময়নাগড়ের) এবং মন্ত্রী মহামদকে (গৌড়ের) সামন্ত শাসক

রূপে দেখা যায়। এদের মধ্যে গৌড়েরশ্বর, ইছাই ঘোষ, লাউসেন ও মন্ত্রী মহামদকে সামন্তশাসক হিসেবে বেশি সক্রিয় ও সরব দেখা যায়। মহামদের শোষণ ও কূটচালে গৌড়েশ্বর অনেকটা তার হাতের ক্রীড়ণকে পরিণত হয়ে পড়েছেন। ইছাই ঘোষও বিদ্রোহী সামন্ত শাসক হিসেবে শাসন-শোষণ চালিয়েছেন। শুধু লাউসেনই প্রজাদরদী সামন্ত শাসক হিসেবে ও ধর্মঠাকুরের ভক্ত-সেবক হিসেবে বীর্য-বীরত্ব ও চারিত্রিক মাহাত্ম্যের পরিচয় দিয়েছেন। এ সামন্ত শাসকদের শাসন-শোষণ, স্বভাব ও রাজকীয় রীতি-নীতি, বিধি-বিধান সম্পর্কিত আলোচনা নিম্নরূপ–

রাজ্যাভিষেক

বাংলার সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সিংহাসনের মনোনয়ন বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকলেও সাধারণত জ্যেষ্ঠ যুবরাজ বা রাজপুত্রকে প্রাধান্য দেয়া হতো। তবে এক্ষেত্রে সততা, সুশিক্ষা, আদর্শ, নৈতিকতা ও অভিজাত মহলে গ্রহণযোগ্যতার বিষয়টি গুরুত্ব পেতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লাউসেন ও চিত্রসেনকে নানা আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে রাজপদে অভিষিক্ত হতে দেখা যায়–

ক. 'যশকীর্ত্তি জগতে জাগালে পুন্যবান।
দেশে দেশে প্রজা এসে শুনিয়া আসান ॥
লাউসেনে কর্ণসেন দিল রাজ্যভার।
কর্পূর হইল পাত্র অনুগত তার ॥' –(পৃ-৩৫০)

খ. 'প্রজাগণে প্রবোধ করিল একে একে।
চিত্রসেনে রাজটীকা দিল অভিষেকে ॥' –(পৃ-৭১২)

শাসকের প্রতাপ

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় শাসকের প্রতাপ ও প্রভাব থাকতো সীমাহীন। রাজ্যের সকল কর্মই রাজার অভিমত দ্বারা অনুশাসিত হতো। একজন প্রজার নতুন বসত বাড়ি নির্মাণ, বিয়ে, জমি অধিগ্রহণ এমনকি স্থানান্তর বা দেশত্যাগের ক্ষেত্রেও শাসকের পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন পড়তো। এর চমৎকার চিত্র দেখা যায় শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' গল্পে ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' গৌড়েশ্বরের রাজ ক্ষমতার এরূপ প্রতাপ পরিলক্ষিত হয়। কারণ তিনি শুধু প্রধান শাসক, বিচারক, দেশের মালিক ও জনগণের দণ্ডমুণ্ডেরই মালিক নন, বরং কৃষক প্রজার ঘরবাড়ি নির্মাণ, জমি প্রদান, বিয়ের অনুমতি ও দেশত্যাগের ব্যাপারে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত রূপে গৃহীত হয়েছে। রমতি নগরের তেরো ঘর ডোম সম্প্রদায়ের ময়নাগড়ে যাবার ক্ষেত্রে গৌড়েশ্বরের অনুমতি বা ছাড়পত্রের (passport) প্রয়োজন হয়েছিল___

ক. স্থানান্তরের অনুমতি বা ছাড়পত্র

'শুনিয়া সানন্দে সেন আশ্বাসিত বাণী।
সবে সাজে সত্বরে রাজার আজ্ঞা আনি ॥
এত বলি গেলা রায় রাজ সন্নিধান।
কও কেন এল পুনঃ ভূপতি সুধান ॥
সেন বলে আজ্ঞা কর ডোম তের ঘর।
লোকজন চাই যদি রাখিতে চাকর ॥
দিনু দিনু বলি রাজা দিল লিপি দান।
বিদায় হইল পুনঃ হয়ে নতমান ॥

,,,

আসিয়া কালুকে দিল লিখন পরয়না।
সাজিল সকল ডোম দক্ষিণ ময়না ॥' –(পৃ- ৩৫৭)

খ. সামন্ত শাসকদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন

'শ্রীযুত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম সুভাশী রাশি বিজ্ঞান পত্রে ॥

,,,

পত্র পড়ি সত্বর সিমুলা আস্য রায়।
এখানে সকলি কব শুনিবে সভায় ॥

,,,

যদিস্যাৎ গমনে সিমুলা কর ব্যাজ।
বিধাতা বিমুখ হবে বুঝে কর কাজ ॥
ময়না সাধিব কর ঘোড়া লব কেড়ে।
এ কর্ম্ম ইঙ্গিতে না করে কোন ভেড়ে ॥' –(পৃ–৪৪১)

সামন্ত রাজার শাসন ও শোষণ

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় শাসকগণকে সাধারণত স্বৈরাচারী, অত্যাচরী ও পর-পীড়ক হিসেবে দেখা যায়। আবার অনেক সময় শাসকদের অযোগ্যতা, দুর্বলতা, উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে মন্ত্রী, কতোয়াল, সামন্ত জমিদার ও সৈন্যদের সীমাহীন শোষণ নির্যাতন করতে দখা যায়।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' গৌড়েশ্বরের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মন্ত্রী মহামদ প্রজাদের ওপর শোষণ-জুলুম-অত্যাচার করে কর-খাজনা আদায় করেছে ব্যক্তিস্বার্থে। তার অত্যাচারের মাত্রা এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, প্রজাগণ বাধ্য হয় দেশ ত্যাগ করতে এবং কতিপয় প্রজা নিরুপায় হয়ে গৌড়শ্বেরের কাছে বিচার জানায় এর প্রতিকারের আশায়। গৌড়ের দুঃশাসন ও শোষণে বিপর্যস্ত জন জীবনের অবস্থা দাঁড়ায় নিম্নরূপ–

'অবিচারে ভাঙে রাজ্য গৌড়ের ভুবন।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ ॥

,,,

কেবা আছে অখিলের এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর-দ্বারি ॥

,,,

রাজকর লোকের তেমনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হোলো দেশাছাড়া ॥

,,,

কেহ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রবেশে কামরূপ।

,,,

রাজার আসান শুনি পাত্রের নাবড়ি।
প্রধান জনেক প্রজা কহে কর জুড়ি ॥

বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রীবর।
তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজ কর ॥
তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে ॥
কেবা কোথা করেছে এমন অবিচার।
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্যে খাটায় বেগার ॥
এতপীড়া পাইয়া পালাল প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজার নাহি দিল মন ॥' –(পৃ-৩৫১-৩৫২)

বেগার শ্রম আদায় বা শ্রম শোষণ

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় যুদ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসল কাটা, উৎসবসহ আপদকালীন সময়ে শাসকগণকে জোর করে বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করতেন। অসহায় প্রজাগণের এতে প্রতিবাদ, পলায়ন করার কোন সুযোগ থাকতো না।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' মন্ত্রী মহামদের কূটকৌশলে ধর্মপূজার আয়োজন করতে প্রজার ওপর অতিরিক্ত কর আরোপের পরেও প্রজাকে বেগার শ্রম দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। কেউ যাতে পালাতে বা ফাঁকি দিতে না পারে এর জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়। এছাড়াও রাজার বিভিন্ন অনুষ্ঠান, শিকার, বিয়ে যুদ্ধ ও আপদকালীন সময়ে প্রজাদের এমন বেগার খাটতে দেখা যায়–

'ভরণ ভূষণভাবে খরচ অযুত।
কোথা হৈতে এত ধন করিব মজুত ॥
কত আছে দান ধর্ম্ম অপরঞ্চ দায়।
ভাণ্ডার করিলে শূন্য ভাল নহে রায় ॥
হুকুমে দেহারা তুলি মিছা কেন ব্যয়।
রাজা বলে কর যে তোমার মনে লয় ॥
তবে পাত্র কোটালে হুকুম দিল দড়।
বেগারি কোদাল ঝুড়ি এনে কর জড় ॥
পাত্রের হুকুম পালে বন্দি ইন্দ্রজাল।
বেগারি বিষয়ে বড় বাড়লে জঞ্জাল ॥

,,,

দ্বাদশ কোটাল সঙ্গে ইন্দ্রজাল ধায়।
সহরে বেগার ধরে লাগি যার পায় ॥
তাঁতি তেলি তামলি তৈলঙ্গ তৈলকার।
কৈবর্ত্ত কুজুড়া কানু কামার কুমার ॥
বাইতি বেগারি বেনে বিশেষ বারুই।
কলসী কোদাল কান্ধে বেগারি বিজই ॥
কেহ বা পালাতে পথে দূতে ধরে তেড়ে।
হুড়া মারি হাতাহাতি রাখিয়াছে সাজুড়ে ॥' –(পৃ–৩৫১–৩৫২)

পুত্রহীনের সম্পত্তি গ্রাস

ছয় পুত্র যুদ্ধে মারা যাবার পর ময়নাগড়ের সামন্ত রাজা কর্ণসেন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। কারণ পুত্র না থাকলে গৌড়েশ্বর তার সমুদয় সম্পত্তি কেড়ে নেবেন। তাই অপুত্রক কর্ণসেন রাণী রঞ্জাবতীকে বলেছেন–

‘পুত্রবিনা গৃহ যেন পদ্মপত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল ॥
প্রাণ গেলে প্রথম বাসরে অনাহার।
রাজা লয় যে কিছু সম্পত্তি থাকে তার ॥’ –(পৃ–২৮)

নারী নির্যাতনে উৎসাহ দান

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় যুদ্ধের সঙ্গে নারী ধর্ষণ ও বলাৎকারের প্রসঙ্গটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। কারণ সামন্ত শাসকগণ ভূমি দখল করতে বা প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে জব্দ করতে যে যুদ্ধের আয়োজন করেন, এতে শত্রু পক্ষের মনোবল ভাঙতেই মূলত নারীদের ওপর ধর্ষণ চালানো হতো। এ ধর্ষণই ছিল সামন্তশাসক ও সৈন্যদের প্রধান অস্ত্র। ব্যক্তি লালসা-রিরংসার গুরুত্ব ছিল গৌণ। সামন্তশাসকের স্বৈরাচারী মানসিকতাই এ বিষয়কে উৎসাহ দান করে এসেছে।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ মন্ত্রী মহামদ কৌশলে লাউসেনকে ময়নাগড় থেকে দূরে পাঠিয়ে দেন, প্রায় পুরুষ শূন্য ময়নাগড় আক্রমণ চালালে লখাইয়ের সঙ্গে রানী কলিঙ্গা বীরাঙ্গনা বেশে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এতে মহামদ ক্রুদ্ধ হয়ে নিজের ভাগ্নে বধূ জানার পরেও কলিঙ্গাকে ধর্ষণ-বলাৎকার করতে উৎসাহ দিয়ে বলেছেন–

‘যুবতী যবন মাঝে সেজে আসে কোন কাজে
বুকেতে নাহিক কুল ভয়।
সবে মিলে ধর ধর যে যার বাসনা কর
ও মোর ভাগিনা বধূ নয় ॥’ –(পৃ-৫৪২)

সামন্ত শাসকের ভোগ-বিলাস

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় শাসক বা রাজার মূল লক্ষ্যই থাকতো জমি ও নারীকে ভোগ-দখল করা। কারণ জমি থেকে আসতো শস্য ও অর্থ, আর নারী যোগাতো শরীরী আনন্দ ও বিনোদন। এছাড়া গান-বাজনা, নৃত্য, সেবাদাসী, উপপত্নী, বাদী, মদ-সুরাপান, হেরেমের কামকাতর ও আয়েশী আয়োজন এবং শিকারের মাধ্যমে শাসকগণ ভোগ-বিলাসে মত্ত হতেন।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ গৌড়েশ্বর নিজে দেশ শাসনে আন্তরিক না হয়ে বরং মন্ত্রী ও শ্যালক মহামদের ওপর সর্বাংশে নির্ভর করতেন। এছাড়া শিকার, ভাগবত ও পুরাণ পাঠ-শ্রবণ করে আরাম-আয়েশ ও বিলাসী জীবন যাপনে সময় ব্যয় করতেন। অথচ মন্ত্রীর অত্যাচারে যে প্রজা রাজ্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তা রাজা জানতেই পারেননি–

কর্মে উদাসীনতা

‘ অবিচারে ভাঙে রাজা গৌড়ের ভুবন।
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ ॥
,,,
কেহ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রবেশে কামরূপ ।
প্রজার বিপত্তি এত নাহি জানে ভূপ ॥
,,,
একদিন আইল রাজা করিতে শিকার।
সম্মুখে সোনার পুরী দেখে ছারখার ॥
বাইজ বাজার আর বিশাশয় পাড়া।
বিশেষ সজ্জন লোক দেখে পুরী ছাড়া ॥

দেশের দুর্গতি দেখে দুঃখ ভাবে ভূপ।
পাত্রকে ডাকায়ে কিছু সুধান স্বরূপ ॥
,,,
এত পীড়া পাইয়া পালান প্রজাগণ।
মফস্বলে মহারাজা নাহি দিলে মন ॥' –(পৃ-৩৫১-৩৫২)

রাষ্ট্রীয় অরাজকতা

সমকালীন সামন্তবাদী সমাজে দুঃশাসন, শোষণ, নিপীড়ন ও যুদ্ধ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। রাজ ক্ষমতার উৎস সিংহাসন দখলকে কেন্দ্র করে সামন্ত শাসকদের মধ্যে যুদ্ধ-বিদ্রোহ-বিক্ষোভ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। আবার অর্থ-বিত্তের উৎস হিসেবে ব্যবসায় বাণিজ্য ও ভূমিকে দখল তথা আয়ত্তে রাখতেও জোর-জুলুমের প্রয়োজন হতো। এছাড়া সরকারি আমলা তথা সৈন্য-সামন্তদের অত্যাচার দুর্নীতিতেও প্রজাদের অবস্থা বিপন্ন হতো এবং এতে করে অনেক সময় প্রজারা বসত ভিটা ছেড়ে পালাতে বাধ্য হতো। শাসকশ্রেণির বিলাসিতা, কর্মবিমুখতা ও অযোগ্যতার সুযোগেই মূলত রাষ্ট্রে এমন অরাজকতার সূত্রপাত ঘটতো।
'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' গৌড় যাত্রা পালা অংশে রাজা জাল্লাল শেখরকে তারই প্রতিপালিত পোষা কামদল বাঘ কর্তৃক সিংহাসন থেকে উচ্ছেদ করে রাজক্ষমতা দখল করার ঘটনা মূলত সমকালীন রাষ্ট্রীয় অরাজকতার প্রতীকী ইঙ্গিত বহন করে। এছাড়া গৌড়েশ্বরের শাসন কর্মের উদাসীনতায় মন্ত্রী মহামদে অত্যাচারে অতিষ্ঠিত হয়ে অন্যান্য প্রজাদের মতো কালু ডোমের তেরো ঘর বাসিন্দা নিজ দেশ রমতিনগর ত্যাগ করে ময়নানগরে চলে যায় —

ক. ক্ষমতা দখল জনিত অরাজকতা

'নগরে প্রবেশ করে লাগি যারে পায়।
বলে ছলে ধর‍্যা ধর‍্যা ঘাড় ভাঙ্গে যায় ॥
আশা বৃদ্ধি হল্যা বাঘা ভ্রেমে নাছে নাছে।
তরাসে তরল লোক প্রাণ ওড়ে পাছে ॥
,,,
রাজার সংগ্রামে জিনি সহরে প্রবেশে।
ঠাড় মোড় হল্য লোক তরাসে হুতাশে ॥
হাটিনা বাজার কান্দে কাবারি কুজুরা।
ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে কিবা বাল্য বুড়া ॥
,,,
এইরূপি কোপে তাপে সভারে সংহারি।
ভিতর মহলে চলে মালসাট মারি ॥
রাজপুরে প্রবেশি রাজার পরিবার।
দাস-দাসী আদি যত করিল্যা সংহার ॥
পালঙ্কে বসিয়া যায় রাজার যুবতী।
ভূপতি পালাল্য পেয়্যা প্রবল দুর্গতি ॥
,,,
অভয়া আশীষে বাঘা রাজা হল্য পাটে ॥' –(পৃ-২২৪-২২৫)

খ. প্রজাদের দেশ ত্যাগ

'অবিচারে ভাঙ্গে রাজ্য গৌড়ের ভুবন।
পীড়া পেয়ে পাত্রের (মন্ত্রীর) পলায় প্রজাগণ ॥

,,,

কেবা আছে অখিলের এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর দ্বারি ॥

,,,

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষয়ে বঞ্চিত।
বিবরে বলিব কত পাত্রের দুর্নীতি ॥
রাজকর লোকের তেমনি নিল কড়া।
অতেব সকল প্রজা হোলো দেশ ছাড়া ॥
সেনের আসানে কত আসিছে ময়না।
নীলাচল উৎকল আশ্রয়ে কত জনা ॥
কেহ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রবেশে কামরূপ।
প্রজার বিপত্তি এত নাহি জানে ভূপ ॥ −(পৃ-৩৫১)

যুদ্ধ ও সামাজিক নিরাপত্তা

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় যুদ্ধ-হাঙ্গামা ছিল আবশ্যিক বিষয়। ভূমি ও নারী দখলকে কেন্দ্র করে সাধারণত এ যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতো। এছাড়া প্রতিবেশি রাজার শত্রুতা, সামন্তরাজদের বিদ্রোহ, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা এবং নিজের শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করতেও যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটতো। এতে করে শুধু সামন্ত শাসকের খোয়াল-খুশির দাবি মেটাতে গিয়েই সাধারণ প্রজার জীবনে নিমেষেই নেমে আসতো যুদ্ধজনিত অভিশাপ ও মহাবিপর্যয়। তৎকালীন সমাজ জীবনে নিরাপত্তার কোন স্থায়িত্ব ছিল না বললেই চলে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' সিমুলার রাজা হরিপালের বিরুদ্ধে, ঢেকুরগড়ের ইছাইয়ের বিরুদ্ধে ও লাউসেনের ময়নাগড়ে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তাতে করে জনজীবনে বিপর্যয় ও দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে —

যুদ্ধজনিত বিপর্যয়

'সহরে সকল প্রজা হলা হুলস্থূল।
প্রমাদে পড়িয়া কেহ নাহি বান্ধে চুল ॥
ধন কড়ি ধান্য কেহ রাখে খুলি কুড়্যা।
সভয় সকল প্রজা ষোল ক্রোশ জুড়্যা ॥
মেষ গরু অজা অধি কেহ করে বই।
কেহ বলে দুষ্কর লস্কর আইল অই ॥

,,,

কেহ বলে খুড়া মলো কেহ বলে জেঠা।
কেহ গায় গুণের জামাই গেল কাটা ॥
ভাই বলে ফুকারিয়া কেহ কেহ কাঁদে।
বিধাতা বিমুখ বড়ো বুক নাহি বাঁধে ॥

,,,

কাটা গেল হেথা যত হাতী ঘোড়া নর।
ছট্‌ফট্ করে কেহ গেছে যমঘর ॥
হাত পা কেটেছে কারো অর্দ্ধ শির কান।
আঁতটা বাহির করি কেহ খাবি খান ॥

শেল বুকে মরে কেহ কাটা গেছে আধা।
রণ ভূমি রুধির রপটে মহী কাদা ॥
সৌরভে সকল শিবা মরা গন্ধে ধায়।
কেহ ফড়াটানে কেহ আঁতখুলে যায় ॥

,,,

সারা রাত্রি শৃগাল কুকুরে রহে দ্বন্দ্ব ॥
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী চর্ম্ম চীল।
আসিতে না পায় দিশা নিশা অর্দ্ধশীল ॥ –(পৃ-৬১৪-৬১৫)

দেশপ্রেম

দেশপ্রেম সামন্ত শাসন ব্যবস্থার এক গৌরবোজ্জ্বল দিক। দেশ বা রাজাকে স্বাধীন রাখতে অথবা দেশকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করতে শাসকের যে বীরত্ব, শৌর্য-বীর্যের প্রয়াস দেখা যায়, তা সমকালীন প্রেক্ষাপটে সত্যিই প্রশংসনীয়। একজন সৎ ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের দেশপ্রেম তার জাতিকে গৌরব ও সমৃদ্ধির চূড়ায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' দেশের প্রতি প্রেম ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়েছে কালুর স্ত্রী লখাই, পুত্র শাকা ও শুকা এবং লাউসেনের স্ত্রী কলিঙ্গা ও কানড়া। লখাই শত্রুর হাত থেকে দেশ ময়নাগড়কে রক্ষার জন্য দেশবাসীকে যুদ্ধে উজ্জীবিত করেছে, পুত্রদের যুদ্ধে পাঠিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে এবং নিজে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে। কলিঙ্গা ও কানড়ার বীরত্ব, সাহস ও শৌর্য-বীর্য দেশ প্রেমের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে —

ক. লখাইয়ের বীরাঙ্গনা মূর্তি

'একাকী রাখিব পুরী রণে দিব হানা।
একা যুদ্ধে জিনে যেয়ে জাগাব ময়না ॥
ঠায় ঠায় ডোমনী সবারে ধরে কাটে।
শত শত সেনায় সংহারে ফলাসাটে ॥- (পৃ-৬০৭-৬০৯)

খ. লখাইয়ের দেশপ্রেমে অনুপ্রেরণা

'আজি মর কিবা মরণ বর্ষ শতে।
অবশ্য মরণ আছে জন্মিলে জগতে ॥
সম্মুখ সমরে মলে স্বর্গে চলে যাবে।
পরিণামে প্রভুর পরম পদ পাবে ॥
এত বলী কপাল ধেয়ানে ধনি ধায়।
নগরে যতেক লোক ডাকিয়া জাগায় ॥
জাগরে নগরে লোক যামিনী বিষম।
রাতে হানা দিল গড়ে গৌড়ের অধম ॥
ডরে না ডরাও কেহ ডেকে ডেকে কই।
এ কারণে তাড়ায়ে করেছি নদী বই ॥
মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।
তু বেটা তখনি তবে হয়ে না মরিলি ॥
যুবতী যৌবন রসে জীবনের আশ।
জননী বিকল কাঁদে মনে নাই ত্রাস ॥' -(পৃ-৬২১-৬২৩)

গ. কলিঙ্গার বীরাঙ্গনা মূর্তি

‘শুন দুষ্ট নরাধম ভাঙ্গিলি আপন ভ্রম
আমি কর্পূরধলের দুহিতা।
সাক্ষাৎ সম্বন্ধ কই তোর ভাগিনাবধূ হই
সেন মহাশয়ের বনিতা ॥
কহে নারী মহারুষ্ট হেদে রে চণ্ডাল দুষ্ট
কি কহিলি কথা পাপরুচি।
এত বলি রোষে রণে রাহুত মাহুত সনে
হাতী ঘোড়া করে কুচি কুচি ॥’ -(পৃ-৬৪২)

দাস-দাসী প্রথা

সামন্ত শাসন ব্যবস্থার সবচেয়ে অমানবিক ও অবমাননাকর পদ্ধতি হলো দাস প্রথা। প্রাচীনকাল থেকেই যুদ্ধবন্দী হিসেবে, ক্রয়সূত্রে, উপহার বা দান বা যৌতুক হিসেবে, সেবাদাসী সূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে এসব ক্রীতদাস বা শ্রম দাস সংগ্রহ করা হতো। ভারতবর্ষ তথা বাংলায় এসব দাস-দাসীদের কৃষি, গৃহভৃত্য ও সৈন্য বাহিনীতে নিয়োগ করা হতো।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ লাউসেন কলিঙ্গা ও কানড়ার বিয়ের সময় গৃহভৃত্য পর্যায়ের দাস-দাসীর উল্লেখপাওয়া যায়। এছাড়া কানড়ার দাসী ধুমসীর চলাফেরা ও বীরাঙ্গনা মূর্তি, তাকে ঠিক দাসীতে সীমিত না রেখে বরং সখীতে পরিণত করেছে–

ক. ‘চৌদলে চাপিল রায় দম্পতি সহিত।
দাসদাসী বীরগণ চৌদিগে বেষ্টিত ॥’ -(পৃ-৪০৫)

খ. ‘সুখদ শিবিকা চাপি রাজ পুরোহিত।
চৌদিকে চলিল ভারী নফরে বেষ্টিত ॥’ -(পৃ-৪১৫)

বৃত্তিজীবী বা বর্ণজীবী সম্প্রদায়

বাংলা ও বাঙালির সমাজ কাঠামো বর্ণ ও বৃত্তির ওপর আশ্রয় করেই গড়ে ওঠেছে। বর্ণ বিন্যাস ও শ্রেণি বিন্যাস প্রায় একই মাপকাঠিতে বাঁধা ছিল। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রেই অনেকের বংশীয় বৃত্তি বা পেশাকে বরণ করে নিতে হতো। কারণ বাঙালি হিন্দু সমাজে বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণ নির্ভর। আর বর্ণ ছিল জন্ম নির্ভর। এ বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে আবার সামাজিক সম্মানও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল।

বাঙালি চতুর্বর্নীয় সমাজে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছাড়াও বহু বর্ণ ও উপবর্ণের উল্লেখপাওয়া যায়। এদের মধ্যে অন্ত্যজ-অসম্পৃশ্য বা ব্রাত্য শ্রেণি বলে উল্লেখকরা হয়, যারা মূল সমাজের স্রোতধারার বাইরে অবস্থান করে এবং যাদের ন্যূনতম সামাজিক মর্যাদা নেই। স্বাভাবিকভাবে গোটা সমাজে যে সকল বৃত্তিজীবীর উল্লেখপাওয়া যায়, এরা হলো— ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, পণ্ডিত, কবিরাজ, জ্যোতিষী, বৈদ্য, ওঝা, ঘটক, কাজি, মোল্লা, বণিক, কৃষক, গোয়াল, কামার, কুমার, তাঁতি, তেলি, স্বর্ণকার, গন্ধবণিক, জেলে, ধোপা, ছুতার, কাঠুরে, মালাকার, বাইতি, ডোম, বাগদী, হাড়ি, চোর, ডাকাত, বাইজি, বারাঙ্গনা অন্যতম।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ এসব বৃত্তিজীবী শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায় —

‘তাঁতি তেলি তামলি তৈলঙ্গ তৈলকার।
কৈবর্ত্ত কুজুড়া কানু কামার কুমার ॥
বাইতি বেগারি বেণে বিশেষ বারুই।
কলসী কোদাল কান্ধে বেগারি বিজই ॥

ব্রাহ্মণ সজ্জন ভয়ে লুকাইল কোণে ॥
ব্রহ্মচারী ভিখারী ফকিরে করে মজা।
কত কাষ্ঠ কাটে তক্ষ বেগারী কামিলা।
করাতে কাটিয়া কাষ্ঠ বরগা তুলিলা ॥' -(পৃ-৫৫২)

ব্রাহ্মণ

সাধারণত বাঙালি হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণগণই সর্বোচ্চ সামাজিক সম্মান, ক্ষমতা ভোগ করে থাকেন। ধর্মীয় ও সামাজিক স্বীকৃতি থাকায় এ ব্রাহ্মণগণ সাধারণ মানুষের কাছে দেবতার মতো ভক্তি, শ্রদ্ধা, সম্মান পেতেন। পেশা হিসেবে ব্রাহ্মণগণ পুরোহিত, রাজ উপদেষ্টা, পণ্ডিত বা অধ্যাপক, জ্যোতিষী বা গণক, ওঝা বা বৈদ্য ঘটকালী ও সমাজ বিধায়কের পদকে অলংকৃত করে থাকেন। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এর পরিচয় পাওয়া যায় —

রাজার উপদেষ্টা ব্রাহ্মণ

'বার দিয়া ভূপতি বসেছে ভব্যমনে।
নানা রত্ন বিরাজিত বিচিত্র আসনে ॥
অতুল রাতুল ভোট ভালে দিব্য ফোঁটা।
সম্মুখে সাক্ষাত সূর্য্য বসে বিপ্র ঘটা ॥' -(পৃ-৩২৭)

পুরোহিত ব্রাহ্মণ

'বেদ গান বিপ্রগণ করে উচ্চৈঃ স্বরে ॥
লাজ হোম করে দিল ঘৃতের আহুতি।
বর কন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী ॥
সমাপন সব কর্ম্ম বেদে অনুসারে।
ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে ॥
দ্বিজগণে তুষি ধনে নতবান রায়।
ব্রাহ্মণে আশীষ দিল বিভা হল সায় ॥' -(পৃ-৫৩)

পণ্ডিত বা অধ্যাপক ব্রাহ্মণ

'পণ্ডিত বলেন ত্যজ ও ভয় ভাবনা।
মরিলে জীয়াবে ধর্ম্ম পুরিবে বাসনা ॥' -(পৃ-৬৪)

জ্যোতিষী বা গণক ব্রাহ্মণ

'গ্রহবিপ্র গুড়ি গুড়ি প্রবেশি রাজার বাড়ি
খুড়ি খুড়ি বলি ঘন ডাকে।
পঞ্জিকা সম্প্রতি শুন গণনা করিব পুনঃ
আজিপুত্র পাইবে ত্বরিত ॥
মায়াধারী গ্রহবিপ্র ঈষৎ হাসিয়া ক্ষিপ্র
খড়ি পাতি করিছে গণনা ॥' -(পৃ-১৩৬)

ঘটক ব্রাহ্মণ

'ঘটক ব্যাপক বড় ভট্ট জাতি তায়।

হাত নাড়া দিয়া বলে রাজার সভায় ৷'- (পৃ-৪১৬)

দরিদ্র বা দানগ্রহিতা ব্রাহ্মণ

'চিন্তিয়া পুত্রের ক্ষেম মহারাজ কত হেম
দুঃখী দ্বিজ দেখি দিল দান ৷' (পৃ-১১৯)

ওঝা-বৈদ্য

'রাত্রে করে মানুষ দিবসে করে অজা।
রাণী বলে দূর কর হেন ছার ওঝা ৷' -(পৃ-১৮১)

মণ্ডল

'মণ্ডল বলেন আজ্ঞা হল যে তোমার।
তিন দিনে তেরো ফলা করাব তয়্যার ৷' -(পৃ-১৬৮)

মহাজন

'ঘটি বাটি থালা বন্ধকে বিকিলা
কলুর কড়ির শোধে ৷' -(পৃ-২৫৯)

কৃষক

'সুখবাসী চাষী কিবা প্রবাসী চাকর।
নয়নে নিদাটী লেগে নিদ্রায় কাতর ৷' -(পৃ-৫৯১)

ব্যাধ বা শিকারী

'বারতা পাইয়া বারজন ব্যাধ ধায়।
জোহার করেন আসি ভূপতির পায় ৷' -(পৃ-২১৬)

জেলে

'দৈবাধীন সেই মৎস্য ধরয়ে ধীবরে।
সন্তোষ সঁপিলা সেই শম্বরের ঘরে ৷' -(পৃ-১৩৪)

মালি

'প্রবেশ করিলা সেন মধ্য গোলাহাটে।
প্রথমে মালিনী সঙ্গে দেখা রাজবাটে ৷
সুরিক্ষা ভেটিতে যায় লয়ে মালা ফুল।' -(পৃ-২৮১)

কামার

'তিন দিনে তেরো ফলা করাব তয়্যার ৷
এত বলি ধর্ম্মদাস কর্ম্মী কর্ম্মকারে।
আনায়্যা রাজার কাছে ভার দিল তারে ৷' -(পৃ-১৬৮)

গোয়াল

'অন্য থাক ঢেকুরে ইছাই হৈল বীর।
নিঠুর গোয়ালা বেটা করেছে ফকীর ৷' -(পৃ-১৪১)

কলু বা তেলি

'ঘটি বাটি থালা বন্ধকে বিকিলা

কলুর কড়ির শোধে।' -(পৃ-২৫৯)

ধোপা

'ন বুড়ি বুড়ীর করি মজিল শোলায়।
দেড় বুড়ি দিয়ে ধরে ধুবিনীর পায় ॥' -(পৃ-২৮৪)

কাবারি

'হাটিনা বাজার কান্দে কাবারি কুজুড়া।
ধরে ধরে ঘাড় ভাঙ্গে কিবা বাল্য বুড়া ॥' -(পৃ-২২৪)

দোকানী

'নিদ্রা যায় দোকানী দোকান নাহি তুলে।
ঘোর ঘুমে তাঁত গাড়ে তাঁতী পড়ে ঢুলে ॥' -(পৃ-৫৯২)

নাপিত

'রাণী সবিনয়ে ভাষে নাপিত নৃসিংহ দাসে
রজক রাজীবে দিল পাতি।' -(পৃ-১১৯)

বারুই

'কলসী রাখিয়া রামা পিয়ে পুষ্প মধু মৌ।
নয়ানী শিবাই দত্ত বারুয়ের বৌ ॥' –(পৃ-২৬০)

বাইতি বা ঢুলি

'সেন বলে মোর সাক্ষী প্রভু পরাৎপর।
অপরঞ্চ প্রমাণ বাইতি হরিহর ॥
কত কষ্ট পাব নিত্য কাঁধে বহে ঢাক।' -(পৃ-৬৯২)

তাঁতী

'তরাসেতে তাঁতির তনয় তাঁত গাড়ে।
লুকাইতে লাফ দিয়া বাঘা ধরে ঘাড়ে ॥' -(পৃ-২২৪)

মাঝি

'প্রবেশে ভৈরবী গঙ্গা কত দূর যেয়ে।
বিনা করে সমাদরে পার করে নেয়ে ॥' -(পৃ-৩১২)

দারোয়ান

'এত শুনি পঞ্চাশ কাহন চায় দারী।
দারীরে ভুলান সেন করিয়া চাতুরী ॥' -(পৃ-২৮৯)

মাহুত

'শুনি গদা মাহুত মালিক পাট হাতী।
প্রবাসী শিয়রে বান্ধে নিশাবাগে রাতি ॥' -(পৃ-৩২২)

রাহুত

'হাতী ঘোড়া রাউত মাহুত যূথে যূথ।
দেখিলে পরাণ উড়ে যেন যমদূত ॥' -(পৃ-৪২৬)

মদক

'প্রাণ লইয়া পালাইল মদক ভবনে।
লুকাতে আশ্রয় খোঁজে অন্ধকার কোণে ॥' -(পৃ-৩২৩)

ভিক্ষুক সন্ন্যাসী বা যোগী

'বলগা বিশেষ বাক্য ভূপতির আগে।
বারণাসী নিবাসী সন্ন্যাসী ভিক্ষা মাগে ॥
যোগীর জঞ্জাল নাহি ছাড়ে এক তিল।' -(পৃ-২২০)

হাড়ি

'জিজ্ঞাসিতে রমাই পণ্ডিত দিল সায়।
ইছা রাণা হাড়িকে তখন কয় রায় ॥' -(পৃ-৫৭৫)

ডোম

'পেরুল সহর গৌড় প্রবেশে রমতি।
পথে দেখা হৈল কালু ডোমের সংহতি ॥
রমতি আশ্রিত মোরা আছি ঘর তের।
বৃত্তি বেচে খাই যে চাকর নহি কার ॥' -(পৃ-৩৪৬)

শুড়ি

'সাজি সবে আনন্দে অনেক আয়োজনে।
সুরা হেতু গেল সবে শুড়ির সদনে ॥' -(পৃ-৫৯৯)

নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান

মধ্যযুগের সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক মান-মর্যাদা-সম্মন ও অবস্থান যে মোটেও সখুকর ছিল না– তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে ধর্মীয় ও সামাজিক শাসন- শোষণের মাধ্যমে নারীকে কার্যত ভোগের সামগ্রী ও অবরোধবাসিনীতে পরিণত করে রেখেছিল। পুরুষের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ হলো নারীর দুই সম্পদরূপ ও যৌবন। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে এ রূপ ও যৌবনই নারীর জন্য শত্রু বা কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ জন্যই নারীকে চরম অপমান ও আক্রমণের শিকার হতে হয়। পুত্র সন্তানের জন্মদান ব্যতিত পুরুষের সমাজে নারীর তেমন কোন সম্মান বা মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং নারীর ব্যক্তিত্বকে অবমাননা করতে সমাজে প্রচলন করা হয়েছিল বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ ও সহমরণ প্রথার। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

বহুবিবাহ

তৎকালী বাঙালি সমাজে কৌলিন্য প্রথার দাপটে পুরুষের বহু বিবাহ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। শুধু ধনী বা বিত্তবান শ্রেণি নয়, বরং দরিদ্র জনসাধারণও রিরংসার তাড়নায় ও দান সামগ্রীর লোভে এ বহুবিবাহ নামক বিবাহ ব্যবসায় মেতে উঠে। স্বামীর একাধিক বিবাহে নারীর প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ ছিল না।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লাউসেনকে ৪ বিয়ে (কলিঙ্গা, বিমলা, অমলা ও কানড়া) ও কালু ডোমকে ২ বিয়ে (লখাই ও সনকা) করতে দেখা যায় —

ক. লাউসেনের বহুবিবাহ

'কৌতুকে কামিনী কন্যা কলিঙ্গার সই।
কপালে চন্দন দিয়া পায়ে ঢালে দই ॥
বেদের বিধানে রাজা মন্ত্র উচ্চরিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা সেনে দিল সমপিয়া ॥
বেদের বিধান মত অতি শভক্ষণে।

অর্চিয়া অমলা কন্যা দিল লাউসেনে ॥
তবে রাজা আনন্দিত বেদের বিধানে।
বিধুমুখী বিমলা বিবাহ দিল সেনে ॥' -(পৃ-৪০০-৪০৮)
গুণবতী কানড়া আমার প্রিয় ঝি।
তুমি হইলে জামাতা ইহার পর কি ॥'- (পৃ-৪৭০)

বাল্যবিবাহ

তৎকালীন বাঙালি সমাজে কৌলিন্য প্রথার ফলে বাল্যবিবাহ ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। শাস্ত্রাচারের মাধ্যমে প্রচার করা হয় গৌরীদানের অক্ষয় স্বর্গলাভ ও অশেষ পুণ্যের মাহাত্ম্য গাথা। অর্থাৎ গৌরী (৮ বছর বয়সী), রোহিণী (৯ বছর বয়সী) ও কুমারী (১০ বছর বয়সী) মেয়ের বিবাহ দানকে সমাজে ব্রাহ্মণগণ নানাভাবে প্ররোচনা দিতেন। এতে করে কুলীন পাত্রের কদর ও মর্যাদা বেড়ে যায় এবং ১০-১২ বছর বয়সের মধ্যেই মেয়ের বিবাহের তাড়া থেকেই বরপণ বা যৌতুক সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়। এর ফলে বালিকা কন্যার জীবন ও তার পরিবার বিপর্যয়ের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়ে পড়ে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বৃদ্ধ সামন্ত রাজা কর্ণসেনের সঙ্গে বিয়ে দেয়া হয় ১২ বছর বয়সী গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীকে। ১২ বছরের অবিবাহিতা রঞ্জাবতীকে দেখে গৌড়রাজ উদগ্রীব হয়ে শ্যালিকার বিয়ে ঠিক করতে গিয়ে বলেন —

'রাণীকে ডাকিয়ে রাজা বুঝান বিরল ॥
সম্প্রতি সম্বন্ধ বাক্য শন সীমন্তিনী।
অবিবাহিত এত বড় তোমার ভগিনী ॥
রায় কর্ণসেনে বিভা দিব রঞ্জাবতী।
এতৎ সম্বন্ধে যদি দেহ অনুমতি ॥
রঞ্জার বয়স এই সেই মহাকুল।
এই হেতু ভাবিয়াছি সব সুপ্রতুল ॥
বয়স বছর বার বন্ধ্যা বলি হেলে।
প্রাণনাথে সভায় বিন্ধেছে বাকশেলে ॥' -(পৃ-৪৭-৬৩)

সতীদাহ বা সহমরণ প্রথা

তৎকালীন সামন্তবাদী বাঙালি সমাজে সতীদাহ বা সহমরণ নামক একটি জঘন্য, পাশবিক ও অমানবিক প্রথা প্রচলিত ছিল। কোন কারণে স্ত্রীর পূর্বে স্বামী মারা গেলে সেই স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় স্ত্রীকেও স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিতে হতো। স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জনকারী নারীকে 'সতী' বলে সমাজ বাহবা দিতো। অথচ এ সতীদাহ প্রথার জন্য মূলত বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ অনেকাংশেই দায়ী। সমাজে পুরুষ অভিভাবকগণ সমাজ ও বংশের কুল-মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতেই মূলত নারীকে অশেষ পুণ্যের কথা বলে আগুনে পুড়ে মারার এ কৌশল বাৎলে দিয়েছিল। নারীর কামনা-বাসনাকে জোর করে অবদমন করতেই এ বিধান জারি করা হয়েছিল।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' ইছাই ঘোষের ছয় পুত্রের মৃত্যুতে ছয় বিধবা পুত্রবধূ সহমৃতা হয়েছে। আবার মন্ত্রী মহামদের চক্রান্তে লাউসেনের মায়ামণ্ড দেখে তার ৪ স্ত্রীও সহমরণের প্রস্তুতি নিয়োছিল, যা ধর্ম ঠাকুরের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়–

কর্ণসেনের ছয় পুত্রবধূর সহমরণ

'ধুলায় লোটায়ে কান্দে শিরে ভাঙ্গে হাঁড়ি।
কেমনে দেখিব ঘরে ছয় বধূ বাঁড়ী ॥
স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা।
চিন্তানলে ছয়বধূ হৈল অনুমৃতা ॥' -(পৃ-৪৪)

নারীর জীবন বাস্তবতা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে নারীর জীবন ছিল অত্যন্ত রূঢ়, কঠোর ও পুরুষতান্ত্রিক সমাজের নিষ্পেষণে অসহায় তথা নির্বাক। নারীকে স্বামী, সন্তান ও সংসারের দায়ভার বহন করতে হতো এবং এর জন্য সকল অন্যায় অপবাদ মুখ বুজে সহ্য করতে হতো। মা-বাবা, ভাই-বোন ছেড়ে শুধু নারীত্বের বিকাশ ঘটাতেই নারী স্বামী গৃহের অবমাননাকর পরিস্থিতি মেনে নিতে বাধ্য হতো। সার্বিকভাবে নারীর জীবন মোটেও সুখকর ও নির্ঝঞ্ঝাট ছিল না।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতীর বিয়ের সময় নারীর পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পতিগৃহে গমনের বিষয়, স্বজনহীন অবস্থা, পুত্র সন্তানের জন্য আত্মবির্সজনের সাধনা করেছেন। অন্যদিকে নটীরূপী দেবী দুর্গার কথাতেও নারীর দাম্পত্য জীবনের রূঢ় বাস্তবতার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে —

ক. নারীর দাম্পত্য জীবনের রূঢ়তা

'শুনি কৃতাঞ্জলি রঞ্জা কন ধীরে ধীরে।
মহারাজ বিস্তৃত না হবে অভাগীরে ॥
পিতামাতা বৃদ্ধ বাসে প্রবাসেতে ভাই।
যাঁরে সমার্পিয়া দিলে তাঁর সঙ্গে যাই ॥
ঘরে একেশ্বরী হবে স্বামী বালাভোলা।
ননদী সতিনী নাই বচনের জ্বালা ॥' -(পৃ-৫৪)

খ. নারীর পুত্রের দায়

'আমা সম সংসারে নাহিক অভাগিনী।
বিদীর্ণ করেছে বুক সোদরের বাণী ॥
বয়স বছর বার বন্ধ্যা বলি হেলে।
প্রাণনাথে সভায় বিন্ধেছে বাক্‌শালে ॥
সেই অগ্নি উঠে নিত্য অন্ন নাহি রুচে।
কানা খোঁড়া পুত্র হোক তবু দুঃখ ঘুচে ॥
অনুগ্রহ কর প্রভু শালে দিব ভর।
অর্ঘ্য করে গ্রহণ ঠাকুর দিবাকর ॥
পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিতে ধ্যায় ধর্ম্মরূপ।
ঝুপ করে ঝাঁপ দিতে শব্দ উঠে ঝুপ ॥
বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল ফার।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্ত ধার ॥' -(পৃ-৬৩-৯৮)

গ. নারীর সতীন যন্ত্রণা

'মমতা না করে পিতা পাষাণ শরীর।
সতিনী চপলা আর কি করিব পতির ॥' -(পৃ-১৬১)

নারীর জীবন বঞ্চনা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে নারী জীবনের বঞ্চনা, অতৃপ্তি, ব্যর্থতা ও স্বপ্ন ভঙ্গের কোন সীমা ছিল না। কারণ নারীর কোন মতামতের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতো না, এমনি কী বিবাহের মতো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়েও তার মন-মর্জির দিকে তোয়াক্কা না করে পুরুষ অভিভাবকগণ বিবাহ দিয়ে দিতেন। এতে করে একজন নারীর জীবনের সকল স্বপ্ন-বাসনা, চাওয়া-পাওয়া নিমেষেই ধূলিস্যাৎ হয়ে যেতো। পছন্দসই জীবন সঙ্গিনীর অভাবে মানসিক ও দৈহিক প্রশান্তি বঞ্চিত এসব নারীরা প্রায়ই পাপ-পঙ্কে নিমজ্জিত হতো ––

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' নারী জীবনের এ প্রতীকারহীন বঞ্চনা –– অতৃপ্তির প্রমাণ মেলে নয়ানীর প্রেম নিবেদনে, ভাজন বুড়ির সাজ-সজ্জার ব্যর্থ প্রাণান্তকর প্রয়াসে এবং অমলা-বিমলা-হীরা-কলাবতী ও সাঙ্গাতিনীর মতো গ্রাম্য নারীদের পতি নিন্দার মধ্য দিয়ে ––

নারীদের জীবন বঞ্চনা

বিমলা –– 'পতি অতিশয় বুড়া
দুর্দ্দিনের কালে ফেলাইল জলে
টিটে শোকা মোর খুড়া ॥

সাঙ্গাতিনী –– স্বামীটা বিদেশী মোর।
যে যে থাকে দূরে তবে নাকি মোরে
লোকে বলে ভাতার খোর ॥

কলাবতী –– বলে কলাবতী নারী।
সেবি স্বামী অন্ধ সদা করে স্ক্রন্ধ
ভোজন কালে খুমারি ॥

শীলা –– মোর দুঃখ শুন সই।
স্বামীটা অবোধ পায়ে কুড়া গোদ
অনেক দুঃখেতে কই ॥

হীরা –– হীরা বলে অবা হাবা গোবা বোবা
বিধাতা ঘটাল গোচর।
সেবি সেই স্বামী বোবা হই আমি
কথা কহি ঠারে ঠোরে ॥

অন্যান্য নারী– কেহ কহে আলো তোর ভর্ত্তা ভাল
বচন শুনিতে পায়।
মোর পতি বুড়া কালা কানা খোঁড়া
খেপা টিপেশোকা তায় ॥
বামা বাবী রটে স্বামী যুবা বটে
কিন্তু সে জীয়ন্তে মরা।' -(পৃ-২৫৮-২৫৯)

নারীর কর্মক্ষেত্র

তৎকালীন বাঙালি সমাজের কতিপয় নারীরা ছিলেন কিছুটা স্বাধীন, কর্মমুখর ও অর্থ উপার্জনকারী। যদিও সমাজের মূলধারার নারীদের তুলোনায় এদের সংখ্যা বা অনুপাত ছিল যৎ সামান্য। তথাপি তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষাপটে এসব ধাত্রী বাদাই, ডোমনী, পাটুনি, নর্তকী, মালিনী, বীরাঙ্গনা নারীদের উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যের ইঙ্গিত বহন করে।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় —

ক. ধাত্রী বা দাই

'ছেদন করিয়া নাড়ী সপুরট পাট সাড়ী
ধাত্রী পাইল কতেক সম্মান।' -(পৃ-১১৯)

খ. নর্তকী

'অশেষ বিশেষ করি লাসবেশ
নাচিতে চলিলা নটী।
তান মান তান আরম্ভিল গান
মূর্ত্তিমান ছয় রাগ।
রাগিণীর গতি বুঝি অম্বুবতী
নাটে বাড়ে অনুরাগ ॥' -(পৃ-২৩)

গ. মালিনী

'প্রবেশ করিল সেন মধ্য গোলাহাটে।
প্রথমে মালিনী সঙ্গে দেখা রাজবাটে ॥
সুরিক্ষা ভেটিতে যায় লয়ে মালা ফুল।' -(পৃ-২৮১)

ঘ. ডোমনী

'বিবাহ বাসরে সবে স্বামী বলে জানি।
দুখে গেল গতর গায়ের রক্ত পানি ॥
ভাল মন্দ নাহি জানি ভাতারের ভাত ।
ঝুড়ি পেড়ি চুপড়ী বুনিতে গেল হাত ॥' -(পৃ-৬২২)

ঙ. বারাঙ্গনা

'বেশ্যার বচন বুক মুখ নয় খাট।
সেন বলে কেমন ভাড়ায়ে যাই ঝাট ॥
দড় দড় বিবাদ বাধাল যদি চেড়ী।
রায় বলে পথ ছাড় বুঝে দিব কড়ি ॥
শুনিয়া সুরিক্ষা বলে ধরে লয়ে চল।
শুনি সেনে বেড়ে যত নাগর সকল ॥
এত বিল সুরিক্ষা সহিত দুই রায়।
নাগরে বেষ্টিত নটী নিকেতনে যায় ॥' -(পৃ-২৯১)

নারীর প্রতিবাদী সত্তা

মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজে শুধু পুত্র সন্তানের 'জননী' ব্যতিত নারীর তেমন কোন সম্মানজনক স্থান ছিল না। হিন্দু ও মুসলিম সমাজ-ধর্মে জননীর ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদনে উদার হলেও কন্যা, জায়া ও জননীর সামাজিক অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বেশি উদাসীন ও নির্বিকার। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মের অবরোধ, আগ্রাসন, দমন-

পীড়নের মধ্যে থেকেও কোন কোন নারীকে প্রতিবাদী ও বিদ্রোহী হতো দেখা যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে কতিপয় নারীর এ প্রতিবাদ যদিও সবল হয়ে দানা বাঁধতে পাড়েনি, তথাপি নারী কণ্ঠের এ সোচ্চার সরব ও সত্তাসন্ধানী প্রবণতা সমাজ ও সমাজ অভিভাবক পুরুষের ভীতকে কাঁপিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব চিত্রের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় —

ক. লখাইয়ের ব্যক্তিসত্তার জাগরণ

'বেদে বলে বনিতা বিশেষ বাম অঙ্গ।
সত্য বটে সম্পদে বিপদে নয় সঙ্গ ॥
বলিতে বলিতে বাড়ে অভিমান ক্রোধ।
প্রসবে প্রসবে টুটে অবলার বল।
পুরুষে ওসব কথা বুঝিতে বিরল ॥' -(পৃ-৫৯৬)

খ. কানড়ার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও বরবরণ

'কানড়া কুমারী ইচ্ছাবতী।
জিজ্ঞাসা করহ ধন্যা কুলকামিনী কন্যা
কামনা কর্য্যাছে কোন পতি ॥
জ্ঞানবতী সতী সাধ্বী কন্যা নহে কারো বাধ্যি
কানড়া কুমারী জাতিস্মরা।
বিধাতা নিববন্ধ গতি মনে আছে প্রাণপতি
লাউসেনে হব স্বয়ম্বরা ॥
এতক্ষণ মনের মরম শুন তাত।
ময়না মণ্ডল পতি মোর প্রাণনাথ ॥'- (পৃ-৪১৯-৪২৯)

সমাজ শাসন

বাঙালি সমাজ বহুকাল ধরেই শাসিত হয়ে আসছে পুরুষগোষ্ঠী ও তাদের তৈরি শাস্ত্র দ্বারা। সমাজের অভিভাবক এ পুরুষগোষ্ঠী তাদের মর্জি মতো ধর্ম ও সমাজকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে নারীর ওপর তুলেছে খড়গহস্ত। নারীর সামগ্রিক জীবনের ওপর পুরুষতান্ত্রিক সমাজ শাসন ও শোষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্পেষণ চালিয়েছে। নারীর ব্যক্তিসত্তা কোন মূল্য বা সহানুভূতি পায়নি এ সমাজের কাছে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এর চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে —

নারীর চলাফেরায় নিয়ন্ত্রণ

'বচন রাখিয়া যাও আপনার বাস।
প্রভাত হইলে লোকে গাবে অপভাষ ॥
দেখিতে উত্তম জাতি কুলবতী ধন্যা।
আপনি জানহ তুমি কার বধূ কন্যা ॥
কিবা অনুরাগে আইলে হয়ে ঘর ছাড়া। -(পৃ-১৫৫)

শাস্ত্র শাসন

প্রাচীন কাল থেকেই বাঙালি সমাজ ধর্ম তথা শাস্ত্রের দ্বারা পরিচালিত হয়ে এসেছে। বাঙালি জীবনে জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বিষয়সমূহই শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর এ ধর্মীয় শাস্ত্র ও বিধি-বিধান পুরুষের

মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব প্রচার করা হয়েছে। পুরুষকে দেয়া হয়েছে দেবতার মহিমা। অথচ নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে এসব শাস্ত্রী থেকেছে নিশ্চুপ ও নির্বাক।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' শাস্ত্র শাসনের এসব চিত্র পাওয়া যায় ––

ক. স্বামীর মাহাত্ম্য প্রচার

'ত্যজ তুমি হেন মতি   ভজ নিজ প্রাণপতি
সতী পতিব্রতা ধর্ম্মশীলা।
স্বামী সেবা সব ধর্ম্ম   সংসারে কি আছে কর্ম্ম
শুন শুন ওগো কুলবালা ॥
সেই সাধ্বী কলকন্যা   সেই সে সংসারে ধন্যা
পতি অন্য মতি নাই যার।
মনোবাঞ্ছা হয় সিদ্ধি   পতি পরামায়ু বৃদ্ধি
সাবিত্রী প্রমাণ সাধ্বী তার ॥' -(পৃ-১৫৮)

খ. স্বামীকে দেবতার স্তরে উন্নীতকরণ

'স্বামী বিনা সংসারে নারীর নাই গতি।
ঘরে যেয়ে ভক্তিভাবে ভজ নিজ পতি ॥
পতিব্রতা সম ধর্ম্ম কহা নাহি যায়।
পৃথিবী পবিত্র যার পায়ের ধূলায় ॥
ঘরে বসে পায় সেই চতুর্ব্বর্গ ফল।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তার করতল ॥
সংসার সাগর তর স্বীমা সেবা করি ।'-(পৃ-২৬৪-২৫৫)

গ. স্বামীই নারীর উপাস্য

'রাণী বলে সতন্তরা কভু নাহি আমি।
গয়া গঙ্গা বারানাসী স্বর্গপদ স্বামী ॥
যে রাঙ্গা চরণ বিনে অন্যে নাহি মতি।
পতি বিনে সংসারে নারীর নাহি গতি ॥' -(পৃ-৭১১)

ঘ. নারীর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় নিশ্চুপ

'বীর বলে মোর দশা তোর দোষ নয় ॥
বেদে বলে বনিতা বিশেষ বাম অঙ্গ।
সত্য বটে সম্পদে বিপদে নয় সঙ্গ ॥' -(পৃ-৫৯৬)

ঙ. নারী সাধন পথের অন্তরায়

'সেন বলে সুন্দরী দুর্গম অস্তাচল।
অনুপমা পরম সুন্দরী তুমি তায়।
নিরখিতে বদন মদন মোহ পায় ॥
থাকুক অন্যের কথা ত্রিলোকের নাথে।
ঘটেছে দারুণ দুঃখ সীতা লয়ে সাথে ॥' -(পৃ-৫৬৭)

পুরুষতন্ত্রের দাপট

সামন্তবাদী সমাজ মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রতিনিধি ও পৃষ্ঠপোষক। বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজেই পুরুষের প্রতাপ ও প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে। পুরুষ শাসক ও পুরুষ পুরোহিত মোল্লাগণ মিলে নিজেদের স্বার্থে ধর্ম ও সমাজ বিধান রচনা করে চাপিয়ে দিয়েছে নারীর ওপর। এভাবে শাস্ত্রাচার ও সমাজ শাসনে স্বীকৃতি পেয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরুষতন্ত্রের একচ্ছত্র আধিপত্য ও ক্ষমতার দাপট। এতে করে নারীর ন্যায্য ও প্রাপ্য অধিকার, সম্মান-সৌভাগ্যের জায়গাটি হয়ে পড়েছে সংকুচিত, অবহেলিত ও বিপন্ন।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' ও দাপটের চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে —

ক. নারীর প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা

'অবলা হইয়া কেন অসম্ভব ভাষ।
দুর্গম চাঁপাই যাত্যে লাজ নাই বাস ॥
সহজে অবলা জাতি তায় তুমি চেট্যা।
অরি হয় নারীর পথের কাঁটাকুটা ॥' -(পৃ-২৮)

খ. নারীর অপরাধে খড়্গহস্ত

'বুঝান বিশেষ যত জ্ঞান ধর্ম্মবাণী।
শুনিয়া না শুনে কানে পুরুষডাকিনী ॥
পুণ্যবান পুরুষ না ভুলে কোনরূপে।
তবে মাগী আমারে ডুবায়ে মেলে কূপে ॥
পেটের বেটা ছোঁড়া সভায় হলো বাদী।
গদাধর বলে ভাল থাকলো হারামজাদী ॥
মাগী বলে মিছামিছা মজায়ে মোর জাতি।
তাপে তবে কর্পূর কুপিয়া ধরে কাতি ॥
নাক কান কাটে তার লক্ষ্মণ ঠাকুর।
সেইরূপ করে তারে করে দিল দূর ॥
রায় গদাধর বলে ঐ বটে মোর বাপ।
মনের মতো হলো শাস্তি ঘুচলো মনের তাপ ॥
সে সব রঙ্গের মেয়ে শুনি নিদারুণ।
ভয়েতে হইল যেন জোকের মুখে চুণ ॥' -(পৃ-২৭৪-২৭৫)

গ. নারীর প্রতি বিরূপ ধারণা

'শিব কন তোমার আজ্ঞায় যাই ধেয়ে।
ভরসা না দিতে পারি খল জাতি মেয়ে ॥
বিফল জীবন যার স্বতন্তরা নারী।
অবলা প্রবলা হৈলে নষ্ট হয়ে গারি ॥
দেবের দেবতা বলি বেদে মোরে কয়।
ঘরের মেয়ের কাছে কথা নাহি রয় ॥' -(পৃ-৩০৯)

পুত্র সন্তানের প্রত্যাশা ও গুরুত্ব

সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুত্র সন্তানের গুরুত্ব ও বিজয় ঘোষণা করা হয়েছে। পুত্রকে শুধু ইহকালের বংশ ধারার প্রদীপ নয়, সম্মান-সৌভাগ্যের উৎস নয়, পিতা-মাতা-বোনের রক্ষক নয়, বরং পরকালের পুন্নাম নরকের ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রচার করা হয়েছে। আর এ পুত্র লাভের জন্য ধর্মীয়ভাবে রাখা হয়েছে পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে কন্যা সন্তানের প্রতি সমাজ ও ধর্ম রেখেছে সীমাহীন অবজ্ঞা, অবহেলা, বৈষম্য আর পোষণ করেছে নেতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' পুত্র সন্তানের এ জয়রথের চিত্র পাওয়া যায় —

ক. পুত্র ইহকাল ও পরকালের পরিত্রাণকারী

'পুত্র বিনা গৃহে যেন পদ্মপাত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল ॥
প্রাণ গেলে প্রথম বাসরে অনাহার।
রাজা লয়ে যে কিছু সম্পত্তি থাকে তার ॥
হাহাকার করে তার পিতৃলোক গণ।
পুত্র বিনা পিণ্ড বাদ প্রধান তর্পণ ॥
জীবন বিফল যার পুত্র নাই রায়।
আঁটকুড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায় ॥
সংসার সম্পদ সুখ সকলি বিফল।
শুনি কর্ণসেন বলে সব কর্ম্মফল ॥'- (পৃ-২৮-২৯)

খ. পুত্র বংশধারা রক্ষাকারী

'আটঁকুড়া হৈল পাত্র (মহামদ) বধে ছয় পো।
শোকে রঞ্জারাণীর নয়ানে বহে লো ॥
ধরিয়া পুত্রের হাতে করে ব্যাকুলি।
ঘুচিল পিতার কুলে পিণ্ড জলাঞ্জলি ॥
ভাই হৈল ভাগ্যহীন ভারত ভুবনে।
একপুত্র দান দেহ আপনার গুণে ॥
বাছারে বাঁচায়ে দেহ বংশে দিতে বাতি।' -(পৃ-৭০২-৭০৩)

গ. পুত্র পরকালের ত্রাতা

'তবে চতুর্বর্গ ফল পাবে রাজা করতল
সকল ভাবোন নৃপবর।
পুত্রের বয়ান হেরি পুন্নাম নরক তরি
পরিণামে যা করে ঈশ্বর ॥' -(পৃ-৩১)

ধন-ঐশ্বর্য

অর্থ-বিত্ত-বৈভব ও প্রাচুর্যের কারণেই মূলত এ বাংলাকে 'সোনার বাংলা' ও 'পৃথিবীর 'ভূস্বর্গ' বলা হতো। আর সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সারা দেশের প্রায় সকল ধন-সম্পদই রাজা বা শাসকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়তো। এছাড়া শাসকের অনুগত অভিজাত শ্রেণি, বণিত শ্রেণি ও সরকারি আমলা শ্রেণির লোকজনও রাষ্ট্রীয় প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতো। রাজা বা সম্রাটের সামগ্রিক জীবন, দান-দক্ষিণা, ধর্ম-কর্ম ও বিলাস ব্যাসনে তাই অভিজাত্য আড়ম্বরতার পরিচয় পাওয়া যায়। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এমন ধন-ঐশ্বর্যের পরিচয় মেলে —

ক. দান-দক্ষিণার আড়ম্বরতা

'চিন্তিয়া পুত্রের ক্ষেম মহারাজ কত হেম
দুঃখী দ্বিজ দেখি দিল দান ॥
ভাটে বিলাইল ঘোড়া নাপিত রজকে জোড়া
জরিশাল সরবন্দ চীরে।
তুষিতে সকল রাজ্যে তৈল মৎস্য দধি আর্য্যে
ঘরে ঘরে বিলাইল ফিরে ॥
কুটুম্ব বান্ধব জ্ঞাতি সবারে মণ্ডল পাতি
পাঠান ভূপতি কর্ণসেন। '-(পৃ-১১৯)

খ. পূজার ব্যয়ে আড়ম্বরতা

'বুঝে দেখ কত নিত্য নৈমিত্তিক ব্যয় ॥
তোমার দারুণ দান দিনে দশ ধেনু।
দিগবাণ সুবর্ণ দক্ষিণা তার অণু ॥
হাতী ঘোড়া চাকরে খরচ লক্ষ সাত।'- (পৃ-৫৫১)

দারিদ্র্য

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় শাসক রাজা, আমলা, অভিজাত, বণিক ও সামন্ত জমিদারদের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য থাকলেও সমাজের বিরাট জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্য সীমার নিচেই বসবাস করতে হতো। কারণ কৃষক প্রজাসহ অন্যান্য বৃত্তিজীবী গোষ্ঠীর নিজস্ব সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। ঘর বাড়ি, জমি-জমা, চাকরি, ব্যবসা সবই শাসকের মন-মর্জির ওপর নির্ভর করতো। উপরন্তু শাসক, আমলা ও কর্মচারীদের সীমাহীন শোষণ, জুলুম ও অত্যাচারে সাধারণ সৈনিক, কৃষকসহ অন্যান্য শ্রমজীবী গোষ্ঠীর ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটতো না বরং দারিদ্র্যই ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এ দারিদ্র্যের চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

ক. ডোম সম্প্রদায় বা নিম্নবর্ণের চিরন্তন দারিদ্র্য

'সাজিল সকল ডোম দক্ষিণ ময়না ॥
কলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেয়া ছাতাছাতি ॥
পাত পেত বোমা বান্ধি হাকাইল বরা।
কুক্কুর পায়রা হাঁসে সাজিল বাজরা ॥
বাইশ হেতার বান্ধে কান্দে রয় ভার।
পরিবার সঙ্গে আসি করিল জোহার ॥
রায় বলে কালুহে কিসের বোঝা ভার।
বীরবলে জাতিবৃত্তি ভূষণ আমার ॥'- (পৃ-৩৪৭)

খ. শোষণ-বঞ্চনায় প্রজার দারিদ্য

'প্রধান জনেক প্রজা কহে কর জুড়ি ॥
বিটল নাবড় কেন কন মন্ত্রীবর।
তিন সন ইজাফা দিয়াছি রাজকর ॥

তথাপি বন্ধন দশা কভু নাহি ঘুচে।
সন্তাপে শুখাল তনু অন্ন নাহি রুচে ॥'- (পৃ-৩৫২)

নিম্নবর্গ মানুষের সহজাত দৃষ্টিভঙ্গি

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় নিম্নবর্গের মানুষজন তাদের বৃত্তি ও গণ্ডির মধ্যেই যথাসম্ভব সুখ ও স্বপ্নের জগৎ রচনা করতে অভ্যস্ত ছিল। বাইরের বিত্ত-বৈভব ও ঐশ্বর্য-বিলাস ছিল তাদের কাছে অজানা-অচেতনা। এ বঞ্চিত, দুর্ভাগ্যপীড়িত মানুষের কাছে তাই স্বর্গের অক্ষয় ভোগ-বিলাসের চেয়ে মাটির পৃথিবীর চিরচেনা পরিবেশের যৎ সামান্য অবসর উপকরণই ছিল কাঙ্ক্ষিত। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' তাই কালু ডোম লাউসেনের স্বর্গে যাবার প্রস্তাবে বলেছে —

'সেন বলে বীর কালু চল স্বর্গবাস।
কালু বলে যাই যদি পাই মদ মাঁস ॥
হেথা সেথা কে জানে অক্ষয় স্বর্গ পদ।
যথা পাই সদাই শূকর মাংস মদ ॥' -(পৃ-৭১১)

চোর-ডাকাত-লুটেরা

সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থায় তৎকালে শুধু শাসক শ্রেণির দৌরাত্ম্যই ছিল না বরং চোর-ডাকাত-লুটেরা ও জলদুস্যদের আতঙ্ক সমভাবে বিদ্যমান ছিল। বণিক, পথিক ও সাধারণ মানুষজন হার্মাদ, মগ, বর্গিদস্যু, চোর, ডাকাত ও লুটেরার আক্রমণে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়তো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব চোর-ডাকাত ও লুটেরার দৌরাত্ম্যের চিত্র পাওয়া যায় —

ক. চুরি

'বিনয়ে বন্দন করি বলে ইন্দে চোর।
কোন কর্ম্ম মহাপাত্র লন খাই তোর ॥
অতি শিশু আসে ত আনিয়া দিব আগে।
নয় বা কালীরে বলি দিব নিশা ভাগে ॥
বর পেয়ে অভয়ে আনিল ইন্দুর মাটি।
মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়ালে সিঁদকাঠি ॥
জাগ্ জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগে মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ নিদ্রা ঘোর ॥' -(পৃ-১২৩-১২৬)

খ. লুণ্ঠন-ডাকাতি

'বুঝিয়া দারীর মতি মহামতি রায়।
বাজারে বালক ডাকি পসরা লুটায় ॥
দোহাই দাবড়ি দারী দেয় দড় দড়।
রাজপথ আগুলি প্রমাদ পাড়ে বড় ॥
দেখরে সকল লোক বিদেশীর তান।
সহস্র কাহন ধন লুটালো দোকান ॥' (পৃ-২৮৮)

সামাজিক অবক্ষয়

সামন্তবাদী সমাজে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়ের অবনতি ঘটে। সামন্ত শাসকেরা মদ ও নারীর ভোগ-বিলাসে মগ্ন যেমন থেকেছে, তেমনি নিম্নশ্রেণির মানুষেরাও ভাগ্যের পরিবর্তনের প্রত্যাশায় লোভ, কূটকৌশল, মিথ্যাচার ও

কৃতঘ্নতার পরিচয় দিয়েছে। সমাজ জীবনে নীতি-নৈতিকতা, সততা, সংযম ও মূল্যবোধ আশঙ্কাজনক ভাবে হ্রাস পেতে শুরু করে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' মন্ত্রী মহামদ কূটকৌশল ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে চোর দিয়ে লাউসেনকে হত্যা করতে চেয়েছেন, হাতি চুরির অপবাদ দিয়েছেন, পশ্চিমে সূর্যোদয়কে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে সাক্ষী হরিহরকে ঘুষ দিয়েছেন, লাউসেনের মায়ামুণ্ড প্রেরণ করেছে এবং প্রজার ওপর শোষণ করতে গিয়েও মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে শিবাই দত্তের স্ত্রী নয়ানী নিজের পুত্রকে হত্যা করে লাউসেনের উপর মিথ্যা দোষ চাপিয়েছেন এবং হরিহর বাইতিও লোভের বশে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে সম্মত হয়েছেন —

ক. নয়ানীর প্রতারণা-কূটকৌশল

'নিশ্বাস ছাড়িয়া ধেয়ে যেয়ে এইরূপে।
পুত্রে এনে পাপিনী ডুবায়ে মেলে কূপে ॥
কলা করি কুলটা কান্দিছে উভরায়।
শুনিয়া নগরলোক উভমুখে ধায় ॥
নির্ম্মতা মাগী মিছে শোকে কেঁপে কয়।
হেদে ও শালার বেটা বধিলে তনয় ॥
একা পোয়ে পেয়ে পথে বল করে ও।
ডাক দিতে কূপেতে ডুবালে মোর পো ॥'-(পৃ-২৬৭)

খ. মন্ত্রী মহামদের কূটকৌশল ও প্রতারণা

'এত শুনি মহাপাত্র ভাবিয়া নাবুড়ি।
মনে করে রাজাকে করিব আঁটকুড়ি ॥
পাঠাব কাঙুর রণে তার প্রিয় বেটা।
ভাগিনা যেন ভবানী খর্পরে যায় কাটা ॥
কামরূপে পাঠান সঙ্কেতে সমাচার ॥
লাউসেন সেজে যান তোমার উপর।
সংগ্রামে সংহারি তারে আসিবে সত্বর ॥
অ মোর ভাগিনা বলি না করো অপেক্ষা।
বলিদানে দিয়া তারে পূজিবে কামাখ্যা ॥'- (পৃ-৩৫৫-৩৫৭)

গ. কাম্বা ডোমের চরম কৃতঘ্নতা

'শরণ লইলাম দাদা রক্ষ কর প্রাণ।
তুমি জ্যেষ্ঠ জন্মদাতা পিতার সমান ॥
তুমি না করিলে কৃপা হতাম বৈরাগী।
অনুগত দাস আমি কিছু ভিক্ষা মাগি ॥
পূর্ব্বমুখে বলে কালু এই ব্রহ্মা সত্য।
যে কিছু মাগিব তাই দিব তথ্য ॥
বল কামু কি দিব কহিছে কালু বীর।
দূরে থেকে কাম্বা বলে কেটে দাও শির ॥'- (পৃ-৬৩৩-৬৩৫)

ঘুষ-দুর্নীতি

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সমাজে শুধু ভোগ-বিলাস, অযাচার-ব্যভিচার ও লাম্পট্যই প্রচলিত ছিল না, বরং সীমাহীন ঘুষ-দুর্নীতি ও অপকর্ম সমাজকে গ্রাস করে ফেলার উপক্রম হয়ে পড়ে। শাসকের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মন্ত্রী, আমলা, সৈনিক ও কর্মচারীগণ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য ঘুষ ও দুর্নীতির আশ্রয় নিতে শুরু করে। শোষণ-জুলুমের সঙ্গে ঘুষ ও দুর্নীতির প্রাদুর্ভাবের কারণে সাধারণ প্রজার দুঃখের সীমা ছিল না। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এ ঘুষ-দুর্নীতির পরিচয় মেলে —

ক. মহামদের দুর্নীতি

'কেবা আছে অখিলের এমন অবিচারী।
মিছা অপবাদ দিয়া লুটে ঘর স্কারি ॥
অসতে আদর নিত্য সৎপথে কন্টক।
সজ্জন জনারে পীড়া ঠেকাইয়া ঠক ॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব বিষ্ণু বিষয়ে বঞ্চিত।
বিবরে বলিব কত পাত্রের দুর্নীত ॥
রাজকর লোকের তেসনি নিল বাড়া।
অতেব সকল প্রজা হোলো দেশ ছাড়া ॥' -(পৃ-৩৫১)

খ. কাম্বা ডোমকে মহামদের ঘুষ প্রদান

'পাত্র বলে যে আনিবে কালুর মস্তক।
ময়না ইনাম পাবে রেখে যাবে শক ॥
এখনি পরুক জোড়া ঘোড়া পাবে এলে।
বচনে বাড়ায় বুক পাত্র এড়ে পান।
সমাচার শুনে কাঁপে সবাকার প্রাণ ॥
হেনকালে কাম্বা ডোম উঠাইল পান।
কহিতে লাগিল কিছু পাত্র বিদ্যমান ॥ -(পৃ-৬৩২)

সততা-সংযম ও নৈতিক মূল্যবোধ

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজের নৈতিক অধপতন ও মূল্যবোধের বিপর্যয়ের বিপরীত মেরুতে সততা সংযম ও শুদ্ধচারী সাধনার চিত্রও সগৌরবে বিদ্যমান ছিল। কারণ হিন্দু-মুসলিম সমাজে তখনোও ধর্মীয় বিধি-বিধান, নৈতিক বল-বিশ্বাস, মানবিক ও মাঙ্গলিক উপাসনার ধারা অব্যাহত ছিল। এ কারণে সমাজে এমন নর-নারীর উল্লেখমেলে, যাদেরকে কোন লোভ-লালসা, ষড়যন্ত্র-কূটকৌশল ও পাপ-পঙ্কিলতা স্পর্শ করতে পারেনি।
'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' সমাজ জীবনের এ সততা-সংযম ও নৈতিক মূল্যবোধের গৌরবময় চিত্রের উল্লেখপাওয়া যায়–

ক. লাউসেনের সংযম ও চারিত্রিক দৃঢ়তা

'বচনে বচনে সুধা বরিষয়ে যত।
না জানি লাবণ্য তায় উপজিল কত ॥
দেবী এত বচন বলিল যদিস্যাৎ।
রাম রাম বলি যেন কর্ণে দিল হাত ॥
অঙ্গ আভা উদয়ে আঁধার করে আল।

উঠ বলি এখানে বসিয়া নহে ভাল ॥
কি কার্য্য আমার কাছে ও সব সরস।
জনমে যুবতী আমি না করি পরশ ॥' -(পৃ-১৫৫-১৫৬)

খ. কালু ডোমের চরম প্রতিশ্রুতি রক্ষা

'লখেকে বান্ধিয়া দড় কালু সত্য করে।
গঙ্গা জল তুলসী তামায় তুলে ধরে ॥
পূর্ব্বমুখে বলে কালু এই ব্রহ্ম সত্য।
যে কিছু মাগিব তাই দিব তথ্য ॥
বল কামু কি দিব কহিছে কালু বীর।
দূরে থেকে কাম্ব বলে কেটে দাও শির ॥
যে ছিল কপালে কাম্বা ফলিল আমার।
এ চোটে মাথা কেটে সত্য কর পার ॥'- (পৃ-৬৩৪-৬৩৬)

নাগরিক সমাজ

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সাধারণত শাসকের রাজধানী, দুর্গ বা গড়, প্রদেশ, শহর বা বন্দর ও তীর্থকে কেন্দ্র করে নাগরিক সমাজের সূত্রপাত ঘটতো। এসব নগর বা শহরে মানুষের নৈতিক বিকাশের চেয়ে অবক্ষয়, ভোগ-বিলাসের উপকরণই বেশি মাত্রায় বিদ্যমান ছিল। আর এসব নগরে বসবাস করতো বিলাসী বাবু, ধনী বণিক অভিজাত শ্রেণি, সামন্ত শাসক, আমলা এবং কলাবতী বারাঙ্গনা-নর্তকী গায়ক সম্প্রদায়।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' গৌড়, ঢেকুরগড়, ময়নাগড়, রমতিনগর, জামতিনগর, গোলাহাট, মঙ্গলকোট, বর্ধমান ও কামরূপ প্রভৃতি নগর বা শহরের পরিচয় পাওয়া যায়। এসব নগরগুলো ছিল মূলত সামন্ত রাজাদের রাজধানী, যাকে কেন্দ্র করে মূলত এ বৃহৎ বাংলায় পাল শাসনামলের নাগরিক সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। আর এ নাগরিক সমাজ ও সংস্কৃতিকে মূলত সমকালীন আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামো তথা ব্যবস্থাপনাই গতিশীল করেছিল। যেহেতু তৎকালীন এ নগরগুলো গড়ে ওঠেছিল সামন্ত শাসকদের রাজনৈতিক প্রয়োজনে, সেহেতু এসব স্থান মানুষের মেধা-মন, রস-রুচি ও বৈদগ্ধ্যের বিকাশের চেয়ে বরং সামন্তবাদী ভোগ-বিলাসের কেন্দ্রে পরিণত হয়ে পড়েছিল —

ক. জামতি নগরের চালচিত্র

'আম জাম পলাশ পিপুল থরে থরে।
সারি পুরীর প্রান্তরে শোভা করে ॥
কর্পূর বলেন শুন ময়না ঠাকুর।
জামতি নগর নষ্ট নাবড়ির পুর ॥
কায়েস্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য বিশেষ সজ্জন।
ঐপুরে নাই যায় সব নীচে মন ॥
অরুণ মুদিত কাল ত্বরান্বিত নিশা।
কর্পূর কহেন এই পুরী ধর্ম্মনাশা ॥
নটী দারী নহে সব গৃহস্থের মেয়ে।
লাজ খেয়ে নগরে বুলে চেয়ে ॥'- (পৃ-২৫৫)

গ্রামীণ সমাজ

তৎকালীন সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় গ্রামগুলো ছিল মূলত অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ভারতের ঐতিহ্যবাহী বর্ণজীবী বা বৃত্তিজীবী শ্রেণির মানুষেরা কৃষি, বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যের মাধ্যমে এসব গ্রামকে প্রায় সব দিক থেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে। শুধু কেরোসিন ও লবণ গ্রামের বাইরে থেকে আনা হতো। এছাড়া একজন মানুষকে জীবন-যাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন, তার সবই গ্রামে উৎপন্ন হতো বা পাওয়া যেতো। এমনও দেখা যেতো, একজন লোক তার সারা জীবন গ্রামেই কাটিয়ে দিয়েছে, অথচ গ্রামের বাইরে তাকে যেতে হয়নি। অর্থাৎ গ্রামকে আশ্রয় করেই তার জন্ম, বেড়ে ওঠা, বিয়ে, সংসার ও মৃত্যুলীলা সম্পন্ন হতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এমন গ্রামীণ সমাজের পরিচয় মেলে। যারা বংশানুক্রমিকভাবে নিজ বৃত্তি বা পেশায় নিয়োজিত থেকে গ্রামকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলে। 'হস্তীবধ পালায়' ডোম সম্প্রদায় এবং 'অঘোর বাদল পালায়' বিভিন্ন বর্ণজীবী বা বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়ের কর্মমুখর জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় ––

বিভিন্ন বৃত্তিজীবী সম্প্রদায়

'তাঁতি তেলি তামলি তৈলঙ্গ তৈলকার।
কৈবর্ত্ত কুজুড়া কানু কামার কুমার ॥
বাইত বেগারি বেণে বিশেষ বারুই।
কলসী কোদাল কান্ধে বেগারি বিজই ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন ভয়ে লুকাইল কোণে ॥
ব্রহ্মাচারী ভিখারী ফকিরে করে মজা।
বাটে ধরি বেগারি বাঁটিয়ে দেয় বোঝা ॥
কত কাষ্ঠ কাটে তক্ষ বেগারী কামিলা।
করাতে কাটিয়া কাষ্ঠ বরগা তুলিলা ॥' -(পৃ-৫৫২)

তৃতীয় পরিচ্ছদ

বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন

জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন কেবল জীবিকাগত নয়, বরং স্থান-কাল ও গোষ্ঠীগতও। মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্য ঘটে একারণেই। অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি, আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন চেতনার বহিঃরূপই সংস্কৃতির সাক্ষ্য। সংস্কৃতির আবর্তন-নিবর্তন-উদবর্তন কিংবা বিকাশ বিবর্তন তাই শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈক্ষিক ও প্রশাসনিক সাবলীলতা স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দৌর্বল্য- দুর্দশার উপর নির্ভরশীল।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে মানুষের জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত যাবতীয় সকল কিছুই সংস্কৃতির মধ্যে গণ্য। অর্থাৎ জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইন-কানুন, অনুশীলন, অভ্যাস ও ধর্মকর্ম সবই সংস্কৃতির আওতার মধ্যে পড়ে। সুতরাং সংস্কৃতি বলতে মানব সৃষ্ট সবকিছুকেই বোঝায় এবং এ সংস্কৃতি বংশ পরম্পরা উত্তরাধিকারসূত্রে মানব সমাজে বর্তায়।

বিবাহ

বিবাহই বাঙালি জীবনের প্রধান সংস্কার। কনে বা বর দেখা থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাস্ত্রাচার ও লোকাচার মেনে কন্যা সম্প্রদান ও বধূবরণের মধ্য দিয়ে এ পর্বের সমাপ্তি ঘটে। বাঙালি সমাজে বহু ধরনের বিবাহের

প্রচলন থাকলেও শুধু অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের স্বাভাবিক বিকাশ ও স্বীকৃতি সমাজ জীবনে পরিলক্ষিত হতো। আবার বাংলা মূলত পুরুষতান্ত্রিক সমাজ হবার কারণে বর কনের বাড়িতে গিয়ে বিয়ে করে নববধূকে শ্বশুরালয়ে নিয়ে আসতো। বিবাহের এ প্রক্রিয়ার মধ্যে ঘরবাড়ি দেখা, বর-কনে দেখা, পাকা কথা, দিন-তারিখ ঠিক করা, বিবাহ ভোজ, বৌভাত, যৌতুক বা দান সামগ্রী ও বাসর সজ্জার বিষয়গুলো আড়ম্বরের সঙ্গে উদ্‌যাপন করা হতো।

পাত্র নির্বাচন

বিবাহের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে বরের বংশ, ধন-সম্পদ, স্বভাব-চরিত্র, বিদ্যা-শিক্ষা, দৈহিক-সুগঠন, বল-বুদ্ধি, সাহস ও বীরত্বকে প্রাধান্য দেয়া হতো। এছাড়া পুরুষের প্রকৃতি নির্ণয়ে- শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব শ্রেণিতে বিভাজন মানা হতো। সামন্তীবাদী সমাজে বরের বয়স নয়, বরং বিত্ত-বৈভবই প্রাধান্য পেতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রাজা কর্ণসেন, গৌড়েশ্বর ও লাউসেনের বিবাহের সময়ও পাত্রের কুলমান, অর্থ-বিত্ত, চারিত্রিক মাহাত্ম্য ও শিষ্টাচার প্রাধান্য পেয়েছিল —

ক. পাত্র হিসেবে কর্ণসেন

'কি করে কহিব নাথ কর্ণসেন বুড়া।
রাজা বলে বুঝি যদি সেই বংশচূড়া ॥
সকলগুণের গুণী ধনী ধর্ম্মবান।
কুলে শীলে কেবা আছে সেনের সমান ॥
বুড়া ভেবে কদাচ না ভেব বলহীন।
শোকে তাপে কর্ণসেন হয়েছে মলিন ॥'-(পৃ-৪৮)

খ. পাত্র হিসেবে লাউসেন

'কেবা ধরে সংসারে এমন রূপগুণ ॥
দক্ষিণ ধরণী পতি ধর্ম্মশীল বড়।
মহারাজ কর্ণসেন কুলেশীলে দড় ॥
তার পুত্র লাউসেন ধর্ম্মের সেবক।
হেন বরে কণা দিলে রয়ে যায় সক ॥
দনুজারি তনুজ জিনিয়া রূপবান।
গুণে মহাগুণী ধনী কুবের সমান ॥' -(পৃ-৩৯৩)

স্বয়ংবর প্রথা

সামন্তবাদী সমাজে রাজকুমারীদের বিবাহের ক্ষেত্রে স্বয়ংবরের আয়োজন করা হতো। এ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আগত রাজা ও রাজপুত্র ও বিখ্যাত বীরদের মধ্যে থেকে রাজকুমারী পছন্দের বরকে বাছাই করে বরমাল্য পরিয়ে দিতো। এ স্বয়ংবর প্রথা একদিকে রাজকুমারীর পাত্র বাছাইয়ে কিছুটা ব্যক্তি স্বাধীনতা ও নারী সত্তার ইঙ্গিত যেমন বহন করে, তেমনি সামন্ত রাজার আভিজাত্য ও গৌরবকে বহুগুণে মহিমান্বিত করে তুলে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' সিমুলার রাজা হরিপালের রাজকন্যার বিবাহে স্বয়ংবর প্রথা অনুসরণ করা হয়। কানড়া স্বাধীনভাবে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে বহুপাত্রের মধ্যে থেকে বীর লাউসেনকে বরমাল্য পড়িয়ে স্বামী হিসেবে বরণ করে নেয় —

'ভাগ্যবতী কানড়া পাঠাল্যে কিছু কয়্যা॥

সর্ব্বকালে দেবী পূজে ভূপতির বালা।
দরাতে না পারে কারে দিব বর মালা ॥
কৈলাস হইতে দেবী দিল এই গণ্ডা।
এক চোটে যে জন করিবে দুই খণ্ডা ॥
সে হবে কানড়াপতি ঈশ্বরীর আদেশ।
কানড়ার মনে এই প্রতিজ্ঞা বিশেষ ॥
রাজার আদেশে নিল অভয়ার অসি।
সভা মাঝে হানে গণ্ডা ধর্ম্মের তপস্বী ॥
একান্ত ধর্ম্মের পদ মনে করি ধ্যান।
গণ্ডার হানিতে চোটে হইল দুইখান ॥
হরিষে অনুন্যা দাসী হাতে হেম থালা।
বসন ভূষণ কত মলয়জ মালা ॥
বরমালা দিয়ে সেনে বলিছে মিনতি।
আজি হত্যে হল্যে তুমি কানড়ার পতি ॥'- (পৃ-৪৩৪-৪৪৪)

পাত্রী নির্বাচন

আর্য যুগ থেকে বাঙালি সমাজে বিবাহের পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে কন্যার ৫টি গুণকে (রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বংশ) বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হতো। এছাড়া- পদ্মিনী, চিত্রাণী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী হিসেবে নারীর প্রকৃতি নির্ণয় করা হতো।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বিয়ের পাত্রী হিসেবে রঞ্জাবতীর, কানড়ার ও অমলার রূপ, বয়স, বংশ, বিদ্যা ও শারীরিক সুলক্ষণকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছিল —

ক. পাত্রী হিসেবে রঞ্জাবতী

'ছোট ভগ্নী বামেতে বসেছে রঞ্জাবতী ॥
ভুবনমোহন রূপ পরম সুন্দরী।
অপ্সরা উর্ব্বশী কিম্বা স্বর্গবিদ্যাধরী ॥
সম্প্রতি সম্বন্ধ বাক্য শুন সীমন্তিনী।
অবিবাহ এত বড় তোমার ভগিনী ॥
রায় কর্ণসেনে বিভা দিব রঞ্জাবতী।
এতৎ সম্বন্ধে যদি দেহ অনুমতি ॥' -(পৃ-৪৮)

খ. পাত্রী হিসেবে কানড়া

'পাত্র বলে কুলকন্যা কর্য্যাছি ঘটনা।
পদ্মমুখী পদ্মিনী বরণ কাঁচা সোনা ॥
হরিপাল ভূপাল কন্যা সিমুল্যাবাসিনী।
শুশীমুখী রামা কিবা অপ্সরা উর্ব্বশী ॥' -(পৃ-৪১৫-৪৪৪)
'গুণবতী কানড়ার রূপের নাহি সীমা।
কলেবর কান্তি কিবা কনক প্রতিমা ॥' -(পৃ-৪৪৪)

ঘটকালী প্রথা

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহের অনুঘটক হিসেবে ঘটকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অন্যান্য গোত্রের লোকজনও পেশাদার/ অপেশাদার ঘটক সমাজে বিদ্যমান ছিল। এসব ঘটক পেশা সূত্রেই সাধারণত বাক্‌পটু, চতুর ও ধূর্ত স্বভাবের হতো। বিবাহের এ কর্ম উপলক্ষ্যে ঘটকদের পান-সুপারি, বস্ত্র, অর্থসহ নানা রকম উপহার বখশিশ প্রদান করা হতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহের ঘটকালীর কাজ করেছিলেন ভগ্নিপতি স্বয়ং গৌড়েশ্বর। তবে এটি তিনি করেছিলেন রাজনৈতিক ও মানষিক কারণে। অন্যদিকে সিমুলা রাজকন্যা কানড়াকে বিবাহের জন্য গৌড়েশ্বর পেশাদার ঘটক গঙ্গাধর রায়কে বহু পারিতোষিক ও পুরস্কার দিয়ে প্রেরণ করেন। বিবাহের ক্ষেত্রে যে বহু মিথ্যা, ছল-চাতুরীর আশ্রয় সর্বকালে স্বীকৃত ছিল, তা গৌড়েশ্বরের সঙ্গে ঘটকের আলাপের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়েছে ––

'এত শুনি হর্ষ রাজা দিল সায়।
ভাট পুরোহিত পাত্র সিমুল্যা পাঠায় ॥
ভাটে ডাকি আপনি কহেন নপবর।
সাবধানে শুন অহে গঙ্গাধর রায়।
বিবাহ বিষয়ে মিথ্যা দোষ নাহি তায় ॥
বাড়াব সম্মান খুব সিদ্ধ হলে কাজ।
জোড় হস্তে বলে ভাট ভাল মহারাজ ॥
ঘটক ব্যাপক বড় ভট্ট জাতি তায়।
হাত নাড়া দিয়া বলে রাজার সভায় ॥
সিমুল্যা অবনীনাথ কর অবগতি।

,,,

তার পুত্র গৌড়েশ্বর ঈশ্বরের অংশে।
প্রবল প্রতাপে যারে সংসারে প্রশংসে ॥
কুমুদ বান্ধব বন্ধু পিতা সিন্ধু যার।
স্বধর্ম্ম ধরণী ধন কি কহিব তার ॥
রূপেগুণে অনুপাম কুলপদ্ম পুষা।
বার ভূঞা ভূপতি ভুবনে যার ভূষা ॥- (পৃ-৪১৫-৪১৬)

কনের অধিবাস

বাঙালি হিন্দু সমাজে বর-কনে এবং কনের পিতাকেও বিবাহের পূর্বদিন অভুক্ত থেকে অধিবাস ব্রত পালন করতে হতো। এ অধিবাস বিবাহের অন্যতম আচার বলে গণ্য হতো।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতীর বিয়েতে রঞ্জাবতীসহ পিতা বেনু রায় এবং কলিঙ্গার বিয়েতে কলিঙ্গাসহ পিতা কর্পূর ধলকে অধিবাস পালন করতে দেখা যায় ––

ক. কলিঙ্গার অধিবাস

'সিদ্ধার্থ গোরোচনা তাম্রাদি রূপা সোনা
হরিদ্রাদি অলক্তক বাস।
দর্পণ সরযপে চামর ধূপ দীপে
করিলা মঙ্গলাধিবাস ॥' -(পৃ-৩৯৯)

কনের সাজসজ্জা

বাঙালি সমাজে বিবাহের কন্যাকে গায়ে হলুদ দিয়ে স্নান করিয়ে বিচিত্র বস্ত্র, অলংকার ও প্রসাধনের সমন্বয়ে সাজানো হতো। একাজ সাধারণত সধবা স্ত্রী, আয়া ও সখীরা করে থাকে। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা, অমলা, বিমলা ও কানড়ার বিয়ের সময় এদেরকে গায়ে হলুদসহ বিচিত্র বসন-ভূষণ ও প্রসাধনে সাজানো হয়–

রঞ্জাবতীর সাজসজ্জা

'আপনি মন্থরা অতি আনন্দিত মনা।
রাজপুরে হুলাহুলি উল্লাস বাজনা ॥
সখীগণে হরিষে হরিদ্রা দিল গায়।
চন্দনাক্ত সিন্দুর কজ্জল ॥
সিদ্ধার্থ গোরোচনা তাম্রাদি রূপাসোনা
হরিদ্রা অলক্ত বাস।'-(পৃ-৪৯-৫০)

বর বরণ

বাঙালি সমাজে বিবাহের বরকে নানা আচার ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে কন্যার মা ও আয়াগণ বরণ করে থাকে। সাধারণত ধান-দূর্বা, সোহাগ কাজল, অগুরু-চন্দন সহকারে বর বরণের প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লাউসেন-কলিঙ্গার বিয়ের সময় আয়াগণ নানা আচার ও আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে বর লাউসেনকে বরণ করে নেয় —

'উল্লাস বাজনা চিত্র আসন উপরে।
শশীমুখী সকল বরিতে আইল বরে ॥
কৌতুকে কামিনী কন্যা কলিঙ্গার সই।
কপালে চন্দন দিয়া পায়ে ঢালে দই ॥
মুখে দিয়া তাম্বুল সেনের সেকে গাল।
সাত বার বরিল ঘুরায়ে হেমথাল ॥
সাজায়ে সাতাশ কাটি সর্ব্ব সখী লয়ে।
মঙ্গল আচারে বরে প্রদক্ষিণ হয়ে ॥
যতনে আনিল কন্যা রতনে রঞ্জিতা।
চিত্রাসনে রত্নদীপ জ্বলে চারিভিতা ॥

,,,

বরে প্রদক্ষিণ কন্যা করে বার সাত।
দুজনে বদলে মালা পাশারিয়া হাত ॥
নিছিয়া ফেলিল পান উভ হাত তুলি।'-(পৃ-৪০০)

বিবাহের আচার ও আনুষ্ঠানিকতা

বাঙালি হিন্দু সমাজের বিবাহের ক্ষেত্রে অগ্নিকে সাক্ষী রেখে মন্ত্র পাঠ, গাঁটছাড়া বেঁধে সাত পাক, সপ্তর্ষি দর্শন, শুভ দৃষ্টি বিনিময়, পানচিনি, কন্যা সম্প্রদান ও আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে এ শুভকর্ম সম্পন্ন করা হতো। এতে গান-বাজনা, নৃত্য, ভোজসহ আনন্দ উৎসবের আয়োজন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত থাকতো। তবে সকল বিবাহের ক্ষেত্রেই-নান্দীমুখ, অধিবাস, গাত্রহরিদ্রা, বরবরণ, সপ্তপদী গমন, অরুন্ধতী দর্শন, লাজাহোম, অশ্মারোহণ,

কুশণ্ডিকা ও স্ক্রিরাগমন আবশ্যিক আচার বলে গণ্য হতো। এছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হলুদ, কলাগাছ, সিঁদুর, কড়ি, কলা, দুর্বা, মাছ ও লোহা- এসব দ্রব্য উর্বরতার প্রতীক বলে গণ্য হতো।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতী- কর্ণসেন এবং লাউসেন-কলিঙ্গা-অমলা-বিমলা-কানড়ার বিয়েতে সকল শাস্ত্রচার, বিধি-বিধান মেনেই সম্পন্ন হয় —

'শুভক্ষণে কন্যা বরে করিল ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর শব্দ উঠে জয়ধ্বনি ॥
নিকেতনে নিল কন্যা দিয়া জলধারা।
মণ্ডপে প্রবেশে বর স্ত্রী আচার সারা ॥
মাথায় বসন দিলা রতন মৌড়ালা।
বেদের বিধান সিদ্ধ বাঁধে গাঁটছড়া ॥
বেদগান বিপ্রগণে বলে উচ্চস্বরে।
তেমতি কলিঙ্গা কন্যা লাউসেন বরে ॥
লাজহোম করে দিল ঘৃতের আহুতি।
বর কন্যা দোঁহে দেখে ধ্রুব অরুন্ধতী ॥
সমাপন সব কর্ম্ম বেদ অনুসারে।
ব্রাহ্মণ বিশেষ ব্যস্ত দক্ষিণার তরে ॥
স্ক্রিজগণে তুষি ধনে নতমান রায়।
ব্রাহ্মণ আশীষ দিল বিভা হৈল সায় ॥
ক্ষীর খণ্ডে ভোজন শয়ন সমাদরে।'- (পৃ-৪০১-৪০২)

কন্যা সমর্পণ

বাঙালি সমাজে সাধারণত কন্যার পিতা বা পিতৃস্থানীয় গুরুজন কন্যাকে বরের হাতে সমর্পন করতেন। এর সঙ্গে আর্শীবাদ ও শুভকামনা করা হতো এবং যৌতুক তথা উপহার বা দানসামগ্রী প্রদান করা হতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' কর্ণসেন ও লাউসেনের বিয়েতে রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা, অমলা, বিমলা ও কানড়াকে তাদের পিতা শাস্ত্রাচার মেনেই দানসামগ্রী ও যৌতুকের সমাহারেই বরের হাতে সমর্পণ করে —

'বেদের বিধানে রাজা মন্ত্র উচ্চারিয়া।
সালঙ্কারা কন্যা সেনে দিল সমর্পিয়া ॥
যৌতুক দক্ষিণা দান দিল নানা ধন।
রাজা হলো অবসর তুষিয়া ব্রাহ্মণ ॥
সায় হলো সম্প্রদান লজ্জা ত্যজি দূর।
সেন দিল সীমন্তিনীর সিন্দুর ॥'- (পৃ-৪০১-৪০২)

ফুলশয্যা বা বাসর

বাঙালি সমাজে কন্যার পিত্রালয়ে বা বরের পিত্রালয়ে বাসর রাত বা ফুলশয্যা যাপনের রীতি রয়েছে। সাধারণত পিতৃতান্ত্রিক সমাজে বরের বাড়িতে এবং মাতৃতান্ত্রিক বা আদি-বাসী সমাজে কনের বাড়িতে বাসর রাত উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লাউসেন ও কলিঙ্গার ফুলসজ্জা বা বাসর থাপিত হয় কলিঙ্গার

পিত্রালয়ে। করণ লাউসেন কামরূপ জয় করতে এসে যুদ্ধের সন্ধিশর্তে কলিঙ্গাকে বিয়ে করেন। এ জন্যই লাউসেন বাসর যাপন শ্বশুরালয়ে করতে বাধ্য হন —

'ব্রাহ্মণ আশীষ দিল বিভা হৈল সায় ॥
পতিপুত্রবতী কন্যা ভূপতির দারা।
বর কন্যা নিল ঘরে দিয়া জলধারা ॥
ক্ষীরখণ্ডে ভোজন শয়ন সমাদরে।
বিরচিত বাসর বঞ্চিল কন্যাবরে ॥
আট দিনে ঢাকিল মঙ্গল আট হাঁড়ি।
সেন বলে ঠাকুর বিদায় হবো বাড়ী ॥' -(পৃ-৪০২)

যৌতুক ও কন্যা বিদায়

সাধারণত বাঙালি সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে বরপণ ও কন্যাপণ উভয় প্রচলিত রয়েছে। বিবাহের সময় কন্যাপণ হিসেবে-নগদ অর্থ, ও গহনা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে বরপণ হিসেবে-নগদ অর্থ, অলংকার, বস্ত্র, আসবাবপত্র, জমি-বসতবাড়ি, গাড়ি, গরু, ঘোড়া, হাতী, দাস-দাসী প্রদানের বহুল রীতি প্রচলিত রয়েছে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতী ও কানড়ার বিয়েতে রাজা বেনু রায় ও রাজা কর্পূরধল উভয়েই কন্যার সঙ্গে যৌতুক হিসেবে নানা মূল্যবান অলংকার, স্বর্ণ, মণি, মুক্তা, দাস-দাসী উপহার দিয়েছেন। এছাড়া প্রাণের পুত্তলি কন্যার বিদায়ে রাজা-রানীর চোখ অশ্রুসিক্ত ও কণ্ঠ ভারি হয়ে এসেছে —

'নানা ধনে বিদায় করিল জামাতার।
বসন ভূষণ হেম হীরা মণিহার ॥
যতনে রতন পেড়ি ভূপতির নারী।
সাজি দিল শ্বশুর শাশুড়ি নমস্কার ॥
ভূপতি জরদ জোড় জরিপট্ট শাল।
নানাধনে ডোমগণে করিল নেহাল ॥
ব্রাহ্মণ নৃপতি নারী আরাধ্য অপরে।
সবাকার চরণ বন্দিল কন্যা বরে ॥
হেম হীরা রত্নমালা কেহ দিল দান।
ব্রাহ্মণ বিদায়ে বিভোল সর্ব্বলোক।
জননী পাসরে কোলে মৃত পুত্রশোক ॥
পথ নাহি দেখে রাণী নয়ানের লোহে।
সকল সংসার কাঁদে কলিঙ্গার মোহে ॥
মুখ হেরি কান্দে যত খেলাবার সখী।
ছলছল করে দুটি কলিঙ্গার আঁখি ॥-(পৃ-৪০২-৪০৩)

বধূবরণ

বাঙালি সমাজে পুত্রবধূকে বরণ করারও কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম-নীতির প্রচলন ছিল। সাধারণত শাশুড়ি নববধূকে সোনার গহনা ও ধান-দূর্বা দিয়ে আশীর্বাদ করে বরণ করে নিতেন।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ পুত্রবধূ কলিঙ্গা-অমলা-বিমলাকে বরণ করতে রঞ্জাবতী সোনার থালে ধান-দূর্বা সাজিয়ে সধবা নারীদের নিয়ে অগ্রসর হয়েছেন। পুত্রবধূদের ধান-দূর্বা, অলংকার দিয়ে আর্শীবাদ করে, উলুধ্বনির মাধ্যমে বরণ করে নিয়েছেন। এছাড়া ব্রাহ্মণদের আর্শীবাদ এবং নিকট আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের উপহারে পুত্রবধূগণ সংবর্ধিত হয়েছে —

‘নানা পদ্য বাদ্য বাজে শুনিতে রসাল।
বর কন্যা বরিতে সাজাল হেম থাল ॥
পুত্রবধূ আনন্দে উথলে রঞ্জারাণী।
ব্রাহ্মণ সকলে করে শুভ বেদ ধ্বনি ॥
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গল ধ্বনি হুলাহুলিময় ॥
পুত্রবধূ মুকুট মণ্ডিত রত্নমালা।
প্রধান মন্দিরে নিল দিয়া জলঝারা ॥
বধূর বদন হেরি পুলকিত প্রেমে।
নিছনি করিল কত হীরামণি হেমে ॥
কনক অঞ্জলি কত মরকত মণি।
মহারাজ কর্ণসেন করিল নিছনি ॥
পুত্রবধূ প্রণতি করিল পদতলে।
রাজারাণী আশিস্ করিল কুতূহলে ॥’-(পৃ-৪০৮-০৯)

জোকার

বাঙালি হিন্দু সমাজে পূজা, যাগ-যজ্ঞ, বিবাহ, লোকাচার ও দুঃসাহসিক কর্মের সাফল্যে জোকার বা উলুধ্বনি বা জয়ধ্বনির ব্যাপক প্রচলন রয়েছে। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ বিবাহ, বধূবরণ, পূজা-যজ্ঞ, আতুড় বা জাতকর্মের মতো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এ জোকার দেবার চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

‘শুভক্ষণে কন্যা বরে করিল ছাউনি।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর শব্দ উঠে জয়ধ্বনি ॥
পুত্রবধূ আনন্দে উথলে রঞ্জারাণী।
ব্রাহ্মণ সকলে করে শুভ বেদ ধ্বনি ॥
কৌতুকে কামিনীগণ দিল জয় জয়।
মধুর মঙ্গল ধ্বনি হুলাহুলিময় ॥’- (পৃ-৪০১-৪০৯)

দাম্পত্য ধারণা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কে নর-নারীর মধ্যে উচু ধারণা বলবৎ ছিল। কারণ হিন্দু ও মুসলিম ধর্মের বিশ্বাস মতে নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের বন্ধন পরকাল পর্যন্ত অটুট থাকে। স্বামীর সংসার, সন্তান, সেবাকর্ম ও ধর্মাচরণেরৎ সহযোগিনীর ভূমিকা পালন করতেই স্ত্রীকে ‘সহধর্মিণী’ বা ‘অর্ধাঙ্গিনী’ বলা হয়। তাই স্ত্রীগণ স্বামীকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করতো এবং সতী সাধ্বীভাবে জীবন পরিচালনা করতো। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ রঞ্জাবতী-কর্ণসেন এবং লাউসেন-কলিঙ্গা-কানড়া এবং কালু ডোম-লখাইয়ের মধ্যকার সম্পর্ক, কর্তব্যজ্ঞান, স্বামী-সংসার ও সন্তানের প্রতি দায়ভার থেকেই মূলত বাঙালির দাম্পত্য ধারণার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে —

ক. কলিঙ্গাকে অভিভাবকদের উপদেশ

‘মায়ে ঝিয়ে প্রবোধে প্রবীণ যত লোক ॥
সুপুত্র হৈলে বৈসে সভার ভিতর।
সৈই কন্যা ধন্যা যে স্বামীর করে ঘর ॥’ -(পৃ-৪০৩)

খ. কলিঙ্গাকে রঞ্জাবতী

‘প্রবন্ধে করিয়া আগে রাখ প্রাণনাথ।
পতি বিনা যুবতী জনম এঁটোপাত ॥’-(পৃ-৪৭৯)

পতিভক্তি

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই স্ত্রীগণ পতি বা স্বামীদের দেবতার মতো ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সম্মান করতো। স্বামীকে ইহলোক ও পরলোকের পরিত্রাণকারী, অভিভাবক ও জীবন-জীবিকার যথার্থ অবলম্বন বিবেচনা করতো। স্বামীর সুখ ও মঙ্গলের জন্য বাঙালি নারীরা মুখ বুজে সকল অন্যায়-অত্যাচার-অপবাদ মুখ বুজে সহ্য করতে দ্বিধাবোধ করতো না।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ রঞ্জাবতী স্বামী কর্ণসেনকে দেবতা জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করে চাঁপাইয়ে শালে ভর দেবার অনুমতি প্রার্থনা করেছেন। আবার লখাই স্বামী কালু ডোমকেই জীবনের সৎগতির একমাত্র উপায় বিবেচনা করছে ––

ক. রঞ্জাবতীর পতিভক্তি

‘চাঁপায়ে সেবিব ধর্ম্ম তুমি আজ্ঞা দিলে ॥
সাক্ষাৎ দেবতা তুমি আজ্ঞা নাহি দিলে।
প্রসন্ন না হবে প্রভু সহস্র পূজিলে ॥’-(পৃ-৬৫)

খ. পতিভক্তির মাহাত্ম্য

‘রানী বলে স্বতন্তরা কভু নহি আমি।
গয়া গঙ্গা বারাণাসী স্বর্গপদ স্বামী ॥
সে রাঙ্গা চরণ বিনে অন্যে রাহি মতি।
পতি বিনে সংসারে নারীর নাহি গতি ॥’ -(পৃ-৭১১)

দাম্পত্য কলহ

বাঙালি নারীরা যেমন স্বামী সংসার সন্তানের স্বার্থ ও মঙ্গলের জন্য সব কিছু সহ্য করতো, তেমনি আবার স্বামীর আসক্তি, স্থূল রুচিবোধ, চরিত্রহীনতা পাপমতি কর্মকাণ্ডে অগ্নিমূর্তি ধারণ করতো। বিশেষ করে স্বামীর বহু বিবাহকে ও পিতা-মাতার অপমানকে কোন মতেই মেনে নিতে চাইতো না। এ নিয়ে দাম্পত্য কলহের সূত্রপাত ঘটতো।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ কালু-লখাই, হরিহর বাইতি ও তার স্ত্রী এবং দুই সতীন লখাই-সনকার মধ্যে ঝগড়া কলহ দেখা যায়। কালু ডোম ও লখাইয়ের মধ্যকার এ দাম্পত্য কলহ-স্কন্দ্ধ মূলত আদর্শের কারণে সংঘটিত হয়েছে–

কালু– হেদে লো ডুমনী শ্যালী ধাউতালী।
কে রাখে রাখুক দেখি নাক চুল কাটি ॥
সংসারে বিখ্যাত আমি কালু মহাবল।
এবে হনু চেড়ি তোর চাপড়ের তল ॥
লখাই– লখে বলে কাটিলে রাখিতে আছে কে।

প্রাণপতি গতি সতী যুবতীর দে ॥
শুন নাথ দেশের বারতা কিছু বলি।
প্রভু বিনা পুরী হলো সোঁতের শিউলি ॥
আমারে সপিয়া পুরী তুমি যাও ঘুম।
নরকে নিস্তার নাই নাড়িলে হুকুম ॥
কালু– শিঙ্গা তার বনে চল পালাইয়া যাই।
হেন সুখ সম্পদ সম্মান মুখে ছাই ॥
কি কাজে কাটাব মাথা কাহার লাগিয়া।
শুনিয়া ডোমনী ডোমে বলিছে আঁটিয়া ॥
লখাই– পাসরিলে পূর্ব্বপাড়া পুকুরের পাড়।
কত হবে সুজন আখের জাতি রাঢ় ॥
মাটির মাথর ভাড় ভাঙ্গা কুঁড়েঘর।
তখন তেমন দশা এক লক্ষেশ্বর ॥
সম্প্রতি ভোজন কালে কোলে থাল গাড়ু।
সুখে খেতে খুঁদকুঁড়া এবে তুচ্ছ লাড়ু ॥
বেজার হয়েছে বুজি খেতে খেতে ঘি।
জেতের স্বভাব নাথ তোর দোষ কি ॥' -(পৃ-৬১৭-৬১৯)

সাধভক্ষণ

মধ্যযুগীয় বাংলার হিন্দু সমাজে সামবেদীয় দশ সংস্কার অনুসরণ করা হতো। এগুলো হলো- গর্ভধান, পুংসবন, সীমান্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নিষ্ক্রমণ, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকর্ম, উপনয়ন ও বিবাহ। গর্ভবতী নারীর ৪র্থ মাসে সীমান্তোন্নয়ন, ৫ম মাসে পঞ্চামৃত, ৬ষ্ঠ মাসে পরমান্ন ভোজন, ৭ম মাসে সাধভক্ষণ ও নবম মাসে নববস্ত্র পরিধানের বিধান রয়েছে। বাঙালি সমাজে গর্ভবতী নারীদের সাধারণত পঞ্চম বা সপ্তম মাসে সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান করানোর প্রথা প্রচলিত রয়েছে। ধনী-গরীব নির্বিশেষ সাধ্যানুযায়ী পছন্দের খাবার ও নতুন বস্ত্রের মাধ্যমে ধূমধামের সঙ্গে এ অনুষ্ঠান পালন করতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রানী মন্থরা, রঞ্জাবতী ও কলিঙ্গার সাধভক্ষণের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয় —

রঞ্জাবতীর সাধভক্ষণ

'সাত মাসে হইল জীবের অধিষ্ঠান।
ধরণী মণ্ডলে ধনী ধর্ম্মকে ধেয়ান ॥
মহা পুণ্যোদয়য় হইল ময়না মণ্ডলে।
ভাজা ভুজা নানা দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলে ॥
আনন্দে অবধি নাই ময়না নগরে।
সাদরে সাধের দ্রব্য এসে ঘরে ঘরে ॥' -(পৃ-১১৬)

সাধের ব্যঞ্জন

বাঙালি গর্ভবতী নারীর সাধভক্ষণের খাবারের আয়োজনে কিছু নির্দিষ্ট রীতি প্রচলিত ছিল। সাধারণত টক-ঝাল, শাক-সবজি-আচার-চাটনি, মাছ, মাংস, পিঠাপুলি, মিষ্টান্ন এসবের অন্তর্ভুক্ত থাকতো।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ রানী মন্থরা, রঞ্জাবতী ও কলিঙ্গার সাধভক্ষণের জন্য নানা রকমের খাবার-দাবারের আয়োজন করতে দেখা যায় —

রঞ্জাবতীর সাধের ব্যঞ্জন–

‘আনন্দে অবধি নাই ময়ন নগরে।
সাদরে সাধের দ্রব্য এসে ঘরে ঘরে ॥
ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী চিনি চাঁপাকলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা ॥
মজা মর্ত্তমান মিছরী মিশাইয়া দই।
কাছে বসি হরিষে খাওয়ায় কোন সই ॥
ভাজা ভুজা নানা দ্রব্য ভুঞ্জে কুতূহলে।’ (পৃ-১১৬-১১৭)

গর্ভকালীন আচরণ ও বৈশিষ্ট্য

সাধারণত গর্ভবতী নারীর গর্ভ ধারণের প্রথম মাস থেকে শুরু করে সন্তান প্রসবের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ দশম মাস অবধি শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পট পরিবর্তন ঘটে। চতুর্থ মাস থেকেই মূলত গর্ভের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে দেখা দিতে শুরু করে। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ মন্থরা, রঞ্জাবতী ও কলিঙ্গা গর্ভকালীন অবস্থায় বিচিত্র ধরনের শারীরিক ও মানসিক আচরণ করেছেন। তবে রঞ্জাবতীর ক্ষেত্রে এ বিষয়টি চমৎকারভাবে উন্মোচিত হয়েছে —

ক. রঞ্জাবতীর গর্ভকালীন আচরণ

‘ভকতবৎসল বাঞ্ছা পুরিল রঞ্জার।
শুভদিনে হৈলে তার গর্ভের সঞ্চার ॥
প্রথম মাসের গর্ভ জানি বা না জানি।
কানাকানি করে লোকে দুমাসের কালে।
গর্ভবতী হৈলা রাণী ভর দিয়া শালে ॥
তিন মাসে কেমন কেমন করে গা।
ঘুমে আঁখি ঢুলুঢুলু মুখে ক্ষীণ রা ॥
অলসে এলায় অঙ্গ অন্ন নাহি রুচে।
ভাজা গুয়া ভোজনে অরুচি মুখে ঘুচে ॥
চারিমাসে চন্দ্রমুখী চঞ্চল চেতনা।
নূতন গর্ভিনী কিছু জানে না যন্ত্রনা ॥
দিনে দিনে বাড়ে রূপ বদনের ছবি।
ভূমে করে শয়ন সহিতে নারে রবি ॥
কুল কাসন্দি করঞ্জা অম্বলে যায় সাধ।
পুরুষ আবেশ বাড়ে মদন উন্মাদ ॥
পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত খেতে হৈল মনস্থির।
জন্মিল ছ মাসে পূর্ণ শিশুর শরীর ॥
সাত মাসে হইল জীবের অধিষ্ঠান।
ধরণী মণ্ডলে ধনি ধর্ম্মকে করে ধেয়ান ॥’-(পৃ-১১৫-১১৬)

প্রসবকালীন আচরণ উৎকণ্ঠা

প্রসবকালীন সময়ে বাঙালি নারীর নানারকম আবেগ-উৎকণ্ঠার বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। কারণ একদিকে মৃত্যুর ভয়, শারীরিক দুঃসহ যন্ত্রণা এবং অন্যদিকে সন্তান লাভের বাসনার যুগপৎ মানসিক অস্থিরতায় গর্ভবতী বিপর্যস্ত হতে শুরু করে। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রানী রঞ্জাবতীর সন্তান প্রসবকালে নানারকম আবেগ-আহাজারি ও উৎকণ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায় —

রঞ্জাবতীর প্রসবকালীন আচরণ

'ন মাসে প্রবেশে গর্ভ নিবড়ে অষ্টম।
দিনে দিনে বাড়ি গর্ভ গুরুতর শ্রম ॥
প্রসব বেদনা এসে আকর্ষিল কুঁখ।
দুঃখানলে মরমে মলিন চাঁদমুখ ॥
দুঃখ পায় শুনি ধাই ধাওয়াই আসি।
গায়ে দিল চন্দনাদি বাও করে দাসী ॥
ঘনশ্বাস ছাড়ে নারী ভূমে পাতে গা।
মরি মরি আর গো সহিতে নারি মা ॥
পিরুদাই প্রবোধে কথার দিয়া নেঠা।
এমনি প্রসব হবে চাঁদপারা বেটা ॥
জাঠা বাজে বচনে বিরস চিনি দই।
মা মরিগো সহিতে নারি সইগো সই ॥
এখন জানিলে কেন শালে ভর দিব।
জিউ যায় দিদি গো আর নাহি জীব ॥
বেগ দিয়া বুন গো বিধাতার ছার মুখ।
এখনি প্রসব হবে আর নাতি দুঃখ ॥
দাসী বলে হাতে ধরে উঠে হেঁটে বুলো।
বসে থাকা ভাল নহে দাই কেন ভুলো ॥
তেল জল কুঁখে মুখে দুখে দেয় সীতা।
থু থু করে ফেলে রাণী সব লাগে তিতা ॥
প্রসব মারুতে শিশু হইল ভূমিষ্ঠ।'-(পৃ-১১৭-১১৮)

নবজাতকের আতুড় ঘর কেন্দ্রিক আচার

বাঙালি সমাজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই আতুড় ঘরে বেশ কিছু আচার প্রচলিত রয়েছে। এসবের মধ্যে আতুড় ঘরের চালের খড় দিয়ে আগুন প্রজ্জ্বলন, নাড়ি ছেদন, জোকার বা উলুধ্বনি, শঙ্খবাদ্য বাজানো, ছয়দিনে ষষ্ঠীপূজা, সাত দিনে উঠানি, জাতকর্ম নান্দীমুখ যজ্ঞ, নাম রাখা, ৬ষ্ঠ মাসে অন্নপ্রাশন, ৫ম বছরে হাতেখড়ি ও কর্ণভেদ, ৭ম বছরে উপনয়ন করা হয়।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতী, লাউসেন ও চিত্রসেনের জন্মের পর সন্তানের কল্যাণ বা মঙ্গলার্থে আতুড় ঘরে বেশ কিছু আচার উৎসব পালন করতে দেখা যায় —

ক. লাউসেনের আতুড় ঘর আচার

‘আনন্দে নাহিক ওর   পুত্র হইল চিত্ত চোর
চাঁদমুখ চান রাজরাণী।
বেদ বিধি কুল ধর্ম   যত্নে যত জাতকর্ম
করে কর্ণসেন নৃপমণি ॥
ছেদন করিয়া নাড়ী   সপুরট পাট সাড়ী
ধাত্রী পাইল কতেক সম্মান।
চিন্তিয়া পুত্রের ক্ষেম   মহারাজ কত হেম
দুঃখী দ্বিজ দেখি দিল দান ॥-(পৃ-১১৯)

অন্নপ্রাশন ও অন্যান্য আচার

বাঙালি সমাজে সাধারণত নবজাতক সন্তানের কল্যাণে ছয় মাসে অন্নপ্রাশন, নান্দীমুখ যজ্ঞ, নাম রখো, পাঁচ বছরে হাতেখড়ি ও কর্ণভেদ এবং জাওয়াতি অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে দেখা যায়।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ রঞ্জাবতী ও লাউসেনের জন্মের পর অন্যান্য আচারের মতো অন্নপ্রাশনও করা হয় —

ক. লাউসেনের অন্নপ্রাশন

‘হরিষে হরিদ্রা তৈল মাখায়ে কৌতুকে।
দুলালে দুলাল কোলে চুম্ব দেন মুখে ॥
সুখে সাধে সুন্দরী বালকে করি কোলে।
তিন মাসে অভিলাষে বন্ধুবাসে বুলে ॥
সাধে অন্নপ্রাসন করিল ছয় মাসে।
নানা অলঙ্কার দিল মনের উল্লাসে ॥’-(পৃ-১৩৮)

সখী বা মিতা পাতানো

বাঙালি সমাজে সাধারণত ছেলে-মেয়েদের মধ্যে নামের সাদৃশ্য অথবা আনুষ্ঠানিক ভাবে সখী ও মিতা পাতানো হতো। এসব সখী ও মিতাগণ নিকট আত্মীয় বলে গণ্য হতো। ধূমধাম ও আড়ম্বরতার সঙ্গে হাতে লাল-নীল সুতা বেঁধে এ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হতো। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ লাউসেনের মিতা লাউদত্ত কর্মকার, কলিঙ্গার সই এবং জামতি পালা অংশের গ্রাম্যবধূ শীলার সইয়ের উল্লেখপাওয়া যায় —

ক. লাউসেনের মিতা

‘আমি পরিচয় করি শুন সুমহত্ত্ব।
কর্ম্মকার কুলে জন্ম নাম লাউদত্ত ॥
এত শুনি মিতা বলে রায় দিল কোল।
নত হয়ে কহে দত্ত আনন্দে বিভোল ॥
কৃপা করি আমারে করিলা তুমি মিতা।
গুহকে চণ্ডালে যেন অখিলের পিতা ॥’-(পৃ-৩১৪)

খ. কলিঙ্গার সই

‘কৌতুকে কামিনী কন্যা কলিঙ্গার সই।
কপালে চন্দন দিয়া পায়ে ঢালে দই ॥
মুখ হেরি কান্দে যত খেলাবার সখী।
ছলছল করে দুটি কলিঙ্গার আঁখি ॥-(পৃ-৪০০-৪০৩)

অলংকার

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে নর-নারী উভয়েই অলংকার ব্যবহার করতো। সাধারণত হীরা-মণি-মুক্তা, স্বর্ণ-রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, শঙ্খ ও ফুলের অলংকার প্রচলিত ছিল। মেয়েরা মাথায়- টোপর, সিঁথি পাট, টিকলি, টায়রা পরতো, গলায় পরতো-হাসুলি, হার, চেইন, টাকার ছড়া, তাবিজ ও কবচের ছড়া, কানে দিতো- কানফুল, কুণ্ডল, ঝুমকা, বালি, কানবালা, মদনকড়ি, দুল, রিং ও পাসা, হাতে পরতো- কঙ্কণ, বালা, বলয়, চুড়ি, তাড়, খাড়ু, অঙ্গদ, পেচি, তাগা, বাহুতে দিতো- বাজুবন্দ, কেয়ূর, জসম, গ্রীবায় পরতো- গ্রীবাপত্র, নাকে দিতো- নথ, বেসর, নাকছাবি, নাকফুল, কোর, ডারবোলক, কোমড়ে দিতো- বিছা, চন্দ্রহার ও কিঙিকণী, পায়ে দিতো- নূপুর, পাঁসুলি, ঘুঙুর, মল, খাড়ু, উছটি, হাতের আঙুলে দিতো- আংটি এবং পায়ের আঙুলে দিতো- উনচট ও রতনচূড় আংটি প্রভৃতি। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ বিভিন্ন জনের বিয়ে, স্বামী সান্নিধ্য গমন ও নিজেকে আকর্ষণীয় করে তুলতে উপর্যুক্ত অলংকার ব্যবহার করতে দেখা যায় —

ক. নয়ানীর অলংকার

‘আরোপে অলকা কোলে মুকুতার পাতি।
সীমন্তে রচিয়া দিল সুবর্ণের সিঁথি ॥
অঙ্গে পরে অপূর্ব্ব অনেক অলংকার।
প্রবালে পুরট পাঁতি গজমতি হার ॥
দোসুতি তেসুতি মতি হেম কণ্ঠমাল।
গোরা গায় গজমতি গর্ব্ব করে ভাল ॥
নাসায় বেশর পড়ে করিয়া লাবণ্য।
কানে পরে কুণ্ডল কনক টাকা কড়ি।
করেতে কঙ্কণ শঙ্খ বাজুবন্দ ছড়া।
নাগর ভুলাতে চায় দিয়ে তাহ নাড়া ॥
পরিল পুরট টাড় বিচিত্র বাউলী।
কটিতে কিঙ্কিণী পরে পাদাগ্রে পাসুলী ॥
অপর যে পদ্মভূষা পাতা গোটা মল।
গরব গমনে কত পুরুষ পাগল ॥’-(পৃ-২৬১)

খ. ইছাইয়ের যুদ্ধালংকার

‘তড়িতে জড়িত যেন জলধর জ্যোতি।
হারামণি হার গলে কানে গজমতি ॥
ধনুক বন্দুক আদি আচ্ছাদিত ঢাল।’-(পৃ-৫১৭)

প্রসাধনী ও রূপচর্চা

মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যের পূজারী। আর নারীরা সহজাত ভাবেই সাজসজ্জা প্রিয়। ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠান, বিবাহ ও স্বামী সান্নিধ্যে যাবার পূর্বে নর-নারী উভয়েই প্রসাধন পরিচর্যা করতো। প্রসাধনী হিসেবে- সিঁদূর, কাজল, চন্দন, অগুরু,গোলাপজল, কস্তুরী, কুমকুম, কর্পূর, হলুদ, সুগন্ধি তেল, আতর, আলতা, আমলকি ও ফাউগ ব্যবহৃত হতো। এছাড়া পান শুধু মুখশুদ্ধিতে নয়, বরং ঠোঁট রাঙানোর প্রসাধনী হিসেবেও এর বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ রঞ্জাবতী, কলিঙ্গার বিয়ে ও স্বামী সান্নিধ্যে যাবার সময় এবং নয়ানী ও দেবী দুর্গা লাউসেনকে ভুলাতে নানা রকম রূপচর্চা ও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করেছে ––

রঞ্জাবতীর রূপচর্চা বা প্রসাধন

‘মালিকী কল্যাণী হেথা অশেষ বিশেষ।
শশী মুখী রাণীর রচিল লাসবেশ ॥
আঁচারিয়া চাঁচর চিকুরে চিত্রবেণী।
বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বা দিকে টালনি ॥
করবী মণ্ডিত মাল্যে মনোহার ফুলে।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রম অলিকুলে ॥
পিঠে লোটে পট্টজাদ পুরটের ঝাঁপা।
সারাগায় গন্ধময় গন্ধরাজ চাঁপা ॥
কানে পরে কুণ্ডল কনক কাটা কড়ি।
পরিল বেসর নাকে বেশ হইল বড়ি ॥
রতন মুকুরে রাণী দেখে মুখছবি।
কপালে সিন্দুর শোভা প্রভাতের রবি ॥
চন্দন চন্দ্রমা কোলে কজ্জলের বিন্দু।
ভুরুযুগ উপরে উদয় অর্দ্ধ ইন্দু ॥
বুকে বান্ধে কাঁচালি সঙ্কেত অভিলাষে।
পরশে রাজার হস্ত খসে অনারাসে ॥
চিয়ায় চাপায়ে গায় চন্দন কুমকুম।-(পৃ-১১০-১১১)

সাবান ও খার

বাঙালি সমাজে নর-নারী স্নানে যেমন সুগন্ধি সাবান, গোলাপজল ও তিলপাতা ব্যবহার করতো, তেমনি জামা-কাপড়, কাঁথা পরিষ্কার করতে খার চুন ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল।‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ রজক বা ধোপাদের কাপড়-চোপড় ধুতে খার ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ খার তৎকালে সাবানের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হতো ––

‘পশ্চিম উদয় মিছে পর্ব্বতের আলা।
রজকে পোড়ায় ক্ষার স্তুপাকার পালা ॥-(পৃ-৬৮৪)

নাম রাখা

বাঙালি হিন্দু মুসলিম সমাজে নবজাতক সন্তানের নাম রাখার ক্ষেত্রে সাধারণত কতগুলো বিষয়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে নাম রাখা হতো। এসব বিষয় হলো- দেব-দেবী, পৌরাণিক চরিত্র, আল্লাহর গুণবাচক নাম, নবী-রাসুল, খলিফা-সাহাবা, ফুল-ফল, গ্রহ-নক্ষত্র, শস্য-মশলা, মাছ, মূল্যবান পাথর, অস্ত্র, রোগ, তৈজসপত্র, অঞ্চল, পেশা, বর্ণ, গোষ্ঠী ও নদী। এসব বিষয়ের সঙ্গে মিল বা সাদৃশ্য রেখেই মূলত বাঙালি ছেলে মেয়েদের নাম রাখার প্রথা প্রচলিত ছিল।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ লুহিশ্চন্দ্র, লাউসেনের নাম রাখা হয় এ ধর্মীয় বিধান মোতাবেক। আবার বাঙালি নারী নামের ঐতিহ্য ধরা পড়ে জামতিনগরের পতি নিন্দাকারিণী নারীদের নামের মাধ্যমে ––

ক. লুহিশ্চন্দ্রের নামকরণ

'কন প্রভু সন্ন্যাসীর বেশে।
জ্যেষ্ঠ যে তনয় হবে   লুহিশ্চন্দ্র নাম থোবে
বলি দিবে ধর্মের উদ্দেশ্যে ॥-(পৃ-৩১)

খ. বাঙালি নারীর নামকরণ

'কহে চন্দ্রকলা   শুন গো বিমলা
আমার ঐ নায়ে ভরা ॥
সাধুর নন্দিনী   বলে সাঙ্গাতিনী
স্বামীটা বিদেশী মোর।
শীলা বলে ফুল   বরঞ্চ ও ভাল
মোর দুখ শুন সই।
হীরা বলে অবা   হাবা গোবা বোবা
বিধাতা ঘটালো মোরে।
করিয়া চাতুরী   বারুয়ের নারী
নয়ানী করিছে মানা ॥' -(পৃ-২৫৮-২৬০)

বস্ত্র

বাঙালি সমাজে হিন্দু ও মুসলমানদের পোশাকের ভিন্নতা ছিল। তবে মুসলিম শাসনামলে অভিজাত হিন্দুদের পোশাকে মুসলমানী ঢং চলে আসে। হিন্দুরা সাধারণত ধুতি, চাদর বা উত্তরীয়, শাড়ি বা কাপড়, কৌপীন, গামছা ব্যবহার করতো। উচু বর্ণের হিন্দুরা কাঠের খড়ম বা জুতা ও পৈতা ধারণ করতো। মুসলিম সমাজে লুঙ্গি বা তহবন, কুর্তা, টুপি, পাগড়ি, ইজার বা পায়জামা, পাঞ্জাবি, আলখেল্লা, নিমা, চাপকান, নাগরা জুতা, মোজা, শাড়ি, কামিজ, সালোয়ার, বণ্ডাউজ, ছায়া, শেমিজ, ঘাগড়া, ওড়না ও বোরকার প্রচলন ছিল। তবে সাধারণ দরিদ্র বাঙালি গামছা, লুঙ্গি, গেঞ্জি, কাপড় ও কৌপীন ব্যবহারেই সীমাবদ্ধ ও সন্তুষ্ট থাকতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির পরিধেয় এমন পোশাক বা বস্ত্রের সন্ধান পাওয়া যায় —

ক. ধুতি ও শাড়ি

'বান্ধব পুরট পাগ পরো পট্টধুতি।
দলুই সবার কানে দোলাইব মতি ॥
নারীগণে তোমার পরাব পাটশাড়ী।' -(পৃ-৩৪৭)

খ. শাল ও পাগড়ি

'শিঙ্গা বলে এল্যে মাল   শুন্যা রঞ্জা দিল শাল।
সোনালী শিরোপ সরোবন্দে ॥-(পৃ-১৮৩)

গ. পুরুষের যুদ্ধ পোশাক

'এত বলি সাজনি করিছে সবিশেষে।
অধোবস্ত্র ইজার উজার অধদেশ ॥
পায়ে পরে পট্টজোড়া পুরটে রচিত।
কত বর্ণে কাদম্বিনী তড়িত জড়িত ॥

কোমর কসনি করে বসন বিমলে।
পরিসর পুরট পট্টকা তার কোলে ॥
শিরে বান্ধে সরবন্দ সুবর্ণের চীরা।
বিন্দু ইন্দু বান হেম মাঝে পঞ্চহীরা ॥
আভরণ পরিয়া উড়নি গায়ে শাল।'-(পৃ-১৯৪-১৯৫)

খাদ্য দ্রব্য

বহুকাল পূর্ব থেকেই বাংলার অধিবাসীদের বলা হতো 'মাছে ভাতে বাঙালি'। মাছ আর ভাতই ছিল বাঙালির প্রদান খাবার। হিন্দু ও মুসলমানদের খাবারে কিছুটা বৈচিত্র্য ও বিধি নিষেধ ছিল। হিন্দুদের প্রাত্যহিক খাবার হিসেবে- ভাত, মাছ, দই, দুধ, কলা, ডাল, শাক-সবজি, নিরামিষ ও খিচুড়ি প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে অভিজাত মুসলিম সমাজ বিভিন্ন প্রাণির মাংস (গরু, মহিষ, উট, ছাগল, ভেড়া), রুটি, বিরিয়ানী, খিচুড়ি, কোর্মা, পোলাও, কালিয়া, কাবাব, রেজালা, কোপ্তা, মোগলাই পছন্দ করতো। হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণিই খাবারের সঙ্গে চাটনি, আচার, আমসি, কাসুন্দি, সালাদ, বোরহানি, টক-ঝাল-ঝোল ও খাটনা খেতে পছন্দ করতো। দরিদ্র বাঙালির প্রাত্যহিক খাবার তালিকায় থাকতো — ভাত, পান্তাভত, বাসীভাত, খুদের ভাত, জাউ, ছাতু, খাটনা, আলুপোড়া, চাল ভাজা, মরিচ বাটা ও বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা প্রভৃতি।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির এ বিচিত্র রকমের খাবারের পরিচয় পাওয়া যায় —

'কুল কাসন্দি করঞ্জা অম্বলে যায় সাধ।
'ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী চিনি চাঁপা কলা।
পাঁচ পিঠা প্রচুর পায়েস পাতখোলা ॥
মজা মওমান মিছরী মিশাইয়া দই।'-(পৃ-১১৬-১১৭)
'সম্প্রতি ভোজন কালে কোলে থাল গাড়ু।
'মুখে খেতে খুঁদকুঁড়া এবে তুচ্ছ লাড়ু ॥
বেজার হয়েছ বুঝি খেতে যেতে ঘি।'-(পৃ-৬১৯)

শুকনো খাবার

বাঙালি সমাজে শুকনো খাবার হিসেবে প্রচলিত ছিল– চিড়া, মুড়ি, খৈ, মোয়া, বিন্নি, বাতাসা, খাজা, নাড়ু, কদমা, লাড্ডু ও বিভিন্ন প্রকার টানা প্রভৃতি। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব শুকনো খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায় —

'মুয়া মুড়ি মুড়কি মধুর মত্তমান।
পরিপাটী পাঁচ ভুজা করে জলপান ॥'-(পৃ-৪৬৪)

মিষ্টান্নজাত খাদ্যদ্রব্য

বাঙালি সমাজে মিষ্টি জাতীয় খাবার খুব জনপ্রিয় ছিল। এসব খাবারের মধ্যে– তালের গুড়, আখের গুড়, খেজুরের গুড়, দই, ঘোল, মাঠা, মাখন, ছানা, সন্দেশ, ছানাবড়া, লুচি, ক্ষীর, পায়েস, পনির ফিরনি, ক্ষীরসা, শিখারিনী, রসগোল্লা, চমচম, অমৃতী ও জিলাপী অন্যতম। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির জনপ্রিয় মিষ্টিজাত খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় —

ক. 'সঝাল বক্কাল কত মিছরি মিশাইয়া।
দুগ্ধ মারি ক্ষীর করি রাখে জুড়াইয়া ॥

উড়ি চেলে গুড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীরখণ্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা ॥
ঘৃতপক্ক লুচি পুরী নাগর উদ্দেশে।
অপূর্ব্ব উড়ির অন্ন রান্ধে অবশেষে ॥'-(পৃ-২৯৮)

পিঠা

বাঙালি জাতি বিভিন্ন ঋতুতে বিচিত্র ধরনের পিঠা খেতে পছন্দ করতো। এসব পিঠার মধ্যে — চিতই, ভাঁপা, পাটি সাপটা, পাকোয়ান, তালপিঠা, বড়া, তিলকুলী, দুধকুলী, ক্ষীরপুলি, মোরগ সংসার, রুটি পিঠা, ছিদ রুটি, ধুয়াপিঠা, জলপিঠা, ভিজানো পিঠা, তেল চিতই ও হাতে কাটা সেমাই অন্যতম। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির এসব পিঠার উল্লেখ পাওয়া যায় —

'উড়ি চেলে গুড়ি কুটি সাজাইল পিঠা।
ক্ষীরখন্ড ছানা ননী পুর দিয়া মিঠা ॥'-(পৃ-২৯৮)

মাছ

বাঙালি সমাজে মাছ জনপ্রিয় খাবার হিসেবে পরিচিত। নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুরে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেতো। এসব মাছের মধ্যে — ইলিশ, বোয়াল, রুই, পাঙ্গাস, শৈল, কৈ, পুটি, টেংরা, বাইন, খৈলশা, শিং, মাগুর, ফলি, চিতল, কাতল, ভেটকি, মৃগেল, চিংড়ি, পোনা মাছ, বেলে, আইর, রিটা, মেনি, বাটা, নওলা, তেলাপিয়া, কার্ভু ও শুটকি মাছ অন্যতম। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি এসব প্রিয় মাছের উল্লেখপাওয়া যায় —

'মঞ্চে বসে মৎস্যে কালু মহাবল।
রোহিত মৃগাল বাটা ফলুই চিতল ॥'-(পৃ-৪৯০)

শাক

বাঙালির প্রাত্যহিক খাবার তালিকায় বিভিন্ন ধরনের শাকের উল্লেখপাওয়া যায়। এসব শাকের মধ্যে — নলিতা শাক (পাট), গিমাশাক, পোলতাশাক, লাউশাক, কুমড়া শাক, পালংশাক, লালশাক, বৈতাশাক, মটরশাক, খেসারী শাক, কলই শাক, সরিষা শাক অন্যতম। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির প্রাত্যহিক খাদ্য দ্রব্যের তালিকার অন্তর্ভুক্ত এসব শাকের উল্লেখপাওয়া যায় —

'পরিপাটী করিয়া নাটিনী করে পাক।
ঘনকাটি করিয়া পুয়ালি নটা শাক ॥
বেথ্যা শাক ভাজিয়া সোনার থালে রাখে।
নবীন নালতা শাক ঘৃত দিয়া ছাঁকে ॥-(পৃ-৭২৫)

মসলা দ্রব্য

বাঙালি সমাজে রান্না বান্নায় নানারকম মসলার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এসব মসলার মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের তেল (সরিষা, তিল, তিশি ও ঘি), আদা, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, গরম-মসলা, মরিচ, হলুদ, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা, তেজপাতা, কালোজিরা, পেয়াজ, রসুন ও জয়ফলের বহুল ব্যবহার ছিল।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির ব্যবহৃত মসলা সমূহের উল্লেখরয়েছে —

'ঘৃতে সাঁতলিয়া নামায় ঘন্ট অপরূপ।
সুপ রান্ধে সুন্দরী ঘুরিয়া দেয় কাটি।

হরিদ্রাদি আসি তুলে মশলা পরিপাটি ॥
তুলাইয়া কোলে রাখে সুবর্ণ কটরা।
আদা ঝাল দিয়া রান্ধে মালের লকরা ॥'-(পৃ-৭২৫)

রান্না বান্না

বাঙালি সমাজে ধনী-গরীব নির্বিশেষে গৃহবধূ বা বাড়ির গিন্নীকেই নিজ হাতে রান্না-বান্না করার প্রচলন ছিল। গৃহভৃত্য বা কাজের ঝিগণ গৃহবধূদের রান্নায় সহায়তা করতো মাত্র। সকালে স্নান করে তারপর রান্নার আয়োজন করতো এবং তা নিজ হাতেই কর্তা ব্যক্তিদের খাবার পরিবেশন করতে হতো। রান্নার সাফল্যই গৃহবধূর কৃতীত্ব ও কর্তৃত্ব বয়ে আনতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রানী রঞ্জাবতী ও কলিঙ্গা থেকে শুরু করে সুরিক্ষা বারাঙ্গনাকেও রান্না বান্নায় সুনিপুণ ও দক্ষ হতে দেখা যায় —

রাণী রঞ্জাবতী ও কলিঙ্গার রান্নাবান্না

'কলিঙ্গা সহিত তবে রাণী রঞ্জাবতী ॥
স্নান পূজা করি রাণী করিল রন্ধন।
শাক সুপ সঝোল সুকুতা সুখামন ॥
বেসরে বেস্বর ঘণ্টে সুরসাল ঝালে।
পরিপাটী পাঁচ ভাজা পুরটের থালে ॥
আলু ওল পটল পনস পানফল।
কদলী করলা কিছু কুষ্মাণ্ড কমল ॥
মজাকলা ভাজা তৈলে ঘৃতে টস্‌টস্‌।
ক্ষীরখণ্ড পায়স পিষ্টক পাঁচ রস ॥'-(পৃ-৪৭৮)

ভোজন প্রক্রিয়া

বাঙালি সাধারণত দিনে তিনবার (সকাল, দুপুর ও রাত) খাবার খেতে অভ্যস্ত ছিল। নর-নারী উভয়েই স্নান সেরে, উপাসনা করে পূত ও পবিত্র হয়ে বিধাতার নাম স্মরণ করে পাটি বা পিঁড়িতে বসে খাবার খেতো। গৃহবধূ বা মায়েরা খাবার পরিবেশন ও হাত পাখা দিয়ে বাতাস করতো। খাবার শেষে পান ও কর্পূর দিয়ে মুখ শুদ্ধির প্রথা প্রচলিত ছিল।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রাজা কর্ণসেন ও দুই পুত্র লাউসেন ও কর্পূরকে স্নান করে, পূজা সম্পন্ন করে তারপর একত্রে বসে পঞ্চাশ ভোজন করতে দেখা যায়। রান্নার মতো ব্যঞ্জন খাবার পরিবেশন ও করেছেন রানী রঞ্জাবতী ও পুত্রবধূগণ দাসীরা শুধু রানীদের সহায়তা করেছে মাত্র —

'স্নান করি দাসী আসি আসন যোগায়।
দুদিকে দুই পুত্র বৈসে মধ্যে বৃদ্ধ রায় ॥
উত্তম আতপ অন্ন সুবর্ণ ভাজনে।
পরিপাটী বাটী বাটী পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে ॥
আগে দিল প্রাণনাথ পিছু দুই পুত্র।
হরিষ বিষাদে আঁখি ছলছল নেত্র ॥
বেদ বিধি ভোজন করিয়া বুহ সুখে।
মুখ শুদ্ধি করি রাজা বসিল কৌতুকে ॥'-(পৃ-৪৭৮-৪৭৯)

খাবার থালা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে খাবার পাত্র হিসেবে কলাপাতা, বাটির বাসন, টিনের থালা, চীনা মাটির থালা, রূপার-থালা, সোনার থালা ব্যবহৃত হতো। সাধারণত বারোয়ারি পূজা, শ্রাদ্ধ, কীর্তন, মিলাদ, মৃত্যুবার্ষিকীতে কলাপাতা ব্যবহার করা হতো। গরীব শ্রেণি মাটির বাসন ও টিনের থাল ব্যবহার করতো। অন্যদিকে সামন্তরাজা, জমিদার ও অভিজাত শ্রেণি রূপা ও সোনার থাল ব্যবহার করতো। বিদেশ থেকে আনা হতো কাঁচ বা চীনামাটির কারু কার্যময় থালা-বাসন। এসব রূপা ও সোনার থালা একই সঙ্গে বংশীয় আভিজাত্যের প্রতীক বলে বিবেচিত হতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' দক্ষিণ ময়নার সামন্তরাজা কর্ণসেনের গৃহে এবং গোলাহাটের সুরিক্ষা বারাঙ্গনার গৃহেও সোনার থালার উল্লেখপাওয়া যায় —

ক. 'সুরসাল দিয়া ঝাল হেম থালে ঢালে।
তারে রান্ধে বেসারু ব্যঞ্জন ঝোল ঝালে ॥'-(পৃ-২৯৮)

খ. 'বেসরে বেম্বর ঘণ্টে সুরসাল ঝালে।
পরিপাটী পাঁচ ভাজা পুরটের থালে ॥'-(পৃ-৪৭৮)

মুখ শোধন

বাঙালি সমাজে খাবারের পর মুখ শুদ্ধির প্রচলন ছিল। সাধারণত পান, কর্পূর, কুস্তুরি ও এলাচসহ সুগন্ধি দ্রব্য দিয়ে মুখ শুদ্ধি করা হতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির পান, কর্পূর সহযোগে খাবার পর মুখশোধন প্রক্রিয়ার চিত্র পাওয়া যায় —

'বেদবিধি ভোজন করিয়া মহাসুখে।
মুখশুদ্ধি করি রাজা বসিল কৌতুকে ॥'-(পৃ-৪৭৯)

নেশাজাত দ্রব্য

বাঙালি সমাজে ধনী ও দরিদ্র শ্রেণির মধ্যে নেশা করার প্রবণতা ছিল। বাঙালির নেশাজাত দ্রব্যের মধ্যে — গাজা, ভাঙ, আফিম, ধুতুরা, সিদ্ধি, চরস, তাড়ি ও আমানী (পচাভাত থেকে তৈরি) অন্যতম। হালকা নেশাজাত দ্রব্য হিসেবে গুল, সুপারি, জর্দা, তামাকের প্রচলন ছিল। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির নেশাজাত দ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায় —

ক. সুরা ও সিদ্ধি

'সব দোস্ত আইস পোস্ত সুরা সিদ্ধি খাই।
কালচিতা বলে মিতা এই বটে ভাই ॥'-(পৃ-১২৯)

খ. গাজা-মদ

'ভাজা ভুজা গাঁজা পোস্ত ঘোঁটা সিদ্ধি সুরা।
সেজে লও সরস কলসী পাঁচ পুরা ॥'-(পৃ-৪৬৩)

গ. পচানো মদ

'এত ভাবি কয় শুঁড়ি কাঁপিতে কাঁপিতে ॥
গাড়া মদ মাটিতে পুরান সাত ঘড়া।
আজ্ঞা কন এনে দিব অকালের ভাড়া ॥'-(পৃ-৫৯৯)

আপ্যায়ন ব্যবস্থা

বাঙালি প্রাচীন কাল থেকেই অতিথিপরায়ন জাতি। আগত অতিথিকে বাঙালি আদর-আপ্যায়ন ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহার দিয়ে মনজয় করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতো। অতিথি আপ্যায়নের পর্যায় পড়ে – কুশলাদি বিনিময়, নাস্তা হিসেবে শরবত, চিড়া-মুড়ি, গুড়, খৈ, দুধ, কলা প্রদান, বড় খাবার হিসেবে মাছ, মাংস, মিষ্টি জাতীয় খাবার পরিবেশন, ঘুমানোর উত্তম ব্যবস্থা করা, বিদায় বেলা বস্ত্রসহ নানা উপহার প্রদান করে বিদায় জানানো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' জামতি নগরের লাউদত্ত কর্মকার লাউসেন ও কর্পূরকে এবং সিমুলা রাজকন্যা কানড়া কালু ডোমকে নানা খাদ্য দ্রব্য ও বিনয়ের মাধ্যমে অতিথির আপ্যায়ন করেছে —

লাউদত্তের আপ্যায়ন ও বিনয়

'জোড় হাতে কহে কালি যেয়ো রাজপুরে।
কৃপা করি আজি এস আমার মন্দিরে ॥
অতিথির ভাবে সেন গেলা তার বাস।
স্বগোষ্ঠী সহিত বলে পূর্ণ অভিলাষ ॥
পরিবার সহিত সেবক হয়ে সেবে।
জ্ঞানবান গৃহস্থ যেমন গুরুদেবে ॥
দুই চারি বচন শুধান ভক্তিবশে।
পরিপাটী ভোজন করায়ে পাঁচ রসে ॥
দক্ষিণ দলুজে দিব্য আসন উপরে।
বার দিল বেষ্টি দুই ভেয়ে যত নরে ॥'-(পৃ-৩১৫)

পানের ব্যবহার

বাঙালি সমাজে পানের বহুমাত্রিক ব্যবহারের প্রচলন ছিল। পান একাধারে আপ্যায়নের বস্তু, মুখের প্রসাধনী, কাজের পুরস্কার বা উপহার, আনুগত্য গ্রহণের প্রতীক, কাজে নিয়োগদান কালে পান প্রদান, আত্মীয় বাড়ির উপহার দ্রব্য ও বিবাহের অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হিসেবে পান ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি জীবনে পান- প্রসাধনী, উপহার দ্রব্য, শুভ কর্ম বা বিয়ের পাকা কথা বা প্রতিশ্রুতির প্রতীক এবং আপ্যায়ন হিসেবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় —

ক. আপ্যায়নের বস্তু

'কাটা গুয়া সাঁটা পান নিল বাটা ভরি।
হাসি হাসি শশীমুখী তোষে প্রাণনাথে।
বামে বসে তাম্বুল যোগায় হাতে হাতে ॥'-(পৃ-৪৮২)

খ. প্রসাধনীর বস্তু

'বসিয়া ভক্ষণ করে কর্পূর তাম্বুলী ॥
রসের দর্পণে রামা মুখ দেখে চেয়ে।
মনে হল নাগরে মোহিব মাত্র যেয়ে ॥
বসিয়া নাপান করি খান পান গুয়া ॥'-(পৃ-২৬১)

গ. সম্মতি প্রদানের প্রতীক বস্তু

'হের এস আগিয়ে অভয় পান লও।
কোনো চিন্তা নাই গো কথায় সায় দেও ॥'-(পৃ-৬০৫)

ঘ. কাজে নিয়োগ দানের প্রতীক হিসেবে

‘হুকুম করিল রাজা পান দিয়া হাতে।
লুট শুনে সহজে চোয়ার সব মাতে ॥’-(পৃ-৪৯০)

শিক্ষা ব্যবস্থা

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে শিক্ষার কেন্দ্র বা বিদ্যপীঠ হিসেবে টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মঠ, আশ্রম, গুরুগৃহ, মাদ্রাসা, মক্তব, খানকাহ, ও মসজিদ ব্যবহৃত হতো। গুরু বা পণ্ডিত এবং মোল্লা-মওলানা বা ওস্তাদের মাধ্যমে ছাত্র-শিষ্যদের বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করা হতো। এসব পঠিত বিষয়ের মধ্যে — ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, নাটক, সঙ্গীত, স্মৃতি শাস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, দর্শন, অভিধান, গণিত, কারিগরি, নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, পদার্থ, জ্যামিতি, বীজগণিত, চিকিৎসা শাস্ত্র ও রতিশাস্ত্র অন্যতম। হিন্দু সমাজে ‘হাতেখড়ি’ ও মুসলিম সমাজে ‘বিস্‌মিল্লাহ খানি’ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আড়ম্বরতার সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষা শুরু হতো। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ বাঙালির শিক্ষা ব্যবস্থার পরিপূর্ণ চিত্রের উল্লেখপাওয়া যায়–

পঠিত বিষয়সমূহ

‘রায় কর্ণসেন হেথা আনন্দিত মনে।
বিদ্যারম্ভ করি পুত্রে পড়নে যতনে ॥
আকারাদি ককারন্ত জানা হৈল স্বর।
ককারাদি ক্ষকারান্ত হল বর্ণাপর ॥
অভিলাষে অঙ্ক আস্ক ফলাদি বানান।
তিনদিনে দুই ভেয়ে যতনে শিখান ॥
অষ্টধাতু অষ্ট সিদ্ধি সুবন্ত অনর।
পড়িল অঙ্কের ভেদ বন্ধে করি ভর ॥
ধাতু নাম শব্দ ভেদ পড়িল অপর।
পরম সুবেশে দোঁহে সুশীল সুন্দর ॥
বেদ বাণী জানিতে পাণিনি পড়ে রায়।
এতদুরে সম্প্রতি সঙ্গীত পালা সায় ॥
বল বন্ধে লাউসেন বাড়ে প্রতিদিন।
বেদজ্ঞান বিজ্ঞ হন পড়িয়া পাণিন ॥
কাব্য অলংকার কোষ আগম নিগম।
জ্ঞান ধর্ম্ম বিদ্যায় বাড়িল দুই ভাই।
অতঃপর মল্ল বিদ্যা শিখাইতে চাই ॥’-(পৃ-১৪০-১৪১)

শিক্ষাগুরুর মান ও মর্যাদা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে শিক্ষক-পণ্ডিত ও ওস্তাদের সম্মান-মান-মর্যাদা ছিল অতি উচ্চ মার্গের। ছাত্র-শিষ্যগণ শিক্ষকদের সালাম-আদাব, প্রণাম-কদমবুছি সহকারে ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। গুরুর সঙ্গে সর্বদা বিনয় সহকারে ও বিনম্র মনোভাব নিয়ে ছাত্র ও অভিভাবকগণ মিশতেন। রাজ দরবার থেকে কৃষকের কুটীর পর্যন্ত শিক্ষাগুরুর বিশেষ কদর ও সম্মানের আসন ছিল। শিক্ষকের আদেশ-নিষেধকে ছাত্ররা বেদ বাক্যের মতো মানার চেষ্টা করতো। শিক্ষাগুরু ছিলেন বাঙালি সমাজে পরম পূজনীয় ও শ্রদ্ধার পাত্র।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ লাউসেন ও কর্পূরের পাঠদানে নিয়োজিত শিক্ষাগুরু ও মল্লবীর ছদ্মরূপী হনুমানকে এরূপ বিনয় ও বিনম্র ভক্তি শ্রদ্ধা করতে দেখা যায় —

‘মহাবীর আইল হয়ে মল্লগুরু।
মল্লডোরমণ্ডিত মাথায় বীরটুপি।
রাজসভা প্রবেশিল রাম নাম জপি ॥
সম্ভ্রমে উঠিল রায় দেখি মল্লগুরু।
রঞ্জাবতী বলে ধন্য বাঞ্ছাকল্প তরু ॥
শুভক্ষণে সেন তারে বসান বিশেষ।
সাদরে সুধান তারে ঘর কোন দেশ ॥
দুই পুত্রে রাজরানী সঁপে হাতে হাতে।
কৃপা করি বীর বিদ্যা শিক্ষা হয় যাতে ॥
এত বলি দিল দোঁহে করি সমর্পণ।
দুভেয়ে আনন্দে বন্দে গুরুর চরণ ॥
আশিস্ করিল বীর হও মহাবলী।
দু ভাই দাঁড়ান তবে হয়ে কৃতাঞ্জলি ॥’-(পৃ-১৪২-১৪৩)

গুরু দক্ষিণা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে শিক্ষাগুরু ও পণ্ডিতদের বাৎসরিক বা মাসিক বেতন হিসেবে, সোনা-দানা, অলংকার, শাল-ধুতি-বস্ত্রাদি, জমি-জিরাত,বসত বাড়ি, ফল-মূল, সবজি ও ফসলাদি দান করা হতো। গৃহ শিক্ষক ও আশ্রম বা পাঠশালা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকৃদের দান-দক্ষিণার ধরন ভিন্ন থাকতো। তবে গুরুকে যে যাই দিত, তা অর্থমূলের চেয়ে ভক্তি মূল্যেই নিবেদিত হতো।

‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ লাউসেন ও কর্পূরের জন্য নিয়োজিত মল্লগুরু হনুমানকে গুরু দক্ষিণা হিসেবে মূল্যবান বসন-ভূষণ ও অর্থকড়ি পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয় —

‘এত শুনি রাজরাণী প্রবেশি ভাণ্ডার।
হেম থালে রচিল মল্লের পুরস্কার ॥
রত্ন হার হীরা মণি বসন ভূষণ।
ইন্দু বিন্দু বাণ দিল স্ক্রাদশ কাঞ্চন ॥
রাখিল মল্লের আগে বৃদ্ধ রাজরাণী।
গলায় লম্বিত বাস বলে পটুপাণি ॥
এ নহে তোমার যোগ্য যতকাল জীব।
ভাগ্যে থাকে ভূষা করি চরণ সেবিব ॥’-(পৃ-১৪৪-১৪৫)

চিঠিপত্র

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজে যোগাযোগের অন্যতম উপায় বা মাধ্যম ছিল চিঠি পত্র। সামন্ত শাসকগণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণে এ চিঠি পত্র বা পরোয়ানা তথা ফরমান পাঠিয়ে আদেশ-নিষেধ-অনুরোধ জারি করতেন। সাধারণ মানুষও তাদের প্রিয়জন ও আত্মীয়ের কাছে এ চিঠিপত্রের মাধ্যমেই কুশলাদি বিনিময় করতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' গৌড়েশ্বরের পক্ষে মন্ত্রী মহামদকে সামন্ত শাসকদের কাছে চিঠিপত্র ও পরোয়ানা পাঠাতে দেখা যায় —

ক. রাজকীয় পত্র বা পরোয়ানা

'এত শুনি সত্বর পত্তর লেখে পাতি।
প্রথমে লিখেন স্বস্তি সর্ব্ব গুণান্বিত।
প্রিয় প্রাণপ্রতিম পরম প্রতিষ্ঠিত ৷৷
শ্রীযুক্ত লাউসেন রায় সুচারু চরিত্রে।
পরম সুভাশী রাশি বিজ্ঞাপন পাত্রে ৷৷
সদাই চিন্তিয়া সদাশয়ের কুশল।
এখানে আপনি আল্য আমার কুশল ৷৷
পত্র পড়ি সত্বর সিমুলা আস্য রায়।
এখানে সকাল কব শুনিবে সভায় ৷৷
ইহাতে অনেক আছে কি কব অধিক।
লিখন তারিখ দিল তেরই কার্তিক ৷৷
সই করি রাজার কুলুপ করি পাতি।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল যাবি দিবারাতি ৷৷'-(পৃ-৪৪১-৪৪২)

খ. ব্যক্তিগত পত্র

'প্রথমে লিখিলা স্বস্তি সর্ব্ব গুণান্বিতা।
শ্রীমতী কলিঙ্গারাণী সুচারুচরিতা ৷৷
সুপরম শুভাষী লিখিল বিজ্ঞাপন।
তোমার কল্যাণ মোর কল্যাণ কারণ ৷৷
পরন্তু কারণ লিখি পীড়া পাই চিতে।
শুভ সমাচার প্রিয়ে পাঠাবে ত্বরিত্বে ৷৷
বিতারিখ বৈশাখ বিগ্রহবার লেখা।
বান্ধিল পক্ষীর গলে প্রতি বর্ণ দেখা ৷৷'-(পৃ-৬৬৪-৬৬৫)

লেখার উপকরণ

তৎকালীন বাঙালি সমাজে লেখার কাগজ হিসেবে কলা পাতা, তালপাতা, গাছের বাকল, পশুর চামড়া ও তুলোট কাগজ ব্যবহার করা হতো। কালি তৈরি করা হতো পুইয়ের গুটা বা দানা, অর্জুন, বাবলা, আমলকী গাছের ফল ও বাকল থেকে। আর কালি তৈরি করা হতো প্রদীপ ও পাতিলের কালি থেকে। আর কলম হিসেবে বাঁশ বা কঞ্চির কাঠি, নলখাগড়া ও পাখির পালক ব্যবহৃত হতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব লেখার উপকরণ ব্যবহার করতে দেখা যায় —

ক. কাগজ

'কাগজে বুঝিয়া আন কাঙুরের কর।
লিখে দেহ জয়পত্র ফিরে যাই ঘর ৷৷' (পৃ-৩৯১)

খ. মসীপত্র বা কাগজ কলম

'আমি পক্ষ উপলক্ষ লেখ মসীপত্র।
সমাচার সত্বর আনিব গত মাত্র ॥'-(পৃ-৬৬২)

পত্র বাহক

তৎকালীন সামন্তবাদী শাসনামলে বাংলায় পত্র বহন করতে দূত বা বিশ্বস্ত কর্মচারী ব্যক্তি এবং পোষা কবুতর বা পায়রা, টিয়া এবং শুক বা সারি পাখি ব্যবহার করা হতো। এ পাখির মাধ্যমে দূতিয়ালী বিনিময় প্রথা ঐতিহাসিক ভাবে বাঙালি সমাজে স্বীকৃত। পায়রার মাধ্যমে মীর জাফর পুত্র মীরন ইংরেজদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন।[৩১]

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রাষ্ট্রদূতের এবং শুকসারি পাখির মাধ্যমে পত্রবহন বা দূতিয়ালী কাজের উল্লেখপাওয়া যায় মন্ত্রী মহামদের পরোয়ানা পাঠানো ও লাউসেনের কাছে পত্র পাঠানোর মাধ্যমে —

ক. দূতের মাধ্যমে পত্র বহন

'সই করি রাজার কুলুপ করি পাতি।
ইন্দ্রজালে আজ্ঞা দিল যাবি দিবারাতি ॥
ত্বরায় আসিবি যাবি পাবি খুব চিরা।
শিরে বন্দি যায় ইন্দ্রা নাহি চায় ফিরা ॥'-(পৃ-৪৭৪-৪৭৫)

খ. পাখির (সারিশুক) মাধ্যমে পত্র বহন

'পিতা তুমি পালন করেছে পুত্র প্রায়।
এবার তোমার ধার কিছু শুধি রায় ॥
আমি পক্ষী উপলক্ষ লেখ মসী পত্র।
সমাচার সত্বর আনিব গত মাত্র ॥
তুমি বন্ধু বান্ধব বিপত্তে মোর সাথী।
পক্ষীরে সন্তোষ করি রাজা লিখে পাতি ॥
বিতারিখ বৈশাখ বিগ্রহ বার লেখা।
বান্ধিল পক্ষীর গলে প্রতি বর্ণ দেখা ॥
উড়াইতে উঠে পক্ষী আকাশ পদ্ধতি।
যতদূরে নাহি শর বাঁটুলের গতি ॥'-(পৃ-৬৬৩-৬৬৫)

চিকিৎসা ব্যবস্থা

বাঙালি সমাজে প্রাচীন কাল থেকেই বহুধরনের চিকিৎসা পদ্ধতির প্রচলন ছিল। হিন্দু বৈদ্যরা আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে কবিরাজ হতো, মুসলমানগণ ইউনানী শাস্ত্র অধ্যয়ন করে হতো হেকিম বা তবির। এছাড়া বৌদ্ধরা মঘা তথা বর্মী চিকিৎসা শাস্ত্র স্ক্রারা শিশুচিকিৎসা করতো। গোয়ালেরা গবাদি পশুর চিকিৎসা এবং নাপিতেরা ফোঁড়া কাটার সঙ্গে জড়িত ছিল। এ চিকিৎসা পদ্ধতির পাশাপাশি মানুষেরা সন্ন্যাসী, যোগী, পীর ও মোল্লাদের কাছ থেকে পানিপড়া, সুতা পড়া, তাবিজ, কবচ, মন্ত্র, ঝাড়, ফুঁকের দাওয়াই নিতো। ওষুধ হিসেবে ভেষজ উদ্ভিদ ব্যবহার করা হতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতীর সন্তান কামনায় এরূপ আয়ুর্বেদ, ইউনানী, ঝাড়-ফুঁক, মানত, মানসিক ও যাগ-যজ্ঞের বিধি-ব্যবস্থার আয়োজন করতে দেখা যায় —

'প্রবোধে প্রাবীণা যত পরিতোষ কোলে।

কুলের কমলকলি বাছা পাবে কোলে ॥
না হয় ঔষধ কত প্রতিকার আছে ॥
কত গুণী গুবিণী করিল কতখান।
মাসে মাসে ঔষধ অপত্য আশেখান ॥
শিবার্চ্চনা শান্তি কত ব্রত উপবাসে।
কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে ॥
ষষ্ঠী দেবী পূজি রামা বর মাগে কান্দে।
পুত্র হলে চিত্র করি তলা দিব বেন্ধে ॥
কত ঠাঁই বাচা বান্ধে করিয়া মানন।
ভাল পেয়ে দৈবজ্ঞ দেখান ডেকে হাত।
কত পিঁড়া উঠানে মেয়ের পড়ে যাত ॥' (পৃ-৬১-৬২)

ধর্মীয় উৎসব ও যাগ-যজ্ঞ

ধর্মই বাঙালির প্রাণ। এ ধর্মকে আশ্রয় করেই বাঙালি জন্মবিবাহ ও মৃত্যুর মতো সকল কর্মই পরিচালিত হতো। বাঙালি হিন্দুর জীবনে বারো মাসে তেরো পার্বণের প্রচলন ছিল। এসবের মধ্যে মাঘ মাসে–সরস্বতী পূজা ও শ্রীপঞ্চমী, ফাল্গুন মাসে–দোল পূর্ণিমা ও বাসন্তী পূজা, চৈত্র মাসে– চড়ক পূজা, বৈশাখ মাসে- বাস্তুপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে–জামাই ষষ্ঠী, আশ্বিন মাসে– দুর্গা পূজা ও লক্ষ্মী পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে– নবান্ন এবং পৌষ মাসে–পৌষালী পার্বণ অন্যতম। এছাড়া হোলি, কালীপূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, রথযাত্রা, রাসযাত্রা, শিবরাত্রি, উপনয়ন ও ভাই ফোঁটার প্রচলন ছিল। অন্যদিকে মুসলিম সমাজে ঈদ-উল-ফিতর, ঈদ-উল-আজাহা, মহরম, শব-ই-বরাত, শব-ই-মেরাজ, শব-ই-কদর ও বেরা অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' ধর্মঠাকুর পূজা, দুর্গা পূজা, কালীপূজা, ষষ্ঠী পূজা, নান্দীমুখ যজ্ঞ, সূর্যব্রত ও অগ্নি পূজার উল্লেখপাওয়া যায় ––

ক. ধর্মঠাকুর পূজায় শালে ভর যজ্ঞ (রঞ্জাবতীর)

'দু আঁখি মুদিয়া ধনি ধর্ম্মকে ধেয়ান।
ধর্ম্মকর্ম প্রভু তোমাতে প্রমাণ ॥
এক পুত্র দান মোরে দেহ পরাৎপর।
নতুবা পরাণ ত্যজি শালে দিব ভর ॥
পুনর্ব্বার অর্ঘ্য দিতে ধ্যায় ধর্ম্মরূপ।
ঝুপ করে ঝাঁপ দিতে শব্দ উঠে ঝুপ ॥
বুকে পিঠে ফুটে শাল পিঠে হল ফার।
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠে রক্ত ধার ॥'-(পৃ-৯৮)

খ. সূর্য পূজা (লাউসেনের চার স্ত্রীর)

'কর শঙ্খ ত্যজে তবে চারি রাজার ঝি ॥
স্নান পূজা করি দিল সূর্য্য অর্ঘ্য দান।
ধরণী মণ্ডলে ধনী সূর্য্যকে ধেয়ান ॥'-(পৃ-৫০১)

গ. দুর্গা পূজা (ইছাই ঘোষের)

'সবারে প্রবোধ করে গোয়ালা নন্দনে।
পার্ব্বতী পদারবিন্দ পূজে প্রাণপণে ॥
কমল কুসুম আদি কুমকুম কস্তুরী।
অগুরু চন্দন গন্ধে অর্চ্চিলা ঈশ্বরী ॥'-(পৃ-৫১৪)

পূজায় বলি প্রথা

মধ্যযুগীয় বাঙালি হিন্দু সমাজে দেবতার সন্তুষ্টি বিধান, সমাজ ও গণমানবের কল্যাণ কামনায় পূজা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠানে নরবলি এবং পশুবলির বিধান প্রচলিত ছিল। সাধারণত কালীপূজায় নরবলি দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। তবে এ নরবলি সামাজিক প্রথায় পরিণত হয়নি, বরং একান্ত গোপনে এ বলি সম্পন্ন হতো। অন্যদিকে পূজায় মহিষ, ছাগল, ভেড়া, পাঠা, মোরগসহ বিভিন্ন পশু পাখির বলি প্রথা সিদ্ধ ছিল। তবে সকল বলির ক্ষেত্রেই পুরুষ পশু বলি দিতে হতো, মাদি পশু ছিল বর্জনীয়।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বিভিন্ন পূজা-যজ্ঞে এরূপ নরবলি ও পশুবলির প্রমাণ মেলে ––

নরবলি (কালী পূজায় নরবলি)

অতি শিশু আসে ত আনিয়া দিব আগে।
নয় বা কালীরে বলি দিব নিশা ভাগে ॥
তব আগা শিরে ধরে শিশু লয়ে আসি হরে
দুগ্ধ বিনে পথে মরে যায়।
তোমার কল্যাণ ভাবি পূজিনু কালিকা দেবী
নদী তটে বলি দিয়া তায় ॥'-(পৃ-১২৪-১৩২)

পশুবলি

দুর্গা পূজায় পশুবলি

'পার্ব্বতী পদারবিন্দ পূজে গোপসুতে ॥
ছাগ মেষ মহিষ বিশেষ বিশাসয়।
বলি দিয়া বলিছে বাসুলী জয় জয় ॥'-(পৃ-৫১৪)

লোকাচার-বিশ্বাস-সংস্কার

বাঙালির জীবন বহুকাল ধরেই লোকাচার বিশ্বাস ও সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বাঙালি তার প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় চেতন-অবচেতন মনেই ঋতু-মাস-বার-তিথি-নক্ষত্র-লগ্ন ও যাত্রার শুভাশুভ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া, ঝাড়-ফুঁক, জাদু-মন্ত্র, দারু-টোনা, তুক তাক-বাণ-উচাটন, তাবিজ-কবচে বিশ্বাস, তেলপড়া, বাটি চালান, হাত চালান, আয়না পড়ায় আস্থা, বট-তাল-তেঁতুল-গাব-শেওড়া গাছে ভীতি, জীন-ভূত-দেব-দানবে ভীতি ও বিশ্বাস, গৃহ নির্মাণ ও গৃহ-প্রবেশে নিয়ম-নীতি মানা, রাশিচক্র ও নিয়তিতে বিশ্বাস করে থাকে। এছাড়া বাঙালি হিন্দু সমাজে আজো বছরের বারো মাসের পাঁচ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ। এসব কিছু এখনো বাঙালি জাতি গভীর বিশ্বাস ও আস্থার সঙ্গে পালন করে আসছে। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসবের চিত্র পরিলক্ষিত হয়-

১. যাত্রাপথের শুভ-অশুভ লক্ষণ

বাঙালি সমাজের বিশ্বাস মতে যাত্রা পথে গাভী, গোয়ালা, যোগী-সন্ন্যাসী, ভরা কলস, বহনকারী সধবা বধূ- এসব শুভ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত। পক্ষান্তরে যাত্রার শুরুতে দরজার চৌকাঠে হোঁচট খাওয়া, পথে চিল, শকুন, শিয়াল,

দাঁড়কাক, পেঁচা, কচ্ছপ, সাপ, খালি কলস, তেলী ও বিধবার সাক্ষাতকে অশুভ লক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

ক. যাত্রাপথের অশুভ লক্ষণ

'অমঙ্গল যাত্রায় দেখিল চর্ম্মচিল।
শকুনি গৃধিনী আগে করিছে কিল্ কিল্ ॥
কিচি কিচি কালপেঁচা ডাকে কাছে কাছে।
কোণেতে কচ্ছপ দেখে কর্পিগণ গাছে ॥
বামে কাল ভুজঙ্গ দক্ষিণে দেখে শিবা।
কেহ বলে না জানি কপালে আছে কি বা ॥'-(পৃ-৪২৫)

খ. দরজার চৌকাঠে ঠেকা ও হোঁচট খাওয়া

'বলিতে বারাল বাজী সম্মুখে যোগায়।
সওয়ার হইতে স্কার ঠেকিল মাথায় ॥
কিচি কিচি কালপেঁচা কাছে কাছে ডাকে।
অচল হইল বাজী থমকিয়া থাকে ॥
অমঙ্গল না বুঝি চাবুক মারে ঘোড়া।'-(পৃ-৫৪১)

২. অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নড়াচড়ায় অমঙ্গল আশঙ্কা

বাঙালি সমাজের বিশ্বাস মতে- জিহবায় দাঁতের কামড় লাগা, হাত থেকে কোন কিছু খসে পড়া, চোখ নড়াচড়া বা লাফানো, হাত নড়াচড়া করা যা নিজের বা নিকট আত্মীয়ের বিপদ ও অশুভ বিষয়কে ইঙ্গিত করে।

জিহবায় কামড় লাগা ও মন উচাটন

'বীর হনুমানে প্রভু সুধান বচন।
মন উচাটন করে কিসের কারণ ॥
কেন বা বসিতে খাত্যে শুতে নাঞি সুখ।
কেবা কোথা সেবক সঙ্কটে পায় দুখ ॥
দশনে রসনা চাপে কাঁপে বামতনু।'-(পৃ-৫২৫)

৩. স্ত্রীকে সর্বদা স্বামীর বামে রাখা

বাঙালি সমাজের বিশ্বাস মতে, স্ত্রী বাম অঙ্গ এবং স্বামী ডান অঙ্গ। তাই স্ত্রীকে সর্বদা স্বামীর বাম পাশে বসতে হয়, বাম পাশে ঘুমাতে হয়, বাম হাতে সধবা বা এয়োতীর চিহ্ন স্বরূপ লোহা পরতে হয় এবং নাকের বাম পাশে নাক-ফুল পরতে হয়। এসব আজ অব্দি বাঙালি সমাজে প্রচলিত রয়েছে।

ক. নারী বাম অঙ্গ

'বেদে বলে বিশেষ বনিতা বাম অঙ্গ।
পশ্চিমে উদয় দিতে আমি যাব সঙ্গ ॥'-(পৃ-৫৬৬)

খ. বাম হাতে নোয়া বা এয়োতীর চিহ্ন ধারণ

'কলসে কলসে তার ঢেলে দিল ঘি।
কর শঙ্খ ত্যজে তবে চারি রাজার ঝি ॥
কার বোলে ঘুচাইলি হাতের আয়ত।
কুশলে আছেন বসে তোর প্রাণনাথ ॥'-(পৃ-৫০১-৫০২)

৪. নারীর ঋতুকালীন অবস্থা

বাঙালি সমাজে নারীর ঋতুকালীন অবস্থা সম্পর্কিত কিছু সংস্কার বিদ্যমান ছিল। এ ঋতুকালীন সময়ে নারীকে অপবিত্র ভাবা হতো, তাকে স্পর্শ করা ও একত্রে ঘুমানোকে পাপ বলে গণ্য করা হতো ঋতুর প্রথম দিনে স্ত্রী সংসর্গকে পরিত্যাজ্য বলে বিধান রয়েছে ঋতুর চতুর্থ দিনে নারীর শুচিতা অর্জিত হয় এবং পঞ্চম দিনে ঋতু স্নান করার বিধান রয়েছে। নিষ্ঠাবান হিন্দু-মুসলমানগণ ঋতুবতী নারীর রান্নাকৃত খাবার পরিহার করেন। এসময় নারীর ধর্ম কর্ম, যাগ-যজ্ঞ, প্রার্থনা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

ক. ঋতুর প্রথম তিন দিন সম্ভোগ পরিহার

'নিতি নব লাবণ্য ধরেন রঞ্জাবতী।
শুভদিনে সুন্দরী হইল ঋতুমতী ॥
তিনদিন পতি সঙ্গে রহিল বিচ্ছেদ।
পরশে পাতক বাড়ে মুণি বাক্য বেদ ॥'-(পৃ-১০৬)

খ. ঋতুর চতুর্থ দিনে শুচিতা

'চারিদিনে শুদ্ধ নারী স্বামীর পরশে।
সকল পবিত্র হয় পঞ্চম দিবসে ॥-(পৃ-১০৬)

গ. ঋতুর পঞ্চম দিনে ঋতু স্নান

'সকল পবিত্র হয় পঞ্চম দিবসে ॥
চাঁপায়ে প্রভুর আজ্ঞা সদা মনে অই।
ঋতুস্নানে যান রানী তিন দিন বই ॥' (পৃ-১০৬)

ঘ. ঋতুকালে স্ত্রী সংস্পর্শের পাপ

'নিজ নারী পরশে পাতক হৈল রায় ॥
শুন নাথ সাক্ষাতে সরম খেয়ে কই।
ঋতুমতী আছি রাতি হৈল তিন বই ॥
না কেলে অধর্ম্ম নাথ তুমি ধর্ম্মচারী।
শয়নে স্বামীর সঙ্গে হতে হয় দারী ॥'-(পৃ-৪৮৩)

৫. ঘুমের দিক অনুসারে শুভ-অশুভ

বাঙালি সমাজে ঘুমানোকে কেন্দ্র করে কতিপয় সংস্কার-বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। উত্তর শিয়রী হয়ে ঘুমানাকে অমঙ্গলের ইঙ্গিত, পশ্চিম দিকে ঢলে পড়াকে অশুভ লক্ষণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

উত্তর শিয়রী ঘুমের আশঙ্কা

'মুখে নাহি উত্তর উত্তরে পড়ে ঢুলে।
কাঁদে লখে কপালে কঙ্কন হানে তুলে ॥
উত্তরে ঢলিল নাথ মজিল ময়না।'-(পৃ-৬০২)

৬. আঁটকুড়ার (নিঃসন্তান) অপবাদ ও আশঙ্কা

বাঙালি সমাজে যে দম্পতির সন্তান হতো না সে পুরুষকে আঁটকুড়া ও নারীকে বন্ধ্যা বলে অবজ্ঞা করা হতো। এ আঁটকুড়া পুরুষকে অশুভ-অকল্যাণের প্রতীক ভাবা হতো। কোন শাসক যদি নিঃসন্তান হতেন, তাহলে রাজ্যের

সকল অমঙ্গলের জন্য শাসকের এ আটকুড়া দশাকে দায়ী করা হতো। এছাড়া পরকালে পূর্বপুরুষসহ সকলের পুন্নাম নরকে ভোগের কথা বিশ্বাস করা হতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব সংস্কার-বিশ্বাসের চিত্র পাওয়া যায় ––

ক. আটকুড়াকে অমঙ্গলের বা অকল্যাণের প্রতীক ভাবা

'পুত্র বিনা পিণ্ড বাদ প্রধান তর্পণ ॥
জীবন বিফল যার পুত্র নাই রায়।
আঁটকুড়া লোকে বলে মুখ নাহি চায় ॥'-(পৃ-২৯)

৭. স্বামীকে আঘাত করা পাপ

বাঙালি সমাজে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় স্বামীকে পরম পূজনীয় ও দেবতা জ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। নারীর জন্য স্বামীই ইহকাল ও পরকালের একমাত্র গতি এবং স্বামীই নারীর ধর্ম ও বিধাতা স্বরূপ-এমন বিশ্বাস উভয় সমাজেই প্রচলিত ছিল। তাই স্বামীকে কোন ভাবেই আঘাত বা প্রহার করা স্ত্রী জন্য ছিল মহাপাপ।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এ সম্পকির্ত চিত্র পরিলক্ষিত হয় ––

'সুখে নিদ্রা যায় কালু মুখে নাই রা ॥
না পেরে নিদানে বলে বচন বিষাদ।
চিয় চিয় প্রাণনাথ পড়েছে প্রমাদ ॥
নাড়াচাড়া দিয়ে ডাকে তবু নাহি নড়ে।
লখে বলে প্রাণনাথে চিয়াব চাপড়ে ॥
বিধি বিষ্ণু শঙ্কর তোমরা থাক সাক্ষী।
চাপড়ে চিয়াব পতি না হব পাতকী ॥'-(পৃ-৬১৭)

৮. নারীর অধিবাস অর্ধেক বিবাহ তুল্য

বাঙালি সমাজে নারীর বিবাহের অধিবাস সংক্রান্ত কিছু সংস্কার-বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে। কোন নারী যদি স্থির বিশ্বাসে ধর্মকে সাক্ষী মেনে কাউকে উদ্দেশ্য করে অধিবাস গ্রহণ করে, তাহলে তার অর্ধেক বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যায় বলে সংস্কার প্রচলিত রয়েছে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' কানড়া লাউসেনকে স্বামী মনে করে অধিবাস পালন উপলক্ষ্যে একথা বলেছে ––

'কানড়া আমার নাম স্বামী ভাবি তোমা।
পঞ্চম বৎসর হতে সেবি শিব উমা ॥
অধিবাস করিলে অর্দ্ধেক বিভা হয়।
স্মৃতি বেদ বিদিত বিস্ক্রান সব কয় ॥'-(পৃ-৪৬৭)

৯. মৃত্যুকালে রাম নাম না নিতে পারার অনুতাপ

বাঙালি সমাজে মৃত্যুকালীন সঙ্কটময় মুহূর্তে আল্লাহ বা ভগবান বা রাম নাম না নিতে পারা এবং কালেমা অথবা গীতা বা মন্ত্রজপ করতে না পারাকে অশুভ ইঙ্গিত বলে বিশ্বাস করা হতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লখাইয়ের পুত্র শাকার মাধ্যমে এ বিষয়টি উন্মোচিত হয়েছে ––

'মরমে রহিল শেল　　হেথা জন্ম বৃথা গেল
মুখে না বলিনু রাম নাম।
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব দেবা　　জনক জননী সেবা
না করিনু বিধি হলো বাম ॥' (পৃ-৬২৭)

১০. রাশি-চক্র-তিথি-লগ্ন ও নক্ষত্রে বিশ্বাস

তৎকালীন বাঙালি সমাজে রাশি চক্রের ওপর বিশ্বাস ছিল প্রবল। বারোটি রাশি (১. তুলা ২. মেষ ৩. মিথুন ৪. বৃষ ৫. কর্কট ৬. সিংহ ৭. কন্যা ৮. ধনু ৯. বৃশ্চিক ১০. মকর ১১. কুম্ভ ১২. মীন) ওপর বাঙালি নর-নারীর আস্থা ছিল গভীর। এছাড়া তিথি-নক্ষত্র ও লগ্নের শুভ-অশুভ নির্ণয় করে বাঙালি নর-নারীগণ যাত্রা, শুভ কর্ম সম্পন্ন করতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' কলিঙ্গার বিয়ের সময় এরূপ রাশিচক্র ও তিথি-লগ্নের প্রভাব দেখা যায় —

অশুভ লগ্নে বিবাহ আশঙ্কাজনক

'নিরানন্দ হইল স্ক্রন্ধে মনোবদ্ধ নব।
বিবাহ মঙ্গল কার্য্য মহামহোৎসব ॥
অশৌচান্তে পৌষমাস করে শুক্রবৃদ্ধি।
অতিচারে বৃহস্পতি পরে কালাশুদ্ধি ॥
শ্রী হরিশয়নে বিভা অনুচিত প্রায়।
বৎসরেক বিবাহ বিলম্ব কর রায় ॥'-(পৃ-৩৯৪)

জাদু-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক

বাঙালি সমাজে বহুকাল যাবত জাদু-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের প্রভাব রয়েছে। সাপের বিষ ঝাড়া, তেলপড়া, পানপড়া, বাটিপড়া, আয়না পড়া, কাজলপড়া, ধূলা বা মাটি পড়া, বাণ মারা, ভূত-প্রেত-জীন চালান করা, স্বামী বশীকরণ ওষুধ, ঘুম পাড়ানের মন্ত্র ও নানা মায়াবী মন্ত্রে বাঙালি বিশ্বাস করতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' ইন্দা মেটে চোরের ঘুমের মন্ত্র, সুরিক্ষার ডাকিনী বিদ্যা, গুরিক্ষার পানপড়া, নয়ানীর তেলপড়া, সতী ও বল্লভার কাজলপড়া, মন্থরা ও কলিঙ্গার বিয়ের সময় স্বামীবশীকরণ ওষুধের নানা আয়োজনের চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

ক. ঘুমের মন্ত্র (ইন্দা মেটে চোরের)

'বর পেয়ে অভয়ে আনিল ইন্দর মাটি।
মন্ত্র পড়ি জাগায়ে ছোঁয়াল সিঁদকাটি ॥
জাগ্ জাগ্ মাটি কাজে লাগ মোর।
ময়না নগর জুড়ে লাগ্ নিদ্রা ঘোর ॥
আগম ডাকিনী তন্ত্রে মন্ত্রে পড়ে মাটি।
কালিকা দেবীর আজ্ঞা লাগ্‌বে নিদুটি ॥
লাগ্ লাগ্ নগর জুড়ে গড় বেড়ে লাগ্।
যেখানে যেরূপে যেবা জাগে বীর ভাগ ॥
খাটে বাটে ভুমে গড়ে যে জন ঘুমায়।
ভূপতি ভোজের আজ্ঞা আগে লাগে তায় ॥
কাঙ্গুরে কামিক্ষাদেবী চণ্ডীর আজ্ঞায় ॥
মাটির পড়ে দিল কুম্ভকর্ণের দোহাই।
উড়াই শহরে সবার উঠে হাই ॥'-(পৃ-১২৬)

খ. পানপড়া (গুরিক্ষার)

'গুরিক্ষা বলেন কেন সাধিব বিশেষ।
পড়া পান পরশে আপনি হবে মেষ ॥
মনোহর মালা পর মলয়জ মাখ।
মন কথা নাহি রায় মোর কথা রাখ ॥'-(পৃ-২৮৮)

গ. তেল পড়া (নয়ানীর)

'মুখে মাখে তৈল পড়া নয়নে কজ্জল।
চাহিতে চক্ষের কোণে পুরুষ পাগল ॥
গায়ে দিল চর্চ্চিত চন্দন চারু চুয়া।
বসিয়া নাপান করি খান পান গুয়া ॥'-(পৃ-২৬১)

ঘ. স্বামী বশীকরণে কাজল পড়া বা সোহাগ কাজল

'এই গুঁড়ি অন্নে মাখি দিবে মাষা ছয়।
ভোজনে ভূপতি ভব্য ভুলে যেন রয় ॥
পড়ে দিয়া কজ্জল নয়ানে দিয়া চাবে।
তার সাক্ষী সহসা তখনি পাওয়া যাবে ॥
পানের সহিত গুঁড়ি তুলি দিবে মুখে।
রাজা যেন সোহাগে সদাই রাখে সুখে ॥
এক ছিটা ফেলে দিহ কাপড়ে কিঞ্চিৎ।
নাথ না ছাড়িবে সঙ্গ বাড়িবে পীরিত ॥' -(পৃ-৩৭)

ঙ. স্বামী বশীকরণের মায়া মন্ত্র (লখাই)

'তোর ঔষধের গুণে ভাতার ভাসুর।
গা জ্বলে গোবরখাকী হেথা হতে দূর ॥
সতিনের বিষম বচন বাজে বুকে।
কাঁদিতে কাঁদিতে লখে চলে হেঁট মুখে ॥'-(পৃ-৬২৩)

পাপ-পুণ্যের ধারণা

তৎকালীন বাঙালি বর্ণবাদী হিন্দু সমাজে পাপ-পুণ্যের ধারণা ছিল প্রকট। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজে শাস্ত্রাচার ও ধর্মাচারের নামে বহুবিধ পাপ-পুণ্যের বিধি-বিধান ও নিয়ম নীতি চালু ছিল। সকল পাপের মধ্যে– অন্নপাপ, ব্রাহ্মণ হত্যা, খুন, ব্যভিচার, বলাৎকার, মিথ্যাচার, অপহরণ, লুণ্ঠন ছিল অন্যতম। পক্ষান্তরে পুণ্যের মধ্যে ছিল– বিভিন্ন পূজা, ব্রত, পশুবলি, দান-দক্ষিণা, পরোপকার প্রভৃতি।

মানত বা মানসিক

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সমাজে নানা ধরনের মানত বা মানসিকের প্রচলন রয়েছে। বাঙালি সন্তান প্রত্যাশায়, রোগ নিরাময়ে, পরীক্ষার কৃতকার্যে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষায় ও শুভ কাজের প্রত্যাশায় মসজিদ-মন্দিরে গবাদি পশু-পাখি, টাকা-পয়সা, বস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ ও খাবার দান করে থাকে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব মানত বা মানসিকের পরিচয় মেলে ––

ক. লাউসেনের জীবন রক্ষার্থে মানসিক

'সেন কন কেন্দো না রে ধেয়াও গোসাঞি।
অনাথ বান্ধব বিনে আর কেহ নাঞি ॥
মনোহর মহাপূজা মানসিক করে।
মন রাখি প্রভুপদ পঙ্কজ পঞ্জাবে ॥'-(পৃ-১৮৮)

খ. যুদ্ধে জয়ে লাউসেনের মানসিক

'এত বলি ডোমগণে প্রবোধ করিয়া।
অনাদি অনন্ত ভাবে একান্ত হইয়া ॥
মনোহর মহাপূজা মানসিক করি।
স্তুতি করি মুখে নয়নে বহে বারি ॥
উদ্ধার হে দীনবন্ধু দেব ধর্ম্মরাজ।'-(পৃ-৫২৪)

গ. পুত্র লাভে রঞ্জাবতীর মানসিক

'শিবার্চ্চনা শান্তি কত ব্রত উপবাসে।
কঠোর করেন কত পুত্র অভিলাষে ॥
ষষ্ঠী দেবী পূজি রামা বর মাগে কেন্দে।
পুত্র হলে চিত্র করি তলা দিব বেন্ধে ॥
কত ঠাঁই বাচা বান্ধে করিয়া মানন।'-(পৃ-৬২)

অভিজ্ঞান

তৎকালীন বাঙালি সমাজে স্বীকৃতির মাধ্যম হিসেবে অভিজ্ঞানপত্র বা স্মারক প্রথার প্রচলন ছিল। এসব অভিজ্ঞানের মধ্যে — চিঠিপত্র, শারীরিক লক্ষণ বৈশিষ্ট্য, অলংকার বা উপহার দ্রব্য, দিন-তারিখ-মাস-বছর-তিথি-লগ্ন, স্মরণীয় ঘটনা, বিশেষ শস্যের ক্রম হ্রাস-বৃদ্ধি বা অঙ্কুর প্রভৃতি অন্যতম। প্রবাস জীবনে, অজ্ঞাত বাস ও হারানো ব্যক্তিবস্তুকে ফিরে পাবার স্বীকৃতি হিসেবে এসব অভিজ্ঞানের বহুল প্রচলন ছিল।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব অভিজ্ঞানের ব্যবহার বিধি পরিলক্ষিত হয় —

ক. শারীরিক বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ

'আপাদমস্তক খানি নিরখিরা কন রাণী
এ নহে আমার লাউসেন ॥
সেই মূর্ত্তি শোভা শান্তি কনক মুকুর কান্তি
কলেবর কিছু নহে ভিন্ন।
দেখিল সকল গাত্র কেবল নাহিক মাত্র
শিরে ধর্ম্মপাদুকার চিহ্ন ॥'-(পৃ-১৩৭)

খ. মূল্যবান অলংকার বা অঙ্গুরী

'আমার বচনে যদি না হলো প্রত্যয়।
কোথায় রহিল তোর সত্বের উদয় ॥
হাত পাতি লহ আসি স্বামীর অঙ্গুরী ॥'-(পৃ-৫০৩)

প্রতিজ্ঞা বা কিরা কাটা

বাঙালি সমাজে প্রতিজ্ঞা বা কিরা কাটার বিচিত্র পদ্ধতির প্রচলন ছিল। এসবের মধ্যে — মাথায় বা বুকে হাত রাখা, বিধাতা-দেবতা ও ধর্মকে সাক্ষী মানা, মসজিদ-মন্দির সামনে রাখা, ধর্মগ্রন্থ (গীতা ও কুরান) স্পর্শ করা, পশ্চিম বা পূর্ব দিক হওয়া, গঙ্গাজল-তামা-তুলসী স্পর্শ করার মাধ্যমে কোন কাজ করা বা না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব প্রতিজ্ঞা বা কিরা কাটার চিত্র দেখা যায় —

ক. রঞ্জাবতীর কিরা কাটা

'কুটুম্ব বান্ধব জ্ঞাতি সবারে মণ্ডল পাতি
পাঠান ভূপতি কর্ণসেন।
গৌড়ে না পাঠালে বাণী শুনি তাপে রঞ্জারাণী
আপনি মাথার কিরা দেন ॥' (পৃ-১১৯)

খ. খাবার খেতে কিরা কাটা

'কত কষ্টে নিঞা গেল তেঁতুলের পাতা।
আর কেন কর ব্যাজ খেয়ে মোর মাথা ॥
উপস্থিত অন্নে কেন মিছা দুঃখ পাও।
আর কিছু ভেব না হে মোর মাথা খাও ॥'-(পৃ-৩০২)

গ. পতি-পুত্রের নামে প্রতিশ্রুতি

'বিবাহ না দিয়া তোর যদি যাই ফিরা।
মৈনাক মহেশ গুহ গণেশের কিরা ॥
যদি রাজা লাউসেন মরেছে সর্ব্বথা।
আনাব যমের ঘরে কত বড় কথা ॥'-(পৃ-৪৬০)

ঘ. অপরাগতায় বা অনিচ্ছায় প্রতিজ্ঞা

'ডেকে নেগা তের ডোম যম অবতার।
মোর মাথা খাস যদি কিছু কস আর ॥'-(পৃ-৬২১)

ঙ. গঙ্গাজল তামা-তুলসী ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা

'লখেকে বান্ধিয়া দড় কালু সত্য করে।
গঙ্গাজল তুলসী তামায় তুলে ধরে ॥
পূর্ব্ব মুখে বলে কালু এই ব্রহ্ম সত্য।
যে কিছু মাগিব তাই দিব তথ্য ॥
ইথে অন্য মত করি ঈশ্বর প্রমাণ।
ইহ পরকাল মজি হারাব পরাণ ॥'-(পৃ-৬৩৫)

চ. সুরিক্ষাও লাউসেনের প্রতিশ্রুতি

'প্রতিজ্ঞা করহ আগে সাক্ষাৎ সভার ॥
পরাজয়ী হই যদি ত্রিগুণ বন্ধনে।
জয়ী হই কেটে লব নাসিকা লোচন ॥'-(পৃ-৩১১)

মাতৃস্নেহ ও মাতম

বাঙালি সমাজে সবার কাছে মা অতি আপনজন ও পূজনীয় গুরুজন হিসেবে সর্বোচ্চ ভক্তি-শ্রদ্ধা পেয়ে এসেছে। বাঙালি সন্তানেরা সর্বাবস্থায় গর্ভধারিণী মাকে স্মরণ রেখে এবং সকল শুভ কর্মই মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আরম্ভ করে। আবার নয়নের পুত্তলি, হৃদয়ের ধন এ সন্তানের বিপদ-আপদে, দুর্ঘটনা, রোগ-বালাই ও মৃত্যুতে বাঙালি মায়ের মাতম আহাজারি, আর্তি ও উৎকণ্ঠায় পরিবেশ ভারি হয়ে ওঠে

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রাণী রঞ্জাবতী, লখাই ও দেবী দুর্গার মাধ্যমে বাঙালি মাতৃহৃদয়ের শাশ্বত মায়া মমতাও আদর-স্নেহের চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে —

ক. রঞ্জাবতীর মাতৃস্নেহ

'হারায়ে অমূল্য মণি রাণী পেলে কোলে।
চাঁদ মুখে চুম্বন দিয়া চলে হোলাহোলে ॥
ধন যে হারালে পায় মলে পায় প্রাণ।
তার সম সংসারে কে আছে ভাগ্যবান ॥
পুত্রের কল্যাণে রাণী আনি বিপ্র যত।
গোধন ধরণীধন বিলাইল কত ॥
ভক্তিমত নিয়ত পূজেন নিরঞ্জন।
যতনে করেন দুই পুত্রের পালন ॥
হরিষে হরিদ্রা মাখিয়ে কৌতুকে।
দুলালে দোলান কোলে চুম্ব দেন মুখে ॥'-(প-১৩৮)

খ. রঞ্জাবতীর অন্ধ মাতৃস্নেহ

ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় রঞ্জাবতী পুত্র লাউসেনকে গৌড়ে যেতে প্রথমে নিষেধ করেন। কিন্তু বীরপুত্র সে নিষেধ না মানলে, তিনি মল্লবীর দিয়ে পুত্রকে হাত-পা ভেঙে ঘরে রাখার সিদ্ধান্ত নেন। এখানে রঞ্জাবতীর মাতৃহৃদয়ের নির্মমতা অপেক্ষা সন্তানকে বিপদে ঠেলে না দিয়ে বরং নিরাপদে আগলে রাখার বিষয়টিই উন্মোচিত হয়েছে —

'রাণী বলে দূর কর হেন ছার ওঝা ॥
বরঞ্চ এমন কেহ মহা মগ্ন থাকে।
বিক্রমে বাছারে মোর খোঁড়া কর্যা রাখে ॥
চরণ ভাঙ্গিলে ঘুচে গমনের আশ।
ঘরে বস্যা চান্দ মুখ দেখিব বারমাস ॥'-(পৃ-১৮১)

গ. পুত্রের মৃত্যুতে লখাইর মাতম

'কাটা মাথা কোলে দিতে ডাকে উভরা।
অমনি পড়িল লখে আছাড়িয়া গা ॥
বাছা আমার কোথা আমার দুলালিয়া।
মরামাথা নিয়ে কাঁদে মুখে মুখ দিয়া ॥
কে মারিল আমার সোনার শাকাবীর।
কি পাপে মায়ের প্রাণ না হয় বাহির ॥'-(পৃ-৬২৮)

বাঙালি নারীদের কান্নার ধরন

বাঙালি সমাজে নারীদের কান্নার আলাদা ঢং ও ঐতিহ্য রয়েছে। আপনজনদের মৃত্যু, বিপদ-আপদ ও সংকটময় মুহূর্তে বাঙালি নারীগণ বিনিয়ে বিনিয়ে হাত-পা মাটিতে ও বুকে চাপড়িয়ে কাঁদতে থাকে। মৃত ব্যক্তির আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-বাসনা, উল্লেখযোগ্য গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করে আহাজারি করতে থাকে। এমনকি বিধাতাকে পর্যন্ত ভর্ৎসনা করতে থাকে শোকের আতিশয্যে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লাউসেনের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদে তার স্ত্রী ও মা, পুত্র শাকার মৃত্যুতে লখাই ও স্ত্রী ময়ূরা এবং ভক্ত ইছায়ের মৃত্যুতে দেবী দুর্গার কান্নার মাধ্যমে বাঙালি নারীদের এ কান্নার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে ––

পুত্র শোকে রঞ্জাবতীর কান্না

'মুণ্ড দেখি চৌদিকে রহিল সব সতী।
ইহা দেখি স্ত্রিগুণ ফুকরে রঞ্জাবতী ॥
সাধের সাধনা সব কোথা যাও মা।
বাছা কোথা গেল বলি আছাড়িছে গা ॥
কি পাপে পামর বিধি নিধি নিল হরে।
বাছা মলো অভাগিনী আছি প্রাণধরে ॥
বসাতে পাতিনু হাট কে হলোরে হাতা।
ও বাপ কর্পূর মোর লাউসেন কোথা ॥
এক জন্ম মরে পেনু ভর দিয়া শালে।
হেন বাপ কোথা গেলি কি হলো কপালে ॥'-(পৃ-৪৯৮)

মাতৃহৃদয়ের আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা

বাঙালি সমাজে সন্তানের প্রতি-গর্ভধারিণী মায়ের মায়া-মমতা, আদর-যত্ন, স্নেহ ও বাৎসল্য একান্তই অপার্থিব-অপরিমেয় ও অকৃত্রিম। বাঙালি মা তার সমগ্র জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা দিয়ে সন্তানকে আগলে রাখে এবং সবকিছুর বিনিময়ে সন্তানের মঙ্গল কামনা করে। সন্তানের বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা ও সংকটে বাঙালি মায়ের সদা সর্তক প্রাণ সবার আগেই দুশ্চিন্তায় অস্থির-উতলা হয়ে ওঠে। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি মায়ের এমন আতঙ্ক-উৎকণ্ঠার পরিচয় মেলে ––

রঞ্জাবতীর উৎকণ্ঠা

'শোকে শুকাইল রাণী সমাচার শুনি।
কোমল শরীর বাছা জিনি কাঁচা ননী ॥
দুর্গম গোউড় যেতে মানা নাঞি করি।
দেখ বাছা দাড়াইয়া অভাগী আগে মরি ॥
হরি হরি প্রাণ গেল কর্য়্যা বেটা বেটা।
সে বেটা মায়ের বুকে মের্য়া যায় জাঠা ॥
না দেখিলে তিলে তিলে তোমা হই হারা।
পরান পুত্তলি তুমি লোচনের তারা ॥
সম্মান সম্পদ সব সংসারের সুখ।
সকল বিফল দেখি না দেখিলে মুখ ॥
তোরে আমি অভাগী পেয়্যাছি বড় দুঃখে।
এখনও শালের দাগ ঘুচে নাঞি বুকে ॥
পথে ব্যাঘ্র ভল্লুক ভূতলে চোর খাট।
যেত্যে চাও কেমনে এমন দুর্গম বাট ॥'-(পৃ-১৭৯-১৮০)

মাতৃভক্তি

বাঙালি সমাজে মাতৃভক্তির মতো শ্রদ্ধা, বিনয় ও আবেগের স্থান সন্তানের জীবনে দ্বিতীয়টি নেই। বাঙালি সন্তানেরা জীবনের সকল ক্ষেত্রেই গর্ভধারিণী মাকে ভুলেনা বা বিস্মৃত হয় না। বরং সর্বাবস্থাতেই মায়ের নাম স্মরণ করে। জীবনের সকল শুভ কর্ম, সকল সিদ্ধান্ত ও যাত্রার সময়ে মায়ের আশীর্বাদ, শুভ কামনা ও অভিমতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। মায়ের মুখের হাসি ও সুখের জন্য সন্তানেরা সকল ত্যাগ স্বীকার করতেও প্রস্তুত থাকে। ধর্মীয় ও সামাজিক স্বীকৃতির কারণে বাঙালি সন্তানের কাছে মা দেবীর স্তরে উন্নীত ও স্বর্গ লাভের সোপান বলে চিহ্নিত।

লাউসেনের মাতৃভক্তি

'জানিলে জননী যেতে না দিবে সর্ব্বথা।
না কয়ে কেমনে যাব সাক্ষাৎ দেবতা ॥
তোমার পুণ্যের প্রভা জানাব সভায়।
জয়যুক্ত হয়্যা দোঁহে আসিব ত্বরায় ॥
আজ্ঞা নাঞি করিলে বাড়াত্যে নারি পা ॥'-(পৃ-১৮৭-১৮০)

পিতৃস্নেহ

বাঙালি সমাজে সন্তানের প্রতি পিতৃস্নেহের জায়গাটিও অনেক তাৎপর্যময়, মহিমাদীপ্ত ও আবেগী স্তরে উপনীত। সন্তানের ভবিষ্যৎ জীবনের সুখ, কল্যাণ, আরাম-আয়েশের জন্য বাঙালি পিতা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। সন্তানের বিপদে-আপদে বাঙালি পিতাগণ নীলকণ্ঠের মতো সকল আঘাত, ঝুঁকি নিয়ে সন্তানকে আগলে রাখেন। সন্তানের বিপদ, দুর্ঘটনা ও মৃত্যুতে পিতার শোক অত্যন্ত মর্মভেদী হয়ে থাকে। বাঙালি সন্তানের কাছে তাই পিতার আসন দেবতার স্তরেই উন্নীত। পিতার কথা বেদ বাক্যের মতো পালনীয় এবং পিতাই পার্থিব জীবনের সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্ক্ষী ও অভিভাবক।

কর্ণসেনের পিতৃস্নেহ

'কর্ণসেন বলে বাপু কোন বুদ্ধে কও।
বাক্য বল বিষম বালক বই নও ॥
গৌউড় দুর্গম দূর কত দিব লেখা।
ক্রোশেক দুক্রোশ নয় পূর্ব্ব পানে দেখা ॥
খদ্যোৎ পতঙ্গ আমি তুলগ না করি।
তোমা না দেখিয়া পাছে সেই রূপ মরি ॥
কত কষ্টে নামটি ঘুচেছে আঁটকুড়া।
একালে উচিত বাছা ছেড়ে যেতে বুড়া ॥'-(পৃ-১৭৯)

পুত্র শোক

বাঙালি সমাজে প্রতিটি পিতার কাছে পুত্র শোকের ব্যাপারটি অত্যন্ত মর্মভেদী, পীড়াদায়ক ও দুঃসহ যন্ত্রণার। পুত্রের মৃত্যুতে বাঙালি পিতা শুধু পুত্রকেই হারান না, বরং সাথে সাথে তার লালিত, প্রত্যাশিত স্বপ্নও চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পুত্র সন্তানের শোক অনেক পিতাই সহ্য করতে না পেরে সংসার বিবাগী, উদাসী ও পাগল প্রায় হয়ে পড়ে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' পুত্র শোকের এ বিষয়টির চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

কর্ণসেনের পুত্র শোক

'পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল।

সর্ব্ব শোকে কর্ণসেন হইল পাগল ॥
হাতী ঘোড়া ধন প্রাণ রাজছত্র দণ্ড।
কর্ম্মদোষে বিধাতা করিল লণ্ডভণ্ড ॥
পুত্রশোকে জরজর হইল তার তনু।
পুত্র বিনা সকল সংসার দেখে শূন্য ॥
অত্যকালে ঘটে আসি অশেষ অভাগ্য।
সংসার বাসনা ছাড়ি বাড়িল বৈরাগ্য ॥
দশাদোষে হল সে দারুণ দুঃখভাগী।
মুখে ভস্ম মাখে রাজা যেন যোগী॥
পট্টাম্বর ত্যজি রাজা পরিল কৌপীন।
ফকির করিল বিধি দশা হল হীন॥-(পৃ-৪৫)

বকা ও গালি

বাঙালি সমাজে বহুকাল ধরেই বিচিত্র রকমের বকা ও গালি প্রচলিত রয়েছে। বকা ও গালি সাধারণত ধনী, অত্যাচারী ও পর-পীড়ক শ্রেণির আক্রোশের যেমন বহিঃপ্রকাশ, তেমনি আবার অসহায়- অক্ষম শ্রেণির প্রতিকারহীন লাঞ্ছনা ও অপমানের সান্ত্বনা স্বরুপ। বাঙালি সমাজে স্বভাবজাত, পেশাবাচক, স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক, ও পশু- পাখিবাচক নিন্দার্থক শব্দসমূহকে গালি হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এর মধ্য-কানা-কানি, শালা-শালী, সমুন্দি, ভাঙরা, মাগী, ঢেমনা, বখিল, চসমখোর, গরু, গাই, বলদ, ষাঁড়, পাঠা, বানর, কুত্তার বাচ্চা, বাদির বাচ্চা অন্যতম।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব বকার মধ্যে- বাড়া, মাগী, বুড়া, বুড়ি, ঢেমনী, ভাতারখোর, গোবরখাগী, বুড়া ভাতার, শালা, শালী, শালার বেটা, হারামজাদী, ঢাটি, কুঁজি, নটী, বেশ্যা, প্রভৃতির উল্লেখপাওয়া যায় —

ক. 'বুড়ী বলে আমায় করেছ উপহাস।
বুড়া ভাতারের সেবা কর বারমাস ॥-(পৃ-২১)

খ. 'পাগল পাত্রের বুদ্ধে পাইল এতদূর।
বাড়া কি বলিব বৃদ্ধ শ্বশুর ঠাকুর ॥-(পৃ-৪৭)

গ. 'এক ঠাটী বলে মোর কর্ম্মফলে
পতি অতিশয় বুড়া ॥' (পৃ-২৫৮)

ঘ. 'ছেলে মেরে পথিক বান্ধে মাগীর এত বুক।
গর্ব্বিনী সে গরবখাকী তিন ছেলের মা।
পরের পুরুষ দেখে ধরিতে নারে গা ॥'-(পৃ-২৭৫)

ঙ. 'আজি হতে অতিথি প্রভাতে যেও যথা।
সেন বলে ছাড় নটী পরিপাটী কথা ॥'-(পৃ-২৮৭)

শাস্তি ও নির্যাতন

বাঙালি সমাজ জীবনে অন্যায় ও অপরাধের ধরন ও মাত্রানুযায়ী বিচিত্র রকমের শাস্তির প্রচলন ছিল। সাধারণ অন্যায়ের জন্য- চড়, থাপড়, কিল, ঘুষি, কানমর্দন, নাকেখত, কানধরে উঠাবসা, গলায় গামছা দিয়ে ঘোরানো, পিপঁড়ায় দাঁড় করানো ও শরীরে চুতরা পাতা ঘষা প্রচলিত ছিল। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় অপরাধের জন্য- লাঠি-বেত-চাবুক-দোররা দিয়ে পিটানো, শূলে চড়ানো, অঙ্গহানি, কয়েদ বা জেল জুলুম, শিরশেছদ, ফাঁসি, যাবজ্জীবন ও

নির্বাসন দণ্ডের প্রচলন ছিল। আর এ অপরাধগুলো ছিল- চুরি, ডাকাতি, হত্যা-খুন-লণ্ঠন, অপহরণ, ধর্ষণ-ব্যভিচার, গুম ও বিদ্রোহ অন্যতম।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত এসব শাস্তির মধ্যে-লাথি, কিল, চড়-থাপড়, জুতার বাড়ি, চুলধরে প্রহার, দাড়ি ও মাথা মুণ্ডানো, মুখে চুনকালি দেয়া, গলায় জুতার মালা পরানো, গরু-ঘোড়ার প্রস্রাবে গোসল, নাক-কান-চুল কাটা, নাকে খত, বুকে পাথর চাপানো। হাত-পায়ে দাণ্ডা বেড়ি দেয়া, জেলজুলুম, নির্বাসন বা বনবাস, শূলে চড়ানো তথা মৃত্যুদণ্ড প্রভৃতির উল্লেখপাওয়া যায় —

ক. ভাট বা দূতের শাস্তি

নাথা নুথা কিল গুঁতো হিড়িক জুতার।
ভাট বলে মরি মরি গোপ বলে মার॥
পরিহার মাগে ভট্ট ছেড়ে দেরে ভাই
মাথা মুড়ে দে রে বলিছে ইছাই।
ভাটেরে প্রবোধ করি মুচড়িছে দাড়ি।-(পৃ- ৩৯)

খ. নায়ানীর শাস্তি

'তাপে তবে কর্পূর ধরে কাত॥
নাক কান কাটে তারে লক্ষ্মণ ঠাকুর।
সেই রূপ করে তারে করে দিল দূর॥ –(পৃ-২৭৪-২৭৫)

গ. হরিহর বাইতির শাস্তি

'চোরের উচিত শাস্তি অনুচিত কাজ॥
অবিচারে মহারাজা দিতে চাহে শূলি।
আনন্দে বলিছে ধন্য কাল কলি॥' –(পৃ-৯৬৮)

ঘ. মহামদের শাস্তি

'গলিত কুষ্ঠক হও ছাড় ব্রহ্ম রা।
বলিতে বলিতে পাত্রের গলে পড়ে গা ॥
পচাগন্ধে বিষম মাছির ভন্‌ভনে।
নিকটে না বসে কেহ নাকে বস্ত্র বিনে ॥' -(পৃ-৭০৩)

ঙ. সুরিক্ষার শাস্তি

'কাটিল লোচন নাক ঘষাড়িল ভূঞে।
দয়ার ঠাকুর সেন জল দিল মুঞে॥'-(পৃ-৩১১)

বিচার ব্যবস্থা

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ বিচারক হিসেবে রাজা বা সম্রাট বিচার কাজ পরিচালনা করতেন। তবে পেশাদার বা নিয়মিত বিচারক হিসেবে কাজি, মুফতি, পণ্ডিত ও মোল্লাগণ এ কাজ সম্পন্ন করতেন। বাঙালি সমাজে সাধারণত ধর্মীয় বিধি-বিধান (কুরআন, হাদিস, বেদ, সংহিতা) অনুসারে বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতো। তবে অনেক সময় সামন্ত শাসক, জমিদারদের স্বেচ্ছাচারী মনোভাবের কারণে প্রজাগণ সঠিক বা ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত হতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' জামতিনগরের রাজা গদাধর রায় 'নয়ানী ও লাউসেনের বিরুদ্ধে আনীত হত্যার বিচার করেছেন। প্রথমে রাজা কোন বিবেচনা না করেই লাউসেন ও নয়ানীকে জেলে বন্দী করে রাখেন এবং পরে লাউসেনের অলৌকিক ক্ষমতায় নয়ানীর মৃতছেলের পুনর্জীবন ও সাক্ষ্য দেবার কারণে ভ্রষ্টা নায়ানীর

নাক- কান কাটা হয়। আবার রাজভাণ্ডারের অর্থ, স্বর্ণ চুরির দায়ে গৌড়েশ্বর কোন প্রমাণ ও সাক্ষী ও বিবেচনা ছাড়াই হরিহর বাইতিকে শূলে দেন ––

ক. রাজা গদাধরের বিচার কার্য

'অবিচারে নরপতি দিল কারাগার।
ভাল মন্দ কিছু নাহি করিল বিচার॥
কলা করে কান্দে মাগী কোলে মরা পো।
রাজ আজ্ঞা হল লয়ে কারাগারে থো॥
আপনি বিচার কালি বুঝিব সকালে।
সেনের বন্ধন দিয়া রাখিল কোটানে॥
পেটের বেটা ছোঁড়া সভায় হলো বাদী।
গদাধর বলে ভাল থাকলো হারামজাদী॥
মাগী বলে মিছামিছা মজায়ে মোর জাতি।
তাপে তবে কর্পূর কুপিয়া ধরে কাতি॥
নাক কান কাটে তার লক্ষ্মণ ঠাকুর।
সেই রূপ করে তারে করে দিল দূর॥'-(পৃ-২৬৭-২৭৫)

খ. গৌড়েশ্বরের বিচারকার্য

'সাক্ষ্য বলে হরিহর চলে গেল বাড়ি।
কোপে ওষ্ঠ কাঁপে পাত্র মুচড়িছে দাড়ি॥
সেনে ছেড়ে আড়ি হৈল বাইতি উপর।
ধন চোর ঢেসায় পাঠাব যমঘর॥
এত ভাবি ভাণ্ডারে প্রবেশ করে ছলে।
ধন চুরি গেল বলে কন্দিল কোটালে॥
পাত্র বলে নিবেদন শুন মহারাজ।
চোরের উচিত শাস্তি অনুচিত ব্যাজ॥
অবিচারে মহারাজা দিতে চাহে শূলি।
আনন্দে বলিহে পাত্র ধন্যকাল কলি॥
না কর বাইতি কিছু ধর্ম্ম অভিমানে।
কোটাল লইয়া গেলা বধিতে মশানে॥-(পৃ-৬৯৭-৬৯৮)

উপহার-বখশিশ ও দান- দক্ষিণা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে বিবাহ, পূজা, ঈদ, শ্রাদ্ধ, আকীকা, উপনয়ন, হাতেখড়ি পার্বনসহ বীরত্বপূর্ণ কাজে পুরস্কার- বখশিশ ও দান- দক্ষিণার প্রচলন ছিল। রাজা থেকে শুরু করে সাধারণ গৃহস্থ পর্যন্ত এসব দান- দক্ষিণায় অভ্যস্ত ছিলেন। আত্মীয় বাড়িতে যাবার সময়, রাখাল শ্রমিককে নিয়োগ দানের সময় বা কর্ম শেষে বিভিন্ন ধরনের উপহার প্রদান করার রীতি প্রচলিত ছিল। এসব উপহার দ্রব্যের মধ্যে ছিল- অর্থ - কড়ি, গহনা- অলংকার, পান-

সুপারি, ধুতি- চাদর- শাড়িসহ অন্যান্য বস্ত্র, থালা-বাসন তৈজসপত্র, দাস- দাসী, গৃহ পালিত ও বন্য পশুপাখি, মাছ, খাদ্য দ্রব্য এবং অন্যান্য মূল্যবান তথা উপযোগী পণ্য সামগ্রী।

'ধর্ম মঙ্গল কাব্যে, উপহার সামগ্রীর পরিচয় পাওয়া যায় —

ক. পুত্র কল্যাণে দান- দক্ষিণা

'ছেদন করিয়া নাড়ী সপুরট পাট সাড়ী
ধাত্রী পাইল কতেক সম্মান।
চিন্তিয়া পুত্রের ক্ষেম মহারাজ কত হেম
দুঃখী দ্বিজ দেখি দিল দান॥
ভাটে বিলাইল ঘোড়া নাপিত রজকে জোড়া
জরিশাল সরবন্দ চীরে।
তুষিতে সকল রাজ্যে তৈল মৎস্য দধি আর্য্যে
ঘরে ঘরে বিলাইল ফিরে॥-(পৃ-১১৯)

খ. কামারের মজুরিসহ অন্যান্য বখশিশ

'কত পুরস্কার হল্য কামারের লাভ॥
করে দিল্য বিনোদ বলয় বাজুবন্ধ।
শ্রবণে সোনার চাঁপা শিরে সরোবন্ধ॥
কত নিধি কনক কড়াই কণ্ঠহার।
পট্ট জোড়া হরিশালে নেহারে কামার॥'-(পৃ-১৭৭)

গ. মল্লবীরদের বখশিশ

'শিঙ্গা বলে এল্যো মাল শুন্যা রঞ্জা দিল শাল
সোনালী শিরোপা সরোবন্দে।'-(পৃ- ১৮৩)

ঘর বাড়ি

বাঙালি সমাজে অঞ্চলে ভেদে বিচিত্র ধরনের ঘর-বাড়ি দেখা যায়। ধনী সামন্ত শাসক, বণিক ও অভিজাত শ্রেণিরা পাকা ইটের রাজ প্রাসাদ, দালান কোঠা, দুর্গ, মঠ- মন্দির- মসজিদ, নাট্যশালা, জলসাঘর নির্মাণ করতেন। এসব দালান ও বাড়িসমূহ বহুতল বিশিষ্ট হতো এবং বিভিন্ন মহলে (পাঁচ মহল, সাত মহল) বিভক্ত থাকতো। এছাড়া টিনের চারচালা, আটচালা ঘরও নির্মাণ করা হতো। আনন্দ বিনোদনের তৈরি করা হতো বালাখানা, বৈঠকখানা, জলসাঘর, বাগান বাড়ি, জলটুঙ্গি, হাওয়াখানা, বিলাসভবন ও প্রামোদ তরী। অন্যদিকে গ্রামের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন শ্রেণির মানুষজন টিন, বাঁশ, বেত ও ছন-খড়কুটা দিয়ে তৈরি করতো দোচালা, চারচালা, কুড়ে ঘর, ছাপড়া, ডেরা, মাটির ঘর, গোলা ঘর, গোহাল ঘর ও পর্ণকুটীর প্রভৃতি।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির গৃহ ব্যবস্থারু মধ্যে রাজ প্রাসাদ, দালান কোঠা, গড় বা দুর্গ, দেউল, মন্দির, দোকানপাট,ও কুড়ে ঘরের চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

ক. দলিজ বা বৈঠকখানা

'প্রাণনাথে দেখ যেয়ে নয়ন ভরিয়া।
দলিজ দুয়ারে রাজা আছে দাড়াইয়া॥'-(পৃ-৪৬৬)

খ. রাজপ্রাসাদ বা অট্টালিকা

'ভূমে হাঁটু পাতি পূর্ব্বে প্রবেশিতে ঘর।
এখন শয়ন অট্টালিকার উপর॥-(পৃ-৬১৯)

গ. কুড়ে ঘর

'মাটির পাথর ভাড় ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর।
তখন তেমন দশা এক লক্ষেশ্বর॥-(পৃ-৬১৯)

তৈজসপত্র

বাঙালি নর- নারী তার সংসার জীবনে নানা রকম তৈজসপত্র ব্যবহার করে থাকে। ধনী-গরীব, গ্রাম্য- শুহরে সকল মানুষই তামা-কাঁসা-লোহা-বাঁশ-বেত কাঠ ও মাটির বিচিত্র রকমের তৈজসপত্র ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। বাঙালির প্রাত্যহিক সংসার জীবনে ব্যবহৃত এসব তৈজসপত্রের মধ্যে — পাত্র (ভাণ্ড, ঘট, ঘড়া,) ভৃঙ্গার, গেলাস, পাতিল, কড়াই, থালা, বাসন, বাটি, খোরা, সাজি, ঝুড়ি, থলে, সরা, ঢাকনী, চামচ, ছেনি, হাড়ি, কলস, খেজুরপাটি, শীতলপাটি, দড়ি বা রশি, মশারি, খাট, চৌকি, জল চৌকি, পিঁড়ি, হাত পাখা, পানের ডাবর, সড়তা, লোটা, বদনা, হাতা, ঢেঁকি, কুলা, ধামা, ডালা, কাঠা, চাঙারি, বাখারি, দোলনা, শিকা, হামান দিস্তা, পাটা, জাতা, সিন্ধুক, রেকাবি, প্রদীপ, বালতি, খুন্তি, দা, লাঙল- জোয়াল, মই, ডোল, কাজল দানি, সুরমাদানি, হুকা প্রভৃতি।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে, বাঙালির প্রাত্যাহিক জীবনে ব্যবহৃত এসব তৈজসপত্রের উল্লেখপাওয়া যায় —

ক. চামর বা হাত পাখা

'চাপে দুই চরণ চামরে করে বা।
রাজা বলে হেদে বা খানিক ঘুম যা॥-(পৃ- ১১১)

খ. খাট পালং- পাটি- বালিশ- দোলনা

'মেঝে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া ফলঝাঁটি।
ফেলিল পালঙ্ক তায় পাতাইল পাটি॥
গুজরাটী ছিট ভোট ষোট তার খাসা।
দুদিকে বালিশ রাখে আলিশ বিনাশা॥
পালঙ্ক চৌদিকে চিত্র তেথরি দোলনা।'-(পৃ-১০৯)

গ. কুলা-ডালা- ঝুড়ি-বাঁশ-বেত

'কুলা ডালা বুনিতে বাঁশের বান্ধে বেতি।
ধুচুনি চুপড়ি ঝুড়ি পেয়া হাতাহাতি॥
পাত পেত বোমা বান্ধি হাঁকাইল বরা।
বাইশ হেতার বান্ধে কান্দে রয় ভার।'-(পৃ-৩৭৪)

ঘ. ঘটি-বাটি-থালা

'পিড়া ঘরে ঝাড়ি খুরি ঘটী বাটি থালা।
উঠালে উলঙ্গ ঘুমে ঘরে জলে আলা॥,-(পৃ-৫৯১)

ঙ. ঢেঁকি- হাড়ি- চুলা- চালুনি

'উড়ি ধান জানিবে শোলের কর‍্যা ঢেঁকি।
অতি হাঁড়ি নিজ হাতে করিবে নির্ম্মাণ।
নদীর আনিয়া বালি করিবে উনান॥
চালুনিতে জল আনো তারাদীঘি হতে।'-(পৃ-৭২২-৭২৩)

যানবাহন

তৎকালীন বাংলায় জল ও স্থলপথেই মানুষজন যাতায়াত করতো। জলপথের বাহন রূপে-জাহাজ, নৌকা, ডিঙি ও ভেলার প্রচলন ছিল। আর স্থল পথের বাহন ছিল– পালকি, দোলা, রথ, হাতি, ঘোড়া, উট, মহিষ, গাধা, খচ্চর, বলদ, ষাড় এবং গরুর গাড়ি ও ঘোড়ার গাড়িসমূহ। এছাড়া সাধারণ মানুষ পায়ে হেঁটেই যাতায়াতে অভ্যস্ত ছিল। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত এসব যানবাহনের উল্লেখপাওয়া যায় —

ক. রথ, গরু-ঘোড়া

‘সদা সুখ সম্পদ সভায় সুসম্মান।
রথাদি গো গজ বাজী নর নৌকা যান॥’-(পৃ-০৮)

খ. হাতি

‘ইছাই প্রবেশে পুরী বেষ্টিত লস্কর।
মাথায় ধবল ছাতি হাতীর উপর॥’-(পৃ-৩৯)

গ. দোলা

‘নাগারা নিশান বাদ্য বেড়ে সৈন্যগণে।
বরকন্যা চলে দিব্য দোলা আরোহণে॥’-(পৃ-৫৫)

ঘ. ডিঙ্গা

‘তড়বড়ি কুপিয়া সাজিল পাঁচ ডিঙ্গা।
ঘন বাজে টমক টেমাই কাড়া শিঙ্গা॥’-(পৃ-৪৯১)

ঙ. ভেলা

‘সেন বলে বীর কালু ছেড়ে দাও ভেলা।
পেরুল সকল ডেমে করে অবহেলা॥’-(পৃ-৫০৭)

চ. নৌকা

‘নয়জন নাবিকে নৃপতি নিল নায়।
বাটুয়া কুকুর কেন্দে গড়াগড়ি যায়॥’-(পৃ-৫৬৮)

খেলাধুলা

বাঙালি সমাজে বহুকাল থেকেই বিচিত্র ধরনের খেলাধুলার প্রচলন ছিল নর-নারী উভয়েই অবসর-বিনোদন, শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্তির জন্য-পাশা, দাবা, চৌগান, বা পলো, কুস্তী, মল্ল, কাবাডি বা হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবান্দা, কানামাছি, বুড়িছোঁয়া, গোল্লাছুট, নৌকা বাইচ, সর্দারবারি, হাতির লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, বুলবুলির লড়াই ও বিয়ে দান, মহিষের লড়াই, ঘোড়দৌড়, গরু দৌড়, বানরের খেলা, সাপের খেলা, খঞ্জরের নাচ, বিশ- পঁচিশ, বাঘবন্দি, জল খেলা, ডাঙ-গুটি, পায়রা উড়ানো, ঘুড়ি উড়ানো, লাটিম খেলা, শিকার, তাস ও জুয়া খেলায় অভ্যস্ত ছিল। পর্তুগিজ ও ওলন্দাজদের হাত ধরেই এদেশে তাস ও জুয়া খেলার সূত্রপাত ঘটে। সামন্ত শাসকগণ শিকারের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করতেন। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্যে’ বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব খেলাধুলার চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

পাশা খেলা

‘অঙ্গীকার করি রাণী পাশা খেলে ভ্রমে।
দেখা দিল স্ক্রিজ আসি দিবা দুই যামে॥
পাশায় নেশায় চিত্ত নেত্র হৈল হারা।
দৈবদোষে ঠকে গেল ভূপতির দারা॥’-(পৃ-৩৭০)

শিকার

সামন্তবাদী সমাজে শাসকগণ মহাসমারোহে বাঘ, হরিণ, সিংহ, হাতিসহ বিভিন্ন পশু-পাখি শিকার করে আনন্দ উপভোগ করতেন। এশিয়ারের সাফল্য শাসকের শৌর্য-বীর্যের বহিঃপ্রকারশ ঘটাতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' গৌড়েশ্বরের মহা আড়ম্বরে বাঘ শিকার এবং শাকা-শুকাকে শূকর শিকরে যেতে দেখা যায় —

ক. বাঘ শিকার

'এত বলি প্রবোধ করিলা মহারাজ।
দড়দড় হুকুম করিলা সাজ সাজ॥
শাদ্দুর্ল শিকারে যাব নব লক্ষ দলে।
শুনিয়া সিপাই সব সাজে বীর বলে॥'–(পৃ-২২৬)

খ. শূকর শিকার

'শাখা শুখা শিকারে শূকর করে লোপ।
পোড়ায়ে বড়সা মুখে জোগাইল টোপ॥'-(পৃ-৪৯০)

মাছ ধরা বা শিকার

বাঙালি সমাজে মাছ ধরা বা শিকারের বহুল প্রচলন ছিল। জেলেদের পাশাপাশি বাঙালি নর- নারী উভয়েই মাছ ধরায় পটু ছিল সাধারণত বেড়জাল, রাক্ষসজাল, ডোল্লা জাল, ঝাঁকি জাল, ঠেলা জাল, ভেসাল জাল, দোঁ জাল, পলো, জুতি, কোচ, হাতায়ে, পুনপুনি বা ফালা, ওচা, ও বড়সি দিয়ে মাছ ধরায় বাঙালিরা অভ্যস্ত ছিল। ফাগুন-চৈত্র মাসে বিভিন্ন খাল- বিলে মাছ ধরতে ঘটা করে- পলো বাইচ অনুষ্ঠিত হতো। মাছ ধরার উপকরণসমূহ বাঙালি নর-নারীরা নিজেরাই তৈরি করতে পারতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে, দলুই ও কালু ডোমকে বড়শি দিয়ে মাছ শিকার করতে দেখা যায়–

'অজয়ে মারিয়া মৎস্য গাছে কান্ধি ভেলা।
দেখি না এসব করে কি করে গোয়ালা ॥
কাটিয়া সরল গাছ সাজাইয়া মঞ্চে।
তাহে বসে দলুই বড়সী বায় সঞ্চে॥
শাকা শুখা শিকারে শূকর করে লোপ।
পোড়ায়ে বড়সা মুখে জোগাইল টোপ॥
মঞ্চে বসে মৎস্য মারে কালু মহাবল।
রোহিত মৃগাল বাটা ফলুই চিতল॥'–(পৃ- ৪৯০)

গান- বাজনা- নৃত্য

বাঙালি হিন্দ- মুসলিম উভয় সমাজেই গান- বাজনার কদর ছিল। ধর্মীয়- সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব ও পালা-পার্বনে নাচ-গান ও বাদ্যের বহুল ব্যবহার প্রচলিত ছিল। বাঙালির লোক প্রিয় গানের মধ্যে — মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালী, বাউল, মরমী, পল্লীগীতি, ঝুমুর নাচ, ঘেটু যাত্রা, যাত্রা অভিনয়, বিচার গান, পালা গান, কীর্তন, কথকতা, হামদ্‌-নাত, গজল, খেয়াল, কাওয়ালী ও বিভিন্ন প্রকার রাগ সঙ্গীত অন্যতম। এছাড়া বাঙালির নাচ-গানের বাদ্যযন্ত্র হিসেবে-একতারা, দোতারা, সেতার, বীণা, বেণু, ডমরু, দামামা, শঙ্খ, বিউগল, সানাই, সিঙ্গা, পিনাক, পাখেয়াজ, এসরাজ, দোহারা, মোহরা, মদৃঙ্গ, করতাল, তবলা, মুরলী, রবাব, বেহালা, হারমোনিয়াম,

ভেউল, কাঁসা, তাম্বুরা, কবিলাস, ঢাক, ঢোল, খঞ্জনি, নুপূর ও ঘুঙুরের ব্যাপক প্রচলন ছিল। পেশাদার গায়েন, বাদক শিল্পী, নর্তকী, বেশ্যা, হিজড়ারা এসব নৃত্য-গীত করতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে অবসর বিনোদন হিসেবে এসব বাদ্যযন্ত্র, নাচ-গানের উল্লেখপাওয়া যায় —

বাদ্যযন্ত্র

'সুপদ্য বাজে বাদ্য মাদল মুরজাদ্য
মঙ্গল জয় হুলাহুলি।
নৃপতি নিকেতনে যতেক সমীগনে
মঙ্গল তণ্ডুল বিউলী॥
শুভক্ষণে কন্যা বরে করিয়ে ছাউনী।
শঙ্খ ঘণ্টা ঘোর বাদ্য উঠে জয়ধ্বনি॥
ঢাক ঢোল শিঙ্গা কাড়া একাকারময়।
আনন্দ আবেশে সবে বলে- ধর্ম্মজয়॥'-(পৃ-৫০-৬২)

হাতিয়ার

মধ্যযুগে বাংলায় সর্বদা যুদ্ধ- দাঙ্গা- হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। যুদ্ধে জয় এবং জীবন সুরক্ষার জন্য বাঙালি সমাজে বহুধরনের অস্ত্র বা আয়ুধের ব্যবহার করা হতো। এসব অস্ত্রের মধ্যে — তীর-ধনুক, বর্শা-বল্লম, গদা, কামান, বন্দুক, তরবারি, কিরিচ, ছোরা, চাকু, খঞ্জর, পাশ, চক্র, টঙ্কার, বাণ, কুঠার, ও লাঠি অন্যতম। যুদ্ধ পোশাক হিসেবে- লোহার জিরাই, কাবাই, পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ, ইজার, টুপি, মোজা, ঢাল, বর্ম ব্যবহৃত হতো। আর রর্ণবাদ্য হিসেবে- ঢাক- ঢোল, কাড়া-নাকাড়া, দামামা, ভেউড় ও বিউগলের ব্যবহার ছিল। চতুরঙ্গ বাহিনীর (অশ্ব, হস্তী, রথ, পদাতিক) মধ্যে যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতো। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব যুদ্ধাস্ত্রের উল্লেখপাওয়া যায় —

'নিজ তূণ হইতে তুলিলা তিন বাণ।
হাতে হাতে ঈশ্বরী ইছায়ে দিল দান॥
ডান ভাগে বান্ধিল যুগল যমধার।
খরতর জোড়া খাঁড়া বান্ধে দুই থর॥
দুদিকে যুগল টাঙ্গি যম অবতার।
ছোয়াহুরি কাটারি কুটিল হীরাধার॥
করকচে তুলে বান্ধে তের শত তীল॥
ধনুক বন্দুক আদি আচ্ছাদিত ঢাল।
বান্ধিল দেবীর বাণ মূর্তিমান কাল॥'-(পৃ-৫১৬-৫১৭)

রোগ-বালাই

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে বেশ কিছু রোগের প্রাদুর্ভাব ও প্রকোপ দেখা যায়। এসব রোগের মধ্যে—স্বর্দি-জ্বর, কালা বা পচানো জ্বর, বাত জ্বর, অন্ধত্ব, বধিরত্ব বাত, অতিসার, শূল, ব্যথা, কাশ, কফ, গলগণ্ড, চোখে ছানি, খুজলি বা চর্মরোগ, দাউদ, পিত্ত, কলেরা, বাউসি (পাইলস), যক্ষ্মা, গুটিবসন্ত, কুষ্ঠ, সিফিলিস বা উপদংশন ও গোদ (Elephantiasis) অন্যতম। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে, বাঙালি সমাজে বিদ্যমান এসব রোগ-বালাইয়ের চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

ক. গোদ

'শীলা বলে ফুল বরঞ্চ ও ভাল
মোর দুখ শুন সই।
স্বামীটা অবোধ পায়ে কুড়া গোদ
অনেক দুঃখেতে কই॥'-(পৃ-২৫৯)

খ. বধিরতা ও প্রতিবন্ধী

'মোর পতি বুড়া কালা কাণা খোঁড়া
খেপা ঢিপেশোকা তায়॥'-(পৃ-২৫৯)

গ. কুঁজ

'অধিক অবুঝ পিঠ ভরা কুঁজ
শুতে গেলে করে উঃ।
ঘাড়ে কুঁজ জুড়ে ভূমে মায় গড়ে
মিনসে রাজ্যের কু॥,-(পৃ-২৫৯)

ফুল-ফল, লতাগুল্ম ও গাছপালা

বাঙালি সমাজে পূজা-ব্রত, বিবাহ ও সামাজিক- ধমীয় অনুষ্ঠান, উৎসবে ফুলের ব্যবহার ছিল অপরিহার্য। এছাড়া নারীদের রূপচর্চা- প্রসাধন ও গৃহ সজ্জায় ফুলের ব্যবহার করা হতো। বাড়ির আঙিনায়, উঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, মসজিদ, মন্দির, অফিস আদালত ও বাগানে মালীদের সেবাযত্নে নানা রকম ফুল- ফল গাছের পরিচর্যা করা হতো।

ক. ফুল

বাঙালি সমাজে প্রচলিত ফুলের মধ্যে — গোলাপ, চাপা, মালতী, যুথি, কেয়া, কেতকী, টগর, বকুল, মল্লিকা, জবা, জুই, পদ্ম, করবী, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, হাসনাহেনা, গাদা, বেলী, পলাশ, কদম, শেফালি, শিউলি, সূর্যমুখী ও কৃষ্ণচূড়া অন্যতম

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসকল ফুলের উল্লেখপাওয়া যায় বহুল পরিমাণে —

'রাখে নানা পুষ্প শোভা জাতি যূথী জোড় জবা
চাঁপা চন্দ্রমালতী মল্লিকা।
পূজিতে পরমান্দ করবীর অববিন্দ
তুলসী বকুল টগরিকা॥'-(পৃ-৫৭৭)

খ. ফল

বাঙালি সমাজে বিভিন্ন ধরনের ফলের প্রচলন ছিল। এসব ফলের মধ্যে — আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, নাশপাতি, নারকেল, বেল, আতা, ডালিম, তাল, জাম্বুরা, জলপাই, কমলা, করমজা, কামরাঙ্গা, আমড়া, আমলকী, জামরুল, বরই, খেজুর, কলা, তেঁতুল, পেয়ারা, আনারস, অন্যতম। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির জনপ্রিয় এ ফলসমূহের উল্লেখ মেলে–

'বারমেসে কদলী কাঁঠাল আম্রফল।
টাবা নেবু নারেঙ্গা গুবাক নারিকেল॥'-(পৃ-৪৮৯)

গ. গাছপালা ও লতাগুল্ম

বাংলা ভূখণ্ডে নান প্রজাতির গাছ-পালা লতাগুল্মের বিপুল উপস্থিতি লক্ষ করা যেতো। এসব গাছপালারা মধ্যে — আম, জাম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারি, শাল, জারুল, গজারি, সুন্দরী, গামারি, মেহগনি, মহুয়া, বট, অশ্বত্থ, পিপুল, দেবদারু, শেওড়া, বাঁশ, ঘৃতকুমারী, থানকুনী, কালোমেঘ, চিরতা, ঈশ্বরীরমূল অন্যতম।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে, এসব লতাগুল্ম ও গাছপালার বহুল উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় —

'কাটিল পেয়াল কাল পালিতা পলাশ শাল
ক্ষুদ্র তাল তমাল তেঁতুল॥
করঞ্জা করন্দা সাঁড় খেঁদে কেয়া কলো কাড়া
কালকাসন্দা কটকী কাঁটাফুল।
ঝোপ ঝাপ ঝাউ ঝাঁটি সাঁই শর সিজ কাঠি
কোদাল উপাড়ে তার মূল॥
বৈঁচি বাবলা বেনা বনবেত্র বনসোনা
অপামার্গ আকন্দ আকল।
কাটিয়া রাখিল লম্বা আম জাম রামরম্ভা
বটবৃক্ষ বকুল শ্রীফল॥'–(পৃ-৫৭৬)

জীবজন্তু-পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ

বাঙালি ভূখণ্ডে জলে-স্থলে, ঝোপ-ঝাড়ে, বনে-জঙ্গলে ও বাড়ির আঙিনায় বিচিত্র ধরনের জীব-জন্তুর আনাগোনা দেখা যায়। সংখ্যায়, স্বভাবে, আকারে-আকৃতিতে, রঙে-বৈচিত্র্যে ও উপযোগীতায় এসবের ব্যবহার লক্ষ করার মতো।

ক. গৃহপালিত পশুপাখি —

বাঙালির গৃহপালিত পশুপাখির মধ্যে রয়েছে — গরু, মহিষ, ঘোড়া, গাধা, ছাগল, ভেড়া, পাঠা, হাস, মুরগি, বিড়াল, কুকুর, কবুতর প্রভৃতি। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে, এসমস্ত গৃহপালিত পশু-পাখির পরিচয় পাওয়া যায় —

'পারাবত কুক্কুট কতেক রাজহাঁস।
বিড়াল কুকুর খেয়্যা বেড়ে গেল আশ॥
ছাগল শূকর মেষ মহিষের ছা।
ধরে ধরে ঘার ভাঙ্গে বিপরীত রা॥'-(পৃ-২১৫)

খ. পাখি

বাংলা অঞ্চলে বিচিত্র ধরনের পাখির উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এসব পাখির মধ্যে — কোকিল, কাক, ময়ূর, দোয়েল, শালিক, চিল, পেঁচা, শকুন, ঈগল, চিল, ঘুঘু, ময়না, টিয়া, কবুতর বা পায়রা, বাবুই, মাছরাঙ্গা, ডাহুক, কানকুয়া, টুনটুনি, চড়ুই, পানকৌড়ি, গাঙচিল, শামকল, বক, তিতির, চকোর, ওকোয়েল অন্যতম।'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসমস্ত পাখির উল্লেখপাওয়া যায় —

'কোকিল উগারে মধু ভ্রমর গঞ্জুরে।
ময়ূর ময়ূরী নৃত্য মহোৎসব করে॥
চকোরী চকোর নাচে পাইয়া পেল।

চিত্তবোর উপরে উড়িছে মেঘমালা॥
রাজহংস সহিত নাচিছে সারী শুক।
চক্রবাক বকী বক বিহরে উলুক॥
কাক কঙ্ক কোকিল করিছে কলরব।
ঘোর নাদে ঘুঘু যেন ঘন ঘন তানে।
ডাহুক ডাহুকে নাচে ডিমে দিয়া তা।
তপস্বী বাদুড় ঝোলে উভ করি পা॥
মীনমুখে মাছরাঙ্গা মানায় মহত।
প্রিয়মুখে পিয়ে মধু পিক পারাবত॥
বাবুই বসন্ত বউ রঙ্গা রায়মনি।
হরিগুণ গানেতে ময়না মহামুহি॥
তাতারা তিতির তোতা তাতেলে বিহগ।
রামসর শালিক শালিকী চিত্র খগ॥'-(পৃ-১৫৪)

গ. বন্যপশু

বাঙালি অঞ্চলে বন্যপশুর মধ্যে — বাঘ, সিংহ, হাতি, ভালুক, গণ্ডার, শূকর, হরিণ, জিরাফ, জেব্রা, বনগরু, খাটাশ, সজারু, শিয়াল, বেজি, খরগোশ, ইদুর, গরিলা, বানর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'ধর্মমঙ্গলে কাব্যে, এ ধরনের বন্য পশুর উল্লেখপাওয়া যায় —

'সারা রাত্রি শৃগাল কুকুরে রহে স্তন্ধ॥
কাক কঙ্ক শকুনী গৃধিনী চর্ম্মচীল।
আসিতে না পায় দিশা নিশা অন্ধশীল॥'-(পৃ-৬১৬)
গহন গমনে মনে ভয় ভাবে ভরা।
শুনিয়া শার্দ্দুল সিংহ শূকরের সাড়া॥
সিংহ সনে কুরঙ্গ মাতঙ্গ দিল ভঙ্গ।
ভক্ষ্য ভেক ভয়ে যায় ভুজঙ্গের সঙ্গ॥
মার্জ্জার মূষিক শিব শশক শার্দ্দুল
গলাগলি ভাসে বানে বিপত্তে ব্যাকুলী॥'-(পৃ-৫৬০-৫৭৬)

ঘ. জলজ জন্তু

বাংলা অঞ্চলে জলজ জন্তু বা প্রাণী হিসেবে-কুমীর, কচ্ছপ, কাছিম, শুশুক, জোক, হাঙ্গর, ভোদর, উদ, কাঁকড়া, শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক প্রভৃতির উল্লেখপাওয়া যায়। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এসব জলজ জন্তুর উল্লেখপাওয়া যায় —

'রজকের পাট কালো কমল তরঙ্গ।
দেখাইয়া বলে এই কুম্ভীর ভুজঙ্গ॥'-(পৃ-২৫২)
দারুণ কুম্ভীর আসি করে বড় বল॥
লেজ কাঠে কুম্ভীর কচ্ছপ কাটে কান্।'-(পৃ-৫০৮)

ঙ. কীট পতঙ্গ

বাঙালি সমাজে নানা রকম কীট-পতঙ্গের মধ্যে — ভ্রমর, ফড়িং, প্রজাপতি, ঝিঝিপোকা, গোবরে পোকা, তেলাপোকা, বিচ্ছু, পিঁপড়া, মৌমাছি, ডাঁস, মশা, মাছি, ছারপোকা, বা উড়শ, মাজড়া পোকা, সিন্দুরিয়া পোকা ও টিকটিকি অন্যতম।

'শিয়রে তাড়ায়ে রব মশা মাছি ডাঁসা।
প্রভু নাই যাবত পুরেন অভিলাষ॥'-(পৃ-৯৭)
ফনা ঝাড়ি ফলঙ্গ মারিতে যায় ফেটে॥'-(পৃ-১৬৭)

চ. সাপ

বাংলা জলপ্লাবিত অঞ্চল হওয়াতে এখানে বিচিত্র ধরনের সাপের আনাগোনা দেখা যেতো। এসব সাপের মধ্যে- ধোড়া, তক্ষক, গুই, গোখরা, দাড়াশ, পাণ্ডু, অজগর, সুতানলি,কাল নাগিনী, দুমুখো সাপ, উনকোটী সাপ, সিন্দুবিয়া সাপ, অগ্নিজাল সাপ, ভার্গাব সাপ, সিংহমুখ সাপ, কেউটিয়া সাপ অন্যতম। ওঝা, বেদে ও সাপুড়েরা এসব সাপ পালন ও খেলা দেখিয়ে থাকে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' এ সকল সাপের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় —

'আট তোলা বিষে যে বাসুকী বলধর।
দংশিলে অবশ্য মৃত্যু নতুবা অমর॥
শুনিয়া অজয় তত্ত্ব সেনেরে কহিতে।
পাতালে বাসুকী নাগে আনিল ত্বরিতে॥
বিষপুঞ্জ সপরাজ দংশিল ঘোড়ায়।'-(পৃ-৫০৯)

নদ-নদী

এ বাংলা অঞ্চল অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল দ্বারা জড়িয়ে রয়েছে বাংলার এসব নদ-নদীর মধ্যে- গঙ্গা, ভাগীরথী, সরস্বতী, দামোদর, কালিন্দী, নর্মদা, গোদাবরী, বিপাশা, রেবা, মন্দাকিনী, ইরাবতী, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, করতোয়া, ভৈরব, গোমতী, তিস্তা, কপোতাক্ষ, মহানন্দা, আড়িয়াল খা, শীতলক্ষ্যা, ধলেশ্বরী, কালিগঙ্গা, বুড়িগঙ্গা, গড়াই, কর্ণফুলী, চিত্রা, কুমার, আত্রাই, ইছামতি অন্যতম।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে, বাংলার এসব নদ-নদীর উল্লেখপাওয়া যায় —

ক. নদ-নদী

'গৌড় মুখে ধায় দিবারাতি॥
কালিন্দী পেরিয়া দূর ধূলাডাঙ্গি ব্রহ্মপুর
পিঠে রাখি পাইল পদ্মমা।
দ্বারিকেশ্বর নদী ধায় পেরিয়ে পীরের পায়
সেলাম করিয়া বামে ধায়।
উচালন রাখি দূর আসিল বারাকপুর
দামোদর পার হল নায়॥
পার হল ভাগীরথী অপরঞ্চ পদ্মাবতী
লঘুগতি গৌড়ে উপনীত।'-(পৃ-১১৯-১২০)

খ. পুকুর বা দীঘি

'খাণ্ডার পুরীর বিঘ্ন রাজা নাই পাটে।
পূজিব পার্ব্বতী পদ সাটী দীঘির ঘাটে॥'-(পৃ-৫৯৯)

গ. নদীর ঘাট

'সম্প্রতি সম্পূর্ণ পূজা চাঁপায়ের ঘাটে।
পণ্ডিত গোঁসাই দিল বিসর্জ্জন ঘটে॥'-(পৃ-১০৪)

ঘ. বিল

'গুরুতর গমনে রজনীর বদনে
প্রবেশে পদ্মার বিল॥'-(পৃ-৫৮৬)

প্রকৃতি প্রভাব

বাঙালির জীবন জিজ্ঞাসা ও জীবিকার ওপর প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য, নদ-নদীর আশীর্বাদ ও আগ্রাসন, খরা-দুর্ভিক্ষ, মেঘ-বৃষ্টি, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস ও বন্যার খেয়ালী মূর্তি বাঙালি নর-নারীর অন্তঃকরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। মানব জীবনের সুখ-ঐশ্বর্য, দুঃখ বিরহের সময় প্রকৃতির প্রভাব ও উপলব্ধি প্রগাঢ় রূপ লাভ করে। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' প্রকৃতির এ চালচিত্রের পরিচয় মেলে —

ক. শিলা বৃষ্টি

'মায়া দৃষ্টি হল সৃষ্টি ঘোর বৃষ্টিপাত।
নির্ঘাত শব্দ শিল বন উল্কাপাত ॥
হুড়্ হুড়্ দুড়্ দুড়্ ঘোর গভীর গর্জ্জন।
পীড়া পেয়ে প্রমাদে পালায় ভক্তগণ ॥
শীত ভীত ক্ষুধায় কম্পিত কলেবর।
আশ্রয় লইল সবে পথে পেয়ে ঘর ॥' (পৃ-১০১)

খ. বন্যা ও প্লাবন

'কুল কুল কুরব কমল কাণে কাণ।
দেখিতে দেখিতে বড় বেড়ে গেলে বান ॥
ঘোর রবে ঘুরুনি ঘুরিছে ঘনেঘন।
প্রমাদ পেড়েছে পুরে প্রলয় পবন ॥
দুড় দুড়ুম দুড়ুম দুদিকে নদীর ভাঙে কূল।
তটিনী তটের তরু সংহারে সমূল ॥
আকাশে উথলে জল রাশি রাশি ফেন।
দেখে সচিন্তিত বড় রাজা লাউসেন ॥'-(পৃ-৩৬৩-৩৫৪)

গ. বৃষ্টি বাদল

'আজ্ঞা বন্দি সঘনে গগনে গৌড় বেড়ে।
সঘনে ঈশান কোণে চিকুর আছাড়ে ॥
দড় দড় শব্দ ঘোর ঘন উল্কাপাত।
বিপরীত বিদ্যুৎ ঘন বিষম বজ্রপাত ॥

নির্ঘাত শব্দ শুদ্ধ শিলা বরিষণ।
প্রমাদ পাড়িল পুরে প্রলয় পবন ॥
মড় মড় শব্দে ঝড়ে পড়ে গাছ।
কত পীড়া উঠানে আছাড়খায় মাছ ॥
ঘন ঘোর অন্ধকারে বিষম বৃষ্টি ধারা।
হারা হল দিবানিশি রবি শশী তারা ॥
নিতি নিতি বাড়ে বড় অঘোর বাদল।
খাল খানা বাট বাটী একাকার জল ॥
নিয়ম অষ্টম দিনে ঘুচিল বাদল।' (পৃ-৫৫৬-৫৬০)

ঘ. বসন্ত ঋতুর প্রভাব

'ছয় ঋতু প্রফুল্ল ফুটেছে নানা ফুল।
মকরন্দ লোভে মত্ত ভ্রমে অলিকুল ॥
কোকিল উগারে মধু ভ্রমর গুঞ্জরে।
ময়ূর-ময়ূরী নৃত্য মহোৎসব করে ॥
ডালে বসে ডাকে শুক প্রেমে পুলকিত।
ভ্রমর ভ্রমরীগণে গানে বিমোহিত ॥
দেখিতে দেখিতে দেবীর বাড়ে বড় প্রেম।
মনে মনে কামিনী করেন কত ক্ষেম ॥
ডমরু রবার বীণা মুরলীর তান।
দোঁহে আধবয়ানে দোঁহার গুণগান ॥'-(পৃ-১৫২-১৫৩)

আদব কায়দা ও কুশল বিনিময়

বাঙালি হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজেই কিছু আদব কায়দা ও কুশল বিনিময়ের প্রচলন ছিল। যেমন সাক্ষাতের প্রথমেই সালাম, আদাব ও নমস্কার দেয়া, করমর্দন ও কোলাকুলি করা, গুরুজনদের প্রণাম ও কদমবুছি করার বিধান ছিল। আবার বিদায়ের সময়ও কিছু দূর এগিয়ে গিয়ে অনুরূপভাবে ছালাম আদাব ও প্রণাম করা। এছাড়া গুরুজনের সামনে বসে না থেকে বরং উঠে দাঁড়ানো, উচ্চস্বরে হাসা বা কথা না বলা, সম্মুখ দিয়ে না চলা, ধূমপান না করা এবং একই বৈঠকে আগে খাবার গ্রহণ না করা বা আগেই উঠে না পরা — এসব তখনো বাঙালির প্রচলিত আদব কায়দার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব আদব কায়দা ও কুশল বিনিময়ের চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

ক. গুরুজনকে প্রণাম

'ব্রাহ্মণ নৃপতি নারী আরাধ্যা অপরে।
সবাকার চরণ বন্দিল কন্যাবরে ॥
হেমহীরা রত্নমালা কেহ দিল দান।
ব্রাহ্মণ আশিস্ দিল শিরে দূর্ব্বাধান ॥'-(পৃ-৪০২)

খ. নমস্কার ও বিনয়

'দম্পতি বন্দিল রাজা নারীর চরণে ॥
প্রণাম আশিসে আর নমস্কার বোলে।

কনক অঞ্চলি কত মরকত মণি।
মহারাজ কর্ণসেন করিল নিছনি ॥
পুত্রবধূ প্রণতি করিল পদতলে।
রাজা রাণী আশিস্ করিল কুতূহলে ॥
নমস্কারি নৌকতা যৌতুক যত ধন।
দাসীগণ রানীকে করিল সম্পূর্ণ ॥
ব্রাক্ষ্মণ আশিষ দিল শিরে দূর্ব্বা ধান।
দম্পতি সহিত সেন হলো নতমান ॥
শেষে আসি কর্পূর লোটায়ে পড়ে পায়।
উঠে আলিঙ্গন করে লাউসেন রায় ॥'-(পৃ-৪০৯)

গ. বিদায় বচন ও সম্ভাষণ

'অপরাধ ক্ষম রে কহেছি কুবচন।
ক্ষমা দিবে মহাশয় মোর নিবেদন ॥
এত শুনি কর্পূর বলেন জোড় হাতে ॥
জন্মভূমি জগতে দেবতা করে সাধ।
ক্ষমা দিবে আপনি অশেষ অপরাধ ॥
জন্ম হইল জগতে যাবৎ পরাধীন।
সুধিতে নারিনু কিছু মা বাপের ঋণ ॥'-(পৃ-৭১৪)

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

বাঙালি সমাজে আর্শীবাদ ও অভিশাপ প্রদানের বিশেষ ঐতিহ্য বিদ্যমান ছিল। সাধারণত নারীদের পুত্রবতী, পতির দীঘায়ু ও কল্যাণ কামনা করা হতো এবং সীতা-সাবিত্রী ও সতীর মতো পতিপ্রাণা হবার আশীর্বাদ করা হতো। অন্যদিকে পুরুষদের রাম ও যুধিষ্ঠিরের মতো আদর্শবান ও সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ এবং অর্জুনের মতো বীর, সাহসী ও লক্ষ্মণের মতো অনুগত হবার আশীর্বাদ করা হতো। আর শত্রু বা প্রতিপক্ষকে সাধারণত মৃত্যুর, সন্তান নাশ, সবংশে নিপাত ও দুরারোগ্য রোগ- বালাইয়ের অভিশাপ দেয়া হতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব আর্শীবাদ ও অভিশাপের চিত্র পরিলক্ষিত হয় —

ক. নবজাতকের দীর্ঘায়ু কামনা

'সখীগণে কন রাণী আনন্দে উথলি।
এতদিনে ঠাকুর চাহিল মুখ তুলি ॥
ভাগ্যবতী ভগ্নী মোর ভর দিয়া শালে।
কোলে পুত্র করিল স্বামীর বৃদ্ধকালে ॥
হকু বাছা বেঁচে থাকুক কোলজোড়া হয়ে।'-(পৃ-১২১)

খ. পুত্র ও পতি কল্যাণে আশীর্বাদ

'আশীর্বাদ করিল ঠাকুর মায়াধরী ॥
পুত্রবতী হও সতী সাবিত্রী সমান।
জন্ম যাক আয়তে স্বামীর বাড়ুক মান ॥'-(পৃ-৫০১)

গ. নির্বংশ হবার অভিশাপ

'পক্ষ পসারিতে পাথ   লহিশ্চন্দ্র করে তাক
বাঁটুলে বিদারে তার বুক ॥
বাঁটুল বাজিতে বুকে   আকুল হইয়া দুঃখে
পক্ষ ডাকে বিপরীত রা।
বলে পক্ষ খেয়্যা তালি   বিনা অপরাধে মলি
হরিশ্চন্দ্র নির্বংশ যা ॥'-(পৃ-৩১-৩২)

হাসি ঠাট্টা ও রসালাপ

বাঙালি সমাজে ঠাট্টার সম্পর্কিত আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে হাসি-তামাশা ও রঙ্গ-রসের প্রচলন ছিল। অনেক সময় ব্যঙ্গ- বিদ্রূপ করতেও হাসি ঠাট্টার আশ্রয় নেয়া হতো। দাদা-নাতি, নানা-নাতি, নানা-নাতিন, দাদী- নাতিন, বা দাদা-নাতিন, বেহাই-বেহান, বন্ধু-বান্ধব, সই-সখী, ভাবি-দেবর, স্বামী-স্ত্রী, দুলাভাইয়ের সঙ্গে শ্যালক-শ্যালিকাগণ এরূপ হাসি ঠাট্টা, রঙ্গ-রস করতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি জীবনে প্রচলিত এসব হাসি ঠাট্টা ও রসালাপের পরিচয় পাওয়া যায় —

ক. দম্পতির হাসি-ঠাট্টা

'রসকর ভোজনেতে সুখ অঙ্গমাঝ।
আজি রামা আমা লয়া তোমার সে কাজ ॥
সুধাসিক্ত হলে নাথ সব সুধাময়।
তোমা লয়ে রস নাথ কোন কালে নয় ॥
মকরন্দে পূর্ণ যদি অরবিন্দ ফুটে।
তায় অতি অকৃতী অলির মন ছুটে ॥
লুটিতে নিষেধ মধু যদি হয় যোগ।
তবু না নিষেধে পদ্ম ভ্রমরের ভোগ ॥'-(পৃ-১০৮-১০৯)

খ. নারীর সহজাত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

'শলে ভর দিয়া বর পেয়ে কোন কাজ।
ধিক্ রে দারুণ বিধি তোর মুণ্ডে বাজ ॥'-(পৃ-১১২)

গ. বেহাইদের মধ্যে ঠাট্টা-রসিকতা

'পরিহাসে ভাসে রাজা বৈবাহিক সনে।
যুবতী জায়ার প্রেম পড়ে গেল মনে ॥
ধলরাজ বলে তুমি বৃদ্ধ মহারাজ।
পরস্পর পরিহাসে সেন পেল লাজ ॥' (পৃ-৪০৫)

ঘ. বৃদ্ধদের রসিকতা

'শুন বলি বিশেষ বুঝাও গিয়া তায়।
বড় ভাগ্য হেন বর বিধাতা জোটায় ॥
বুড়া বলে বলে যে লোহার গণ্ডা কাট।
বাসরে বুঝিবে বুড়া বলে নহে খাট ॥' (পৃ-৪৩৬)

ঙ. ভগ্নীপতি পর্যায়ে রসিকতা

'সর্ব্বকালে শুক্ল ফুলে পূজেছ গোসাঁই।
তুমি কানড়া পতি ঠাকুর জামাই ॥
বড় সুখে সংসার করিবে সমাদরে।
সর্ব্বকালে দাসী আমি থাকিব বাসরে ॥-(পৃ-৪৪৪-৪৪৫)

চ. বয়স নির্ণয়ে রসিকতা

'বুড়া নয় খানিক বয়সে বটে বাড়া।
তবু অন্য যুবক সম্মুখে হয় খাড়া ॥
আমি যে এমন বুড়া ঘাটিয়াছি কি।
হাঁসি মুখে হেট হল বেনুরায়ের ঝি ॥'-(পৃ-৪৮)

বাক্ চাতুর্য ও বাহাস

বাঙালির সকল শ্রেণির নর-নারী তাদের প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথে বাক্ চাতুর্য ও বাহাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। জীবন অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান, আর্থ-সামাজিক-ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংস্পর্শে, নব-দম্পতি, দেবর-ভাবী, বেহাই-বেহান, রাখাল-চাকর, গুরু-শিষ্য ও ঠাট্টার সম্পর্কীয়দের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে বাক্ চাতুর্য ও বাহসের সূত্রপাত ঘটতে দেখা যায়।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতী-কর্ণসেন, লাউসেনের সঙ্গে দেবী দুর্গা, নয়ানী, কানড়া, কলিঙ্গা ও সুরিক্ষার মধ্যে এমন বাক্ চাতুর্য ও বাহাসের উল্লেখপাওয়া যায় —

যুদ্ধ ক্ষেত্রে শাকা ও চূড়ার বাহাস

শাকা– 'শাকা বলে সাজিলি বটে চূড়া।
মরিলে মরমে বড় শোক পাবে খুড়া ॥
পালারে পরাণ লয়ে ফেলায়ে হেতার।
হাটে হাটে গিয়ে বেচ পানের পসার ॥

চূড়া– চূড়া বলে বুড়ামি কথায় কিবা ফল।
আপনি পলারে যদি পরাণ বিকল ॥
বৃত্তি বটে পূর্ব্বাপর পানের ব্যাপার।
সিঁদ চুরি ডাকাতি করিতে কসর কার ॥
তুঁ রাঢ় চোয়ার তোকে সব কর্ম্ম খাটে।

শাকা– গ্রামের সম্বন্ধে তোরে ভাই বলে কই।
অতেব ওসব কথা এতক্ষণ সই ॥
জাতি রাঢ় আমি রে করম রাঢ় তুঁ।

চূড়া– চূড়া বলে চোরা বেটা চেপে কস মুঁ ॥
বচনে বচনে বড় বাধিল বিবাদ।
তঁ যদি তরাস মনে রণে ভঙ্গ দিস।
জায়া তোর জননী জননী নিজ নিস ॥

শাকা– শাকা বলে ঐ কিরা ফিরে তোরে লাগে।
শেল সংহারিলে যে সংগ্রাম হতে ভাগে ॥'-(পৃ-২৬৪-৬২৫)

ধাধা বা প্রহেলিকা

বাঙালি সমাজে বহুকাল যাবত ধাধা বা প্রহেলিকার প্রচলন ছিল। সাধারণত জ্ঞানের গভীরতা যাচাই, সমস্যার সমাধান, প্রতিজ্ঞার শর্ত হিসেবে এসব প্রহেলিকা ধরা হতো। ধর্ম-পুরাণ ও বাস্তব জীবন আশ্রিত বিষয়কে অবলম্বন করে এসব প্রহেলিকা বুনন করা হতো। এতে কৃতকার্য হলে যেমন রাজ্য, রাজকন্যা, ধন-সম্পদ, খ্যাতি লাভ হতো, তেমনি পরাজয়ে জীবনাবসান, লাঞ্ছনা ও দুভোর্গ জুটতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' লাউসেনকে গোলাহাটের বারাঙ্গনা সুরিক্ষা এরকম দুরূহ-দুর্ভেদ্য ও জটিল মোট আটটি প্রহেলিকা সমাধান করতে দেয়। লাউসেন তার উপস্থিত প্রজ্ঞা, দূরর্শিতা এবং আরাধ্য ধর্মঠাকুরের কৃপায় এসব প্রহেলিকার সদত্তর দিতে সক্ষম হয় —

১. প্রশ্ন —

'যার গর্ভে জন্ম লয় নাহি তারে মায়া।
জন্মিয়া ভক্ষণ করে জননীর কায়া ॥
বাসি না সম্বল করে রাখে দরিদ্র লক্ষণ
আশ্রয় জনার পীড়া করে অনুক্ষণ ॥'-(পৃ-৩০৪)

উত্তর : জ্বলন্ত আগুন।

২. প্রশ্ন —

'নাস্তি (নেই) মুখ মস্তকাদি নাস্তি (নেই) হস্ত পা।
নাস্তিতু আকার ভুমে নাস্তি বাপ মা ॥
নহে সে জীবজন্তু কিন্তু অতি শক্ত।
আবেশে আহার করে মানুষের রক্ত ॥'-(পৃ-৩০৫)

উত্তর : দুশ্চিন্তা বা চিন্তানল

ধর্ম-কর্ম

ধর্মই বাঙালি সমাজের প্রাণ। এ ধর্মকে আশ্রয় করেই বাঙালির সামগ্রিক জীবন প্রবাহ পরিচালিত হয়। বাঙালি হিন্দু সমাজে ধর্মকর্মের বিষয় হিসেবে পাঁচটি পর্বকে যথা- ক. মূতিপূজা ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি, খ. বেদ-পুরান ও স্মৃতিশাস্ত্রে আস্থা, গ. ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দিয়ে পূজার্চনা, ঘ. মৃত্যু পরবর্তী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া, ঙ. ঈশ্বর-পরকালে ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস প্রভৃতিকে আবশ্যিক বলে মানা হয়। আবার মুসলিম ধর্মেরও এরূপ পাঁচটি মূলপর্ব হিসেবে- ক. কালেমা বা আল্লাহ-নবী-রাসুলে বিশ্বাস, খ. নামাজ. গ. রোজা, ঘ. হজ্ব, ঙ. যাকাত প্রভৃতিকে মানা হয়। হিন্দুরা বাৎসরিক পূজা-ব্রত ছাড়াও প্রাত্যহিক গীতাপাঠ, সকাল-সন্ধ্যাকালীন উপাসনা ও তপ-জপ করে থাকে। আবার মুসলমানগণও বাৎসরিক ঈদ ও রোজা উদ্‌যাপন ছাড়াও প্রাত্যহিক নামাজ, কুরআনা পাঠ ও শ্রবণ এবং তজবি পাঠ করে থাকে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি হিন্দু সমাজের পূজা, ব্রত, যাগ-যজ্ঞ এবং সন্ন্যাসব্রত পালনের চিত্রসমূহ পরিলক্ষিত হয়–

রঞ্জাবতীর পুত্রেষ্টি যজ্ঞ

'কতেক কঠোর তপে যাগ যজ্ঞ পূজা জপে
গ্রহদিন গেল নিবড়িয়া।
স্নান পূজা বাদ্য নাটে দশমে গামার কাটে
নদীতটে জয় জয় দিয়া ॥
পণ্ডিত পদ্ধতি আছে জাগাল গামার গাছে
গণেশাদি পূজিয়া দেবতা।

বৃক্ষের বরণ করি সংঘাত সহিত ধরি
বান্ধিল সবার হাতে সুতা ॥
জয় জয় নিরঞ্জন ডাকে যত ভক্তগণ
মহোৎসবে গাজনে গোঁয়ায় ॥
অপর দাদুর ঘাটা পূজিয়া সন্ন্যাসী কটা
ঘটা করি চাঁপায়ের ঘাটে।
সাজায়ে কদলী মঞ্চে কাটারি পাতিয়ে মঞ্চে
ভর দিয়া এল ধর্ম্মবাটে ॥
সমাধিয়ে ধুনা সেবা ধ্যান করি ধর্ম্মদেবা
নবরত্ন জ্বালে তপস্বিনী।
পুত্র অভিলাষে রাণী জোড় করে পুট পাণি
অর্ঘ্য দিয়ে সূর্য্যকে ধেরান ॥
নিদয় না হবে কভু পতিতপাবন প্রভু
পাপিনী প্রণমে তব পায়।
কহিয়ে কোমর আঁটি মুদিয়ে নয়ন দুটি
ঝুপ করে ঝাঁপ দিল তায় ॥'-(পৃ-৯৫-৯৬)

বাণপ্রস্থ বৈরাগ্য বা সন্ন্যাসবরণ

বাঙালি হিন্দু সমাজে চতুরাশ্রম (ব্রক্ষচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) মানা হয়। কখনো অনেক বড় আঘাত থেকে, আবার কখনো দৈব বা মুনি ঋষির নির্দেশে সংসার-সন্তান-স্ত্রীর মায়া-মমতার জাল বিচ্ছিন্ন করে স্রষ্টা বা ভগবানের সান্নিধ্য পেতে বৈরাগ্যকে মুক্তির উপায় হিসেবে বেছে নেবার প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রাজা কর্ণসেন যুদ্ধে ছয়পুত্র, সহমরণে ছয় পুত্রবধূ এবং বিষপানে স্ত্রী মৃত্যুর আঘাত সহ্য করতে না পেরে রাজ সিংহাসন ত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেছিলেন —

'স্বামী মৈল সংগ্রামে সংসার ভাবি বৃথা।
চিতানলে ছয়বধূ হৈল অনুমৃতা ॥
পুত্রশোকে মৈল রাণী ভখিয়া গরল।
সর্ব্বশোকে কর্ণসেন হইল পাগল ॥
হাতী ঘোড়া ধন প্রাণ রাজছত্র দণ্ড।
কর্ম্মদোষে বিধাতা করিল লণ্ডভণ্ড ॥
পুত্রশোকে জরজর হইল তার তনু।
পুত্র বিনা সকল সংসার দেখে শূন্য ॥
অন্ত্যকালে ঘটে আসি অশেষ অভাগ্য।
সংসার বাসনা ছাড়ি বাড়িল বৈরাগ্য।
দশাদোষে হল সে দারুণ দুঃখভোগী ॥
মুখে ভস্ম মাখে রাজা হল যেন যোগী।
পটাম্বর ত্যজি রাজা পরিল কৌপীন।'-(পৃ-৪৪-৪৫)

ধর্ম ও শাস্ত্র গ্রন্থ

বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানগণ তাদের সমগ্র জীবন পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে নিজ নিজ ধর্ম গ্রন্থ ও শাস্ত্র দ্ধারা। হিন্দুরা যেমন– রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, উপনিষদ, পুরাণ, সংহিতা ও স্মৃতি শাস্ত্র দ্ধারা, তেমনি মুসলমানগণও কুরআন ও হাদিস দ্ধারা নিজেদের পরিচালনা করে থাকে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' হিন্দু ধর্মের বেদ (ঋক, সাম, যজু, অথর্ব), গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, উপনিষদ, ভাগবত, স্মৃতি শাস্ত্র, সংহিতা, আগম, নিগম ও পুরাণসমূহের উল্লেখপাওয়া যায় —

ক. বেদ

'জায়া পরশনে যদি যাত্রা হয় ভঙ্গ।
বেদ বলে বিশেষ বণিতা অৰ্দ্ধ অঙ্গ ॥'-(পৃ-৪৮৩)

খ. স্মৃতি শাস্ত্র

'অধিবাস করিলে অৰ্দ্ধেক বিভা হয়।
স্মৃতি বেদ বিদিত বিদ্ধান সব কয় ॥'-(পৃ-৪৬৭)

গ. রামায়ণ

'পাত্রমিত্র সগোত্র সহিত সত্ত্বগুণে।
বাল্মীকি গোসাঁই গ্রন্থে রামায়ণ শুনে ॥'-(পৃ-১২০)

ঘ. আগম-পুরাণ

বিশেষ না পেলে ভেদ আগাম পুরাণ বেদ
তপে জপে যোগে যোগীগণ।'- (পৃ-২১১)

সম্ভোগ বা রতিলীলা

বাঙালি হিন্দু মুসলিম নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের সম্ভোগ প্রক্রিয়াটিও শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র-লগ্ন, ঋতুবতী অবস্থা, শারীরিক সংকট ও সুস্থতা মেনেই দম্পতিগণ রতিলীলা সম্পন্ন করতো। রতিলীলার ক্ষেত্রে রুচিবান ও সংস্কৃতমনা নর-নারীগণ পরিবেশ ও প্রস্তুতির ওপর বিশেষ জোর দিতো। উত্তম খাবার, উপযোগী পোশাক, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার ও মুখশুদ্ধির বিষয়গুলো গুরুত্ব পেতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' রঞ্জাবতী কর্ণসেন এবং কলিঙ্গা-লাউসেনের সম্ভোগ ও রতিলীলার চিত্র পাওয়া যায়। সামন্ত রাজা-রানীর এ রতিলীলায় পরিবেশ ও প্রস্তুতি পর্ব মেনে, সুরুচি ও সম্মানজনকভাবে নব দম্পতিদের মধ্যে সম্ভোগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে দেখা যায় —

ক. কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর রতিলীলা

'রাণী রঞ্জাবতী হেথা করিয়া রন্ধন।
স্বামীকে দিলেন অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন ॥
পরিপাটী ভোজন করে পাঁচ রস।
রাণী পানে চেয়ে কিছু কহেন সরস ॥
দাসী পানে তখন সঙ্কেতে রাণী চায়।
বাসর বঞ্চিব ঝাট নিদ্রাতুর রায় ॥

,,,
মাঝে যার কাঞ্চন বরণ কাঁচ ঢালা ॥

মেঝে জুড়ে ফেলে সপ দিয়া ফুলঝাঁটি।
ফেলিল পালঙ্ক তায় পাতাইল পাটি ॥
গুজরাটী ছিট ভোট যোট তার খাসা।
দুদিকে বালিশ রাখে আলিস বিনাশা ॥

,,,

মালিকা কল্যাণী হেথা অশেষ বিশেষ।
শশীমুখী রাণীর রচিল লাস বেশ ॥
আচাড়িয়া চাঁচর চিকুরে চিত্র বেণী।
বান্ধিল বিনোদ খোঁপা বাঁ দিকে টালনি ॥
নানা পরিবন্দ করি বেন্ধেছে কবরী।
নিরখিতে বদন মদন মন চুরি ॥
বুকে বান্ধা কাঁচলি সঙ্কেত অভিলাষে।
পরশে রাজার হস্ত খসে অনায়সে ॥
সুবেশে শয়নশালা প্রবেশে রূপসী।
মোহিত হইল রাজা হেরি মুখশশী ॥

,,,

আদরে বসায় উরে উতারে কাঁচলি।
পীন পয়োধর মুখে পিয়ে মহাবলী ॥
ভুলিল পুরুষ যদি যৌবনের হাটে।
কতখান নাপান করিতে তায় খাটে ॥
মদনে মাতিয়া রাজা পসারিল পানি।
নানা কার করিয়া পালান পাটরাণী ॥
অমনি আবেশে রায় বান্ধে ভুজ পাশে।
ঢল ঢল রসের সাগরে দোঁহে ভাসে ॥
প্রকাশে বদনবিধু ঘুচায়ে বসন।
পুন পুন পিয়ে মধু মাতিলা মদন ॥
কাজে কাজে ঘাটি নাই লাজে বলে না না।
কে বুঝে রসিক বিনা রসিকার তানা ॥
কটিবাস খুলিতে রক্তিম দিঠে চায়।
লাজে লাজ পলাইল কাজে মজে রায় ॥
নূপুর নিনাটে ঘন শ্রবণ নিকটে।
রতিসুখ শায়বে লহরী কত উঠে ॥
পুলকাঙ্গ চাপেতে চঞ্চল চাঁদমুখী।
সুরতি সংগ্রামে জুড়ে মদন ধানকী ॥
কটিতে কিঙ্কিনী বাজে রতি জয়নাদ।
ঘুচিল মদন বাণ টুটিল উন্মাদ ॥
উঠে বসে রঞ্জাবতী মুখে ক্ষীণ রা।
রতি শ্রমে অলসে এলায়ে পড়ে গা ॥
ভেসেছে অপাঙ্গকোলে ভালের ভূষণ।
নাসাকোণে গালে গলে চক্ষুর অঞ্জন ॥
কেশ বেশ বিশেষ কাঁচলি গেছে খসি।
দাসী আসি হাসিয়া মুছাল মুখশশী ॥

বদন শোধন করে সুগন্ধি জীবনে।
দূরে গেল সন্তাপ সন্তোষ হইল মনে ॥
প্রকাশ হইল রবি বেলা দণ্ড ছয়।
স্নান পূজা করে দোঁহে আনন্দ হৃদয় ॥'-(পৃ-১০৮-১১৩)

দেশি শব্দ ও ভাষাবুলি

একসময় বাঙালির ছিল গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, আথাল ভরা গরু আর বুক ভরা গান। এ ভাবপ্রবণ বাঙালির ভাষা-বুলির মাধ্যমে প্রকাশ পেতো তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা-আকুতি ও স্বপ্ন বিলাস। প্রাত্যহিক জীবনে উচ্চারিত এ দেশি শব্দ ও ভাষাবুলিই ছিল বাঙালির চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান ধারণার পরিচায়ক। দেশি শব্দ ও ভাষাবুলির মাধ্যমেই মূলত বাঙালি জাতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মন-মেজাজ ও মানসিকতার বহিঃ প্রকাশ ঘটতো।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনের ভাব বিনিময়ে এসব শব্দ ও ভাষাবুলি ব্যবহার করতে দেখা যায় — ঝি, খোঁটা, স্বতন্তরা (মুক্ত বা স্বাধীন), বিটলে বা বিটল, আলা (আলো), ঝাঁটা, বহুড়ী (বউ), নাবড়, ছেবড়, ঠেটি (ঢাটি), বেটি, পাজী, পাখাল (ধৌত করা), ঠাট (উদ্ধত), রা (শব্দ), সমাচার, খেদায়, বাড়া, জঞ্জাল, কিরা (প্রতিজ্ঞা), ঝোড় (জঙ্গল), বাছা, নাপান (কৌশল বা ছলনা), কুটুম্ব, মলে (মৃত্যু), ছাওয়াল, চেছাঁ বা চাঁছা, ধান্ধা, জাঠা (ঝাঁটা), বালাই, ক্ষার, ঠক, আছাড়, পাছড়া-পাছড়ি, বাও (বাতাস) মেয়্যা, রোজ করা (নিয়মিত বন্দোবস্ত), ফাঁফর, ঢেমনা ও জিউ (জীবন), ঢেমনী, হেদে রে (তবে রে), সামাল (সাবধান), মিনসে (স্বামী), নিদান (বিপদ), কাঁচুলী, ভাতার, পো (পুত্র), পুত (পুত্র), বাছা, আই আই, নিছনি, আল্যাঙ (আসলেন), পসরা, গোটা (সমগ্র), ঢল ঢল ও জরজর (আধিক্য), সোদর (ভাই), সাজাল, মুত (প্রস্রাব), তরাস (ভয়), বুন (বোন), বেবাক (সব), ব্যাপার (ব্যবসা), রাঁড় (বিধবা), গোঁয়ার (দুরন্ত), আড়ি (নাছোড়বান্দ), বড়াই (গর্ব), দাবড়ি, লেঠা, বেহান (সকাল), নাগর, ফান্দনি, দাদাল, অরাতি, দোঁহে (দুইজনে), সিথান (মাথা রাখার স্থান), ঠেঁটা (বাচাল), লক্‌পক্ (অস্থিরতা), ল্যাঙ্গটা (উলঙ্গ) প্রভৃতি।

ক. 'গায়ে দিলা চন্দনাদি বাও (বাতাস) করে দাসী ॥
জিউ (জীবন) যায় দিদি গো আর নাহি জীব ॥
বেগ দিয়া বুন (বোন) গো বিধাতার ছার মুখ।'-(পৃ-১১৭)

খ. 'এত ভাবি দূর করে ঔষধের ডালা।
খেদায় অসতী নারী ছাউনীর বেলা ॥
কান্দিয়া কহেন আমি কোথা যাই মা।
মায়ায় মোহিত রানী মুখে নাই রা ॥'-(পৃ-৪০১-৪০৩)

বিদেশি শব্দ

সমকালীন রাজনীতি ও ধর্মীয় প্রভাবে বাঙালি সমাজে দেশি শব্দের সঙ্গে বহু বিদেশি (আরবি, ফারসি ও তুর্কি) শব্দের মিশ্রণ ঘটে যায় অনিবার্যভাবে। কারণ রাজ ক্ষমতায় মুসলমানগণ থাকায় এদেশের প্রশাসন, রাজস্ব, সৈন্যবাহিনী, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আরবি, ফারসি ও তুর্কি শব্দের প্রবেশ ঘটে অপ্রতিরোধ্য গতিতে। তাই আজ এসব বিদেশি শব্দ গুলো বাংলা ও বাঙালির নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়ে পড়েছে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে সমকালীন প্রভাব অনুযায়ী এসব বিদেশি শব্দের আগমন, প্রচার ও প্রসার অনিবার্য ভাবে দেখ যায় —

চসমখোর, চোক্‌লখোর (চোগল খোর), পরোয়ানা, নফর, তালাক, তওবা, জাহির (ঘোষণা), দরবার, দাখিল থানা, খালাস (মুক্ত), দোস্ত (বন্ধু), বাদী, খোদা, কদম, হারামজাদী, ইজাফা (মাফ), জোহার (অনুযোগ/হাতজোড়), মোকাম, নকীব, খানসামা, বক্‌শিশ, শরবন্দ, বেগারী, কামিলা, শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান, মিঞা, মীর, সরাইখানা, দলিজখানা, বিবি, বকেয়া, আসান, পীর, খাতির, ফকির, খিলকা, ইনাম, মাহিনা, বেজার, বিজ্ঞাপন, গুণাগার প্রভৃতি।

ক. 'সব দোস্ত (বন্ধু) আইস পোস্ত সুরা সিদ্ধি খাই।
কালচিতা বলে মিতা এই বটে ভাই ॥'-(পৃ-১২৯)

খ. 'পেটের বেটা ছোঁড়া সভায় হলো বাদী।
গদাধর বলে ভাল থাক লো হারামজাদী ॥'-(পৃ১২৭৪)

তত্ত্ব-দর্শন ও প্রবাদ-প্রবচন

প্রবাদ-প্রবচন বাঙালি নর-নারীর কথা বলার ভূষণ। জীবনের নানা অভিজ্ঞতাজাত এসব প্রবাদ-প্রবচনগুলো হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, আবহাওয়া, জলবায়ু, কৃষি ও লোকাচারসমূহ। বাঙালি নর-নারী তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে, ভাব-ভঙ্গিতে, চেতনে-অবচেতনে, হাঁসি কান্না ও আনন্দ বেদনায় এসব প্রবাদ-প্রবচন ও তত্ত্ব-দর্শন ব্যবহার করে থাকে।

'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' বাঙালি জীবনে ব্যবহৃত এসব তত্ত্ব দর্শন ও প্রবাদ প্রবচনের উল্লেখপাওয়া যায় বহুল পরিমাণে–

১. মৃতদেহ দাহ করে চিতার অনলে।
সজীব শরীর সদা দহে চিন্তানলে ॥'-(পৃ-৮)

২. কিবা অভিশাপ তার কেবা সেই বুড়ী।
বয়সের দোষ হয় বচনের দেড়ী ॥'-(পৃ-২২)

৩. দুখ সুখ সংসারে সমান দশা দুটা।
পক্ষভেদে চন্দ্রমা যেমন বাড়া টুটা ॥
কর্ম্মফলে কপালে কেবল দুখ সুখ।
কেহ লক্ষপতি কেহ নাছের ভিক্ষুক ॥-(পৃ-৪৫)

৪. নারীহীন পুরুষে পেয়েছে বড় দাগা।
সহজে হইবে বলি সোনায় সোহাগা ॥-(পৃ-৫২)

৫. রাজা বলে দূর নহে যেবা যার বন্ধু।
দুই লক্ষ যোজন অন্তর দেখ ইন্দু ॥-(পৃ-৫৪)

৬. সুব্যঞ্জন ঝোল ঝালে কুটুম্বিতা হালা হলে
পরকালে কেহ কার নয় ॥-(পৃ-৫৮)

৭. সহজে অবলা জাতি তায় তুমি চেট্যা।
অরি হয় নারীর পথের কাঁটাকুট্যা ॥'-(পৃ-৬৭)

৮. পুত্র বিনা গৃহ যেন পদ্মপত্রে জল।
জলবিম্ব যেন নাথ জীবন চঞ্চল ॥-(পৃ-৬৭)

৯. তুমি যারে কৃপা কর তার নাহি দুখ।
সুমেরু ঠেলিতে পারে হেলাইয়া বুক ॥-(পৃ-১১৫)

১০. পাপ প্রকাশিয়া যবে পীড়িবে শমন।
কোথা রবে জায়া পুত্র পরিবার ধন ॥-(পৃ-১১৫)

১১. কি ধন পাঠান পাত্র তাই পানে চিত।
সহজে সে লুব্ধ জাতি রজক নাপিত ॥-(পৃ-১২২)

১২. হেঁট মাথা হয়ে এত ভাবিতে ভাবিতে।
অসতে অসৎ যুক্তি আসে আচম্বিতে ॥-(পৃ-১২২)

১৩. রোগ ঋণ রিপু না রাখিব অবশেষে।
দিবসে দিবসে বেড়ে পীড়া দেয় শেষে ॥'-(পৃ-১২৩)

১৪. আন্ধারমাণিক বাছা অন্ধনীর নড়ি।
লোচনের তারা বাছা কৃপণের কড়ি ॥-(পৃ-১৩৪)

১৫. ধন যে হারালে পায় মলে পায় প্রাণ।
তার সম সংসারে কে আছে ভাগ্যবান ॥-(পৃ-১৩৮)

১৬. সেই ধর্ম্ম ভাব যে ফলার পাবে গাছ।
শুন্যা মনে ভাবনা বাড়িল্য সাত পাঁচ ॥-(পৃ-১৬৯)

১৭. খাওয়ালে মাখাল্যে কালে পড়াল্যে শুনাল্যে।
ভাল মন্দ জানা যায় সভা এলে গেল্যে ॥-(পৃ-১৮০)

১৮. অভাগীর ভাড়া ঐ কৃপণের কড়ি।
আন্ধারমাণিক মোর অন্ধকের নড়ি ॥-(পৃ-১৮৪)

১৯. কুপুত্র হইলে কুলে কুলাঙ্গার কহে।
কুবৃক্ষ কোটরে অগ্নি উঠে বন দহে ॥-(পৃ-১৯৬)

২০. হরিস্ক্রার মথুরা গোকুল বৃন্দাবন।
কোন তীর্থ নহে দূর দাঁড়াইলে মন ॥-(পৃ-২০৮)

২১. অবিশ্বাসে বিশ্বাস অবশ্য মন্দ বলে।
মরিবার ওষুধ ভূপতি বান্ধে গলে ॥-(পৃ-২১৫)

২২. বিশেষতঃ না বুঝিলে বিপরীত ফল।
বনজন্তু বিশেষ বিষম ব্যাঘ্র খল ॥-(পৃ-২১৫)

২৩. অহঙ্কার অধিকে অধিক অধোগতি।
যেই দোষে দুঃখ পেল্যা অর্জুনের নাতি ॥-(পৃ-২১৮)

২৪. সাধুসঙ্গ সাক্ষাতে সকল সিদ্ধি লাভ।
ভাবিতে ভাবিতে ভুলে জাতির স্বভাব ॥'-(পৃ-২৩৬)

২৫. অন্ধের নয়ন তুমি দারিদ্রের হীরা।
ধর্ম্মপথে ছেড়ে দিনু ঘর যাবে ফিরা ॥-(পৃ-২৩৭)

২৬. অহঙ্কারে কে কোথা বেড়েছে সর্ব্বকাল।
কোথা গেল হিরণ্যকশিপু শিশুপাল ॥-(পৃ-২৩৭)

২৭. আপনি হইলে সৎ অসতে কি করে।
ভয় নাই ভায়া চল ভাবি মায়াধরে ॥-(পৃ-২৫৫)

২৮. ঘৃতের কলস নারী পুরুষ অনল।
একযোগে থাকিলে অবশ্য করে বল ॥ (পৃ-২৫৬)

২৯. আজ্ঞা কর এখনি তোমার সঙ্গে যাই।
ঘর স্ক্রার ভাতার পুত্রের মুখে ছাই ॥-(পৃ-২৬৩)

৩০. বামন হইয়া হাত বাড়াইলে চাঁদে।
ভক্তে বান্ধ ভ্রষ্টা নারী বচনের ফাঁদে ॥-(পৃ-২৬৯)

পূর্ববর্তী ‘মনসাঙ্গল’ ও ‘চণ্ডীমঙ্গল’ কাব্যধারায় অবনমিত শ্রেণির জীবন দর্শন তথা মতাদর্শ যেভাবে সমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছিল, ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ কবিদের ধর্ম ঠাকুরের বিজয় গাথা ও ‘ধর্মমঙ্গল’ রচনার মধ্য দিয়ে তারই ঐতিহ্য ধারাবাহিকভাবে রূপায়িত হয়েছে। পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্যসমূহে দেখা গেছে, ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক অনার্য নিম্নশ্রেণির শক্তিকে ব্রাহ্মণ্য সমাজকে একরকম স্বীকার করে নিতেই হয়েছিল। ‘ধর্মমঙ্গল কাব্য’ ইতিহাসের সেই পরিণতির সযত্ন প্রয়াস। এ ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যের মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য মূলত লাউসেন চরিত্রকে কেন্দ্র করেই প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গবেষক মোহাম্মদ হাননানের উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য–

‘ধর্মমঙ্গলে লাউসেন লৌকিক জীবনাদর্শের রূপক। তাকে আশ্রয় করেই নিম্নশ্রেণির (অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য সম্প্রদায়) মানুষ সকল প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। হরিহর বাইতি, কালুডোম ও লখাই প্রমুখ চরিত্রের সীমাহীন দৃঢ়তা ও আদর্শবাদিতার চিত্রায়ণে ব্রাহ্মণ্যতের অন্ত্যজ মানুষকেই আদর্শ পুরুষকার চরিত্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে তা শুধু বিস্ময়করই নয়, বরং তুলোনারহিতও।’[৩২]

তবে ধর্মমঙ্গল কাব্যের যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি তাৎপর্যময় হয়ে ওঠেছে, তা হলো সমকালীন বাঙালি সমাজে বিদ্যমান বর্ণবাদকে অস্বীকার করা। পুরোহিততন্ত্রে ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া অধিকার শুধু সামাজিক ভাবেই স্বীকৃত ছিল না, বরং শাস্ত্রীয় ভাবেও ছিল তা স্বতঃসিদ্ধ। এরূপ সামাজিক পটভূমিতে অন্য তিন বর্ণের (ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) নয়, বরং একেবারে অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য ব্রাত্য ডোম সম্প্রদায়ের (যাদের কোন বর্ণেই ঠাঁই ছিল না) পুরোহিত তন্ত্রে অনুপ্রবেশ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি আদায়ের বিষয়টি নূতন শক্তির শুভ উদ্বোধনকে ঘোষণা করেছে।

তাই ধর্ম ঠাকুরের পূজায় অন্ত্যজ ডোম শ্রেণির পুরোহিতগিরি বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিহাসে একটি তাৎপর্যময় ঘটনা এবং নিষ্পেষিত সম্প্রদায়ের প্রতিবাদের নূতন কোরাস। আর এমন ঘটনা শুধু বঙ্গদেশের মতো দেশেই সম্ভব হয়েছে। কারণ ইতিহাসবিদদের মতে, এ বঙ্গদেশই ছিল প্রতিরোধকারী ও পরাজিত অনার্য সম্প্রদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীদের সহজাত শৌর্য-বীর্য ও বীরত্বের ইতিহাস এ বিষয়টিকে আরো সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত করেছে। এ ধরনের অনমনীয় মনোভাবের কারণেই মূলত ধর্মমঙ্গল কাব্য এত বেশি প্রাণের স্ফূর্তি পেয়েছে। সাহিত্য সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দারের মতে-এ প্রাণের স্ফূর্তি সম্ভব হয়েছিল ধর্ম ঠাকুরের সর্বপ্রেম ও মানবতাবাদী সত্তার কারণে। কারণ সমকালীন সাংস্কৃতিক যোগ-বিয়োগের ফলে অনার্য চিন্তা-মনন ও অভ্যাসের সঙ্গে যখন ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও জৈন চিন্তাধারা ও আদর্শ মিলিত হয়েছিল, তখন থেকেই সমস্ত ধর্মমতের সার সঙ্কলনে অথবা সংমিশ্রণেই ধর্মঠাকর পরিকল্পিত হয়েছেন। সেকালের মানুষ এমনি ভাবে সমস্ত দেবতার মধ্যে, সমস্ত শক্তির মধ্যে, সমস্ত মানুষের মধ্যে, সমস্ত সম্প্রদায় ও বর্ণের মধ্যে ঐক্যসূত্র বন্ধন করে নিজেদের ভাব মূর্তি অর্জন করেছে। কারণ সকলকে স্বীকার করে নিয়ে যে ঐক্যভাব দেখা দেয়, সেই ভাব ও ভাবসঞ্জাত প্রীতিই ছিল সেকালের সামাজিক আচরণের মূল প্রেরণা। সমস্ত ভেদ বিচারের বিরুদ্ধে লোক মানসের এই প্রীতিই ছিল একমাত্র প্রতীকী প্রতিবাদ।[৩৩]

তথ্য-নির্দেশ

১.	আহমদ শরীফ	: বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড); নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ-৩২৮
২.	সুকুমার সেন	: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড); অপরার্ধ, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১৯৭৫, পৃ-১৫৪
৩.	সুকুমার সেন	: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড); আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি. ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪১০, পৃ-১২৪
৪.	মোহাম্মদ হাননান	: বাংলা সাহিত্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব; বিশ্বসাহিত্য ভবন, ঢাকা, ২০০১, পৃ-৬৭
৫.	হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	: Discovery of Living Buddhism in Bengal; Calcutta, 1897, আশুতোষ ভট্টাচার্যের ‘বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস’ গ্রন্থে উদ্ধৃত
৬.	অতুল সুর	: বাঙলার সামাজিক ইতিহাস; জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃ-৩২
৭.	সুকুমার সেন	: পূর্বোক্ত, পৃ-১১১
৮.	দীনেশচন্দ্র সেন	: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় খণ্ড); পশ্চিমবঙ্গ, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ২০০২, পৃ-৪৬৯
৯.	অরবিন্দ পোদ্দার	: মানবধর্ম ও বাংলা কাব্যে মধ্যযুগ; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ-৯১-৯২
১০.	বাসুদেব রায়	: চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ; উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ-৪৬৯
১১.	শিব দত্ত সম্পাদিত	: অমর কোষ; বোম্বাই, ১৯৪৪, পৃ-৭,২০,৪০২
১২.	R.C Roy	: The Kharias; Ranchi, 1937, p-321
১৩.	B.C Law Volume	: I, Calcultta, 1945, p-79-80
১৪.	JRASB	: VIII, 1942, p-132-133
১৫.	W.Schmidt	: The origin and Growth of Religion; London; 1935, p-49.
১৬.	আহমদ শরীফ	: পূর্বোক্ত; পৃ-৩৩০
১৭.	অরবিন্দ পোদ্দার	: পূর্বোক্ত; পৃ-৯২
১৮.	পীযূষ কান্তি মহাপাত্র	: ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্যের ভূমিকা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬২.
১৯.	Jadunath Sarkar	: History of Bengal; vol-2, p-397
২০.	দীনেশচন্দ্র সেন	: বৃহৎ বঙ্গ (২য় খন্ড); দে’জ পাবলিশিং, (তৃতীয় মুদ্রণ), কলকাতা,২০০৬,পৃ-৮৪১
২১.	Jadunath Sarkar	: Ibid; p-413
২২.	সুকুমার সেন	: পূর্বোক্ত; পৃ-১১৫
২৩.	পূর্বোক্ত	: পৃ-১৫১
২৪.	দীনেশচন্দ্র সেন	: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় খণ্ড); পূর্বোক্ত; পৃ-৪৭৩
২৫.	পূর্বোক্ত	: পৃ-৭৪৩
২৬.	W.W. Hunter	: A statistical Account of Bengal; Vol-IV, London, 1876, p-140.
২৭.	পীযূষ কান্তি মহাপাত্র	: পূর্বোক্ত; ভূমিকা অংশ
২৮.	আশুতোষ ভট্টাচার্য	: পূর্বোক্ত; পৃ-৬০৭
২৯.	অরবিন্দ পোদ্দার	: পূর্বোক্ত; পৃ-৯৫
৩০.	অতুল সুর	: বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন; সাহিত্যে লোক, কলকাতা, ২০০১, পৃ-২৭৭
৩১.	আব্দুল হাই শিকদার	: সিরাজদৌলা মুর্শিদাবাদ; জ্ঞান বিতরণী, ঢাকা, ২০০১, পৃ-১৫৯
৩২.	মোহাম্মদ হাননান	: পূর্বোক্ত; পৃ-৭০
৩৩.	অরবিন্দ পোদ্দার	: পূর্বোক্ত; পৃ-৯৬-৯৭

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য ও সমকালীন প্রেক্ষাপট

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই বাংলার রাজনৈতিক আকাশ নানা বিপর্যয়ের ঘনঘটায় তমাসাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। অর্থাৎ বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহাসংকট ঘনীভূত হতে শুরু করে। মুঘল রাজবংশের শেষ গৌরব রবি সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলেই (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) ভারতবর্ষ তথা বাংলার আসন্ন পতন অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ আরওঙ্গজেবের শাসনামলের (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.) প্রায় অধিকাংশ সময়ই ব্যয় হয় বিভিন্ন যুদ্ধ বিগ্রহ ও বিদ্রোহ-বিক্ষোভ দমনের কাজে। এ জন্য আওরঙ্গজেবকে উত্তর ভারতে (১৬৫৮-১৬৮১ খ্রি.) ও দাক্ষিণাত্যে (১৬৮২-১৭০৭) খ্রি.) সর্বদাই ব্যতি-ব্যস্ত থাকতে হয়েছে এসব দাঙ্গা-হাঙ্গামা মোকাবেলা করতে। এর ফলে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্যে যুদ্ধ ও সামরিক বাহিনীর খরচ বৃদ্ধি পাওয়াতে কার্যত শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে এবং কৃষি-শিল্প-অর্থ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিপর্যয় দেখা দেয়।

এতে করে গোটা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং রাজকোষাগার যায় প্রায় শূন্য হয়ে। দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধ ব্যয় মেটাতেই দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান ও তাঁর পূর্ববর্তী সুবাদারগণকে বাংলা থেকে মোটা অংকের টাকা (বার্ষিক রাজস্ব ছাড়া অতিরিক্ত কর হিসেবে) দিল্লীতে পাঠাতে হতো। এমন পরিস্থিতিতে বৃদ্ধ সম্রাট আওরঙ্গজেবের ১৭০৭ খ্রি. মৃত্যু ঘটলে সিংহাসন দখলকে কেন্দ্র করে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ, প্রভাবশালীদের চক্রান্তে সিংহাসনচ্যুতি, নাদির শাহের ভারত আক্রমণ, হত্যাযজ্ঞ ও সম্পদ লুণ্ঠন, আহমদ শাহ আবদালীর ৫ বার ভারত আক্রমণে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়। দিল্লীর চারপাশের ভূখণ্ডে মুঘল সাম্রাজ্য শুধু প্রতীকী রূপে টিকে থাকে মাত্র। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলা প্রদেশেরও স্থিতি-শক্তি, সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার ব্যাপক অভাব ও অবনতি ঘটে।

সম্রাট আরওঙ্গজেবের মৃত্যুজনিত বিপর্যয়ের ঢেউ অনিবার্যভাবে এসে লাগে সুবা বাংলার ভাগ্যাকাশে। দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তির উত্থান-পতনে বাংলার শাসন ব্যবস্থা হয়ে পড়ে নড়বড়ে। মহাজনী বণিক শ্রেণির উত্থান এবং বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর অভ্যুদয়ের কারণে সুবা বাংলা হয়ে পড়ে অরক্ষিত, অরাজক ও অস্থিশীল। আর এ কারণেই মাত্র ৪০ বছরের নবাবী শাসনামলে (১৭১৭-১৭৫৭ খ্রি.) পর পর ৫ জন নবাব সিংহাসনে বসেছিলেন বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য। এঁরা হলেন মুর্শিদকুলী খান (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি.), সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯ খ্রি.) সরফরাজ খান (১৭৩৯-১৭৪০ খ্রি.), আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) ও সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.) প্রমুখ। এঁদের মধ্যে মাত্র মুর্শিদকুলী খান ও আলীবর্দী খানই ছিলেন সুযোগ্য শাসক, আর সকলেই ছিলেন অযোগ্য, বিলাসী ও ইন্দ্রিয়কাতর।

নবাব মুর্শিদকুলী খান তাঁর ১০ বছরের শাসনামলে (১৭১৭-১৭২৭ খ্রি.) রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার সাধন, সৈন্যবাহিনী সংকোচিতকরণ ও প্রশাসনিক ব্যয় কমিয়ে এনে অর্থনীতিকে কিছুটা চাঙা করেছিলেন। এ সময় সুবা বাংলা ছিল ৩৪টি সরকার ও ১৩৫০ টি মহাল বা পরগনায় বিভক্ত। আর বাংলার বার্ষিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১,৩১,১৫,৯০৭ টাকা। মুর্শিদকুলী খানের সুযোগ্য নেতৃত্বেই বাংলার আর্থ-সামাজিক ও শাসন ব্যবস্থা কিছুটা স্থিতিশীল পর্যায়ে উন্নীত হয়। তাঁর শাসনামলে রাজধানী মুর্শিদাবাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের তালিকা ছিল নিম্নরূপ :

পণ্য দ্রব্য	পরিমাণ	দাম
চাল (১ম শ্রেণির)	১ মণ ১০ সের	১ টাকা
চাল (২য় শ্রেণির)	১ মণ ২৩ সের	১ টাকা
চাল (৩য় শ্রেণির)	১ মণ ৩৫ সের	১ টাকা
গম (১ম শ্রেণির)	৩ মণ	১ টাকা
গম (২য় শ্রেণির)	৩ মণ ৩০ সের	১ টাকা
তেল (১ম শ্রেণির)	২১ সের	১ টাকা
তেল (২য় শ্রেণির)	২৪ সের	১ টাকা
ঘি (১ম শ্রেণির)	১০ $\frac{১}{২}$ সের	১ টাকা
ঘি (২য় শ্রেণির)	১১ $\frac{১}{৪}$ সের	১ টাকা

কার্পাস তুলা প্রতিমণ ২ থেকে ২$\frac{১}{২}$ টাকায় বিক্রি হতো।[১]

মুর্শিদকুলী খান দেশে আর্থিক ঋদ্ধি বা সচ্ছলতা আনয়ন করতে সক্ষম হলেও সুদক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো ও দীর্ঘস্থায়ী শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করার মতো দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল না অথবা সমকালীন পরিবেশ-পরিস্থিতি হয়তো এর অনুকূলে ছিল না। কারণ- 'He did nothing to give permanence to his system, he created no efficient civil service, no council of notables to serve as a check on the caprice of tyrants and preserve the balance of the state in evil days to come.”[২]

মুর্শিদকুলী খানের দৃষ্টি শুধু রাজকোষাগার পূর্ণ করে তোলার দিকেই সর্বাত্মকভাবে নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ও সামরিক শক্তি বৃদ্ধি না করে বরং হ্রাস করার কারণে বাংলা বিদেশি বণিক ও বহিঃ শক্তি তথা শত্রুদের দ্বারা বার বার আক্রান্ত হতে থাকে। নবাব আলীবর্দী খান ও সিরাজউদ্দৌলাকে এর জন্য চড়া মাশুল দিতে হয় এবং সুবা বাংলা ও তার জনগণকে এর বেদনাদায়ক ফল ভোগ করতে হয়।

কারণ আলীবর্দী খানের শাসনামলে (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) শুধু বর্গী দস্যুরাই বিপজ্জনক হয়ে ওঠেনি, বরং বিদেশি বণিকদের মধ্যে ইংরেজ কোম্পানি ফরাসিদের রাজনৈতিক কুটকৌশলে পরাজিত করে অপ্রতিরোধ্য হয়ে ওঠতে থাকে। যা সুবা বাংলার জন্য ছিল আগাম অশনিসংকেত। এছাড়া পূর্ববর্তী পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি (Frank) বা হার্মাদ (Armada) ও আরাকানী মগ দুস্যুরাও বাংলা সুখ-শান্তি কেড়ে নেয়।

পর্তুগিজ ফিরিঙ্গিরা প্রথমে সপ্তগ্রাম (সাতটি গ্রামের সমন্বয়-বংশবাটি, কৃষ্ণপুর, বাসুদেবপুর, শিবপুর, নিত্যানন্দপুর, সম্বোকায়া ও বলদঘাটি) এবং পরবর্তীকালে হুগলি, পশ্চিমবঙ্গের হিজলী, তমলুক, পিপলি ও পূর্ববঙ্গের ঢাকা, বাখরাগঞ্জ ও নোয়াখালী অঞ্চলে বসতি ও বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপন করে শক্তিশালী হয়ে ওঠে।[৩] পূর্ববঙ্গের ইছামতি নদীর তীরবর্তী ১২ মাইল বিস্তৃত এলাকায় এরা ফিরিঙ্গি বাজার স্থাপন করে এবং এদের সংখ্যা দ্রুত ২৫ হাজারে উন্নীত হয়। এ পর্তুগিজরা শুধু এদেশে বাণিজ্যই করতো না, বরং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে শুল্ক ফাঁকিসহ নানা দুর্নীতির আশ্রয় নিতো এবং নদীর তীরবর্তী গ্রামগুলোতে আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট, অপহরণ ও অগ্নিসংযোগ করে গ্রামগুলো শ্মশানে পরিণত করতো। এরা বাঙালি নারীদের অপরহণ, ধর্ষণ করে রক্ষিতায়

পরিণত করতো, আবার অনেককে দাসী হিসেবে আরাকানে বিক্রির উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিতো। এ পর্তুগিজ ও বাঙালি নারীদের যৌন মিলনের ফসলই হলো 'ফিরিঙ্গি বা দো-আঁশলা' জাতি।[৪]

এ পর্তুগিজ ফিরিঙ্গি ও মগ দস্যুদের অত্যাচারের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার আচার্য যদুনাথ সরকারের 'Studies in Mughal India' ও কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মধ্যযুগে বাঙ্গালা' গ্রন্থের বরাত দিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা এ পর্যায়ে প্রণিধানযোগ্য– 'ষোড়শ শতকের শেষের দিক থেকেই বাংলার সমুদ্র ও নদীপথে মগ-ফিরিঙ্গিদের দস্যুতার ও দৌরাত্ম্যের ঢেউ-এ ঢেউ-এ মাতামাতি শুরু হয়, তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান স্ত্রী-পুরুষ ছোট-বড় সকলকেই বন্দী করিয়া তাহাদের হাতের পাতা ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে সরু বেত প্রবেশ করাইয়া বাঁধিত এবং একজনকে আরেকজনের উপর চাপাইয়া জাহাজের পাটাতনের নিম্নে ফেলিয়া রাখিত। যেমন লোকে পাখীকে আহার করতে দেয়, সেইরূপ তাহারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় উপর হইতে বন্দীদের আহারের নিমিত্তে চাউল ছড়াইয়া দিত। ''' ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে এই দস্যুদলের যাতায়াতের কারণে নদীগুলির উভয় পার্শ্বে একজন গৃহস্থও রহিল না। দস্যুদল লুণ্ঠন ও নর-নারী হরণ করিয়া এই প্রদেশের অবস্থা এমন করিয়া ফেলিয়াছে যে, তথায় একটি বসত বাড়ীও নাই, অথবা একটি প্রদীপ জ্বালাইবার লোক ও নাই'।[৫]

বাংলার শাসন ব্যবস্থা, শান্তি ও স্থিতিতে বিপর্যয় ডেকে আনে বর্গীদের আক্রমণ ও দাঙ্গা হাঙ্গামা। অতুল সুরের মতে- বর্গীর হাঙ্গামা বাঙালী জীবনে এক মহানিশার দুঃস্বপ্ন। মহারাষ্ট্রের অধিবাসীদের 'মারাঠা' বলা হতো এবং এরাই বাংলা ভূ-খণ্ডে 'বর্গী' নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করে। নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) রেবারের মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলে ৪০ হাজার দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনী দিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে পাঠিয়েছিলেন বাংলায় চৌথ আদায় করতে। মারাঠা এ বর্গী বা দুস্য বাহিনী বাংলার বিভিন্ন অভিজাত ব্যক্তি ও অঞ্চলে হামলা, লুটপাট, অগ্নি-সংযোগ ও হত্যালীলা চালিয়ে টাকা-পয়সা হাতিয়ে চলে যেতো। এভাবে এরা দীর্ঘ ৯ বছর (১৭৪২-১৭৫১ খ্রি.) মুর্শিদাবাদ, জগৎশেঠের বাড়ি, কলকাতা-হুগলির কিছু অংশ ও ইংরেজ বণিকদের জাহাজ এবং নৌকা লুটপাট করে সর্বস্বান্ত করে ফেলে। এদের দমন করতে নবাব আলীবর্দী খানকে বেশ বেগ হতে হয় এবং বালেশ্বরের যুদ্ধে বিজয়ী হলেও মারাঠা বর্গীদের সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

১৭৪৪ খ্রি. আলীবর্দী খান কিছুটা বাধ্য হয়ে ও কূটকৌশল-শঠতার আশ্রয় নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে মুর্শিদাবাদের মানকরা নামক স্থানের শিবিরে ডেকে আনেন এবং প্রতারণার মাধ্যমে হত্যা করেন। এতে করে পরবর্তী ১ বছর বর্গীর আক্রমণ বন্ধ থাকলেও পুনরায় আবার পূর্ণদ্যোমে শুরু হয়। ফলে বৃদ্ধ আলীবর্দী খান আর এ বর্গীদের সঙ্গে পেড়ে উঠতে পারেন নি। নবাব বাধ্য হয়ে ১৭৫১ খ্রি. বর্গীদের সঙ্গে সন্ধি করেন এবং শর্তানুযায়ী প্রতি বছর চৌথ হিসেবে ১২ লক্ষ টাকা প্রদান করবেন এবং ওড়িশ্যা বর্গীদের হাতে তুলে দেন। এর ফলে বাংলা বর্গীদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়। এ বর্গীদের ভয়-ভীতির কথা সংবলিত ছড়া শুনিয়ে বাংলার মায়েরা আজো দুষ্টু-দুরন্ত-ডানপিঠে ছেলেদের ঘুম পাড়ান।[৬]

এ বর্গীদের অত্যাচারের জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায় কবি গঙ্গারাম দাসের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' (১৭৫০ খ্রি.) এবং কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০ খ্রি.) 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে (১৭৫২-৫৩ খ্রি.)। কবি গঙ্গারাম তাঁর কাব্যে উল্লেখ করেছেন এভাবে-

'কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একই চোটে কারো বধে পরাণ ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক জত লাইয়া জাএ।
অঙ্গুষ্টে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ ॥

একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি শব্দ করে ॥' – (মহারাষ্ট্র পুরাণ)

বর্গী আক্রমণের আরো বস্তুনিষ্ঠ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে ভারতচন্দ্র রায়ের লিখনীতে–

'স্বপ্ন দেখি বর্গী রাজা হইলা ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥
বর্গী মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ॥
লুঠি বাংলার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হইল বান্দি নৌকার জাঙ্গাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥' –(অন্নদামঙ্গল; পৃষ্ঠা-১১)

নবাব আলীবর্দী খানের জীবদ্দশায়েই বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে অচলাবস্থা ও বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়, তা রোধ বা মোকাবেলা করার কোন ক্ষমতা বা যোগ্যতা কোনাটিই নবাব সিরাজউদ্দৌলার (১৭৫৬-১৭৫৭ খ্রি.) ছিল না। বরঞ্চ বলা ভালো, কোন পরিস্থিতি আর তাঁর নিয়ন্ত্রণে ছিল না। কারণ দিল্লীর মুঘল শাসকদের নাজুক অবস্থা, বাংলার শাসন কাঠামোর ভাঙন, নবাব-অভিজাত শ্রেণির ভোগ বিলাস, ইংরেজ বণিক শক্তির উত্থান ও রাজক্ষমতা লাভের উদগ্র বাসনা, দেশীয় হিন্দু সামন্ত রাজা-মহারাজাদের অর্থলিপ্সা-ষড়যন্ত্র-কূটকৌশল, মুসলিম অভিজাত শ্রেণির কৃতঘ্নতা ও দুর্নীতির আতিশয্যে দেশকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়।

মীর জাফর, মীর কাসিমদের ক্ষমতালিপ্সা, উমিচাঁদ, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, ইয়ার লতিফ খাঁ ও কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের মতো দেশীয় অমাত্য-মহাজন-রাজা-মহারাজাদের লোভ-ঘুষ-দুর্নীতির কারণে সামন্তরাদের আসন্ন পতন অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর হাত ধরে পুজিবাদী অর্থব্যবস্থার উত্থান ঘটে বা এর পটভূমি তৈরি হয়। অর্থাৎ পুজিবাদের কাগজী নোটের কাছে সামন্তবাদী ধাতব মুদ্রার পরাজয় ঘটে।

ইংরেজ ইস্ট-ইন্ডিয়া বণিকগোষ্ঠীর অপ্রতিরোধ্য উত্থান, অর্থশক্তি ও ভৌগোলিক সুরক্ষিত অবস্থান বাংলার রাজক্ষমতা দখলে উৎসাহিত করে তোলে। তাদের দূরদর্শী ও নীতি বিবর্জিত এসব পদক্ষেপের কারণেই মাত্র ১৬ হাজার টাকার মাধ্যমে জব চার্নক সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে গোবিন্দপুর, সুতানটি ও কলকাতার জমিদারী কিনে নিয়ে আধুনিক কলকাতা নগরীর পত্তন ঘটান।[৭] এ কলকাতা ও মাদ্রাজের শক্তিশালী অবস্থান, দেশীয় আমলা-অভিজাত ও জমিদারদের সমর্থন লাভ, সমাজের বিদ্যমান ঘুষ-দুর্নীতি ও নৈতিক অবক্ষয়জনিত সামাজিক ভাঙনে পুজিবাদী অর্থব্যবস্থা উত্থানের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়। আর এ কারণেই এক প্রতারণাপূর্ণ আধ-ঘণ্টার পলাশী যুদ্ধের (২৩ জুন, ১৭৫৭ খ্রি.) মাধ্যমে বাংলার রাজক্ষমতা ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। দেশ বিতাড়িত, কুলাঙ্গার এক শ্রেণির ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী এভাবে বাংলায় বাণিজ্য করতে এসে রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

এরপর শুরু হয় বাংলায় একের পর এক দুঃখ গাথা, দমন-পীড়ন, নৈরাজ্য ও দুর্বিপাকের ইতিহাস। কারণ ইংরেজদের প্রবর্তিত কুখ্যাত দ্বৈতশাসন পদ্ধতি বা Dual Govt. system (১৭৬৫খ্রি.) এর ফলে বাংলায় শোষণের পথ প্রশস্ত হয় এবং মাত্র ৪-৫ বছরের মাথায় দেখা দেয় দেশজুড়ে ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ (১১৭৬ বঙ্গাব্দ বা ১৭৬৯-৭০ খ্রি.)। এ দুর্ভিক্ষে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোকের প্রাণ হানি ঘটে এবং ১৭৮০ খ্রি. অরাজক বঙ্গদেশে ডাকাত দলের অগ্নিসংযোগে ৫০ হাজার গৃহ ও ৫ শতাধিক লোক পুড়ে মরে।[৮]

এ দুর্ভিক্ষের মৃত্যু ও মহামারীর রেশ কাটতে না কাটতেই মাত্র ৩০ বছর পরে অপ-উদ্দেশ্যে প্রবর্তন করা হয় ‘চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা Parmanent settlement system’ (1793)। এতে করে বাংলার অভিজাত মুসলমানসহ হিন্দুদের দুরবস্থা চরম সীমায় গিয়ে পৌছায়। নির্ধারিত সময়ে খাজনা পরিশোধ করতে না পারার অপরাধে বর্ধমানের মহারাজার, নদীয়ার মহারাজার, নাটোরের রাণী ভবানীর, বীরভূমের রাজার ও বিষ্ণুপুরের রাজার চরম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। [৯]

এর প্রতিবাদে সারা দেশে দেখা দিতে থাকে ফকির বিদ্রোহ (১৭৬৩ -১৮০০খ্রি.), চুয়ার বিদ্রোহ (১৭৬০-১৭৮৩ খ্রি.), চাকমা বিদ্রোহ (১৭৮৩-১৭৯৫ খ্রি.), ঘরুই বিদ্রোহ (১৭৭৩ খ্রি.), হাতিখেদা বিদ্রোহ (১৭৯১ খ্রি.), সুবান্দিয়া গ্রামের বিদ্রোহ (১৭৯২ খ্রি.), সমশের গাজীর বিদ্রোহ (১৭৭০ খ্রি.), তন্তুবায়দের বিদ্রোহ (১৭৭৮) ও ফরায়েজী আন্দোলন প্রভৃতি। [১০]

বাংলার এমন দুর্যোগ-দুর্বিপাকপূর্ণ অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে সমালোচক অরবিন্দ পোদ্দার বলেন– মধ্যযুগের বাংলার সমাজ আমাদের মানসপটে যে চিত্র আঁকে তা বিরামহীন রাজনৈতিক দুর্যোগ ও ঘনঘটায় আবৃত। বাংলার এ আকাশ রাজরাজড়া, আমীর-ওমরাহ, সুলতান, বাদশাহ্দের যুদ্ধ-বিগ্রহ, সিংহাসন লিপ্সু রাজপুরুষ, এমনকি দাসদের কূটচক্রান্ত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, জায়গীর প্রার্থী রাজকর্মচারীদের আকস্মিক বিদ্রোহ, ভূম্যাধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তিদের লোভাতুর দৃষ্টি ও পাপাচরণের মেঘে ঢাকা। ''' ষোড়শ শতকের শেষের দিক থেকেই বাংলার সমুদ্র ও নদীপথে মগ ফিরিঙ্গিদের দস্যুতার দৌরাত্মে ঢেউ-এ ঢেউ-এ মাতামাতি শুরু হয়। তারপর দৃশ্যপটে আবির্ভাব হয় ইংরাজ বণিকের। অষ্টাদশ শতকের বৃটিশ বিজয়ের কলকোলাহলে আমীর ওমরাহদের রাজত্বকালের শেষ সূর্য অস্ত যায়। আকাশের মধ্যযুগীয় মেঘ কাটে, দেখা দেয় নতুন মেঘ। ''' তখন বাংলার গ্রাম্য সমাজের সাধারণ মানুষ আর কোন আকাশে নিরাপত্তার সূর্যের সন্ধান করেছিল। কিন্তু সূর্যের সন্ধান মেলেনি। এই অন্ধকার আকাশ সিংহাসনলিপ্সু ক্রুরচক্র ব্যক্তি, লোভী ভূঁইঞা আর মানুষ পণ্যের ব্যবসাদার ফিরিঙ্গি ও মগ দস্যুদের অবাধ লীলাভূমি। বিভিন্ন ঘটনা ও চক্র-চক্রান্তের ফলে এরা এই আকাশে আবির্ভূত হয়েছে এবং নির্দিষ্ট স্থানে ও কালে তাদের লীলার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে। তাদের লক্ষ্য ছিল এক ক্ষমতা অধিকার; কর্ম ছিল বিবিধ-লুণ্ঠন, নরহত্যা, ছলকৌশল শঠতা। এইসব বিবিধ কর্ম যখন একই সামাজিক পরিবেশ ঘুরপাক খেয়েছে (When all were struggling against all), তখনই সৃষ্টি হয়েছিল মার্কস বর্ণিত প্রাক-বৃটিশ রাষ্ট্রীয় অবস্থা বা পুজিবাদী ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থা।[১১]

বাংলার এমনি রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও পটভূমিতেই ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর (১৭১২-১৭৬০ খ্রি.) রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’ (১৭৫২-৫৩খ্রি.)। অর্থাৎ পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭খ্রি.) মাত্র ৫ বছর পূর্বে তিনি এ কাব্য রচনা সম্পন্ন করেন। তাঁকে এ কাব্য রচনায় উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন নবদ্বীপের বিখ্যাত মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়

সুবা বাংলার ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে মূলত ‘পলাশী যুদ্ধের’ (১৭৫৭ খ্রি.) মাধ্যমে। এতে করে ইংরেজ বণিকগোষ্ঠী প্রকৃত অর্থেই শাসক সেজে বসেন। এদের মন যুগিয়ে, স্তুতি-স্তব করে যে আস্থাভাজন নবাবগণ (মীর জাফর, মীর কাসিম, নজিম উদ্দৌলা ও সইফুদ্দৌলা) বাংলার মসনদে বসেন, তারা মূলত ইংরেজ বণিকদের হাতের পুতুলে পরিণত হয়ে পড়েন। ইংরেজদের চাহিদা, দাবি-দাওয়া ও মনোতুষ্টি করতে গিয়ে নবাবগণ যেমন বেকায়দায় পড়েন, তেমনি দেশ ও জনগণের দেখা দেয় বেহালদশা ও চরম বিপর্যয়। এ সময় দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বলে কিছু ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে অভজাত শ্রেণি, বণিক শ্রেণি ও মহাজন-বিত্তবান লোকেরা মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, কলকাতা,

নবদ্বীপ ও হুগলি অঞ্চলে চলে আসেন এবং বসবাসের জন্য বসতি স্থাপন করতে থাকেন। কারণ সামন্ত শাসক ও বণিকগণ এসব স্থানে বসবাস করতেন বিধায় এখানকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার ছিল।

ইংরেজ বণিকগোষ্ঠীর শাসন ব্যবস্থা ও পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলার সমাজ ব্যবস্থায় যে রূপান্তর ঘটে অর্থাৎ নব্য ধনী বা জমিদার ও মুৎসুদ্দি শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এদের হাতে অজস্র রুপি থাকলেও উচ্চ সাংস্কৃতিক রস-রুচিবোধ ছিল না। তাই এসব নগর অঞ্চলে পূর্ববর্তী সামন্তবাদী অভিজাত্যকে অনুকরণ করতে গিয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা, অযাচার, ব্যভিচার, স্থূল রঙ্গ-রস, ভোগ-বিলাস আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যায়। রাজা-মহারাজাদের দরবার সভায় ও বিত্তবানদের বৈঠকখানায় বিভিন্ন নেশা ও আসক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলে স্থূল রঙ্গ-রসিকতা, হাসি-ঠাট্টা-ভাঁড়ামি, আদি রসাত্মক শ্লোক-কাব্য পাঠ ও শ্রবণের মহোৎসব। সমকালীন এরূপ দরবারী সাহিত্য ও রসরুচির পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে-

'The style and the spirit both become depraved the former by a vinglorious pedantry which made description grotesque by their over drawn niceties, the serious often passing into the burlesque and the latter scurrilous obsc-grosser than anything on sterm, smollet, of wycherly and by the introduction of characters like those of Hiramalini and Bidu-Brahmani accessories to illicil love of the most revolting type.'[১২]

এমনি সামজিক-সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক অধপতনে মুসলিম শাসকশ্রেণির বিপর্যয়ের বেদিতে হিন্দু জমিদার ও বণিক শ্রেণি নব উদ্যমে জেকে বসেন। তৎকালীন বাংলার হিন্দু সমাজ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ছিলেন (ক) নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং (খ) ঢাকা রাজনগরের রাজা রাজবল্লভ। ইহারাই ছিলে সমাজের প্রতিনিধি।[১৩]

মধ্যযুগ থেকেই নবদ্বীপ বা নদীয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল। কারণ এ নবদ্বীপ ছিল সেন বংশীয় রাজাদের দ্বিতীয় রাজধানী শহর এবং এখান থেকেই রাজা লক্ষ্মণ সেন এক রকম পরাভব স্বীকার করে পলায়ন করায় (১২০৪খ্রি.) বাংলায় মুসলিম রাজত্বের সূত্রপাত ঘটে। এছাড়া মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রি.) পদধূলিতে ধন্য হবার কারণে ও এখানেই মহাপ্রয়াণ ঘটায় নবদ্বীপ মহাতীর্থে রূপ নেয় এবং কালক্রমে তা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র তথা বিদ্যাপীঠে পরিণত হয়।

কিন্তু ইংরেজ কম্পানির শাসনামলে সমকালের প্রভাবে নবদ্বীপের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রস ও রুচিতে কলুষতার ছাপ পড়ে। এ কলুষতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে ড. দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন-

'যে নবদ্বীপে বৈষ্ণবগণ এক সময় মেঘদর্শনে কৃষ্ণভ্রম করিয়া প্রেমাবেশে পাগল হইতেন, সেই স্থানে ভারতচন্দ্রের শিষ্যগণ সমস্ত শীতলতার গণ্ডী অতিক্রম করিয়া লালসারাক্ষসীকে ষোড়শোপচারে পূজা করিতে লাগিলেন।' [১৪]

এই সময় নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন বঙ্গদেশের যুগাবতার।[১৫] নদীয়ার বা নবদ্বীপের কৃষ্ণনগরের বিশাল জমিদারি পরিচালনা করতেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় (১৭১০-১৭৮২খ্রি.)। কৃষ্ণচন্দ্রের জন্ম ১৭১০ খ্রি.। পিতৃব্য রামগোপালের রাজা হবার কথা ছিল। শোনা যায়, তিনি ছল-চাতুরী করে পথে পিতৃব্যকে বিলম্ব ঘটান এবং তার পূর্বে মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দীর (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) দরবারে উপস্থিত হন এবং বাক্‌চাতুর্য দিয়ে নবাবের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায় করতে সক্ষম হন।

নবাব আলীবর্দী কৃষ্ণচন্দ্রকে খুব পছন্দ করতেন এবং তাকে 'ধর্মচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করেন। ভারতচন্দ্রের তথ্য মতে, কৃষ্ণচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে দুই বিয়ে করেন এবং দুই পক্ষের পুত্রগণ হলেন- শিবচন্দ্র, ভৈরব চন্দ্র, হরচন্দ্র,

মহেশচন্দ্র, ঈশাণ চন্দ্র, রাজকায় চন্দ্র ও শুম্ভচন্দ্র। এছাড়া তিনি একাধিক কন্যা সন্তানেরও জনক ছিলেন। ধনে-জনে, বিত্ত-বৈভবে, সম্মান-সৌভাগ্যে এবং প্রভাব ও প্রতাপে সমকালে বাংলায় কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্র রায় স্বভাব-চরিত্রের দিক থেকে ছিলেন কপট, অকৃতজ্ঞ, স্বার্থবাদী, নির্মম ও সনাতন পন্থী। যে আলীবর্দী খানের কাছ থেকে তিনি নানাভাবে উপকৃত হতেন, সেই তিনিই নবাবকে অনুর্বর ভূমি দেখিয়ে ২০ লক্ষ টাকার রাজস্ব মওকুফ করিয়ে নেন। আবার তিনি যখন নবাব মীর কাসিমের হাতে মুঙ্গের দুর্গে বন্দী হন, মৃত্যুদণ্ড যখন তাঁর মাথার ওপরে ঝুলছিল, তখন তিনি পুত্র শিবরামকে নিয়ে পূজার ফাঁদ পেতে সেখান থেকে উদ্ধার পান। এছাড়া তিনি লর্ড হেস্টিংসের স্ত্রীকে এক ছড়া মুক্তার মালা উপহার দিয়ে নিজ পুত্র শুম্ভচন্দ্রের অপ-উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দেন।[১৬]

কৃষ্ণচন্দ্র বিশাল ভূখণ্ডের রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্যের সীমা ভারতচন্দ্র যা উল্লেখ করেছেন, তা এরূপ-রাজ্যের উত্তর সীমা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিম সীমা– গঙ্গাভাগীরথীর খাদ, দক্ষিণ সীমা-গঙ্গাসাগরের খাদ এবং পূর্ব সীমা ধুল্যাপুরের বড় গঙ্গার পাড় পর্যন্ত। এ বিরাট রাজ্য তিনি সাহস ও যোগ্যতার সঙ্গে শাসন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সিংহাসনে আরোহনের সময় তাঁর ঋণের পরিমাণ ছিল ১০ লক্ষ টাকার ওপরে এবং ১২ লক্ষ টাকার নজরানার দাবি মেটাতে ব্যর্থ-হওয়ায় মহাবৎজঙ্গ তাঁকে বন্দী করেছিলেন। তিনি নিজ যোগ্যতায় এসব ঋণ হতে মুক্ত হতে পেরেছিলেন এবং রাজ্যের সীমানাও বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।[১৭]

কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতির একজন যোগ্য পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজ দরবারে বিভিন্ন জ্ঞান-গুণীর সমাগম ঘটে এবং এদের সংস্পর্শে দরবারের শ্রী বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর দরবারে সম্রাট আকবরের মতো নবরত্নের স্থান ছিল। এরা হলেন- ভারতচন্দ্র, গোপাল ভাঁড়, রামপ্রসাদ সেন, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, হরিরাম তর্ক সিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, বাণেশ্বর বিদ্যালংকার, হাস্যার্ণব ও মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। এছাড়া রামগোপাল সার্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, শিবরাম বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ ও বীরেশ্বর ন্যায় পঞ্চানন উল্লেখযোগ্য।[১৮]

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ দরবারে যে স্থূল হাসি-ঠাট্টা ও রঙ্গ-রসের ফুলঝুড়ি ছুটতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। বরং দরবারের তিন হাস্যরসিক ও ভাঁড় (গোপাল ভাঁড়, হাস্যার্ণব ও মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়) ছিলেন এর যোগান দাতা। দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' (২য় খণ্ড, পৃ-৫৫৮-৫৫৯) গ্রন্থে এরকম কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যা সমকালের রস-রুচি উন্মোচন করতে যথেষ্ঠ-

ক. কৃষ্ণচন্দ্র : এ যে রাজপুত্র দেখছি (গোপাল ভাঁড়ের ছেলে দেখে)।
গোপাল ভাঁড় : ধন্য তুই ছেলে, তোর কল্যাণে আমি রাজপুত্রের বাপ হলাম।
খ. কৃষ্ণচন্দ্র : মুক্তারাম; গতরাতে স্বপ্নে দেখেছি যে, তুমি একটা নর্দমায় আর আমি পায়েসের হ্রদে পড়েছি।
মুক্তারাম : মহারাজ; আমিও এই রূপ স্বপ্ন দেখেছি। কেবল পার্থক্য হলো যে, আমরা ডাঙায় উঠে পরস্পরের দেহ লেহন করছি।

এসব বিদ্বান-জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে ভারতচন্দ্র রায়ই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ- এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই, বরং এটি সর্বজন স্বীকৃত। কারণ ভারতচন্দ্রই তাঁর কবিকৃতী দিয়ে নিজের সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অমর করে রেখেছেন। কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্যা-শিক্ষার মতো শিল্পেরও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি নাটোর থেকে একদল মৃৎশিল্পী এনে কৃষ্ণনগরে মৃৎশিল্পের প্রসার ঘটান। স্থাপত্য কলার উন্নয়নে তিনি প্রশংসীনয় অবদান রাখতে সক্ষম হন। এর প্রমাণ আজো বহন করছে বাংলার বহু দেব মন্দির। এছাড়া এ রাজবংশ বিশেষত তাঁর উৎসাহেই শান্তিপুরের ধুতি বা বস্ত্র শিল্প

খ্যাতিতে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। আবার সনাতন ধর্মের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত, পৃষ্ঠপোষক ও কর্তা ব্যক্তি হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্র ছিলেন আঠারো শতকের নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজের মধ্যমণি। তিনি ১৭৫৩ খ্রি. মাঘ মাসে অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় যজ্ঞ পালন করেন। এজন্য তিনি বাংলা, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, মহারাষ্ট্র, মিথিলা, উৎকল ও বারণাসী অঞ্চল থেকে বিখ্যাত সব পণ্ডিতদের আমন্ত্রণ করে আনেন এবং বহু জাকজমকের সঙ্গে যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এ যজ্ঞ সম্পন্ন করতে তৎকালেই খরচ হয়েছিল ২০ লক্ষ টাকা।[১৯] আবার অনেকের ধারণা, দীপান্বিতা বা দীপালী উৎসবের দিনে যে, 'কালী পূজার' বিধান পাওয়া যায় তার প্রবর্তকও ছিলেন এই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।[২০]

এ নিষ্ঠাবান হিন্দু হবার কারণে কৃষ্ণচন্দ্র মানসিকতায় ছিলেন সনাতন পন্থী ও অনুদার। তাই তিনি ছিলেন বিধবা বিবাহের ঘোর বিরোধী। এ জন্যই তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকার পরও ঢাকার রাজনগরের বিখ্যাত রাজা রাজবল্লভের নয় বছরের বিধবা কন্যা অভয়ার বিধবা বিবাহের আপ্রাণ চেষ্টা করার পরও শুধু কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতার কারণেই তা ব্যর্থ হয়। এছাড়া নাটোরের রানী ভবানী তার বিধবা কন্যা তারা সুন্দরীর পুনর্বিবাহ দিতে গেলেও কৃষ্ণচন্দ্রের বিরোধিতায় তা পণ্ড হয়ে যায়। আবার বৈদ্য জাতির পৈতা ধারণের অধিকার পেতে রাজা রাজবল্লভ তৎকালীন আমলে ১০ লক্ষ টাকা খরচ করে এর বিধান পেতে আগ্রহ দেখালে তাতেও কৃষ্ণচন্দ্র বাধা দেন। এমনকি রানীভবানী বিধবাদের একাদশী পালনের শর্ত হ্রাস করার উদ্যোগ নিলে তাও কৃষ্ণচন্দ্র প্রতিহত করেন।[২১]

কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের চারিত্রিক এ গোড়ামি, রক্ষণশীলতা ও কপটতার কারণে তাঁর শেষ জীবন বেদনা ও বিষাদে পূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনিও পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সমর্থন করেন এবং এর সপক্ষে কাজ করেন। যুদ্ধের পর রবার্ট ক্লাইভ কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রতিদান স্বরূপ ৫টি কামান পুরস্কার দেন।[২২] এছাড়া নানা বিপদে-আপদে ইংরেজরা তাঁকে সাহায্য করেন।

তাঁর পুত্র শম্ভুচন্দ্র পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে সিংহাসন দখল করেছিলেন। এতে কৃষ্ণচন্দ্র ভীষণভাবে ব্যথিত ও মর্মপীড়িত হয়ে পড়েন। এ দুঃখে তিনি গঙ্গাগোবিন্দের উদ্দেশ্যে দুই ছত্র কবিতা লিখেছিলেন- 'পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য। যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ ॥' এমন পরিস্থিতিতে ১৭৮২ খ্রি. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় মৃত্যুবরণ করেন।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের চারিত্রিক দোষ-ত্রুটি নিয়ে বিতর্ক থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক অনুরাগ, প্রজ্ঞ-বৈদগ্ধ্য, রস-রুচি, আভিজাত্য ও বিত্ত-বৈভবকে সকলে একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ড. সুনীতি কুমারের মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য-

'An aristocrat like Raja Krishna Chandra of Nadia lived, like many an `English educated' highly placed India of the present day, a double life; on the outside, in certain context it was an imitation of the Muslim-cum-Rajput court life of Agra or Delhi; and inside it was the same old fashioned way of living and thinking that characterised a secular Brahman of late medieval times.'[২৩]

প্রকৃত অর্থেই কৃষ্ণচন্দ্র রায় ছিলেন বাংলার সামন্তবাদ ও পুজিবাদের যুগসন্ধিকালের প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্ব। একদিকে সামন্তবাদী আভিজাত্য-বিলাস, রস-রুচি, রক্ষণশীলতা এবং অন্যদিকে পুজিবাদী অর্থব্যবস্থার পরিবর্তনশীলতায় আস্থাভাজন ও পরিপোষক–চারিত্রিক এ দ্বিবিধ বৈশিষ্ট্যই কৃষ্ণচন্দ্রকে ইতিহাস এনে দিয়েছে সুখ্যাতি ও কুখ্যাতির যুগপৎ পরিচিতি।

অন্নদামঙ্গল বা কালিকামঙ্গলের কবি পরিচিতি

বাংলা সাহিত্যে অন্নদামঙ্গল কাব্যের একক রচয়িতা হিসেবে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের নাম বিশেষভাবে সমাদৃত। এ অন্নদামঙ্গলের মোট তিন খণ্ডের মধ্যে 'বিদ্যাসন্দুর কাহিনী' সংযোজিত হবার কারণে 'অন্নদামঙ্গল কাব্যকে' অনেকেই 'কালিকামঙ্গল কাব্য' বলে অভিহিত করেছেন। এদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের রচয়িতা কবির সংখ্যা ড. আহমদ শরীফ সতেরোজন বলে উল্লেখ করেছেন। [২৪]

ড. আহমদ শরীফের মতে, কালিকা মঙ্গলের প্রথম কবি দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ। এ কাব্যটি বাংলায় প্রথম রচিত হয় সুলতান আলাউদ্দিন গুসেন শাহের (১৪৯৩-১৫১৯খ্রি.) দৌহিত্র সুলতান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহের (১৫৩২ খ্রি.) আগ্রহে। 'কালিকামঙ্গলের' দ্বিতীয় কবি শাহ বারিদ খান। এরপর 'কালিকামঙ্গল' নামের আবরণে মূলত শৃঙ্গার রসের ঘাটাঘাটি করে অনেকেই এ কাব্য রচনা করেছেন। আজ অবধি 'কালিকামঙ্গল' তথা 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান' রচয়িতা সতেরো জন কবির নাম পাওয়া গেছে। এরা হলেন- দ্বিজ শ্রীধর কবিরাজ, শাহ বারিদ খান, কঙ্ক, গোবিন্দ দাস, বলরাম চক্রবর্তী, কৃষ্ণরাম, প্রাণরাম, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর, নিধিরাম আচার্য, দ্বিজ রাধাকান্ত, কবীন্দ্র, মদন দত্ত, মধুসূধন চক্রবর্তী, ক্ষেমানন্দ, বিশ্বেশ্বর ও কবিচন্দ্র প্রমুখ।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য এসব কবিদের মধ্যে পূর্ব ময়মনসিংহের অধিবাসী কবি কঙ্ককেই বাংলা 'কালিকামঙ্গল' কাব্যের আদি রচয়িতা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[২৫] তবে এ মতের পক্ষে তেমন সুস্পষ্ট প্রমাণ বা জোরালো সমর্থন পাওয়া যায়নি।

বাংলা কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানের আদি রচয়িতা নিয়ে সন্দেহ বা সংশয় থাকলেও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর যে এ ধারার শ্রেষ্ঠ কবি এ বিষয়ে কারো বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। বরং সকলেই এক বাক্যে, নির্দ্বিধায় ভারতচন্দ্রের কবিকৃতী ও শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকার করেছেন।

ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর

ভারতচন্দ্র শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান কবি নন, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিনিধি। পলাশীর পূর্বেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি মুখপাত্র, পলাশীর পরেকার পঞ্চাশ বৎসরের তিনি আদর্শ স্থাপয়িতা এবং সাহিত্যিক কুশলতায় রবীন্দ্রনাথের যুগেও তিনি প্রমথ চৌধুরীর মতো বিদগ্ধ সমালোচকদের অকুণ্ঠিত প্রশংসাভাজন, অশ্রুবিলাসী বাঙালি জাতির পক্ষে তিনি প্রয়োজনীয় প্রতিষেধক।[২৬]

এদিক থেকে মঙ্গলকাব্যের এবং মধ্যযুগেরও সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০খ্রি.)। তিনি পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭খ্রি.) মাত্র ৫ বছর পূর্বে (১৭৫২-৫৩খ্রি.) এ বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা সম্পন্ন করেন। আর পলাশী যুদ্ধের ৩ বছর পরে (১৭৬০খ্রি.) মাত্র ৪৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করে। ১৭৬০ থেকে ১৮৬০ খ্রি. ১০০ বছরের এ সময়কাল বস্তুতপক্ষে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পক্ষে প্রস্তুতির কাল। এ যুগসন্ধির পটভূমিতেই ভারতচন্দ্র রচনা করেন 'অন্নদামঙ্গল কাব্য'। সুতরাং বলা যায়, বিদেশি প্রভাবমুক্ত বাংলার সর্বশেষ কবি ভারতচন্দ্র। বিবর্তনের পথ ধরে মঙ্গল কাব্যের ধারা এবং বাংলা ভাষা তাঁর হাতে আশ্চর্য পরিণতি লাভ কের। তাঁর মতো শব্দ-কুশলী ভাষা শিল্পী কবি শুধু মধ্যযুগে কেন, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে দুর্লভ।

এ কারণে মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগে ভারতচন্দ্র রায়ই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। শুধু তাই নয়, ভারতচন্দ্র তাঁর অসাধারণ শক্তি দ্বারা মঙ্গলকাব্যের বিধিবদ্ধ নিয়মের গণ্ডীর মধ্যেও এর সর্বাঙ্গে যে এক অপূর্ব লাবণ্য সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তার দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের সমগ্র কাব্য সাহিত্যের মধ্যে আর নেই। [২৭]

মধ্যযুগের অপরাপর কবিদের মতো ভারতচন্দ্র রায়ের জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত ও তথ্যবহুল উপাত্ত জানা যায় না। বরং এর জন্য কবির রচনাকৃত গ্রন্থের ভণিতার ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভর করতে হয়। তবে ভারতচন্দ্রের সৌভাগ্য যে, তাঁর জীবন সংবলিত তথ্যবহুল একটি লেখা বাংলার আরেক যুগসন্ধির কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯ খ্রি.) তার বিখ্যাত 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৫ খ্রি. প্রকাশ করেন। এতে করে ঈশ্বর গুপ্তের ১০ বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম সাফল্য লাভ করে। এর ১ মাস পরে তা 'কবির ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আজ পর্যন্ত এটিই ভারতচন্দ্র সম্পর্কে জানার একমাত্র বস্তুনিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য উৎস।

ভারতচন্দ্র রায় ১৭১২ খ্রি. বর্ধমান জেলার ভুরসুট পরগণার 'পেঁড়ো' গ্রামের এক জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় ছিলেন ভুরসুট পরগণার জমিদার ও মাতা ছিলেন-ভবানী দেবী। এ নরেন্দ্রনারায়ণ ভরদ্বাজ গোত্রে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্ম লাভ করেন। তবে বিত্ত-বিষয়-বৈভবের কারণে তাদের 'রায়' বলা হতো এবং জনসাধারণ সম্বোধন করতো 'রাজা' বলে। এ বংশের পূর্বপুরুষ ছিলেন বিখ্যাত প্রতাপনারায়ণ। নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ের ছিল ৪ পুত্র, যেমন-চতুর্ভুজ রায়, অর্জ্জুন রায়, দয়ারাম ও ভারতচন্দ্র রায়। এ ভারতচন্দ্র রায়ই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ পুত্র এবং খ্যাতি ও যোগ্যতায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

জনশ্রুতি মতে, তৎকালীন বর্ধমানের মহারাজ ছিলেন কীর্তিচন্দ্র রায়। কীর্তিচন্দ্রের শৈশবকালে কোন কারণে তার মহারানী বিষ্ণুপ্রিয়াকে নরেন্দ্রনারায়ণ নাকি কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। এতে রানী ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে নরেন্দ্রনায়ণকে সমুচিত শাস্তি দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। তিনি রাতের মধ্যে আলমচন্দ্র ও ক্ষেমচন্দ্র নামক দুই জন রাজপুত সেনাপতির মাধ্যমে 'ভবানীপুরের গড়' ও 'পেঁড়োর গড়' লণ্ডভণ্ড করে দখল করে নেন। আর এতেই রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েন এবং অনেকে পালিয়ে রক্ষা পান। নরেন্দ্রনারায়ণ খুব দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্র্যের সঙ্গে দিনাপাত করতে থাকেন।

ভারতচন্দ্র এমন পারিবারিক পরিস্থিতিতে পলায়ন করে বা সকলের অজান্তেই মাতুলালয় মঙ্গলঘট পরগণার 'নওয়াপাড়া' চলে যান এবং সেখানকার বিখ্যাত তাজপুর গ্রামস্থ পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ, অভিধানসহ সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ভারতচন্দ্র এসময় শুধু সংস্কৃত বিদ্যা শিক্ষাই অর্জন করেননি, বরং মাত্র ১৪-১৫ বছর বয়সে পরিবারের মতামতের তোয়াক্কা না করেই সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামতেই সারদা গ্রামের কেশরকুনি আচার্যদের বংশীয় নরোত্তম আচার্যের কন্যা রাধাকে বিয়ে করেন। সমকালীন সমাজে যা ছিল অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। এরপর তিনি নিজ বাড়ি ভুরসুটে প্রত্যাবর্তন করেন। সংস্কৃত বিদ্যালাভ ও নিজ পছন্দে বিয়ে করার ফল স্বরূপ পিতা-মাতা ও অগ্রজ ভাইদের দ্বারা ভীষণরূপে তিরস্কৃত হন। কারণ তৎকালে রাজভাষা ছিল ফারসি। ফারসি বিদ্যায় পারদর্শী না হলে সরকারি কোন চাকরি বা আর্থিক সুবিধা পাওয়া যেতো না। মনের দুঃখে ভারতচন্দ্র বাড়ি ত্যাগ করে হুগলির বাঁশবেড়িয়ার পশ্চিম দেবানন্দপুর গ্রামের বিখ্যাত রামচন্দ্র মুনশীর নিকট আশ্রয় নেন।

রামচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থেকে এবং খুব দুঃখ-কষ্ট ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে তিনি ফারসি ভাষা-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। এরিমধ্যে বর্ধমান রাজা কীর্তিচন্দ্রের দেওয়ান রাজবল্লভ ভারতের পিতার ইজারা তালুক খাস করে নেন। এ সময় ভারতচন্দ্র বাড়িতে ফিরে এলে, তাঁর ফারসি কৃতবিদ্যার সংবাদের সকলেই খুশি হলেন এবং পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারে তাঁকে বর্ধমান রাজ দরবারে প্রেরণ করা হয়।

কিন্তু বর্ধমানরাজের কর্মচারীদের চক্রান্তে পড়ে ভারতচন্দ্র কারারুদ্ধ হন। পরে তিনি বুদ্ধিবলে ও চাতুর্য দ্বারা কারারক্ষীদের হাত করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। এরপর তিনি সোজা কটক হয়ে পুরীতে পৌছান। এখানে বৈরাগীদের সংস্পর্শে এসে বৈষ্ণবধর্মে অনুরাগী হয়ে বৈষ্ণব সেজে বৃন্দাবন অভিমুখে গমন করেন। হুগলির কৃষ্ণনগরের গোপীনাথজীর মন্দিরে কীর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ গ্রামের পাশেই ছিল ভারতচন্দ্রের শ্যালিকার শ্বশুর বাড়ি। ভায়রার ভাই রঘুনাথ গোপনে এ খবর তার শ্যালিকা ও ভায়রার নিকট বলা মাত্রই সকলে মন্দিরে এসে তাঁকে অনেক প্রবোধ-সান্ত্বনা দিয়ে বাড়তিে নিয়ে গেলেন। গেরুয়া বস্ত্র পরিবর্তন করে, নাপিত দিয়ে চুল-দাড়ি কেটে ভারতকে পুনরায় সংসার ধর্মে ফিরিয়ে আনা হয়। কিন্তু ভারতচন্দ্রে নিজ পিত্রালয়ে না ফিরে বরং ভায়রা বাড়ি ছেড়ে সারদা গ্রামের শ্বশুরালয়ে আশ্রয় নেন।

কিছুকাল শ্বশুরবাড়ি থেকে অর্থ-উপার্জনের উদ্দেশ্যে তিনি ফরাসডাঙ্গায় গমন করেন। এখানে এসে তিনি ফরাসি গভর্নমেন্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য ব্যক্তি ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট এসে আশ্রয় নেন এবং কর্ম-ব্যবস্থার জন্য প্রার্থনা জানান। ভারতচন্দ্রের বিদ্যা-শিক্ষা ও বংশ পরিচয় জেনে দেওয়ানজী সন্তুষ্ট হলেন এবং চাকরিরও আশ্বাস দিলেন। ভারত দেওয়ানজীর বাড়িতে বসবাস না করে বরং পার্শ্ববর্তী গোন্দলপাড়ার রামেশ্বর মুখার্জির (ওলন্দাজ গভর্নমেন্টের দেওয়ান) বাড়িতে রাত যাপন করতেন এবং আহারাদি করতেন ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতে। [২৮]

আর এ ইন্দ্রনারায়ণের বাড়িতেই নিয়মিত যাতায়াত করতে নবদ্বীপের বিখ্যাত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়। কিছু দিনের পরিচয়ে ভারতচন্দ্রের বিদ্যা বুদ্ধির গুণে ও বন্ধুবর ইন্দ্রনারায়ণের সুপারিশেই মূলত কৃষ্ণচন্দ্র রায় ভারতকে নিজ রাজ দরবারের সভাপণ্ডিত হিসেবে নিয়োগ দানে সম্মত হন। তিনি ভারতচন্দ্রকে বাড়ি করতে মূলাজোড়ে জমি দান করেন এবং মাসিক ৪০ টাকা মাহিনা নির্ধারণ করে দেন। বাড়ি করতে ১০০ টাকা এবং ৬০০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব প্রদানের বিধান করে মূলাজোড় গ্রামখানি ইজারা দেন। মূলত কৃষ্ণচন্দ্রের অনুগ্রহ ও দয়াতেই এত দিনে ভারতের জীবনে (৪০ বছর বয়সে) শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসে। [২৯]

ভারতচন্দ্র নতুন বাড়ি নির্মাণ করে স্ত্রীকে নিয়ে আসেন। এখানেই ভারতচন্দ্রের দাম্পত্য জীবন প্রকৃত অর্থে শুরু হয়। ভারতচন্দ্র ও স্ত্রী রাধার গর্ভে ক্রমে তিনপুত্র- পরীক্ষিৎ রায়, রামতনু রায় ও ভগবান রায়ের জন্ম হয়।[৩০] এ বাড়িতেই শেষ জীবনে বসবাস করে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় মৃত্যুবরণ করেন।

মূলাজোড়ের বাড়িতে বসবাস করেই ভারতচন্দ্র সকাল-সন্ধ্যা নিয়মিত কৃষ্ণচন্দ্রের রাজ দরবারে যাতায়াত করতেন এবং স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দ্বারা রাজাও সভাসদদের মনোরঞ্জন করতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা ও অভিপ্রায়েই মূলত তার বংশ ও পূর্বপুরুষদের মাহাত্ম্য কীর্তি প্রকাশ করতেই 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনায় মনোনিবেশ করেন। ভারতচন্দ্র এ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনায় তাঁর সকল মেধা-মনন, রস-রুচি ও পাণ্ডিত্যের সমন্বয় ঘটিয়ে বহু শ্রম স্বীকার করে ১৭৫২-৫৩খ্রি. এটি সম্পন্ন করেন। এ কাব্য যখন তিনি রাজ দরবারে নিয়ে যান রাজাকে প্রদান করতে, তখন কৃষ্ণচন্দ্র বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকাতে, পাণ্ডুলিপিটি বালিশের ওপর রেখে দেন। এতে ভারতচন্দ্র সবাইকে অবাক করে দিয়ে বলে ওঠেন- 'করেন কী মহারাজ! এতে যে সকল রস গড়িয়ে পড়ে যাবে বা রসে বালিশ ভিজে যাবে।'[৩১]

কৃষ্ণচন্দ্র এমন বাক্যে চমৎকৃত হয়ে বলেন- 'গোপাল ভাঁড়; ভারত আজ তোমাকেও হার মানিয়ে দিল।' এরপর তিনি অপরাপর রাজকর্ম বাদ দিয়ে ভারতের এ মনোহর অন্নদামঙ্গল কাব্য শ্রবণ করেন এবং মোহিত হয়ে কবিকে বিশেষ পুরস্কৃত করেন। ভারতচন্দ্রের কবিকৃতীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'রায়গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। নাগরিক সমাজের রস-রুচি ও বাক্ বৈদগ্ধ্যের কারণেই মূলত তাঁকে 'নাগরিক কবি' বলা হয়। ভারতচন্দ্রের সাহিত্য রচনার

হাতেখড়ি ঘটে শৈশবেই। তিনি যখন পণ্ডিত হীরারাম রায়ের তত্ত্বাবধানে সংস্কৃত সাহিত্য পড়েন, তখনই কাব্য রচনার সূত্রপাত ঘটে। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে-

ক. সত্যপীরের ব্রতকথা (১ম খণ্ড), পণ্ডিত হীরারাম রায়ের নির্দেশে রচিত।

খ. সত্যপীরের ব্রতকথা (২য় খণ্ড), রামচন্দ্র মুনশীর নির্দেশে রচিত (আনু. ১৭৩৭-৩৮ খ্রি.)।

গ. অন্নদামঙ্গল কাব্য (১৭৫২-৫৩খ্রি.)। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নির্দেশে রচিত।

ঘ. রসমঞ্জরী কাব্য। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের নির্দেশে রচিত।

ঙ. নাগাষ্টক কাব্য (আনু. ১৭৫২-৫৩খ্রি.)।

চ. গঙ্গাষ্টক। সম্ভবত মুলাজোড়ের গঙ্গাতীরে বসবাসকালে রচিত।

ছ. চণ্ডীনাটক (অসম্পূর্ণ)।

জ. খণ্ড কবিতাবলী। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ থাকাকালে বিভিন্ন সময়ে রচিত

'চৌরপঞ্চাশৎ' কাব্যটি ভারতচন্দ্রের রচনা নয় বলেই গবেষকদের সিদ্ধান্ত। [৩২]

তবে ভারতচন্দ্রের কবি খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁর এ অন্নদামঙ্গল কাব্য; বিশেষত 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান'। সমকালীন বাংলায় বিশেষত কলকাতার নাগরিক সমাজে 'বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান' ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়। 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ছাড়া বাবু সমাজের বৈঠক বা আসর জমতো না। এছাড়া যাত্রা, কথকতা ও নবীন নর-নারী সমাজে এ বিদ্যাসুন্দর সমাদরের সামগ্রীতে পরিণত হয়। এ কাব্যটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশ করে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য (১৮১৬ খ্রি.)।[৩৩] এ প্রতিভাবান কবি ভারতচন্দ্র মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৭৬০ খ্রি. বহুমূত্র ও ভস্মক রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ভারতচন্দ্রের কবিকৃতী, পাণ্ডিত্য, রস-রুচি ও শিল্প দক্ষতা নিয়ে সমকাল থেকে বর্তমান কাল অবধি বিতর্কের কমতি ছিল না। জনপ্রিয়তার খ্যাতিতে সমকালে ভারতচন্দ্রে ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ভারতচন্দ্রের শিল্পকুশলতা ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে সমালোচকদের মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য-

ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'The father of a very vile school of poetry though himself a man of elegant genius.'[৩৪]

খ. হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্যন্ত এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই এবং বোধ হয় আর জন্মিবে না; তেমন মধুমাখা কথা বুঝি আর কেহ কখনও গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না।'[৩৫]

গ. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'He is the father of modern Bengali. His versification, too is very good, and it is the model followed by many distinguised poets of the present day ''' কিন্তু In higher attributes of a poet, Bharat Chandra is far inferior to many who have preceded and followed him.' [৩৬]

ঘ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।' [৩৭]

ঙ. প্রমথ চৌধুরী

'As regards Bharat Chandra's language there is nothing more limpid, more bright, more graceful or more elegant in the whole of Bengali literature. ''' Bharat Chandra as a supreme literary craftsman; will ever remain a master to us writers of the Bengali language.'[৩৮]

চ. দীনেশচন্দ্র সেন

'ভারতচন্দ্র প্রকৃত কবির প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অলংকার শাস্ত্র তাঁহার মাথা ঘুরাইয়া দিয়াছিল ''' নানা দোষ সত্ত্বেও ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এত আদরণীয় হইল কেন, তাহার কারণ আমরা নির্দেশ করিয়াছি- ভারতচন্দ্রের অপূর্ব শব্দমন্ত্র। বাঙ্গালা পৃথিবীর কোমলতম ভাষা বলিয়া গণ্য হইতে পারে, কিন্তু এই কোমলতার কিরূপ আকর্ষণীয় শক্তি আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর না পাড়লে সম্যক উপলব্ধি হইবে না।''' এতে কবির অসাধারণ পাণ্ডিত্যের প্রভা পড়িয়া বইখানিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে।''' কত বড় প্রতিভা লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এই ব্যাপারে তাহা প্রমাণিত হইতেছে।'[৩৯]

ছ. আশুতোষ ভট্টাচার্য

'অত্যন্ত সহজ ও সংক্ষিপ্ত কথায় গভীরতম ভাবদ্যোতক প্রবচনের মত এক একটি পদ রচনা করিতে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ভারতচন্দ্রের তুলনা নাই।... ভারতচন্দ্রের ভাষার ঐশ্বর্য অতুলনীয়। সংস্কৃত, পারসী ও প্রাকৃত বাংলা শব্দের সুন্দর সমন্বয় দ্বারা তিনি ভাষার যে শুধু লাবণ্যই বৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহা নহে- তাঁহার অপূর্ব শব্দবিন্যাস-নৈপুণ্য দ্বারা তাহার মধ্যে একটি স্বচ্ছন্দ গতিবেগ দান করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের এই সুমার্জিত ভাষাই রাজসভার উপযুক্ত ভাষা হইল; বঙ্গভাষা সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ গ্রাম্যতা মুক্ত হইয়া উচ্চতর সাহিত্যিক ভাষার উপযোগিতা লাভ করিল।... মুকুন্দরামের কবি কল্পনা বাংলার ধূলিমাটিতে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু ভারতচন্দ্র সেই ধূলিমাটির উপাদান লইয়া তাজমহল রচনার স্বপ্ন দেখিলেন।'[৪০]

জ. সুকুমার সেন

'ভারতচন্দ্র নিষ্ঠাবান শব্দকুশলী কবি। ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ্ব্যবহারের চটকে ভারতচন্দ্রের রচনা সেকালের শব্দশিল্পের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।... সুললিত এবং রসাল শব্দ গ্রন্থনে পূর্ববর্তী অধিকাংশ কবির তুলনায় ভারতচন্দ্রের যোগ্যতা অধিক ছিল। কেননা সংস্কৃত-বাঙ্গালা-ফারসী-হিন্দুস্থানী এই চারি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার হইতে ইচ্ছামত শব্দ চয়ন সামর্থ্য খুব কম বাঙ্গালী কবিরই দেখা গিয়াছে। [৪১]

তবে ভারতচন্দ্রের পাণ্ডিত্যও শিল্পকুশলতার ব্যাপারে প্রশংসা থাকলেও রস-রুচির ক্ষেত্রে রয়েছে নানা অভাব-অভিযোগ। আদিরস ও অশ্লীলতার অভিযোগ অনেকেই উত্থাপন করেছেন। এ বিষয়ে দুইজন বিশিষ্ট দায়িত্বশীল, সমকাল সতর্ক সাহিত্য সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য-

ক. প্রমথ চৌধুরী

'ভারতচন্দ্র চেয়েছিলেন যে, তাঁর কাব্যে প্রসাদগুণ থাকবে ও তা হবে রসাল। এই দুই বিষয়েই তাঁর মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে।... তবে তাঁর কাব্যের অনেক অংশ যে অশ্লীল, তা স্বয়ং ভারতচন্দ্রও জানতেন, কারণ তাঁর কাব্যের অশ্লীল অঙ্গসকল তিনি নানাবিধ উপমা, অলংকার ও সাধুভাষায় আবৃত করতে প্রয়াস পেয়েছেন।... **প্রথমত**; এ কারণেই ভারতচন্দ্রের কাব্য যত সুপরিচিত অপর কারো তত নয়। **দ্বিতীয়ত**; ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার ভিতর Art আছে, অপরের আছে শুধু Nature।... ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতা গম্ভীর নয়, সহাস্য।'[৪২]

খ. ক্ষেত্র গুপ্ত

'ভারতচন্দ্র জীবনের একটা বড় অংশ অভিজাত ভূস্বামীদের সঙ্গে কাটিয়েছেন।... তাছাড়া কালের সংকট এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের পৌনঃপুনিক বিপর্যয় দুইয়ে মিলে একটা সুরই বেজে উঠেছে, যেন তাঁর নিজের মধ্যেই নিজের আয়না। এ কারণেও সময়ের অন্তরে প্রবেশের দরজা তিনি পেয়েছিলেন। অবশ্য যুগকে চেনবার জন্য সবচেয়ে বড় অস্ত্র ছিল তাঁর মনীষায় ও প্রতিভায়।... ভারতচন্দ্র পুরাতন জীর্ণ আদর্শগুলি ভেঙেছেন, প্রথাগুলিকে ব্যঙ্গ বা অবহেলা করেছেন, রীতি পদ্ধতিগুলির প্রতি অশ্রদ্ধা দেখিয়েছেন প্রয়োগের বৈপরীত্যে। বড় শিল্পী যখন ভাঙেন, কিছু গড়বার জন্যেই। সেখানে তিনি যুগের ক্ষয়ের সীমা ছাড়িয়ে যান। ভারতচন্দ্রে সে সাধনা আছে।... ভারতচন্দ্রে এই প্রবণতা ভোগ নয়, ভোগের দর্শন, বিলাসিতা নয়–বিলাস কলার শব্দৈশ্বর্যময়ী প্রতিমা।'[৪৩]

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়– রাজসভার কবি হিসেবে ভারতচন্দ্রকে দরবারী রস-রুচির আমদানি করতে হয়েছিল তাঁর কাব্যকলায়। প্রতিপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কাব্য রচনা করলেও তা বিলাসের পণ্যে পরিণত হয়নি, বরং সমকালকে ধারণ করেছে অসামান্য দক্ষতায়। যুগ-যন্ত্রণা, পাপ-পঙ্ক, ভোগ-বিলাস ও অবক্ষয়ের প্রতি যেমন তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কটাক্ষের বাণ নিক্ষেপ করেছেন, তেমনি দেহ ও কামকে আশ্রয় করেই এক দেহাতীত প্রেম ও পুণ্যের নিষ্ক্রান্তির পথ নির্দেশ করেছেন। যেখানে ভোগ বাসনার চেয়ে বৈরাগ্য সাধনাই বড় হয়ে ওঠেছে।

দেবী অন্নদা ও কালিকার পরিচয়

দেবী চণ্ডী কালো বলে তাকে কালিকা, কালী বা শ্যামা রূপে যেমন পূজা করা হতো, তেমনি অন্নদাত্রী হিসেবে অন্নদা নামেও তার পূজার প্রচলন ঘটে। প্রাচীন অনার্য নারী দেবতা এই চণ্ডী। ইনি শক্তিরূপিণী। শতাধিক নামে চণ্ডী অনার্য সমাজে পূজিতা হতেন। ক্রমে আর্য সমাজে তিনি শিব বা হর গৃহিনীরূপে শিবানী, উমা, গৌরী ও তারা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। পৌরাণিক যুগে এঁর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা অসামান্য রূপে বেড়ে যায়। দশ প্রকার শক্তির অধিকাররূপে তাঁর দশম মহাবিদ্যার দশমূর্তি পরিকল্পিত হয়েছে, যথা- কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা। শিবা-শিবানী অর্থে চণ্ড-চণ্ডী নামের মধ্যেই তাঁদেরকে প্রচণ্ড শক্তির আধাররূপে স্বীকার করা হয়েছে।

সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবের কারণে তাঁর উগ্র রৌদ্ররূপ কমনীয় করুণাময়ী রূপে পরিণত হয়। তখন তিনি অন্নাপূর্ণা, কমলা ও দুর্গারূপে বাংলাদেশে পূজিতা হতে থাকেন। দুর্গারূপে দশদিক রক্ষার প্রতীক দশ প্রহরণধারিণী হিসেবে তাঁর দশভুজা মূর্তি পরিকল্পিত হয়। দুর্গারূপে তিনি শ্যামা নন, বরং গৌরী বা উমা ও অন্নদা। অনার্য প্রভাবে এককালে তিনি অনার্য দেবতা বিষ্ণু, শিব ও কালী (চণ্ডী) সর্বভারতিক দেবতারূপে পূজিত হন; ফলে ব্রাহ্মণ্য সমাজ–বৈষ্ণব, শৈব ও শাক্ত সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।[৪৪]

এভাবে চণ্ডীর মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যকে 'চণ্ডীমঙ্গল' কালিকার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যকে 'কালিকামঙ্গল' অন্নদার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যকে 'অন্নদামঙ্গল' এবং গৌরী বা দুর্গা বা সারদার মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যকে যথাক্রমে 'গৌরী-দুর্গা-সারদামঙ্গল' নামে অভিহিত করা হয়। মঙ্গলকাব্যে প্রধানত- চণ্ডী, অন্নদা, কালিকা বা কালী দেবীর স্বতন্ত্র তিনরূপ প্রচার-প্রসার ও প্রতিষ্ঠা পায়।

মুসলিম শাসনামলের গোড়ার দিকে সমাজে অর্থাৎ হিন্দুসমাজে ঝাঁকুনির কারণে উঁচু-নিচু একাকার হয়ে যায়। মহাযান উপাস্যবহু দেব-দেবী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে স্থান পাবার পাশাপাশি ধ্বংসোন্মুখ (তান্ত্রিক) বৌদ্ধ মত ব্রাহ্মণ্য মতের কোলে ঠাঁই নেয়। গ্রাম দেব-দেবী যতদূর সম্ভব শাস্ত্রীয় দেব-দেবীর নাম ও প্রকৃতি গ্রহণ করতে

থাকে। গৃহস্থ নারীর ব্রত উপবাসের ঠাকুর অন্য স্থানে অপদেবতা কিংবা উপদেবতা-শাস্ত্রপন্থী দেবতার মর্যাদান্বেষী হলেন।

পাষাণ (পাথর), ধাতব বা পট প্রতিমায় দেব পূজা প্রথমে বৌদ্ধ তান্ত্রিক মতে শুরু হয়েছিল এবং গুপ্ত রাজাদের সময় থেকে তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে চালু হয়েছিল। সেন রাজাদের আমলে বিষ্ণু বা শিবের অস্ত্রীক ও সস্ত্রীক মূর্তি এবং মহিষ মর্দিনী বা রাজেশ্বরী চণ্ডী মূর্তি মন্দিরে স্থাপনের মাধ্যমে পূজার প্রচলন হয়েছিল। চণ্ডীপূজা বা কালীপূজা ও দুর্গাপূজা শারদ্যোৎসবে প্রতিষ্ঠিত হলো।[৪৫]

এর ধারাবাহিকতায় বাংলায় দুর্গা পূজার প্রচলন ঘটে এবং তা বারোয়ারী সামাজিক উৎসবে রূপ নিতে শুরু করে। অনেক গবেষক চতুর্দশ খ্রি. বা তার পূর্ববর্তী সময়কে দুর্গাপূজার সূত্রপাতের কাল বলে ইঙ্গিত করেছেন। ঐতিহাসিকগণের মতে, বাংলায় সর্বপ্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে শারদীয় দুর্গাপূজা শুরু করেন তাহেরপুরের (বর্তমান রাজশাহীর বাগমারা থানার) বিখ্যাত রাজা কংসনারায়ণ (১৫৮০ খ্রি.)। এ পূজায় তিনি এমন জমকালো আয়োজন করেছিলেন যে, এতে তৎকালীন প্রায় ৯ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল।[৪৬]

তার কিছুকাল পরে ১৬০৬ খ্রি. নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদার এবং ১৬১০ খ্রি. কলকাতার বিখ্যাত সাবর্ণ-চৌধুরীদের বংশীয় লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারও মহা সমারোহে দুর্গা পূজা করেছিলেন বলে শোনা যায়। বাংলার সাধারণ মানুষ চিরকালই ক্ষুধা, দুঃখ ও দারিদ্র্যের সঙ্গে পরিচিত ছিল। এছাড়া বন্যা-বর্ষা-দুর্ভিক্ষসহ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ছিল তাদের নিত্য সঙ্গী। এ দুর্ভিক্ষপীড়িত, ক্ষুধার্ত ও অসহায় মানুষেরা নিজেদের মতো করে দেবী কল্পনার মাধ্যমে পূজা করেছে এবং অন্ন (খাদ্য) ও নিরাপত্তার বর পেয়েছে। এভাবেই দেবী দুর্গা বাংলার জনসাধারণের নিকট হয়ে উঠেছেন অন্নদায়িনী- মাতৃরূপিণী অন্নপূর্ণা বা অন্নদা এবং সকল বিপদনাশিনী-বরাভয়দায়িনী অভয়া। তাই দীন-দুঃখী দরিদ্র-বাঙালি সমাজে দেবী অন্নদা এত বেশি জনপ্রিয়, বল-ভরসা-বিশ্বাস ও আস্থা প্রদানকারী মাতৃমূর্তিতে পরিণত হয়েছেন। এ অন্নদা দেবীর পূজা প্রবর্তন প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেন বলেছেন- 'রাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণা প্রতিমা অবলম্বনে অন্নপূর্ণা পূজা প্রবর্তন করেন বলিয়া শোনা যায়। হয়তো এই পূজা প্রবর্তনের পূর্ব-ইতিহাস হিসেবে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে অন্নদামঙ্গল লিখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।'[৪৭]

ড. অতুল সুরের মতে– মাতৃদেবী আদিতে যে শস্যাদির সঙ্গেই সংশিণ্টষ্ট ছিলেন, তা তাঁর অন্নপূর্ণা, শাকম্ভরী ইত্যাদি অভিধা থেকেই প্রকাশ পায় (মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা, পৃ-৯৪)। আবার ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে- বৈদিক যুগে দুর্গাকে মাতৃদেবী রূপে চিন্তার উন্মেষের সম্ভাবনাকে স্বীকার না করে উপায় নেই। বিশেষ করে তাঁকে যখন তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুঃখনাশিনীরূপে বর্ণনা করা হয়েছে (শক্তির রূপ : ভারতে ও মধ্য এশিয়ায়, পৃ-২২)। পঞ্চোপাসক (সূর্য, অগ্নি, শিব, দুর্গা ও বিষ্ণু মতান্তরে গণেশ, সূর্য, বিষ্ণু, শিব ও দুর্গা যাদের উপাস্য দেবতা) সম্প্রদায় ছাড়াও বাঙালি সমাজে আরো দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। বাংলার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পালাবদলে দেব-দেবীর প্রতি মানুষের বিশ্বাসের জগতেও ঘটেছে অনিবার্য পরিবর্তন। আর এ কারণেই ষোড়শ শতাব্দীতে মুকুন্দরাম অসহায়, দিশেহারা ও দায়গ্রস্ত মানুষের প্রতিনিধিরূপে চণ্ডী দেবীর প্রতি অবিচল ভক্তি বিশ্বাস থেকে রচনা করেন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য। এ ক্ষেত্রে ধর্মবোধের তাড়না ও দৈব নির্ভরশীলতাই ছিল মুখ্য।

পক্ষান্তরে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মবোধের শৈথিল্যে, নৈতিক অধপতনে এবং অনেকাংশে আত্মনির্ভরশীলতার যুগে বিলাসী, কপট ও দৃঢ়চেতা মানুষের প্রতিনিধিরূপে অন্নদা ও কালী দেবীর প্রতি প্রয়োজন তথা দায়সাড়া ভক্তি থেকে ভারতচন্দ্র রচনা করেন 'অন্নদামঙ্গল বা কালিকামঙ্গল' কাব্য। দেবী অন্নপূর্ণা বা অন্নদা সৌভাগ্যবানকে যেমন সুখ সম্পদে ভরপুর করে তোলেন, তেমনি আবার নিরন্ন মানুষকে অন্ন যোগানের দায়িত্ব ভারও গ্রহণ করেন।[৪৮]

কিন্তু কালী বা কালিকা দেবীর পূজা উপাসনার ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্যটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাধারণত বাঙালি সমাজের চোর, ডাকাত, লুটেরা, সন্ত্রাসী, যোদ্ধা, সৈনিক, বিলাসী বাবু, শাসকগণ নিজ নিজ স্বার্থ (শুভ বা অশুভ) উদ্ধারের জন্যই নরবলি বা পশুবলি দিয়ে কালী পূজা করায় অভ্যস্থ ছিলন। দেবীও ভক্তের ডাকে সাড়া দিয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে প্রয়াস চালাতেন বা বর দান করতেন। সাধনায় সিদ্ধি লাভের শক্তি অর্জন করতেই মূলত এ শক্তিরূপিণী কালিকা পূজার বেশ প্রসার ঘটে। কালী বা কালিকা দেবীর ভয়ঙ্করী রণোন্মাদিনী মূর্তির বিপরীতে রয়েছে কল্যাণময়ী শান্ত ও মাতৃমূর্তি রূপ। ভক্ত ও সেবকের কাছে তিনি প্রাণরক্ষাকারিণী মমতাময়ী জননী, আর প্রতিপক্ষের নিকট তিনি মূর্তিমান আতঙ্ক। এ কালিকা দেবীর স্বরূপ সম্পর্ক তিনজন সাহিত্য সমালোচকের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য–

ক. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

'অন্নদামঙ্গলের অন্নদা এবং কালিকামঙ্গলের কালিকা এক দেবী নন, যদিও ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে দুই দেবীরই মাহাত্ম্যজ্ঞাপন করে কাহিনী রচনা করেছেন। তবে দুটি কাহিনী এমন স্বতন্ত্র, তাদের যোগসূত্র এমন ক্ষীণ যাতে কখনো এরূপ মনে করার অবকাশ থাকে না যে, এই কাব্য মধ্যে আমরা একটি দেবীকেই দুইরূপে দেখতে পাচ্ছি। অন্নদা এবং কালিকা দুই স্বতন্ত্র দেবী এবং স্বতন্ত্রভাবেই ভারতচন্দ্রের কাহিনীতে তাদের অবস্থান। তবে উভয়েই শাক্ত দেবী, তন্ত্রের সঙ্গে অল্পাধিক সম্পৃক্ত, শিবের শক্তিরূপে পরিচিত, উভয়েই দেবী পার্বতী দুর্গার রূপভেদ রূপে কল্পিত।'[৪৯]

খ. অরুণকুমার বসু

'অষ্টাদশ শতাব্দী বাংলাদেশের ইতিহাসে তিমিরচ্ছায় দুর্যোগের স্মৃতিতে লাঞ্ছিত। জাতীয় জীবনে সহস্রাধিক অপমানে নিষ্পিষ্ট, হতাশা ও নৈরাশ্যের অতলস্পর্শী গহ্বরে নির্বাসিত, নিক্ষিপ্ত মানবত্মা অদৃষ্টে করাঘাতের সঙ্গে এমন এক বরাভয়দাত্রী ভীষণা দেবীর মূর্তি কল্পনা করেছে, যিনি জীবনের অনিশ্চিত দুর্ভাগ্যের উপর শান্তির প্রলেপ দিতে পারবেন, উচ্ছৃঙ্খল ব্যর্থতাকে একটি ঐক্যসূত্রে বেঁধে দিতে পারবেন– তিনিই কালিকা।'[৫০]

গ. আশুতোষ ভট্টাচার্য

'তন্ত্রশাস্ত্রে উল্লেখিত হইয়াছে যে, কালী শক্তি দেবতা চণ্ডীরই রূপভেদ মাত্র। অবশ্য নিম্নস্তরের অনার্য সমাজ হইতেই যে কালিকা দেবীর উদ্ভব হইয়াছে, তাহা তাহার দেবত্বের প্রকৃতি হইতেই উপলব্ধি করা যায়। তন্ত্রের ভিতর দিয়া ইনি ক্রমে পৌরাণিক সাহিত্যেও প্রবেশ লাভ করেন। কিন্তু পরবর্তী পৌরাণিক সম্পর্কের ফলেও তাঁহার অনার্য প্রকৃতির মূলে বিন্দু মাত্রও আর্য প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব অনার্য সমাজের মধ্যে তিনি যে একজন বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্না দেবী ছিলেন, তাহাই মনে হয়।'[৫১]

সুতরাং বলা যায়, কালের প্রবাহে বাংলায় পার্বতী বা দুর্গার রূপভেদে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে কালিকা দেবীর উদ্ভব ও পূজার প্রচলন ঘটে। এ কালিকা পূজা বাংলায় কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাতে করা হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে (ত্রয়োদশ খ্রি. রচিত) সে অমাবস্যার রাতকে বলা হয় দীপান্বিতা। কালীপূজার দিন সন্ধ্যায় লক্ষ্মী পূজা ও পার্বণ শ্রাদ্ধ করার প্রচলন রয়েছে। দীপান্বিতা বা দীপালী উৎসবের দিনে কালীপূজা বা শ্যামা পূজার বিধান সর্বপ্রথম পাওয়া যায় কাশীনাথ রচিত 'কালী সপর্যাবিধি' (১৭৩৮ খ্রি.) গ্রন্থে। ধারণা করা হয়- 'নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রই প্রথম কালীপূজার প্রবর্তন করেন। [৫২] বাংলায় তন্ত্রসাধনা, কালীসাধনা ও দশম মহাবিদ্যা সাধনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের কাহিনী

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৭৫২-১৭৫৩ খ্রি.) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের আজ্ঞায় কবি ভারতচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' রচনা করেন। এ 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য এককভাবে শুধু ভারতচন্দ্র কর্তৃক রচিত হওয়ায় এটি বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্য ধারায় স্বতন্ত্র শাখারূপে প্রকৃত অর্থে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তারপরও ভারতচন্দ্র তাঁর বহুমুখী ও সৃষ্টিশীল প্রতিভার গুণে বাংলা মঙ্গলকাব্যের ধারায় সম্পূর্ণ নূতন এ শিল্প আঙ্গিক (অন্নদামঙ্গল) সংযোজন করতে সক্ষম হন। এদিক থেকে তিনি বাংলা মঙ্গলকাব্য সাহিত্য ধারায় সম্পূর্ণ নূতন একটি শাখার একক স্রষ্টা।

'অন্নদা মঙ্গল' কাব্যের খণ্ড বিভাজন নিয়ে রয়েছে মত পার্থক্য রয়েছে। ড. ক্ষেত্রগুপ্তের মতে- অন্নদা মঙ্গলে কাহিনী আছে মোট পাঁচটি; যথা- ১. শিব-পার্বতী উপাখ্যান, ২. ব্যাস বৃত্তান্ত, ৩. হরিহোড় উপাখ্যান, ৪. ভবানন্দের উপাখ্যান, ৫. বিদ্যাসুন্দর। এর মধ্যে বিদ্যা-সুন্দরের একেবারে নিঃসম্পর্ক গল্পটি ভবানন্দ কাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এমনকি আরাধ্যা দেবীও ভিন্ন, অন্য প্রসঙ্গগুলিতে অন্নপূর্ণা, এখানে কালিকা। অপর চারটি কাহিনীর মধ্যে ক্ষীণসূত্র একটি সম্বন্ধ রক্ষিত হয়েছে- তাতে ঐক্যবদ্ধ গল্পের স্বাদ আসে না। তিন এবং চার সংখ্যক কাহিনী দুটি মৌলিক উপাদানে গঠিত।[৫৩]

ড. সুকুমার সেনের মতে- অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য বর্ণনা অন্নপূর্ণামঙ্গল রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে। একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের বংশকর্তা ভবানন্দ মজুমদারের কীর্তি বর্ণন উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রশস্তি রচনা। কাব্যটি এই তিনটি স্বতন্ত্র উপাখ্যান রূপ ক্ষীণ সূত্রে যোজনা করা আছে-১. শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, ২. বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল, ৩.মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল। পুরাতন দেবীমঙ্গল কাব্যের মতো ভারতচন্দ্রের কাব্যও আট পালায় বিভক্ত। তবে এই পালা বিভাগ সর্বত্র আখ্যান অনুযায়ী নহে।[৫৪]

তবে সাধারণত অন্নদামঙ্গল কাব্যের তিনটি খণ্ড বিশেষভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। তা হলো-

ক. পুরাণ কথা-শিবায়ন বা অন্নদামঙ্গল

খ. রূপকথা- বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল

গ. ইতিহাস কথা- মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান বা অন্নপূর্ণামঙ্গল

সুতরাং বলা যায়, 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ। সত্যিকার অর্থে এই তিন খণ্ড তিনটি পৃথক কাব্য। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অনুকরণে ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল'-র প্রথম খণ্ড রচনা করেন। যা অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল। দ্বিতীয় খণ্ডে যে 'বিদ্যাসুন্দর পালা' সংযোজন করা হয়েছে, তা এদেশে পূর্ব প্রচলিত একটি রূপকথা বা উপাখ্যান মাত্র। আর তৃতীয় খণ্ডে মুঘল সুবাদার রাজা মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও যশোরের রাজা প্রত্যাপাদিত্যের সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা মাত্র (যদিও প্রকৃত ইতিহাসে প্রমাণ মেলে না)।

এদিক থেকে 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রথম খণ্ড ও তৃতীয় খণ্ডকে মঙ্গল কাব্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য বা রচনা রীতির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বলে মেনে নেয়া যায়। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ড 'বিদ্যাসুন্দর' পালাকে কোন মতেই মঙ্গল কাব্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করা যায় না। এছাড়া এ অংশ যে ভারতচন্দ্রের মূল কাব্য পরিকল্পনায় ছিলনা, বরং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশ বা অনুরোধেই সংযোজন করেছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এর যুক্তি হিসেবে দেখানো যায় যে, প্রথম খণ্ডের শেষেই ভারতচন্দ্র বলেছেন-

> 'ইতঃপর কহে শুন রায় গুণাকর।
> প্রতাপআদিত্য মানসিংহের সমর।।'-(পৃ.-১৬০)

অথচ এর অব্যবহিত পরে দ্বিতীয় খণ্ড হিসেবে 'মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ কাহিনী' বর্ণনা না করে বরং বর্ধমানে উপস্থিত হয়ে মানসিংহ মাটির সুড়ঙ্গ পথ দেখে যে কৌতূহল জন্মায় তার সূত্র ধরেই ভবানন্দ মজুমদারের জবানিতে কবি 'বিদ্যাসুন্দর পালা' বর্ণনার আয়োজন সম্পন্ন করেছেন। এখানে মূলত ভারতচন্দ্র একটি কৌশলময় ফাঁদ পেতেছেন। যেমনটি পেতেছিলেন এরও প্রায় দুইশত বছর পরে বাংলার আরেক সাহিত্যিক শওকত ওসমান (১৯১৭-১৯৯৮ খ্রি.) তাঁর 'ক্রীতদাসের হাসি' (১৯৬২ খ্রি.) নামক উপন্যাসের ভূমিকা অংশে।
তাছাড়া 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী ঘটনাগত ভাবেও মর্ত্যের দেবী অন্নদার পূজার কাহিনীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয়। আর দেবীও অন্নদা মূর্তির বদলে কালিকা মূর্তিতে আবির্ভূতা হয়েছেন। অন্নদাত্রীর ভূমিকা নিয়ে নয়, বরং কাম-লালসাসিক্ত প্রেমের বরদাত্রী রূপে বিদ্যা ও সুন্দরের গুপ্ত মিলন সাধন করেছেন। এবার 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের তিনটি খণ্ডের কাহিনী সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো-

ক. শিবায়ন বা অন্নদামঙ্গল

এ গ্রন্থের প্রথমেই রয়েছে অপরাপর মঙ্গল কাব্যের মতো দেব বন্দনা। যথারীতি গণেশসহ পঞ্চদেবতা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্নপূর্ণার বিশেষ বন্দনা করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে সমকালীন বাংলার রাজনৈতিক ঘটনা তরঙ্গের কথা। বাংলার নবাব ছিলেন আলীবর্দী খান (মহাবদ জঙ্গ)। মঘুল সেনা বাহিনী ভুবনেশ্বরের মন্দির আক্রমণ ও ধ্বংস করায় মহাদেব ক্রুদ্ধ হয়ে বর্গীরাজ ভাস্কর পণ্ডিতকে বাংলা আক্রমণ করে যবন মুসলিমদের যথোচিত শাস্তি প্রদানের স্বপ্নাদেশ দেন। এর ফলে বাংলায় চলে বর্গীদের আক্রমণ-লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ। এতে করে নবাবের রাজকোষ শূন্য হয়ে যায় এবং তিনি কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কাছে ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দাবী করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এত টাকা দিতে অপরাগ হলে নবাব তাকে মুর্শিদাবাদের কারাগারে বন্দী করে রাখেন। বিপন্ন অসহায় কৃষ্ণচন্দ্র কারাগারেই বসে চৌত্রিশ অক্ষরে দেবী অন্নদার বন্দনা করেন। এতে দেবী স্বপ্নাদেশ দেন যে, অন্নদার মূর্তি গড়ে পূজা দিলে সকল বিপদ হতে মুক্তি মিলবে। এ কারণে রাজা সভাকবি ভারতচন্দ্রকে দেবী অন্নদার মাহাত্ম্য বিষয়ক গান লিখতে আদেশ করেন।
এরপর পৌরাণিক ঘটনা অবলম্বনে সতী-শিব-গৌরীর কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সতীর পিতা দক্ষরাজ মেয়ের জামাই শিবকে আমন্ত্রণ না করেই মহা ধূমধামে যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু করেন। মেয়ে সতী এতে অসন্তুষ্ট হয়ে পিত্রালয়ে গমন করেন। মেয়েকে দেখে দক্ষরাজ আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনেই জামাই শিব ও মেয়েকে কটাক্ষ ও অপমান সূচক কথা বলেন। এতে দারুণভাবে মর্মাহত হয়ে সতী দেহ ত্যাগ করেন। স্ত্রীর মৃত্যুর সংবাদে শিব মহা ক্রুদ্ধ হয়ে তার বাহিনী দিয়ে দক্ষের যজ্ঞ বিনাশ করেন এবং শ্বশুর দক্ষের মুণ্ডপাত করেন। পরে অবশ্য শ্বশুরকে পুনর্জীবিত করেন ছাগমুণ্ড দিয়ে।
এর ফলে শিব বৈরাগ্য ধর্ম গ্রহণ করেন। সতী আবার হিমালয় ও মেনকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন এবং উমা বা গৌরী নাম ধারণ করেন। এবারও তিনি দেবতা শিবকে স্বামী হিসেবে পাবার জন্য উপাসনা শুরু করেন। এতে দেবতাদের পরামর্শে মদন দেবতা ফুলশর নিক্ষেপ করে শিবের মনে কামচেতনা জাগিয়ে তোলেন। এ সময় নারদের ঘটকালিতে গৌরীর সঙ্গে শিবের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এ নব-দম্পতির সংসার জীবন মোটেও সুখকর ছিল না। কারণ শিব ছিলেন নেশাখোর, কর্মবিমুখ ও উদাসী প্রকৃতির মানুষ। অভাব-অনটন ও ক্ষুধার জ্বালায় শিব ভিক্ষাবৃত্তি করতে বাধ্য হন। অভাবের সংসারে শিবের সঙ্গে গৌরীর ঝগড়া লেগেই থাকে। এমন পরিস্থিতিতে ভিক্ষাও মিলতে চায় না। অসহায়-দিশেহারা-ক্ষুধার্ত শিবকে দেবী লক্ষ্মী নানা উপদেশ ও পরামর্শ দেন। গৌরীর অন্নদামূর্তির প্রভাবে শিবের খাদ্যাভাবসহ দুঃখ-কষ্ট দূর হয়ে যায়।

সখী জয়া-বিজয়ার পরামর্শে অন্নপূর্ণা দেবী পৃথিবীতে পূজা পেতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাই দেব শিল্পী বিশ্বকর্মাকে দিয়ে কাশীতে তৈরি করেন অন্নপূর্ণাপুরী। এ কাশীতে ব্যাসদেব শিষ্যসহ প্রবেশ করেন এবং ঘটনা প্রসঙ্গে শিব বিদ্বেষী হয়ে দারুণ লাঞ্ছনা ভোগ করেন। এর প্রতিশোধ নিতেই তিনি বারণাসীতে নিজ নামে অর্থাৎ ব্যাসবারণাসী পুরী নির্মাণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। কিন্তু বিশ্বকর্মা ও গঙ্গাদেবী তার এ অপ-উদ্দেশ্যে রাজি না হওয়ায় তাদেরকে তিরস্কার করেন এবং নিজ উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। দেবী অন্নদা জরতীবেশে ব্যাসদেবকে দারুণভাবে জব্দ করেন।

এরপর দেবী অন্নদা সখী জয়া-বিজয়ার পরামর্শে কুবেরের অনুচর বসুন্ধর ও বসুন্ধরাকে ছলনার মাধ্যমে অভিশাপ দিয়ে পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। বসুন্ধর ঘুটেকুড়ানী পদ্মিনী ও বিষ্ণুহোড়ের ঘরে হরিহোড় নাম নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে। আর বসুন্ধরা জন্ম নেয় ঝড়ু দত্ত ও ধুমীর ঘরে সোহগী নাম নিয়ে। অন্নদার কৃপায় হরিহোড়ের অবস্থা রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যায়। অর্থ-বিত্তের প্রভাবে হরিহোড়ের 'বাহাত্তরে কায়স্থ' নামক বংশীয় অপবাদ দূর হয় এবং ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলীন বংশের তিন কন্যা বিয়ে করেন। অন্নদার ঘট ও ঝাঁপি তার গৃহে শর্ত সাপেক্ষে স্থান পায়।

দৈব প্রভাবে হরিহোড় বৃদ্ধ বয়সে দত্ত বংশের মুখরা কিশোরী সোহাগীকে চতুর্থ বিয়ে করেন। এ সোহাগী ও তার দাসী লকলকি মিলে হরিহোড়ের সুখের সংসারে আগুন জ্বালিয়ে তোলে। বাধ্য হয়ে দেবী অন্নদা বিকল্প উপায় হিসেবে কুবের পুত্র নলকুবের ও তার দুই স্ত্রী চন্দ্রিনী ও পদ্মিনীকে অভিশাপ দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন। নলকুবের ভবানন্দ নাম নিয়ে আন্দুলিয়া গ্রামের রাম সমাদ্দার ও সীতার ঘরে জন্ম নেন। আর চন্দ্রিনী–চন্দ্রমুখী এবং পদ্মিনী–পদ্মমুখী নাম নিয়ে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন। যথাকালে ভবানন্দ মজুমদারের সঙ্গে তাদের বিয়ে হয়। এ সময় দেবী অন্নদা হরিহোড়ের গৃহ থেকে তার মঙ্গল ঘট ও ঝাঁপি নিয়ে ভবানন্দ মজুমদারের গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। গাঙ্গিনীর নদীর ঘাটে ঈশ্বরী পাটুনীর নৌকায় পার হয়ে তাকে বরদান করে ভবানন্দের বাসভবনে উপস্থিত হন। ভক্ত ভবানন্দকে নানা বর, পূজা পদ্ধতি, অভয়বাণী ও ভবিষ্যৎবাণী শুনিয়ে দেবী বিদায় নেন। এ খণ্ডের উপকাহিনী হিসেবে ব্যাসদেবের কাহিনী ও হরিহোড়ের কাহিনী বিশেষ উদ্দেশ্যে পল্লবিত হয়েছে।

খ. বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল

দ্বিতীয় খণ্ডের বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে কবি একটি কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন। একটি ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বিচ্ছিন্ন উপাখ্যানকে এর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। বাংলা জয়ের জন্য মঘুল সম্রাট জাহাঙ্গীর রাজা মানসিংহকে পাঠান। কারণ যশোরের প্রতাপাদিত্য পিতৃব্য বসন্তরায় ও তার অন্যান্য পুত্রকে হত্যা করেন এবং কচু রায় কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে দিল্লীর দরবারে গিয়ে অভিযোগ করেন। এ কচু রায়কে সঙ্গে করে মানসিংহ বর্ধমানে উপস্থিত হলে কানুনগো ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহকে অভিনন্দন জানান। এ সময় মানসিংহ একটি মাটির সুড়ঙ্গ পথ দেখতে পান এবং এর ইতিহাস জানতে চাইলে ভবানন্দ এ বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বর্ণনা করে শোনান।

ভারতচন্দ্র যে বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর প্রবর্তন বা সংযোজন করেছেন, তা মূলত কাশ্মীরের সংস্কৃত পণ্ডিত বিলহন রচিত 'চৌরপঞ্চাশিকা' বা চৌরী সুরতপঞ্চাশিকা' (একাদশ খ্রি.) গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে। গুজরাটের রাজধানী অনহিলপত্তনের মহাপাঞ্চাল দেশের রাজার মেয়েকে শিক্ষা দানে জন্য পণ্ডিত বিলহনকে নিযুক্ত করা হয়। রাজার নাম মদনাভিরাম, রানী- মন্দারমালা, রাজকন্যা-যামিনীপূর্ণতিলকা। কালক্রমে গুরু ও শিষ্যার মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হয়। যদিও এর প্রতিরোধক ও প্রতিষেধক হিসেবে উভয়ের মাঝখানে পর্দা ছিল এবং বিলহনকে অন্ধ বলে এবং

রাজকন্যাকে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বলে জানানো হয়েছিল। তারপরও এ জ্ঞান সঞ্চার থেকে গর্ভাসঞ্চারের সূত্রপাত ঘটে। এ বিষয় জানাজানি হলে রাজা বিলহনকে হত্যার নির্দেশ দেন। তখন পণ্ডিতকবি ৫০টি কবিতা লিখে রাজাকে শোনান। এ কবিতায় মুগ্ধ হয়ে রাজা বিলহনকে মুক্তি দেন এবং রাজকন্যাকে তার হাতে তুলে দিয়ে রাজ্য থেকে বিদায় করে দেন। সেই থেকে এ ৫০টি কবিতার নামক 'চৌরপঞ্চাশিকা'।[৫৫]

এছাড়া কবি বররুচির 'বিদ্যাসুন্দুরম' অন্যান্য কবির রচিত- 'বিদ্যাসুন্দর চরিতম', 'বিদ্যাসুন্দর-চৌরপঞ্চাশিকা' ও 'বিদ্যাসুন্দরোপাখ্যানম' উল্লেখযোগ্য। এসব কাব্যের লেখক ও সময়কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও রাজকুমারীর সঙ্গে পণ্ডিত বা চোরবেশী পুরুষের গুপ্ত প্রেম ও রতিবিহারের বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু অষ্টাদশ শতাব্দী অবধি এ 'বিদ্যাসুন্দর' কাহিনী বাংলায় খুব জনপ্রিয় ছিল। এ সমাদৃত গ্রন্থকে আশ্রয় করেই কবি ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ডে এ অংশ সংযোজন করেছেন। তাঁর রচিত বিদ্যাসুন্দর কাহিনী নিম্নরূপ-

বর্ধমান রাজ্যের রাজা বীরসিংহ রায় এবং তার একমাত্র সন্তান পরম রূপসী ও বিদূষী কন্যা বিদ্যা। বিদ্যা প্রতিজ্ঞা করেছিল, যে রাজপুত্র তাকে বিদ্যা ও তর্কযুদ্ধে পরাজিত করতে পারবে তাকেই সে বিয়ে করবে। কিন্তু দেখা গেল শত শত যুবরাজ বিদ্যার কাছে তর্কে হেরে ব্যর্থ- মনোরথে ফিরে যায়। অথচ বিদ্যার বিয়ের কোন ব্যবস্থা হয় না। এতে রাজা বীরসিংহ রায় কন্যাকে পাত্রস্থ করা নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায় পড়ে যান।

অন্যদিকে বিদ্যার এ প্রতিজ্ঞার কথা দেশে-বিদেশে প্রচার হয়ে যাওয়াতে কাঞ্চী দেশের রাজা গুণসিন্ধু রায়ের সুদর্শন ও বিদ্বান পুত্র সুন্দর বিদ্যার মুখোমুখি হতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। রাজভাটের মুখে রাজকন্যা বিদ্যার রূপ-গুণের কথা শোনে সুন্দর খুঙ্গি-পুথি, শুক পাখি ও ঘোড়া সাজিয়ে বর্ধমানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। বর্ধমান নগরের দুর্গদ্বারের দারোয়ান তার পরিচয় জানতে চাইলে, সুন্দর নিজেকে বিদ্যা ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেন। কিন্তু দারোয়ান তা বিশ্বাস না করলে তাকে ঘোড়াসহ মূল্যবান বস্তু ঘুষ দিয়ে সুন্দর বর্ধমান রাজার নগরে প্রবেশ করেন। বর্ধমান নগরের পরিবেশ ও বিত্ত-বৈভব দেখে সুন্দর মুগ্ধ হন এবং বিশ্রামের জন্য সরোবরের নিকট এক বকুল গাছের তলায় আশ্রয় নেন। বিকেল বেলা রাজবাড়ির মালিনী হীরা ফুল তুলতে এসে যুবরাজ সুন্দরকে দেখে মুগ্ধ হন। হীরার পরিচয় পেয়ে বিদ্যার সান্নিধ্য লাভের আশায় সুন্দর হীরার গৃহে আশ্রয় নিতে রাজী হন। হীরার স্বভাব চরিত্র অনুমান করেই সুন্দর হীরাকে মাসী বলে সম্বোধন করেন। সুন্দরের টাকায় হীরা বাজার করে তাকে খাওয়ায় এবং অবসর সময়ে রাজবাড়ির গল্প করে। একদিন সুন্দর রাজকন্যাকে তার প্রতি প্রলুব্ধ করতে এবং তার বিদ্যার গভীরতা যাচাই করতে ফুল দিয়ে একটি কামমূর্তি ও একটি প্রেমপত্র হীরার কাছে পাঠিয়ে দেন। এসব দেখে যথারীতি রাজকন্যা সুন্দরকে দেখতে অস্থির হয়ে পড়ে এবং অভিসারের সংকেত স্থান বলে দেয়। সকল চর-ভয় ও লাজ-লজ্জা তোয়াক্কা না করে বিদ্যা ও সুন্দরের সাক্ষাত ঘটে। কিন্তু পরস্পরকে কাছে পাবার কোন পথ কেউ আবিষ্কার করতে পারে না। হীরা বিষয়টি রাজা ও রানীকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানোর প্রস্তাব দিলেও অজানা আশঙ্কায় উভয়ে তা নিষেধ করে।

সুন্দর এ পরিস্থিতিতে রাতে কালীপূজা করে কালী দেবীর ধ্যান করেন। দেবী এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাকে স্বর্গীয় সিঁদকাটি প্রদান করেন এবং মালিনীর ঘর হতে বিদ্যার শয়ন কক্ষ পর্যন্ত দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথ নির্মাণের বর দেন। দেবীর বরেই মূলত সুন্দর রাতারাতি এ সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করে বিদ্যার সঙ্গে সাক্ষাত করেন। তর্কের বিচারে সুন্দর বিদ্যাকে পরাজিত করলে রাজকন্যা সুন্দরের গলায় বরমাল্য পড়িয়ে দেয় এবং গান্ধর্ব মতে বিয়ে করেন। বিদ্যার শয়ন কক্ষে নানা হাসি-ঠাট্টা, গান-বাজনা ও ভোজনের পরে উভয়ের রতিলীলা শুরু হয়ে যায়। এরূপ ভাবে চলে নিয়মিত নৈশ বিহার ও দিবা বিহার। শুধু রাজকন্যার সখীগণ এ বিষয়টি জানতো। এছাড়া সকলের অগোচরে চলে বিদ্যা-সুন্দরের পরস্পরের গৃহে যাতায়াত ও বিহার। সুন্দরের ইচ্ছায় ও আহ্বানে রাজকন্যা বিদ্যা বিপরীত বিহার

করতেও বাধ্য হয়। এ সময় উভয়েই হাস্য-পরিহাস, সুখ-উল্লাস-উত্তেজনায় দিনাপাত করতে থাকে। তারা উভয়ের শুক ও সারি পাখির মধ্যে বিয়ে দেয়। এমন দৈহিক সংসর্গের আতিশয্যের অনিবার্য ফলরূপে এক সময় বিদ্যা গর্ভবতী হয়ে পড়ে। এ খবর ও অবস্থা দেখে সখীগণ ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কায় রানীর কাছে বলে দেয়াতে তা রাজার কানে পৌছায়।

অন্যদিকে রাজপুত্র সুন্দর রাতে বিহার করতেন এবং দিনে রাজ দরবারে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে এসে নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করতেন। কিন্তু বিদ্যার গর্ভ সঞ্চারের খবর প্রকাশ পেল রাজকন্যার জীবনে বিপর্যয় নেমে আসে। রাজকন্যার এ পাপকর্মের দায় গিয়ে পড়ে কতোয়াল ধূমকেতুর ওপরে। কতোয়াল তার দশ ভাই নিয়ে এর উৎস সন্ধান করতে গিয়ে বিদ্যার কক্ষে খাটের নিচে দীর্ঘ সুড়ঙ্গ পথের আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। দশ ভাই বুদ্ধি করে নারীর ছদ্মবেশে রাতে রাজকন্যার কক্ষে অবস্থান করে এবং যথাসময়ে সুন্দর কক্ষে প্রবেশ করা মাত্রই বন্দী হন। বন্দী সুন্দরকে রাজ দরবারে হাজির করা হলে সবাই তার রূপ-চেহারা দেখে অনুতাপ করেন এবং তাকে রাজপুত্র বা বিত্তশালী বংশের সন্তান বলে অনুমান করেন।

রাজা বীরসিংহ রায় অনেক চেষ্ট করেও সুন্দরের পরিচয় জানতে ব্যর্থ হন। সুন্দর নানা কৌশলে তার প্রকৃত পরিচয় এড়িয়ে যান। এতে বীরসিংহ ক্ষুব্ধ হয়ে তাকে বধ করতে মশানে পাঠিয়ে দেন। এ অপকর্মের দোসর ও আশ্রয়-প্রশ্রয় দানকারী হিসেবে হীরামালিনীকেও নানাভাবে অপদস্থ করে রাজ্য থেকে বিতারিত করা হয়। এদিকে সুন্দরের শুক পাখি রাজার কাছে তার পরিচয় প্রদান করে। আবার অন্যদিকে সুন্দর মশানে বসে কালী দেবীর স্তব পাঠ করলে দেবী ভক্তের বিপদে নিজস্ব বাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়ে সকল সৈনিকদের বন্দী করে ফেলেন। এ অবস্থা দেখে রাজা বীরসিংহ লজ্জা ও অনুতপ্ত হন। অবশেষে তিনিও কালী দেবীর স্তব করেন এবং সুন্দরের হাতে রাজকন্যা বিদ্যকে তুলে দেন।

শ্বশুরালয়ে অবস্থান কালেই বিদ্যা-সুন্দরের কোল জুড়ে এক পুত্রের জন্ম হয়। যথা সময়ে সুন্দর স্ত্রী ও পুত্রকে নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যান। কিছুকাল সুখে ঘর-সংসার করার পর দেবী কালীর মায়ায় বিদ্যা ও সুন্দর দিব্যজ্ঞান ফিরে পেয়ে পুত্রের হাতে রাজ্যভার দিয়ে স্বর্গে ফিরে যান। এখানেই বিদ্যা সুন্দর পালার পরিসমাপ্তি ঘটে।

এ বিদ্যাসুন্দর কাহিনী প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে ড. সুকুমার সেন বলেছেন- 'পুরুষ খোঁজে বিদ্যার আর নারী চায় সুন্দর পতি—এই রূপকের উপর বিদ্যাসুন্দর কাহিনীর ভিত্তি। বর্তমান সহস্রাব্দের প্রারম্ভের তিন-চারি শতাব্দী হইতে এই কাহিনীর বিভিন্ন রূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। একটি কাহিনীর মূলে ছিল বিদ্যাশিক্ষা অথবা পাণ্ডিত্য-বিচার উপলক্ষ্যে কবিপণ্ডিত গুরুর ও কলাবিৎ রাজদুহিতা ছাত্রীর মধ্যে প্রণয় ঘটনা। আর একটি কাহিনী ছিল চতুর (< প্রাকৃত চাউর < বাংলা চোর) কবি প্রণয়ীর সঙ্গে রাজবালা প্রণয়িনীর গোপন মিলন। বাঙ্গালায় প্রচলিত বিদ্যাসুন্দর আখ্যায়িকায় বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় কাহিনীটিই স্থান পাইয়াছে। প্রথম ইঙ্গিত রহিয়া গিয়াছে সুন্দরের পড়ুয়া ছদ্মবেশ ধারণে এবং রাজ অন্তঃপুরের গোপন কক্ষে বিদ্যা-সুন্দরের প্রহেলিকা বিচারে।'[৫৬]

এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেন চতুর্দশ শতাব্দীর শেষার্ধে জৈন কবি রাজশেখর সুরীর লেখা আর একটি প্রণয় কাহিনী উল্লেখ করেছেন। উজ্জয়িনী নগরের বিখ্যাত জৈন সাধু বিশালকীর্তির খ্যাতিমান পণ্ডিত শিষ্য ছিলেন মদনকীর্তি। ঘটনাক্রমে তিনি কর্ণাটদেশে পৌছে কুন্তীভোজ রাজার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। রাজা তার পূর্বপুরুষদের নিয়ে প্রশংসা বাক্য লিখতে বলায় মদনকীর্তির শ্রুতি লেখক হিসেবে রাজকন্যা মদন মঞ্জরীকে নিয়োগ করা হয়। উভয়ের মাঝে পর্দার ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও কালক্রমে তা বিদ্যাসুন্দরের মতো অবস্থায় গিয়ে উপনীত হয়।[৫৭]

গ. মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান বা অন্নপূর্ণামঙ্গল

এ তৃতীয় খণ্ডই ছিল ভারতচন্দ্রের বর্ণনার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কারণ এ ভবানন্দ মজুমদার ছিলেন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবংশের পূর্বপুরুষ। বর্ধমানে মানসিংহ ভবানন্দের কাছে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী শোনেন এবং তারপর ভবানন্দের বাড়ি বাগোয়ানের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। দেবী অন্নদা নিজ মাহাত্ম্য প্রকাশ করতেই মূলত সখী-জয়া-বিজয়ার পরামর্শ মতেই ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রপাত শুরু করেন। এ ঝড়বৃষ্টিতে মানসিংহের সৈন্য, হাতি-ঘোড়া ও রসদ বিনষ্ট হয়। ভবানন্দের সহায়তায় ও দেবী অন্নদার কৃপায় রাজা মানসিংহ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করে যশোরের দিকে অগ্রসর হন প্রতাপাদিত্যকে দমন করতে। দেবীর কৃপায় যুদ্ধে মানসিংহের বিজয় হয় এবং বন্দী প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে মানসিংহ দিল্লীর অভিমুখে যাত্রা করেন। ভবানন্দ মজুমদারকে রাজ্য পাইয়ে দেবার আশ্বাস দিয়ে মানসিংহ সঙ্গে করে নিয়ে যান। পথিমধ্যে প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু হলে তাকে ঘি দিয়ে ভেজে দিল্লীতে নিয়ে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থাপন করা হয়। বাংলার খবর শোনে এবং ভবানন্দের সাহায্য, তথা দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্যের কথা শোনে সম্রাট খুশি হতে পারলেন না। বরং ভবানন্দকে হিন্দু ধর্ম, পূজাযজ্ঞ ও দেব-দেবীর সম্পর্কে নানা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। ভবানন্দও ছাড়বার পাত্র নন, তিনিও মুসলিম ধর্ম, নামাজ-রোজা ও আল্লাহ সম্পর্কে অশালীন ও ব্যঙ্গ বাণ নিক্ষেপ করেন। ব্রাহ্মণ ভবানন্দের ওপর ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে সম্রাট তাকে কারাগারে বন্দী করে রাখেন। জাতি-বিদ্বেষ ও ঘৃণা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে।

ভবানন্দের এ দুর্গতি দেখে সঙ্গে আসা দাসু-বাসু দুই ভাই দিল্লীতে গা ঢাকা দিতে বাধ্য হয়। কারাগারের নানা নিগ্রহে ভবানন্দ দেবী অন্নপূর্ণার স্তুতি বন্দনা করেন। দেবী ভবানন্দকে অভয় দান করেন এবং দিল্লীতে ভূত-প্রেতের আক্রমণ শুরু করেন। দিল্লীর জন জীবনের মহা বিপর্যয় নেমে আসলে সভাসদদের পরামর্শে সম্রাট জাহাঙ্গীর দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য স্বীকার করে পূজা করেন। এছাড়া ভবানন্দকে মুক্ত করায় দিল্লী শহর দেবীর আক্রোশ থেকে রক্ষা পায়। পরে ভবানন্দকে নানাভাবে প্রশংসা, স্তুতিবাক্য, উপহার ও রাজ্যের ফরমান দিয়ে সন্তুষ্ট করে বিদায় দেন। দিল্লী থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন পথে দাসু-বাসু এসে মিলিত হয় এবং ভবানন্দ প্রয়াগ, কাশী, অযোধ্যাসহ পবিত্র তীর্থস্থানগুলো দর্শন করে নিজ বাড়ি এসে পৌছান। দাসু-বাসুকে নানাভাবে পুরস্কৃত করা হয়। রাজ্য লাভে বাদশাহী ফরমান পাওয়াতে ভবানন্দের বাড়িতে খুশির বন্যা বইতে থাকে। রাত্রি যাপন করতে গিয়ে ভবানন্দ সংকটে পড়েন। কারণ দুই স্ত্রী চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখী নিজ নিজ দাসী সাধী-মাধীর প্ররোচনায় সাজ-সজ্জা করে স্বামীকে আকৃষ্ট করার প্রতিযোগিতায় নামে এবং কলহ-কন্দলে জড়িয়ে পড়ে।

এ অবস্থায় ভবানন্দ নিজ বুদ্ধি ও চাতুর্য বলে দুই স্ত্রীকেই কথায় প্রবোধ দিয়ে মনোবাসনা পূরণে সক্ষম হন। বড় স্ত্রী চন্দ্রমুখীর ঘরে তিন পুত্র- গোপাল, গোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয়। ধনে-জনে, বিত্ত-বৈভবে, প্রভাব-প্রতাপে, সম্মান ও সৌভাগ্যে ভবানন্দের সংসার ভরে ওঠে। এরপর ভবানন্দ চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে মহাধুমধামের সঙ্গে দেবী অন্নদা বা অন্নপূর্ণার পূজা সম্পন্ন করেন। দেবীর কৃপায় ভবানন্দ ও দুই স্ত্রী দিব্যজ্ঞান ফিরে পান এবং অভিশাপ কাল শেষে স্বর্গে ফেরার আয়োজন করেন। দেবীর ভবিষ্যৎ বাণীতে আশ্বস্ত হয়ে পুত্রদের হাতে রাজ্য ভার দিয়ে দুই স্ত্রীসহ ভবানন্দ মজুমদার স্বর্গে ফিরে যান। এখানেই তৃতীয় খণ্ড তথা গ্রন্থের পরিসমাপ্তি ঘটে।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের ঐতিহাসিকতা বিচার

ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের (১৭৫২-১৭৫৩খ্রি.) সূচনায় কাহিনীর প্রয়োজনে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা ও চরিত্রের উল্লেখ করেছেন, তার সঙ্গে প্রকৃত ইতিহাসের অনক বিষয়েই মতবিরোধ ও সংঘর্ষ দেখা দেয়। শুরুতেই তিনি বলেছেন যে, বাংলার মুসলমান যবন সৈনিকদের হাতে পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দির আক্রান্ত হলে দেবতা শিবের স্বপ্নাদেশে বর্গীরাজ ভাস্কর পণ্ডিতের আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে বাংলা তছনছ হয়ে যায় এবং রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। নবাব আলীবর্দী খান বা মহাবৎ জঙ্গ (১৭৪০-১৭৫৬ খ্রি.) তখন অন্যান্য সামন্ত রাজাদের মতো নবদ্বীপের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট ১২ লক্ষ টাকা নজরানা দাবি করেন। কৃষ্ণচন্দ্র এ নজরানা দিতে অস্বীকার করলে বা অপারগ হলে তাঁকে আর্লীবর্দী খান মুর্শিদাবাদে বন্দী করেন এবং পরে অন্নদা দেবীর কৃপায় মুক্তি পান।

কিন্তু ইতিহাস থেকে যা জানা যায়, তা হলো-নবাব আলীবর্দীর সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের সম্পর্ক মোটেও খারাপ ছিল না। বরং নবাব থাকে 'ধর্মচন্দ্র' উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেন। বরং কৃষ্ণচন্দ্রই পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রি.) বিশ্বাসঘাতকাত করেন এবং ইংরেজদের সঙ্গে আতাত ও সহযোগিতার মনোভাব বজায় রাখার কারণেই মূলত নবাব মীর কাসিম (১৭৬০-১৭৬৩ খ্রি.) তাকে বন্দী করে মুঙ্গের দুর্গে রাখেন। সেখান থেকে অন্নদাদেবীর কৃপায় নয়, বরং ইংরেজদের সহযোগিতায় মুক্ত হন। আর আলীবর্দীর শাসনামলে বর্গীর আক্রমণ ছিল মাত্র ৯ বছরকাল ব্যাপী (১৭৪২-১৭৫১ খ্রি.)। বর্গীর আক্রমণ বাংলার জন্য ত্রাসের রাজত্ব কায়েমের যে কথা শোনা যায়, তা সর্বাংশের জন্য প্রযোজ্য নয়। কারণ বর্গীদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়েছিল মূলত মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান ও কলকাতা। আর আলীবর্দী খানও প্রাণপণ চেষ্টায় বর্গীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৫১ খ্রি. তিনি সন্ধির শর্ত অনুযায়ী বর্গীদের হাতে ওড়িশা ছেড়ে দেন এবং প্রতি বছর ১২ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার করেন।[৫৮]

তাই দেখা যায়, বর্গীদেরই সন্ধি বাবদ বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা আলীবর্দীর নিকট পাওনা ছিল। আর ভাস্কার পণ্ডিত দেবতা শিবের নির্দেশে নয়, বরং রেবারের মারাঠাধিপতি রঘুজী ভোঁসলের নির্দেশেই সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণেই চৌথ আদায়ের উদ্দেশ্যেই বাংলা আক্রমণ করেন। এর সঙ্গে পুরী ও ভুবনেশ্বরের মন্দির আক্রমণের কোন ঘটনা জড়িত নয়। এরপরের বিষয়টি হলো মুঘল সুবাদার রাজা মানসিংহ কর্তৃক যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে দমনের ঘটনা। ভারতচন্দ্র উল্লেখ করেছেন যে, রাজা প্রতাপাদিত্য যশোরে দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং মুঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীরকে (১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.) অগ্রাহ্য করতে শুর করেন। এছাড়া তিনি পিতৃব্য বসন্ত রায়কেসহ তার সন্তানদের অন্যায়ভাবে হত্যা করেন। একমাত্র জীবিত পুত্র কচু রায় পালিয়ে দিল্লী গিয়ে বাদশাহর কাছে নালিশ করেন। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশেই রাজা মানসিংহ কচু রায়কে নিয়ে প্রতাপাদিত্যকে দমনের উদ্দেশ্যে বর্ধমানে উপস্থিত হল। এখানে মানসিংহকে বাগোয়ানের কানুনগো ভবানন্দ মজুমদার অভিন্দন জানান।

ঝড় বৃষ্টিসহ নানা দুর্যোগ ভবানন্দ মানসিংহকে সাহায্য করেন এবং দেবী অন্নদার কৃপায় প্রতাপকে পরাজিত করে খাঁচায় বন্দী অবস্থায় দিল্লী যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অভুক্ত অবস্থায় প্রতাপের মৃত্যু হলে তার মৃতদেহ ঘি দিয়ে ভেজে বাদশাহর কাছে উপস্থাপন করা হয় এবং তার নির্দেশে যমুনা নদীতে মৃতদেহ ভাসিয়ে দেয়া হয় – এমন ঘটনা বাস্তব ইতিহাসের সঙ্গে নানা বিষয়ে সাংঘর্ষিক। কারণ-ইতিহাসে রাজা প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে যতটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা হলো- মুঘল শাসন বিরোধী বাংলার বারো ভূঁইয়াদের মধ্যে প্রতাপ ছিলেন অন্যতম। এই প্রতাপের পিতা শ্রীহরি (বিক্রমাদিত্য) ও পিতৃব্য জানকী বল্লভ (বসন্ত রায়) সুলায়মান কররানীর (১৫৬৫-১৫৭২ খ্রি.)

অধীনে চাকরি করতেন। প্রতাপের আসল নাম গোপীনাথ। তবে তিনি শৈশবকাল থেকেই ‘প্রতাপাদিত্য’ নামে সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। রাজা চাঁদ রায়ের মৃত্যু হলে সুন্দরবনের জমিদারী প্রতাপের পিতা শ্রীহরি লাভ করেন। রাজা টোডরমলকে ভূমি জরিপে সহায়তা করায় শ্রীহরিকে যশোরের জমিদারী পুরস্কার দেয়া হয়। মৃত্যুর সময় শ্রীহরি জমিদারির দশ আনা অংশ পুত্র প্রতাপকে এবং ছয় আনা অংশ ভ্রাতা বসন্ত রায়কে প্রদান করে যান।

এ জমিদারির মালিকানা নিয়েই মূলত প্রতাপের সঙ্গে বসন্ত রায়ের বিবাদ শুরু হয়। সম্ভবত প্রতাপ ১৫৯৭ খ্রি. যশোরের রাজা হন। উচ্চাভিলাষী প্রতাপ নিজে শক্তি বৃদ্ধির জন্য বাখরাগঞ্জের রাজা রামচন্দ্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেন। এ সময় বসন্ত রায়ের বাৎসরিক পিতৃ শ্রাদ্ধের দিনে ব্যস্ত সময়ে প্রতাপ নিরস্ত্র পিতৃব্য বসন্ত রায়কে এবং তার আরো দুই পুত্রকে হত্যা করেন। এমনকি রাজ্যবিস্তারের জন্য জামাতা রামচন্দ্রকেও হত্যার পরিকল্পনা করেন। তবে নিজ পুত্র ও কন্যার কৌশলে জামাতা রক্ষা পান।

অন্যদিকে বসন্ত রায়ের জীবিত একমাত্র পুত্র কচু রায় (রাঘব) কোনক্রমে পালিয়ে রক্ষায় পান এবং দিল্লীর দরবারে গিয়ে নালিশ করেন। মুঘল সম্রাট প্রতাপকে দমন করতে সুবাদার ইসলাম খাঁ চিশতীকে প্রেরণ করেন। যুদ্ধে প্রতাপের পরাজয় ঘটে এবং তাকে বন্দী করে ঢাকায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই লোক চক্ষুর অন্তরালে মুঘল কারাগারে তাঁর শোচনীয় মৃত্যু (১৬১১খ্রি.) হয় বলে ধারণা করা হয়। তবে তার মৃত্যুর যে জনশ্রুতি পাওয়া যায়- লোহার খাঁচায় ভরে দিল্লী নেয়ার পথেই কাশী বা বারণাসীর কাছে তিনি বিষ পানে আত্মহত্যা করেন, এ বিষয়ে ইতিহাসে সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে না।

স্যার যদুনাথ সরকারের ‘History of Bengal’ (২য় খণ্ড) গ্রন্থের বরাত দিয়ে বলা যায়- সম্রাট আকবরের শাসনামলে (১৫৫৫-১৬০৫ খ্রি.) রাজা মানসিংহ বাংলার সুবাদার হয়ে আসেন। মানসিংহের সুবাদারি শাসন কাল হলো ১৫৯৪ খ্রি. ৪ মে. থেকে ১৬০৬ খ্রি. ১ সেপ্টেম্বর। সুবাদার মানসিংহের কাছ থেকেই পাঠান সামন্ত ওসমান উড়িষ্যা পুনর্দখল করে নেন।

এছাড়া তখন বাংলার বারো ভূঁইয়াগণ বিদ্রোহ করে বসলে এবং রাজস্ব প্রদানে অস্বীকৃতি জানালে দিল্লী থেকে মানসিংহকে ডেকে পাঠানো হয় এবং তদস্থলে ইসলাম খাঁ চিশতীকে বাংলার সুবাদার (১৬০৭ খ্রি.) হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এ সময় ইসলাম খাঁর নৌ-সেনাপতি ছিলেন মির্জা নাথন। তিনি তাঁর ‘বাহ্‌রীস্তান-ই গায়েবী’ গ্রন্থে প্রতাপ সম্পর্কে বলেছেন– প্রতিশ্রুতি ও শর্ত ভঙ্গের কারণে প্রতাপের বিরুদ্ধে ইসলাম খাঁ অসন্তুষ্ট হন। ১৬১১ খ্রি. ওসমানের বিরুদ্ধে পরিচালিত যুদ্ধে প্রতাপ ইসলাম খাকে পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে সাহায্য করা থেকে বিরত থাকেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে ইসলাম খাঁ প্রতাপের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং যুদ্ধে পরাজিত করে তাকে রাজধানী ঢাকায় নিয়ে আসেন। এখানেই তার করুণ মৃত্যু (১৬১১ খ্রি.) ঘটে।

সুতরাং দেখা যায়, প্রতাপের করুণ পরিণতি বা ভাগ্য বিপর্যয়ের সঙ্গে ইসলাম খা জড়িত; কোন ভাবেই মানসিংহ নন। তাই মানসিংহের সঙ্গে কানুনগো ভবানন্দের সাক্ষাত ও সাহায্যের বিষয়টি ইতিহাস সম্মত নয়। তবে ভবানন্দ মজুমদার এসব ঘটনার সমসাময়িক কালেও যে জীবিত ছিলেন শুধু এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়। হয়তো ভারতচন্দ্র মানসিংহের সমকালীন জনপ্রিয়তার কিংবদন্তিকে কাজে লাগিয়েছেন, নতুবা জনশ্রুতির ওপর নির্ভর করেছেন। যেহেতু ভারতচন্দ্রের উদ্দেশ্যই ছিল কৃষ্ণচন্দ্রের রাজবংশীয় পূর্বপুরুষদের মাহাত্ম্য ও গৌরব গাথা প্রচার-প্রকাশ করা, সেহেতু তাঁর পক্ষে এসবের আশ্রয় নেয়া মোটেও অস্বাভাবিক ছিল না। আর আমাদেরও স্মরণ বা বিবেচনায় রাখতে হবে যে, ভারতচন্দ্র কাব্য রচনা করেছেন —— ইতিহাস নয়।

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঙালির অর্থনৈতিক জীবন

বাংলার অর্থনীতির প্রাণ ছিল কৃষি। কৃষি প্রধান দেশ হওয়ায় বাংলার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি কৃষির ওপর অনেকাংশেই নির্ভর করতো। এ ছাড়া কৃষিজাত শিল্প ও ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়েই মূলত বাংলার অর্থনীতি যুগ যুগ ধরে গড়ে ওঠেছে। বাংলার অর্থনীতির চালিকাশক্তি ছিল মূলত গ্রাম। কারণ গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির ওপরই বাংলার অর্থনীতির স্থায়িত্ব নির্ভর করতো। গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং তার উৎপন্ন দ্রব্যের বণ্টন ব্যবস্থাও গ্রামে সম্পন্ন হতো। যার ফলে গ্রামকে কেন্দ্র করেই মূলত গড়ে উঠতো হাট-বাজার ও গঞ্জ।

এ যুগে কৃষি ছাড়াও নানা রকম হস্তশিল্প, কল-কারখানা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এর ফলে আত্মপ্রকাশ ঘটে এক নতুন শ্রমজীবী শ্রেণি ও মালিক গোষ্ঠী। নতুন জন্ম নেয়া এ শ্রেণি বণিক ও মহাজন সম্প্রদায় হিসেবেও পরিচিতি লাভ করে। এ বণিকদের আগ্রহ ও উৎসাহেই মূলত নদীর তীরে গড়ে ওঠতে থাকে বড় বড় বাণিজ্য কেন্দ্র তথা নদীবন্দর ও সমুদ্র বন্দর। এ বাণিজ্য বন্দরগুলোকে কেন্দ্র করেই বাংলার অর্থনীতি গতি লাভ করে এবং দেশ-বিদেশে প্রসার ঘটে।

কৃষি

নবাবী শাসন আমলে (১৭১৭-১৭৫৭ খ্রি.) সুবা বাংলায় যদিও দেশীয় বণিক-মহাজন শ্রেণি ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে দ্রুত অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে যেতো, তথাপি কৃষি অবহেলিত ছিল না। কারণ তখনোও বাংলার সিংহভাগ লোকই কৃষিকে আশ্রয় করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতো। বরং সমকালে বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর বাংলায় মহাশক্তি নিয়ে উত্থান, ঘুষ-দুর্নীতি ও নানা অপকর্মে দেশীয় বণিকদের বিপর্যয় দেখা দিলে জনসাধারণ আরো বেশি মাত্রায় কৃষির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' তাই নেশাখোর-ভিক্ষুক ও দরিদ্র শিবকে দেবী অন্নদা কৃষি কাজ করার পরামর্শ দিয়েছেন–

'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস   তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত   সকলের এই মত
ভিক্ষা মাগ নৈবচ নৈবচ ॥' (পৃ- ৬০)

এছাড়া তৎকালীন সমাজে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে কৈবর্ত, কায়স্থরাও কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল। বর্ধমান নগরের সমাজ ব্যবস্থাতেও এর প্রমাণ মেলে–

'আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাষাধোবা চাসাকৈবর্ত্ত অনেক ॥' (পৃ-১৭১)

ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা

তৎকালীন সুবা বাংলা বেশ কয়েকটি পরগনা, মহাল বা মুলুকে বিভক্ত ছিল। নবাবগণ এ সুবা বাংলার ভূমিকে বিভিন্ন রাজস্ব-কর বা খাজানা প্রদানের শর্তে তা সামন্ত রাজা, জমিদার বা ভূস্বামীদের প্রদান করতেন। এ ভূমি বণ্টন ব্যবস্থায় দলিল বা সনদের ব্যবহার ছিল এবং ভূমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত প্রশাসনিক কাঠামো বা কর্মকর্তা ও কর্মচারী গড়ে তোলা হয়েছিল।

সনদ প্রথা

'ফরমান মতো সব সনদ লিখিয়া।
মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥
পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥' (পৃ- ৩৩৮)

পরগণা

'অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা।
খাড়ি জুড়ী আদি করি দপ্তরে গণনা ॥' (পৃ- ১৩)

জায়গীর ব্যবস্থা

'মজুন্দার রাজাই পাইলা ফরমান।
খেলাত কাটার ঘড়ি নাগারা নিশান ॥' (পৃ-৩২০)

অথবা,

'ফরমানী মহারাজ মনসব্দার।
সাহেব নহবৎ আর কানগোই ভার ॥
কোঠায় কাঙ্গুরা ঘড়ী নিশান নহবৎ।
পাতশাহী শিরপা মুলতানী সুলতানৎ ॥' (পৃ-১৩)

জমি বা ভূমিতে অধিকার গ্রহণ

'ঢাকায় নবাব তথা পাঠায়ে উকিল।
ডঙ্কা দিয়া বাগুয়ানে হইলা দাখিল ॥ (পৃ-৩২৮)

রাজস্ব-কর-খাজনা

নবাবী আমলেও ভূমি সংক্রান্ত রাজস্ব, কর বা খাজনাই ছিল সামন্ত শাসকদের আয়ের প্রধান উৎস। সাধারণত উৎপাদিত ফসলের ধরন অনুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত রাজস্ব ধার্য করা হতো। রাজস্ব শস্য বা নগদ টাকায় পরিশোধ করা যেতো। তৎকালীন রাজস্ব ব্যবস্থায় শ্রম খাজনা, দ্রব্য খাজনা ও মুদ্রা খাজনা পরিলক্ষিত হয়।

ক. নজরানা

'মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায় ॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়ালা হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ ॥' (পৃ-১১)

খ. সেলামী

'দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার ॥' (পৃ- ৩৩৮)

গ. পুণ্যাহ

'হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ॥' (পৃ- ৩৩৮)

রাজস্ব কর্মচারী

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সুবা বাংলার ভূমি ও রাজস্ব বিভাগের কাজকে তরান্বিত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে একটি প্রশাসন কাঠামো গড়ে তোলা হয়। এদের মধ্যে ছিলেন- মজুমদার, কানুনগো, আমীন, পেশকার, পোদ্দার, ডিহিদার, পাটোয়ারি, চৌধুরী, গ্রামীণ, মণ্ডল ও মাতব্বর প্রমুখ।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' রাজস্ব ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত এসব কর্মচারীর উল্লেখ পাওয়ায় যায়–

ক. আমীন ও পেশকার

'আমীন রাঢ়ীয় দ্বিজ নীলকণ্ঠ রায়।
দুই পুত্র তাহার তাহার তুল্য কায় ॥
দেয়ানের পেশকার বসু বিশ্বনাথ।
আমীনের পেশকার কৃষ্ণসেন সাথ ॥ (পৃ- ১৩)

খ. কানুনগো

'দেবী দয়া অনুসারে ভবানন্দ মজুন্দারে
হইয়াছে কানগোই (কানুনগো) ভার।' (পৃ-১৩১)

গ. পোদ্দার

'পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান ॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥' (পৃ-২৬২)

ঘ. গোমস্তা মণ্ডল

'পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥' (পৃ-৩৩৮)

শস্য

নদীমাতৃক বাংলায় প্রচুর পরিমাণে খাদ্যশস্য ও অর্থকরী শস্য উৎপাদিত হতো। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ধান, পাট, আখ, তুলা, তেলবীজ (সরিষা, তিল, তিশি) নীল, রেশম, ডালবীজ (মসুরি, খেসারি, মুগ, কলই, ছোলা), গম, যব, আদা, মরিচ, পান, সুপারি, তামাক ও বিভিন্ন প্রকারের ফল-মূল, শাক-সবজি অন্যতম।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' এসব খাদ্যদ্রব্যের উল্লেখ পাওয়া যায়–

খাদ্যশস্য

'ধান চালু মাষ মুগ ছোলা অরহর।
মসুরাদি বরবটী বাটুলা মটর ॥
দেধান মড়ুয়া কোদো চিনা ভুরা যব।
জনাব প্রভৃতি গম আদি আর সব ॥
মৎস্য মাংস কাঁচা পাকা নানা গুড় দ্রব্য।
ঘাস-পাত ফুল ফল যতমত গব্য ॥' (পৃ-৩১৪-৩১৫)

শ্রমবাজার

তৎকালীন বাংলায় কৃষি ও উৎপাদন শিল্পের শ্রম বাজারের বিচিত্র ধরনের শ্রম ও শ্রমিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এসবের মধ্যে শ্রমদাস, রাখাল, কামলা, দিনমজুর, শ্রমিক বা করিগর, যৌথ শ্রম, গৃহভৃত্য ও বেগার শ্রমিক

অন্যতম। মজুরি হিসেবে দৈনিক, মাসিক, বাৎসরিক, চুক্তিভিত্তিক বেতন বা মাহিনা প্রদান করা হতো। সৈনিকদের সাধারণত বেতনের বিকল্প হিসবে জায়গীর প্রদান করা হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত এসব বেগার শ্রম, যৌথ শ্রম, দিন মজুরী শ্রমের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক. বেগার শ্রম

'সভয় অন্তর নহ স্বতন্তর
ভয়েতে সবারে মান।
নানা গুণ জানি যারে তারে মানি
বেগার খাটিতে জান ॥
,,,
তোর গুণধর যত কারিকর
হইবে দুঃখী বেগার ॥' (পৃ-১২২)

খ. যৌথ শ্রম

'কাট ঘুঁটে কুড়াইয়া রাখিয়াছি সাজাইয়া
অরে বাছা না পারি বহিতে
মঙ্গল হইবে তোর অতিদূরে ঘর মোর
ঘুঁটেগুলি যদি দেহ বয়ে।।
অর্দ্ধেক আমার হবে অর্দ্ধেক আপনি লবে
দয়া করি চল মোরে লয়ে ॥' (পৃ-১৪২)

শিল্প

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা ভূখণ্ড বিভিন্ন প্রকার শিল্পে উৎকর্ষ লাভ করে। এসব শিল্পকে ধারণ করেই বাংলার সমাজে বিভিন্ন পেশাজীবী বা বৃত্তিজীবী শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এসব শিল্পের মধ্যে বস্ত্রশিল্প বা তাঁত শিল্প, লৌহশিল্প, স্বর্ণ-রৌপ্য শিল্প, তামা-কাঁসা শিল্প, শঙ্খ শিল্প, মৃৎ শিল্প, কাঠ-বাঁশ-বেত শিল্প, পট-আল্পনা শিল্প এবং স্থাপত্য শিল্প অন্যতম। বাংলার মসলিন কাপড় এক সময় সারা বিশ্বের দরবারে ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব হস্ত বা কুটির শিল্প ও বড় কল-কারখানার উল্লেখ পাওয়া যায় বর্ধমান নগরকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায়–

ক. কল-কারখানা

'চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার ॥' (পৃ-১৭০)

খ. কারুশিল্প

'ভাবে রায় মালায় কি হবে কারিকরি।
অন্যের অদৃষ্ট কিছু কারিকরি করি ॥
পাত্র কৌটা মত কৌটা কৈল কেয়াফুলে।
সাজাইল থরে থরে মল্লিকা বকুলে ॥

তার মাঝে গড়িল ফুলের ফুলধনু।
তার পাশে গড়ে রতি ফুলময় তনু ॥

,,,

ফুল ধনু ফুল গুণ ফুলময় বাণ।
দুই হাতে দিল তার পূরিয়া সন্ধান ॥
থুইল কৌটায় কল করিয়া এমনি। (পৃ-১৮৭)

ব্যবসায়-বাণিজ্য

মধ্যযুগ থেকেই এ সুবা বাংলা ব্যবসায়-বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সম্পদের প্রাচুর্য ও সহজলভ্যতাই ছিল বাংলায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের অন্যতম কারণ। এ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধিই বাংলাকে পৃথিবীর 'ভূ-স্বর্গ' বা 'সোনার বাংলায়' পরিণত করেছিল। এশিয়া-আরব, ইউরোপ ও আফ্রিকা থেকে অসংখ্য মানুষ ও ব্যবসায়ীগণ বাংলায় আগমন করতেন ভাগ্য পরিবর্তনের প্রত্যাশায়। বাংলার বিখ্যাত স্থল ও সমুদ্র বন্দরগুলোর অন্যতম হলো- সপ্তগ্রাম, হুগলি, কলকাতা, বেনারস, বর্ধমান, সোনারগাঁও, চাটগাঁ বা চট্টগ্রাম প্রভৃতি। স্থল ও জলপথের এসব বন্দর নগরে পণ্যদ্রব্য নিয়ে ব্যবসায়ী-মহাজনগণের সমাগম ঘটতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বর্ধমান রাজ্যের নাগরিক জীবন ব্যবস্থায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের কর্মতৎপরতা দেখা যায়–

বণিক সমাজ

নবাবী আমলে বাংলার বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশীয় বণিক, মহাজন, ব্যাপারী ও অভিজাত শ্রেণির কেউ কেউ সম্পৃক্ত হতেন। এছাড়া বিদেশি বণিকরাও দেশি বণিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দিয়ে ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হতেন। এ সময় বাংলায় বিখ্যাত শেঠ পরিবার ছাড়াও বহু বণিক-মহাজন শ্রেণির উদ্ভব ঘটে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' এসব দেশি-বিদেশি বণিক সমাজ ও মহাজন শ্রেণির উল্লেখ পাওয়া যায়–

'প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥

,,,

ষষ্ঠ গড়ে দেখ যত বোঁদেলার থানা।
আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাক মালখানা ॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙখ্যা করে ধন ॥' (পৃ-১৬৮)

হাট-বাজার ও বন্দর-গঞ্জ

নবাবী আমলে সুবা বাংলার প্রাদেশিক রাজধানী ও নদী তীরবর্তী এলাকায় হাট-বাজার ও বন্দর গড়ে ওঠে। এ সবের মধ্যে- সপ্তগ্রাম, হুগলি, কলকাতা, মাদ্রাজ, বেনারস, সোনার গাঁ, চট্টগ্রাম, ঢাকা, পাবনা, নোয়াখালি, বরিশাল, মুর্শিদাবাদ, উড়িষ্যা, মগমুলুক তথা বার্মা ও বর্ধমান অন্যতম।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বর্ধমান ও দিল্লীর নাগরিক সমাজে বহু হাট-বাজার ও বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায়–

'সমুখে দেখে চক চান্দনী সুন্দর।

,,,

চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আটে হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার ॥ (পৃ ১৬৯-১৭০)

পণ্য সামগ্রী

নবাবী আমলে সুবা বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের মধ্যে ছিল খাদ্যশস্য, অর্থকরী ফসল, পশুপাখি, মসলা, বস্ত্র, চারু ও কারুশিল্পজাত দ্রব্য, মণি-মুক্তা, অলংকার, শঙ্খ, হাতির দাঁত, ঘি, মধু, ঘোড়া, চীনা মাটির থালাবাসন, খেলনা, মদ প্রভৃতি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলা অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের এসব পণ্য সামগ্রীর উল্লেখ পাওয়া যায়–

'সেরের কাহনদার কিনিনু সন্দেশ।

,,,

আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জয়ফল।

,,,

কত কষ্টে ঘৃত পানু সারা হাট ফিরা।

,,,

দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।

,,,

অবাক হইনু হাটে দেখিয়া গুবাক।

,,,

দুঃখেতে আনিনু দুগ্ধ গিয়া নদীপারে।

,,,

আটপণে আনিয়াছি কাট আট আটি।' (পৃ ১৮০-১৮১)

মুদ্রা ব্যবস্থা

নবাবী আমলে দ্রব্য কেনা-বেচা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ব্যবস্থা ও বিনিময় ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। এ অর্থ বা মুদ্রা ব্যবস্থায় স্বর্ণ-রূপা-তামা, তঙ্কা, কড়ি ও কাগজী টাকার প্রচলন ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত এসব মুদ্রা ও বিনিময় ব্যবস্থার মধ্যে টাকা, কড়ি ও ধাতব মুদ্রার উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. টাকা

'শুনি তুষ্ট কবি রায়   দশ টাকা দিলা তায়
দুটি টাকা দিলা নিজ রোজ।' (পৃ- ১৭৮)

খ. কড়ি

'কড়ি ফট্‌কা চিড়া দই   বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া   কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে ॥' (পৃ- ১৭৮)

গণনা পদ্ধতি

বাংলার অর্থনীতিতে টাকা-পয়সার গণনার ক্ষেত্রে বেশ কিছু মাধ্যম বা একক অনুসরণ করা হতো। এসব গণনা পদ্ধতির মধ্যে ছিল- কুড়ি, পণ, গণ্ডা, কাহন, শত, হাজার, লক্ষ ও কোটি প্রভৃতি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলায় প্রচলিত এসব গণনা পদ্ধতির মধ্যে পণ, গণ্ডা, কাহন, কুড়ি, শত, সহস্র, লক্ষ, কোটি প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ক. কুড়ি

'দর করে এক মূলে জুঁখে লয় দুনা তুলে
ঝকড়ায় ঝড়ের আকার।
পণে বুড়ি নিরূপণ কাহনেতে চারিপণ
টাকাটায় শিকার স্বীকার ॥' (পৃ- ১৭৯)

খ. পণ

দুই পণে এক পণ কিনিয়াছি পান।
আমি যেই তেঁই পানু অন্যে নাহি পান ॥' (পৃ- ১৮০)

গ. কাহন

'সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধসের পাইতে সন্দেশ ॥' (পৃ-১৮০)

ঘ. হাজার

ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থানা বান্ধা বাজী ॥' (পৃ-১৭০)

ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতি

নবাবী আমলে বাংলায় ওজন ও পরিমাপ পদ্ধতিতে তুলা, রতি, সটাক, পোয়া, সের, মন, অনুসরণ করা হতো। এছাড়া বস্তুর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা ও ব্যস নির্ণয়ে সাধারণত গজ ও হাতের মাপ ব্যবহৃত হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' ওজনের মান হিসেবে মণ, সের, সটাক, পোয়া, তোলা, রতি এবং পরিমাপের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতার মান হিসেবে হাত, গজের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. মণ

'অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার।
ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার ॥' (পৃ-৪৭)

খ. সের

'সেরের কাহন দরে কিনিনু সন্দেশ।
আনিয়াছি আধ সের পাই সন্দেশ ॥' (পৃ- ১৮০)

গ. দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ

'মালিনী বিদ্যার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ ॥
উর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্দ্ধেক তাহার।
স্থলে স্থলে মণি জ্বলে হরে অন্ধকার ॥' (পৃ-২০০)

পরিবহন ব্যবস্থা

তৎকালীন বাংলার ব্যবসায়-বাণিজ্যের পণ্য স্থল ও জলপথে আনা-নেয়া করা হতো। এসব রাস্তায় পরিবহন হিসেবে নৌকা, ডিঙা, জাহাজ, হাতি, ঘোড়া, উট, গরু, মহিষ, বলদ, গাধা, খচ্চর ব্যবহার করা হতো। এছাড়া স্বল্প দূরত্বের জন্য কুলী, মিন্‌তী, মুটে ও খালাসীদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বর্ধমান ও দিল্লী নগরে ব্যবসায়-বাণিজ্যের পণ্য পরিবহনে জাহাজ, হাতি, ঘোড়া, ষাঁড়, বলদ, মহিষ, গাধা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. নৌকা ও জাহাজ

'দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥' (পৃ-১৬৮)

খ. উট-ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর

'ইরাকী তুরকী তাজী আরবী জাহাজী।
হাজার হাজার দেখে থানে বান্ধা বাজী ॥
উট গাধা খচ্চর গণিতে কেবা পারে।' (পৃ-১৭০)

বাণিজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থা

নবাবী শাসনামলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বিশেষ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হতো। এরপরও এ সময়ে বাংলায় বাণিজ্যের জন্য হুমকি স্বরূপ দেখা দেয় মারাঠা বর্গিদের আক্রমণ, চোর-ডাকাত ও লুটেরাদের উৎপাত।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলা অঞ্চলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য বড় হুমকি হিসেবে মারাঠা বর্গি, স্থানীয় চোর, ডাকাত, লুটেরাদের উল্লেখ করা হয়েছে–

ক. বর্গিদের হাঙ্গামা

'বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।' (পৃ-১১)

খ. চোর-ডাকাতের উৎপাত

'ডাকাতি ছিনার চোর হাজার হাজার।
বেড়ী পায় মেগে খায় বাজার বাজার ॥' (পৃ-১৬৯)

বাণিজ্য বিষয়ে মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি

নবাবী আমলে বাংলায় ব্যবসায়ী বণিক ও মহাজন গোষ্ঠী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অভূতপূর্ব সম্মান সৌভাগ্য লাভ করতে সক্ষম হয়। জীবনের উন্নতির ক্ষেত্রে বাণিজ্যের বিকল্প কিছু ছিল না। তাই কৃষির পাশাপাশি অনেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ ও আত্মপ্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হয়ে ওঠে। কারণ বাঙালি সমাজে প্রচলিত ধারণাই ছিল- 'লক্ষ্মীর বসতি বাণিজ্যে।' তাই ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে তৎকালীন বাংলার অনেকেই সম্মান সৌভাগ্য লাভে বাণিজ্যে অংশগ্রহণ করে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' জীবন-জীবিকা, অর্থ-বিত্ত, সম্মান-সৌভাগ্যের মূল চাবিকাঠি হিসেবে বাণিজ্যের মূল্যায়ন করে শিব ও গৌরী বলেছেন–

'বৃদ্ধকাল আপনার নাহি জানি রোজগার
চাষবাষ বাণিজ্য ব্যাপার।
,,,
বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষা মাগা নৈবচ নৈবচ।' (পৃ-৬০)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালির সামাজিক জীবন

মধ্যযুগ ছিল একান্তভাবেই সামন্তবাদী সমাজ। সামন্ত প্রভুর লক্ষ্যই থাকতো নিজ শক্তি, বাহুবল বা পরাক্রম দ্বারা ভূমি বা রাজ্য দখল করা। ভূমির সঙ্গে আরেকটি বিষয় জড়িত থাকতো, তা হলো নারী। কারণ জমি ও জরু (নারী) উভয়েই উর্বরতার প্রতীক এবং উভয়েই শস্য, সন্তান, শক্তি, সমৃদ্ধি, সুখ-শান্তি বয়ে আনে। সামন্ত শাসকগণ সাধারণত ধর্মকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করে এবং জনসাধারণকে জিম্মি রেখে সবার সামনে নিজেকে বিধাতার বংশধর বা প্রতিনিধি রূপে উপস্থাপন করেন। ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শাসকই ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর ব্যক্তি ও অভিভাবক। শাসকের ইচ্ছাই ছিল আইন। জনগণের জীবন-জীবিকার, সম্মান-সৌভাগ্যের ও দণ্ড-মুণ্ডের স্থায়িত্ব শাসকের মন-মর্জির ওপর নির্ভর করতো। এদিক থেকে তিনি ছিলেন একাধারে সর্বোচ্চ বিচারক ও প্রশাসক।

এ সামন্তবাদী শাসকগণ (সুলতান, নবাব, রাজা ও জমিদার) সাধারণত স্বভাবে উগ্রপন্থী, বিশ্বাসে গোড়া, আদর্শে পশ্চাৎমুখী, সংস্কারে অবিশ্বাসী, মানবতার প্রশ্নে দ্বিধাগ্রস্ত এবং নৈতিকতার মানদন্ডে ইন্দ্রীয়াসক্ত। এ মহাশক্তিধর সামন্ত শাসকের ছত্রছায়ায় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপুটে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে নানাবিধ দুর্যোগ ও বিপর্যয় দেখা দেয় অনিবার্যভাবে।

সামন্ত শাসন

নবাবী আমলে সুবা বাংলা ছিল একান্তভাবেই সামন্তবাদী শাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দিল্লীর মুঘল সম্রাটের অনুগত (শাহী ফরমান দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত বা অনুমোদিত) রাজপ্রতিনিধি হিসেবে নবাবগণ অনেকটা স্বাধীনভাবেই বৃহৎ বাংলা শাসন করতেন। শুধু বাৎসরিক রাজস্ব বা কর প্রদান করলেই মুঘল সম্রাট সন্তুষ্ট থাকতেন। এসব নবাবদের অধীনে থাকতো অসংখ্য সামন্ত রাজা-মহারাজা, জমিদার, ভূস্বামী, মণ্ডলসহ প্রশাসন কাঠামোর বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এ নবাব, রাজা, মহারাজা ও জমিদারগণই ছিলেন মূলত বাংলার কৃষক প্রজার অধিশ্বর বা ভাগ্যবিধাতা। সাধারণ মানুষের জান-মাল, জীবন-জীবিকা, সুখ-শান্তি এ সামন্ত শাসক শ্রেণির মন-মর্জি-দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপরই নির্ভর করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর বাংলার সুবাদার মানসিংহ, মুর্শিদাবাদের নবাব আলীবর্দী খান, বর্ধমানের রাজা বীরসিংহ ও যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যের মাধ্যমে সামন্তবাদী শাসনের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে–

মুঘল সম্রাটের প্রতাপ

'যশোর নগর ধাম প্রতাপআদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥

,,,

আধ হৈল পাতসায় বান্ধিয়া আনিতে তায়
রাজা মানসিংহে পাঠাইলা।
বাইশী লস্কর সঙ্গে কচুরায় লয়ে রঙ্গে
মানসিংহ বাঙ্গালা আইলা ॥' (পৃ-১৬১)

সামন্ত শোষণ

নবাবী আমলেও বরাবরের মতো বাংলার সামন্ত শাসকগণ ছিলেন শোষক ও পরপীড়ক। কারণ দিল্লীর সম্রাটের চাহিদা, নিজেদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ যোগান দিতে প্রয়োজন পড়তো প্রচুর অর্থকড়ির। তাই বাড়তি টাকা-পয়সা সংগ্রহ করতে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কৃষক প্রজার ওপর জুলুম নির্যাতন ও শোষণ চালাতো। শাসকের ইচ্ছার বলি হতে হতো সাধারণ মানুষকে। তাই শোষণ-পীড়ন ছিল সামন্ত শাসকের সহজাত বৈশিষ্ট্য। 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' নবাব আলীবর্দীর, রাজা বীর সিংহের ও কতোয়াল ধূমকেতুর শোষণের চিত্র পাওয়া যায়–

ক. আলীবর্দীর (মহাবদজঙ্গ) শোষণ

'মহাবদজঙ্গ তাঁরে ধরে লয়ে যায়।
নজরানা বলে বার লক্ষ টাকা চায় ॥
লিখি দিলা সেই রাজা দিব বার লক্ষ।
সাজোয়ালা হইল সুজন সর্ব্বভক্ষ ॥' (পৃ-১১)

খ. ধূমকেতু কোটালের শোষণ

কোটালে জিজ্ঞাসা করে   হীরার কথা না সরে
চোরের যে ছিল   লুঠিয়া লইল
যে ছিল হীরার ঘরে।
খুঙ্গীপুথি রত্নভারে   দিতে হবে সরকারে।
পিঞ্জর সহিত   লয় হরষিত
পড়া শুক সারিকারে ॥' (পৃ ২৫৪-২৫৫)

সামন্ত শাসকের প্রশাসন ব্যবস্থা

নবাবী আমলে সুবা বাংলার প্রশাসনিক কাঠামোতে সবার ওপরে ছিলেন নবাব এবং নিম্ন পর্যায়ে ছিলেন গ্রাম্য মাতাব্বর বা গ্রাম পঞ্চায়েত। এর মধ্যবর্তী পর্যায়ে থাকতো সেনাপতি, মন্ত্রী, উজির, নাজির, উপদেষ্টা, রাজপুরোহিত, পণ্ডিত, দেওয়ান, বখশী, কতোয়াল বা নগর রক্ষক, বিচার বিভাগ, শাসন বিভাগ, রাজস্ব ভূমি বিভাগ ও সশস্ত্র বিভাগের কমকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। নবাবই ছিলেন একাধারে প্রধান শাসক, বিচারক ও সেনাপতি। 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' সামন্ত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজদরবার কেন্দ্রিক প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত আমলা-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চমৎকার চিত্র পাওয়া যায়। এছাড়া সম্রাট জাহাঙ্গীর, ভবানন্দ মজুমদার, রাজা বীর সিংহের দরবারেও তদ্রূপ চিত্র দেখা যায়–

ভবানন্দ মজুমদারের প্রশাসন

'পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুমদার।
স্নান পূজা করিয়া বাহিরে দিলা বার ॥
ঘড়িয়াল ঠনঠন বাজাইছে ঘড়ি।
চোপদার সমুখে দাঁড়ায় লয়ে ছড়ি ॥
দেওয়ান আমীন বক্সী মনসী দপ্তরী।
খাজাঞ্চী নিযুক্ত কৈলা বিবেচনা করি ॥
সহবতী হিসাব-নিকাশ বাজে দফা।
মুহরির রাখিল হিসাব করি রফা ॥

ফরমান মতো সব সনদ লিখিয়া।
মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥
পরগণা পরগণা হইল আমল।
লেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেন সবে চতুর্গণ তার ॥
এই রূপে রাজত্বের যা কিছু নিয়ম।
ক্রমে ক্রমে করিলা সতেক উপক্রম ॥' (পৃ- ৩৩৮)

দাস-দাসী প্রথা

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য এবং অপরিহার্য অঙ্গ ছিল দাস-দাসী। রোমান ও গ্রিক দেশের মতো ভারতবর্ষের দাস-দাসীর অবস্থা এতটা ভয়াবহ ছিল না। এদেশে সাধারণত যুদ্ধ সৈনিক, কৃষিকাজ ও গৃহভৃত্যের কাজে-কর্মে এসব দাস-দাসী ব্যবহার করা হতো। সাধারণভাবে যুদ্ধবন্দী, উপহার হিসেবে প্রাপ্ত এবং ক্রয়সূত্রে দাস-দাসী সংগ্রহ করা হতো। ভারতবর্ষের দাসী-দাসীদের প্রতি অনেকটা উদার, মানবিক আচরণ করা হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' দিল্লী, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের সামন্ত শাসকদের অধীনে দাস-দাসীদের উল্লেখ পাওয়া যায়-

ক. সৈনিক হিসেবে হাবসী ক্রিতদাস

'হাবসী ইমাম বক্স হাবসী প্রধান।
হাতী ঘোড়া উট আদি তাহার যোগান ॥' (পৃ-১৩)

খ. সখী পর্যায়ের দাসী

'বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা
সখীগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে
মোর মত ছাড়া কভু নয় ॥
যত সখীগণ কয় কেন হীরা কর ভয়
দাসী কোথা ঠাকুরানী ছাড়া ॥' (পৃ-১৯৭)

গ. গৃহভৃত্য পর্যায়ের চাকর বা দাস

'নাগারা নিশান ঘড়ি সংযোগ করিয়া।
কতগুলি লোক যোগ্য চাকর রাখিয়া ॥' (পৃ-৩২৮)

যুদ্ধ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও সামাজিক নিরাপত্তা

নবাবী আমলে বাংলায় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ছিল না বললেই চলে। কারণ প্রায় সময়েই যুদ্ধ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। রাজায় রাজায় যুদ্ধ, সেনাপতিদের বিদ্রোহ, মারাঠা-বর্গীদের আক্রমন-লুণ্ঠন, বিদেশি বণিকগোষ্ঠীর মহাশক্তি নিয়ে উত্থান ও ক্ষমতালিপ্সা, চোর-ডাকাত এবং লুটেরার উৎপাতে সমকালীন সামাজিক নিরাপত্তা চরমভাবে ব্যাহত হয়ে পড়ে। এতে করে মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা, সুখ-শান্তি দারুণভাবে বাধাগ্রস্ত হয়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' সামন্তরাজ বিদ্রোহী প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে মানসিংহের যুদ্ধ এবং বর্গী রাজা ভাস্কর পণ্ডিতের বাংলা আক্রমন ও লুটপাটে এবং রাজনৈতিক অস্থিরতায় দেশ ও জনজীবনে বিপর্যয় দেখা দেয়–

ক. মনসিংহ ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ

'ধূধূ ধূধূধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্ দামামা দম্‌দম্
ঝনন্ন ঝম্‌ঝম্ ঝাঁজে ॥
,,,
কত নিশান ফরফর নিনান ধরধর
কামান গর গর গাজে ॥
সব জবান রাজপুত পাঠান মজবুত
কামান শরযুত সাজে ॥
,,,
সমরে পশিয়া অন্তরে রুষিয়া
দুই দলে করে গালাগালি ॥
ঘোড়ায় ঘোড়ায় যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে।
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে ॥
,,,
ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুঠিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে আগুনি পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ ॥
পাতশাহী ঠাটে কবে কেবা আঁটে
বিস্তর লস্কর মাঝে।
শেষে ছিল যারা পলাইল তারা
মানসিংহে জয় হৈল।
পিঞ্জর করিয়া পিঞ্জরে ভরিয়া
প্রতাপআদিত্যে লৈল ॥' (পৃ ২৯৫-২৯৭)

খ. বর্গীদের দাঙ্গা-হাঙ্গামা

'স্বপ্ন দেখি বর্গি রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি আকৃতি ॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গাপার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥' (পৃ-১১)

বৃত্তিজীবী বা বর্ণজীবী শ্রেণি

বাংলা ও বাঙালির সমাজ কাঠামো বর্ণ ও বৃত্তির ওপর আশ্রয় করেই গড়ে ওঠেছে। বর্ণবিন্যাস ও শ্রেণিবিন্যাস প্রায় একই মাপকাঠিতে বাঁধা ছিল। এখানে বৃত্তি বা জীবিকা ছিল বর্ণ নির্ভর। আর বর্ণ ছিল জন্ম নির্ভর। তাই বৃত্তি বা পেশা বর্ণ ও শ্রেণির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছিল। আর সামাজিক মান-মর্যাদা ও সম্মান এসব বৃত্তি বা পেশার ওপর নির্ভর করতো। চতুর্বর্ণীয় হিন্দু সমাজ ব্যবস্থায় সবার ওপরে ছিল ব্রাহ্মণগণ। এরপরে যথাক্রমে থাকতো ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য বা ব্রাত্য শ্রেণি। কাজের বা পেশার মান বা ধরন অনুযায়ী সামাজিক অবস্থান, বাসস্থান, আহার-বিহার, বসন-ভূষণে পার্থক্য সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়তো। অন্যদিকে মুসলমান সমাজেও এ রকম আশরাফ (উচ্চ শ্রেণি বা আরব দেশীয়), আতরাফ বা আজলফ (নিম্ন শ্রেণির) ও আরজল (ধর্মান্তরিত শ্রেণি) শ্রেণিবিভেদ দেখা যায়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম সমাজ জীবনে গড়ে ওঠা এসব বৃত্তিজীবী বা বর্ণজীবী মানুষের সরব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়–

ব্রাহ্মণ

'ব্রাহ্মণমণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলঙ্কার স্মৃতি দরশন ॥
,,,
শিব পূজা চণ্ডীপাঠ যজ্ঞ মহোৎসব ॥' (পৃ-১৭০)

পুরোহিত

'অশেষ উপচার আনিয়া মজুন্দার
পূজেন অন্নদাচরণ।
পদ্ধতি সুবিদিত পণ্ডিত পুরোহিত
পূজয়ে বিধান যেমনি ॥' (পৃ-৩৪২-৪৩)

জ্যোতিষী বা গণক

'অবিজ্ঞ সর্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
বারবেলা কালবেলা সদাসঙ্গে তার ॥
পাপরাশি পাপ গ্রহ পাপতিথি তারা।
অভাগারে একদিন না ছাড়িবে পারা ॥' (পৃ-২৬১)

পণ্ডিত অধ্যাপক

'রাজ সভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।
না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত ॥
ঋতু হৈলে একবার সম্ভবে সম্ভাষ।
তাহে যদি পর্ব্ব হয় তবে সর্ব্বনাশ ॥' (পৃ-২৬১)

বৈদ্য বা ওঝা

'রাজ সভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করায়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বন ॥' (পৃ-২৬১)

ঘটক

‘নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবেরে বিবাহ দিলা সতী।’ (পৃ-১৫)

বণিক

‘প্রথম গড়েতে কোলাপেষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥
দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।
সফরিয়া নানা দ্রব্য আনয়ে জাহাজী ॥’ (পৃ-১৬৮)

মহাজন

‘ষষ্ঠ গড়ে থাকে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা ॥
সেই গড়ে নানা জাতি বৈসে মহাজন।
লক্ষ কোটি পদ্ম শঙ্খে সঙ্খ্যা করে ধন ॥’ (পৃ-১৬৮)

মুনশী

‘পাঁতিলেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি ॥’ (পৃ-২৬১)

বখশী

‘বখশী আমার পতি সদাই খুনশী ॥
কিঞ্চিত কশুর নাহি কশুর কাটিতে।
বেহিসাবে এক বিন্দু না পারি লইতে ॥’ (পৃ-২৬১)

খাজাঞ্চি

‘খাজাঞ্চি আমার পতি সবারি অধম ॥
চাঁদমুখা টাকা দেই সোনামুখে লয়।
গণি দিতে ছাই মুখো অধোমুখ হয় ॥
পরধন পরে দিতে যার এই হাল।’ (পৃ-২৬২)

পোদ্দার

‘পোদ্দার আমার পতি কৃপণ প্রধান ॥
কোলে নিধি খরচ করিতে হয় খুন।
চিনির বলদ সবে একখানি গুণ ॥’ (পৃ-২৬২)

মুহরী

‘অভাগীর পতি হিসাবের মুহরী ॥
শেষ রেতে রাসে সারা রাতি লিখে পড়ে।
খায়াইতে জাগাইতে হয় দিয়া কড়ে ॥’ (পৃ-২৬৩)

জেলে

‘সেই মৎস্য জালিয়া (জেলে) ধরিয়া লবে জালে।
ভেট লয়ে দিবেক শম্বর মহীপালে ॥’ (পৃ-২৩৭)

দোকানী

'চলে দিয়া হাত নাড়া   পাইয়া হীরার মাড়া
দোকানি দোকান ঢারে ডরে।' (পৃ-১৭৮)

সাপুড়ে

'কেহ বলে ডাক দিয়া আন সাপুড়িয়া।
এখনি ধরিবে সাপ কাঁদনি গাইয়া ॥' (পৃ-২৪৫)

ধোপা

'কেহ বলে রৈও রৈও পরি আসি শাড়ী।
কেহ কান্দে কাপড় থাকিল ধোপাবাড়ী ॥' (পৃ-৩৪০)

দারোয়ান

'দ্বারী কহে একী হয়   পড়ুয়ার বেশ নয়
খুঙ্গীপুথি ধুতি ধরে তারা।'

,,,

দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার   থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥' (পৃ-১৬৬-১৬৭)

অন্যান্য বৃত্তি বা পেশাজীবী মানুষ

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বর্ধমান নগরের বর্ণনা সূত্রে বাঙালি সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এদের মধ্যে– স্বর্ণকার, গন্ধবণিক, কাঁসারি, শাখারি, গোয়ালা, তামুলী, তেলী, তাঁতী, মালাকার, নাপিত, বারুই, কৃষক, কামার, কুমার, যোগী, সন্ন্যাসী, সেকরা, ছুতার, চাঁড়াল, বাগ্‌দী, হাড়ী, ডোম, মুচী, শুড়ী, কোল, কুলু, ব্যাধ, বেদে, বাজীকর, বাইতি, পটুয়া, বারাঙ্গনা, নর্তক, ভাঁড় অন্যতম। এ বর্ধমান নগরের বাসিন্দাদের মাধ্যমে বাঙালি সমাজের পুরো চিত্রটি চমৎকারভাবে উন্মোচিত হয়েছে–

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।

,,,

বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।

,,,

কায়স্থ বিবিধ জাতি দেখে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি ॥
গোয়ালী তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার ॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।
যুগি চাষাধোবা চাষা কৈবৰ্ত্ত অনেক ॥
সেকরা ছুতার নুড়ী ধোবা জেলে গুঁড়ী।
চাড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ি ॥
কুরমী কোরঙ্গা পোদ কপালি তিয়র।
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর ॥

বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক ॥' (পৃ-১৭০-১৭১)

ঘুঁটে-কাঠ-খড় কুড়ানী

'হরিহোড় যেথা যান কাট ঘুঁটে নাহি পান
আট দিক আন্ধার দেখিলা।
,,,
বৃদ্ধ পিতা মাতা ঘরে আকুল অন্নের তরে
ঘুঁটে বেচা আমার সম্বল ॥' (পৃ-১৪২)

নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থান

সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় নারীর সামাজিক মান-মর্যাদা ও অবস্থান তেমন সুখকর ছিল না। কারণ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ধর্মীয় ও সামাজিক শাসন-শোষণের মাধ্যমে কার্যতঃ নারীকে ভোগের সামগ্রী ও অবরোধবাসিনীতে পরিণত করে তোলে। পুরুষের দৃষ্টিতে নারীর সম্পদ দুটি- রূপ আর যৌবন। পুরুষের সমাজে নারীর এ দুটি সম্পদই তার জন্য বড় শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। এ জন্যই নারী অনবরত আক্রমণ আর অপমানের শিকারে পরিণত হয়। শুধু পুত্র সন্তানের জন্মদান ও জননী হিসেবে সামন্তবাদী সমাজে নারীর কিছুটা গুরুত্ব ছিল। সমাজ, ধর্ম, শাস্ত্র ও সংহিতা নারীকে তৎকালে পাপের আধার ও নরকের দ্বারে পরিণত করে তোলে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অবস্থানের প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় হিসেবে সমাজ শাসন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপট, শাস্ত্রাচার, পুত্র সন্তান কামনা, কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ, সপত্নী যন্ত্রণা, নারীর অবমাননা-বঞ্চনা ও সামাজিক বৈষম্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সমাজ শাসন

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' নারীর স্বাধীন চলাফেরার ওপর সামাজিক নিষেধাজ্ঞা ও মেয়ের বিবাহ না হওয়ায় গঞ্জনা দেখা যায়–

নারীর স্বাধীন চলাফেরায় নিষেধাজ্ঞা

'অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥
ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটুনী।
একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি ॥
পরিচয় না দিলে করিতে না পারি পার।
ভয় করি জানি কে দিবে ফেরফার ॥' (পৃ-১৫৬-১৫৭)

শাস্ত্র শাসন বা শাস্ত্রাচার

সামন্ত শাসকগণ নিজেদের স্বার্থেই অর্থাৎ মসনদ টিকিয়ে রাখতেই মন্দির ও মসজিদকে সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে। অর্থাৎ পুরোহিত ও মোল্লাদের দিয়ে নিজেদের মতো করে ধর্মের বাতাবরণে শাস্ত্রীয় বিধি বিধান ও অনুশাসন প্রণয়ন করেছে। মানুষের জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যু পর্যন্ত সমগ্র জীবন প্রবাহকে কঠোর বিধি-নিষেধের অধীন করা

হয়েছে। আর এ শাস্ত্রাচার ও লোকাচারগুলো প্রধানতই নারীদের জন্য প্রণীত এবং তাদেরকেই তা পালন করতে হতো। বিধাতার নাম দিয়ে তৈরি বিধানকেও পুরুষ সমাজ নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে।

ক. পুরুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

'হাসিয়া কহেন দেবী এমনা কি হয়।
সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয় ॥

,,,

পাইতে পতির অঙ্গ নারীর সাদ করে।
তার সাক্ষী মৃত পতি সঙ্গে পুড়ে মরে ॥
পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরে যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায় ॥' (পৃ-৫১)

খ. নারীকে কামাতুর-কলাবতী করে উপস্থাপন

'প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল দ্রুত হয়ে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে।
বিদ্যার পোহায় রাতি ঐ কথা নানা জাতি
পুরুষের আট গুণ মেয়ে ॥ (পৃ ১৯৫-১৯৬)

পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দাপট ও দৃষ্টিভঙ্গি

সামন্তবাদী শাসন মূলত পুরুষতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী সমাজ ব্যবস্থা। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সমাজ ব্যবস্থাতেই পুরুষের দাপট, প্রতাপ ও প্রাধান্যকে স্বীকার করা হয়েছে। ধর্মের দোহাই দিয়ে পুরুষের পক্ষপাতিত্বমূলক এ অপশাসন যুগ যুগ ধরে স্বীকৃতি পেয়ে এসেছে। পুরুষ শাসক ও পুরুষ পুরোহিত-মোল্লারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে ধর্মীয় ও সামাজিক বিধান প্রণয়ন করে তা চাপিয়ে দিয়েছে নারীদের ওপর। পুরুষের আধিপত্যে নারীরা কার্যত দাসীতে পরিণত হয়ে পরে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শুক পাখির উক্তিতে পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির চিত্র উন্মোচিত হয়েছে-

'আলো সারি দুর দুর নারীর হৃদয় ক্রূর
পুরুষে মজায় কামকূপে ॥
গুণসিন্ধু রাজসুত সুন্দর সুগুণযুত
বিদ্যা লাগি করে গুণমণি।
দস্যু কন্যা মহৌষধে পতি করি সাধু বধে
বিদ্যাবীর সিংহের তেমনি ॥
বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরিহরি
পতিবধ কৈল পাপীয়সী ॥ (পৃ- ২৭৩)

কৌলিন্য প্রথা

সামন্তবাদী হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রেণির আধিপত্য ও প্রতাপে তৎকালীন সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন ঘটে। মূলত সেন আমলে রাজা বল্লাল সেন সমাজের বালাই স্বরূপ এ কৌলিন্য প্রথার প্রচলন ঘটান। বংশ বা কুলের

পবিত্রতা ও রক্তের শুদ্ধতা বজায় রাখতে যেমন বহির্কুলে বিবাহ করা যেত না, তেমনি মেয়েদের গৌরীদানের ব্যাপারে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়। কুলীন পাত্রের অভাবে অনেক কন্যার পরিবার বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। আর কুলীন পাত্রগণ অর্থের লোভে পড়ে বিবাহের ব্যবসায়-বাণিজ্য শুরু করে। এ কৌলিন্য প্রথাই মূলত বাঙালি সমাজে বহুবিবাহ ও সহমরণ প্রথার ইন্ধন যোগায়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' কৌলিন্য প্রথার যাতাকলে পিষ্ট ও নিগৃহীত এমনি এক কুলীন ঘরের মেয়ের জীবন যন্ত্রণার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে–

'আর রামা বলে আমি কুলীনের মেয়ে।
যৌবন বহিয়া গেল বর চেয়ে চেয়ে ॥
যদি বা হইল বিয়া কত দিন বই।
বয়স বুঝিলে তার বড় দিদি হই ॥
বিয়াকালে পণ্ডিতে পণ্ডিতে বাদ লাগে।
পুনর্ব্বিয়া হবে কিবা বিয়া হবে আগে ॥
বিবাহ করেছে সেটা কিছু ঘাটি ষাটি।
জাতির যেমন হৌক কুলে বড় আঁটি ॥
দু চারি বৎসরে যদি আসে এক বার।
শয়ন করিয়া বলে কি দিবি ব্যভার ॥
সুতা বেচা কড়ি যদি দিতে পারি তায়।
তবে মিষ্ট মুখ নহে রুষ্ট হয়ে যায় ॥' (পৃ-২৬৪)

বাল্য বিবাহ

বাঙালি সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে মূলত কৌলিন্য প্রথা বহুলাংশে দায়ী। গৌরীদানের পুণ্যলাভ, নারীর শূচিতা রক্ষা, বংশীয় মর্যাদা রক্ষা ও পুরুষের রিরংসা চরিতার্থ করতেই মূলত বাল্যবিবাহের প্রচলন করা হয়। সাধারণত বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে গৌরী (৮ বছর বয়সীকে), রোহিনী (৯ বছর বয়সীকে) ও কুমারী (১০ বছর বয়সীকে) দানের অশেষ পুণ্য ও গুণকীর্তন করা হতো। এ বাল্য বিবাহের কারণেই সমাজে বিধবার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় এবং নানা অপকর্ম ও অযাচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' পুতুল খেলার বয়সী গৌরীর সঙ্গে বৃদ্ধ কুলীন শিব ঠাকুরের বিবাহ দেয়া হয়েছে। এছাড়া দরিদ্র বাসুর বিবাহের মধ্য দিয়েও বাল্য বিবাহের ইঙ্গিত মেলে-

বাসুর বাল্য বিবাহ

'কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিলা দাসু
এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে।
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু ॥' (পৃ-৩০৯)

বহু বিবাহ

কৌলিন্য প্রথার কারণেই মূলত বাঙালি সমাজে বহু বিবাহের প্রচলন শুরু হয়। এছাড়া হিন্দু মুসলিম উভয় ধর্মের স্বীকৃতি থাকায় বিত্তবান সমাজের ভোগ-বিলাসিতার উপকরণ হিসেবে এ প্রথাটির দ্রুত প্রসার ঘটে। দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অনেক বিত্তবান শ্রেণিই স্ত্রী সংগ্রহে মেতে ওঠে। এর কুফল হিসেবে সমাজে বিধবার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায় এবং সমাজে ব্যাভিচারের প্রাদুর্ভাব ঘটে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' ভবানন্দ মজুমদার, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, নলকুবের, হরিহোড় ও ঘেসেড়ানীর বহুবিবাহের চিত্র পাওয়া যায়-

ক. হরিহোড়ের বহুবিবাহ

'ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্যকুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥ (পৃ- ১৪৭)

খ. ভবানন্দ মজুমদারের বহুবিবাহ

'চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী নাম দুজনার।
বিবাহ করিলা ভবানন্দ মজুমদার ॥ (পৃ- ১৫৫)

গ. ঘেসেড়ানীর বহুবিবাহ

'বৎসর পনর ষোল বয়স আমার।
ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার ॥' (পৃ- ২৯২)

সহমরণ প্রথা

তৎকালীন সামন্তবাদী পুরুষতান্ত্রিক সমাজে সবচেয়ে বর্বর ও ভয়াবহ প্রথা ছিল সহমরণ ব্যবস্থা। স্বামীর মৃত্যু হলে সেই স্বামীর চিতায় সদ্য বিধবা স্ত্রীকেও জীবন্ত পুড়ে মরে সতী হবার গৌরব অর্জন করতে হতো। সাধারণত বহুবিবাহের ও বাল্য বিবাহের ফলে অনেক অল্প বয়স্ক বালিকারা বিধবায় পরিণত হতো। এরা বৈধব্য জীবনের কঠোর একাদশী ব্রত মানতে পারতো না বা মান্য করতে আগ্রহ দেখাতো না। পুরুষের প্রলোভনে পড়ে এরা অনেকেই ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে পিতা ও পতির বংশে কলঙ্ক বয়ে আনতো এবং অনেকে পতিতায় পরিণত হতো। তাই বংশীয় মান-মর্যাদা রক্ষার্থেই মূলত সমাজপতিগণ এ সহমরণ প্রথার প্রচলন করেন। রাজা রামমোহনের আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ খ্রি. সহমরণ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' রতি, সোহাগী, চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর সহমরণের ইচ্ছা ও আয়োজন করতে দেখা যায়-

ক. সোহাগীর সহমরণ

'চারিদিকে বন্ধুগণ করে হায় হায়।
দেখিতে দেখিতে ধন ধান্য উড়ে যায় ॥
সোহাগী মরিল পুড়ি হরিহোড় লয়ে।' (পৃ- ১৫৬)

গ. চন্দ্রমুখী ও পদ্মমুখীর সহমরণ

'চন্দ্রমুখী পদ্মমুখী স্বর্গে যাইবার সুখী
সহমৃতা হইলা হাসিয়া।' (পৃ-৩৪৯)

বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধকরণ

সামন্তবাদী বাঙালি হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। শাস্ত্রকার, সমাজপতি ও পুরোহিতরা বিধবা মেয়েদের পুনর্বিবাহকে শাস্ত্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করে দেন। এ ছাড়া মৃত পতির সম্পত্তিতেও স্ত্রীর অধিকার বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায়নি। বরঞ্চ বিধবা নারীকে পতিগৃহে বা পিতৃগৃহে নিদারুণ লাঞ্ছনাময় একাদশী পালনের মাধ্যমে মূলত জেল জীবনের অবদমনমূলক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দেয়। ১৮৫৬ খ্রি. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংগ্রামের ফলে বিধবা বিবাহ স্বীকৃতি পায়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' হিন্দু সমাজে বিধবা নারীদের বিবাহ না দেবার বিষয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীর ভবানন্দ মজুমদারকে কটাক্ষ করে বলেছেন-

আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায়।
ফল হেতু ফুল তার মাসে মাসে ফুটে।
বীজ বিনা নষ্ট হয় সে পাপ কি ছুটে ॥' (পৃ- ৩০৬)

বৈধব্য যন্ত্রণা

সামন্তবাদী বাঙালি হিন্দু সমাজে বিধবা নারীর জীবন যন্ত্রণার শেষ ছিল না। কারণ বিধবাকে সামাজিকভাবে অশুভ-অকল্যাণের প্রতীক ভাবা হতো। 'রাক্ষুসী বা ভাতারখাগী' অপবাদ দেয়া হতো এবং বিবাহ থেকে শুরু করে কোন অনুষ্ঠানে তার প্রবেশাধিকার ছিল না। একাদশী ব্রতের মতো কঠোর বিধি-নিষেধ মেনে মূলত মৃতের ন্যায় জীবন যাপন করতে হতো। স্বামীর সম্পদে তেমন অধিকার ছিল না বং পতিগৃহে বা পিতৃগৃহেও নিদারুণ লাঞ্ছনা, অবমাননা ভোগ করতে করতেই জীবন কাটিয়ে দিতে হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' স্বামী মদনের মৃত্যুতে বিধবা রতিকে এবং দক্ষের মৃত্যুতে তার স্ত্রী প্রসূতিকে নানা কারণে বিলাপ করতে দেখা যায়। কারণ পতির মৃত্যুতে মানসিক দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে ধর্মীয়-সামাজিক নানা বিধি-নিষেধময় জ্বালা-যন্ত্রণা এসে বিধবাকে কুড়েকুড়ে গ্রাস করে-

রতির বৈধব্য যন্ত্রণা

'পতিশোকে রতি কাঁদে   বিলাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে   রুধির বহিছে ধারে
কাম-অঙ্গভস্ম লেপে অঙ্গে ॥
আলুথালু কেশ বাস   ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসার পুরিল হাহাকার।

,,,

কোথা গেলা সুররাজ   মোর মুণ্ডে হানিবাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি   আমি তাহে দেহ ঢালি
অন্তকালে কর এই ধর্ম্ম ॥ (পৃ ৩৫-৩৭)

নারীর জীবন বঞ্চনা ও অবমাননা

সামন্তবাদী সমাজে নারীর জীবন বঞ্চনা বা অবমাননার অন্ত ছিল না। স্বামীর বহুবিবাহের ফলে সতীন যন্ত্রণা, শাশুড়ী-ননদের দুর্ব্যবহার, স্বামী পরিত্যাক্তা হবার অবমাননা, স্বামী কর্তৃক প্রহার এবং অপুত্রক অবস্থায় নারী দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকতো না। বন্ধ্যা বা পুত্রহীনা নারীর পারিবারিক কোন মর্যাদা বা প্রভাব থাকতো না। আবার স্বামীর স্থায়ী রোগ, ভগ্ন স্বাস্থ্য, দারিদ্র্য, উদাসী-নেশাখোর স্বভাবের কারণে নারীর সকল স্বপ্ন-বাসনারই ঘটতো অপমৃত্যু। তাই বাঙালি নারীকে ধরিত্রীর মতো একাধারে স্বামী-সন্তান ও সংসারের দায়ভার একা বহন করতে হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' গৌরী, বসুন্ধরা, চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখী ও বর্ধমান নগরের নারীদের অবমাননাকর জীবনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়।

ক. পিতৃবাসের যন্ত্রণা

'জননীর আশে যবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥' (পৃ- ৬১)

খ. সপত্নী বা সতীন যন্ত্রণা

'আমার স্বামীরে লয়ে মানুষ করিয়া।
আনন্দে রাখিলা তারে তিন নারী দিয়া ॥
স্বামীহীনা আমি ফিরি কান্দিয়া কান্দিয়া।
এত দুঃখ দেহ মোরে কিসের লাগিয়া ॥
আপনি ত জান স্ত্রীলোকের ব্যবহার।
সতিনী হইলে পতি বড়ই প্রহার ॥
বরঞ্চ শমনে লয় তাহা সহা যায়।
সতিনী লইলে স্বামী সহা নাহি যায় ॥' (পৃ- ১৪৮)

গ. শাশুড়ী-ননদ সম্বন্ধীয় যন্ত্রণা

'ঘরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা।
সতিনী বাঘিনী শাশুড়ী রাগিনী
ননদী নাগিনী বিষের ভরা ॥' (পৃ- ১৭৩)

ঘ. স্বপ্নভঙ্গজনিত যন্ত্রণা ও অতৃপ্তি

'রাজ সভাসদ পতি বৈদ্যবৃত্তি করে।
ভোঁজনের কালে মাত্র দেখা পাই ঘরে ॥
নাড়ী ধরি স্থানে স্থানে করয়ে ভ্রমণ।
আমি কাঁপি কামজ্বরে সে বলে উল্বন ॥

,,,

রাজ সভাসদ পতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত।

না ছোঁয় তরুণী তৈল আমিষে বঞ্চিত ॥

,,,

ঘড়েল পতির জ্বালে আমি হৈনু ভাল ॥
রাত্রি দিন আট পর (প্রহর) ঘড়ি পিটে মরে।
তার ঘড়ি কে বাজায় তল্লাস না করে ॥' –(পৃ ২৬১-২৬৩)

ঙ. সামাজিক কলঙ্ক বা অপবাদের গঞ্জনা

'ওলো নিশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী
সাপিনী পাপকারিনী।

,,,

না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।

,,,

বিদ্যার মা ছলে যদি কেহ বলে
এখনি খাইব বিষ।
প্রবেশিব জলে কাতি দিব গলে
পৃথিবী বিদায় দিস ॥' –(পৃ ২৩৭-২৩৮)

নারী স্বাধীনতা

সামন্তবাদী বাঙালি সমাজে নারীর তেমন স্বাধীনতা ছিল না। ইসলাম ধর্মে যতটুকুই ছিল, তাও শাস্ত্র গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ থাকতো। নারীর শিক্ষা ও স্বাধীন মতামতের যে উল্লেখ পাওয়া যেতো, তা মূলত বিত্তবান শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের প্রায় সকল নারীর অবস্থা ছিল গতানুগতিক। সাংসারিক কর্মের বাইরে যে সকল নারীরা অর্থ উপার্জন করতো, তারা ছিল সমাজের মূল ধারার বাইরের বাসিন্দা। তাই সমকালীন সমাজে নারীর জননী মূর্তিতে এবং বিশেষত নিম্নবৃত্তিজীবী সমাজে নারীদের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল।
'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' নারী স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নারীর কর্মক্ষেত্রে আত্মনিয়োগ, শিক্ষা গ্রহণ ও বিদ্যার বিবাহের ক্ষেত্রে সদিচ্ছার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে-

ক. বিদ্যার নারী শিক্ষা

'সভাসদে জিন আগে করিয়া বিচার।
তবে সে বিচারযোগ্য হইবা বিদ্যার ॥

,,,

বিদ্যারে কহিছে রাজা অন্তঃপুরে গিয়া।
হায় কেন মাটি খেয়ে পড়ানু বিদ্যায়।
বিপাক ঘটিল মোরে তোর প্রতিজ্ঞায় ॥
যত রাজপুত আনি পলায় হারিয়া।' –(পৃ- ২২৪)

খ. ব্যক্তিত্ববোধ ও বরবরণে স্বাধীনতা

'বীর সিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা

রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই   বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।' (পৃ- ১৬২)

নারীর কর্মক্ষেত্র

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' কিছু নারীকে প্রাত্যহিক সংসারের আটপৌরে কাজ ছাড়াও অর্থ উপার্জন সংশ্লিষ্ট কাজ করতে দেখা যায়। এসব পেশাজীবী নারী হলো- পাটুনী, মালিনী, গোয়ালিনী, নর্তকী, ডোমনী, ঘুঁটে-কুড়ানী, ঘেসেড়ানী ও বারাঙ্গনা প্রভৃতি। এদের চিত্র নিম্নরূপ-

পাটুনী

'অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।
ত্বরায় আনিল নৌকা বামাস্বর শুনি ॥' (পৃ- ১৫৭)

মালিনী

'হেনকালে তথা এক আইল মালিনী ॥
কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।

,,,

মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়িতে যোগাই।
ভালবাসে রাজা রাণী সদা আসি যাই ॥' (পৃ ১৭৫-১৭৬)

ঘেসেড়ানী

'ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে ॥
কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায়রে গোসাঁই।
এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই ॥' (পৃ- ২৯২)

বারাঙ্গনা

'বাইতি পটুয়া কান সমবি (বারাঙ্গনা) যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড়া নর্ত্তক অনেক ॥' (পৃ- ১৭১)

গ্রামীণ জীবন

তৎকালীন সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় বাংলার গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থা ছিল প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ। তবে শহর বা নগরের তুলোনায় ছিল অবহেলিত, অনগ্রসর ও অনুন্নত। কারণ গ্রামে শুধু সামন্ত জমিদার, জোতদার বা মাতাব্বর শ্রেণির লোকজনই সম্মানজনকভাবে বসবাস করতেন। বাকি দরিদ্র কৃষক প্রজার অবস্থা ছিল অপরিবর্তনীয়। কারণ রাজনৈতিক গোলযোগের ঢেউ গ্রামকে তেমন দগ্ধ বা আলোড়িত করতো না। তাই শাসকের পরিবর্তন ঘটতো হরহামেশাই, কিন্তু গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন আসতো না। বরং ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার ও বিশ্বাস গ্রামকে জেঁকে বসেছিল অক্টোপাসের মতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলার বাগোয়ান পরগনার বড়গাছি গ্রামের চিত্র পাওয়া যায়। বাংলার গ্রামীণ জীবনের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ সংক্রান্ত সকল লোকাচার, বিশ্বাস, ধর্ম-কর্ম, দুঃখ-দারিদ্র্য, বংশীয় কৌলিন্য, অস্পৃশ্যতা, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পরিলক্ষিত হয়-

'বাঙ্গালায় ধন্য পরগণা বাগুয়ান।
তাহে বড়গাছি গ্রাম গ্রামের প্রধান ॥
পশ্চিমে আপনি গঙ্গা পূর্ব্বেতে গাঙ্গিনী।

,,,

হেনকালে এক রামা স্নান করি যায়।
তৈল বিনা চুলে জটা খড়ি উড়ে গায় ॥
লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥
অন্ন বিনা কলেবরে অস্থিচর্ম্ম সার।
গেঁয়ে লোকে দিয়াছে পদ্মিনী নাম তার ॥
আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা একগাছি।

,,,

মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোর ॥
বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে ॥

,,,

আমার আশিষে তুমি পুত্রবতী হবে।
সেই পুত্র হৈতে তুমি বড় সুখে রবে ॥
ধন ধান্যে পরিপূর্ণ হইবেক ঘর।
কুলীন কায়স্থ সব দিবে কন্যাবর ॥

,,,

এইরূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবের সোঁসর ॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানা মতে ধন দিয়া সকলে তুষিল ॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥
পিতা মাতা সুত ভ্রাতা কন্য বধূগণ।
জামাই বেহাই লয়ে ভুঞ্জে নামাদন ॥' (পৃ ১৩৯-১৪৭)

নাগরিক সমাজ

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় নগর বা শহর বলতে মূলত শাসকের রাজধানী, প্রাদেশিক শাসক বা গভর্নরের কর্মস্থল, বাণিজ্য বন্দর ও সেনা ছাউনী বা দুর্গ এলাকাকে বোঝাতো। অর্থাৎ শাসক বা শাসকের কর্মস্থলকে কেন্দ্র করেই মূলত সেকালে নগরের পত্তন হতো। এসব নগরে সকল বর্ণজীবী বা পেশাজীবী শ্রেণির বসবাস বা সমাগম ঘটতো। প্রশাসনিক সকল আয়োজনের সঙ্গে সঙ্গে ভোগ বিলাসের নানা উপকরণেরও লীলাভূমি হিসেবে নগরের সমাদর বা গুরুত্ব ছিল। দেশি-বিদেশি সকল শ্রেণির সমন্বয়েই মূলত এ নগর জীবন সরব হয়ে ওঠতো। এ নগরই ছিল সামন্তবাদী সমাজের শক্তি, সৌন্দর্য, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সঙ্গীত, কলাবিদ্যা, গৌরব ও ঐশ্বর্যের প্রতীক বা লীলাভূমি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' দিল্লী, মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ ও বর্ধমান রাজ্যে নাগরিক সমাজকেন্দ্রিক জীবন-যাত্রার পূর্ণাঙ্গ চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। তবে এর মধ্যে বর্ধমান রাজ্যের নাগরিক জীবনের কর্মব্যবস্ততা, কোলাহল, বণিক সমাজ, মহাজন শ্রেণি, সৈন্য সামন্ত, বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির তৎপরতা, বসবাস এবং ঐশ্বর্য বিলাসের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়-

'প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।
ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ফিরিঙ্গি ফরাস ॥

,,,

দ্বিতীয় গড়ে দেখে যত মুসলমান।
সৈয়দ মল্লিক সেখ মোগল পাঠান ॥

,,,

তৃতীয় গড়েতে দেখে ক্ষত্রিয় সকল।
অস্ত্রশাস্ত্রে বিশারদ সমরে অটল ॥

,,,

চতুর্থ গড়েতে দেখ যত রাজপুত।
রাজার পালঙ্ক রাখে যুদ্ধে মজবুত ॥
পঞ্চম গড়েতে দেখে যতেক রাহুত।
ভাট বৈসে তার কাছে যাতায়াতে দূত ॥

,,,

সমুখে দেখেন চক চান্দনী সুন্দর।
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর ॥
চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা।

,,,

দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।
আট হাট ষোল গলি বত্রিশ বাজার ॥

,,,

ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।

ব্যাকরণ অলংকার স্মৃতি দরশন ॥

,,,

বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ ॥
কায়স্থ বিবিধ জাতি দেকে রোজগারি।
বেণে মণি গন্ধ সোনা কাঁসারি শাঁখারি ॥
গোয়ালা তামুলী তিলী তাঁতী মালাকার।
নাপিত বারুই কুরী কামার কুমার ॥
আগরি প্রভৃতি আর নাগরী যতেক।' (পৃ ১৬৮-১৭১)

বর্ণপ্রথা

সামন্তবাদী শাসনামলে বাঙালি হিন্দু সমাজ ছিল মূলত চতুর্বর্ণীয় (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র) ও চতুর্বর্গীয় (ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ) অনুশাসন ও বিশ্বাস দ্বারা চালিত। শূদ্রের পরেও অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ আরেক শ্রেণিরও উল্লেখ পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ্যবাদী শ্রেণির স্বার্থ চিন্তা ও কূটকৌশলের ফলেই মূলত হিন্দু সমাজ-জীবনে এ বর্ণপ্রথা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। এ বর্ণপ্রথার কারণেই মূলত সমাজের বন্ধন ও অনুশাসন শিথিল হয়ে পড়ে এবং অত্যাচারিত, শোষিত নিম্নবর্গের জনগণ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। এর ফলে হিন্দু সমাজ হুমকির সম্মুখীন হয় এবং সমাজে বিপর্যয় নেমে আসে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বর্ধমান নগর ও বড়গাছি গ্রামের জনজীবনে বর্ণপ্রথার দাপটের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। হোড় সম্প্রদায়কে 'বাহাত্তরে কায়স্থ' বলে গঞ্জনা, অবজ্ঞা দিতে ও তাদের স্পর্শ এড়িয়ে চলতে দেখা যায়-

ক. ব্রাত্য বা অন্ত্যজ শ্রেণি

'চাড়াল বাগদী হাড়ী ডোম মুচী শুঁড়ী ॥
কোল কলু ব্যাধ বেদে মাল বাজীকর।
বাইতি পটুয়া কান কসবি যতেক।
ভাবক ভক্তিয়া ভাঁড় নর্ত্তক অনেক ॥' (পৃ- ১৭১)

খ. চতুর্বর্ণীয় সমাজ

'কহিতে ব্রাহ্মণ কি আছে লক্ষণ
বেদাচার বহিষ্কৃত।
ক্ষত্রিয় কথন না হয় ঘটন
জটা ভস্ম আদি ধৃত ॥
যদি বৈশ্য হয় চাষী কেন নয়
নাহি কোন ব্যবসায়।
শূদ্র বলে কেবা দ্বিজ দেয় সেবা
নাগের পৈতা গলায় ॥ (পৃ- ২০)

সামাজিক অবক্ষয়

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতেই বাঙালি সমাজ জীবনে অবক্ষয়ের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যায়। কারণ মুঘল শক্তির পতন, বিদেশি বণিক গোষ্ঠীর রাজ্যলিপ্সা, দেশীয় বণিক ও বিত্তবান শ্রেণির স্বার্থ চিন্তা, ক্ষমতার স্পৃহা ও

সীমাহীন দুর্নীতি বাংলার সমাজ জীবনকে ভয়ংকরভাবে কলুষিত করে তোলে। কঠোর-কঠিন মুসলিম ও হিন্দু ধর্মীয় বিধি-বিধান অর্থের কাছে পরাভব মানতে শুরু করে। শাসক শ্রেণি ভোগ বিলাসে আকণ্ঠ নিমগ্ন ও নিমজ্জিত থাকায় দেশের শাসন ব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়ে। এতে সমাজের সকল স্তরেই ঘুষ-দুর্নীতি, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, লোভ-স্বার্থপরতা, অনাচার-ব্যাভিচার-ভোগ-বিলাস যেমন বেড়ে যায়, তেমনি আবার নৈতিক মূল্যবোধ, সততা ও দেশপ্রেমের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পায়। আর এ কারণেই পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭ (খ্রি.) বাঙালির পরাজয় ঘটে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' মুর্শিদাবাদ, নবদ্বীপ, বর্ধমান ও বাগোয়ানের নাগরিক ও গ্রামীণ সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, ঘুষ-দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র-কূটকৌশল, মিথ্যাচার, স্বার্থচিন্তা, প্রতারণা ও কৃতঘ্নতা প্রকট আকার ধারণ করে। যা গোটা সমাজকে বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়–

ঘুষ-দুর্নীতি

তৎকালীন নবাবী শাসনামলে অন্যান্য বিপর্যয়ের মধ্যে ঘুষ-দুর্নীতির প্রাদুর্ভাব ঘটে। নবাবদের ভোগ বিলাস ও শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রশাসনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ সৈনিক এবং বিত্তবান অভিজাত থেকে শুরু করে সাধারণ শ্রমিকও ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে। এ ঘুষ-দুর্নীতিই বাংলার জন্য বিপর্যয় ডেকে আনে।

ক. দারোয়ানের ঘুষ গ্রহণ

'সুন্দর কহেন ভাই ঘোড়া জোড়া ছেড়ে যাই
খুঙ্গী পুথি ধুতি পাখি লয়ে।
তবে নাক ছাড় দ্বারী দ্বারী কহে তবে পারি
জমাদ্দর বখশীরে কয়ে ॥
শিরোপা স্বরূপে রায় পেসকোশ দিলা তায়
ঘোড়া জোড়া পাঁচ হাতিয়ার।
দ্বারী ছেড়ে দিল দ্বার থানায় হইয়া পার
প্রবেশিলা নগরে কুমার ॥' (পৃ- ১৬৭)

খ. কোটাল বা কতোয়ালের ঘুষ গ্রহণ

'দূর কর কূটনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গাপার কর গালে চুন কালি দিয়া ॥
ঢেকা দিয়া কোটালের ভাই লয়ে যায়।
ধুতি খেয়ে ছেড়ে দিল মালিনী পলায় ॥' (পৃ- ২৬৭)

সুযোগ সন্ধানী

নবাবী শাসনামলে কেন্দ্রীয় শক্তির (দিল্লীর) দুর্বলতা এবং নবাবদের অযোগ্যতা, উদাসী-ভোগ-বিলাসী প্রবণতার কারণে রাষ্ট্রীয়-সমাজ জীবনে এক শ্রেণির সুযোগ-সন্ধানী ও কপট লোকের আবির্ভাব ঘটে। এদের চাটুকারিতায় ও স্বার্থ চিন্তার কারণে দেশে বিপর্যয় নেমে আসে।

দাসু-বাসুর স্বার্থপরতা

'দাসু-বাসু আদি যত পলাইয়াছিল।
সংবাদ পাইয়া সবে আসিয়া মিলিল ॥

,,,

করিলেন স্নান দান প্রয়াগের নীরে।
দাসু-বাসু নিবেদন করে ধীরে ধীরে ॥

,,,

জ্ঞানবলে তোমরা আন্ধারে দেখ আলো।
চক্ষু কান আছে মোরা তবু কানা বলো ॥ (পৃ- ৩২১)

মূল্যবোধের অবক্ষয়

নবাবী শাসনামলে বাংলার সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয়ের সূচনা হয়। যেখানে নর-নারীর পরকীয়া প্রবণতা, রিরংসা তাড়না এবং আত্মঘাতী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

ক. নারীর পরকীয়া প্রবণতা

'দেখিয়া সুন্দর রূপ মনোহর
স্মরে জরজর যত রমণী।
কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি ॥
আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে।
যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পালাইয়া সাগর পারে ॥' (পৃ- ১৭৩)

খ. পুরুষের রিরংসা তাড়না

'পুরুষেরা দেখ যদি নারী মরি যায়।
অন্য নারী ঘরে আনে নাহি স্মরে তায় ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা ॥' (পৃ- ৫১)

সততা, ন্যায়নিষ্ঠা ও নৈতিক মূল্যবোধ

তৎকালীন সামন্তবাদী সমাজের নৈতিক অধপতন ও বিপর্যয়ের বিপরীত মেরুতে সততা ও শুদ্ধাচারী সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কারণ তখনো এক শ্রেণির মানুষ ছিল, যাদেরকে পার্থিব জীবনের এ লোভ-লালসা ও স্বার্থচিন্তা কলুষিত করতে পারেনি। সততা, সংযম, ন্যায়-নিষ্ঠা, দয়া-দাক্ষিণ্যে তারা ছিলেন অটুট ও অবিচল। 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বালক হরিহোড়ের কর্মকাণ্ড ও মানসিকতার মাধ্যমে সমকালীন সমাজে বিদ্যমান সততা শুদ্ধাচারী প্রবণতার ইঙ্গিত মেলে-

'কোথা হৈতে আসি বুড়ী ঘুঁটে লয়ে ভরে ঝুড়ি
সর্ব্বনাশ করিল আমার।
কাড়ি নিলে হবে পাপ বুড়ী পাছে দেয় শাপ
এ দুঃখের নাহি দেখি পার ॥' (পৃ- ১৪২)

সাম্প্রদায়িক ঘৃণা ও বিদ্বেষ

রাজনৈতিক পালাবদলের কারণে গোটা ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ ও ভেদনীতি ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। এর ফলে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর পরস্পরকে ঘৃণা, অবিশ্বাস, অবজ্ঞা ও শত্রু ভাবতে শুরু করে। এতে করে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নিরাপত্তা, সুখ-শান্তি চরমভাবে ব্যাহত হয়। এ ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষবাষ্পের কারণেই মূলত দেশীয় হিন্দু জমিদার, বণিক ও মহাজন-বিত্তবান গোষ্ঠী মুসলিম নবাবের বিরুদ্ধাচরণ করে ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে হাত মেলান। সামাজিক জীবনের মানসিক অসন্তোষ রাষ্ট্রীয় জীবনে মহা বিপর্যয় ডেকে আনে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলায় নবাব আলীবর্দী খান ও বর্গীরাজা ভাস্কর পণ্ডিতের কার্যকলাপ এবং মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ও ভবানন্দ মজুমদারের কথোপকথনে এ সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষ, সন্দেহ-সংশয়ের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে।

ক. মুসলমান সৈন্য কর্তৃক মন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠন

'বিস্তর লস্কর সঙ্গে অতিশয় জুম।
আসিয়া ভুবনেশ্বরে করিলেক ধুম ॥
ভুবনে ভবনেশ্বর মহেশের স্থান।
দুর্গা সহ শিবের সর্ব্বদা অধিষ্ঠান ॥
দুরাত্মা মুঘল তাহে দৌরাত্ম্য করিল।' (পৃ ১০-১১)

অথবা,

যত দেবতার মঠ ভাঙ্গি ফেলে করি হঠ
নানা মতে করে অনাচার
বামন পণ্ডিত পায় থুথু দেয় তার
পৈতা ছেঁড়ে ফোঁটা মোছে আর ॥' (পৃ- ৩১২)

খ. হিন্দু বর্গীদের দ্বারা মুসলিম রাজ্য লুণ্ঠন

'মারিতে লইল হাতে প্রলয়ের শূল।
করিব যবন সব সমূল নির্ম্মূল ॥
,,,
স্বপ্ন দেখি বর্গিরাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইল রঘুরাজ ভাস্কর পণ্ডিত ॥
বর্গি মহারাষ্ট্র আর সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি।
আইল বিস্তর সৈন্য বিকৃতি-আকৃতি ॥
লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
,,,
কাটিল বিস্তর লোক গ্রাম গ্রাম পুড়ি।
লুঠিয়া লইল ধন ঝিউড়ী বহুড়ী ॥' (পৃ- ১১)

গ. সম্রাট জাহাঙ্গীরের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব

'আমারে মালুম খুব হিন্দুর ধরম।
কহি যদি হিন্দু পতি পাইবে সরম ॥

সয়তানে বাজী দিল না পেয়ে কোরান।
ঝুটে মুট পড়ি মরে আগম পুরাণ ॥

,,,

আর দেখ পাঠা-পাঠী না করি জবাই।
উভ চোটে কেটে বলে খাইল গোসাঁই ॥

,,,

আর দেখ নারীর খসম মরি যায়।
নিকা নাহি দিয়া রাঁড় করি রাখে তায় ॥
মাটি কাঠ পাথরের গড়িয়া মুরুত।
জীউ দান দিয়া পূজে নানামত ভূত ॥

,,,

আমার বাসনা হয় যত হিন্দু পাই।
সুন্নত দেওয়াই আর কলমা পড়াই ॥
জন তোমরা গোঁয়ার আছ জানি।
মিছা লয়ে ফির বেইমানী হিন্দুয়ানি ॥
দেহ জ্বলি যায় মোর বামণ দেখিয়া।
বামনের রাজ্য দিতে বল কি বুঝিয়া ॥' (পৃ- ৩০৫-৩০৬)

ঘ. ভবানন্দের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব

'পুরাণের মত ছাড়া কোরানে কি আছে।
ভাবি দেখ আগে হিন্দু মুসলমান পাছে ॥
ঈশ্বরের নূর বলি দাড়ির যতন।
টিকি কাটি নেড়া মাথা এ যুক্তি কেমন ॥
কর্ণ বেধে যদি হয় হিন্দু গুণাগার।
সুন্নতের গুণা তবে কত গুণ তার ॥

,,,

দেব-দেবী পূজা বিনা কি হবে রোজায়।
স্ত্রী-পুরুষ বিনা কোথা সন্তান খোজায় ॥
দেবী পূজা করে হিন্দু বলিদান দিয়া।
যবনেরা জবে করে পেটের লাগিয়া ॥

,,,

খশম ছাড়িয়া যেবা নিকা করে রাঁড়।
এক ছাড়ি গাই যেন ধরে আর ষাঁড় ॥

,,,

সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয় ॥
পশ্চিমে সূর্য্যের অস্ত সে মুখে নমাজ।
যত করে মুসলমান সকলি অকাজ ॥' (পৃ ৩০৭-৩০৮)

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

তৎকালীন সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষের বিপরীত প্রান্তে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও সম্প্রীতির বন্ধন-বিশ্বাস গড়ে ওঠে। আর এ কারণেই হিন্দু মুসলিম সমাজে বৈবাহিক সম্পর্ক, রাজ দরবারে উচ্চ পদে নিয়োগ, ফকির-দরবেশ-সাধু-সন্ন্যাসীদের উভয় সমাজেই সমানভাবে সম্মান-ভক্তি-শ্রদ্ধা ও সমাদর করতে দেখা যায়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' প্রথম দিকে মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাব থাকলেও পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উন্মেষ ঘটে। তাই তিনি হিন্দু জাতি ও ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয়াবত হয়ে বলেছেন–

'অধম যবন আমি তপস্যা কি জানি।
অধর্ম্মের ধর্ম্ম বলি ধর্ম্ম নাহি মানি ॥

,,,

অধম উত্তম হয় উত্তমের সাথে।
পুষ্প সঙ্গে কীট যেন উঠে সুরমাথে ॥

,,,

ঘৃণা ছাড়ি ছুঁয়ে শুদ্ধ করহ আমারে।
পরশ পরশে লোহা সোনা করিবারে ॥

,,,

জাহাঁগীর ঢেড়ী দিলা সকল শহরে।
অন্নপূর্ণা পূজা সবে কর ঘরে ঘরে ॥

,,,

কাজী ছাড়ে কলমা কোরান চাড়ে কারী।
হুলাহুলি দেই যত যবনের নারী ॥' (পৃ- ৩২০)

ঐশ্বর্য

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় শাসক, সামন্ত জমিদার, অভিজাত শ্রেণি, বণিক-মহাজন গোষ্ঠীর হাতে মূলত অর্থ-কড়ি ও সম্পদ কুক্ষিগত থাকতো। শাসকের আনুকূল্যে এরা সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতো। কিন্তু সাধারণ কৃষক প্রজার দারিদ্র্য-দুর্বিপাক ও দুরবস্থার সীমা ছিল না। কারণ দরিদ্র শ্রেণির সম্পদ বলতে কিছুই ছিল না। এমনকি নিজের জীবনের ওপরও তার কোন অধিকারের স্বীকৃতি তৎকালে ছিল না। ধনী-বিত্তবান গোষ্ঠী তাদের ঐশ্বর্যের দাপটে সমাজকে শাসন-শোষণ করতো। বিত্ত ও ঐশ্বর্যই ছিল তৎকালের মান-মর্যাদা ও সম্মান-সৌভাগ্যের মাপকাঠি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর, সামন্তরাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, বীরসিংহ, ভবানন্দ মজুমদার ও হরিহোড়ের বিত্ত বৈভব, ধন-জন-ঐশ্বর্যের পরিচয় পাওয়া যায়–

ভবানন্দ মজুমদারের ঐশ্বর্য

'পরম আনন্দে ভবানন্দ মজুমদার।
স্নান পূজা করিয়া বাইরে দিলা বার ॥

,,,

ফরমান মত সব সনদ লিখিয়া।
মফস্বলে নায়েব দিলেন পাঠাইয়া ॥

পরগণা পরগণা হইল আমল।
দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।

,,,

হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ॥
পৌষ ফাগুনে বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার ॥' (পৃ- ৩৩৮)

অর্থের প্রভাব

নবাবী শাসনামলেও অর্থের প্রভাব ছিল অনিবার্যভাবে প্রবল। কারণ বাহু বলের চেয়ে অর্থবলের প্রাধান্য তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠা পায়। তাই নবাবের ওপর শেঠরা প্রভাব খাটাইতে শুরু করে। সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় অধস্তন প্রজার সামাজিক সম্মান-সৌভাগ্য-ঐশ্বর্য মূলত শাসকের সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করতো। শাসকই ছিলেন প্রজার সুখ-দুঃখের বিধাতা। এখানে দরিদ্র হরিহোড়ের দেবী অন্নপূর্ণা কর্তৃক ধন প্রাপ্তির বর মূলত সামন্ত শাসকের বিশেষ অনুগ্রহ বা মর্জির প্রতীকী ইঙ্গিত।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' অর্থের শাশ্বত প্রভাবের চিত্র প্রকাশ পেয়েছে। হীরামালিনীর কথায়, নিম্নবর্গের হরিহোড়ের উচ্চবর্ণে উন্নীত হবার ক্ষেত্রে এবং নলকুবেরের আত্ম অহংকার ও দাম্ভিকতায়-

ক. হরিহোড়ের সামাজিক সম্মান-সৌভাগ্য প্রাপ্তি

'এই রূপে হরিহোড় পেয়ে ধন বর।
ধনধান্যে পরিপূর্ণ কুবের সোঁসর ॥
কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানা মতে ধন দিয়া সকলে তুষিল ॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহাত্তরে গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥' (পৃ- ১৪৭)

খ. হীরার টাকা-পয়সার প্রশস্তি

'কড়ি কর বিতরণ যাহে যবে যাবে মন
কৈও মোরে তখনি আনিব ॥
কড়ি ফট্কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়িতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে মরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ি দিলে ॥' (পৃ- ১৭৮)

ভোগ-বিলাসিতা

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় নবাব, সামন্ত জমিদার, জোতদার, বণিক, মহাজন, আমলা ও অভিজাত গোষ্ঠী অর্থ-বিত্তের বিরূপ প্রভাবে ভোগ-বিলাসিতায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। মদ, নারী, নাচ-গান, ধূমপান, বুলবুলির বিয়ে,

শিকার ও খেলাধুলায় সময় কাটিয়ে শাসন কাজে উদাসীন হয়ে পড়ে। এরূপ চিত্র পাওয়া যায়– ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নববাবু বিলাস (১৮২৫), দূর্তিবিলাস (১৮২৫), নববিবি বিলাস (১৮৩১) কলিকাতা কমলীলয় (১৮২৩) গ্রন্থে। এতে এক দিকে যেমন জীবনী শক্তির অপচয়ে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়ে মৃত্যু নিকটতর হয়ে পড়ে, তেমনি অন্যদিকে এ দুর্বলতার সুযোগে স্বার্থপর সুযোগ সন্ধানী মহল কূটকৌশলে শোষণ-জুলুম চালিয়ে প্রজাদের অশান্ত করে বা ক্ষেপিয়ে তুলে বিদ্রোহ করে বা সিংহাসন দখল করে নেয়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' সামন্তবাদী সমাজের ভোগ-বিলাসিতার চিত্র উন্মোচিত হয়েছে নলকুবেরের রমণী সম্ভোগে, হরিহোড়ের যাপিত জীবনে, সুন্দর বিদ্যার পোষা শুক-সারীর বিবাহদানের মাধ্যমে–

সুন্দর ও বিদ্যার শুক-সারীর বিবাহদান

'চতুর চতুরা পেয়ে চাতুরীর মেলা।
নিজ নিজ নূতন নূতন রসে খেলা ॥

,,,

কুমারের পড়া শুক দেখিয়া কুমারী।
ফিরে আসি লয়ে গেলা আপনার সারী ॥
সারী শুকে বিয়া দিলা আনন্দে দুজন।
বেহাই বেহানী বলে বাড়ে সম্ভাষণ ॥' (পৃ- ২৩১)

ধনী শ্রেণির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য

সামন্তবাদী সমাজে ধনী বা বিত্তবান শ্রেণি অর্থের প্রভাবে, বংশীয়-কুল গর্বে ও বাহুবলের আত্ম অহংকারে কিছুটা অত্যাচারী, পরপীড়ক, কর্মবিমুখ, নেশাগ্রস্ত, ভোগ-বিলাসী, বহুগামী ও বহু বিবাহে আসক্ত বা অভ্যস্থ হড়ে পড়ে। তবে এর বিপরীতে দান-দয়া-দাক্ষিণ্য, পরার্থপরতা, কল্যাণধর্মী স্বভাবেরও পরিচয় সমকালে দুর্লভ ছিল না।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' দেবী অন্নপূর্ণার জবানিতে ধনী শ্রেণির মধ্যে কুলগর্ব, কর্মবিমুখতা, বহুবিবাহ প্রবণতা ও মনোমালিন্যের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। আর এ বিষয়টি ঈশ্বরী পাটুনীর স্বীকৃতিতে তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেছে-

'ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥
গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশজাত।
পরমকুলীন স্বামী বন্দ্যবংশখ্যাত ॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম ॥
অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন ॥
কুকথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ ॥
গঙ্গা নামে সতা তার তরঙ্গ এমনি।
জীবন স্বরূপ সে স্বামীর শিরোমণি ॥

,,,

পাটুনী বলিছে আমি বুঝিনু সকল।
যেখানে কুলীন জাতি সেখানে কন্দল ॥' (পৃ- ১৫৭)

দারিদ্র্য

মধ্যযুগের বাংলায় রাজা-রাজরা, নবাব-বাদশাহেরা ক্ষমতা অধিকারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। সমাজ বিধায়করা নিজ নিজ সমাজ সংরক্ষণের দুশ্চিন্তায় ছিলেন মগ্ন। গ্রাম্য প্রধানরা রাজন্যবর্গের সুখ বিধানের জন্য ছিলেন চিন্তিত; কিন্তু সাধারণ দুঃস্থ মানুষের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করার অবসর বা চিন্তা কাহারও ছিল না। এদিকে দৃষ্টিপাত করার কথাও নয়। তাই বাংলার বৃহত্তর গণজীবন প্রাচুর্যের দেশেও ছিল বঞ্চনায় বেদনায় পাণ্ডুর। অমানবিক বিধি-বিধান ও পরিবেশের শাসনে বিষণ্ন।[৫৯]

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শিব, হরিহোড়, দাস-বাসু ও ঈশ্বরী পাটুনীর জীবন যাত্রায় বাঙালির শাশ্বত দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে-

ক. শিবের দারিদ্র্য

'শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি ॥
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাদ করে এক দিন পেট ভরে খাই ॥
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে ॥
ভিক্ষা মাগি ভিক্ষা মাগি কাটিলাম কাল।
তবু ঘুচাইতে নারিলাম বাঘছাল ॥
নীচ লোকে উচ্চ ভাষে সহিতে না পারি।
ভিক্ষা মাগি নাম হৈল শঙ্কর ভিখারী ॥' (পৃ- ৫৬)

খ. পদ্মিনী ও হরিহোড় পরিবারে দুঃখ দারিদ্র্য

'শুনিয়া কহিছে রামা করিয়া ক্রন্দন।
কে ডাকিলে অভাগীরে কে আছে এমন ॥
পদ্মগন্ধ যার গায় সে হয় পদ্মিনী।
পদ্মপাত পরি আমি হয়েছি পদ্মিনী ॥
ঘুঁটে কুড়াইয়া স্বামী বেচেন বাজারে।
যে পান খাইতে তাহা না আঁটে তাঁহারে ॥
মৌলিক কায়স্থ জাতি পদবীতে হোড়।
কত কষ্টে মিলে এটে নাহি মিলে থোড় ॥
বাহাত্তরে কায়স্থ বলিয়া গালি আছে।
বসিতে না পান ভাল কায়স্থের কাছে ॥' (পৃ ১৩৯-১৪০)

দুধভাত : গরীবের প্রত্যাশা

মধ্যযুগে বাংলায় বিত্তবানদের ধন-ঐশ্বর্যের মাপকাঠি ছিল সোনার থালাবাসন। ধনী-বিত্তবান শ্রেণির প্রভাব প্রতিপত্তি, গর্ব-আভিজাত্য নির্ভর করতো এসব সোনার থালাবাসনের ওপর।[৬০] কারণ বিত্তবানগণ এসব সোনার থালা-বাটিতে যেমন খাবার খেতেন, তেমনি আবার সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে এসব তৈজসপত্র ব্যবহার ও

প্রদর্শনী করতে গর্ববোধ করতেন। সোনার থালাবাটি ও অন্যান্য তৈজসপত্রের সংখ্যা যার যতো বেশি থাকতো, সমাজে তার ততো সম্মান-সৌভাগ্য বৃদ্ধি পেতো

পক্ষান্তরে মধ্যযুগের বাংলায় সামন্তশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য ছিল নিত্য সঙ্গী। এ 'সোনার বাংলা বা ভূস্বর্গের'[৬১] অর্থ-বিত্ত-প্রাচুর্যের অন্ত ছিল না। কিন্তু তা কুক্ষিগত ছিল কতিপয় সামন্ত শাসক, অভিজাত শ্রেণি ও বণিক-মহাজনদের হাতে। তাই সময়ের আবর্তে বাংলার শাসন ব্যবস্থায় বার বার শাসকদের পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু গরীব বাঙালির ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটেনি। চির অবহেলিত, অসহায় দরিদ্র বাঙালি তাই তাদের স্থির, অপরিবর্তনীয়, অচলায়মান ও প্রতিকারহীন জীবনে দুদণ্ড শান্তি সুখের উৎস হিসেবে ছেলে সন্তান নিয়ে দুধভাত খেতে পারার মাধ্যমেই আত্মতৃপ্তি খুঁজেছে। তাই এ দুধভাত খেতে পারা বা খাবার ইচ্ছাই ছিল তৎকালীন বাঙালি দরিদ্র গোষ্ঠীর একমাত্র প্রত্যাশা এবং পার্থিব জীবনের পরম পাওয়া।

মধ্যযুগের শুধু ঈশ্বরী পাটুনী নয় বরং বিংশ শতাব্দীতেও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের (১৯৪৩-১৯৯৭ খ্রি.) 'দুধভাতে উৎপাত' (১৯৮৫ খ্রি.) নামক গল্পের আরেক গরীব বাঙালি মা জয়নাব তার সন্তানদের বছরে অন্তত একবার দুধভাত খেতে দিয়েছেন (যদিও ব্যর্থ হয়েছেন)। জীবনে আর কিছু না থাক, অন্তত দুধ ভাতে সন্তানকে মানুষ করার প্রত্যাশা ঈশ্বরী পাটুনী ও জয়নাবের মতো সকল বাঙালি মায়েরই ছিল একমাত্র প্রত্যাশা।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' ঈশ্বরী পাটুনী ও বাসুর কাছে এ দুধভাতের প্রত্যাশাই বড় হয়ে উঠেছে–

ক. ঈশ্বরী পাটুনীর দুধভাত প্রত্যাশা

গাঙ্গিনী নদীর খেয়াঘাটের মাঝি ঈশ্বরী পাটুনী দেবী অন্নপূর্ণাকে পাড় করে দেন। এর বিনিময়ে দেবী ঈশ্বরীকে বর চাইতে বললে, সে অন্যান্য লোকের মতো পার্থিব জগতের মূল্যবান ধন রত্ন না চেয়ে বরং তার দরিদ্র সন্তানের দুদণ্ড ঘুম-শান্তির জন্য দুধ-ভাতের প্রার্থনা জানায়। গরীব ঈশ্বরীর চিন্তা-চেতনা ও জীবন ভাবনার পরিধি হয়তো ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু সন্তানের মঙ্গল কামনায় তার এ প্রার্থনার গুরুত্বের গণ্ডী ছিল বিশাল। মমতাময়ী ও হিতাকাঙ্ক্ষী মাতৃমূর্তিতে ঈশ্বরী পাটুনীর এ নিবেদন সমগ্র দরিদ্র বাঙালি মায়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে। সন্তানের মঙ্গল কামনায় এরূপ নিবেদন বা প্রার্থনার ব্যঞ্জনা শুধু 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' নয় বরং সমগ্র বাংলা সাহিত্যে বিরল। তাই ঈশ্বরী পাটুনী বলেছেন–

'প্রণমিয়া পাটুনী কহিছে যোড় হাতে।
আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ॥' (পৃ- ১৫৯)

দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট মানুষের এই জীবন প্রার্থনা সে যুগের কবির কাব্যে যে এমন অপূর্ব সুরে বেজেছে তা বিস্ময়কর ও শ্রদ্ধার যোগ্য। এই পঙ্ক্তির বিদ্যুৎ আলোয় চকিতে ভারত কবির যে মূর্তি চোখে পড়ে তা রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত চূড়াকে অতিক্রম করে উঁচু হয়ে আছে। ব্যথার সমুদ্র থেকে তাঁর সদ্যোত্থিত হস্ত স্বর্গের আশ্বাসের দিকে প্রসারিত।[৬২]

খ. বাসুর দুধভাতে সুখ-শান্তি খোঁজা

গরীব দাসু-বাসু দুই ভাই ভবানন্দ মজুমদারের অনুচর হিসেবে দিল্লী গমন করে এবং মনিবের বন্দীদশায় তারা মহা বিপদে পড়ে। এ আপদকালে গরীব বাসু দুঃখের সঙ্গে উচ্চাভিলাষী মনিব ভবানন্দকে ভর্ৎসনা করে বলেছে–

'হেদে বামনের ছেলে   আগু পাছু নাহি চেলে
দিল্লী আইল রাজাই করিতে।
দুধে ভাতে ভাল ছিল   হেন বুদ্ধি কেটা দিল
পাতশার দেয়ানে আসিতে ॥' (পৃ- ৩১০)

দরিদ্র শ্রেণির মানসিকতা

সামন্তবাদী শাসনামলে বাংলার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুঃখ-দুর্দশার সীমা ছিল না। কারণ রাজনৈতিক পালাবদলে শাসকের পরিবর্তন হতো কিন্তু গরীবের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটতো না। এ চিরস্থায়ী, প্রতিকারহীন, দুঃখ-দারিদ্র্যের অভিশপ্ত গরীব নর-নারী স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা লোভী, সুযোগ সন্ধানী, আত্মমুখর ও ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠতো। আপাত সুখের আশায় তাদের এসব তৎপরতা মূলত চিরস্থায়ী দারিদ্র্যপূর্ণ জীবনে দুদণ্ড সুখের ক্ষেত্রে সান্ত্বনার নামান্তর।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ দাসু-বাসুর চিন্তাভাবনা, দাসুর স্ত্রীর প্রত্যাশা এবং গৃহভৃত্য সাধী-মাধীর স্বার্থপরতার মাধ্যমে মূলত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানসিকতার চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে–

ক. দাসুর মানসিকতা

‘দাসু বলে বাসু ভাই পলাইয়া চল যাই
কি হইবে বিদেশে মরিলে।
বিস্তর চাকরি পাব বিস্তর পরিব খাব
কোনরূপে পরাণ থাকিলে ॥
যুবতী রমণী আছে না রয়ে তাহার কাছে
কেন আনু বামনের সাথে।
নারী রৈল মুখ চেয়ে তবু আনু মাটি খেয়ে
তারি ফল পানু হাতে হাতে ॥
দিবসে মজুরি করে রজনীতে গিয়া ঘরে
নারী লয়ে যে থাকে সে সুখী।
নারী ছাড়ি ধন আশে যেই থাকে পরবাসে
তারে বড় কেবা আছে দুখী ॥’ (পৃ- ৩০৯)

খ. বাসুর মানসিকতা

‘কান্দিয়া কহিছে বাসু উচিত কহিলা দাসু
এই দুখে মোর প্রাণ কাঁদে।
মরি তাহে দুখ নাই নারী রইল কোন ঠাঁই
বিধাতা ফেলিল একি ফাঁদে ॥
কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু ॥’ (পৃ- ৩০৯)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন

জীবিকা সম্পৃক্ত জীবনের সার্বক্ষণিক ও বহুধা অভিব্যক্তিই সংস্কৃতি। জীবন জীবিকাগত নয় কেবল, স্থান-কাল ও গোষ্ঠীগতও বটে। মানব সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য, বিভিন্নতা, বিবর্তন ও বৈষম্য ঘটে এ কারণেই। অনুভূতি ও মননের অভিব্যক্তি এবং আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজন চেতনার বহিঃরূপই সংস্কৃতির সাক্ষ্য। সংস্কৃতির আবর্তন-নিবর্তন-উদবর্তন কিংবা বিকাশ-বিবর্তন তাই শাস্ত্রিক, আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক, শৈল্পিক ও প্রশাসনিক সাবলীলতা স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা দৌর্বল্য দুর্দশার উপর নির্ভরশীল।

সামগ্রিক দৃষ্টিতে মানুষের জন্ম-বিবাহ ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত যাবতীয় সকল কিছুই সংস্কৃতির ভেতরে গণ্য করা হয়। অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞান, ভাব-ভাষা, আচার-বিশ্বাস, শিল্পকলা, নীতিবোধ, আইনকানুন, অনুশীলন, বসন-ভূষণ ও অভ্যাস যেসব মানুষ কোন এক সমাজের পরিবেশে আয়ত্ত করে, সেসব কিছুকেই বলে সেই সমাজের সংস্কৃতি। সুতরাং সংস্কৃতি বলতে মানব সৃষ্ট সব কিছুকেই বোঝায় এবং এ সংস্কৃতি বংশ পরম্পরা উত্তরাধিকার সূত্রে মানব সমাজে বর্তায়।

বিবাহ

বিবাহই বাঙালি জীবনের প্রধান সংস্কার। কনে ও বর দেখা থেকে শুরু করে ঘরবাড়ি দেখা, পাকা কথা, দিন-তারিখ ঠিক করা, বিয়ে ভোজ, কন্যা সম্প্রদান, বৌভাত এর অন্তর্ভুক্ত। হিন্দু সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রেই– নান্দীমুখ, অধিবাস, গাত্রহরিদ্রা, বরবরণ, সপ্তপদীগমন, অরুন্ধতী দর্শন, লাজহোম, অশ্মারোহন, কুশণ্ডিকা, দ্বিরাগমন এ দশটি পর্বকে আবশ্যিক কর্ম হিসেবে পালন করা হয়। বিভিন্ন প্রকার বিবাহের প্রচলন থাকলেও বাঙালি সমাজে সাধারণতঃ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহেরই প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ শিব-গৌরী, বিদ্যা-সুন্দরের বিবাহে বাঙালি সমাজে প্রচলিত সকল লোকাচারে চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। বিবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর আলোচনা নিম্নরূপ–

পাত্র নির্বাচন

বাঙালি সমাজে বিবাহের পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে পাত্রের বংশ, বিদ্যা, ধন-সম্পদ, স্বভাব-চরিত্র, দৈহিক সুগঠন, বলবুদ্ধি ও শৌর্য-বীর্যকে প্রাধান্য দেয়া হতো। এছাড়া শারীরিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী পাত্রকে- শশক, মৃগ, বৃষ ও অশ্ব শ্রেণিতে বা পর্যায়ে বাছাই করা হতো।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ শিব ও সুন্দরের বিবাহের সময়ও এসব বিষয় মানা হয়েছিল–

পাত্র হিসেবে সুন্দর

‘কাঞ্চীপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাহার তনয় ভুবন বিজয়
সুকবি নাম সুন্দর ॥

,,,

রূপের নাগর গুণের সাগর
আর কি এমন আছে ॥’ (পৃ ১৯০-১৯১)

পাত্রী নির্বাচন

বাঙালি সমাজে বিবাহের পাত্রী নির্বাচন করতে আর্য যুগে প্রচলিত ৫টি গুণকে মানদণ্ড হিসেবে ধরা হতো; যথা- রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বংশ প্রভৃতি। এছাড়া শারীরিক বৈশিষ্ট্যানুযায়ী- পদ্মিনী, চিত্রানী, শঙ্খিনী ও হস্তিনী পর্যায়ে নারীকে চিহ্নিত করা হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বিবাহের পাত্রী হিসেবে বাছাই করতে গৌরী ও বিদ্যার ক্ষেত্রেও এসব মানা হয়েছিল–

পাত্রী হিসেবে বিদ্যা

'বীর সিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥' (পৃ- ১৬২)

বংশ-কুল বিচার

বাঙালি সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র ও পাত্রীর বংশ-কুল বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে বিচার-বিবেচনা করা হতো। বংশ কৌলিন্যই ছিল আদর্শ পাত্র ও পাত্রীর মাপকাঠি। এ বংশ কৌলিন্যের গর্ব ও দাপটে পাত্র-পাত্রীর অনেক দোষ-ত্রুটি ঢাকা পড়ে যেতো। তবে এক্ষেত্রে পাত্রপক্ষই সুবিধা পেতো বেশি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শিব, হরিহোড়, সুন্দর ও বর্ধমান নগরের কুলীন নারীর বিবাহের সময়ও এভাবে কুল-বংশ বিচার করতে দেখা যায়–

ক. হরিহোড়ের বিবাহে কুলবিচার

'কুলীন মৌলিক যত কায়স্থ আছিল।
নানামতে ধন দিয়া সকলে তুষিল ॥
ঘটক পাইয়া ধন গাইল ঠাকুর।
বাহাত্তর গালি ছিল তাহা গেল দূর ॥
ঘোষ বসু মিত্র মুখ্য কুলীনের কন্যা।
বিবাহ করিল তিন রূপে গুণে ধন্যা ॥' (পৃ- ১৫৭)

খ. সুন্দরের কুল-বংশের পরিচয়

'কাঞ্চীপুর ধাম গুণসিন্ধু নাম
মহারাজ রাজেশ্বর।
তাঁহার তনয় ভুবন বিজয়
সুকবি নাম সুন্দর ॥' (পৃ- ১৯০)

স্বয়ংবর প্রথা (তর্ক যুদ্ধ বা পাণ্ডিত্য বিচারের মাধ্যমে)

সামন্তবাদী শাসন ব্যবস্থায় রাজকুমারীদের বরবরণ বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বয়ংবর প্রথার প্রচলন ছিল। আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি নির্দিষ্ট দিনে দেশ-বিদেশের রাজা ও রাজপুত্রদের আমন্ত্রণ জানানো হতো এবং রাজকুমারী পছন্দানুযায়ী পাত্রের গলায় ফুলের মালা পড়িয়ে দিয়ে বর নির্বাচন করতেন। অনেক সময় যুদ্ধ, নানা রকম পরীক্ষা ও প্রহেলিকায় উত্তীর্ণ হতে হতো আগত পাত্রদের।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' রাজকন্যা বিদ্যা পাণ্ডিত্য বিচার বা তর্কযুদ্ধের মাধ্যমে বরবরণের যে পদ্ধতি বেছে নিয়েছিল, তা মূলত স্বয়ংবর প্রথারই নামান্তর বলা যায়–

'বীর সিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা

রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়
রাজা ভাবে কি হইবে ইহার ॥
শেষে শুনি সবিশেষ কাঞ্চী নামে আছে দেশ
তাহে রাজা গুণসিন্ধু রায়।
সুন্দর তাহার সুত বড় রূপ গুণযুত
বিদ্যায় সে জিনিবে বিদ্যায় ॥' (পৃ- ১৬২)

গান্ধর্ব বিবাহ প্রথা

মনুস্মৃতিতে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায় যথা- ব্রাহ্ম, দৈব, আর্য, প্রজাপত্য, আসুর, গান্ধর্ব, রাক্ষস ও পৈশাচ প্রভৃতি। এর মধ্যে গান্ধর্ব বিবাহের বাড়তি তাৎপর্য হলো- নর-নারী উভয়ে সম্মত হয়ে ইচ্ছানুযায়ী শুধু দেবতাকে সাক্ষী মেনে মালা বদল করলেই বিবাহ হয়ে যেতো। মুক্ত ও স্বাধীনচেতা নর-নারীদের ক্ষেত্রে এ বিবাহ প্রথাটির গুরুত্ব ছিল অসামান্য।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বিদ্যা সুন্দরের বিবাহটি গান্ধর্ব প্রথানুসারেই সম্পাদিত হয়েছিল−

'বিদ্যা বলে হারিলাম তুমি মোর স্বামী ॥
শুভক্ষণে নিজ হার খুলি নৃপবালা।
হরগৌরী সাক্ষী করি দিলা বরমালো ॥
,,,
বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গান্ধর্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার ॥
কন্যা কর্ত্তা হৈল কন্যা বরকর্ত্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য হৈল পঞ্চশর ॥' −(পৃ ২০৮-২০৯)

বর সজ্জা

বিবাহের জন্য বরকে শাস্ত্র ও সামাজিক আচার মেনেই ক্ষৌরকর্ম, গায়ে হলুদ, স্নান, অলংকার ও পোশাক পরিধান করানো হতো। বর সজ্জার ব্যাপারটি বিবাহের গুরুত্বপূর্ণ একটি পর্ব। যা বরের ভগ্নিপতি ও আয়াগণ সম্পন্ন করে থাকে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বিবাহের জন্য শিব ও সুন্দরকে বিচিত্র বস্ত্র ভূষণে সাজ-সজ্জা করতে দেখা যায়−

শিবের বর সজ্জা

'মনোহর বর হরে দেখিবারে পায় ॥
জটাজূট মুকুট দেখিলা ফণিমণি।
বাঘছাল দিব্য বস্ত্র দিব্য পৈতা ফণী ॥
ছাই দিব্য চন্দন বদন কোটি চাঁদ।
মুগ্ধ হৈল সর্ব্বজন দেখিয়া সুছাঁদ ॥
হরগুণ বরগুণ হৈল এক ঠাঁই।
মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই ॥' −(পৃ- ৪৫)

কনে সজ্জা

বাঙালি সমাজে বিবাহের কন্যাকে বিচিত্র বস্ত্র, অলংকার ও প্রসাধনের সমন্বয়ে সাজানো হয়। কনে সাজানোর ক্ষমতা ও পরিপাটির ওপর আয়াদের মান-সম্মান ও গর্ব নির্ভর করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' গৌরী ও বিদ্যাকে বিবাহের জন্য বিচিত্র বস্ত্র ও ভূষণে সাজসজ্জা করতে দেখা যায়–

'আহা মরি ও মা উমা সোনার পুতুল।

,,,

পায়ে পড়ে আমার উমার কেশপাশ।

,,,

আমার উমার দন্ত মুকুতা গঞ্জন।

,,,

উমার বদনচাঁদে পরকাশে রাকা।

,,,

কি শোভা উমার গায়ে সুগন্ধি চন্দন।

,,,

উমার গলায় জাতী মালতীর মালা।

,,,

বিচিত্র বসন উমা পরে কত বন্ধে।

,,,

উমার রতনকাঞ্চী ভ্রমর গুঞ্জরে।' –(পৃ- ৪৪)

ঘটকালী প্রথা

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই বিবাহের অনুঘটক হিসেবে ঘটকের বিশেষ মর্যাদা ও গুরুত্ব ছিল। ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অন্য বর্ণ-গোত্রের লোকজনও এ পেশা কর্মে আত্মনিয়োগ করতেন। পেশাদার ও অপেশাদার উভয় শ্রেণির ঘটকের তৎপরতা দেখা যেতো। এ ঘটকগণ পেশাসূত্রেই বাকপটু, চতুর ও ধুর্ত স্বভাবের হতেন এবং পারিতোষিক হিসেবে অর্থ, বস্ত্র, ছাতা ও নানা দ্রব্য উপহার পেতেন।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শিবের দুই বিয়ে (সতী ও গৌরীর) এবং হরিহোড়ের চার বিয়ে সম্পন্ন হয় ঘটকের মাধ্যমে। শিবের বিয়ের ঘটক ছিলেন নারদ–

'নারদ ঘটক হয়ে নানামত বলে কয়ে
শিবের বিবাহ দিলা সতী।
শিবের বিকট সাজ দেখি দক্ষ ঋষিরাজ
বামদেবে হৈলা বাসমতি ॥
সতী ঝি আমার বিদ্যুৎ আকার
বাতুলের হৈল জায়া।
আমি অভাজন পরম ভাজন
ঘটক নারদ ভায়া ॥' –(পৃ- ১৫-২১)

বিবাহের আনুষ্ঠানিকতা

বাঙালি হিন্দু সমাজে বিবাহের মুল পর্বগুলো আনুষ্ঠানিকভাবেই সম্পন্ন করা হতো। এসব পর্ব বা ক্রিয়ার মধ্যে– বর বরণ, শাস্ত্রপাঠ, গাঁটছাড়া বেঁধে সাতপাকে অগ্নি প্রদক্ষিণ, অরুন্ধতী বা সপ্তর্ষি দর্শন, পানচিনি, কন্যা সমর্পণ ও আশীর্বাদ প্রভৃতি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শিব-গৌরীর বিবাহ সকল ধর্মীয় ও সামাজিক শাস্ত্রাচার-লোকাচার মেনেই সম্পন্ন হতে দেখা যায়–

'সভা মাঝে হিমালয় পূর্ব্বমুখ হয়ে।
বসিয়াছে দানসজ্জা বাম দিকে লয়ে ॥
উত্তরাস্যে রাখিয়াছে বরের আসন।
পরস্পর শাস্ত্র কথা কহে ধীরগণ ॥
হেন কালে বর আসি কৈলা অধিষ্ঠান।
সম্ভ্রমে উঠিয়া সবে কৈলা অভ্যুত্থান ॥

,,,

স্ত্রী আচার করিতে মেনকা আইলা ॥

,,,

এয়োগণ সঙ্গে করি প্রদীপ ধরিয়া।
লইয়া নিছনি ডালা হুলাহুলি দিয়া ॥

,,,

মেনকা আনন্দে ঘরে লইলা জামাই ॥

,,,

কুতূহুলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।
ঋষিগণ বেদগানে পুরিল ভুবন ॥
কিন্নর করয়ে গান নাচয়ে অপ্সর।
অশেষ কৌতুক করে যত বিদ্যাধর ॥
উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।' (পৃ ৪১-৪৬)

কন্যা সম্প্রদান বা সমর্পণ

কন্যা বাড়িতে বিবাহের সর্বশেষ পর্ব বা আনুষ্ঠানিকতা হলো বরের হাতে কন্যাকে সমর্পণ বা সম্প্রদান করা। সাধারণত কন্যার পিতা বা পিতৃব্য শ্রেণির যে কেউ আশীর্বাদ জানিয়ে কন্যাকে বরের হাতে তুলে দেন।
'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' গৌরীকে পিতা হিমালয় এবং বিদ্যাকে পিতা বীর সিংহ জামাতার হাতে সমর্পণ করেছেন–

'সিংহাসনে বসাইয়া বসন ভূষণ দিয়া
বিদ্যা আনি কৈল সমর্পণ।
করিলা বিস্তর স্তব নানা মত মহোৎসব
হুলাহুলি দেই রামাগণ ॥' (পৃ- ২৮৪)

যৌতুক ও দান সামগ্রী

বাঙালি সমাজে বরপণ ও কন্যাপণ উভয়ের প্রচলন রয়েছে। এ সব পণের মধ্যে অর্থাৎ বরপণের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা, আসবাবপত্র, অলংকার, বস্ত্র, গাড়ি, গাভী, হাতি, ঘোড়া, দাস-দাসী, জমি-জমা ও ঘরবাড়ি অন্যতম। আবার কন্যাপণের ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা, অলংকার, জমি, ঘরবাড়িই গুরুত্ব পেতো। তৎকালীন সমাজে যৌতুক ছিল মূলত স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান সামগ্রী মাত্র। তা বর্তমান কালের মতো সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নেয়নি।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বিদ্যা সুন্দরের বিয়েতে বিদ্যার পিতা রাজা বীর সিংহ রায় বরপণ হিসেবে সুন্দরকে বিভিন্ন দান সামগ্রী ও দাসদাসী দান করেছেন। পক্ষান্তরে বাসু কন্যাপণ হিসেবে ২০ টাকা যৌতুক দিয়ে বিয়ে করেছে–

ক. সুন্দরের বরপণ প্রাপ্তি

‘শ্বশুর শাশুড়ী স্থানে মাগিলা বিদায় ॥
বিস্তর নিষেধ বাক্য কয়ে রাজা রাণী।
বিদায় করিলা শেষে করি যোড়পাণি ॥
বিস্তর সামগ্রী দিলা কহিতে বিস্তর।
দাস-দাসী দিলা সঙ্গে সৈন্য বহুতর ॥’ (পৃ- ৩০৯)

খ. বাসুর কন্যাপণ প্রদান

‘কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু ॥’ (পৃ- ৩০৯)

বধূবরণ

বাঙালি সমাজে পুত্রের নববধুকে বরণ করারও কিছু রীতি-নীতির প্রচলন ছিল। শাশুড়ী পুত্রবধূকে সোনার অলংকার ও কুলায় ধান-দুর্বা নিয়ে আশীর্বাদ করে বরণ করে নিতেন। এরপর পুত্রবধূ গৃহে প্রবেশ করে।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ পুত্রবধু বিদ্যাকে পৌত্রসহ রাজা গুণসিন্ধু ও রানী লোকাচার মেনে বরণ করে নেন–

‘সুন্দর বিদ্যারে লয়ে ঘরে গেলা হৃষ্ট হয়ে
বাপ মায় প্রণাম করিলা।
রাজা রাণী তুষ্ট হয়ে পুত্রবধূ পৌত্র লয়ে
মহোৎসবে মগন হইলা ॥’ (পৃ- ২৯০)

কাদাখেঁড়ু ও পুনর্বিবাহ

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে বাল্যবিবাহ বা গৌরীদান প্রচলিত থাকায় মেয়েদের পাঁচ-সাত বছর বয়সেই বিবাহ দেয়া হতো। এসব মেয়ের প্রথম ঋতু হলেই কাদাখেঁড়ু অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো। আর তখনই পুনর্বিবাহের মাধ্যমে পিত্রালয় থেকে কন্যাকে শ্বশুরালয়ে বা পতিগৃহে নেয়া হতো। কারণ রজঃস্বলা না হওয়া পর্যন্ত বালিকা-স্ত্রীকে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হতো।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বিদ্যা-সুন্দর ও বাসুর বিবাহে কাদাখেঁড়ু ও পুনর্বিবাহ পালন করতে দেখা যায়–

বাসুর বিবাহের কাদাখেঁড়ু ও পুনর্বিবাহ

‘কুড়ি টাকা পণ দিয়া নূতন করিনু বিয়া
এক দিনো শুতে না পাইনু।
কাদাখেঁড়ু হইয়াছে পুনর্ব্বিয়া বাকী আছে
মাটি খেয়ে বিদেশে আইনু ॥’ –(পৃ- ৩০৯)

পতিভক্তি

বাঙালি সমাজে পতিভক্তির ক্ষেত্রে নারীরা উচু ধারণা পোষণ করতো। নারীরা পতিকে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-শ্রদ্ধা করতো। পতির আদেশ-নির্দেশকে বেদবাক্য বলে মান্য করতো। ধর্মীয় ও সামাজিক প্রভাবে পতিকে নারীরা পরম

পূজনীয়, গুরুজন ও যথার্থ অভিভাবক মনে করে ভক্তি করতো। পতির সুখ ও কল্যাণে স্ত্রীরা সব কিছু ত্যাগ করতেও প্রস্তুত থাকতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' রতিদেবী ও সতীর মাধ্যমে পতিভক্তির চিত্রটি উন্মোচিত হয়েছে–

সতীর পতিভক্তি

'শিব নিন্দা শুনি মহাদুঃখ গুণি
কহিতে লাগিলা সতী।
শিব নিন্দা কর কি শকতি ধর
কেন বাপা হেন মতি ॥

,,,

তব অঙ্গজনু তেজিব এ তনু
তবে যাবে মোর পাপ ॥
তিনি মৃত্যুঞ্জয় গালিতে কি হয়
মোর যেতে আছে ঠাঁই।
যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল।
এতেক কহিয়া শরীর ছাড়িয়া
উত্তরিলা হিমাচল ॥' (পৃ ২১-২২)

দাম্পত্য কলহ

বাঙালি নারীরা যেমন স্বামী-সন্তান-সংসারের জন্য সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করতো, তেমনি আবার স্বামীর আসক্তি, স্থূল রুচিবোধ, চরিত্রহীনতা ও বহু বিবাহের ক্ষেত্রে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে ঝগড়া-কলহে জড়িয়ে পড়তো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শিব-গৌরীর দাম্পত্য জীবনে অভাব-অনটন-দারিদ্র্যের কারণে গৃহ বিবাদ-দ্বন্দ্বের শুরু হয়। এ বিবাদ মূলত বাঙালি দম্পতিদেরই প্রতিনিধিত্ব করেছে–

ক. শিব-গৌরীর দাম্পত্য কলহ

শিব- 'বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিনী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥
সর্ব্বদা কন্দল বাজে কথায় কথায়।
রস কথা কহিতে বিরস হয়ে যায় ॥

,,,

আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা ॥
অনির্ব্বাহে নির্ব্বাহ করয়ে কত দায়।
আহা মরি দেখিলে চক্ষুর পাপ যায় ॥
পরস্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥'

গৌরী- 'হায় হায় কি কহিব বিধাতা পাষণ্ডী।
চণ্ডের কপালে পড়ে নাম হৈল চণ্ডী ॥
গুণের নাহিক সীমা রূপ ততোধিক।

বয়সে না দেখি গাছ পাথর বল্মীক ॥
সম্পদের সীমা নাই বুড়া গরু পুঁজি।
রসনা কেবল কথা সিন্দুকের কুঁজি ॥
কড়া পড়িয়াছে হাতে অন্ন বস্ত্র দিয়া।
কেন সব কটু কথা কিসের লাগিয়া ॥

,,,

অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই।
মোর আসিবার পূর্ব্বকালি ধন কই ॥
গিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে।
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে ॥
বুড়া গরু দাঁত ভাঙ্গা গাছ গাড়।
ঝুলি কাঁথা বাঘছাল সাপ সিদ্ধি লাড় ॥

,,,

উপযুক্ত দুটি পুত্র আপনি যেমন।
সবে ঘরে আমি মাত্র এই অলক্ষণ ॥
করেতে হইল কড়া সিদ্ধি বেটে বেটে।
তৈল বিনা চুলে জটা অঙ্গ গেল কেটে ॥

,,,

কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পারি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥' (পৃ ৫৫-৫৯)

নারীর দায়

বাঙালি নারী স্বামী-সন্তান-সংসারের জন্য নানা দায়ভার বহন করতে সদা প্রস্তুত থাকে। স্বামী-সন্তান ও সংসারের মঙ্গল-সুখ ও শান্তির জন্য বাঙালি নারী সকল ত্যাগ, কষ্ট, দুঃখ, দারিদ্র্যকে বরণ করে নিতে দ্বিধা করে না। নারীকেই ধরিত্রীর মতো এসব সহ্য করতে হয়েছে যুগ যুগ ধরে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' দক্ষরাজের স্ত্রী প্রসূতিকে স্বামীর প্রতি দায়ভার থেকেই জামাতা শিবের কাছে অনুনয়-অনুযোগ করতে দেখা যায়–

প্রসূতির স্বামীর দায়ভার

'সতী শোকে পতিশোকে লজ্জা তেয়াগিয়া।
প্রসূতি শিবের কাছে আইলা কান্দিয়া ॥
গলবস্ত্রা হয়ে এল শিবের সম্মুখ।
শাশুড়ী দেখিয়া শিব লাজে হেঁটমুখ ॥

,,,

যেমন তোমার নিন্দা করিল পাগল।
যে করিল সেহ নহে তার মত ফল ॥
কি করিবে পরিণামে বুঝিতে না পারি।
ভাগ পেতে হয় মোরে আমি তার নারী ॥' (পৃ-২৫)

নাইয়র প্রথা

বাঙালি সমাজে বিবাহিতা নারী বিভিন্ন উৎসব (ধর্মীয় ও সামাজিক) ও ফসলী মৌসুমে বতর নেয়ার পর অবসর সময়ে বাবার বাড়িতে নাইয়র খেতে যেতো। সাধারণত বাবা, কাকা, মামা বা বড় ভাই আনুষ্ঠানিকভাবে নিতে আসতো। পনেরো-বিশ বা এক মাসের জন্য বাবার বাড়ি অবস্থান করতো এবং এ সময় স্বামীর জন্য হাতপাখা, রুমাল, কাঁথা, মাদুর, শিকা প্রভৃতি তৈরি করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' সতী ও গৌরীর পিত্রালয়ে নাইয়র যেতে দেখা যায়–

সতীর নাইয়র

'নিবেদন শুনহ ঠাকুর পঞ্চানন।
যজ্ঞ দেখিবারে যাব বাপার ভবন ॥' –(পৃ- ১৬)

নারীর গঞ্জনা-ভর্ৎসনা

বাঙালি সমাজে কতিপয় মুখরা রমণীর পরিচয় পাওয়া যায়। যারা কারণে-অকারণে আপনজন ও পরকে নানাভাবে গঞ্জনা বা ভর্ৎসনা করতে পিছপা হয় না। নানাভাবে উদাহরণ টেনে ভর্ৎসনা করতে অনেকে পছন্দ করে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বিদ্যার গোপন প্রণয় ও গর্ভের সংবাদ শুনে রাণী (বিদ্যার মা) স্বামী, কন্যা ও কন্যার সখীদের চরমভাবে তিরস্কার-ভর্ৎসনা করেছেন–

ক. বিদ্যাকে রাণীর ভর্ৎসনা

'গর্ভের লক্ষণ করি নিরীক্ষণ
কহে ভালে কর হানি ॥
ওলো নিশঙ্কিনী কুলকলঙ্কিনী
সাপিনী পাপকারিণী।
,,,
ডরে মোর ঘরে বায়ু না সঞ্চরে
ইহার ঘটক কেবা।
সাপের বাসায় ভেকেরে নাচায়
কেমন কুটিনী সেবা ॥
না মিলিল দড়ি না মিলিল কড়ি
কলসী কিনিতে তোরে।
আই মা কি লাজ কেমনে এ কাজ
করিলি খাইয়া মোরে ॥' (পৃ- ২৩৭)

খ. দাসীদের রাণীর গঞ্জনা

'আ লো সখীগণ তোরা বা কেমন
রক্ষক আছিলি ভালে।
সকলে মিলিয়া কুটিনী হইয়া
চুন কালি দিলি গালে ॥
তোরা এ সঙ্গিনী এ রঙ্গে রঙ্গিনী
এই রসে ছিলি সবে।

ভুলালি আমায় দানি ভাড়া যায়
সঙ্গী ভাঁজ যায় কবে ॥
থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগেত রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি ॥' (পৃ ২৩৮-২৩৯)

দাম্পত্য জীবনে নারীর আট মূর্তি বা রূপ

প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সমাজে নারীর স্বভাব-বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে সমাজপতি, শাস্ত্রকার, সংহিতা রচয়িতা ও বাৎস্যায়ন নারীকে ৮ রূপে (খণ্ডিতা, অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, প্রোষিতভর্তৃকা, স্বাধীন ভর্তৃকা ও কলহান্তরিকা) বিভক্ত করেন। এরূপ ধারণার প্রচলন মধ্যযুগ হয়ে বর্তমান কাল পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী ভাবনায় এরূপ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়–

প্রোষিতভর্ত্তৃকা হয়ে দুহে ছিলা দুঃখ সয়ে
আমা দেখি বাসসজ্জা হৈলা।
কার ঘরে যাব আগে উৎকণ্ঠিতা এই রাগে
দেহুড়ীতে অভিসার কৈলা ॥
কারো ঘরে নাহি গিয়া রহিলাম দাঁড়াইয়া
বিপ্রলব্ধা হইলা দুজনে।
এখন ইহারে লয়ে থাকিলাম সুখী হয়ে
পদ্মমুখী কি ভাবিছে মনে ॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকা ইনি প্রোষিতভর্ত্তৃকা তিনি
আমি হৈনু অপূর্ব্ব নায়ক।
রাত্রি শেষে গেলে তথা ক্রোধে না কহিবে কথা
খণ্ডিতা হইবে পদ্মমুখী।
দেখাইবে কটু কয়ে কলহন্তরিকা হয়ে
কান্দিবেক হয়ে বড় দুখী ॥' (পৃ- ৩৩৬)

গর্ভকালীন আচরণ ও বৈশিষ্ট্য

সাধারণত গর্ভবতী নারীর চতুর্থ মাস থেকেই গর্ভের লক্ষণ দেখা দিতে শুরু করে। এ সময় দৈহিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তনও ঘটতে থাকে। বাঙালি সমাজে গর্ভবতী নারীর ৪ মাসে সীমন্তোন্নয়ন, ৫ মাসে পঞ্চামৃত, ৬ মাসে পরমান্ন ভোজন, ৭ মাসে সাধভক্ষণ এবং ৯ মাসে নববস্ত্র পরিধানের আয়োজন করা হয়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' পদ্মিনীহোড় এবং রাজকন্যা বিদ্যার গর্ভকালীন আচরণ ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়–

বিদ্যার গর্ভকালীন আচরণ-বৈশিষ্ট্য

'গর্ভবতী হৈলা বিদ্যা দুই তিন মাস ॥
উদর আকাশে সুত চাঁদের উদয়।
কমল মুদিল মুখ রজঃ দূর হয় ॥

ক্ষীণ মাজা দিন পেয়ে দিনে দিনে উচ।
অভিমানে কালামুখ নম্রমুখ কুচ ॥
স্তনে ক্ষীর দেখি নীর হইল রুধির।
কাল পেয়ে শিরতোলা দিল যত শির ॥

,,,

দোহাই না মানে হাই কথা নাই তায়।
উদরে কি হৈল বলি দেখাইতে চায় ॥

,,,

সর্ব্বদা ওয়াক ছর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল ॥
মাটি খেয়ে যেমন এমন কৈল কাজ।
পোড়া মাটি খেতে রুচি সারিতে সেলাজ ॥
জাগিয়া জাগিয়া যত হয়েছে বিহার।
অবিরত নিদ্রা বুঝি শুধিতে সে ধার ॥
নিদ্রা না হইত পূর্ব্বে অপূর্ব্ব শয্যায়।
আঁচল পাতিয়া নিদ্রা আনন্দে ধরায় ॥
বসিলে উঠিতে নারে সর্ব্বদা অলস।
শরীরে সামর্থ্য নাহি মুখে নাহি রস ॥' (পৃ- ২৩৫)

আতুড় আচার

বাঙালি সমাজে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পরেই আতুড় ঘরের চাল থেকে খড় পেড়ে আগুন প্রজ্জ্বলন, নাড়িছেদন, জোকার বা জয়ধ্বনি দেয়া, শঙ্খ বাজানো, আনন্দ গীতের আয়োজন করা হয়। এছাড়া ৬ দিনে ষষ্ঠী পূজা, ৭ দিনে উঠানি, নাম রাখা, উপনয়ন ও জাতকর্ম করার প্রচলন রয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' হরিহোড়ের ও বিদ্যার পুত্রের জন্মের সময় আতুড় গৃহের এমন আচার পালন করতে দেখা যায়–

হরিহোড়ের আতুড় আচার

'গর্ভ বেদনায় হৈল পদ্মিনী কাতরা।
দ্রুত হয়ে বসুন্ধর ধরে বসুন্ধরা ॥

,,,

আপনি দিলে হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া নাম দিলা হরি ॥

,,,

ষষ্ঠী পূজা হৈল সায়   ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়।' (পৃ- ১৪১)

অন্নপ্রাশন

বাঙালি সমাজে সাধারণত ৬ মাসের সময় নবজাতকের অন্নপ্রাশন করার বিধান রয়েছে। আনুষ্ঠানিক ভাবে এ দিনে নবজাতকের মুখে অন্ন বা খাবার তুলে দেয়া হয়। এ ৬ মাসে নান্দীমুখ যজ্ঞ করারও বিধান রয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' হরিহোড় ও বিদ্যার পুত্রের ছয় মাসে অন্নপ্রাশন করতে দেখা যায়–

বিদ্যার পুত্রের অন্নপ্রাশন

'পূর্ণ হৈল দশ মাস শুভ দিন পরকাশ
বিদ্যা সতী পুত্র প্রসবিলা ॥
ষষ্ঠী পূজা সমাপিলা ছয় মাসে অন্ন দিলা
বৎসরের হৈল তনয়।' (পৃ- ২৮৪)

নাম রাখা

বাঙালি সমাজে নবজাতকের আনুষ্ঠানিকভাবে নাম রাখা হয়। নাম রাখার ক্ষেত্রে সাধারণত– দেব-দেবীর নাম, পৌরাণিক নাম, খোদা-নবী-রাসুলের নাম, গ্রহ-নক্ষত্র, শস্য, মশলা, ফুল-ফল, মাছ, রত্নপাথর, অস্ত্র, রোগ, তৈজসপত্র, অঞ্চল, পেশা, বর্ণ, গোষ্ঠী, ও কিংবদন্তির সঙ্গে সাদৃশ্য রাখাকে গুরুত্ব দেয়া হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' হরিহোড়, উমা, সোহাগী, কতোয়ালের ১০ ভাই এবং আয়াদের বিচিত্র ধরনের নাম রাখার চিত্র পাওয়া যায়–

ক. হরিহোড়ের নামকরণ

'আপনি দিলেন হুলু নাড়ীচ্ছেদ করি।
দুঃখেতে স্মরিয়া হরি নাম দিলা হরি ॥' (পৃ- ১৪১)

খ. বাঙালি মেয়েদের নামকরণ

'অপর্ণা অপরাজিতা অম্বিকা অমলা।
ইন্দ্রানী ঈশ্বরী ইন্দ্রমুখী ইন্দুকলা ॥
সুলোচনা সুমিতা সুভদ্রা সুলক্ষণা।
যশোদা যমুনা জয়া বিজয়া সুমনা ॥
রোহিনী রেবতী রমা রম্ভাবতী রুমা।
অরুন্ধতী অরণী উর্ব্বশী উষা উমা ॥
সরস্বতী শুকী শুভী সাবিত্রী শঙ্করী।
মহামায়া মোহিনী মাধবী মহেশ্বরী ॥' (পৃ- ৩৩৯)

গ. কতোয়ালের ভাইদের সাদৃশ্যপূর্ণ নাম

'যুক্তি বটে বলি ধূমকেতু দিলা সায়।
মহাবেগে আট ভাই আট দিকে ধায় ॥

,,,

চন্দ্রকেতু ছোট ভাই পরম সুন্দর।

,,,

সূর্যকেতু সুলোচনা হেমকেতু হিমী।
জয়কেতু জয়াবতী ভীমকেতু ভিমী ॥
কালকেতু কালী হৈল উগ্রকেতু উমী।
যমকেতু যমী হৈল রুদ্রকেতু রুমী ॥
ধূমকেতু আপনি হইল ধামধূমী।' (পৃ- ২৪৭)

এখানে কতোয়াল ধূমকেতুর দশ ভাইয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ নাম (ধূমকেতু, যমকেতু, রুদ্রকেতু, কালকেতু, উগ্রকেতু, জয়কেতু, ভীমকেতু, সূর্যকেতু, হেমকেতু ও চন্দ্রকেতু) পাওয়া যায়।

ঘ. সন্তানের অগ্রজ-অনুজ অনুযায়ী নামকরণ

বাঙালি সমাজে সন্তান, পুত্রবধূ ও আত্মীয়তার সম্পর্কিত এসব মানুষকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে জন্মের ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে- বড়, মেঝু, সেজু, নয়া ও ছোট নামে চিহ্নিত করার প্রচলন রয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' ভবানন্দের বাড়িতে অন্নপূর্ণা পূজায় আগত প্রতিবেশি বাড়ির পুত্রবধূদের ক্রমানুযায়ী নামের উল্লেখ পাওয়া যায়–

'বড় মেজ সেজ ছোট ন বহু বলিয়া।
শাশুড়ী দিছেন ডাক পথে দাঁড়াইয়া ॥' (পৃ- ৩৪০)

সখী ও মিতা পাতানো

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে পুরুষের নামের সাদৃশ্যের কারণে বা পিতামাতার আগ্রহে আনুষ্ঠানিকভাবে মিতা বা দোস্ত পাতানো হতো। এ মিতা বা দোস্ত নিকট আত্মীয়ের মতোই বিবেচিত হতো। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে সখী বা সই পাতানো হতো। হাতে লাল-নীল সুতা বেঁধে, খাবার দাবার, নাচ-গানের মধ্য দিয়ে এর অনুষ্ঠান করা হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' গৌরীর, বিদ্যার ও বর্ধমান নগরের নারীদের মধ্যে সখী ও সইয়ের সম্পর্কজনিত সখ্যের পরিচয় পাওয়া যায়–

ক. গৌরী বা উমার সখী

'উমা লয়ে উমাপতি গেলেন কৈলাস।
,,,
নিত্য সখী আসি জয়া-বিজয়া মিলিল।' –(পৃ- ৪৬)

খ. বিদ্যার গৃহভৃত্য পর্যায়ের সখী

'বিদ্যা বলে কেন হীরা ইহা কহ ফিরা ফিরা
সখীগণে তোমার কি ভয়।
মোর খায় মোর পরে যাহা বলি তাহা করে
মোর মত ছাড়া কভু নয়।
যত সখীগণ কয় কেন হীরা কর ভয়
দাসী কোথা ঠাকুরাণী ছাড়া ॥' (পৃ- ১৯৭)

মাতৃস্নেহ

বাঙালি নারীর মাতৃস্নেহের জায়গাটি অতি দরদ-মায়া-মমতায় ও আদরে সিক্ত। বাঙালি কল্যাণবতী ও মমতাময়ী মা সন্তান বাৎসল্যে পৃথিবীর অপরাপর দেশের তুলনায় অনেক বেশি আপন, অকৃত্রিম ও আন্তরিক। সন্তানের মঙ্গল, সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য বাঙালি মা সদা সজাগ ও প্রস্তুত থাকেন। অন্ধ মাতৃস্নেহ বা স্নেহের প্রাবল্য অনেক সময় সন্তানের বিপর্যয় ডেকে আনে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' উমার বিবাহে মেনকা এবং বিদ্যার গোপন গর্ভের সংবাদে রানী প্রথমে তিরস্কার করলেও পরে মমতাময়ী মায়ের মতোই স্নেহে-সহানুভূতিতে সিক্ত হয়েছেন–

রানীর মাতৃস্নেহ

'বিদ্যার কি দিব দোষ তারে বৃথা করি রোষ

বিয়া হৈলে হৈত ছেলে।
যৌবনে কামের জ্বালা কদিন সহিবে বলো
কথা রাখিব কত টেলে ॥' (পৃ- ২৪১)

নারীদের কান্নার ধরন ও মাতম

বাঙালি সমাজে নারীরা সাধারণত কারো মৃত্যুতে, মহা-বিপদ বিপর্যয়ে আর্তনাদ-আহাজারি ও মাতম শুরু করে। এ সময় নারীরা হাত-পা ও বুক চাপরিয়ে মৃত ব্যক্তির জীবনের ইতিহাস বা ঘটনাসমূহ বিনিয়ে বিনিয়ে বলতে থাকে। বাঙালি নারীর মাতম আহাজারিতে পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' রতির স্বামীর মৃত্যুতে এবং মেনকা কন্যা উমার বৃদ্ধ স্বামী বা জামাতাকে দেখে যে কান্না ও মাতম শুরু করে, তাতে বাঙালি নারীদের কান্নার ধরণটি উন্মোচিত হয়ে পড়ে–

রতির কান্না ও মাতম

'পতিশোকে রতি কাঁদে বিনাইয়া নানা ছাঁদে
ভাসে চক্ষু জলের তরঙ্গে।
কপালে কঙ্কণ মারে রুধির বহিছে ধারে
কম-অঙ্গ ভস্ম লেপে অঙ্গে ॥
আলু থালু কেশবাস ঘন ঘন বহে শ্বাস
সংসার পুরিল হাহাকার।
কোথা গেলা প্রাণনাথ আমারে করহ সাথ
তোমার বিনা সকলি আঁধার ॥

,,,

যথাযথা যেতে প্রভু মোরে না ছাড়িতে কভু
এবে কেন আগে ছাড়ি গেলা।
মিছা প্রেম বাড়াইয়া ভাল গেলা ছাড়াইয়া
এখন বুঝিনু মিছা খেলা ॥
না দেখিব সে বদন না হেরিব সে নয়ন
না শুনিব সে মধুর বাণী।
আগে মরিবেন স্বামী পশ্চাতে মরিব আমি
এতদিন ইহা নাহি জানি ॥

,,,

শিবের কপালে রয়ে প্রভুরে আহুতি লয়ে
না জানি বাড়িল কিবা গুণ।
একের কপাল রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন ॥

,,,

অরেরে মলয় বাত তোরে হৌক বজ্রাঘাত
মরে যা রে ভ্রমরা কোকিলা।
বসন্ত অল্পায়ু হও বন্ধু হৈয়া বন্ধু নও
প্রভু বধি সবে পলাইলা ॥
কোথা গেলা সুবরাজ মোর মুণ্ডে হানিবাজ
সিদ্ধ কৈলা আপনার কর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ড দেহ জ্বালি আমি তাহে দেহ ঢালি
অনন্তকালে কর এই ধর্ম্ম ॥' (পৃ ৩৫-৩৭)

প্রসাধনী ও রূপচর্চা

মানুষ স্বভাবতই সৌন্দর্যের পূজারী। এছাড়া নারীরা সাজসজ্জা প্রিয়। বিবাহ, উৎসব, অনুষ্ঠান এবং স্বামী সান্নিধ্যে যাবার পূর্বে নর-নারী উভয়েই প্রসাধন পরিচর্যা করতো। প্রসাধনী হিসেবে- সিঁদুর, কাজল, চন্দন, অগুরু, কস্তুরী, কুমকুম, কর্পূর, হলুদ, ফুল, সুগন্ধি তেল, আমলকি, ফাউগ, আতর, গোলাপ জল ও আলতা (পা রাঙাতে) ব্যবহৃত হতো। এছাড়া পান শুধু মুখশুদ্ধিতে নয় বরং ঠোট রাঙাতেও ব্যাবহার করা হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে'– উমা, বিদ্যা, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী ও সুন্দরকে নানা ভাবে প্রসাধন ও রূপচর্চা করতে দেখা যায়–

ক. চন্দ্রমুখীর প্রসাধন ও রূপচর্চা

'সাধীর বচন শুনি চন্দ্রমুখী মনে গুণি
বটে বটে উঠিয়া বসিলা।
,,,
খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকন শাড়ি
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।
পড়া তৈল মুখে মাখি পড়া ফুল চুলে রাখি
নানা মন্ত্রে সিন্দুর পড়িলা ॥
পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পানগুয়া
ন্যাস বেশ নাপান ঝাঁপান।' (পৃ- ৩৩০)

খ. সুগন্ধি দ্রব্য

'গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ মাখী রাখে বাটি পুরী ॥' (পৃ- ২০৯)

জুতা বা খড়ম

তৎকালীন বাঙালি সমাজে অভিজাত বিত্তবান শ্রেণির লোকজনই কেবল চামড়ার জুতা, নাগরা ও কাঠের খড়ম ব্যবহার করতে অভ্যস্ত ছিল। সাধারণ মানুষ খালি পায়েই যাতায়াত করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' কাঠের খড়ম ও চামড়ার জুতার উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. খড়ম

'কড়েতে ত্রিশূল শোভে চরণে খড়ম।
চলে মহেশ্বরী সেনা ভয়ে কাঁপে যম ॥' (পৃ- ৯৪)

খ. চামড়ার জুতা

'ঠকঠকি হাড়ির কোড়ার পটপটি।
চর্ম্ম উড়ে চর্ম্মপাদুকার চটচটি ॥' (পৃ- ১৬৯)

ঘোমটা প্রথা

তৎকালীন বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে পর্দা প্রথার পাশাপাশি নারীদের ঘোমটা দেবারও প্রচলন ছিল। সর্ববস্থাতেই নারীরা কাপড় পড়ে মাথায় ঘোমটা ব্যবহার করতো। এ ঘোমটা ব্যবহারই ছিল নারীর নম্রতার-শালীনতার শর্ত।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শিব-উমার বিবাহের সময় মেনকা ও অন্যান্য আয়াদের ঘোমটা দিতে দেখা যায়–

'মেনকা দেখিল চেয়ে জামাই লেঙ্গটা।
নিবায়ে প্রদীপ দেয় টানিয়া ঘোমটা ॥' (পৃ- ৪২)

অলংকার

প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকেই বাঙালি সমাজে নর-নারী উভয়ের মধ্যেই অলংকার ব্যবহারের প্রচলন ছিল। হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, শঙ্খ ও ফুলের অলংকারের প্রচলন ছিল। মেয়েরা মাথায়– টোপর, সিঁথিপাট, টিকলি, টায়রা পরতো। নাকে পড়তো– নাকফুল, কোর, বেসর, নাকছাবি, নথও ডালবোলক। কানে পড়তো– কানফুল, করমফুল, কুণ্ডল, ঝুমকা, বালি, কানবালা, মদনকড়ি, দুল ও রিং। গলায় পড়তো– হাসুলি, মালা, চেইন, হার, টাকা-কবচ-তাবিজের ছড়া, বাহুতে দিতো– বাজুবন্দ, তাড়, কেয়ূর ও জসম। গ্রীবায় পড়তো– গ্রীবাপত্র, হাতে দিতো– চুড়ি, কঙ্কন, বালা, বলয়, খাড়ু, অঙ্গদ, পেঁচি, তাগা, হাতের আঙ্গুলে দিতো– আংটি, কোমড়ে দিতো– কিঙ্কিনী, চন্দ্রহার ও বিছা, পায়ে দিতো– পাঁসুলি, নূপুর, উছটি, মল, খাড়ু, ঘুঙুর, ঘুটি এবং পায়ের আঙ্গলে পড়তো– উনচট, রতনচূড় ও আংটি। অর্থাৎ বাঙালি নারীরা মাথা থেকে পা পর্যন্ত অলংকার সজ্জিত করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' অন্নপূর্ণা, বিদ্যা, চন্দ্রমুখী, পদ্মমুখী এবং ভবানন্দের বাড়ি পূজায় আগত নারীদের এরূপ অলংকার ব্যবহার করতে দেখা যায়–

ক. 'বাদ্য করে বাদ্যকর কিঙ্কিণী কঙ্কণ ॥
নৃত্য করে বেশরে নূপুর গীত গায়।
আপনি আসিয়া রতি এয়ো হৈলা তায় ॥' (পৃ- ২০৯)

খ. 'সোনা অঙ্গে ছাই মাখে হাসিয়া হাসিয়া। ॥
হীরা মুক্তা পলা মুক্তা যে ছিল গলায়।
দেখিয়া রুদ্রাক্ষমালা ভয়েতে পলায় ॥' (পৃ- ২৮৬)

পোশাক বা বস্ত্র

বাঙালি সমাজে হিন্দু ও মুসলমানের পোশাকে ভিন্নতা ছিল। তবে মুসলিম শাসনামলে অভিজাত হিন্দুদের পোশাক ও বেশ-ভূষায় মুসলমানী প্রভাব ও ঢং চলে আসে। হিন্দুরা সাধারণত ধুতি, চাদর বা উত্তরীয়, শাড়ি, কাপড়, কৌপীন ও গামছা ব্যবহার করতো। উচু বর্ণের লোকজন কাঠের খড়ম ও পৈতা ধারণ করতো। অন্যদিকে মুসলমান নর-নারীরা তহবন বা লুঙ্গি, কুর্তা, টুপি, পাগড়ি, ইজার বা পায়জামা, পাঞ্জাবি, আলখেল্লা, চাপকান, নাগরা জুতা, মোজা, শাড়ি-কাপড়, ছায়া, ব্লাউজ, বক্ষবন্ধনী, শেমিজ, নিমা, ঘাঘরা, ওড়না ও বোরকা ব্যবহার করতো। তবে সাধারণ দরিদ্র নর-নারীগণ লুঙ্গি, গামছা, কাপড়, কৌপীন ব্যবহারেই অভ্যস্ত ছিল। পুরুষেরা প্রায়ই খালি গায়ে থাকতো। গ্রীষ্ম ও শীতে পোশাকের তারতম্য ঘটতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শিব-উমা, সুন্দর-বিদ্যা, চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখী ও অন্যান্য নর-নারীদের এসব বাঙালি পোশাক ব্যবহার করতে দেখা যায়–

ক. শাড়ি ও বক্ষবন্ধনী

'রতন মুকুট দিলা নানা অলংকার।
অমূল্য কাঁচুলি শাড়ি উড়নি যে আর ॥' (পৃ- ৬৩)

খ. রঙিন শাড়ি

'রাঙ্গা শাড়ী রাঙ্গা শাঁখা জবামলা গলে।
সিন্দুর কপাল ভরা খাঁড়া করতলে ॥' (পৃ- ২৪৮)

গ. মেঘডুম্বুর শাড়ি

‘শাড়ী মেঘডম্বরে করিলা বাঘাম্বর।
মুখচন্দ্রে অর্দ্ধচন্দ্র সিন্দুর উপর ॥’ (পৃ- ২৮৬)

ঘ. চিকন শাড়ি

‘খোঁপা বাঁধি তাড়াতাড়ি পরিয়া চিকণ শাড়ী
পড়িয়া কাজল চক্ষে দিলা।’ (পৃ- ৩৩০)

ঙ. তেনা বা ছিন্ন বস্ত্র

‘শত গাঁটি ছিড়া টেনা করি পরিধান।
ব্যাসের নিকট গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান ॥’ (পৃ- ১২৯)

চ. বৃক্ষপত্রের আচ্ছাদন

‘লতা বান্ধা পদ্মপাতে কটি আচ্ছাদন।
ঢাকিয়াছে পদ্মপাতে মাথা আর স্তন ॥ (পৃ- ১৩৯)

ছ. ছদ্মবেশের বস্ত্র

‘আগে হৈতে বহু রূপ জানে যুবরাজ।
নাটুয়ার মত সঙ্গে আছে কত সাজ ॥
কখন সন্ন্যাসী ভাঁড় ভাট দণ্ডধারী।
বেদে বাজীকর বৈদ্য বেণে ব্রহ্মাচারী ॥’ (পৃ- ২২১-২২২)

ঝ. ধুতি ও দরবারী বস্ত্র

‘দরবেরে কাপড় ছাড়িলা মজুন্দার।
দাসু যোগাইল ধুতিজোড় পরি বার ॥’ (পৃ- ৩২৯)

খাদ্যদ্রব্য

বহুকাল পূর্ব থেকেই এ বাংলার অধিবাসীদের বলা হতো- ‘মাছে ভাতে বাঙালি’। ভাত আর মাছই ছিল বাঙালির প্রধান ও প্রিয় খাবার। তবে হিন্দু মুসলমানের ক্ষেত্রে খাবারের তারতম্য ঘটতো এবং ধর্মীয় বিধি-নিষেধ মেনে চলতো। হিন্দু-মুসলমানের প্রাত্যহিক খাবার হিসেবে ভাত, মাছ, ডাল, দুধ, কলা, শাক-সবজি, নিরামিষ ও খিচুড়িই প্রচলিত ছিল। অভিজাত মুসলিম সমাজে- মাংস-রুটি, বিরিয়ানী, কোর্মা, পোলাও, কালিয়া, কাবাব, কোপ্তা, রেজালা, মোগলাই ও খিচুড়ির প্রচলন ছিল। মাংসপ্রিয় মুসলমানগণ সাধারণত- গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, উট, হাঁস-মুরগি, কবুতর, হরিণ, দুম্বার মাংস খেতে পছন্দ করতো। অন্যদিকে হিন্দুরা- ছাগল, পাঠা, কচ্ছপ খেতো। তবে হিন্দু সমাজে মাংসের চেয়ে মাছেরই সমাদর ছিল বেশি। গরুর মাংস ছিল হিন্দু সমাজে বর্জনীয়। আর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাবারের মধ্যে ছিল- পান্তাভাত, বাসী ভাত, খুদের ভাত, জাউ, ছাতু, খাটনা, আলু পোড়া, আলু সিদ্ধ, চাল-কলই-মটর ভাজা, মরিচ বাটা, শাক পাতা বাটা ও বিভিন্ন প্রকারের ভর্তা অন্যতম। খাবার শেষে বাঙালি পান-সুপারি-জর্দা, তামাক, কাঁজি বা আমানী খেতে পছন্দ করতো।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ এসব খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়–

খাবারের ধরন

বাঙালি সমাজে বিচিত্র ধরনের খাবার প্রচলিত ছিল। এ সবের মধ্যে আমিষ, নিরামিষ, টক-ঝাল-মিষ্টি এবং চর্ব-চুষ্য-লেহ্য ও পানীয় খাবারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ এসব খাবারের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

‘চর্ব-চুষ্য-লেহ্য পেয় আদি নানা রস।
ভোজন করিল হরিহোড় মহাযশ ॥’ (পৃ- ১৪৬)

আমিষ-নিরামিষ

‘নিরামিষ তেইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ বন্ধন মৎস্য মাসে ॥’ (পৃ- ৩৪১)

শাক

বাঙালির প্রাত্যহিক খাবার তালিকায় নানা রকম শাক থাকতো। এসব শাকের মধ্যে- ললিতা (পাট), গিমা, পোলতা, লাউ শাক, কুমড়া শাক, কলমি শাক, পালং শাক, লাল শাক, সরিষা শাক, কচু শাক, খেসারি শাক, পুঁইশাক, কলই শাক, মটর শাক ও বৈতা শাক অন্যতম।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বাঙালির খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত এসব শাকের তালিকা পাওয়া যায়–

‘হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি-খণ্ট ভাজা নানামত শাক ॥’ (পৃ- ৩৪১)

সবজি

বাঙালির খাবারে নানা রকম সবজির প্রচলন ছিল। এসব সবজির মধ্যে- লাউ, মুকড়া, শিম, ঝিঙ্গা, আলু, কচু, পটল, ঢেড়শ, ফুলকপি, পাতাকপি, বেগুণ, করলা, ধুন্দল, বরবটি, উচ্ছে, মুলা, কাঁঠালের বিচি, কলার মোচা বা থোড়, পিপল পাতা, শসা, গাজর অন্যতম।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব সবজির পরিচয় মেলে–

‘বড়া বড়ী কলা মুলা নারিকেল ভাজা।
দুধথোড় ডালনা শক্তানি ঘণ্ট তাজা ॥
কাঁঠালের বীজ রান্ধে চিনি রস বুড়া।
তিল পিটালিতে লাউ-বার্ত্তাকু কুমুড়া ॥’ (পৃ- ৩৪১)

ডাল

বাঙালির খাবারের তালিকায় ব্যবহৃত অন্যতম ডালগুলো হলো- মুসুরি, খেসারি, মুগ, কলই, মটর, ছোলা, ডাবরি, অরহর প্রভৃতি।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বাঙালির খাদ্য তালিকার এসব ডালের উল্লেখ পাওয়া যায়–

‘ডালি রান্ধে ঘনতর ছোলা অরহরে।
মুগ মাষ বরবটী বাটুলা মটরে ॥’ (পৃ- ৩৪১)

মাছ

বাঙালি খাবার তালিকায় বিচিত্র ধরনের মাছ রাখতে পছন্দ করতো। এসব মাছের মধ্যে অন্যতম হলো- ইলিশ, বোয়াল, রুই, পাঙ্গাস, শৈল, সিং, মাগুর, কৈ, কাতল, ভেটকি, পুটি, টেংরা, চিংড়ি, বাইন, খৈলসা, ফলি, চিতল, ফলি, মৃগেল, বাটা, পাবদা, চান্দা, পাকাল, চেলা, ডানকিনা, গজার, কালা বাউস, বাইলা, মেনি, তপসে, বেতকাঁটা, মলা, পোনা ও শুটকি মাছ প্রভৃতি।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বৃহৎ বাংলা অঞ্চলে প্রাপ্ত এ সমস্ত মাছের উল্লেখ পাওয়া যায়।

‘চীতল ভেকুট কই কাতলা মৃগাল।

বানি লাটা গড়ুই উলকা শোল শাল ॥
পাঁকাল খয়রা চেলা তেক্ষো এলেঙ্গা।
গুতিয়া ভাঙ্গন রাগি ভোলা, ভোলচেঙ্গা ॥
মাগুর গাগর আড়ি বাটা বাচা কই।
কালবাসু বাঁশপাতা শাকের কলই ॥
শিঙ্গী ময়া পাবদা বোয়ালি ডানিকেনা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুড়া সোনা ॥
গাঙ্গদাড়া ভেদা চেঙ্গ কুড়িশা খলিশা।
খরশুল্ল্যা তপসিয়া পাঙ্গাস ইলিশা ॥' (পৃ- ৭৪)

মাংস ও মাংসজাত খাদ্য (কালিয়া-কাবাব)

বাঙালি সমাজে মুসলমানগণ- গরু, খাসি, ভেড়া, মহিষ, উট, হাঁস, মুরগি, হরিণ ও কবুতরের মাংস খেতে পছন্দ করতো। অন্যদিকে হিন্দুরা ছাগল, পাঠা ও কচ্ছপের মাংস খেতো এবং গরুর মাংস বর্জন করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব মাংসের ব্যবহার দেখা যায়–

'কচি ছাগ মৃগমাংসে ঝালঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা ॥
অন্ন মাংস সীকভাজা কাবাব করিয়া।
রান্ধিলেন মুড়া আগে মসলা পুরিয়া ॥' (পৃ- ৩৪২)

চাটনি বা আচার

বাঙালি খাবারের সঙ্গে নানা রকম চাটনি-আচার, খাটনা ও সালাদ খেতে পছন্দ করতো। সাধারণত আম, জলপাই, তেঁতুল, চালতা, আমড়া, কুল বরইয়ের আচার, আম, আমসত্ব, অম্বল, কাসুন্দি, লেবু, শসা, গাজর, টমেটো, কাচা মরিচ ও পেয়াজের প্রচলন ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব আচার ও চাটনির উল্লেখ পাওয়া যায়–

'মৎস্য মাংস সাঙ্গ করি অম্বল রান্ধিলা।

,,,

আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার ॥' (পৃ- ৩৪২)

মিষ্টিজাত খাবার

বাঙালি নানা রকম মিষ্টি জাতীয় খাবার খেতে পছন্দ করতো। এসব খাবারের মধ্যে- গুড় (খেজুর, আখ, তাল), চিনি, মিছিরি, দই, ঘোল, মাঠা, মাখন, ছানা, পনির, সন্দেশ, ছানাবড়া, লুচি, ক্ষীর, পায়েস, ফিরনি, ক্ষীরসা, শিখারিনী, রসগোল্লা, চমচম, অমৃতী, জিলাপী, মোয়া, বাতাসা, খাজা, নাড়ু, কদমা, লাড্ডু, টানা অন্যতম।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত এসব মিষ্টি জাতীয় খাবারের পরিচয় পাওয়া যায়–

'ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানা জাতি।
নানা দ্রব্য রাখে নারিকেল রাজবাতি ॥' (পৃ- ২০৯)

পিঠা

বাঙালি সমাজে বিভিন্ন মৌসুমে ও ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিচিত্র ধরনের পিঠা-পুলির প্রচলন ছিল। এসব পিঠার মধ্যে– চিতই, ভাঁপা, ছিত রুটি, রুটি পিঠা, পাটি সাপটা, পাকোয়ান, তাল পিঠা, বড়া পিঠা,

তিলকুলী, দুধ কুলী, মোরগ সংসার, ক্ষীরপুলি, ধুয়া পিঠা, জলপিঠা, ভিজানো পিঠা, তেলচিতই ও হাতেকাটা সেমাই অন্যতম।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত এসব বিচিত্র ধরনের পিঠার পরিচয় মেলে–

'অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।
সুধা বলে এই সঙ্গে আমি হব মিঠা ॥
বড়া এলো আসিকী পীযূষী পুরী পুলী।
চুষী রুটী রামরোট মুগের সামুলী ॥
কলা বড়া ঘিয়র পাপড় ভাজাপুলী।
সুধারুচি মুচমুচি লুচি কতগুলি ॥' (পৃ- ৩৪২)

পলান্ন

'কারণ অমৃত পলান্ন সঘৃত
পানপাত্র হাতা শোভে।' (পৃ- ৭২)

ঘি-মধু-দই

'অন্নের পর্ব্বত পরমান্ন সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর ॥' (পৃ- ৬৪)

দুধ-ভাত-কলা

'তথাস্তু বলিয়া দেবী দিলা বরদান।
দুধে ভাতে থাকিবেক তোমার সন্তান ॥' (পৃ- ১৫৭)

খুদ-জাউ

'ভিক্ষা মাগি খুদ কোণ যে পান ঠাকুর।' (পৃ- ৫৯)

খিচুড়ি

'পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।' (পৃ- ৩৪২)

মসলা

বাঙালি সমাজে রান্নায় বিভিন্ন ধরনের মসলার বহুল ব্যবহার রয়েছে। এসব মসলার মধ্যে– আদা, জিরা, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি, গরম মসলা, কালো জিরা, হলুদ, কাঁচা মরিচ, শুকনো মরিচ, পেয়াজ, রসুন, তেজপাতা, পুদিনা পাতা, তেল (সরিষা, তিল, তিশি), ঘি, ধনেপাতা, জয়ফল অন্যতম।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' রান্নায় ব্যবহৃত এসব মসলার বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়–

ক. 'আড়ি রান্ধে আদারসে দিয়া ফুলবড়ী ॥
রুই কাতলার তৈলে রান্ধে তৈলশাক।' (পৃ- ৩৪১)

খ. 'দুর্ল্লভ চন্দন চুয়া লঙ্গ জায়ফল।
সুলভ দেখিনু হাটে নাহি যায় ফল ॥' (পৃ- ১৮০)

রান্নাবান্না

বাঙালি সমাজে গৃহবধূ বা গৃহকর্ত্রীকেই সাধারণত নিজ হাতে রান্না-বান্না করতে হতো। সমাজের ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল নারীর ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য ছিল। সকালে স্নান-পূজা সেরে রমণীগণ রান্না করতেন এবং নিজ

হাতে স্বামীর খাবার পরিবেশন করতেন। রান্নার সাফল্যই গৃহবধূর সাংসারিক জীবনের অন্যতম গুণ বলে বিবেচিত হতো। সাধারণত সকালে নাস্তা, দুপুর ও রাতে খাবারের জন্য রান্না করতে হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' হীরা মালিনী থেকে শুরু করে সামন্ত রাজা ভবানন্দ মজুমদারের স্ত্রী পদ্মমুখীকে রান্না করতে দেখা যায়–

পদ্মমুখীর রান্নাবান্না

'ভোগের রন্ধনে ভার লয়ে পদ্মমুখী।
রন্ধন করিতে গেলা মনে মহাসুখী ॥
স্নান করি করি রামা অন্নদার ধ্যান।
অন্নপূর্ণা রন্ধনে করিলা অধিষ্ঠান ॥
হাস্যমুখী পদ্মমুখী আরম্ভিলা পাক।
শড়শড়ি খণ্ট ভাজা নানামত শাক ॥

,,,

নিরামিষ তৈইশ রান্ধিলা অনায়াসে।
আরম্ভিলা বিবিধ রন্ধন মৎস্য মাসে ॥

,,,

ঝাল ঝোল ভাজা রান্ধে চিতল ফলই।
কই মাগুরের ঝোল ভিন্ন ভাজে কই ॥

,,,

কচি ছাগ মৃগমাংসের ঝাল ঝোল রসা।
কালিয়া দোলমা বাগা সেকচী সমসা ॥

,,,

আম আমসত্ব আর আমসী আচার।
চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার ॥
অম্বল রান্ধিয়া রামা আরম্ভিলা পিঠা।

,,,

পিঠা হৈল পরে পরমান্ন আরম্ভিলা।
চালু চিনা ভুরা বাজরার চালু দিলা ॥
পরমান্ন পরে খেচরান্ন রান্ধে আর।
বিষ্ণুভোগ রান্ধিলা রান্ধনী লক্ষ্মী যার ॥
অতুলিত অগণিত রান্ধিয়া ব্যঞ্জন।
অন্ন রান্ধে রাশি রাশি অন্নদামোহন ॥

,,,

লতামউ প্রভৃতি রাঢের সরু চালু।
রসে গন্ধে অমৃত আপনি আলুথালু ॥' (পৃ- ৩৪১-৩৪২)

ভোজন প্রক্রিয়া

বাঙালি সমাজে তিন বেলা খাবার গ্রহণের প্রচলন রয়েছে। খাবারের পূর্বে স্নান, স্তব-পূজা সেরে নিতে হতো। এরপর মাদুর, পিঁড়িতে বা চেয়ারে বসে খাবার খাওয়ার রীতি ছিল। গৃহবধূ বা গৃহকর্ত্রী নিজ হাতে খাবার পরিবেশন করে হাতপাখার বাতাস করতেন। গৃহকর্ত্রীকে গৃহভৃত্য বা ঝিগণ এতে সাহায্য করতো মাত্র।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে'– শিব, ব্যাসদেব, বিদ্যা-সুন্দরের ভোজন করার পরিচয় পাওয়া যায়–

শিবের ভোজন

'অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখ সম্পন্ন ॥
কারণ অমৃত পূরিত করি।
রত্ন পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী ॥
সঘৃতে পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন হরে হরিষে মাতা ॥

,,,

চুকুচুকু চুকু চুষ্য চুষিয়া।
কচে মচে চর্ব্ব্য চিবিয়া ॥
লিহ লিহ জিহে লেহ্য লেহিয়া।
চুমুকে চক চক পেয় পিয়া ॥' (পৃ- ৬৮)

মুখ শুদ্ধিকরণ

বাঙালি সমাজে খাদ্য গ্রহণের পর মুখ শোধনের প্রচলন ছিল। মুখ শোধনের এ প্রক্রিয়ায় পান, কর্পূর, অগুরুর ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত উপায়ে মুখ শুদ্ধি করতে দেখা যায়–

'ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা ॥' –(পৃ- ১০৭)

নেশাজাত দ্রব্য

বাঙালি সমাজে ধনী-বিত্তবান শ্রেণি ঐশ্বর্যের বিকারে এবং দরিদ্র গোষ্ঠী দুঃখ-যন্ত্রনা ভুলে থাকতেই মূলত নেশায় আসক্ত হতো। বাঙালির নেশাজাত দ্রব্যের মধ্যে- গাজা, ভাঙ, গুল, আফিম, ধুতুরার বিচি, সিদ্ধি, চরস, তাড়ি, ভাত থেকে পচানো মদ ও আমানীর প্রচলন ছিল। জর্দা, তামাক, সুপারি হালকা নেশাজাত দ্রব্য বলে বিবেচিত হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব নেশাজাত দ্রব্যের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. ধুতুরা ফল

'অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ লক্ষ বার।
ধুতুরার ফল তাহে যত দিতে পার ॥
মহুরী মরিচ লঙ্গ প্রভৃতি মশলা।

,,,

দুগ্ধ দিয়া ঘন করি ঘুরাও ঘোটনা ॥' –(পৃ- ৪৭)

খ. ভাঙ-আফিম

'কেহ আনি দেয় ধুতুরার ফুল ফল।
কেহ দেয় ভাঙ্গ পোস্ত আফিঙ্গ গরল ॥' (পৃ- ৬৫)

গ. তামাক-গাঁজা

'আমি যদি দেখা পাই জিজ্ঞাসিব তায়।
তামাক আফিঙ্গ গাঁজা ভাঙ্গ কত খায় ॥' (পৃ- ২২৬)

পানের ব্যবহার

বাঙালি সমাজে পানের বহুমাত্রিক ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ঠোট রাঙানোর প্রসাধনী হিসেবে, আপ্যায়নের দ্রব্য হিসেবে, বিয়ের অনুষ্ঠানে বা আত্মীয় বাড়ি বেড়ানোর উপহার হিসেবে, কর্মে নিয়োগ দানের স্বীকৃতি হিসেবে, মুখশুদ্ধির উপকরণ হিসেবে এবং কর্মের সাফল্যে পুরস্কার হিসেবে পানের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত পানের বহুমাত্রিক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. কর্মে নিয়োগ ক্ষেত্রে

'শুনরে বিশাই বাছা লহ মোর পান।
পানপাত্র হাতা দেহ করিয়া নির্ম্মাণ ॥' (পৃ- ৬৩)

খ. প্রসাধনী হিসেবে

'পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পান গুয়া
ন্যাস বেশ নাপান ঝাঁপান।' (পৃ- ৩৩০)

গ. পানাহারের বিকল্প হিসেবে

'সায়ং সন্ধ্যা সমাপিয়া বসি পান খান।
,,,
মার কাছে মজুন্দার বসি পান খান।
হেনকালে মাধী এল গাল ভরা পান ॥' (পৃ- ৩২৯-৩৩২)

ঘ. বশীকরণ ওষুধের উপকরণ হিসেবে

'মাধী পাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত তন্ত্র মন্ত্র জানে সে নাপানী গো ॥' (পৃ- ৩২৯)

ঙ. মুখশুদ্ধি ও আপ্যায়নের উপকরণ হিসেবে

'মিঠা পান মিঠা গুয়া চুন পাথরিয়া।
রাখে ছুটা বিড়া বাঁধি খিলি সাজাইয়া ॥' (পৃ- ২০৯)

উপহার-বখশিশ বা পুরস্কার

তৎকালীন বাঙালি সমাজে শাসকের বা রাজার দরবার, সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (বিবাহ, শ্রাদ্ধ) পুরোহিত-মোল্লা, রাখাল-শ্রমিক-অনুগত প্রজা, আত্মীয় বাড়িতে গমনের সময় এবং বীরত্ব-সাহসিকতায় বিভিন্ন পুরস্কার বা উপহার দেবার প্রথা প্রচলিত ছিল। এসব উপহারের সামগ্রী হিসেবে টাকা-পয়সা, সোনা-দানা, অলংকার, পান-সুপারি, ধুতি-চাদর, শাড়ি-কাপড়, থালা-বাসন-গেলাস, মাছ ও খাবারসহ বিভিন্ন বস্তু প্রদান করা হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব উপহার-বখশিশের উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. কর্ম সম্পাদনের পুরস্কার

‘রতন নির্ম্মিত দিলা হাতা পানপাত্র ॥
রতন মুকুট দিলা নানা অলংকার।
অমূল্য কাঁচুলি শাড়ি উড়নি যে আর ॥
বসিবার মণিময় দিলা কোকনদ।’ (পৃ- ৬৩)

খ. কর্মের সাফল্য ও বীরত্বের পুরস্কার

‘নিবেদিল চোর ধরিবার সমাচার।
শিরোপা পাইল হাতী ঘোড়া হাতিয়ার ॥’ (পৃ- ২৬৬)

গ. ব্রাহ্মণদের দান-দক্ষিণা

‘ব্রাহ্মণ পণ্ডিত লয়ে বিচার শুনিয়া।
তুষ্ট কৈলা সকলের নানা ধন দিয়া ॥’ (পৃ- ২৯১)

ঘ. গৃহভৃত্যদের বখশিশ

‘শুনি রাম সুমার্দ্দার সীতা ঠাকুরাণী।
বাসুরে শিরোপা দিলা যোড় শাড়ী আনি ॥’ (পৃ- ৩২৮)

ঙ. কৃষক প্রজাদেরকে রাজার বখশিশ

‘দেখা কৈল যত প্রজা গোমস্তা মণ্ডল ॥
শিরোপা দিলেন সবে বিবিধ প্রকার।
সেলামী দিলেক সবে চতুর্গুণ তার ॥’ (পৃ- ৩৩৮)

চ. পূজায় আগতদের দান-দক্ষিণা

‘সবাকারে দিলা তৈল সিন্দুর চিরণী।
কুতূহল কোলাহল হুলুহুলু ধ্বনি ॥’ (পৃ- ৩৪০)

আপ্যায়ন ও অতিথি সেবা

বাঙালি বরাবরই অতিথি পরায়ন জাতি। আগত অতিথিকে ধনী-গরীব নির্বিশেষে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে গ্রহণ, উত্তম খাবারের ব্যবস্থা, শয়ন বা ঘুমানোর জন্য উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিদায়কালে বিনয় সহকারে বিদায় সম্ভাষণ জানানো- এসবই বাঙালির অতিথি সেবা ও আপ্যায়নের অন্তর্ভুক্ত। অতিথি সেবার ক্ষেত্রে বিনয়, আন্তরিকতাই বড় গুণ বলে বিবেচিত হতো।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বাঙালি সমাজে প্রচলিত আপ্যায়ন ও অতিথি সেবার ক্ষেত্রে প্রচলিত ব্যবস্থা ও বিনয়ের চিত্র পাওয়া যায়–

ক. ব্যাসদেবকে অন্নপূর্ণার আপ্যায়ন

‘শুন ব্যাস গোসাঁই আমার নিবেদন।
নিমন্ত্রণ মোর বাড়ী করিবা ভোজন ॥
বৃদ্ধ মোর গৃহস্থ অতিথি ভক্তিমান।
অতিথি সেবন বিনা জল নাহি খান ॥

,,,

এত বলি ব্যাসদেবে সশিষ্যে লইয়া।

অন্ন দিলা অন্নপূর্ণা উদর পুরিয়া ॥
চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় আদি রস যত।
ভোজন করিলা সবে বাসনার মত ॥
ভোজনান্তে আচমন সকলে করিলা।
হরপ্রিয়া হরীতকী মুখশুদ্ধি দিলা ॥' (পৃ- ১০৬-১০৭)

খ. অতিথি সেবার আদর্শ (হরিহোড়)

'কহিলা মধুর স্বরে থাকিলাম তোর ঘরে
হরি বলে এ হবে কেমনে।
ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারি জনে ॥
অতিথি আপনি হবে উপোসী কেমনে রবে
অন্নের সংযোগ মোর নাই।' (পৃ- ১৪৩)

কুশল বিনিময়

বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কুশল বিনিময়ের ক্ষেত্রে কতিপয় প্রথা মেনে চলতো। সাক্ষাতের শুরুতেই সালাম বা নমস্কার দেয়া এবং পরিচিত হলে বাড়ি-পরিবারের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করা আর অপরিচিত হলে নাম, পিতামাতা, পেশা, গ্রাম, দেশের পরিচয় বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাওয়া হতো।
'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব কুশল বিনিময়ের চিত্র পাওয়া যায়–

সুন্দর ও হীরার কুশল বিনিময়

'কাছে আসি হাসি হাসি করয়ে জিজ্ঞাসা।
কে তুমি কোথায় যাবে কোন খানে বাসা ॥
সুন্দর কহেন আমি বিদ্যা ব্যবসাই।
এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই ॥

,,,

মালিনী বলিছে আমি দুখিনী মালিনী।
বাড়ী মোর ঘেরা বটে থাকি একাকিনী ॥
নিয়মিত ফুল রাজবাড়ীতে যোগাই।

,,,

কাঙ্গাল দেখিয়া যদি ঘৃণা নাহি হয়।
আমি দিব বাসা আইস আমার আলয় ॥ (পৃ- ১৭৬)

আদব-কায়দা ও বিনয়

বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে প্রাত্যহিক জীবনে কিছু আদব-কায়দা মেনে চলতো। সাক্ষাতের প্রথমেই সালাম-আদাব-নমস্কার জানানো, করমর্দন করা, কোলাকুলি করা, গুরুজনকে প্রণাম বা কদমবুছি করা। আবার বিদায়কালেও তদ্রূপ কর্মগুলো করা। এছাড়া গুরুজনের সামনে বসে না থাকা, গুরুজনের সামনে তাদের নাম উচ্চারণ না করা, উচ্চশব্দে হাসা বা কথা না বলা, গুরুজনের চোখ বরাবর দৃষ্টি না রেখে নত মস্তকে কথা বলা,

গুরুজনের সামনে না চলা, একই বৈঠকে খেতে গেলে গুরুজনের আগেই খাবার না খাওয়া, গুরুজনের পূর্বেই বৈঠক থেকে না ওঠা এবং গুরুজনের সামনে ধূমপান ও হাসি-ঠাট্টা না করা।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব আদব-কায়দা ও বিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়–

ক. প্রণাম ও পদবন্দনা

'শুনিয়া মেনকা মনে জানিলা নারদ।
সম্ভ্রমে বাহিরে আসি বন্দিলেন পদ ॥
হিমালয় শুনিয়া আইলা দ্রুত হয়ে।
সিংহাসনে বসাইলা পদধূলি লয়ে ॥' (পৃ- ৩২)

খ. হাতজোড় করে বিনয়

'যত সখীগণ বিরস বদন
রাণীর নিকটে যায়।
করি জোড় পানি নিবেদয়ে রানী
প্রণাম করিয়া পায় ॥' (পৃ- ২৩৬)

গ. বিদায় বেলার বিনয় সম্ভাষণ

'বিল্বপত্র ঘ্রাণ লয়ে বন্ধুগণে প্রিয় কয়ে
গোবিন্দদেবেরে প্রণামিলা।
বাপ মায় প্রণামিয়া দুই নারী সম্ভাষিয়া
আরোহিলা পালকী উপর ॥' (পৃ- ২৯৮)

ঘ. স্বামীর প্রতি স্ত্রীদের বিনম্র ভক্তি ও নমস্কার

'মাধীর বচনে পদ্মমুখী ত্বরান্বিতা।
দেহুড়ীর কাছে গিয়া হৈলা উপনীতা ॥
গলায় অঞ্চল দিয়া কৈলা নমস্কার।' (পৃ- ৩৩৪)

শিক্ষা ব্যবস্থা

মধ্যযুগে বাঙালি সমাজে শিক্ষার কেন্দ্র বা বিদ্যাপীঠ হিসেবে টোল, চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মঠ, গুরুগৃহ, মাদ্রাসা, মক্তব, মসজিদ ব্যবহৃত হতো। এসব প্রতিষ্ঠানে গুরু-পণ্ডিত ও শিক্ষক বা ওস্তাদের মাধ্যমে ব্যাকরণ, কাব্য, অলংকার, নাট্যশাস্ত্র, সঙ্গীত, স্মৃতিশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিত, রতিশাস্ত্র, কারিগরি বিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, ভূগোল, পদার্থ, রসায়ন, জ্যামিতি ও চিকিৎসা শাস্ত্রে পাঠদান করানো হতো।

সন্তানের ৫ বছর বয়সে হিন্দুরা 'হাতেখড়ি' এবং মুসলমানগণ 'বিসমিল্লাহ খানি' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক বিদ্যা শিক্ষা শুরু করতো। তবে এ বিদ্যা শিক্ষায় শিষ্টাচার, আদব কায়দা, নম্রতা, সততা, ভদ্রতা, ন্যায়-নীতির ওপর উভয় সমাজই বিশেষ জোর দিতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' যুবরাজ সুন্দর, রাজকন্যা বিদ্যা ও ভবানন্দ মজুমদারের বাল্যশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়–

বিদ্যার শিক্ষা ব্যবস্থা

বীর সিংহ নামে নরপতি।
বিদ্যানামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥

প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।
রাজপুত্রগণ তায় আসিয়া হারিয়া যায়।
রাজা ভাবে কি হবে ইহার ॥' (পৃ- ১৬২)

পঠিত বিষয়

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বিদ্যা ও সুন্দরের পাণ্ডিত্য বিচারের মাধ্যমে বাঙালি সমাজে প্রচলিত পাঠ্য বিষয়সমূহের পরিচয় পাওয়া যায়–

ক. ব্রাহ্মণদের শিক্ষার বিষয়

'ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেখে বেদ অধ্যয়ন।
ব্যাকরণ অলংকার স্মৃতি দরশন ॥' (পৃ- ১৭০)

খ. গণক-জ্যোতিষিদের শিক্ষা

'অভিজ্ঞ সর্ব্বজ্ঞ পতি গণক রাজার।
,,,
পাপরাশি পাপগ্রহ পাপতিথি তারা।
,,,
সর্ব্বদা আঙ্গুল পাঁজি করি কাল কাটে।' (পৃ- ২৬১)

গ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বিষয়

'ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলংকার সঙ্গীত শাস্ত্রের অধ্যাপক ॥' (পৃ- ৩৪৯)

ঘ. কামশাস্ত্র বা রতি বিদ্যা

'মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
,,,
কামশাস্ত্র জানে কত বিদ্যা অলংকার।
কত মতে করে রতি বলিহারি তার ॥' (পৃ- ২৫৪)

ঙ. ভাষা বিদ্যা

'মানসিংহ পাতশায় হৈল যে বাণী।
উচিত যে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী ॥' (পৃ- ৩০৩)
,,,
'পুরাণ আগমবেত্তা নাগরী পারসী।
দয়া করি দিব দিব্যজ্ঞানের আরশী ॥' (পৃ- ৩৪৯)

চুরি বিদ্যা

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সামন্তবাদী সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় ভবিষ্যৎ বিপদের চিন্তা থেকেই এবং তা উত্তরণের পন্থা হিসেবে শাসকগণ যুবরাজদের অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষার সঙ্গে চুরি বিদ্যাও শিক্ষা দিতেন। যুবরাজ সুন্দরের চুরি বিদ্যায় অভিজ্ঞতা তারই প্রমাণ বহন করে–

'চোর বিদ্যা বিচার আমার নহে পণ।
চোরসহ বিচার কি করে সাধু জন ॥' (পৃ- ২০৫)

সাহিত্যের বিষয়-আশয়

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' সাহিত্যের নানাবিধ শাখার বা বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়–

নাট্যাভিনয় বা নাটক

'নাট্যশালা হইতে আনিল আয়োজন।
ধরিল নারীর বেশ ভাই দশ জন ॥' (পৃ- ২৪৭)

পাণ্ডিত্য যাচাই বা তর্কযুদ্ধ বা বিদ্যা বিচার

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাংলায় কবি-পণ্ডিত-শাস্ত্রকার ও মুণি-ঋষিগণের মধ্যে পাণ্ডিত্য বিচার করতে তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হতো। তর্কে জয়ী পণ্ডিতের পুরস্কার, সম্মান, সৌভাগ্য ও সুখ্যাতির প্রকাশ ঘটতো। অনেক রাজা বা রাজকুমারী এ তর্কযুদ্ধের বা প্রহেলিকা বিচারের মাধ্যমে বরবরণ করে নিতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বর্ধমান রাজকন্যা বিদ্যাও তার বরবরণ করতে এ পাণ্ডিত্য বিচার পদ্ধতি গ্রহণ করে এবং বর হিসেবে সুন্দরকে নির্বাচন করে। এ পাণ্ডিত্য বিচারের বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ–

'পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা রসের তরঙ্গ।
প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে উঠে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ ॥
ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
অলংকার আদি সাধ্য সাধন সাধক ॥

,,,

বেদন্ত একাত্মবাদী দ্ব্যাত্মবাদী তর্ক।
মীমাংসায় মীমাংসার না হয় সম্পর্ক ॥
বৈশোষিকে বিশেষ কহিতে কিছু নারে।
পাতঞ্জলে মাথায় অঞ্জলি বান্ধি হারে ॥
সাঙ্খ্যেতে কি হবে সঙ্খ্যা আত্মনিরূপণ।
পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন ॥
শ্রুতি বিনা উপায় না পায় সমাধার।

,,,

সুন্দর কহেন রামা কি হৈল সিদ্ধান্ত।
বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥
অন্য শাস্ত্র যে সব সে সব কাঁটাবন।
তত্ত্বগ্রন্থ বাদরায়ণে প্রমাণ লিখন ॥' (পৃ ২০৭-২০৮)

লেখার উপকরণ

বাঙালি সমাজে লেখা-পড়ার উপকরণ হিসেবে পুঁথি ও পাণ্ডুলিপিকে প্রথা হিসেবে ব্যবহার করা হতো। বিশেষ উপায়ে তালপাতা, কলাপাতা, চামড়া ও তুলা থেকে কাগজ তৈরি করা হতো। এসব কাগজে বাঁশের কাঠ বা কঞ্চি, গাছের ডাল ও পাখির পালকের কলম দিয়ে কালির সমন্বয়ে (অর্জুন, বাবলার বাকল ও গাব-পুইয়ের গুটাজাত কালি) লেখা হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব লেখার উপকরণের প্রমাণ মেলে–

ক. দোয়াত-কলম

‘পাতি লেখা রাজার মুনশী মোর পতি।
দোয়াতে কলম দিয়া বলে হৈল রতি ॥’ (পৃ- ২৬১)

খ. কাগজ বা ফর্দ

‘হেটে ফর্দ্দ হারায়ে উপরে হাতায়।
পরের কলমে সদা দোয়াতি যোগায় ॥’ (পৃ- ২৬৩)

গ. তাম্রপত্র

‘সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া ॥
তাম্রপত্রে সন্ধিমন্ত্র বিশেষ লিখিয়া।’ (পৃ- ১৯৯)

চিঠিপত্র

তৎকালীন বাঙালি সমাজে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে চিঠি-পত্রের ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত ছিল। শিক্ষিত নর-নারী উভয়েই চিঠিপত্র লেনদেন করতো। পত্রবাহক হিসেবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী, দূত এমনকি শিকারী বা পোষা পায়রা বা কবুতর, ঘুঘু, টিয়া পাখির ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বাঙালি সমাজে প্রচলিত চিঠিপত্রের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. সুন্দরের শ্লোকপত্র ও রহস্য সংকেত

‘লিখিনু যে শ্লোক তিন পদে দেখ তার।
দ্বিতীয় পঞ্চমাক্ষর গণ দুইবার ॥
একত্র করিয়া পড় মোর নাম পাবে।
অপর সুধাবে যাহা মালিনী শুনাবে ॥’ (পৃ- ১৮৮)

খ. রাজকীয় পত্র

‘সেই দেশে ভাট গিয়া নিবেদিল পত্র দিয়া
আসিতে বাসনা হৈল তার।’ (পৃ- ১৬২)

চিকিৎসা পদ্ধতি

বাঙালি সমাজে চিকিৎসা বিদ্যা ছিল অর্থ উপার্জনের সম্মানজনক একটি পথ বা পদ্ধতি। হিন্দু বৈদ্যরা আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করে কবিরাজ হতো, মুসলমানেরা তিব্বতীয় বা ইউনানী অধ্যয়ন করে হেকিম বা তবির হতো। এছাড়া বৌদ্ধরা মঘা বা বর্মী চিকিৎসা শাস্ত্রানুযায়ী এ দেশে শিশু ও নারী শিক্ষার সূত্রপাত ঘটায়। আবার গোয়ালেরা গ্রামের পশু চিকিৎসা এবং নাপিতেরা ফোঁড়া কাটার ব্যাপারে বেশ পরিচিতি পায়। এসব চিকিৎসার পাশাপাশি পীর-সন্ন্যাসী-মোল্লা-পুরোহিতদের দেয়া ঝাড়-ফুঁক, পানি পড়া, তাবিজ-কবচ ও অসুখ-বিসুখের দাওয়াই হিসেবে ব্যবহার করা হতো।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব চিকিৎসা পদ্ধতির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. সন্তান লাভে ভেষজ ওষুধ

‘মায়াময় শ্রীফলের ফুল দিলা হাতে।
,,,
কানে কানে কহিলেন যতনে রাখিবে।
ঋতুস্নান দিনে ইহা বাটিয়া খাইবে ॥’ (পৃ- ১৪০)

খ. বৈদ্য বা ওঝার আয়ুর্বেদ চিকিৎসা

‘বৈদ্য দেখে নাড়ী ধরি কহে ব্যাধিভেদ।
চিকিৎসা করয়ে পড়ে কাব্য আয়ুর্ব্বেদ ॥’ (পৃ- ১৭০)

বকা ও গালি

বাঙালি সমাজে বহুকাল থেকেই কিছু বকা ও গালি প্রচলিত রয়েছে। আত্মীয়তার সম্পর্কবাচক, স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক ও পশু-পাখিবাচক নিন্দার্থক শব্দগুলোকে বাঙালি সমাজে গালি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এসব গালির মধ্যে– শালা, শালী, সমুন্দি, কানা-কানী, ভাঙরা, বখিল, গরু, গাই, বলদ, ষাঁড়, পাঠা, গাধা, হাতী, বানর, ছাগল, বাছুর, কুত্তার বাচ্চা, বাদীর বাচ্চা, শালার পু শালা, শুয়োরের ছাও ও মাগী অন্যতম। বকা সাধারণত প্রতাপশালীর হাতিয়ার এবং অসহায় গরীবের সান্ত্বনা বস্তু বলে বিবেচিত হয়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব বকা ও গালির উল্লেখ পাওয়া যায়। এসব গালির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ভাঙ্গর, আঁটকুড়া, ঠেঁটা, বুড়ী, বুড়া, বিটল বামন, মাগী, শালী, লোচন খাগী, কুটনী ঘাগী, শালী, রাক্ষুসী, পাপীয়সী, ভাতার খাগী, গাজাখোর, পেতনী, ডাকিনী, কুঁজী, হারামজাদী প্রভৃতি।

ক. ভাঙ্গর

'আমার উমা মেয়ের চূড়া।
ভাঙ্গর পাগল ওই লো বুড়া ॥ (পৃ- ৪২)

খ. রাক্ষুসী ও পাপীয়সী

'বিয়া কৈল লুকাইয়া শেষে দিল ধরাইয়া
ডাকাতির দুহিতা রাক্ষসী।
আহা মরি আহা মরি হায় হায় হরিহরি
পতিবর্ধ কৈল পাপীয়সী ॥' (পৃ- ২৭৩)

গ. শালা

'ভাঙ্গাইয়া আড়কাট এমনি লাগায় ঠাট
বলে শালা আলো টাকা মোর।' (পৃ- ১৭৮)

ঘ. শালী

'দেই গালি বলে শালী কোথা পালি চোরে।
কেটা সেটা কার বেটা বল কেটা মোরে ॥' (পৃ- ২৫৩)

ঙ. হারামজাদী

'মাধী হারামজাদী এখনি হৈল বাদী
করিতে চায় ছাড়াছাড়ি।' (পৃ- ৩৩৩)

শাস্তি ও বিচার ব্যবস্থা

বাঙালি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে অন্যায়-অপরাধের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। সাধারণ অন্যায়ের জন্য শাস্তিগুলো হলো– চড়, থাপড়, কিল, ঘুষি, কানমর্দন, নাকে খত, গলায় গামছা দিয়ে ঘোরানো, কান ধরে উঠ বস করানো, পিঁপড়ার ওপর দাঁড় করানো, লাঠি-বেত দিয়ে প্রহার, মাথা মুণ্ডন, মুখে কালি দেয়া ও গলায় জুতার মালা দিয়ে ঘোরানো। অন্যদিকে চুরি-ডাকাতি, অপহরণ, হত্যা, ব্যাভিচার, খুন, ধর্ষণ, বিদ্রোহ, গুমের শাস্তি স্বরূপ– চাবুক মারা, দোররা মারা, অঙ্গচ্ছেদ, জেল-জুলুম, ফাঁসি, শিরশ্ছেদ, আগুনে পোড়ানো, হাতির পদতলে পিষ্টকরণ ও শূলে দেবার রীতি ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' মধ্যযুগীয় বাংলায় প্রচলিত এসব শাস্তির চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এর মধ্যে– লাথি, কিল, আগুনে পোড়ানো, জুতার প্রহার, নাক-কান কর্তন, বেত্রাঘাত, গালে চুনকালি লেপন, প্রহার, চুল ধরে টানা, শূলে দেওয়া, নাকে খত, মাথা মুণ্ডানো, জেলজুলুম ও প্রাণদণ্ডের বিধান অন্যতম।

ক. নাক-কান কাটা ও শূলে চড়ানো

'থাক থাক থাক কাটাইব নাক
আগে ত রাজারে কহি।
মাথা মুড়াইব শালে চড়াইব
ভারত কহিছে সহি ॥' (পৃ- ২৩৯)

খ. কিল-থাপর ও বেত্রাঘাত

'হাত কড়ি পায় দড়ি মারে ছড়ি বেত্রে ॥
নঠশীল মারে কিল লাগে খিল দাঁতে।' (পৃ- ২৫১)

গ. মাথা মুণ্ডানো ও চুন কালি লেপন

'দূর কর কুটিনীরে মাথা মুড়াইয়া।
গঙ্গাপার কর গালে চুণ কালি দিয়া ॥' (পৃ- ২৬৭)

ঘ. মৃত্যুদণ্ড বা মুণ্ডপাত

'কহ সত্য পরিচয় কহ সত্য পরিচয়।
মিথ্যা যদি কহ তবে যাবে যমালয় ॥' (পৃ- ২৬৮)

ঙ. জেল-জুলুম

'পাতশার আজ্ঞা পায় নাজির সত্বরে ধায়
মজুন্দার কয়েদ করিল।
দিলেক হাবসি খানা অন্ন জল কৈল মানা
দ্রব্যজাত লুঠিয়া লইল ॥' (পৃ- ৩০৯)

রোগ-বালাই

তৎকালীন বাঙালি সমাজে বেশ কিছু রোগের প্রকোপ ও প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান ছিল। এসব রোগের মধ্যে- চোখে ছানি, স্বর্দি, জ্বর, অতিসার, শূল, ব্যথা, কাশ, গলগণ্ড, বধিরত্ব, কফ, খুজলি-পাচরা, দাউদ, বাত, পিত্ত, বাউসি (পাইলস), যক্ষ্মা, গুটি বসন্ত, জণ্ডিস, গোদ (Elephantiasis), কুষ্ঠ ও সিফিলিস বা উপদংশন অন্যতম।
'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে সংক্রমিত এসব রোগের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়–

ক. জ্বর

'তামার শলা বুড়ার জটা।
তায় বেড়িয়া ফোঁফায় ফণী
দেখে আসে জ্বর লো।' (পৃ- ৪২)

খ. বাত

'বায়ুতে পাকিয়া চুল হৈল শনলুড়ি।
বাতে করিয়াছে খোঁড়া চলি গুড়ি গুড়ি ॥' (পৃ- ১৩০)

গ. কুঁজো ও শূল

'শিরঃশূলে চক্ষু গেল কুঁজা কৈল কুঁজে।
কতটা বয়স মোর যদি কেহ বুজে ॥' (পৃ- ১৩০)

ঘ. স্বর্দি

'সর্ব্বদা ওয়াক সর্দ্দি মুখে উঠে জল।
কত সাধ খেতে সাদ সুস্বাদু অম্বল ॥' (পৃ- ২৩৫)

ঙ. অন্ধত্ব

'মন্দ ভাগ্য অন্ধ পতি দ্বন্দ্বে মাত্র ভাল।
গোরা ছিনু ভাবিতে ভাবিতে হৈনু কাল ॥' (পৃ- ২৫৯)

চ. গোদ

'গোদা কুঁজো কুরুণ্ডে প্রভৃতি আর যত।
সকলের রমণী সকলে নিন্দে কত ॥' (পৃ- ২৬৫)

লোকাচার-সংস্কার-বিশ্বাস

বাঙালির জীবন বহুকাল ধরেই লোকাচার-বিশ্বাস ও সংস্কার দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। বাঙালি তার প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় চেতন-অবচেতন মনেই ঋতু-মাস-বার-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র ও যাত্রার শুভাশুভ, স্বপ্নের ব্যাখ্যা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া, ঝাড়ফুঁক, জাদু-মন্ত্র, দারু-টোনা, তুক-তাক, বাণ-উচাটন, তাবিজ-কবচে বিশ্বাস, তেলপড়া, বাটি চালান, হাত চালান, আয়না পড়ায় আস্থা, বট-তাল-তেঁতুল-গাব-শেওড়া গাছে ভীতি, জীন-ভূত-দেব-দানবে ভীতি ও বিশ্বাস, গৃহনির্মাণ ও গৃহ প্রবেশের নিয়ম নীতি মানা, রাশিচক্র ও নিয়তিতে বিশ্বাস করে থাকে। 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব লোকাচার বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়–

ক. সংসারে ঐশ্বর্য ও পুত্রলাভে স্ত্রী-পুরুষ ভাগ্যকে মানা

'পরস্পর পরস্পরা শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র ॥' (পৃ- ৫৭)

খ. স্বামীকে কটুকথা বা আঘাত না করা

'কেমনে এমন কন লাজ নাহি হয়।
কহিবারে পাকি কিন্তু উপযুক্ত নয় ॥' (পৃ- ৫৮)

গ. স্বামীর নাম না বলা

'বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি।
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী ॥' (পৃ- ১৫৭)

ঘ. হোঁচট ও হাত খসে দ্রব্য পরা অলুক্ষণে

'কপালে টনক নড়ে হাত হৈতে হাতা পড়ে
উছট লাগিয়া পদ টলে ॥
দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্মে মন্দ করে
অন্নদার উপজিল রোষ।' (পৃ- ১২৬)

ঙ. অন্নদাপূজার অষ্টমী তিথিতে স্ত্রী সংসর্গ পরিত্যাজ্য

'অষ্টমীর পর্ব্ব কয় ইথে রতি যুক্ত নয়
অন্নদার ব্রততিথি তায়।' (পৃ- ১৩৫)

চ. সধবা স্ত্রীর এয়োতির চিহ্ন বহন করা

'আয়তের চিহ্ন হাতে লোহা এক গাছি।

মুখ গন্ধে পদ্মিনীর সদা উড়ে মাছি ॥' (পৃ- ১৩৯)

ছ. ঋতু স্নান মানা

'দেবীর দয়ায় ঋতু সেই দিনে হয় ॥
স্নান দিনে সেই ফুল বাটিয়া খাইল।' (পৃ- ১৪১)

জ. ঋতু স্নান বা শুদ্ধির দিনে পতি সংসর্গ

'সীতা ঠাকুরাণী নামে তাহার গৃহিণী।
ঋতু স্নান সে দিন করিয়াছিলা তিনি ॥
রতি রসে সেই সতী পতিরে তুষিলা।' (পৃ- ১৫৫)

ঝ. পূজা না সেরে খাওয়া অপ্রশস্ত

'এত বেলা হৈল পূজা না করি।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় জ্বলিয়া মরি ॥' (পৃ- ১৮৮)

ঞ. বিবাহের ক্ষেত্রে শিবের হস্তক্ষেপে বিশ্বাস

'এত দিনে বুঝি শিব হৈলা অনুকূল।
ফুটাই ভগবতী বিবাহের ফুল ॥' (পৃ- ১৯৩)

ট. গর্ভবাসকে পাপ মনে করা

'মহাপাপ থাকে যার গর্ভবাস হয় তার
নিগম আগমে সুবিদিত।' (পৃ- ১৩৭)

ঠ. অনুঢ়া যুবতী কন্যাকে অশুভ সংকেত মনে করা

'কি কহিব হায় হায় জ্বলন্ত আগুন প্রায়
আইবড় এত বড় মেয়ে।' (পৃ- ২৪১)

ড. যাত্রার শুভ লক্ষণ

'জয় অন্নপূর্ণা কয়ে চলিলা সত্বর হয়ে
মঙ্গল দেখেন বহুতর ॥
ধেনু বৎস এক স্থানে বৃষ খুরে ক্ষিতি টানে
দক্ষিণেতে ব্রাক্ষণ অনল।' (পৃ- ২৯৮)

ঢ. ভূত-প্রেতে বিশ্বাস

ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড়ে তত ॥
'দেখিতে না পাই কেবা করে ধূমধাম।
সবো রোজ হাঁকে হুম হাম খুম খাম ॥

,,,

এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায় ॥' (পৃ ৩১৪-৩১৫)

জাদু-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁক

বাঙালি সমাজে বহুকাল যাবত জাদু-মন্ত্র, ঝাড়–ফুঁকের প্রভাব রয়েছে। সাপের বিষ ঝাড়া, তেলপড়া, বাটিপড়া, আয়না পড়া, কাজল পড়া, পান পড়া, ধূলা পড়া, চুরি করতে মাটি পড়া বা ঘুমের মন্ত্র, পাতা পড়া, বাণ মারা, ভূত-পিশাচ-জীন চালান করা, নজরবন্দি বা ভেলকীবাজী, ডাকিনী বিদ্যায় বিশ্বাস ও আস্থা আজো বাঙালি সমাজে বিদ্যমান রয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত জাদু-মন্ত্র ও ঝাড়-ফুঁকের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. কলহ-কন্দলের মন্ত্র

'সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীণা যন্ত্র।
দাড়ি লয়ে ঘন পড়ে কন্দলের মন্ত্র ॥' (পৃ- ৪৩)

খ. মন্ত্রের প্রভাব

'জগতে যে কিছু আছে অধীন দেবের
শাস্ত্রে বলে সেই দেব অধীন মন্ত্রের ॥' (পৃ- ১৩০)

গ. গুপ্ত মন্ত্র

'পূজা করি সিঁদকাঠি লইলেন রায়।
মন্ত্রপড়ি ফুঁক দিয়া মাটিতে ভেজায় ॥' (পৃ- ১৯৯)

ঘ. ভেলকী বাজি

'এখন সন্ন্যাসী যদি জিনে লয়ে যায়।
চেয়ে রবে ভেল ভেল ভেলকীর প্রায় ॥' (পৃ- ২২৮)

ঙ. সাপের সুরক্ষায় তন্ত্রমন্ত্র ও ওষুধের ব্যবস্থা

'চাঁদড় ঈশার মূল বোঝা বোঝা আনে।
মণি মন্ত্র মহৌষধি যেবা যত জানে ॥
শরীর পাঁচিয়া সবে ঔষধ বসায়।
যার গন্ধে মাথা গুজি বাসুকি পলায় ॥' (পৃ- ২৪৭)

চ. ভূত ছাড়ানোর মন্ত্র

'ভূত ছাড়াইতে ওঝা মন্ত্র পড়ে যত।
বিবী লয়ে ভূতের আনন্দ বাড় তত ॥
অরে রে খবিস তোরে ডাকে ব্রহ্মদূত।
ও তোর মাতারি তুই উহারি সে পুত ॥
কুপী ভরি গিলাইব হারামের হাড়।
ফতমী বিবীর আজ্ঞা ছাড় ছাড় ছাড় ॥' (পৃ- ৩৪১)

ছ. পান পড়া ও পানি পড়া (বশিকরণ মন্ত্র)

'মাধী শাছে পড়ি দেয় পান পানি গো।
কত মন্ত্র তন্ত্র জানে সে নাপানী গো ॥' (পৃ- ৩২৯)

জ. তেল পড়া-কাজল পড়া (বশীকরণ মন্ত্র)

'পড়া তৈল মুখে মাখি   পড়া ফুল চুলে রাখি

নানা মন্ত্রে সিন্দুর পড়িলা ৷৷
পরি পড়া গন্ধ চুয়া মুখে পড়া পান গুয়া
ন্যাস বেশ নাপান ঝাঁপান। (পৃ- ৩৩০)

ঝ. বশীকরণ তন্ত্রমন্ত্রের ব্যবস্থা

'করিনু যত তন্ত্র পড়িনু যত মন্ত্র
কন্দলে গেল মাড়ামাড়ি।' (পৃ- ৩৩৪)

তাবিজ কবচে আস্থা

বহুকাল যাবত বাঙালি সমাজে তাবিজ-কবচ-মাদুলির ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন রোগ-বালাই, বিপদ আপদ, অশুভ দৃষ্টির হাত থেকে রক্ষায় সুরক্ষা হিসেবে পীর-ফকির-সাধু-সন্ন্যাসীদের কাছ থেকে তাবিজ-কবচ ধারণ করতে আজো দেখা যায়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত তাবিজ কবচের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. কবচের ব্যবহার

'উপাসনা পূজা ধ্যান কবচ সাধন।
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ ফলে নিয়োজন ৷৷' (পৃ- ৬৯)

খ. তাবিজের ব্যবহার

'ইত্যাদি অনেক মন্ত্র পড়িলেক ওঝা।
মিয়া দিলা লিখিয়া তাবিজ বোঝা বোঝা ৷৷

,,,

এমন খবিশ আর না শুনি কোথায়।
তাবিজ ছিড়িয়া ফেলি ওঝারে কিলায় ৷৷' (পৃ- ৩১৫)

মানত বা মানসিক

বাঙালি সমাজে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ, পরীক্ষা ও মামলা থেকে মুক্তি বা জয়ী হতে মসজিদ-মন্দির-বিধাতার নামে বিভিন্ন দ্রব্য বা বস্তু মানত করে। মানত বা মানসিকের বস্তুর মধ্যে হলো- গরু, ছাগল, মোরগ, মুরগি, টাকা-পয়সা, মিষ্টি-বাতাসা, শিরনি প্রভৃতি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত মানত বা মানসিকের চিত্র পাওয়া যায়–

অন্নদাদেবীর উদ্দেশ্যে মানত

'অষ্টাহ মঙ্গল যেই শুনে ইতিহাস।
তাহার নিবাসে সদা আমার নিবাস ৷৷
একমনে মোর গীত যে করে মাননা।
আমি পূর্ণ করি তার মনের বাসনা ৷৷' (পৃ- ৮৮)

ধর্মীয় উৎসব ও পূজা-যাগ-যজ্ঞ

ধর্মই বাঙালির প্রাণ এবং এ ধর্মকে আশ্রয় করেই বাঙালির সমগ্র জীবন প্রবাহ পরিচালিত হয়। বাঙালি হিন্দুর জীবনে বছরের বারো মাসে তেরো পার্বণ-পূজা প্রচলিত রয়েছে। এ সবের মধ্যে মাঘে– সরস্বতী ও শ্রীপঞ্চমী, ফাল্গুণে- দোল-পূর্ণিমা ও বাসন্তী পূজা, চৈত্রে- চড়ক পূজা, বৈশাখে-বাস্তুপূজা, জ্যৈষ্ঠে- জামাই ষষ্ঠী, আশ্বিনে দূর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, অগ্রহায়ণে– নবান্ন এবং পৌষ পার্বণ অন্যতম। এছাড়া পুত্রেষ্টি যজ্ঞ, রথযাত্রা, রাসযাত্রা,

চণ্ডী পূজা, মনসা পূজা, শিবরাত্রি, বিশ্বকর্মা পূজা, উপনয়ন ও ফাইফোঁটা অন্যতম। মুসলিম সমাজে ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, মহররম, শবে বরাত ও শবে কদর প্রচলিত রয়েছে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' হিন্দু সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের পূজা ব্রতের ও উপাসনার উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. ষষ্ঠী পূজা

'ষষ্ঠী পূজা হৈল সায় ছয় মাসে অন্ন খায়
যুবা হৈল নানা দুঃখ পায়ে।' (পৃ- ১৪১)

খ. শিব পূজা

'স্থলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিব শিবাচরণ পূজিলা ॥' (পৃ- ১৭২)

গ. কালী পূজা

'আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায়।
কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায় ॥' (পৃ- ১৯৯)

ঘ. কুমারী পূজা

'তার মধ্যে কতগুলি কুমারী লইয়া।
করিলা কুমারী পূজা বাস ভূষ দিয়া ॥' (পৃ- ৩৪০)

ঙ. দুর্গা বা অন্নপূর্ণা পূজা

'পৌষ মাঘ ফাগুন বঞ্চিয়া সুখসার।
চৈত্র মাসে পূজা আরম্ভিলা অন্নদার ॥ (পৃ- ৩৩৮)
(চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়)

চ. সূর্য পূজা

'সূর্য্যরূপে ঈশ্বরের পূর্ব্বেতে উদয়।
পূর্ব্বমুখে পূজে হিন্দু জ্ঞানোদয় হয় ॥' (পৃ- ৩০৮)

পুণ্যাহ বা হালখাতা

মধ্যযুগ থেকেই (আকবরের শাসনামল) সামন্তবাদী শাসনভুক্ত সুবা বাংলায় নবান্নে পুণ্যাহ উদ্‌যাপিত হতো। এ দিন প্রজাগণ নির্ধারিত রাজস্ব বা খাজনা উত্তম পোশাক পরিধান করে রাজা বা জমিদারের দরবারে গিয়ে পরিশোধ করতো। শাসকগণও প্রজাদের খাদ্যদ্রব্য, পান-সুপারির উপহার প্রদান করে তুষ্ট করতো। এছাড়া ব্যবসায়ীরা পহেলা বৈশাখে মাসে হালখাতা পালন করে থাকে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' সামন্ত রাজা ভবানন্দ মজুমদারকে রাজস্ব বা খাজনা আদায়ের উদ্দেশ্যে অগ্রহায়ণের নবান্নে পুণ্যাহ পালন করতে দেখা যায়–

হায়নের অগ্র অগ্রহায়ণ জানিয়া।
শুভ দিনে পুণ্যাহ করিলা বিচারিয়া ॥' (পৃ- ৩৩৮)

পশুবলি প্রথা

বাঙালি হিন্দু সমাজে পূজা ও ব্রত উৎসবে দেবতার সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্তে নরবলি ও পশুবলির প্রচলন রয়েছে। এসব পশু-পাখির মধ্যে– গরু, মহিষ, ছাগল, পাঠা, ভেড়া, কবুতর, মোরগ অন্যতম। এক সময় এদেশে পূজায়

নরবলি ও গঙ্গায় সন্তান বিসর্জনের প্রথা প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে তার বিলুপ্তি ঘটেছে। মুসলমানগণও ঈদুল-আযহা-তে পশু কোরবানি করে থাকে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি হিন্দু সমাজে পূজায় পশুবলির চিত্র দেখা যায়–

দুর্গা পূজায় পশু বলিদান

'ষোড়শ উপচার সামগ্রী কত আর
কি কহ তাহার বিশেষ।
মহিষ মেষ ছাগ প্রভৃতি বলিভাগ
বসন ভূষণ সন্দেশ ॥' (পৃ- ৩৪৩)

ধর্মকর্ম ও পূজা পদ্ধতি

বাঙালি হিন্দু সমাজে ধর্মকর্ম ও পূজা পদ্ধতিতে পাঁচটি বিষয় বা পর্বকে আবশ্যিক হিসেবে মানা হয়; যথা- ক. মূর্তিপূজা ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠান খ. বেদ-পুরাণ ও স্মৃতিশাস্ত্রে বিশ্বাস গ. ব্রাহ্মণ-পুরোহিত দিয়ে পূজার্চনা ঘ. মৃত্যু পরবর্তী অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ ঙ. ঈশ্বর-পরলোক ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস। হিন্দুদের মতো মুসলিম ধর্মেও এরূপ পাঁচটি বিষয় মূলস্তম্ভ বা পর্ব হিসেবে মানা হয়; যথা- ক. কালেমা বা আল্লাহ ও নবী রাসুলে বিশ্বাস খ. নামাজ, গ. রোজা ঘ. হজ্ব ঙ. যাকাত প্রভৃতি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' দুর্গা, কালী, কুমারী, শিব পূজা ও যজ্ঞের বিচিত্র আনুষ্ঠানিকতার পরিচয় এবং ধর্মকর্মের অশেষ পুণ্য লাভের উল্লেখ পাওয়া যায়–

জোকার বা জয়ধ্বনি

বাঙালি হিন্দু সমাজে পূজা-ব্রত, যাগ-যজ্ঞ, সন্তান প্রসব, বিয়ে, বীরত্বপূর্ণ কর্মে নর-নারীর জোকার বা জয়ধ্বনি দেবার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এ জোকার বা উলুধ্বনিকেও ধর্মীয় পূজা, যাগ-যজ্ঞের আবশ্যিক অঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি হিন্দু সমাজে প্রচলিত এ জোকারের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. শিব-দুর্গার বিবাহে জোকার

'এই রূপে হরগৌরির বিবাহ হইল।
হিমালয় মেনকার আনন্দ বাড়িল ॥
কুতূহলে হুলাহুলি দেয় এয়োগণ।' (পৃ- ৪৬)

খ. দুর্গা পূজায় জোকার

'বিবিধ উপচার অশেষ উপহার
অনেকবিধ বলিদান ॥
অন্নদা জয় জয় সকল দেবে কয়
ভুবন ভরি কোলাহল।' (পৃ- ৮৬)

নিয়তিবাদ-অদৃষ্ট বা দৈব বিশ্বাস

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে নিতি বা অদৃষ্ট বা দৈবে বিশ্বাস করে আসছে। 'দৈবের লিখন, না যা খণ্ডন'- এমন প্রবাদের প্রচলন বাঙালির এ বিশ্বাস থেকেই উদ্ভব ঘটেছে। জীবনের সকল কর্ম বা ঘটনায় অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, সুখ-শান্তি, সম্মান-সৌভাগ্য, দুঃখ-দারিদ্রকে বাঙালি নিয়তি বলেই মেনে নেয়।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত মানুষের নিয়তিবাদ বা দৈব বিশ্বাসের বহু প্রমাণ পাওয়া যায়–

ক. বিবাহে অদৃষ্ট মানা

‘সতী ঝি আমার বিদ্যত আকার
বাতুলের হৈ জায়া।
,,,
আহা মরি সতী কি দেখি দুর্গতি
অন্নবিনা হৈলা কালি।
তোমার কপাল পর বাঘছাল
আমার রহিল গালি ॥’ (পৃ- ২১)

খ. পূর্ব ভাগ্য

‘নারদ কহিছে ভাগ্য হয়েছে তখনি।
জনক জননী ভাবে জন্মিলো যখনি ॥’ (পৃ- ৩২)

গ. মৃত্যু পূর্ব নির্ধারিত

‘পূর্ব্ব নিয়োজন নিকট মরণ
মদন সমুখে রয়।’ (পৃ- ৩৩)

ঘ. দুঃখ-দুর্দশা দৈব নির্ধারিত

‘শিব শিব শিব নাম সবে বলে শিবধাম
বাম দেব আমার কপালে।’ (পৃ- ৩৬)

ঙ. নিয়তি অখণ্ডনীয়-অলঙ্ঘনীয়

‘বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিণী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী॥’ (পৃ- ৫৬)

চ. বিবাহের জোড়ানিতে দৈবের হাত

‘ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে।
বৃদ্ধকালে হরিহোড় বিয়া কৈল তারে ॥’ (পৃ- ১৪৯)

ছ. সব কিছুই দৈবের অধীন

‘মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা ॥’ (পৃ- ২১৭)

জ. দুঃখকে নিয়তি বলে সান্ত্বনা

‘দুজনে ভুঞ্জিল সুখ আমার কপালে দুখ
এ বড় বিধির অবিচার।’ (পৃ- ২৪৩)

আশীর্বাদ ও অভিশাপ

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজে ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠানে ভাল ও শুভ কর্মে, পুরোহিত-ব্রাহ্মণ, মোল্লা, পীর-ফকির-সন্ন্যাসী-সাধু, পিতা-মাতা, সাধারণ মানুষ খুশি হয়ে নানা ভাবে আশীর্বাদ করার প্রথা যেমন প্রচলিত রয়েছে, তেমনি আবার এসব কর্মে অসন্তুষ্ট বা ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দেবার প্রথাও বিদ্যমান রয়েছে।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বাঙালি সমাজে প্রচলিত আশীর্বাদ ও অভিশাপের চিত্র পাওয়া যায়-

অভিশাপের স্বরূপ

বাঙালি সমাজে কোন বিষয় নিয়ে ক্রুদ্ধ বা রাগান্বিত হয়ে শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী ও চক্ষুশূল ব্যক্তির প্রতি অভিশাপ দেবার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এসব অভিশাপের মধ্যে মৃত্যু কামনা, বংশের ধ্বংস কামনা, পুত্রের মৃত্যু, স্বামীর মৃত্যু, রোগাক্রান্ত, দারিদ্রের, অজ্ঞ-মূর্খতার কামনা অন্যতম।

ক. পিতা দক্ষকে কন্যা সতীর অভিশাপ

'কর্ম্ম মত ফল যজ্ঞ যাবে তল।
তোর রক্ষা আর নাই ॥
যে মুখে পামর নিন্দিলে শঙ্কর
সে মুখ হবে ছাগল ॥' (পৃ- ২২)

খ. কাশীবাসীদের ব্যাসদেবের অভিশাপ

'তবে আমি বেদব্যাস এই দিনু শাপ।
কাশীবাসী লোকের অক্ষয় হবে পাপ ॥

,,,

ক্রমে ক্রমে তিনপুরুষের বিদ্যা না হইবে।
ক্রমে ক্রমে তিন পুরুষের ধন না রহিবে ॥
ক্রমে তিন পুরুষের মোক্ষ না হইবে।
যদি বেদ সত্য তবে অন্যথা না হইবে ॥' (পৃ- ১০৩)

গ. বসুন্ধর-বসুন্ধরাকে অন্নদার অভিশাপ

'অন্নপূর্ণা ক্রোধমনে শাপ দিল দুই জনে
যেমন করিলি দুরাচার।
মরত ভুবন যাও মনুষ্য শরীর পাও।' (পৃ- ১৩৭)

আশীর্বাদের স্বরূপ

বাঙালি সমাজে কারো প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে আশীর্বাদ বা মঙ্গল কামনা করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। নারীদের ক্ষেত্রে আশীর্বাদের ধরন হতো- 'পাকা চুলে সিঁদুর পর', 'শত সন্তানের জননী হও', 'পুত্রবতী হও', 'সাবিত্রী-সতী-সীতার মত হও' এবং পুরুষের ক্ষেত্রে হতো- 'রামের মতো ধার্মিক হও', 'লক্ষণের মতো অনুগত হও', এবং 'অর্জুনের মতো বীর হও' প্রভৃতি। এছাড়া বংশের, পরিবারের স্থায়ী সুখ-ভোগের সুস্থতা কামনা-বাসনা করা হতো।

ক. ভবানন্দকে গঙ্গা দেবীর আশীর্বাদ

'মহাসুখে দিল্লী যাবে মনোমত রাজ্য পাবে
মোর তীরে পাবে অধিকার।
সন্তান হইবে যত সবে হবে অনুগত
জনেক হইবে রাজা তার ॥' (পৃ- ৩০০)

খ. ভবানন্দকে অন্নদার আশীর্বাদ

'হইল আকাশ বাণী অন্নদা আইলা ॥
এ ঝাঁপি যত্নে রাখ কভু না খুলিবে।
তোর বংশে মোর দয়া প্রধানে থাকিবে ॥' (পৃ- ১৫৯)

অভিজ্ঞান বা স্মারক

তৎকালীন বাঙালি সমাজে স্বীকৃতির মাধ্যম হিসেবে ও পরিচয়ের প্রতীক স্বরূপ অভিজ্ঞান বা স্মারক প্রথার প্রচলন ছিল। এসব অভিজ্ঞানের মধ্যে- চিঠিপত্র, শারীরিক বৈশিষ্ট্য, অলংকার, উপহার দ্রব্য, দিন-তারিখ-মাস-বছর-তিথি লগ্ন, স্মরণীয় ঘটনা, বিশেষ শস্যের অঙ্কুর বা হ্রাস-বৃদ্ধি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রবাস জীবনে, অজ্ঞাতবাসে হারানো বস্তু ফিরে পেতে এসবের ব্যবহার প্রচলিত ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব অভিজ্ঞানের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. শারীরিক বৈশিষ্ট্য

'বন্দিবার ফলে হৈল পূর্ব্বের সকল।
নিন্দিবার চিহ্ন রৈল বদন ছাগল ॥' (পৃ- ২৬)

খ. স্মৃতি যুক্ত স্থান

'গজ পৃষ্ঠে আরোহিয়া সুড়ঙ্গ দেখিলা গিয়া
মজুন্দারে জিজ্ঞাসা করিল।' (পৃ- ১৬২)

প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি বা কিরা কাটা

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই বিভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতি, মান-অভিমান, রাগ ও দাম্ভিকতায় প্রতিজ্ঞা বা কিরা কাটার প্রচলন রয়েছে। এ প্রতিজ্ঞার ক্ষেত্রে মাথা-বুকে হাত রেখে, বিধাতা-ধর্ম-ধর্মগ্রন্থ-মসজিদ-মন্দিরকে সাক্ষী মেনে ও স্পর্শ করে, পূর্ব-পশ্চিম দিকে দাঁড়িয়ে, সন্ধ্যাকালে, পূজা-নামাজ ও আজানের সময়কে কেন্দ্র করে অথবা জনসম্মুখে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে প্রতিজ্ঞা করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব প্রতিজ্ঞা বা কিরা কাটার চিত্র পাওয়া যায়–

ক. ব্যাসদেবের প্রতিজ্ঞা

'তবে আমি বেদব্যাস এইখানে পরকাশ
করিব দ্বিতীয় বারাণাসী ॥
করিয়াছি যত তপ করিয়াছি যত জপ
সকলি করিনু এই পণ ॥' (পৃ- ১১২)

খ. বিদ্যার প্রতিজ্ঞা

'বিদ্যা নামে তার কন্যা আছিল পরম ধন্যা
রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী ॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই বিচারে জিনিবে যেই
পতি হবে সেই সে তাহার।' (পৃ- ১৬২)

গ. সুন্দরকে হীরা মালিনীর কিরা

'বিষয় আশয়ে বুঝি রাজপুত্র হবে।
আমার মাথার কিরা চাতুরী না কবে ॥
রায় বলে চাতুরী কহিলে কিবা হবে।
ব্যক্ত হবে আগে পাছে ছাপা ত না রবে ॥' (পৃ- ১৮১-১৮২)

ঘ. হীরাকে বিদ্যার দিব্য বা প্রতিশ্রুতি

'বিদ্যা বলে ওলো হীরা মোর দিব্য তোরে।
কোন মতে দেখাইতে পার নাকি মোরে ॥' (পৃ- ১৯৩)

ঙ. সন্ন্যাসী রূপী সুন্দরের প্রতিজ্ঞা

'বিচারে তাহার ঠাঁই আমি যদি হারি।
ছাড়িয়া সন্ন্যাসধর্ম দাস হব তারি ॥
গুরু কাছে মথা মুড়ায়েছি একবার।
তারে গুরু মানিয়া মুড়াব জটাভার ॥
সে যদি বিচারে হারে তবে রবে নাম।
সন্ন্যাসী আপনি তাহে নাহি কিছু কাম ॥
তবে যদি সঙ্গে দেহ প্রতিজ্ঞার দায়।
নিযুক্ত করিয়া দিব শিবের সেবায় ॥
ধরাইব জটা ভস্ম পরাইব ছাল।
গলায় রুদ্রাক্ষ হাতে স্ফটিকের মাল ॥' (পৃ- ১২৩)

ঘর-বাড়ি

সামন্তবাদী শাসনে প্রজাদের ঘর নির্মাণ ও গাছ কাটতে গেলেও জমিদারদের পূর্ব অনুমতি নিতে হতো। এর উল্লেখ দেখা যায়- 'পদ্মা নদীর মাঝি' (১৯৩৬) উপন্যাসে ও 'অভাগীর স্বর্গ' নামক ছোট গল্পে। বাঙালি সমাজে অঞ্চলভেদে বিচিত্র ধরনের ঘরবাড়ি দেখা যায়। ধনী-বিত্তবান, জমিদার শ্রেণির লোকেরাই মাত্র শহরে বা গ্রামে পাকা ইটের দালান, প্রাসাদ, মঠ-মন্দির, মসজিদ নির্মাণ করতো। এসব দালান বা প্রাসাদ বহুতল বিশিষ্ট হতো এবং বিভিন্ন মহলে (পাঁচ মহলা, সাত মহলা) বিভক্ত থাকতো। আবার অনেকে চারচালা, আটচালা ঘরও নির্মাণ করতো। আনন্দ বিনোদনের জন্য জলসাঘর, জলটুঙ্গী, বাগান বাড়ি, হাওয়াখানা, বালাখানা ও প্রমোদ তরী নির্মাণ করতো। দুর্গ বা গড় ছাড়াও বৈঠকখানা নির্মিত হতো। অন্যদিকে গ্রামের মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষেরা একচালা, দোচালা, চারচালা ঘর টিন, বাঁশ-বেত, ছন দিয়ে নির্মাণ করতো। গরীব মানুষেরা ছাপরা, কুঁড়ে ঘর, ডেরা, মাটির ঘর ও পর্ণ কুটীরে বসবাস করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি অঞ্চলে প্রচলিত এসব ঘর-বাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. কুঁড়ে ঘর বা পর্ণ কুটীর

'ভাঙ্গা কুঁড়ে ছাওয়া পাতে   বৃদ্ধ পিতা মাতা তাতে
ঠাঁই নাহি হয় চারিজনে ॥'   (পৃ- ১৪৩)

খ. কোঠা বাড়ি

'বস্ত্র অলংকারে বিষ্ণুহোড় দিব্যকায়।
কুটীর হইল কোঠা দেবীর কৃপায় ॥' (পৃ- ১৪৭)

গ. গড় ও বালাখানা

'ষষ্ঠ গড়ে দেখে যত বোঁদেলার থানা।
আঁটাআঁটি সেই গড়ে থাকে মালখানা।
,,,
সমুখে দেখেন চক চান্দনী সুন্দর
নৌবত বাজিছে বালাখানার উপর ॥' (পৃ- ১৬৮-১৬৯)

ঘ. রাজমহল বা প্রাসাদ ও কারখানা

'চলে রায় পাছ করি কোটালের থানা।
দেখে জাতি ছত্রিশ ছত্রিশ কারখানা ॥
চৌদিকে সহর মাঝে মহল রাজার।' (পৃ- ১৭০)

ঙ. বাবুর্চিখানা বা পাকশালা

'মামুর হইল মোর বাবরুচিখানা।
ঘর হৈতে নিকলিতে পারে জানানা ॥' (পৃ- ৩১৫)

চ. দেউড়ি ও খিড়কি

'দেহুড়ির কাছে থাক হয়ে দানী গো।
ঘরে আনো ঘরে করে টানাটানি গো ॥' (পৃ- ৩৩০)

তৈজসপত্র

বাঙালি নর-নারী তাদের প্রাত্যহিক সংসার জীবনে বিচিত্র ধরনের তৈজসপত্র ব্যবহার করে থাকে। ধনী-গরীব সকলেই তামা-কাসা-বাঁশ-বেত-কাঠ ও মাটির তৈরি জিনিসপত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। এসব তৈজসপত্রের মধ্যে ছিল- হাঁড়ি-পাতিল (ভাগু, ঘট), কড়াই, ছেনি, থালা, বাসন, বাটি, গেলাস, খোরা, সাজি, ঝুড়ি বা ঝুপড়ি, থলে, ছিকা, সরা, কলস, ঢাকনা, হাতা, পাটি বা মদুর (খেজুর, শীতল পাটি), রশি, মশারি, খাট, চৌকি, জলচৌকি, পিঁড়ি, হাতপাখা, পানের ডাবর, সড়তা, লোটা, বদনা, ঢেকি, কুলা, ধামা, কাঠা, ডালা, ডোল, বাখারি, দোলনা, হামান দিস্তা, পাটা, সিন্ধুক, কুপি, বালতি, লাঙল, জোয়াল, মই ও টোনা অন্যতম।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে আটপৌরে সংসার জীবনে নিত্য ব্যবহৃত এসব তৈজসপত্রের পরিচয় পাওয়া যায়–

ক. ঝুড়ি

'কোথা হইতে আসি বুড়ি ঘুঁটে লয়ে ভরে ঝুড়ি
সর্ব্বনাশ করিল আমার।' (পৃ- ১৪২)

খ. হাঁড়ি

'অন্নপূর্ণা নাম লয়ে হাঁড়ী পাড় গিয়া ॥
হাঁড়ীভড়া অন্ন আর ব্যঞ্জন পাইবে।' (পৃ- ১৪৪)

গ. পান পাত্র ও হাতা

'মণিময় রক্তপদ্মে পদ্মাসনা হয়ে।
দুই হাতে পান পাত্র রত্নহাতা লয়ে ॥' (পৃ- ১৪৬)

ঘ. ঝাঁপি

'সে টাকা ঝাঁপিতে ভরি রাঙ্গ তামা বারি করি
হাটে যায় বেসাতির তরে।' (পৃ- ১৭৮)

ঙ. থালা ও বাটি

'গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তূরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটি পুরি ॥
,,,
রাখে সখী পূরি কনকের থালা।' (পৃ- ২০৯)

চ. হাতপাখা বা চামর

‘শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।
পাখা মৌরছল শ্বেত চামর ললিত ॥’ (পৃ- ২০৯)

ছ. খাট বা পালঙ্ক

‘পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥’ (পৃ- ২০৯)

জ. বালিশ

‘সম অবলম্বন বালিশ আলিশ
মুদ্রিত নয়ন ছলায়ে।’ (পৃ- ২১৩)

ঝ. ঝারি বা পিকদানি

‘ছোট মার ঘরে আসি পান খেতে হয়।
এত বলি ঝারি বাটা অমৃতীটি লয় ॥’ (পৃ- ৩৩২)

যানবাহন

তৎকালীন বাঙালি সমাজে জনসাধারণ স্থল ও জলপথেই যাতায়াত করতো। জলপথের বাহন রূপে ব্যবহৃত হতো- জাহাজ, নৌকা, ডিঙি ও ভেলা। অন্যদিকে স্থলপথের বাহন ছিল- পালকি, দোলা, রথ, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, মহিষের গাড়ি, হাতি, ঘোড়া, গরু, গাধা, খচ্চর, উট, বলদ ও মহিষ প্রভৃতি। এছাড়া অল্প দূরত্বের পথ মানুষ পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করতে অভ্যস্ত ছিল।

‘অন্নদামঙ্গল কাব্যে’ বৃহৎ বাংলা অঞ্চলে প্রচলিত এসব যানবাহনের উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. রথ

‘রথ আনি দিতে শিব কহিলা নন্দীরে।
রথে চড়ি গেলা সতী দক্ষের মন্দিরে ॥’ (পৃ- ১৯)

খ. ঘোড়া বা অশ্ব

‘দড়বড়ি চড়ি ঘোড়া অমনি চাবুক ॥

,,,

কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান ছ মাসের পথ।
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ ॥’ (পৃ- ১৬৫)

গ. উট-গাধা-খচ্চর

‘উট-গাধা-খচ্চর গণিতে কেবা পারে।
পালিয়াছে পশুপক্ষী যে আছে সংসারে ॥’ (পৃ- ১৭০)

ঘ. হাতী ও গাড়ি (শকট)

‘সাজ সাজ বলি ডঙ্কা হইল লস্করে ॥
ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়ীতে কামান চলে বন চন্দ্রবান ॥’ (পৃ- ২৯৪)

ঙ. পালকী ও দোলা

‘গজে মানসিংহ পালকীতে মজুন্দার।
ইন্দ্র সঙ্গে যেমন কুবের অবতার ॥’ (পৃ- ৩০০)

চ. নৌকা

'গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥
নৌকা চড়ি বাঁচিলেন মানসিংহ রায়।
মজুন্দার শুনিয়া আইলা চড়ি নায় ॥' (পৃ- ২৯২-২৯৩)

ছ. ডিঙি বা কোশা

'ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।
কোশা চড়ি বেড়াবে উজান আর ভাটি ॥' (পৃ- ২৮৮)

খেলাধুলা

বাঙালি সমাজে বহুকাল থেকেই বিচিত্র ধরনের খেলাধুলা প্রচলিত রয়েছে। নর-নারী উভয়েই অবসর-বিনোদন, শারীরিক ও মানসিক স্ফূর্তির জন্য– পাশা, দাবা, চৌগান বা পলো, কুস্তী, মল্ল, কাবাডি বা হাডুডু, দারিয়াবান্ধা, পুতুল খেলা, কানামাছি, বুড়িছোঁয়া, গোল্লাছুট, নৌকা বাইচ, সর্দারবারি, হাতির লড়াই, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগের লড়াই, বুলবুলির লড়াই, গরু দৌড়, ঘোড়দৌড়, সাপের খেলা, বানরের খেলা, বিশ-পঁচিশ, বাঘবন্দি, পায়রা উড়ানো, ঘুড়ি উড়ানো, লাটিম খেলা, ডাঙ-গুটি, তাস ও জুয়া খেলায় অভ্যস্ত ছিল।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে প্রচলিত এসব খেলার পরিচয় মেলে–

পুতুল খেলা

'দেখেন বাহিরে গৌরী খেলিছেন রঙ্গে।
চৌষট্টি যোগিনী কুমারীর বেশ সঙ্গে ॥
মৃত্তিকার হরগৌরী পুত্তলি গড়িয়া।
সহচরীগণ মেলি দিতেছেন বিয়া ॥' (পৃ- ৩১)

নাচ-গান ও বাজনা

বাঙালি হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই গান-বাজনার কদর ছিল। ধর্মীয়-সামাজিক অনুষ্ঠান, উৎসব পার্বণে নাচ-গানের ব্যবস্থা থাকতো। বাঙালির লোকপ্রিয় গানের মধ্যে ছিল– মারফতি, মুর্শিদি, ভাটিয়ালী, বাউল, মরমী, পল্লীগীতি, ঝুমুর নাচ, ঘেটু যাত্রা, যাত্রাভিনয়, বিচার গান, কীর্তন, কথকতা, গজল, হামদ-নাত, খেয়াল, কাওয়ালী ও বিভিন্ন রাগ-তাল অন্যতম। নৃত্য গীতে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে– একতারা, দোতারা, সেতার, বীণা, বেণু, ডমরু, শঙ্খ, সানাই, শিঙ্গা, পিনাক, পাখোরাজ, দোহরা, ভেরী, মৃদঙ্গ, করতাল, তবলা, মুরলী, রবাব, বেহালা, তাম্বুরা, ঢাক, ঢোল, ঘুঙুর অন্যতম। পেশাদার শিল্পী, বাইজি-বেশ্যা ও নর্তক-নর্তকীগণ অনুষ্ঠান উৎসবে নাচ-গান পরিবেশন করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে বহুল প্রচলিত এসব নাচ-গান ও বাজনার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়–

ক. বীনা বাজিয়ে নাচ-গান

'এ রূপে নারদ মুনি বীণা বাজাইয়া।
উত্তরিলা হিমালয়ে নাচিয়া গাইয়া ॥

,,,

দুটা লাউ বান্ধা কান্ধে কাঠ একখান।
বাজাইয়া নাচিয়া নাচিয়া করে গান ॥' (পৃ- ৩১-৩২)

খ. বর যাত্রায় আতস-বাজি নাচ-গান

দ্বিজগণ লয়ে বরযাত্রা হয়ে
চলিলা যত অমর।
অপ্সর নাচিছে কিন্নর গাইছে
পুলকিত মহেশ্বর ॥

,,,

বায়ু করি বল আপনি অনল
হইলা আতস বাজি ॥' (পৃ- ৩৮)

গ. পূজায় নাচ-গান ও বাজনা

'বাজয়ে বাদ্য কত নাচয়ে নট যত
গায়ক নটী রামজনী
যতেক রামাগণ পরম হৃষ্ট মন
করয়ে হুলুহুলু ধ্বনি ॥' (পৃ- ৩৪৩)

ঘ. বিবাহের বাদ্য

'সানাই কর্ণাল বাজে রগে আলাপিয়া।
ভাট পড়ে রায়বার যশ বর্ণাইয়া ॥' (পৃ- ২৯৪)

ঙ. রণ বাদ্য

'ধূধূ ধূধূধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্ দমামা দমদম
ঝনন্ন ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে ॥
কত নিশান ফরফর নিনান ধর ধর
কামান গর গর গাজে ॥' (পৃ- ২৯৫)

হাতিয়ার (অস্ত্র বা আয়ুধ)

মধ্যযুগে বাংলায় সর্বদা যুদ্ধ-দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকতো। যুদ্ধে জয়ী ও জীবন সুরক্ষার তাগিদেই তৎকালে বাঙালি সমাজে বহু ধরনের হাতিয়ার ব্যবহার করা হতো। এসব অস্ত্রের মধ্যে– তীর, ধনুক, বর্শা, বল্লম, কামান, রামদা, বন্দুক, তরবারি, কিরিচ, ছোরা, চাকু, পাশ, চক্র, টঙ্কার, খঞ্জর, বাণ, কুঠার, গদা অন্যতম। যুদ্ধের পোশাক হিসেবে– লোহার জিরাই, কাবাই, পাগড়ি, শিরস্ত্রাণ, কোমরবন্দ, ইজার, টুপি, মোজা, ঢাল ও বর্ম ব্যবহৃত হতো। যুদ্ধ বাদ্য হিসেবে– ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকাড়া, দামামা, ভেউর ও বিউগল ব্যবহৃত হতো। যুদ্ধের বাহন হিসেবে– হাতি, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, রথ, গরু ও মহিষের ব্যবহার হতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি সমাজে সাংসারিক ও যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত এসব হাতিয়ারের উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. গদা ও চক্র

'গদা চক্র তেয়াগিয়া পাঞ্চজন্য বাজাইয়া
অন্নদা উদ্দেশে পদ্ম দিয়া।' (পৃ- ৮২)

খ. খড়গ-তীর-খঞ্জর

'খড়গ চর্ম্ম লেজা তীর কামনে খঞ্জর।

পড়া শুক লৈলা হাতে সহিত পঞ্জর ॥' (পৃ- ১৬৪)

গ. যুদ্ধাস্ত্র

'ঘোড়া উট হাতী পিঠে নাগারা নিশান।
গাড়ীতে কামান চলে বাণ চন্দ্রবাণ ॥

,,,

তবকী ধানুকী ঢালী রায়বেঁশে মাল।
দফাদার জমাদার চলে সদীয়াল ॥

,,,

শিষ্টাচার মত আগে দিলা সমাচার।
পাঠাইয়া ফরমানে বেড়ী তলবার ॥ (পৃ- ২৯৪)

ফুল-ফল ও গাছপালা

বৃহৎ বাংলা ভূখণ্ডে বিচিত্র ধরনের ফুল-ফল ও গাছপালার উৎপাদন হয়ে থাকে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় এসবের উপযোগিতা বা গুরুত্ব অসামান্য।

ফুল- চাপা, মালতী, যুথী, কেয়া, কেতকী, টগর, বকুল, গোলাপ, মল্লিকা, জবা, জুই, পদ্ম, কবরী, গন্ধরাজ, রজনী-গন্ধা, হাসনা হেনা, গাদা, বেলী, পলাশ, কদম, শেফালি, শিউলি, সূর্যমুখী কৃষ্ণচূরা প্রভৃতি।

ফল– আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, জলপাই, নারিকেল, বেল, আমড়া, আমলকী, কমলা, ডালিম, জাম্বুরা, পেয়ারা, কামরাঙ্গা, তেঁতুল, করঞ্জা, কুলবরই, চালতা, তাল, খেজুর, কলা, আখ, আনারস, নাসপাতি, আতা, লেবু, বেদানা প্রভৃতি।

গাছপালা– তাল, নারকেল, সুপারি, খেজুর, আম, জাম, কাঁঠাল, শ্যাওড়া, গাব, কড়ই, কদম, অশ্বত্থ, বেল, তেঁতুল, মহুয়া, তমাল, হিজল, শিমুল, জারুল, জামরুল, দেবদারু প্রভৃতি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলা অঞ্চলে উৎপাদিত এসব ফুল-ফল ও গাছপালার উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. ফুল

'অশোক কিংশুক চাঁপা পুন্নাগ কেশর।
করবীর গন্ধরাজ বকুল টগর ॥
শেহলী পিয়লী দোনা পারুল রঙ্গন।
মালতী মাধবীলতা মল্লিকা কাঞ্চন ॥
জবা যুতী জাতী চন্দ্রমল্লিকা মোহন।
চন্দ্রমণি সূর্য্যমণি অতি সুশোভন ॥
কনকচম্পক ভূমিচম্পক কেতকী।
চন্দ্রমুখী সূর্য্যমুখী অতসী ধাতকী ॥
কদম্ব বাকস বক কৃষ্ণকেলি কুন্দ।
পারিজাত মধুমল্লী ঝিঁটী মুচকুন্দ ॥' (পৃ- ৭৪-৭৫)

খ. ফল

'আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল।
খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল ॥
হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।

,,,

চালিতা তেঁতুল কুল আমড়া মন্দার ॥' (পৃ ৭৫-৩৪২)

গ. গাছপালা

'আম জাম নারিকেল জামীর কাঁটাল।
খাজুর গুবাক শাল পিয়াল তমাল ॥
হিজোল তেঁতুল তাল বিল্ব আমলকী।
পাকুড় অশ্বত্থ বট বাবলা হরিতকী ॥' (পৃ- ৭৫)

পশু-পাখি ও জীবজন্তু

বৃহৎ বাংলা অঞ্চলের বন-জঙ্গলে, ঝোপ-ঝাড়ে, স্থলে-জলে ও বাড়ির আঙিনায় বিচিত্র ধরনের পশু-পাখি ও জীবজন্তুর সরব আনাগোনা পরিলক্ষিত হয়।

গৃহপালিত ও বন্য পশু– গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগি, কুকুর, বিড়াল, হাতি, ঘোড়া, গাধা, খচ্চর, ভালুক, শিয়াল, গণ্ডার, সিংহ, হরিণ, বেজি, ইঁদুর, খরগোস, শূকর, খাটাশ, সজারু, বাঘ, হায়েনা, বানর ও উট প্রভৃতি।

পাখি– কোয়েল, দোয়েল, তিতির, কোকিল, কাক, ময়ূর, শকুন, চিল, ঈগল, পেঁচা, ফিঙ্গে, ফেঁচা, ঘুঘু, টিয়া, ময়না, কবুতর, শালিক, শামকল, বক, মাছরাঙা, পানকৌড়ি, বাবুই, কানকুয়া, ডাহুক, বাদুড়, টুনটুনি প্রভৃতি।

জলজ জন্তু– শুশুক, কুমীর, হাঙ্গর, ঘড়িয়াল, ভোদর, উদ, কাঁকড়া, শঙ্খ, শামুক, ঝিনুক, জোক, কাছিম, কচ্ছপ প্রভৃতি।

কীটপতঙ্গ– ভ্রমর, ফড়িং, প্রজাপতি, তেলাপোকা, বিচ্ছু, পিঁপড়া, মৌমাছি, মশা, মাছি, ডাঁশ, ছারপোকা, টিকটিকি, ঝিঁঝিপোকা প্রভৃতি।

সাপ– ধোড়া, তক্ষক, গোখরা, দারাস, কালনাগ, সুতানলি, অষ্টনাগ, দুমুখো সাপ, উদয়কাল, উদয়গিরি, অশ্বমুখ, অজগর, সিংহমুখ প্রভৃতি।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলা অঞ্চলে এসব পশুপাখি ও জীবজন্তুর সরব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়–

ক. বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু

'সরভ কেশরী বাঘ বারণ গণ্ডার।
ঘোড়া উট মহিষ হরিণ কালসার ॥
বানর ভালুক গরু ছাগল শশারু।
বরাহ কুক্কুর ভেড়া খাটাস সজারু ॥
ঢোলকান খেঁকি খেঁকশিয়ালি ঘোড়ারু।
বারশিঙ্গা বাওটাদি কস্তুরী তুলারু ॥
গাধা গোধা হাপা হাউ চমরী শৃগাল।
হোড়ার নকুল গৌলা গবয় বিড়াল ॥ (পৃ- ৭৫-৭৬)

খ. সাপ

'কেউটে খরিশ কালী গোখুরা ময়াল।
বোড়া চিতি শঙ্খচূড় সূঁচে ব্রহ্মজাল ৷৷
শাঁখিনী চামার কোষা সূতার সঞ্চার।
খড়ীচোঁচ অজগর বিষের ভাণ্ডার ৷৷
তক্ষক উদয়কাল ডাঁড়াশ কানাড়া।
লাউডগা কাউশর কুয়ে বেতাছাড়া ৷৷
ঢেমনা মোটিলী পুঁয়ে হেলে চিতী ঢোঁড়া।
ছাতারে শীয়চাঁদা নানাজাতি বোড়া ৷৷' (পৃ- ৭৬)

গ. জলজ জন্তু

'পানিতর বেনে বউ গড়ে মৎস্য রঙ্ক ৷৷
হাঙ্গর কুমীর গড়ে শুশুক মকর।' (পৃ- ৭৪)

,,,

'ঝঞ্ঝনার ঝঞ্ঝানি বিদ্যুৎ চকমকি।
হড়মড়ি মেঘের ভেকের মকমকি ৷৷' (পৃ- ২৯২)

ঘ. কীটপতঙ্গ

ভীমরুল ডাঁশ মশা বোরলা প্রভৃতি

,,,

'বিছা বিছু পিপিড়া প্রভৃতি বিষধর।

,,,

কাকলাস ধেড়ে মূষা ছুঁচা অজানাই।' (পৃ- ৭৫-৭৬)

ঙ. পাখি

'ময়না শালিক টিয়া তোতা কাকাতুয়া।
চাতক চোকর নুরী তুরী রাঙ্গ চুয়া ৷৷
ময়ূর-ময়ূরী সারী শুক আদি খগ।
কোকিল কোকিলা আদি রসাল বিহগ ৷৷
সীকরা বহরী বাসা বাজ তুরমুতী।
কাহাকুহী লগড় ঝগড় জোড়াধুতী ৷৷
শকুনী গৃধিনী হাড়গিলা মেটে চিল।
শঙ্খনীল নীলকণ্ঠ শ্বেত রক্ত নীল ৷৷

,,,

নানা জাতী কাক পেঁচা বাবুই বাদুড় ৷৷
বাকচা হারীত পারাবত পাকরাল।
ছাতারিয়া করকটে ফিঙ্গা দহিয়াল ৷৷
চড়ুই মণিয়া পাবদুয়া টুনটুনি।

বুলবুল জল আদি পক্ষী নানা গুণি ॥
ডাহুকা ডাহুকী গড়ে খঞ্জনী খঞ্জন।
সারসা সারসী গড়ে বক-বকীগণ ॥
তিত্তিরী তিত্তিরা পানিকাক পানিকাকী।
কুরলী করল চক্রবাক চক্রবাকী ॥
কাদাখোঁচা দলপিশী কামি কোড়া কঙ্ক।
পানিতর বেনেবউ গড়ে মৎস্য রঙ্ক ॥' (পৃ- ৭৪-৭৫)

নদ-নদী

সমগ্র বাংলার বুক জুড়ে জালের মতো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে অসংখ্য নদ-নদী। এসব নদ-নদীর মধ্যে– গঙ্গা, ভাগীরথী, সরস্বতী, অজয়, দামোদর, কালিন্দী, নর্মদা, গোদাবরী, বিপাশা, ইরাবতী, রেবা, মন্দাকিনী, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র, ভৈরব, গোমতী, তিস্তা, কপোতাক্ষ, আত্রাই, মহানন্দা, সুরমা, ইছামতি, শীতলক্ষা, ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা, কালীগঙ্গা, গড়াই, কর্ণফুলী, রূপসা, চিত্রা, কুমার ও বংশী অন্যতম।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বৃহৎ বাংলার বুকজুড়ে প্রবাহিত এসব নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. গঙ্গা

'লুঠি বাঙ্গালার লোকে করিল কাঙ্গাল।
গঙ্গা পার হৈল বান্ধি নৌকার জাঙ্গাল ॥' (পৃ- ১১)

খ. দামোদর

'সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্দ্ধমান।
পার হৈলা দামোদর করি স্নান দান ॥' (পৃ- ৩০০)

গ. যমুনা

'পাতশার আজ্ঞামত মানসিংহ রায়।
প্রতাপআদিত্যে ভাসাইলা যমুনায় ॥' (পৃ- ৩০৩)

ঘ. গাঙ্গিনী

'অন্নপূর্ণা উত্তারিলা গাঙ্গিনীর তীরে।
পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে ॥
সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।' (পৃ- ১৫৬-১৫৭)

প্রকৃতির প্রভাব

বাঙালির জীবন-জিজ্ঞাসা, জীবিকা ও মননের ওপর প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত গভীর। বাংলার ষড়ঋতুর বৈচিত্র্য, নদ-নদীর আশীর্বাদ ও আগ্রাসন, খরা-দুর্ভিক্ষ, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বর্ষা বাণ ও বন্যার খেয়ালী মূর্তি বাঙালি নর-নারীর অন্তর্ভুবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। সুখে-দুঃখে, বিরহ-বেদনায়, আনন্দ-উল্লাসে প্রকৃতির সান্নিধ্য-সংস্পর্শ প্রগাঢ় ও ব্যঞ্জনা লাভ করে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাংলা প্রকৃতির ষড়ঋতুর রূপ, ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যার চিত্র পরিলক্ষিত হয়–

ক. ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যা

'দশ দিক আন্ধার করিল মেঘগণ।
চূর্ণ হয়ে বহে উনপঞ্চাশ পবন ॥

,,,

চারিদিকে তরঙ্গ জলের তরতরি ॥
থরথরি স্থাবর বজ্রের কড়মড়ি।
ঘুট ঘুট আন্ধার শিলার তড়তড়ি ॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট ডুবিল তাম্বুতে এল বাণ ॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী উট তার সাথী ॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তলবার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥
খাবি খেয়ে মরে লোক হাজার হাজার।
তল গেল মালমাত্তা উরুদু বাজার ॥
বকরী বকরা মরে কুকড়ী কুকড়া।
কুজড়ানী কোলে করি ভাসিল কুজড়া ॥
ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে।
ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে ॥

,,,

ডুবে মরে মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বুকে করি।
কালোয়াত ভাসিল বীণার লাউ ধরি ॥

,,,

গাড়ী করি এনেছিল নৌকা বহুতর।
প্রধান সকলে বাঁচে তাহে করি ভর ॥' (পৃ- ১৯২)

খ. মানব মনে ষড়ঋতুর প্রভাব

'বৈশাখে এ দেশে বড় সুখের সময়।
নানা ফুল গন্ধে মন্দ গন্ধবহ বয় ॥
বসাইয়া রাখিব হৃদয় সরোবরে।

,,,

জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা আম্রএ দেশে বিস্তর।

,,,

মল্লিকা ফুলের পাখা অগুরু মাখিয়া।
নিদাঘে বাতাস দিব কামে জাগাইয়া ॥
আষাঢ়ে নবীন মেঘে গভীর গর্জ্জন।
বিয়োগীর যম সংযোগীর প্রাণধণ ॥

,,,

শ্রাবণে রজনী দিনে এক উপক্রম।
কমল কুমুদ গন্ধে কেবল নিয়ম ॥

,,,

দেখিবে শিখীর নাদ ভেক মকমকি ॥
ভাদ্র মাসে দেখিবে জলের পরিপাটী।

,,,

ঝরঝরি জলের বায়ুর খরখরি।
শুনিব দুজনে শুয়ে গলাগলি করি ॥

আশ্বিনে এ দেশে দুর্গা প্রতিমা প্রচার।

,,,

নদে শান্তিপুর হৈতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥
কার্ত্তিকে এ দেশে হয় কালীর প্রতিমা।

,,,

ক্রমে ক্রমে হইবেক হিমের প্রকাশ।
সে দেশে কি রস আছে এ দেশেতে রাস ॥
অতি বড় উগ্র অগ্রহায়ণের নীহার।
শীতের বিহিত হিত করিবে বিহার ॥

,,,

পৌষ মাসে তিন লোক ভোগে থাকে দড়।
দিন মান অতি অল্প রাত্রিমন বড় ॥

,,,

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।
ঘরের বাহির নহে যেই যুবজানি ॥
শিশিরে কমল বনে বধয়ে পরাণে।

,,,

বার মাস মধ্যে মাস বিষম ফাগুন।
মলয় পবনে জ্বালে মদন আগুন ॥

,,,

মধুর সময় বড় চৈত্র মধু মাস।
জানাইব নানা মত মদন বিলাস ॥' (পৃ- ২৮৭-২৮৯)

ঠাট্টা-রসিকতা

বাঙালি সকল নর-নারী প্রাত্যহিক চলার পথে বাকচতুর ও হাসি ঠাট্টায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। জীবন অভিজ্ঞতা, অধীত জ্ঞান, আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্পর্শে নব দম্পতি, বেহাই-বেহান, দাদা-নাতি, নানী-নাতিন, বন্ধু-বান্ধব, দেবর-ভাবী, দুলাভাই-শ্যালক-শ্যালিকা, রাখাল-চাকরদের মধ্যে কথায় ও কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে এসব ঠাট্টা রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।
'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' নারদ-উমা, বিদ্যা-সুন্দর, বিদ্যা-হীরা, সুন্দর-হীরা, ভবানন্দ-চন্দ্রমুখী-পদ্মমুখীর মধ্যে এরূপ হাসি-ঠাট্টার পরিচয় পাওয়া যায়–

হীরা ও বিদ্যার রসিকতা

হীরা– কি শুনিনু কহ গো নাতিনী ঠাকুরানী।
সত্য-মিথ্যা ধর্ম্ম জানে লোকে কানাকানী ॥
বর না কি আসিয়াছে একটা সন্ন্যাসী।

,,,

ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড় কাকে খায় ॥
কেমন সুন্দর বর আমি দিনু আনি।
না কহিয়া বাপ মায়ে হারাইলা জানি ॥

,,,

থাকহ সন্ন্যাসী লয়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে।
সে যাউক সন্ন্যাসী হয়ে হাতে খোলা লয়ে ॥

বিদ্যা– বিদ্যা বলে বটে বটে আই বলিলা বিস্তর।
এনেছিলা বটে বর পরম সুন্দর ॥
নিত্য বলি বটে আনি দেহ তারে।
দেখিয়া পড়েছ ভুলে নার ছাড়িবারে ॥

,,,

অদ্যাপি নাতিনী বলি কর পরিহাস।
মরলো নির্লজ্জ আই তুই ত মাসাস ॥
আধবুড়া হৈলি তবু ঠাট ঘাটে নাই।
পেয়েছ অভাবে ভাল নাতিনী জামাই ॥' (পৃ ২২৬-২২৭)

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

বাঙালি সমাজে নর-নারীর কথা বলার মাঝে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রচলন ছিল। সাধারণত প্রতিপক্ষকে আঘাত, অপরাধীকে ভর্ৎসনা, নবদম্পতি, রাখাল-চাকর, গুরু-শিষ্য, অভিভাবক-সন্তানাদি এবং ঠাট্টার সম্পর্কীয় আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রচলন ছিল। এ ব্যঙ্গের বাণ শুধু প্রতিপক্ষকে আঘাত বা ঘায়েল করতো না বরং অনেক সময় তার মানসিকতাকে শুধরে সুমতি প্রদানে সহায়তা করতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' জামাতা শিবকে দক্ষরাজ, ভিক্ষুক বেশী শিবকে ছেলের দল, হীরাকে বিদ্যা, সুন্দরকে বিদ্যা, বিদ্যাকে রাণী, গঙ্গাকে ব্যাসদেব, অন্নদাকে নলকুবের ও পদ্মমুখীকে চন্দ্রমুখী কটাক্ষ-ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে দেখা যায়–

ক. শিবকে দক্ষরাজের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

'সভাজন শুন জামাতার গুণ
বয়সে বাপের বড়।
কোন গুণ নাই যেথা সেথা ঠাঁই
সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥

,,,

যবনে ব্রাহ্মণে কুক্কুরে আপনে
শ্মশানে স্বরগে সম।
গরল খাইল তবু না মরিল
ভাঙ্গড়ের নাহি যম ॥

,,,

কি জাতি কে জানে কারে নাহি মানে
সদা কদাচারময়।' (পৃ ১৯-২০)

খ. ভবানন্দ ও পদ্মমুখীকে চন্দ্রমুখীর ব্যঙ্গ

'তোমার যৌবন আছে তুমি আছ সুয়া।
হারায়ে যৌবন আমি হইয়াছি দুয়া ॥
সুয়া যদি নিম দেয় সেহ হয় চিনি।
দুয়া যদি চিনি দেয় নিম হন তিনি ॥' (পৃ- ৩৩৫)

ধর্মগ্রন্থ

ধর্মই বাঙালির প্রাণ। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমান সমাজ পরিচালিত হয় ধর্মীয় গ্রন্থানুসারে। হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থগুলো হলো- বেদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, উপনিষদ, সংহিতা, স্মৃতি ও ন্যায়শাস্ত্র অন্যতম। মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থের মধ্যে– কোরআন ও হাদিস উল্লেখযোগ্য।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালি হিন্দু-মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়–

ক. আগম-নিগম ও সংহিতা

'পাঁজি পুঁথি বোঝা বোঝা লয়ে।
নিগম আগম মত পুরাণ সংহিতা যত
তর্কাতর্কি নানামত কয়ে ॥' (পৃ- ৯০)

খ. বেদ-রামায়ণ-পুরাণ

'বেদে রামায়ণে আর সংহিতা পুরাণে।
আদি অন্তে মধ্যে হরি সকলে বাখানে ॥' (পৃ- ৯২)

গ. স্মৃতিশাস্ত্র ও বেদান্ত

'পুরাণ সংহিতা স্মৃতি মনু বিজ্ঞ নন ॥

বিদ্যা বলে সেই সত্য যে কহে বেদান্ত ॥' (পৃ ২০৭-২০৮)

ঘ. কুরআন

'সেই ঈশ্বরের বাক্য কোরান যে কয়।
সেহ সয়তান বাজী কহিতে কি ভয় ॥' (পৃ- ৩০৭)

সম্ভোগ চিত্র

বাঙালি হিন্দু-মুসলমান নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের সম্ভোগ বা রতি প্রক্রিয়াটিও শাস্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। দিন-ক্ষণ-তিথি-নক্ষত্র, ঋতুবতী অবস্থা, শারীরিক সংকট ও অন্যান্য বিষয় মেনে চলতো। রতিলীলার ক্ষেত্রে রুচিবান নর-নারীগণ প্রস্তুতি ও পরিবেশের ওপর বিশেষ জোর দিতো। উত্তম খাবার, উপযোগী পোশাক, শারীরিক পরিচ্ছন্নতা, সুগন্ধি ব্যবহার, মুখশুদ্ধি, শয্যাকক্ষের পরিপাটি ও সাজসজ্জা এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব পেতো।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' শিব-অন্নদা, বসুন্ধর-বসুন্ধরা, নলকুবের ও চন্দ্রিনী-পদ্মিনী, বিদ্যা-সুন্দর এবং ভবানন্দ মজুমদার-চন্দ্রাবতী ও পদ্মাবতীর মদ্যে রতিলীলা বা স্বামী সংসর্গের চিত্র পাওয়া যায়। এদের মধ্যে বিদ্যা-সুন্দরের রতিলীলাটি পরিবেশ ও প্রস্তুতি মেনেই সম্পন্ন হয়েছে–

বিদ্যা-সুন্দরের রতিলীলা

বিদ্যা ও সুন্দর গান্ধর্ব বিবাহের মাধ্যমে দাম্পত্য জীবন শুরু করে এবং গোপনেই তাদের এ বহু আসন পদ্ধতির রতিলীলা সম্পন্ন হতো। তারপরও উভয়ের প্রস্তুতি ও পরিবেশ তথা সাজ-সজ্জায় সুরুচির বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

'পালঙ্কে বসিলা সুখে যুবক-যুবতী।
শোভা দেখি পায় পড়ে রতি রতিপতি ॥
গোলাব আতর চুয়া কেশর কস্তুরী।
চন্দনাদি গন্ধ সখী রাখে বাটিপূরি ॥
মল্লিকা মালতী চাঁপা আদি পুষ্পমালা।

,,,
ক্ষীর চিনি মিছিরি সন্দেশ নানাজাতি।

,,,
শীতল গঙ্গার জল কর্পূরবাসিত।

,,,
মিঠা পান গুয়া চুন পাথরিয়া।

,,,
রাখে লঙ্গ এলাচি জয়িত্রী জায়ফল।
উদ্দীপন আলম্বন সম্ভোগের বল ॥

,,,
বিদ্যার ইঙ্গিত পেয়ে সহচরীগণ।
আরম্ভ করিল গীত যন্ত্রের বাজন ॥

,,,
দুজনের গানেতে মোহিত দুই জন।
আলিঙ্গন প্রেম রসে মাতিল মদন ॥

,,,
মুখ চুম্বন চাঁদ চোকর হয়ে।
ধনি বারই অঞ্চল ঝাঁপি লয়ে ॥

,,,
ক্ষম হে পতি হে বধু হে প্রিয় হে।
নব যৌবন জোরের যোগ্য নহে ॥

,,,
রস লাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হইবে কলিকা দলিলে ॥

,,,
ভয় না টুটিবে ভয় না তুড়িলে।
রস ইক্ষু কি দেই দয়া করিলে ॥
বলিয়া ছলিয়া সহলে সহলে।
রসিয়া পশিলা ভ্রমরা কমলে ॥

,,,
রসিক রসিকা সুখে যুবক-যুবতী।
বসিলা পালঙ্কে জিনি রতি রতিপতি ॥
সুগন্ধে লেপিত অঙ্গ সুগন্ধ মালায়।
মিষ্ট জল পান করি জলপান খায় ॥' (পৃ- ২০৯-২১৪)

দেশি শব্দ

বাঙালি বরাবরই ভাব-প্রবণ ও আবেগী জাতি। এ ভাব-প্রবণ বাঙালির ভাষা ও বুলির মাধ্যমেই প্রকাশ পেতো তার প্রাণের আকুতি-আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন বাসনা। প্রাত্যহিক জীবনে উচ্চারিত এসব ভাষা বুলি ও শব্দমালাই ছিল বাঙালির চিন্তা-ভাবনা, ধ্যান-ধারণার পরিচায়ক। এসব দেশি শব্দের মাধ্যমেই মূলত বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় ও পরিমণ্ডলকে সুন্দর ভাবে উন্মোচিত করে তোলে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' বাঙালির আটপৌরে জীবনের চলনে-বলনে ও ভাব-ভাষায় উচ্চারিত এসব দেশি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়–

খেদাইয়া, জাঙ্গাল, ঝিউড়ী, বহুড়ী, বাছা, বাছনি, ফাঁফর, বাতুল, বাপা (বাবা), তালাস, বিনাইয়া, কুটা, আই, আছাড়-পাছাড়, লেঙ্গটা, আই আই, ছিছি, সামাই (প্রবেশন), ফোঁফায়, ঝোড়ে, নাফানী, ডুকরিয়া, মূত (প্রস্রাব), সোঁসর, বালাই, ভেভাচাকা, ঢুলুঢুলু, মেলানী, দোঁহে, দোঁহার, ছাবাল, কড়া, ইন্দুর, ব্যাপার (ব্যবসায়), খচমচ, ভাজে (ভাই বউ), ঠাট, হেদে, আচমন, উছলিয়া, দড়, ইথে, নিদান, পাতে, উছট, নীক (উকুনের বাচ্চা), ইলিবিলি, গাঁটি, টাঁকিনিল, ফেরফার, ভেলকী, সেঁউতী, দোসর, তরাস, টলটল, ডগমগ, জরজর, ভাতার, হিতাশী, জুঁখে, দর, কিরাকাটা, সমাচার, ছাপা (গোপন), মিছা, মাজা (কোমড়), কাল, গছায়, ঠারে-ঠোরে, আড়ে (পাশে), দুরুদুরু, ঘায় (আঘাত), ছার, আঁচাআঁচি, পাঁচাপাঁচি, রগড়া, সহণে সহণে, খিল, কটুনী, জিনে (জয় করে), বাটপাড়, মাসাস, ঠাঁই (কাছে), আইশাশ, আতিবাতি, উপজিল, রাখাল, দাড়িম, লম্পট, ওয়াক, ঠাহর, রড়ে (দৌড়ে), তেয়াগিয়া, ডেগরা, চেগরা, নিছনি, বাসি, বাথানিয়া, গাই, ব্যভার (উপহার), বলিহারি, কুটুম্ব, পাকল, আয়াত, লটপট, সুসার, কোশা (ডিঙি), মকমকি, খরখরি, ঘুটঘুট, আন্ধার, কড়মড়ি, খাবি খাওয়া, কুকড়া, নায় (নৌকায়), পাঠা-পাঁঠি, মর্দ, রাঁড়, পুত (পুত্র) ঢেড়ী, নিমা-সীমা, নাপান-ঝাপান, বুনি (বোন), অতিতর, আচাভুয়া, আজাবোজ, আঁকশনী, আঁধলা (গন্ধ), ইটাল (ভাঙা ইট), ইলিমিলি (অস্পষ্ট মন্ত্র), উচুর (অধিক), কড়মী (ঘনুসী), করে রাঁড়ী (বাল্য বিধবা), কাতি (ছুরি), কুজড়া-কুজড়ানী, খেটেল (শ্রমজীবী), ঘেটেল (ঘাটের মাঝি), চেগরা-চেঙ্গরা (বাচাল), চোয়ার (জাতি বিশেষ), ছিনিমিনি (চকচকে), জোহার (নমস্কার), ঝারি (ডাবর), তেনা (ন্যাকড়া), ঠায় ঠায় (স্থানে), ডেগরা/ডেকরা (ধূর্ত), দড়বেলা (যৌবনকাল), দুন/দুনা (দ্বিগুণ), বহিত্র (নৌকা), বাড় (বাহির), বিড়া (গাছা), ব্যাজ (বিলম্ব), ভরম (লজ্জা), ভাঙ্গড় বা ভাঙ্গী, মিত্তিনী (স্বামীর মিতার স্ত্রী), রাজাই (রাজত্ব), রাড়ারাড়ি (ইতরামি), রামজনী (পতিতা নর্তকী), হড়পী (সাপের পাত্র) প্রভৃতি।

বিদেশি শব্দ

সমকালীন রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক ও ধর্মীয় প্রভাবে বাঙালি সমাজে দেশি শব্দের সঙ্গে বহু বিদেশি (আরবি, ফারসি, তুর্কি) শব্দের মিশ্রণ ঘটে যায় অনিবার্যভাবে। কারণ রাজ ক্ষমতায় মুসলমানগণ থাকায় প্রশাসন, অফিস-আদালত, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে বিদেশি শব্দের প্রবেশ ঘটে দুর্বার গতিতে। তবে এ বিদেশি শব্দসমূহ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে আজ এসব শব্দ বাংলা ভাষার নিজস্ব সম্পদে পরিণত হয়ে পড়েছে।

'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' সমকালীন বাংলায় প্রচলিত এসব বিদেশি শব্দের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়-

পাতশা (বাদশা), খেতাব, খালাস, নবাব, নজরানা, জমাদার, ওস্তাদ, সিকাই, ফরমান, সুলতানী, পেশকার, উজীর, দেয়ান, সরম, বেগার, খঞ্জর, থানা, জবেহ বা জবাই, সফরিয়া, তাজী, বালাখানা, হুজুর, হাজির, উকিল, হালাল, নিমক, নাজীর, গরীবনেয়াজ, মহল, খেদমত, জান, হারামজাদা, হারামজাদী, জিম্মা, কোটাল (কতোয়াল), গোঁয়ার, গস্তানী, মস্তানী, মুনশী, দোয়াত-কলম, বখশী, বেহিসাব, গরহাজির, ফিকির, আরজবেগী, বাদী, বিবাদী, ফরিয়াদী, খাজাঞ্চি, পোদ্দার, মুহুরি, দপ্তরি, নকীব, সেলাম, গরজ, দেমাগ, বকরি, হাবাসে, আসরফী, খাসবরদার, ইনাম, নিমকহারাম, সেলামত, কেরামত, গোলাম, কয়েদ, খোরাক, শাহনশাহী, কবুল, হজরত, খেদমত, ঝুটমুট, নায়েব, কাজী, সাঁই, খসম, আদমী, খানাপিনা, বেইমান, সাকার, মজুরি, নাজির, হাবসিখানা, সুন্নত, কলেমা, কোরান, মিয়া, তসবি, বিবি, খবিস, মাতারি, হারাম, জাহির, মামুর, বাবুর্চিখানা, জেনানা, নিকলি, বেহোঁশ, তাবিজ, কবচ, আলম্পন, আরজ, সাহেব, আমীর, উমরা, নমাজ, চীজ, দানা, কারী, তক্তের, খেলাত, পাঞ্জা, কহর (শাস্তি), কামান, কারসাজী, কুদরৎ, তোক, বন্দেগী, বেসাতি (জিনিসপত্র), মজুমদার (রাজস্বের হিসাবরক্ষক), শিরোপা, শোর (চিৎকার), সহবতি, হলক বা হলকা (দল), হালাক, গালিম (শত্রু), আজব, আযাজ, আয়েব (দোষ), ইজার, করিম, কানুনগো, কানাত, কারসাজী, দবা বা দাওয়াই, দাগা (প্রবঞ্চনা), নাপাক, (নিমা, ফতে (জয়), বান্দা, মাল, রবাব, সমুঝায় বা সমঝে, সুবা (অঞ্চল), হরকরা, হাজারি প্রভৃতি।

প্রবাদ-প্রবচন ও দার্শনিক উক্তি

প্রবাদ-প্রবচন বাঙালি নর-নারীর কথা বলার ভূষণ। জীবনের নানা অভিজ্ঞতাজাত এসব প্রবাদ প্রবচন হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠেছে। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক, আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক, আবহাওয়া, জলবায়ু, কৃষি ও লোকাচারসমূহ। বাঙালি নর-নারী তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কাজে-কর্মে, চলনে-বলনে, ভাব-ভঙ্গিতে, চেতনে-অবচেতনে, হাসি-কান্নায় এসব প্রবাদ-প্রবচন, বাগধারা ও দার্শনিক বা তাত্ত্বিক উক্তি সমূহ ব্যবহার করে থাকে।

প্রবাদ-প্রবচন

১. নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
বিস্তর ধার্ম্মিক লোক ঠেকে গেল দায় ॥ পৃ- ১১

২. একের কপাল রহে আরের কপাল দহে
আগুনের কপালে আগুন ॥ পৃ- ৩৬

৩. যে যার ভক্ষক সে তার রক্ষক
সার অসার সংসারে ॥ পৃ- ৫৫

৪. পরস্পরা পরস্পর শুনি এই সূত্র।
স্ত্রীভাগ্যে ধন পুরুষের ভাগ্যে পুত্র। ॥ পৃ- ৫৭

৫. নারী যার স্বতন্তরা সে জন জীয়ন্তে মরা
তাহারে উচিত বনবাস ॥ পৃ- ৬০

৬. বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস তাহার অর্দ্ধেক চাষ
রাজসেবা কত খচমচ।
গৃহস্থ আছয়ে যত সকলের এই মত
ভিক্ষা মাগা নৈব চ নৈব চ ॥ পৃ- ৬০

৭. জননীর আশে যাবে পিতৃবাসে
ভাজে দিবে সদা তাড়া।
বাপে না জিজ্ঞাসে মায়ে না সম্ভাষে
যদি দেখে লক্ষ্মীছাড়া ॥ পৃ- ৬১

৮. হাভাতে যদ্যপি চায় সাগর শুকায়ে যায়
হেদে লক্ষ্মী হৈল লক্ষ্মীছাড়া ॥ পৃ- ৬৬

৯. ঘরে অন্ন নাহি যার মরণ মঙ্গল তার
তার কেন বিলাসের সাধ। পৃ- ৬৭

১০. জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া।
মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিল তাড়া ॥ পৃ- ১১০

১১. মাতঙ্গ পড়িলে দরে পতঙ্গ প্রহার করে। পৃ- ১১৭

১২. দৈব রুষ্ট যার বুদ্ধি নাশে তার। পৃ- ১২২

১৩. যে হৌক সে হৌক আরো করিব যতন।
মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন ॥ পৃ- ১২৫

১৪. দুর্দ্দৈব যখন ধরে ভাল কর্ম্ম মন্দ করে। পৃ- ১২৬

১৫. বুড়া বয়সের ধর্ম্ম অল্পে হয় রোষ।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রান্তি হয় এই বড় দোষ ॥ পৃ- ১৩০

১৬. খুঁয়ে তাঁতি হয়ে দেহ তসরেতে হাত। পৃ- ১৩৩

১৭. পেয়েছিনু মানিক আঁচলে না বান্ধিনু।
নিকটে পাইয়া নিধি হেলে হারাইনু ॥ পৃ- ১৪০

১৮. বিধাতার লিখন কাহার সাধ্য খণ্ডি।
গৃহিনী ভাগ্যের মত পাইয়াছি চণ্ডী ॥ পৃ- ৫৬

১৯. যতন নহিলে নাহি মিলয়ে রতন। পৃ- ১৬৪

২০. নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে। পৃ- ১৬৬

২১. জলেতে নিবায় জ্বালা সর্ব্বলোকে কয়।
এ জল দেখিয়া জ্বালা দশগুণ হয় ॥ পৃ- ১৭২

২২. শুনাইতে শুনিতে পাইব সমাচার।
বাসার সুসারে হবে আশার সুসার ॥ পৃ- ১৭৬

২৩. কড়ী ফট্‌কা চিড়া দই বন্ধু নাই কড়ি বই
কড়ীতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
কড়ীতে বুড়ার বিয়া কড়ি লোভে সরে গিয়া
কুলবধূ ভুলে কড়ী দিলে ॥ পৃ- ১৭৮

২৪. বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা। পৃ- ১৮৫

২৫. বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট।
রাঁঢ় হৈয়ে যেন সাঁড়ের নাট ॥ পৃ- ১৮৮

২৬. বুঝিতে নারিনু বিধির ফন্দ।
করিনু ভালরে হইল মন্দ ॥ পৃ- ১৮৮

২৭. যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে। পৃ- ১৮৯

২৮. ছাড় আইবলা জানি সকল।
গোড়ায় কাটিয়া মাথায় জল ॥ পৃ- ১৮৯

২৯. বড়র পিরিতি বালির ফাঁদ।
ক্ষণে হাতে দড়ী ক্ষণেকে চাঁদ ॥ পৃ- ১৮৯

৩০. যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর ॥ পৃ- ১৯০

৩১. রাজার তনয় বটে রাজবংশে চাসা। পৃ- ১৯৩

৩২. উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে।
কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে ॥ পৃ- ২০৪

৩৩. আমি যদি কথা কহি একে হরে আর।
পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা ধার ॥ পৃ- ২০৪

৩৪. আগু পাছু সাত পাঁচ ভেবে করি মানা।
মৃগ হয়ে দিবে কি সিংহের ঘরে হানা ॥ পৃ- ২১৬

৩৫. সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর।
মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥ পৃ- ২১৭

৩৬. মূঢ় নর যে করে নরের উপাসনা।
দৈব বিনা কোন কর্ম্ম না হয় ঘটনা ॥ পৃ- ২১৭

৩৭. শিলা জলে ভাসি যায় বানরে সঙ্গীত গায়
দেখিলেও না হয় প্রত্যয় ॥ পৃ- ২১৮

৩৮. যার কর্ম্ম তার সাজে অন্যলোকে লাঠি বাজে। পৃ- ২১৯

৩৯. কি জানি বিচারে জিনে না জানি কি হয়।
যে বুঝি চোরের ধন বাটপাড়ে লয় ॥ পৃ- ২২৫

৪০. ময়ূর চকোর শুক চাতকে না পায়।
হায় বিধি পাকা আম দাঁড়কাকে খায় ॥ পৃ- ২২৬

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে দেখা যায়, 'অন্নদামঙ্গল কাব্যে' সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সংঘর্ষ, বিপর্যয়, দুঃখ-দারিদ্র্য, বঞ্চনা-বিভেদ-বিদ্বেষ, ব্যর্থতা ও বাসনার জীবন্ত চিত্র উন্মোচিত হয়েছে। ভারতচন্দ্র বাংলার যে রাজনৈতিক অস্থিরতা, কোলাহল, ইংরেজ বণিক শক্তির উত্থান, মারাঠা বর্গীদের অত্যাচার, নাগরিক জীবনের স্থূল রস-রসিকতা-ভোগ-বিলাস দারিদ্র্যের অভিশপ্ত কাহিনী অঙ্কন করেছেন, তা সময়ের সাক্ষী ও যুগের জ্যোতিতে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠেছে। যদিও 'অন্নদামঙ্গল কাব্যের' কাহিনী বর্ণনার ক্ষেত্রে কিছুটা ইতিহাস লঙ্ঘিত বা বিকৃত হয়েছে, তবে এতে কবির ওপর বেশি দোষ চাপানো যায় না; কারণ তিনি কাব্য রচনা করেছেন- ইতিহাস নয়। আবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে বাংলায় বর্গীদের দিয়ে আক্রমণ করানো এবং মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীরকে দিয়ে অন্নদার পূজা করানো ও স্বীকৃতির মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে সাম্প্রদায়িক চেতনার যে প্রভাব দেখা যায়– তা পুরোপুরি কবির মনোভাব নয়, বরং যুগ মানস ও পৃষ্ঠপোষক রাজার (কৃষ্ণচন্দ্রের) অভিরুচির অভিব্যক্তিকে প্রকাশ করেছে।

কারণ তখন গ্রামীণ বাংলার সমাজে ভাঙ্গন ধরেছে, বাংলার বাণিজ্য আর শিল্প পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে, অর্থনীতির মূল কাঠামো আর শ্রেণীবিন্যাসের সংকটটা পৌছেছে চরমে। রাজনীতি আর অর্থনীতিতে একটা মৌল পরিবর্তন অগ্নিগর্ভ সম্ভাবনায় থরথর করে কাঁপছে। আর ইংরেজ বিজয়ের পূর্ব মুহূর্তের বাংলাদেশের ঐতিহাসিক নিয়তি সেই আগমন- সম্ভাবনাকে নীলকণ্ঠের বেদনায় ধারণ করেছে। পুরনো মূল্যবোধের ভিত্তি ভঙ্গুর, ধর্মের একাধিপত্য আজ অপচিত, নীতিবোধ এবং জীবনের গভীর অনুধাবন অবসিত। প্রাচীনের বিদায়বেদনা আর নতুনের গর্ভযন্ত্রণার এই মুহূর্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্র, সমাজ, শিল্প-সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক সম্পদ। ,,, আর মুর্শিদাবাদের রাজতক্ত নিয়ে গুপ্তহত্যা, রক্তপাত আর রাষ্ট্র বিপ্লব তো ছিলই, ছিল বিদেশি বেনিয়াদের সঙ্গে সংঘর্ষ, ছিল রাতের অন্ধকারে ষড়যন্ত্রের ফেনিল হলাহল। ৬৩

ঐশ্বর্য-দারিদ্র্যের চিত্র উপস্থাপন ছাড়াও কবি অন্নদামঙ্গলের কাহিনীতে প্রেমের তিনটি রূপকে পাশাপাশি তুলে ধরেছেন- শিব, দুর্গা, বিদ্যা-সুন্দর এবং দুই স্ত্রী সহ ভবানন্দ মজুমদারের। বিদ্যা সুন্দরের মুক্তপ্রেম অর্থাৎ গান্ধর্ব বিবাহের ব্যাপারটা কেবলই সমাজকে ঠেসে ঠারা, কেবল হেসে হেসে সমাজ সৌধের ভিতে সুড়ঙ্গ কাটার বাইরের আচরণ। তরুনীর বৃদ্ধ স্বামী কিন্তু তাঁর প্রাণের সমর্থন পায়নি। এমনকি শি দেবাদিদেব হয়েও কবির

ব্যাঙ্গের হাত থেকে রেহাই পাননি। বুভুক্ষু মানুষের বেদনা কবির কাব্যে ভাষা পেলেও দারিদ্র্যকে তিন কখনো শ্রদ্ধা দেখাননি।--- একাধিক বিবাহের জীবন স্পষ্টত তাঁর কাছে ধিক্কৃত হয়েছে। ভবানন্দ মজুমদারকে নিয়ে তার দুই স্ত্রীর কদর্য কোন্দল আর ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস নির্ভুল তুলিকায় এঁকেছেন কবি। ৬৪

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টির যে প্রেরণা ভিত্তি ছিল- মসনদ, মন্দির, মঠ, মাঠ ও মেয়েমহল অর্থাৎ রাজসভা (মসনদ), ধর্ম সংস্থা (মঠ ও মন্দির) আর জনসাধারণ (মাঠ মেয়ে মহল), তা নাগরিক কবি ভারতচন্দ্রের হাতে বাণীমূর্তি লাভ করেছে।''' প্রাক রেনেসাঁ বাংলা সাহিত্য গতির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন ভারতচন্দ্র– এক চোখে তাঁর মানব সন্তানকে দুধে-ভাতে বাঁচিয়ে রাখবার বেদনাময় আকাঙ্ক্ষা, অপর চোখে পার্থিব সব সৌন্দর্য, সব ঐশ্বর্য ভোগের বহ্নিমান কামনার ধিকি ধিকি জ্বালা; ঠোঁটের কোণে তাঁর বিদ্রূপের হাসি-বিদ্রূপ সমাজকে নৃপতিকে সর্বাপেক্ষ অধিক আপনাকে, আর শিল্পীর অহঙ্কারে উচ্চশিব তাঁর কৃষ্ণগর যেন- বাংলার সব রাজপ্রাসাদ থেকে উচ্চতর। ৬৫

বাংলার গ্রামীণ জীবন ও নাগরিক জীবনের দুটি স্বতন্ত্র ধারা রূপ পেয়েছে শতাব্দীর এক ক্রান্তিলগ্নের ঘূর্ণাবর্তে, যার মধ্যে একটি অনিবার্য সম্বন্ধও স্থাপিত হয়েছে আবর্তের শক্তির টানে– এ সময়কালকে ধারণ ও রূপায়নের ক্ষেত্রে ভারতচন্দ্রের যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা অসামান্য।

<u>**তথ্য নির্দেশ**</u>

১. এম.এ রহিম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ- ২৬৭।
২. সনাতন গোস্বামী : কবি ভারতচন্দ্র; এ.কে সরকার এন্ড কোং, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ- ২৭।
৩. অতুল সুর : বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন; সাহিত্যলোক; কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, ২০০১, পৃ- ২৭০-২৭১।
৪. পূর্বোক্ত : পৃ- ২৭৬-২৭৭।
৫. অরবিন্দ পোদ্দার : মানব ধর্ম ও বাংলার কাব্যে মধ্যযুগ; পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ৫ম মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ ৩৩-৩৪।
৬. অতুল সুর : পূর্বোক্ত; পৃ- ২৮৪-২৮৬।
৭. পূর্বোক্ত : পৃ- ২৮১।
৮. দীনেশচন্দ্র সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, ২০০২, পৃ- ৫৫৫।
৯. অতুল সুর : পূর্বোক্ত; পৃ- ৩০০-৩০৮।
১০. পূর্বোক্ত : পৃ ২৯৪-২৫।
১১. অরবিন্দ পোদ্দার : পূর্বোক্ত; পৃ ৩৩-৩৫।
১২. শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৫৬, পৃ- ১৩।
১৩. পূর্বোক্ত : পৃ- ৭।
১৪. দীনেশচন্দ্র সেন : পূর্বোক্ত; পৃ- ৫৫৫।
১৫. পূর্বোক্ত : পৃ- ৫৫৫।
১৬. পূর্বোক্ত : পৃ- ৫৫৬।
১৭. পূর্বোক্ত : পৃ- ৫৫৭।
১৮. পূর্বোক্ত : পৃ- ৫৫৮।
১৯. অতুল সুর : পূর্বোক্ত; পৃ- ৩০৪।
২০. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : শাক্ত পদাবলী; রত্নাবলী, কলকাতা, ১৯৯৯, পৃ- ৭।
২১. বাসুদেব রায় : চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ; উৎস প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৫, পৃ- ২০৮-২০৯।
২২. অতুল সুর : পূর্বোক্ত; পৃ- ৩০৪।
২৩. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পা) : ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা, ৩য় সংস্করণ, পৃ- ১২।
২৪. আহমদ শরীফ : বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (২য় খণ্ড), নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০৩, পৃ- ৪১০।
২৫. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; এ. মুখার্জী এন্ড কোং প্রা.লি. কলকাতা, দ্বাদশ সংস্করণ ২০০৯, পৃ- ৬৯৬।
২৬. গোপাল হালদার : বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম খণ্ড); মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৪, পৃ- ১৯৬।
২৭. আশুতোষ ভট্টাচার্য : পূর্বোক্ত; পৃ- ৫৩৭।
২৮. ব্রজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও সজনীকান্তদাস (সম্পা) : ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ৩য় সংস্করণ ১৩৬৯, পৃ- ২৯।

২৯. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৩১।
৩০. সুকুমার সেন	:	বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি. কলকাতা, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১০, পৃ- ৪২৫।
৩১.		
৩২. ক্ষেত্র গুপ্ত	:	প্রাচীন কাব্য ঃ সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন; জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ- ১৩৭।
৩৩. সুকুমার সেন	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৪২৫।
৩৪. নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ১।
৩৫. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ১।
৩৬. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ১।
৩৭. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ২।
৩৮. প্রমথ চৌধুরী	:	প্রবন্ধ সংগ্রহ; বিশ্বভারতী, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৯৮, পৃ- ২১৬।
৩৯. দীনেশচন্দ্র সেন	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৫৭৫-৫৭৭।
৪০. আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৬৪৬।
৪১. সুকুমার সেন	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৪২৯।
৪২. প্রমথ চৌধুরী	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ২১৯।
৪৩. ক্ষেত্র গুপ্ত	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ১৪১-১৪২।
৪৪. মুহম্মদ আব্দুল হাই ও আহমদ শরীফ (সম্পা)	:	মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা; মওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ- ভূমিকা অংশ।
৪৫. বাসুদেব রায়	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৭৮।
৪৬. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৭৮।
৪৭. সুকুমার সেন	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৪২৭।
৪৮. বাসুদেব রায়	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ১৯৬।
৪৯. শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	:	মধ্যযুগের ধর্ম ভাবনা ও বাংলা সাহিত্য; পুঁথি প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ- ৮৯।
৫০. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় (সম্পা)	:	শাক্ত পদাবলী; রত্নাবলী, কলকাতা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ১৯৯৯, পৃ- ১৯।
৫১. আশুতোষ ভট্টাচার্য	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৬৯১।
৫২. ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৭।
৫৩. ক্ষেত্রগুপ্ত	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ১৪৬।
৫৪. সুকুমার সেন	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৪২৮।
৫৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাঃ)	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৮।
৫৬. সুকুমার সেন	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ৪২০।
৫৭. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ৪২০-৪২১।
৫৮. অতুল সুর	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ২৮৪-২৮৬।
৫৯. অরবিন্দ পোদ্দার	:	পৃ- ৪১।
৬০. অতুল সুর	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ২৫৬।
৬১. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ২৫২।
৬২. ক্ষেত্র গুপ্ত	:	পূর্বোক্ত; পৃ- ১৩৩।
৬৩. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ১৩০।
৬৪. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ১৩৪।
৬৫. পূর্বোক্ত	:	পৃ- ১৩০-১৩৫।

উপসংহার

সাহিত্য যে সমাজ-জীবনের দর্পণ– এ কথা বাংলার মধ্যযুগের সাহিত্য ধারার মঙ্গলকাব্যের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রযোজ্য। কারণ এ মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের (ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) বাংলা ও বাঙালি জাতির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের বস্তুনিষ্ঠ পরিচয় মেলে। বাঙালির সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের এমন কোন দিক নেই (অর্থাৎ জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সম্পর্কিত সকল বিষয়-আশয়ই) যা মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত হয়নি। তাই ধর্ম প্রভাবী মধ্যযুগের এ মঙ্গলকাব্য এবং এর কবিগণের মানসচেতনা শুধু ধর্মীয় বিশ্বাস-সংস্কার দ্বারা সীমাবদ্ধ ছিল না, বরং যুগ-জীবন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কেও তাঁদের সজাগ দৃষ্টি বিদ্যমান ছিল। আর এ কারণেই যুগ যন্ত্রণা, জীবন-জিজ্ঞাসা, রাজনৈতিক পালাবদল ও সামাজিক রূপ-রূপান্তরের পরিণামী প্রেক্ষাপটসমূহ মঙ্গলকাব্যে ধারাবাহিকভাবে উন্মোচিত হয়েছে। যা বাঙালি জাতির রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ইতিহাসের দলিল বা অগ্নিসাক্ষী।

আর্যদের বাংলায় আগমনের পর থেকেই এদেশের রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনে ভাঙন ও পালাবদল সংঘটিত হয় অনিবার্যভাবে। পুরুষতান্ত্রিক আর্যদের বৈদিক ধর্মের প্রতাপ ও প্রভাবে মাতৃতান্ত্রিক অনার্যদের ধর্মীয় বিশ্বাসের জগৎ সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং অনার্য মাতৃদেবীগণ বিতাড়িত হয়ে বনে-জঙ্গলে, গাছ তলায় ও পর্বত গুহায় আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। তুর্কি বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত (ত্রয়োদশ শতাব্দী) ব্রাহ্মণ্যবাদ প্রভাবিত বৈদিক ধর্ম নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বা সত্তা বজায় রাখতে সক্ষম হলেও মুসলমানদের শাসনামলে এসে এর প্রভাব দুর্বল ও শিথিল হয়ে পড়ে। তখন এ বৈদিক ধর্মের ওপর লোকায়ত ধর্মের ছাপ পড়তে থাকে এবং পরবর্তীকালে এর বিজয় বিঘোষিত হয়। আর এ লোকায়ত ধর্মের প্রভাবেই বাঙালি নিম্নবর্গে উদ্ভূতা নারী দেবতা মনসা, চণ্ডী, শীতলার ভদ্র সমাজ বা উচ্চ শ্রেণিতে প্রত্যাবর্তন ও প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হয়। রাষ্ট্রীয় গোলযোগ ও সামাজিক অস্থিরতায় বর্ণবাদী সমাজ এ নারী দেবতাদের গ্রহণ করতে বা মেনে নিতে বাধ্য হয়। ধর্মঠাকুর ও শিবঠাকুর- এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পুরুষ দেবতা। আর এ লৌকিক ধর্মীয় রীতিতে এসেই (বেদ, উপনিষদ ও পুরাণের ধারা অতিক্রম করে) দেবতাগণ শূন্যময় ও নিরাবয়ব না থেকে প্রস্তরময় বা মৃন্ময়ী মূর্তি-প্রতিমায় প্রত্যক্ষগোচর হয়ে পড়েন। দুর্বল-দুর্দশাগ্রস্ত-দিশেহারা ও অসহায় জনসাধারণ তাদের বল-বিশ্বাস ও ভরসার একমাত্র অবলম্বনকে দৃষ্টির অগোচরে রেখে আর শান্তি-স্বস্তি পাচ্ছিল না, তাই ভক্তগণের দাবীর মুখে দেবতার প্রত্যক্ষ মূর্তিতে গৃহ মন্দিরে আশ্রয় নিতে হয়।

পূর্ব যুগের অর্থাৎ মৌর্য ও গুপ্ত যুগের ব্রাহ্মণ্য প্রভাব (সম্রাট অশোক বাদে), পাল যুগের বৌদ্ধ প্রভাব এবং সেন যুগের ব্রাহ্মণ প্রভাবের উত্থান-পতনজনিত বৌদ্ধ পীড়ন এবং মুসলিম শাসনামলে (সাড়ে পাঁচশত বছর) এসে কিছুটা বাধ্য হয়েই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে লৌকিক ধর্মের সমঝোতা বা সহাবস্থানমূলক পটভূমির ক্ষেত্র তৈরি হয়। যা ফখরুদ্দিন মুবারকশাহ, শামস উদ্দিন ইলিয়াস শাহ, আলাউদ্দিন হুসেন শাহ ও সম্রাট আকবরের শাসনামলের সুশাসন ও মানবিক উদারতায় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি জাগ্রত হয় এবং বিপন্নপ্রায় জাতি-ধর্মের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের মাধ্যমে মূলত পঞ্চদশ শতাব্দীর বৃহৎ পূর্ববঙ্গের বরিশাল অঞ্চলের যাপিত জীবনের চালচিত্র উন্মোচিত করা হয়েছে। সামন্ত শাসনের পাশাপাশি বণিক সম্প্রদায়েরও অর্থ-বিত্তের প্রভাবে সামাজিক অবস্থান সুসংহত হয় এবং মান-মর্যাদা প্রায় শাসকের স্তরে গিয়ে পৌছায়। শিবভক্ত চাঁদ সওদাগর তাই সামন্ত শাসকের জাত্যাভিমান নিয়েই অনার্য দেবতা মনসার পূজা দিতে সম্মত তো হয়নি বরং বিরোধিতা করেছেন। চাঁদের বাণিজ্যলব্ধ ধনের ঐশ্বর্য মুলত সমকালীন বাংলার আন্তঃ ও বহির্বাণিজ্যের প্রসার, সমৃদ্ধি ও সম্পদের ঐশ্বর্যকে ইঙ্গিত করে। শিবভক্ত চাঁদ ও মনসার দ্বন্দ্ব বস্তুত মতাদর্শগত ও শ্রেণিচেতনায় পুষ্ট।

মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কার্বের মাধ্যমে ষোড়শ শতাব্দীর বর্ধমান ও মেদিনীপুর অঞ্চলের সমাজ ব্যবস্থার চিত্র বিধৃত হয়েছে। এ কাব্যের একদিকে রয়েছে সমাজ ব্যবস্থার প্রাচীন বা আদি বৃত্তিজীবী ব্যাধ বা শিকারী শ্রেণির অনুষঙ্গ এবং অপর দিকে দেখা যায়, সামন্ত ব্যবস্থার ছত্রছায়ায় বণিক ও মহাজন সম্প্রদায়ের অর্থ-সঞ্চয় প্রবণতা ও শক্তিশালী উত্থান। ব্যাধ কালকেতুর দৈবধনে হঠাৎ করে বিত্তশালীতে রূপান্তর মূলত সামন্ত শাসন-শোষণে পিষ্ট সমাজের বাত্যশ্রেণির সুখ-সমৃদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিপূর্ণ শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত। যা সমকালীন বাংলার ব্রাহ্মণ্যবাদী প্রতাপ প্রতিষ্ঠার অটল-অবিচল মান-মন্দিরের আসন্ন পরাভব এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর অনিবার্য উত্থানকে তরান্বিত করেছে।

ঘনরাম চক্রবর্তীর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে সপ্তদশ শতাব্দীর রাঢ় বাংলার বীরত্বগাথা রূপায়ণের পাশাপাশি অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য ডোম সম্প্রদায়ের সমাজকাঠামোর সম্মানজনক স্তরে ওঠার অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। বর্ণবাদী ব্রাহ্মণদের একক আধিপত্য খর্ব করে ডোম সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্যের আসন দখল করার বিষয়টি মূল ব্রাহ্মণ্যবাদীদের প্রতাপ-প্রভাবের দুর্গে ভাঙন ও টলায়মান অবস্থার অশনিসংকেত।

ভারতচন্দ্র রায়ের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর হুগলি, নবদ্বীপ ও মুর্শিদাবাদ তথা বাংলার সামন্তবাদী সমাজ ব্যবস্থার গর্ভ থেকে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার অনিবার্য উত্থানের ইঙ্গিত দান করা হয়েছে। কারণ কেন্দ্রীয় শক্তি দিল্লী ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ায় সামন্ত শাসকদের বিদ্রোহ-বিক্ষোভ, যুদ্ধ ও বিলাসিতায় ধন-জন ক্ষয়ে ক্রমশ পতনোন্মুখ অবস্থা এবং বিদেশী বণিকগোষ্ঠীর রাজ্যলিপ্সা ও পুঁজিনির্ভর শক্তিশালী অবস্থান- যা ভূমি নির্ভর সামন্তবাদের পতনকে তরান্বিত করে। অর্থাৎ ব্যবসায়-বাণিজ্য নির্ভর পুঁজিবাদের কাগজী নোটের কাছে ভূমি নির্ভর সামন্তবাদের ধাতবী মুদ্রার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। সামন্তবাদের অবক্ষয়, ভোগ-বিলাস, পচন, পাপ-পঙ্ক, আসন্ন পতন ও ক্ষয়িষ্ণুতার বৈপরীত্যে পুঁজিবাদের বিজয় বিঘোষিত হতে থাকে। পুঁজিবাদের এর জয়যাত্রার গতিকে রোধ করার মতো কোন শক্তি তখন বাংলায় আর অবশিষ্ট ছিল না। বরং সামন্তবাদের পরিবর্তে পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে যুগ মানসের সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হতে থাকে অনেকটা নির্দ্বিধায় ও নিশ্চুপে।

সুতরাং দেখা যায়, মনসামঙ্গল কাব্যে– রাখাল ও কৈবর্ত জেলে শ্রেণির, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে– কিরাত বা ব্যাধ শ্রেণির, ধর্মমঙ্গল কাব্যে– ডোম শ্রেণির এবং অন্নদামঙ্গল কাব্যে– ঘুঁটে কুড়ানী শ্রেণির বিপ্লবাত্মক উত্থান ঘটেছে। এ দিক বিবেচনা করলে মঙ্গলকাব্যের কবিদের প্রথাবদ্ধ ও সংস্কারাছন্ন বলা যায় না, বরং এঁরা অনেকটাই সমকাল সচেতন, সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল ও মানবতার প্রশ্নে অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই ধর্মীয় প্রভাবজাত পৌরাণিক আবরণে চারজন যে মঙ্গলকাব্য রচনা করেছেন; তার অন্তর সম্পদ ও মৌল চেতনা মানবিক। এ কারণেই 'মনসামঙ্গল', 'চণ্ডীমঙ্গল', 'ধর্মমঙ্গল' ও 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কোন স্বর্গবাসী দেবতার মাহাত্ম্য, শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্ব স্বীকৃতি তথা প্রতিষ্ঠা পায়নি, যতক্ষণ না মর্ত্যবাসী মানুষ (হোক স্বর্গভ্রষ্ট দেব শিশু) তাকে পূজাদানে বিরত থেকেছে। এ ছাড়া দেবতারা পূজা-যশ-মান আদায়কালে যে কাঙালপনা ও কপট কর্মতৎপরতার আশ্রয়-প্রশ্রয় নিয়েছেন, তখন তারা আর দেবতা থাকেননি বরং রাগ-দ্বেষপূর্ণ মানবে পরিণত হয়ে পড়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে এদের চেয়ে সাধারণ বাঙালি নর-নারীর দুঃখ-দারিদ্র্যে, স্বপ্ন-কল্পনায়, মান ও মানসিকতায়, অনেক বেশি সৎ, মানবিক ঔদার্যে ও আদর্শে বড় হয়ে ওঠেছে। সুতরাং মানুষ ও মানবতাই মঙ্গলকাব্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে মধ্যযুগের (ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী) বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের যে বিস্তৃত পরিচয় পাওয়া যায়, তার মূল্য অসামান্য। বাঙালির যাপিত জীবন সম্পর্কিত এত ব্যাপক ও বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ মধ্যযুগের আর কোন সাহিত্যকর্মে মেলে না। মধ্যযুগে বাঙালির কৃষি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প, নাগরিক সমাজ, গ্রামীণ সমাজ, বিভিন্ন বৃত্তিজীবী শ্রেণি, জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু সংক্রান্ত লোকাচার-বিশ্বাস, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র বিধৃত হয়েছে মঙ্গলকাব্যে। তাই মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য বাঙালির আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন রূপায়ণ- এর শৈল্পিক দলিলে পরিণত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

ক. মূলগ্রন্থ

জয়ন্ত কুমার দাসগুপ্ত (সম্পাদিত) : কবি বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬২

সুকুমার সেন (সম্পাদিত) : কবি কঙ্কণ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল; সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০০১

পীযূষ কান্তি মহাপাত্র (সম্পাদিত) : ঘনরাম চক্রবর্ত্তী বিরচিত শ্রীধর্ম্মমঙ্গল; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৫

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস (সম্পাদিত) : ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলী; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন-১৩৬৯

খ. সহায়ক বাংলা গ্রন্থ

অজয় রায় : বাঙলা ও বাঙালী; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৭

: আদি বাঙালিঃ নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশেণ্ডষণ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা-১৯৯৭

অতুল সুর : বাঙলার সামাজিক ইতিহাস; জিজ্ঞাসা, কলকাতা প্রথম সংস্করণ ১৯৭৫

: বাঙলা ও বাঙালীর বিবর্তন; সাহিত্যলোক, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১

: মহাভারত ও সিন্ধু সভ্যতা; উজ্জ্বল সাহিত্য মন্দির, কলকাতা, ১৯৮৮

: ভারতের বিবাহের ইতিহাস ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৮০

অনীক মাহমুদ : চিরায়ত বাংলা ভাষা রাজনীতি সাহিত্য; আফসার ব্রাদার্স, ৩৮/4 বাংলা বাজার, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ২০০০

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাংলার ব্রত; বিশ্বভারতী, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৫০ বঙ্গাব্দ

অমল কুমার ঘোষ : বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনা; পুস্তক বিপণি, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৯

অমলেন্দু মিত্র : রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর; ফার্মা কে. এল. এস. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৭২

অরবিন্দ পোদ্দার : মানবধর্ম ও বাঙলা কাব্যে মধ্যযুগ; পুস্তক বিপণি, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, অক্টোবর, ২০০৫

: রেনেসাঁস ও সমাজমানস; উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮৩

: মার্ক্সীয় নন্দনতত্ত্ব ও সাহিত্যবিচার; উচ্চারণ, কলকাতা, ১৯৮৬

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড); মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা ১৯৬৬

: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড : প্রথম পর্ব); মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা-২০০৬-২০০৭

: বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড:দ্বিতীয় পর্ব); মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা-২০০৯-২০১০

: বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ কলকাতা, ১৯৯৯-২০০০

অনিরুদ্ধ রায় : সুলতানী আমলের অর্থনৈতিক ইতিহাস- একটি সমীক্ষা; ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭

আনিসুজ্জামান : স্বরূপের সন্ধানে; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৬

: বাঙালি নারী সাহিত্যে ও সমাজে; সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০০

আনিসুজ্জামান (সম্পা.) : বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম খণ্ড); বাংলা একাডেমি, ঢাকা,২০০৮

: বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮

আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ (অনূদিত) : আলবেরুনীর ভারত তত্ত্ব; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২

আবুল কাশেম চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের সামাজিক নকশাঃ পটভূমি ও প্রতিষ্ঠা; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮২

আমিন ইসলাম : সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য; সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, ১৯১৯

আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী, পরিবর্ধিত একাদশ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৬

আবদুল্লাহ ফারুক : বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৪

আবদুল করিম : বাংলা সাহিত্যের কালক্রম (মধ্যযুগ); বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৪

: বাংলার ইতিহাস; বড়াল প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৯

আবুল ফজল আল্লামী	: আইন-ই-আকবরী (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড); বাংলা একাডেমি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, সেপ্টেম্বর, ২০০৮
আহমদ শরীফ	: মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ ; মুক্তধারা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ১৯৭৭
	: বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড); বাংলা একাডেমি প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৭৮।
	: বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (দ্বিতীয় খণ্ড); বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা-১৯৭৮
	: মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য; বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৫।
	: সাহিত্যতত্ত্ব ও বাংলা সাহিত্য; বিদ্যা প্রকাশ, ঢাকা-২০০৩
	: বাঙলা, বাঙালী ও বাঙালীত্ব; সাহিত্যলোক (কলকাতা), ১৯৯২ অনন্যা (ঢাকা) ২০০২
ইরফান হাবিব	: মুঘল ভারতের কৃষি ব্যবস্থা (১৫৫৬-১৭১৭); কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৯
ইরফান হাবিব (সম্পাদিত)	: মধ্যকালীন ভারত (প্রথম খণ্ড); কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী, কলকাতা-১৯৯০।
এ. কে. নাজমুল করিম	: সমাজবিজ্ঞান সমীক্ষণ; নওরোজ কিতাবিস্তান, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, জুন, ২০০৮।
	: পরিবর্তনশীল সমাজঃ ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি. ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮
এন. এ সিদ্দিকী	: মোগল রাজত্বে ভূমি রাজস্ব পরিচালন ব্যবস্থা; পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৮০।
এ. কে. এম. শাহজানাওয়াজ	: ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ); প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৯
	: ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ; সুলতানী পর্ব); প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০২
	: ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ; মোগাল পর্ব) ; প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০০২
এ.কে.এম আবদুল আলীম	: ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৮ম মুদ্রণ, ২০১১
	: ভারতে মুসলিম শাসন ব্যবস্থার ইতিহাস; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৪
উমা সেন	: প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সাধারণ মানুষ; জিজ্ঞাসা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৭১

ওয়াকিল আহমদ : বাংলায় বিদেশী পর্যটক; ঢাকা, ১৯৯০।

: মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা; বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৪

: মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯৫

: বাংলা সাহিত্যের পুরাবৃত্ত ; ঢাকা, ২০০২

: সুলতানী আমলে বাংলা সাহিত্য; ঢাকা, ১৩৭৪

কমলকুমার সান্যাল : মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি (১ম খণ্ড); বর্ণালী, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২

: মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি (২য় খণ্ড); বর্ণালী, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৩

কামিনী কুমার রায় : বাংলার লোকদেবতা ও লোকাচার; বাসন্তী লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮০

কল্যাণী বন্দ্যোপাধ্যায় : নারী শ্রেণী ও বর্ণ (নিম্নবর্গের নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান); সিএম, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৯

কার্ল ম্যানহাইম : সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব (বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর-অনূদিত); বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮০

কার্ল মার্কস : ভারতীয় ইতিহাসের কালপঞ্জী (৬৬৪-১৮৫৮); প্রগতি প্রকাশ, মস্কো, ১৯৭১

কোকা আন্তোনভা ও অন্যান্য : ভারতবর্ষের ইতিহাস; প্রগতি প্রকাশন, মস্কো ১৯৮৬

ক্ষিতিমোহন সেন : হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা; বিশ্ব ভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৫৬

ক্ষেত্র গুপ্ত : কবি মুকুন্দরাম; গ্রন্থ নিলয়, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৪

: প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন; সাহিত্য প্রকাশ, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ।

: বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস; গ্রন্থ নিলয়, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০

খাজা নিযামউদ্দীন আহমেদ : তবাকাত-ই-আকবরী (১ম ও ২য় খণ্ড); আহমদ ফজলুর রহমান কর্তৃক বাংলায় অনূদিত; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৮

গীতা মুখোপাধ্যায় : বাংলা সাহিত্যের সামন্ততান্ত্রিক চিন্তাধারা; কে.পি.বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানী, কলকাতা, ১৯৮১

গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (প্রথম খণ্ড; প্রাচীন ও মধ্যযুগ); অরুণা প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

: বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা (দ্বিতীয় খণ্ড : নবযুগ); অরুণা প্রকাশনী, পঞ্চম মুদ্রণ, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ

: বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ; মুক্তধারা, ঢাকা, মার্চ, ১৯৭৫

গোপাল চন্দ্র সিন্‌হা : ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ); প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭

গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু : বাংলার লৌকিক দেবতা; দে'জ পাবলিশিং চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৮, মাঘ ১৪১৪।

গোপিকারঞ্জন চক্রবর্তী : বাংলা মঙ্গলকাব্যে শ্রমজীবী মানুষ; বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯

গোলাম মুরশিদ : আশার ছলনে ভুলি; আননন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৯৫

গৌতম ভদ্র : মুঘল যুগে কৃষি অর্থনীতি ও কৃষক বিদ্রোহ; কলকাতা, ১৯৮৩

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : কবি কঙ্কণচণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল- বোধিনী (প্রথম ভাগ); ইউনিভারসিটি প্রেস, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯২৫

: কবি কঙ্কণচণ্ডী, চণ্ডীমঙ্গল- বোধিনী (দ্বিতীয় ভাগ); ইউনিভারসিটি প্রেস, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯২৮

চিত্তরঞ্জন মাইতি : বাংলা কাব্য প্রবাহ; মেহ্‌রা রূপা অ্যাণ্ড কোং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৪

জয়া সেনগুপ্তা : মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক পটভূমিকা ও নারী; বড়াল প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেরুয়ারি, ১৯৯০

জিতেন্দ্র লাল বড়ুয়া : আত্ম অন্বেষা: বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, আষাঢ় ১৪০৬/জুন, ১৯৯৯

পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯৫

তানভীর মোকাম্মেল : মার্কসবাদ ও সাহিত্য; জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮৯

তোফায়েল আহমদ : আমাদের প্রাচীন শিল্প; বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় প্রকাশ, ঢাকা, জুন, ১৯৯২

দেবেশ রায় (সম্পাদিত) : দলিত সাহিত্য; সাহিত্য একাডেমী, কলকাতা, ২০০১

দীনেশচন্দ্র সেন : বৃহৎবঙ্গ; প্রথম খণ্ড (সুপ্রাচীন কাল হইতে পলাশীর যুদ্ধ পর্যন্ত); দে'জ পাবলিশিং, তৃতীয় মুদ্রণ, কলকাতা, মার্চ, ২০০৬, ফাগুন ১৪১২

: বৃহৎবঙ্গ; ২য় খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ৩য় মুদ্রণ, কলকাতা, মার্চ ২০০৬, ফাগুন, ১৪১২

: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (১ম খণ্ড); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ ২০০২
: বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য় খণ্ড); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ৩য় মুদ্রণ, ২০০২

দুর্গাদাস লাহিড়ী : বঙ্গের ইতিহাস; কলকাতা, ১৩১৫ বঙ্গাব্দ

দেবীপদ ভট্টাচার্য : বাংলার চরিত সাহিত্য; কলকাতা ১৯৫৪ খ্রি.

নগেন্দ্রনাথ বসু : বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ব্রাহ্মণ কাণ্ড); প্রথমাংশ, কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ
: বরেন্দ্র কায়স্থ বিবরণ; কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ
: কায়স্থের বর্ণ নির্ণয়; কলকাতা, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : ভারতীয় জাতিবর্ণ প্রথা; ফার্মা কে. এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৮৭

নলিনীকান্ত ভট্টশালী : বাংলার প্রাথমিক যুগের স্বাধীন সুলতানদের মুদ্রা ও কালক্রম (মোঃ রেজাউল করিম অনূদিত); ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর বেঙ্গল স্টাডিজ, ঢাকা, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৯৭

নির্মল দাস : মধ্যযুগের কাব্যপাঠ; সাহিত্য বিহার, কলকাতা, ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ।

নীহাররঞ্জন রায় : বাঙ্গালী হিন্দুর বর্ণভেদ; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা
: বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) জ্যোৎস্না সিংহ রায় কর্তৃক সংক্ষেপিত; লেখক সমবায় সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮২ বঙ্গাব্দ
: বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) দে'জ পাবলিশিং, প্রথম সংরক্ষণ, কলকাতা, ১৪০০ বঙ্গাব্দ।
: বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব); দে'জ পাবলিশিং, সপ্তম সংস্করণ ফাগুন, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ

নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায় (সম্পা.) : ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর, ১৯৭৮।

নৃপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস; কলকাতা, ১৩২২ বঙ্গাব্দ

নৃপেন্দ্র গোস্বামী : ভারতীয় সমাজ ও বিবাহ ; নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮১ বঙ্গাব্দ।

নৃসিংহ প্রসাদ ভাদুরী : দেবতার মানবায়ন : শাস্ত্রে সাহিত্যে এবং কৌতুকে; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৫

পবিত্র সরকার (প্রধান সম্পাদক) : ভারতের সমাজ ভারতের নারী; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা ২০০১

প্রদ্যোত কুমার মাইতি : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে বাঙালী নারীর শিক্ষা-চিত্র, ইতিহাস অনুসন্ধান-৫ (গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত); কে.পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা ১৯৯০

প্রফুল্লকুমার সরকার : ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু; ২য় সংস্করণ কলকাতা, ১৯৪১

প্রফুল্লচরণ চক্রবর্তী : ব্রত ও আচার; সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ

প্রমথ চৌধুরী : প্রবন্ধ সংগ্রহ; বিশ্ব ভারতী, কলকাতা, ১৯৯৮

পঞ্চানন তর্করত্ন ও মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত) : বাৎস্যায়নের কামসূত্র; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৩৪

ফ্রাঞ্জ ফেনো : জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যহত (আমিনুল ইসলাম ভূইয়া অনূদিত); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮

বদরুদ্দীন উমর : মার্কসীয় দর্শন ও সংস্কৃতি; চিরায়ত প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৬

: চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে বাংলাদেশের কৃষক; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ৪র্থ মুদ্রণ, জুন, ১৯৯৮

বি.টি. রণদিভে : জাত, বর্ণ শ্রেণি এবং সম্পত্তিগত সম্পর্ক; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, অষ্টম মুদ্রণ, কলকাতা, জুলাই, ২০১০

বিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (প্রথম খণ্ড); প্রকাশ ভবন, ষষ্ঠ মুদ্রণ, কলকাতা, মার্চ ২০০৮

: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (দ্বিতীয় খণ্ড); প্রকাশ ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, মার্চ ২০০৮

: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (তৃতীয় খণ্ড); প্রকাশ ভবন, চতুর্থ মুদ্রণ, কলকাতা, মার্চ, ২০০৮

: পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি (চতুর্থ খণ্ড); প্রকাশ ভবন, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, ফেরুয়ারি, ২০০৭

: বাদশাহী আমল (ফ্রাঁসোয়া বার্নিয়ারের-'ট্রাভেলাস ইন দা মুঘল এম্পায়ার' অবলম্বনে রচিত); অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৩৯২

: বাংলার লোক সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব; অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮০

: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ; ওরিয়েন্ট লংম্যান লি. কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩

বিশ্বজিৎ ঘোষ : বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

ব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য : জীবন রসিক কবি মুকুন্দরাম; হাউজ অব বুকস, কলকাতা, ১৯৫৫

বাসুদেব রায় : মনসামঙ্গল কাব্যে দেব- দেবীর স্বরূপ; পাঠক বন্ধু লাইব্রেরী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০০৪

: চণ্ডীমঙ্গল ও অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীর স্বরূপ; উৎস প্রকাশন, ঢাকা, জুন, ২০০৫

ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : শক্তির রূপঃ ভারতে ও মধ্য এশিয়ায়; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিডেট, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০

ভবতোষ দত্ত : বাঙালি মানসে বেদান্ত; সাহিত্যলোক, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৬

ভীষ্মদেব চৌধুরী : বাংলাদেশের সাহিত্য গবেষণা ও অন্যান্য; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯১

ভূদেব চৌধুরী : বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা (প্রথম পর্যায়); দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিত প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৮

মাহমুদা ইসলাম : নারী ইতিহাসে উপেক্ষিতা; মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪

: সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকা; জে. কে. প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০২

মিতা চট্টোপাধ্যায় : প্রাচীন ভারতের দেব-ভাবনা ; কলকাতা, ১৯৮০

মিনু মাসানী : বিবর্তনের পথে মানব পরিবার (নিযামউদ্দিন আহমদ অনূদিত); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭৩

মুখলেসুর রহমান : মাতৃকা; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৯

মুস্তাফা পান্না : বাংলাদেশের শ্রমজীবী মানুষ; বাংলা একাডেমি ঢাকা, ১৯৮৫

মুসা আনসারী : ইতিহাস : সমাজ ও সংস্কৃতি ভাবনা; বাংলা একাডেমি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, জুন ২০০৮

মুহম্মদ আবদুর রহিম : বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (১ম খণ্ড); মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান অনূদিত, বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা ১৯৯৫

: বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড); মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান ও ফজলে রাব্বি অনূদিত; বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯৬

মুহম্মদ আফসার উদ্দীন (সম্পাদিত) : এ. কে. নাজমুল করিম স্মারক গ্রন্থ; সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮৪

মুহম্মদ আবদুল জলিল : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ; বাংলা একাডেমি, প্রথম পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, জানুয়ারি, ১৯৯৬

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা (দ্বিতীয় খণ্ড); রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৫৭

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া : শ্রীরায় বিনোদঃ কবি ও কাব্য; বাংলা একাডেমি প্রথম সংস্করণ, ঢাকা ১৯৯১

মোহাম্মদ হাননান : মনসামঙ্গল কাব্যে মতাদর্শগত বিরোধ ও শ্রেণীদ্বন্দ্ব; বিশ্বসাহিত্য ভবন, একুশে বইমেলা, ঢাকা, ২০০১

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আধুনিক বাংলা কাব্যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৭০

মীনহাজ-ই-সিরাজ : তবকাত-ই-নাসিরী; (আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া কর্তৃক বাংলায় অনূদিত); বাংলা একাডেমি,ঢাকা, ১৯৮২

মালেকা বেগম : যৌতুকের সংস্কৃতি; দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৬

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা. ও অনূদিত) : কৌটিলীয়ম অর্থশাস্ত্রম; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা ২০০২

মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা. ও অনূদিত) : মনুসংহিতা; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪১০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : সাহিত্য; বিশ্বভারতী, কলকাতা, ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৯৮

রজনী পাল দত্ত : আজিকার ভারত; বিশ্বভারতী, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী, প্রথম বাংলা সংস্করকণ, কলকাতা, ১৯৪৮

রঞ্জন দত্ত : রাঢ়ের সমাজ অর্থনীতি ও গণবিদ্রোহ : বীরভূম-১৭৪০-১৮৭১; সুবর্ণরেখা রত্নাবলী, কলকাতা, ২০০১

রফিকউল্লাহ খান : কবিতা ও সমাজ; বাংলা একাডেমি, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা, ১৯৮৫

: বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৭

রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলাদেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ); কলকাতা, ১৯৭৪

: বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্য যুগ); কলকাতা, ১৩৮০ বঙ্গাব্দ

: বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের সূচনা ও ভারতের নারী প্রগতি; কলকাতা, ১৩৭৫ বঙ্গাব্দ

: কমলা বক্তৃতামালা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৬৬

রাজিয়া সুলতানা : সাহিত্য বীক্ষণ; বাংলা একাডেমি, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, জুল, ১৯৯৮

রাণ্ডল সাংস্কৃত্যায়ন : মানব সমাজ (সুবোধ চৌধুরী অনূদিত); ভারতী বুক স্টল, কলকাতা, প্রকাশ কাল অনুল্লেখিত

: নতুন মানব সমাজ (শম্ভুনাথ দাস অনূদিত); নব প্রকাশ ভবন, পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৮৫

রংগলাল সেন : বাংলাদেশের সামাজিক স্তরবিন্যাস; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় : সমাজ সংস্কৃতি-প্রগতি; প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯১

রামশরণ শর্মা : ভারতের সামন্ততন্ত্র; কে. পি. বাগচী এণ্ড কোম্পানী, তৃতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০০৭

: প্রাচীন ভারতের বস্তুগত সংস্কৃতি ও সমাজ গঠন (গৌতম নিয়োগী অনূদিত); ওরিয়েন্ট লংম্যান লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৯৮

রাজশেখর বসু (সম্পা.) : মহাভারত, এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স, প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৫৬

: রামায়ণ, এম.সি. সরকার এণ্ড সন্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৫৬

লেলিন আজাদ : ভারতীয় সামন্ততন্ত্র ও মোগল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা ১৯৮৯

শঙ্করী প্রসাদ বসু : কবি ভারতচন্দ্র; দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০০

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে পুরুষ চরিত্র; পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯২

: মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য; পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৪

: মাধ্যযুগের বাংলা কাব্যে নারী চরিত্র; পুঁথি, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৬

: মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের রূপ ও রীতি; পুঁথি প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৯৮

: গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন ও সাধন তত্ত্ব; কলকাতা, ১৯৯৯

: মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে সমাজতত্ত্ব; পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০

: শাক্ত-তান্ত্রিক সাধনা ও সাহিত্য; পুঁথি, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ২০০০

শশিভূষণ দাশগুপ্ত : ভারতের শক্তি-সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য; সাহিত্য সংসদ, তৃতীয় সংস্করণ কলকাতা, ১৯৮০

শিপ্রা সরকার : সাহিত্যের সমাজতত্ত্ব : প্রসঙ্গ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য; আজকাল প্রকাশনী ৩৮/৪, বাংলা বাজার, ঢাকা, ডিসেম্বর, ২০০৭

শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ; কলকাতা, ১৯০৯ খ্রিঃ

শিব প্রসাদ ভট্টাচার্য : ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ; মডার্ণ বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৫৬

শিব প্রসাদ হালদার : পৌরাণিক সংস্কৃতি ও বঙ্গ সাহিত্য; ফার্মা কে.এল.এস. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮৩

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা; মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৪৫

: বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা (প্রথম খণ্ড); ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, তৃতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬৭

সাঈদ-উর রহমান : সামন্তযুগে বাঙালী সংস্কৃতি : কয়েকটি প্রসঙ্গ; মৌলি প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০১

স্বরোচিষ সরকার : অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ; প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫

স্নেহময় চাকলাদার : ভারতের জাত ব্যবস্থা ও রাজনীতি; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ কলকাতা, ১৯৮৭

সুকুমারী ভট্টাচার্য : প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, আষাঢ় ১৩৯৪

সুকুমার সেন : বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ১৯৫০

: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড); আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ, সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯১, নবম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০০৯

: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড); আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৩৯৮, নবম মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৭

: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (তৃতীয় খণ্ড); আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৪০১, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক, ১৪১৭

: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (চতুর্থ খণ্ড); আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ, জুন, ২০১০

: বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম খণ্ড); আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ১৯৯৬, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ৯ই সেপ্টেম্বর, ২০১০

সুখময় মুখোপাধ্যায় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম; ভারতী বুক স্টল, ৯৩ মাহাত্মা গান্ধি রোড, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০৭

: বাংলার ইতিহাসের দু'শ বছর (স্বাধীন সুলতানদের আমল); কলকাতা, ১৯৮০ খ্রি.

সতীশচন্দ্র : মধ্যযুগে ভারত (অনুবাদ-বৈদ্যনাথ বসু); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৪

সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী (অনূদিত) : চাণক্য নীতিশাস্ত্র সমীক্ষা; সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৯৯৫

সেলিম আল দীন : মধ্যযুগের বাঙলা নাট্য; ঢাকা, ১৯৯৭

সিরাজ সালেকীন : ভারতীয় শাস্ত্রে নারী কথা; কথা প্রকাশ, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১০

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : জাতি,সংস্কৃতি ও সাহিত্য; কলকাতা,১৩৪৫ বঙ্গাব্দ

সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাক্-পলাশী বাংলা; কে.পি বাগচী অ্যাণ্ড কোম্পানি, প্রথম সংস্করণ,কলকাতা, ১৯৮২

সৈয়দ আকরম হোসেন : বালাদেশের সাহিত্য ও অন্যান্য প্রসঙ্গ; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫

: রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস : চেতনালোক ও শিল্পরূপ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮১

সৈয়দ আজিজুল হক : ময়মনসিংহের গীতিকা : জীবনধর্ম ও কাব্যমূল্য; ঢাকা, ১৯৯০

: মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : সমাজচেতনা ও জীবনের রূপায়ণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮

সৌমিত্র শ্রীমানী : সুলতানী রাজত্বকালে ভারত; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় : কলিকাতা সেকালের ও একালের; কলকাতা, ১৯১৫ খ্রি.

সেলিনা হোসেন ও বিশ্বজিৎ ঘোষ (সম্পাদিত) : জেন্ডার আলোকে সংস্কৃতি; মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন, ১৪১৪,ঢাকা ফেব্রুয়ারি, ২০০৮

সেলিনা হোসেন, বিশ্বজিৎ ঘোষ ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত)	: সাহিত্যে নারীর জীবন ও পরিসর; মাওলা ব্রাদার্স, প্রথম প্রকাশ ফাল্গুন ১৪১০ ঢাকা, মার্চ, ২০০৭
হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য	: হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথম পর্ব); ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড,দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৮২
	: হিন্দুদের দেবদেবী : উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (দ্বিতীয় পর্ব); ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৭৮
	: হিন্দুদের দেবদেবীঃ উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (তৃতীয় পর্ব); ফার্মা কে. এল. এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৭
হুমায়ুন কবির	: বাংলা কাব্য; চতুরঙ্গ, কলকাতা, ২য় সংস্কারণ ১৩৫৬
হুমায়ুন আজাদ	: নারী; আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
	: দ্বিতীয় লিঙ্গ (ল্য দ্যা জিয়েম সেক্স বা দি সেকেণ্ড সেক্স গ্রন্থের অনুবাদ) আগামী প্রকাশনী, ঢাকা প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১

গ. সহায়ক-বাংলা প্রবন্ধ

অজয় রায়	: ভূখণ্ড বাংলাদেশ, জন-জাতি ও সভ্যতা সংস্কৃতি; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.), সুন্দরতম শীতসংখ্যা, ঢাকা, ১৪০২
	: বাঙালির আত্মপরিচয় : একটি পুরাবৃত্তিক ও নৃতাত্ত্বিক আলোচনা; সফর আলী আকন্দ (সম্পা.) বাঙালীর আত্ম পরিচয়; ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টডিজ,রাজশাহী বিশ্ববিদালয়, রাজশাহী, ১৯৯১
আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ	: বাঙ্গালা ও বাঙ্গালী; সফর আলী আকন্দ (সম্পা.) বাঙালীর আত্ম পরিচয়; ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯১
আবু জাফর শামসুদ্দীন	: বাঙালীর আত্ম পরিচয়; সফর আলী আকন্দ (সম্পা.) বাঙালীর আত্ম পরিচয়; ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯১
খন্দকার মুজাম্মিল হক	: মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ঐতিহাসিক উপাদান; আবুল খায়ের মোঃ আশরাফ উদ্দিন (সম্পাদিত), ভাষা সাহিত্য পত্র উনবিংশ বার্ষিক সংখ্যা, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৪১০ বঙ্গাব্দ।
খোন্দকার সিরাজুল হক	: বাংলার মুসলমানের আত্ম পরিচয়; সফর আলী আকন্দ (সম্পা.) বাঙ্গালীর আত্ম পরিচয়, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, ১৯৯১
জামরুল হাসান বেগ	: মনসামঙ্গলের পুরুষচরিত্রঃ নারী আসক্তি প্রসঙ্গ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা সংখ্যা ৫৫, ঢাকা, অক্টোবর ১৯৯৯, কার্তিক ১৪০৬
মাহমুদা খাতুন	: মঙ্গলকাব্যের মধ্যযুগের বাঙালী সমাজ; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পা.) সুন্দরম ৬ষ্ঠ বর্ষ; চতুর্থ সংখ্যা, ঢাকা ১৯৯২
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	: বাংলাদেশের প্রসঙ্গ উত্তরাধিকার; বাংলাদেশ : বাঙালী আত্ম পরিচয়ের সন্ধানে; সাগর পাবলিশার্স, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা, ১৯৯১
মোহাম্মদ হাননান	: মনসামঙ্গল কাব্য : চাঁদ সদাগরের শ্রেণী চরিত্র; মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (সম্পা.) সাহিত্য পত্রিকা চৌত্রিশ বর্ষঃ দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা, ফাল্গুন, ১৩৯৭ বঙ্গাব্দ

নরেন বিশ্বাস : প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে খাদ্য পানীয়; রফিকুল ইসলাম (সম্পাদিত), সাহিত্য পত্রিকা আটত্রিশ বর্ষ; প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা, কার্তিক, ১৪০২ বঙ্গাব্দ

নীলিমা ইব্রাহিম : মুকুন্দরামের কাব্যে শ্রেণী চরিত্র; সাহিত্য পত্রিকা অষ্টাদশ বর্ষ: প্রথম সংখ্যা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ১৩৮১ বঙ্গাব্দ

রংগলাল সেন : বাংলাদেশের সামাজিক কাঠামো ঐতিহাসিক পটভূমি; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮১

শামীম আরা : মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য: অন্ত্যজ জীবনের রূপায়ণ; দুলাল ভৌমিক (সম্পা.) এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, সপ্তবিংশ খণ্ড, শীত সংখ্যা, ঢাকা, পৌষ, ১৪১৫/ডিসেম্বর ২০০৯

শিপ্রা সরকার : হিন্দু সমাজের জাতিবর্ণ ব্যবস্থা; একটি নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনা; ভীষ্মদেব চৌধুরী (সম্পা.) এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, ঊনবিংশ খণ্ড, হীরক জয়ন্তী সংখ্যা, গ্রীষ্ম-শীত ১৪১৮, ঢাকা, ডিসেম্বর,২০১১

সাঈদ-উর রহমান : সামন্তযুগে বাংলা ভাষার কবিদের সাহিত্যাদর্শ; সাহিত্য পত্রিকা তেত্রিশ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ঢাকা, ফাল্গুন ১৩৯৬ / ফেব্রুয়ারি, ১৯৯০

সুকুমারী ভট্টাচার্য : সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্র ও নারী : পঞ্চম থেকে একাদশ শতক; প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য; আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৩৯৪

ঘ. সহায়ক ইংরেজি গ্রন্থ

Abul Fazal : Ayeen-i- Akbari (Tr.) Francis Gladwin-ed. Jagadish Mukharjee, Calcutta, 1783

: Akbar Nama of Abdul Fazal : History of the reign of Akbar including an account of his predecessors (Tr.) H. Beveridge, Delhi, 1977

Abdul Hashim : The creed of Islam or The Revolutionary Character of Kalima; Islamic Academy, Dacca, 1970

A.K. Nazmul Karim : Changing Society in India Pakistan and Bangladesh; Nawroz Kitabistan, Dacca, 1976

Angus a Maddison : Class Structure and Economic Growth : India and Pakistan Science the Mughal; London, 1917

Christopher Caudwel : Illusion and Reality; People's publishing House, Bombey,1947

D.D. Kosambi : Culture and Civilization of Ancient India in Historical outline; Vikas publishing House pvt. Ltd. New Delhi, 1981

E.B.Tylor : Primitive culture; Brentano's, New York, 1924

Hamida Khatoon Naqvi : Urbanisation and Urban centres under the Great Mughals (1555-1770) ; First published, 1972

Irfan Habib : The Agrarain system of Mughal India (1556-1707); Asian pulishing House, New York, 1963

Jadunath Sarkar (ed.) : The History of Bengal (Vol-II); The University of Dacca, Dacca, 1972

: Bengal Nawabs; Asiatic Society of Bengal Calcutta.

	: Fall of the Mughal Empire (Vol-I); Orient Langmans Ltd. Bombay, New Delhi, 1981
K.K. Datta	: Studies in the History of the Bengal Subah; Calcutta, 1936
Karl Marx	: Captial (Vol-III); progress publishers, Moscow 1971
Max Weber	: The city; The free press, New York, 1966
	: Essays in Sociology; London, 1970
P.N. Ojha	: Aspects of Medieval Indian Society and culture; B.R. Publishing Corporation, Delhi, 1978
S.A. Dangee	: India From Primitive communism to Slavery; People publishing House, New Delhi, 1972
S.B. Dasgupta	: Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature; Calcutta, 1946
R. C. Mojumder (ed.)	: History of Bengal; University of Dacca, Dacca, 1943
Ralph Fox	: The Novel and the people; Lawrence and wishart, London, 1937
Tamonash Chandra Dash Gupta	: Aspects of Bengali Society; Calcutta University press, Calcutta, 1935
W.W. Hunter	: The Indian Musalmans; third edition, Calcutta, 1945

ঙ. প্রাসঙ্গিক অভিধান/পরিভাষাকোষ

অশোক মুখোপাধ্যায় (সংকলক)	: সংসদ সমার্থ শব্দ কোষ; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৯০
আব্দুল হাকিম খান বাহাদুর (সম্পা.)	: বাংলা বিশ্বকোষ (১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড); নওরোজ কিতাবিস্তান ঢাকা, ১৯৭২-১৯৭৬
আহমদ শরীফ (সম্পা.)	: সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান; বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯২
কবীর চৌধুরী	: সাহিত্য কোষ : মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, প্রথশ প্রকাশ, ১৯৮৪
দুলাল চৌধুরী	: লোক সংস্কৃতি: পরিভাষা; রূপসী বাংলা, কলকাতা-২০০২
ফরহাদ খান	: প্রতীচ্য পুরাণ ; প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৪
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (সম্পা.)	: আঞ্চলিক ভাষার অভিধান; বাংলা একাডেমি, ১৯৬৮
মুহম্মদ এনামুল হক (সম্পা.)	: ব্যবহারিক বাংলা অভিধান; বাংলা একাডেমি ১৯৭৪
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম ও রাজিয়া সুলতানা (সংকলিত ও সম্পাদিত)	: প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার অভিধান (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড); বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৭
রাজশেখর বসু (সংকলিত)	: চলন্তিকা; এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রা. লি. ত্রয়োদেশ সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ
শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সংকলিত)	: সংসদ বাঙ্গালা অভিধান; সাহিত্য সংসদ, সংশোধিত ও পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, ঊনবিংশ মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯৫
সরদার ফজলুল করিম	: দর্শনকোষ : বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৩
সুধীরচন্দ্র সরকার (সংকলিত)	: পৌরাণিক অভিধান; এম.সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রা. লি. পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।
সুবলচন্দ্র মিত্র (সংকলিত)	: সরল বাংলা অভিধান ; নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রা. লি. অষ্টম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, কলকাতা, ১৯৯১
সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা.)	: সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান; সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	: রাজনীতির অভিধান; আনন্দ পাবালিশার্স প্রা. লি. কলকাতা, ১৯৯৭
হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	: বঙ্গীয় শব্দকোষ (দুই খণ্ডে-১ম ও ২য়); সাহিত্য অকাদেমী, নয়াদিল্লী, ১৯৭৫
সেলিনা হোসেন ও নূরুল হুদা (সম্পা.)	: চরিতাভিধান; বাংলা একাডেমি, ১৯৮৫
রফিকুল ইসলাম ও পবিত্র সরকার (সম্পা.)	: প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১ম ও ২য় খণ্ড) বাংলা একাডেমি, ২০১১
সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.)	: বাংলা পিডিয়া (সমগ্রখণ্ড), বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩
Sally Wehmeier (ed.)	: Oxford Advanced Learner's Dictionary; Oxford University Press, London, Sixth edition, 2002-2003
Zillur Rahman Siddiqui	: English-Bangla Dictionary; Bangla Academy, (First Edition):, August, 1993